ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের সিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারণ।

আমাদের কুশলী শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

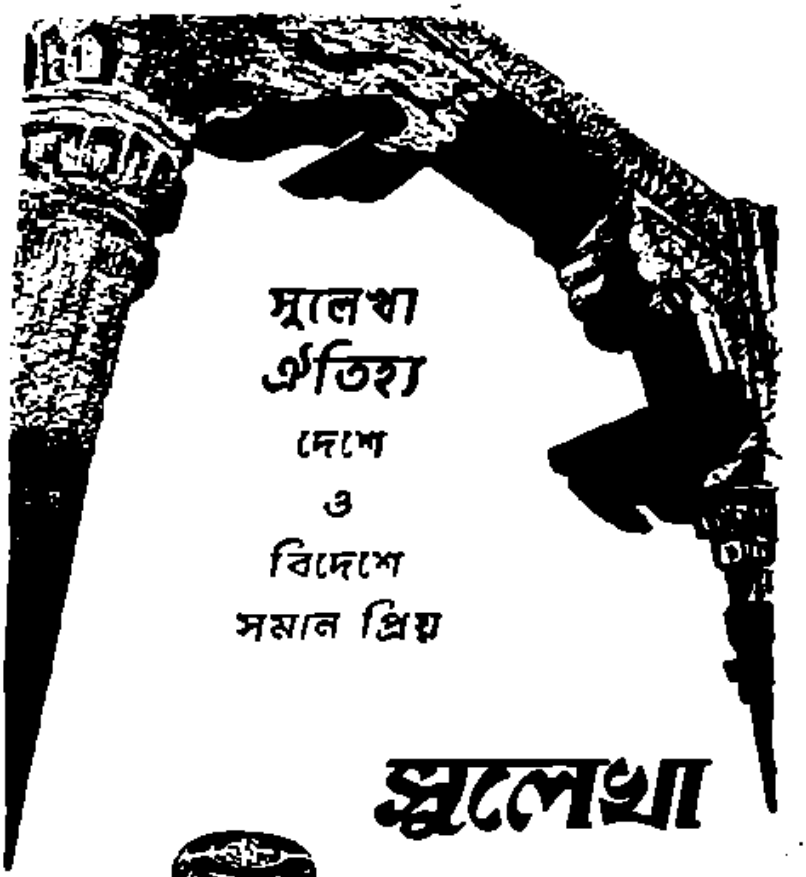

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive SW-318

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
পৌষ ১৩৭৩, JANUARY, 1967
দ্বাবিংশতি বর্ষ—৭ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

পোড়া .... কাটা .... পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

ডাক্তার কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং

আপনার সুন্দর কালো

কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিনের এসেন্স থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেম সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই দেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—প্রভাতী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—নেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস. এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিওসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, দাগা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আসরওয়ালা; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল রাবড়মল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ ধরারাম জেন্সী; অরুক অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চাঁদনীবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৮-২১৮০

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৪৬৫
কল্লা বল্লা (উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪৬৮
খেলাধুলা	
ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দল—	৪৭৫
ক্রিকেটের ঐতিহ্য—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৭৭
নাটমঞ্চ—রত্নাকর	৪৮১
না-স্বর্গ না মর্ত্য (বড় গল্প)—ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়	৪৮৯
নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫২৩

হলা পিয় সহি–

হলা পিয় সহি

উলতমালের তলোবনে শুধু,

[illegible] আসরে আহ্বানে নয়

–গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

এ যুগের বিরহিণী শকুন্তলা আজও

'হলা পিয় সহি !' 'হলা পিয় সহি !' বলে

দীপ্তমধ্যাহ্নের খরতাপে সৌন্দর্যের বরণডালায়

আজ তার না বলেই নয়

বোরোলীন ক্রীম

সকল কাজে সবার সাথে

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস্ – কলিকাতা-৩

এই সংখ্যায়

ভালবাসা—প্রভাত মুখোপাধ্যায় ৫২৯

ছায়া বাণী—চিত্র মিত্র ৫৩৩

মেয়ে-মজলিশ

শীত পার্বন—হাসি ভট্টাচার্য ৫৩৮

শীতের দিনে রান্নাবান্না—বেলা দে ৫৭১

শীতের অঙ্গরাগ—হেমপ্রভা মল্লিক ৫৭৪

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৫৭৮

উঁচু নীচু (গল্প)—কুমারলাল দাশগুপ্ত ৫৫২

কোলে

▲ ভেনিস

▲ অ্যাসর্টেড
লজেন্স ও টফি

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২০

এই সংখ্যায়

রূপসী নেশা (গল্প)—হরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী ৫৫৬

চলতি দুনিয়া— ৫৬৭

মৃত পুতুলের জন্ম (গল্প)—নির্মলেন্দু গৌতম ৫৬৬

জলরঙ (গল্প)—অনিল ভট্টাচার্য ৫৭২

সংযোজন

ভোটরঙ্গ (কার্টুন)

গণতন্ত্র ও ভারত—নলিনীরঞ্জন মিত্র ৫৮১

রঙবেরঙ-এর খবরাখবর ৫৮৮

ভোটের রঙবেরঙ ৫৯১

Kesoram Industries & Cotton Mills Limited.

15, India Exchange Place, Calcutta-1.

Manufacturers of :

Cotton Textile & Piece Goods, Rayon Yarn Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid, CS2, Cnst Iron Spun Pipes & fittings, Readymade Garments, etc. etc.

Head Office :
15, India Exchange Place,
Calcutta-1.

Mill :
42, Garden Reach Road,
Calcutta-24

Rayon Unit

Head Office :
4A, Council House Street,
Calcutta-1

Mill :
Tribeni,
(Dist. Hooghly)

Spun Pipe Unit

Head Office :
P-46A, C. I. T. Scheme XLV
Radha Bazar Lane, Cal-1.

Mill :
Bansberia,
(Dist. Hooghly)

Managing Agents :

Birla Brothers Private Limited

15, India Exchange Place,
CALCUTTA-1

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

স্কুল-কলেজে গোলমাল চলছিল, তাই ছেলেমেয়েদের কথা উঠলো। কথাটা তুললেন ভোলানাথ-বাবু। বললেন, আজকালকার ছেলেমেয়েগুলোই হয়েছে এইরকম। আমার মেজো ছেলেটাকে বললাম, 'লণ্ড্রি থেকে এই কাপড়গুলো নিয়ে আয়। আর আসবার সময় আধ কেজি সরষের তেল আনবি।' 'পারবো না' বলে ব্যাটা বেরিয়ে গেল।

মনে-মনে হাসলাম একটুখানি।

ভোলানাথবাবু বললেন, 'হাসছেন কি মশাই! ছেলেগুলোর মেজাজগুলোই হয়েছে ওইরকম। বড় ছেলের সঙ্গে তো কথাই বলতে সাহস হয় না। খেঁকি কুকুরের মতন খেঁই খেঁই করে ওঠে। বাপের গায়ে হাত তুলতে পারে না, তাই বোধহয়—'

কথাটা আর তাঁকে শেষ করতে দিলাম না। বললাম, 'কি আর করবেন বলুন। এইটেই মেনে নিতে হবে। কারণ সভ্য হয়েছি আমরা।'

ভোলানাথবাবু এ-সব বুঝেন না।

'সভ্যতা না ছাই! চোদ্দার মতন পাৎলুন আর বুশ-শার্ট পরলেই সভ্য হয় না।'

হয়। কিন্তু সেকথা ভোলানাথবাবুও যেমন জানেন না, তাঁর ছেলেরাও তেমনি জানে না।

তবু আমরা সভ্য হয়েছি।

পশ্চিম থেকে সভ্যতার যে-হাওয়া বইলো সেই ঝড়ো হাওয়ায় ভারতবর্ষ উড়িয়ে দিলে তার নিজস্ব সভ্যতার আদর্শ, তারপর সেই একই ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেল তার যা-কিছু-সব, তার অতীত গেল মুছে বর্তমান হলো ধোঁয়াটে, ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

ভারতবর্ষ সভ্য হলো।

যে-সভ্যতা যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে, যে-সভ্যতা ব্যবসায়িক শঠতা ও সামাজিক কপটতাকে পরিহার করতে পারেনি, যে-সভ্যতা বহু-ভর্তিকা নারীকে অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তিকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়েছে, পৃথিবীব্যাপী সেই সভ্যতার একেবারে পেছনের সারিতে থাকলেও আমরা সভ্য হয়েছি বলে গর্ব করছি। তার ওপর এই সভ্যতাকে বেষ্টন করে আছে এমন-একটি অর্থনৈতিক চক্রাকার বৃত্তরেখা—যাকে অতিক্রম করবার সাধ্য আমাদের নেই। সেই চক্রান্তের বেড়াজালে আমরা দম আটকে মরে যাচ্ছি, তবু জীবনযাত্রার

প্রতিটি পদক্ষেপে সেই চক্রান্তকে আমাদের সেলাম বাজিয়ে চলতে হচ্ছে। এরই নাম সভ্যতা। এবং এই সভ্যতার আওতায় ব্যক্তিজীবন বিকৃত হতে যাচ্ছে।

সভ্যতা জিনিসটাই কৃত্রিম।

এই সভ্যতার বিরাট দুর্গ তৈরি করতে গিয়ে প্রকৃতি থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি।

এখন আর আক্রোশ করে লাভ নেই। এ সভ্যতা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শেষ সান্ত্বনা শুধু প্রকৃতি যদি তার প্রতিশোধ নেয়!

সভ্যতা বেড়ে চলেছে। মানুষের পরমায়ু বেড়েছে। রোগব্যাধির ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত্যুর হার কমেছে। একদিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে। অন্যদিকে খাদ্যের উৎপাদন কমেছে। সভ্যতার অভিশাপ রূপে এল একটি সমস্যা এসে দাঁড়াচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে আমরা তার সমাধান করছি। প্রয়োজন হয়েছে জন্মনিরোধের। সুতরাং বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে চালাও 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং।'

এর পরের ধাপ হলো গর্ভপাতকে আইন সঙ্গত করা। গর্ভনিরোধে যখন ফল পাওয়া যাবে না, তখন সভ্যতার হাতে একমাত্র অস্ত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ভপাত।

আজ যেটা অপরাধ, কাল তাই হবে পুণ্যকর্ম।

এই বিকৃত ব্যক্তিজীবন দেশের যুবশক্তিকে করবে কলুষিত। সভ্যতা আনবে অবাধ স্বেচ্ছাচার।

ভারতবর্ষে সভ্যতার আদর্শ ছিল পশুত্বকে অতিক্রম করে মনুষ্যত্বে উত্তরণ।

কিন্তু এই আধুনিক সভ্যতা হবে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে পশুত্বে প্রত্যাবর্তন।

যে যুবশক্তি দেশের আশাভরসা, দেশের ভবিষ্যৎ, সেই যুবশক্তিই যদি হয় বিকৃত স্বেচ্ছাচারে উন্মত্ত, তাহ'লে তার ভয়াবহ পরিণাম সভ্যতার কোন্ স্বর্গধামে আমাদের নিয়ে যাবে ভাবতেও কষ্ট হয়।

পশ্চিমে 'বীট্' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব এবং তাদের জনপ্রিয়তাই তার শুভ সূচনা।

আমাদের দেশেও তার ছোঁয়াচ লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান (শ্রীযান নিখিল সরকার) বিলেতে গিয়ে কিছুদিন সেখানে বাস করে এলো। সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলছিল। বলছিল—বৃটেনের কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে আজকাল কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের আধিপত্য সব চেয়ে বেশি। শিল্পে, সাহিত্যে, টেলিভিসানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিতে—সর্বত্রই তাদের আনাগোনা।

এদের বলে 'পপ্' সম্প্রদায়। বারো তেরো বছরের ছেলেমেয়ে থেকে আরম্ভ করে পঁচিশ-তিরিশ বছরের যুবক যুবতী অদ্ভুতরকমের পোষাক পরে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়, নতুন নতুন নানারকমের মতবাদ প্রচার করে, আর গান যারা গাইতে পারে তারা গান গায়। এই সব কচি-কাঁচা তরুণ-তরুণীদের সব চেয়ে ভাল গাইয়ের নাম পপ্ আন্‌কা। বয়স মাত্র ষোল। তার একখানি গানের রেকর্ডের বিক্রি দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। গায়ক পেয়েছে কম করেও এক লক্ষ পাউণ্ড। এমনি তার জনপ্রিয়তা।

তবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চেয়ে তারা ভিন্ন প্রকৃতির। তারা দলে দলে কলেজ ছেড়ে বেরিয়েও আসে না, শিক্ষকদের আটক করে রাখার মত দুর্বিনীতও নয়। তারা এমন কিছু করে না—যাতে দেশের আর দশের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

এই সব 'পপ্' সম্প্রদায় নিজেদের খেয়াল খুশী মাফিক্ চলে। কাগজের ওপর তুলি দিয়ে এমন একটা কিছু আঁকে যার মানে বুঝা যায় না। অথচ সেইটেই তুলে ধরে বলে, এইটেই আর্ট। গল্প লেখে, উপন্যাস

দেখে। তাতে আদি রসের মাত্রা একটু বেশি থাকে। তারা বলে—'জ্যাস্ট্রিক্টাইন্ এ্যানিম্যাল্ ভালগারিটি।' বাধাবন্ধহীন আদিম উদ্দামতা। গানের ভাষা অতি সহজ সরল। যেমন ধরুন—

আই লাভ্ ইউ উইথ্ অল মাই হার্ট
এণ্ড হোপ্ উই উইল্ নেভার্ পার্ট।
আই এ্যাম্ সো ইয়াং এণ্ড উই আর সো ওল্ড।
ও প্রিজ বী মাই মি—তারেনা! ও প্রিজ—

আমাদের দেশের সঙ্গীতে সাহিত্যে শিল্পে এই উন্নাসিকতার ঢেউ এসে লেগেছে।

তবে আমাদের দেশের এই সব রুচি কাঁচার দল হল ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, নয় তো বেকার। তারা বাপ-দাদার অন্ন ধ্বংস করে আর দেশের ভবিষ্যৎ ভরাডুবি করে তোলে।

লণ্ডনে কিন্তু তা নয়। এরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রোজগার করে। লণ্ডনের একজন লেখক হিসাব করেছেন—এদের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ লক্ষ। এবং প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত তিন পাউণ্ড ইচ্ছেমত ওড়াতে পারে। এদের রোজগারের পরিমাণ প্রায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড। এই বিত্তের ক্রয়ক্ষমতা উপেক্ষা করবার মত নয়। ওরা রেকর্ড ব্যবসার পৃষ্ঠপোষক, বই, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, মোটর সাইকেল, মিনি-মোটর ইত্যাদি অনেক কারবারে লক্ষ্মীকে এরা অচলা করে রেখেছে। এদের জন্যই লণ্ডনের কফি-হাউস, বার্, আর রেষ্টুরেন্টগুলো দিনরাত জমজমাট হয়ে আছে।

এই সব দেখে শুনে মনে হয় বুঝি সারা পৃথিবীটাই একই পথে ছুটে চলেছে। ছুটবেই তো! একই সভ্যতার বিস্তৃত তালপালা।

পরিবর্তন ব্যাকুল মানুষের মন। এই সব অপরিণতবয়স্ক তরুণ-তরুণীর কাছে সমাজের রীতিনীতি বিধি-ব্যবস্থা সবই প্রাচীন এবং পুরাতন। সবই তারা ভেঙে ফেলতে চায়। উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং শরীরের শক্তির অভাব নেই, কাজেই ভাঙাটা তাদের পক্ষে সহজ।

ভাঙতে জানে, অথচ গড়তে জানে না।

এইখানেই রয়েছে সমূহ বিপদ।

এখনও তারা সংসারে প্রবেশ করেনি। আগুনের আঁচ তাদের গায়ে লাগেনি। যেদিন লাগবে সেইদিন তারা গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। যে উৎসাহ নিয়ে ভেঙেছে সেই উৎসাহ নিয়েই গড়বে।

সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে উন্মুক্ত আকাশের তলায় কিংবা বনে-জঙ্গলে বাস করবার মত উন্মাদ তারা নয়। সুখ-সাচ্ছন্দ্য এবং জীবনের আনন্দ তারাও চায়।

তাদের মনের মত আনন্দময় পৃথিবী তারা গড়ে তুলুক! এই শুভবুদ্ধি তাদের আশ্রয় হোক!

এই আশা নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। এই আশা নিয়েই যেন মরতে পারি!

এমনি সব ছেলেদের মাঝখান থেকেই সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। এটা সেই বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্রের দেশ সেকথা ছেলেরা জানে। তারা জানে ইওরোপ এবং ভারতবর্ষ দুটো স্বতন্ত্র দেশ। স্বতন্ত্র আমাদের আদর্শ, স্বতন্ত্র আমাদের দর্শন। স্বতন্ত্র আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি।

'অসতো মা সদ্গময়' আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

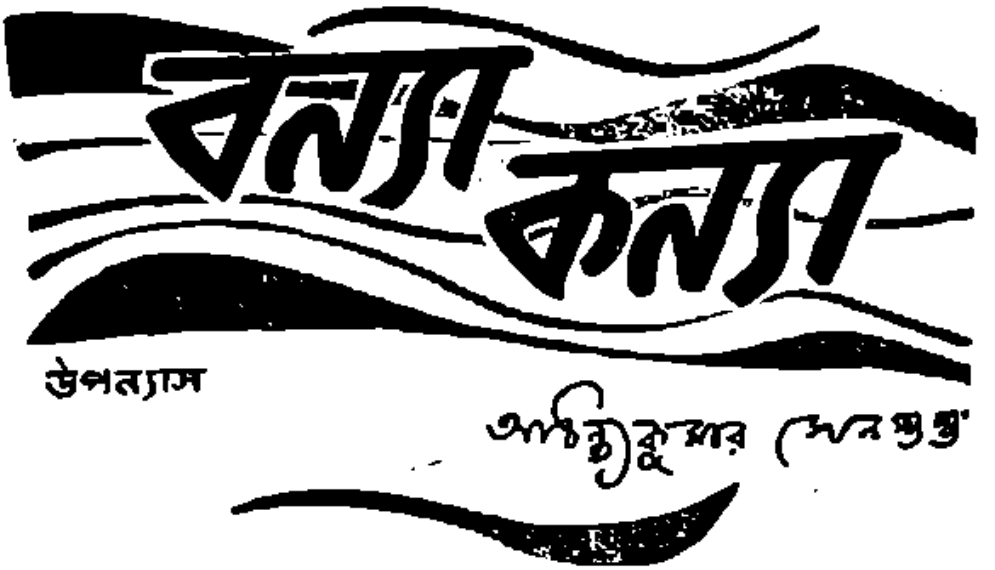

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আর ডাকবার দরকার মধ্যে গেলেন না সরসিজ, নিজেই বনছায়ার ঘরের দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'বনি, ফিরেছিস?'

ডাক শুনে বনছায়া ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠল। দ্রুত হাতে যতদূর সম্ভব এলোমেলো ভাবটা শুধরে নিল। মনে হল তেতলার ঘর নিলেই ভালো হত, সময়-অসময়ে বাবার ডাক এসে এমনি পৌঁছুতে পেত না। অথচ বাবার কাছাকাছি থাকবে বলেই দোতলায় সে ঘর নিয়েছে। মানেই, বৌদিরা বাবার যথেষ্ট দেখাশোনা করলেও, মেয়ের হাতের সেবায় যেন কী একটু অন্তরঙ্গ মাধুরী আছে, তাই বাবাও বলেছিলেন দোতলায় ঘর বাছতে। তাছাড়া, আরো আকর্ষণ, তেতলায় বলে শুধু একখানা ঘর পেত, দোতলায় একসঙ্গে দু-দুখানা ঘর জুটেছে। একটা ঘরের মধ্য দিয়ে আরেকটা ঘর। ভিতরটা শোবার, বাইরেরটা লেখাপড়া করবার। কিংবা, খেয়াল হলে, বাইরেরটাই শোবার, ভিতরেরটা কিছুই না করবার, কিংবা, কেউ আসবে তারই জন্যে বসে-বসে প্রতীক্ষা করবার। মোটকথা অনেক আলস্য অনেক শৈথিল্য অনেক অমনোযোগকে প্রশ্রয় দিতে পারবে বলে দোতলাই সে বেছে নিয়েছিল। ভেবেছিল বৌদিদিদের গা ঘেঁসে যে থাকতে হবে না, তাদের বাঁকা চোখের মোকাবিলায়, এটাই নিদারুণ শাস্তি। বাবা বুড়ো মানুষ, কত আর সমালোচনায় সজাগ থাকবেন, অনেক তাই সে উড়ে-ঘুরে বেড়াবার জায়গা পাবে, কিন্তু এ কী দৌরাত্ম্য!

বনছায়া যে ফিরেছে এ কাউকে বলে দিতে হবে না—সরসিজ নিজের অধিকারেই ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এত দেরি হল যে?'

বনছায়া শান্ত গলায় বললে, 'একটা সাহিত্যসভায় গিয়েছিলাম।'

সাহিত্যসভা বই তো কী। সঙ্গীতের কাছে যাওয়াই একটা সভায় যাওয়া। একটা পাড়ার ক্লাব-ঘরের সভা নয়, অনেক আলোয় ঝাড়-ঝোলানো বিরাট হল-ঘরের সভা, কিংবা যদি বলো, আকাশ-অঙ্গনে জ্যোতিষ্কলোকের সভা, আর সে-সভার অধিপতি মোটে একজন। তার নাম সঙ্গীত। একাধারে সেই বক্তা শ্রোতা উদ্যোক্তা—আর, সমস্ত সভাটা আশ্চর্য এক আদর্শবাদের রঙে।

'তোর বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললাম।' যেন কোথাও বেড়াতে যাবেন, টিকিট বুক করে এলাম, এমনি গা-ছাড়া আরামের ভঙ্গিতে সরসিজ বললেন কথাটা।

কিন্তু বনছায়া যেন শুনল, তোর ফাঁসির দিন ঠিক করে এলাম।

তেমন আদর্শে জীবন বাঁধা থাকলে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে মরতেও কত সুখ। আর তেমন যদি বিয়ে একটা পাওয়া যায় জীবনে তবে খাঁচাস্থর ছেড়ে বনবাসে যেতেও সে রাজি আছে। চাঁছাছোলা ভাবে কথাটা এল বলে বনছায়ার ঔদ্ধত্যটাও কিছু কড়া হল: 'বিয়ে? সে আবার কী!'

'যা চিরকাল সমাজ-সংসারে চলে আসছে, তাই।' সরসিজ যেন আরো একটু বিশদ হতে চাইলেন: 'তোর দাদারা যা করেছে, দিদিরা যা করেছে—সেই বিয়ে।'

'বিয়ে আমি করব না।'

যেন মুখের উপর একটা ঘা খেলেন সরসিজ। নিজেরও অলক্ষ্যে কণ্ঠস্বর যেন কেমন বিকৃত হয়ে গেল: 'বিয়ে করবিনে তো কী করবি?'

বনছায়া গম্ভীর মুখে বললে, 'সাহিত্য করব।'

'সে আবার কী করা! ঘরে বসে ছুটো গল্প কবিতা লেখা! সে তো বিয়ের পরেই আরো ভালো করে করা যায়। বড়লোকের স্ত্রী বলে নিজের লেখা ইচ্ছামতো বই করে ছাপানো চলে—'

'বই ছাপানোটাই সাহিত্য নয়।'

'না হোক। কিন্তু সেটা কিছুতেই বিয়ের অন্তরায় হতে পারে না। কত ঘরের গৃহস্থ ঘরের বউ সাহিত্য করছে—'

'না, না, সে সাহিত্য নয়, আমি জার্নালিজম করব—'

'সে আবার কী!' এ জাতীয় কথা সরসিজ যেন কখনো শুনলেন।

'আমি দৈনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হব, রিপোর্টিং করব, ফিচার লিখব—'

'সেটা আবার বেশি কথা কী! সে তো যে কেউই পারে। বিয়ে করলে আরো ভালো পারে।' বনছায়ার সমস্ত বক্তব্যটাই সরসিজ উড়িয়ে দিতে চাইলেন: 'নে, পাগলামো করিসনে। দু কলম লিখতে পারার মানে বিয়ে ব্যাপারটাকেই নাকচ করে দেওয়া নয়। শোন, দিন পনেরো পরেই একটা ভালো দিন আছে—'

'না, না, আমি বিয়ে করব না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বনছায়া: 'আমি চাকরি করব, আমার কেরিয়র গড়ে তুলব, আমি সাধনা করে-করে সাহিত্যে বড় হব—আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ শস্তা একটা বিয়ের দামে বিকিয়ে দিতে পারবনা।'

'ভবিষ্যৎ? বিয়ের মতো বড় ভবিষ্যৎ মেয়েদের আর কী আছে?' সরসিজ একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন: 'আর কেরিয়র? কেরিয়র তুই কাকে বলিস? চাকরির উন্নতি? তোর এ চাকরি তোকে কত টাকা দিতে পারে? কত তুই আশা করিস? কিসে, কতদূর তোর সাকসেস হয়ে শুনি? তার চেয়ে এ বিয়ে—জীবনে তোর এর চেয়ে আর বড় সাকসেস কী হতে পারে—শত শত চাকরির চেয়েও ঢের-ঢের বড় জিনিস—'

'কার সঙ্গে যে বিয়েটা হচ্ছে সে কথাটাই তো তুমি বলছ না—' কৌশিক এসে ঘরে ঢুকল।

বনছায়া বুঝল বাবা এতক্ষণ বড়দার সঙ্গে বসেই পরামর্শ করছিলেন, বাবার ঘর থেকেই গুটি-গুটি এসে পড়েছে বড়দা।

'যা, সে তো ও জানে। সরসিজ চোখ উজ্জ্বল ক'রে তাকালেন।

'জানি?' বনছায়া অবাক হয়ে গেল : 'আমি কখন জানলাম!'

প্রত্যক্ষে না জানলেও অনুমোচরে জানা উচিত এমনি ভাব করলেন সরসিজ : 'সেই যে গৃহ-প্রবেশের দিন তোকে দেখে গেল, ঐ যে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়র, দেখেছিস তো তুই, সুন্দর সুপুরুষ, বয়েস ডিফ্রি, পনেরোশ' টাকা মাইনে, বাড়ি গাড়ি ফ্রিজ ফোন—'

'এমনিতেই অবশ্য ভালো, তাছাড়া সাইড বিজিনেস আছে'—কৌশিক যোগ করল : 'তারপর সবচেয়ে বেটা বড় কথা—'

মনে মনে দু হাতে দু কান চাপা দিয়ে রেখেছিল এতক্ষণ, এবার বড় কথাটা শোনবার জন্যে বনছায়া উৎকর্ণ হল।

'সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বনছায়াকে দেখে হিমাংশুর ভীষণ পছন্দ হয়েছে।'

পছন্দ হয়েছে! কী লোকটার স্পর্ধা, এক পলক দেখতে না দেখতেই অপরিচিতাকে পছন্দ করে বসে।

'আমাকে বলছিল দেশ বিদেশে অনেক ঘুরেছে কিন্তু বনছায়ার মত এমন কুইনলি এপিয়ারেন্সের মেয়ে সে দেখেনি।' কৌশিক বললে, 'এমন ডিগনিটি—'

ডিগনিটি! সম্ভ্রান্ততা! যে কথাটা সবচেয়ে বেশি এড়াতে চায় তাই বনছায়ার কপালে জেগে জেগে বলে এরা চক্রান্ত করেছে! এতে করে পরিবারের মর্যাদা বাড়বে, বাবা-মায়ের মুখ উঁচু হবে বনছায়ার সুখ-দুঃখের হিসেবে কাজ কী। জীবনে বাসনাই বলো সাধনাই বলো, টাকাই একমাত্র উত্তর। আর মনের কোণে যদি কোনো দূর কুশাঙ্কুর মাথাও তোলে, টাকাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষত নিরাময় করে দেবে।

মুহূর্তে একটা টঙের উপর উঠে বসবে বনছায়া। আর মাটির উপর যেখানে-সেখানে চাপটি মেরে বসতে পারবে না। খুশি করে চা খাওয়া তার নিষেধ হয়ে যাবে। দু পা যেতে হলেও তার গাড়ি লাগবে, থার্ডক্লাশ ট্রেনে বা সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে আর ওঠা হবে না, রিকশা চড়তে হলে রিকশাওলাকে উপকার নয় নির্যাতন করছে এমনি মনে করতে হবে। টাটকা জিনিস না খেয়ে সব সময়েই জিনের বাসি খেতে হবে। যখন-তখন খিল্ খিলিয়ে হেসে ওঠা যাবে না, সব সময়ে শালীনতার মাত্রা ছুঁয়ে চলতে হবে, দু একটা স্ল্যাংও মুখে আনা যাবে না। বস্তিতে ন্যাতসেঁতে ঘরে আধুনিক কবিদের আড্ডায় গিয়ে মন হরে বসার আনন্দটা সমূলে উৎখাত হয়ে যাবে। যে বিপদজ্জনক অভিধানের সুর থাকলে জীবনটা সুস্বাদু হয় তাই বাদ পড়বে জীবন থেকে।

'আসল আকর্ষণের কারণ ওর চেহারা নয়' ছোড়দা সৌতমও শামিল হল : 'ওর সাহিত্য।'

'সাহিত্য!' মাথায় হাত রাখল বনছায়া। তার মানে এর চেয়ে মাথায় একটা বাড়ি মারলে সেটা বোঝার পক্ষে সহজতর হত : 'আমার আবার সাহিত্য কোথায়?'

'এখানে-ওখানে তোর যে সব লেখা বেরিয়েছে তাই ওর চোখে পড়েছে, কিংবা কার কাছে শুনেছে নিশ্চয়।' সৌতম বোকার মতন তাকাল : 'আমাকে বলছিল—'

তারপর বাকিটুকু বলবে কিনা, বললে হিমাংশুকে ঠিক বাঞ্ছনীয় মনে হবে কিনা, দ্বিধা করতে লাগল।

'কী, কী বলছিস হিমাংশু?' সরসিজ উৎসুক হলেন।

'বলছিল সাহিত্যিক স্ত্রী পাওয়া প্রকাণ্ড ব্যাপার।'

'রক্ষে করো।' বনছায়া অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল।

কেউ সেটা গর্তব্যের মধ্যে নিল না। কৌশিক বরং একটু রঙ চড়িয়ে বললে, 'ইঞ্জিনিয়র স্বামী আর সাহিত্যিক স্ত্রী, একদিকে যন্ত্র আরেক দিকে কবিতা—একটা দারুণ কম্বিনেশন হবে—'

'তবে আর কথা কী।' উৎসাহে সরসিজ কৌচ ছেড়ে উঠে পড়লেন। বনছায়ার দিকে সস্নেহ চোখ মেলে বললেন, 'হিমাংশুর যখন সাহিত্যে সিমপ্যাথি আছে তখন তো সোনায় সোহাগা হল। তুই তোর ইচ্ছেমত সাধনা করতে পারবি।'

'হ্যাঁ, সমস্ত ওর ইচ্ছেমত।' কৌশিক পরিষ্কার করে বললে, 'আমাকে হিমাংশু বলেছে বনির কোনো 'পার্সুটে' সে বাধা দেবে না। যদি গান বাজনা শিখতে চায় তাতেও সে রাজি—'

'এমন কি আমাকে বলেছে,' গৌতম যোগ করল: 'যদি চাকরি বজায় রাখতে চায় তাও রাখবে। আর যদি ছেড়ে দিতে চায় দেবে। সব দিকেই প্লেন-সেলিং—'

'তারপর বছরে একবার ফরেনে যাওয়া হবেই।' বললে কৌশিক।

'আসল কথা, মনে যখন একবার ধরে গিয়েছে,' গৌতম বিজ্ঞের মত বললে, 'তখন বনি যেমনটি বলবে তেমনটিই হিমাংশু মেনে নেবে।'

'শুধু ওর মনে ধরলেই হল?' বনছায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'আমার মন বলে কিছুই নেই?'

'নিশ্চয়ই। ঠিকই তো।' সকলের আগে সরসিজ কাঁপিয়ে পড়লেন: 'একদিন হিমাংশুকে বাড়িতে চা খেতে নেমন্তন্ন কর। গৌরাঙ্গের ডাক। তারাই সব ব্যবস্থা করুক। হিমাংশুর সঙ্গে বনির আলাপ করিয়ে দিক। হ্যাঁ, বেশি নয়, আসছে রবিবার—সরসিজ খুশি মনে ঘর ছাড়লেন: 'একটু নিরিবিলি বসে আলাপ হলেই বুঝতে পারবে ইঞ্জিনিয়র স্বামী পাওয়াও কত বড় ব্যাপার।'

কৌশিক আর গৌতমও চায়ের প্রস্তাবে সম্মত হল। যার যার ঘরে বউদের সঙ্গে গোপনে চক্রান্তের জাল বুনতে বসল।

বনছায়া ভাবল কী সুন্দর এরা তার মনের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। এদের ভাবখানা এই, একবার নির্জনে হিমাংশুর মুখোমুখি হতে পারলেই সে ধরা পড়ে যাবে। অর্থাৎ তারও মনে ধরে যাবে হিমাংশুকে।

চলতি সমাজে এর বিপরীতকে চিন্তা করাই তো বিপরীত।

কিন্তু কী করা। কোথায় যাবে? কাকে ধরবে? কী কৌশলে উত্তীর্ণ হবে?

প্রথমেই মনে পড়ল সন্দীপকে। কী বলিষ্ঠ ধৈর্য দিয়ে তৈরি, কী দুর্দাম বিশ্বাস দিয়ে! বারে বারেই তার ছায়ায় গিয়ে বসতে ইচ্ছে করে। শুধু তার সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে থাকলেও যেন চরিত্রে একটা মহৎশক্তি সঞ্চারিত হয়। বিষাদের মধ্যে থেকেও সব কিছু আনন্দময় লাগে।

চারদিকে এত দারিদ্র্য অথচ আর বাড়াবার এতটুকুও চেষ্টা নেই। যতটুকু অবকাশ পায় অধিচ্ছিন্ন লিখছেই, লিখেই চলেছে। কী এর ভবিষ্যৎ বা কিসে একে সফলতর ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়া যায় সেটুকুও ভাবে না। যা হবার তা হবে, তুমি শুধু লিখে যাও বেঁচে যাও ভালোবেসে যাও এইটুকুই জীবনের আশীর্বাদ। লেখা মানে সেই আশীর্বাদের জন্যে জেগে থাকা।

তাই বলে সিনেমা কোম্পানির দু' হাজার টাকা ছেড়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাজার তাকে কত দিয়েছে ? কত ছাপবে বলে কত ছেপেছে ? কমিশনের লোভে কেমন চেপে রেখেছে বিক্রি ? তবু সিনেমা তো করতলে নগদ দু হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল। তা আজ হল ফিরিয়ে দিয়ে ? ঐ গল্পই ওরা ছুরি করে প্লটের একটু হেরফের ঘটিয়ে দিবি অন্যের নামে চালিয়ে যেবে। আপনার শুধু লাঠিই ভাঙল, যে সাপ সে সাপই রয়ে গেল।

সন্দীপ হাসল। বললে, 'ওরা ঠকাক কিন্তু আমরা ঠকব না। ওরা লোভ দেখাক কিন্তু আমরা টলব না।'

এই রুক্ষ রাস্তবতার মধ্যে ঐ আদর্শবাদ অচল। এমন কিছু দুর্যোগে-মধুতে ভেসে যাচ্ছেনা সংসার। তবু সন্দীপ কেন এত নিষ্ক্রিয় এত উদাসীন থাকবে ? বনছায়া যখনই উঠতে চাইছে, বলছে, উঠোনা, আরো একটু বসো, অথচ তাকে তো একটুও স্পর্শ করতে চাইছেনা। অথচ এও বলছেনা, তুমি এখন যাও, আমার উপন্যাসের পরিচ্ছেদটা শেষ করি। যেন এই শুধু বলতে চাইছে, তুমি এসেছ, কয়েকটি মুহূর্ত দিয়ে গেলে আমাকে, আজ সন্ধ্যার জীবনের এই দুর্লভ আশীর্বাদে।

এত অল্পে তুষ্টি—বনছায়ার অসহ্য লাগল। কিন্তু কী করে যে প্রতিবাদকে প্রবল করা যায় ভেবে পায়না।

শেষে বললে, 'আমাকে একটা গল্প দিন, লেখা না থাকলে লিখে দিন। প্রবাহের সম্পাদক শীঘুর হত ছাপবে বলেছে।'

'গল্প ? গল্প কই !'

'সেই তো লিখে দিন। আমি বলছি ঠিক ছাপবে প্রবাহ। ছাপলেই যেন কয়েকটা টাকা।'

সুন্দর মুখে হাসল সন্দীপ। বললে 'শীঘুষবাবুকে আমার কাছে চাইতে বোলো।'

আবার অভিমান ! গা জ্বলে যায় বনছায়ার। ইচ্ছে করে দু হাতে ঠেলা মেরে সন্দীপের এই অনুযোগের বোঝা ফেলে দেয় গা থেকে, গুঁড়িয়ে দেয় অভিমানের স্তম্ভ। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, সন্দীপের পাশটিতে বসে শুধু বসে থাকা ছাড়া আর কিছুতেই যেন তার সাধ যায় না।

'আমার লেখা তো চাইছ তোমার লেখা কই ?' সন্দীপ উন্মুখ হয়ে উঠল।

'আমার লেখা দিয়ে আপনার কী হবে ?'

'জানো না অনেক কিছু হবে। কিন্তু তোমার লেখা তো তুমি এখানে বয়ে নিয়ে আসবেনা, আমিই তা শুনতে তোমার ঘরে যাব।'

'সত্যি, যাবেন ? আমাদের বাড়ি যাবেন ?'

'সেটা তোমাদের বাড়ি কিনা জানিনা কিন্তু আমি তোমার ঘরটিতে যাব।'

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল বনছায়া। বললে, 'সেলে আপনাকে আর ফিরতে দেবনা। কার জন্যে আপনি ফিরবেন ?'

'বনছায়া, তোমার জন্যেই আমি ফিরব।'

বনছায়া ভেবে দেখল আরো কিছু তার আয় বাড়ানো দরকার। শুধু মাইনের আড়াইশো টাকায় কিছু হবার নয়। বাড়তি আয় বাড়াতে গেলে একমাত্র সাহিত্য। সেখানে তার পুঁজি স্বল্পতম। শুধু মেয়ে বলেই যা সে একটু খাতির পাচ্ছে, নইলে, এমনিতে তার বস্তুতে এখনো বিশেষ সার নেই।

সে নিজেই সেটা বোঝে, তবে এটাও সে জানে ঘসতে-ঘসতে কাঠেও আগুন বেরোয়, খুঁড়তে খুঁড়তে কাঁকুরে মাটি থেকেও জল বেরোয়। সে দীর্ঘ পথের যাত্রা তো তার আছেই, পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিতে খুঁজে কিছু মেওয়া যায় কিনা তারই এখন কিকির খুঁজছে।

বিনয় সেনের ফ্ল্যাটের দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে বনছায়া কলিং বেল টিপল।

চাকর এসে দরজা খুলে দিল। কিছু বলবার আগেই ওপাশ থেকে বিনয়ের গলা ভেসে উঠল : 'কে ?'

'আমি বনছায়া।

'আরে এস এস, এঘরে চলে এস, এ ঘরে কেউ নেই।'

যেন কেউ থাকলে তার সেই বনছায়া !

ঘরে ঢুকে দেখল চেয়ারে-টেবিলে বসে বিনয় লিখছে। ডান হাতে কলম আর বাঁ হাতে সিগারেট। বাঁ দিকে হাইদান, ডান দিকে মদের গ্লাস।

'তুমি তো ড্রিঙ্ক কর না, তোমাকে চা দিতে বলি।' চাকরকে হুকুম দিয়েই সিগারেটে টান দিল বিনয়। বললে, 'এ সময়টায় আমি সাধারণত ড্রিঙ্ক করিনা—কেন ইংরিজি বলার চেষ্টা—সরল হওয়াই ভালো—এ সময়টায় আমি সাধারণত টানিনা, কিন্তু শুধু সিগারেটের ধোঁয়ায় লেখাটা ঠিক জমছে না, তাই ভাবলাম যদি জোলো আগুনের গুণে কিছুটা উন্নতি হয় !'

'মদের নাম বুঝি জোলো আগুন ?' চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করতে পারল বনছায়া।

'সাহিত্যিকেরা বলে তরল অনল। সাংবাদিকেরা তো একটু কিচেলেমি করবে, তাই তাদের ভাষায় এটা জোলো আগুন।'

'কী লিখছেন ?'

'আর কী লিখব। এক মহারথীর সঙ্গে ইন্টারভিউ করেছিলাম তার কতারেক করছি। এই এক-টাই শুধু কতারেকের।'

'আর গল্প-উপন্যাস লেখেন না ?' বনছায়া দুঃখিত মুখ করল : 'সাহিত্য ছেড়ে দিলেন ?'

'এ যুগ সাহিত্যের নয়, সংবাদের। মানুষের শিক্ষাদীক্ষা এখন অনেক কিকে হয়ে এসেছে, তাদের ধৈর্যও নেই বলে বসে সাহিত্য পড়ে বা বোঝে বা হজম করে। তার চেয়ে সংবাদ অনেক সহজ, অনেক মুখরোচক।' বিনয় গ্লাসে চুমুক দিল : 'সংবাদ গ্লাস কিছু কিচেলেমি কিছু ইয়াকি বা ফাস্টিনস্টি—তাই আজকালকার সাহিত্য। দেখছ না তাইই জন্যে কত প্রাইজ কত খেতাব কত বিমান ভ্রমণ। যদি মোটা রোজগার করতে চাও তাহলে সাহিত্য ছেড়ে সংবাদে চলে এস। খুচরো সাহিত্যের চেয়ে চুটকি সংবাদে বেশি পয়সা।'

'বেশতো, আসব সংবাদে।' পটাপটি বলতে পারল বনছায়া : 'দিন না কিছু লাইনে।'

'অমনি কতারেক করবে, গ্লাসে আরেক চুমুক দিল বিনয় : 'কিন্তু নিজের উপর আচ্ছাদন রাখতে পারবে না।'

'সে আবার কী।' একটু যেন কেমন নীচু নীচু করল বনছায়ার।

'তার মানে সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত থাকবে। যাকে এক কথায় বলে, লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন

থাকতে নয়। একবার কী হয়েছিল যদি শোনো।' তৃতীয় চোক গেয়ে আকিয়ে বলল বিনয়ঃ 'কোন এক বিলিতি শহরে ঐশ্বর্যের এক পাশোয়ান এসেছে। তার ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা নিতে এসেছে কোনো কাগজের স্টাফ-রিপোর্টার। পুরুষ নয়, তোমার মত মেয়ে রিপোর্টার। পাশোয়ানের সঙ্গে তার হোটেলের ঘরে নিভৃতে ইন্টারভিউ হচ্ছে। কিন্তু কোনো কথাবার্তা নেই, পাশোয়ান মুগ্ধ শিশুর মত শুধু দেখছে মেয়েটাকে।'

অস্বস্তিতে বনছায়া একটু নড়ে-চড়ে বসল।

'হঠাৎ পাশোয়ান বললে, আচ্ছা দেখুন, আমি শুনেছি ঘাস চোখ হাত পায়ের মত বুকও নাকি ফলস হয়? আপনারও কি ফলস না রিয়াল? যদি দয়া করে দেখতে দেন তবেই আপনার প্রার্থিত সংবাদ আপনাকে দিতে দেব, এবং হয়তো কিছু বেশি কথাও পাবেন তার সঙ্গে।' বিনয় হাসল মৃদু-মৃদু।

'ভদ্রমহিলা নির্লজ্জ লোকটার গালে চড় বসিয়ে দিল না?' বনছায়া সর্বাঙ্গে অঙ্গার জ্বালা করল।

'রাগ করে কতারেক্ট না করে ফিরে এল অফিসে। এডিটরের কাছে এসে নালিশ করলে, বললে, এ অপমানের বিহিত করুন। পুলিশে খবর দিন। নির্লজ্জ অসভ্যের পাশোয়ানির শাস্তি চাই। এর শাস্তি, এডিটর বললে, যে করে হোক, কতারেক্ট করে আসা। ভাবো তো, কী কাণ্ডটা হবে, যদি আনতে পারো। আর কোনো কাগজ যা পারবে না তুমি তাই তোমার ছোট্ট পকেটে পুরে নিয়ে আসবে। বিশ্ব জুড়ে তোমার ও আমার কাগজের কত নাম পড়ে যাবে। কত টাকা পাবে ভাবো দিকি। সংসারে সংবাদের মত আছে কী। সংসারে সংবাদই শ্রেষ্ঠ তার জন্যে রিপোর্টাররা চুরি ডাকাতি রাহাজানি কত কী করতে পারে। তোমার বেলায় তো শুধু এইটুকু। যাও যা খাঁটি তা দেখাতে লজ্জা কিসের? নিজের জন্যে নিতান্তই যদি আচ্ছাদন চাও, ঘাসো না হয়, ইউ আর মাই চাইল্ড—'

এত রাগেও হাসি পেল বনছায়ার। বললে, 'তারপর?'

'তারপর এডিটর মেয়েটাকে শান্ত করে পাঠিয়ে দিল পাশোয়ানের কাছে। দিব্যি একটা ইন্টিমেট কতারেক্ট নিয়ে এল। সে মেয়ে এখন টেকিওতে ব্রাঞ্চ অফিস খুলে তার ইন্ডিপেণ্ডেণ্ট চার্জে আছে।'

'আচ্ছা, আমি কিছু ফিচার লিখতে পারি না?' বনছায়া অন্য লাইনে যেতে চাইল।

'লিখুন না, অজস্র লিখুন। মেয়েদের আজ্ঞা, মেয়েদের খেলা দেখা, বুকস্টলে মেয়ে, হকার্স কর্নারে মেয়ে, সভায় মেয়ে, মন্দিরে মেয়ে—কত বিচিত্র বিষয়েই ফিচার চলে—লিখবেন আর আমার কাছে নিয়ে আসবেন। আমি দেখে দেব। বাড়তি রোজগারের জন্য ভাববেন না, আমি আছি।'

'আচ্ছা, আজ তা হলে আসি, লেখা নিয়ে আসব।' বনছায়া উঠল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিনয় বললে, 'স্বচ্ছন্দে আসবেন। আমাকে পাশোয়ান ভাববেন না।'

সিঁড়ি দিয়ে নিচে, রাস্তায়, নেমে গেল বনছায়া।

ভাবতে ভাবতে গেল সুবীর যে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে সে কি শুধু একখানাই ঘর, না একটা বারান্দাও আছে? আর তার বাইরে কি সত্যিই একশো বাষট্টি টাকা, না, আরো কিছু বেশি?

(ক্রমশঃ)

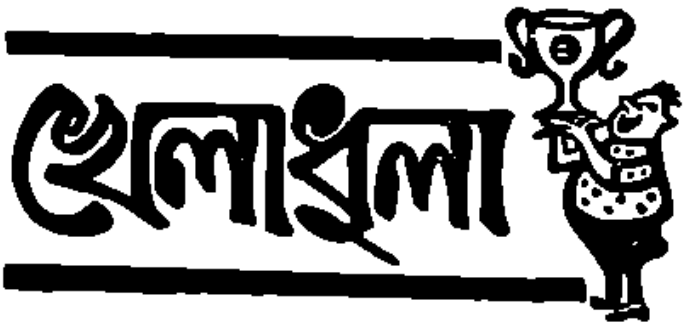

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দল

নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম :—

পাতাউদির নবাব (ক্যাপটেন), সি. ডি. গোখলে, এফ. এস. ইঞ্জিনীয়ার, বি. কে. দুরুরেশ, বি. এস. চন্দ্রশেখর, হনুমন্ত সিং, ই. এস. প্রসন্ন, ডি. এন. সারদেশাই, ডি. সুব্রতবিজয়, আর এক মুদ্রি, এস বেংকট রাঘবন, এ. এম. ওয়াদেকর, বি. এস. বেদী, সুব্রত গুহ, এস. এম. মোহন এবং রমেশ সাকসেনা।

দলের মধ্যে, সুব্রত গুহ, রমেশ সাকসেনা এবং সদানন্দ মোহন এখনো টেস্ট খেলেন নি। যেসে একটিও টেস্ট খেলেননি এমন খেলোয়াড় বিদেশ সফরে এভাবে মনোনীত হননি। সেদিক থেকে এরা তিনজনই প্রথম।

বিস্ময়ের কারণ ঘটেছে জয়সীমাকে বাদ দেওয়ায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে জয়সীমা ছুটি টেস্ট খেলেছেন এবং চার ইনিংসএ তাঁর গড় ২৯ রান। উইকেট পেয়েছেন ১৯ রানে ১টি। এবছর তাঁর ব্যাটিং অবশ্য ভাল হয়নি। কাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে তিনি রীতিমতো ভয়ে ভয়ে এবং নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। জয়সীমাকে বাদ দেওয়ায় বিলাতের পত্রিকাগুলিতেও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। ডেলি মেলের ক্রিকেট লেখক অলরিড বলেছেন, জয়সীমা বাদ যাওয়ায় বোলারের তীক্ষ্ণতম ব্যাটস ম্যান ছাড়াই এবার ভারতীয় দল সফরে আসছে। তাঁর মতে বিশ্বের যারোজন আকর্ষণীয় ব্যাটস ম্যানদের অন্যতম হলেন জয়সীমা। জয়সীমার জায়গায় নেওয়া হয়েছে সদানন্দ মোহনকে। মিডিয়ম ফাস্ট বল করেন। ব্যাটিং-এও ভাল আমেদাবাদে মোলিং-এ তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলে ৩৬ ওভারে ১০৭ রানে ৪টি উইকেট পেয়েছেন।

ইনদোরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের বিরুদ্ধে সুব্রতর চমকপ্রদ বোলিংএর কথা সকলেই জানেন। ঐ খেলায় তিনি দু'ইনিংসে মোট ৩৬ ওভারে ১১০ রানে ১১টি উইকেট দখল করেন এবং তাঁরই মারাত্মক বোলিং-এর ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দু'ইনিংসএ হেরে যায়, যা আর কখনো হারেনি ভারতের সঙ্গে খেলায়।

রমেশ সাকসেনা ১৯৬৩ সালে সিংহলের বিরুদ্ধে চমৎকার খেলে ক্রিকেট কর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। দিল্লীতে এবছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের বিরুদ্ধে তিনি ৩১ ও নট আউট ৪৯ রান করেছেন।

এই দলগুলি যারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছেন অথচ সফরগামী দল থেকে বাদ পড়েছেন, তাঁরা হলেন, আব্বাস আলি বেগ সেলিম দুরানি, অমরনাথ, এবং নাদকারনি। দুরানির বলের সুতির অন্তর্ভুক্তি অনেকেরই না পছন্দ হতে পারে। দুরানির রেকর্ড অবশ্য ভাল নয়, একটি টেস্টএ ৩৮ রান এবং ১২৫ রানে ১টি উইকেট। সুতি দুটি টেস্টএ গড়ে ৩৫ রান করেছেন এবং গড়ে ৪০ রানে ৫টি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ফিল্ডিং দুর্বল। বস্তুতঃ পক্ষে বলা যেতে পারে তাঁরই দোষে ভারত তৃতীয় টেস্টএ ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারাতে পারলো না। যাই হোক আশা করা যায়, প্রাণপণ অনুশীলনের দ্বারা তিনি নিজের ত্রুটি সাধনে সক্ষম হবেন।

ভারতীয় টেস্ট দল সম্বন্ধে বিলাতের কাগজগুলিতে খুব লেখালেখি হয়েছে। সবচেয়ে আলোচনা হয়েছে চন্দ্রশেখরকে নিয়ে। বেশ মজার মজার সব মন্তব্য। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের গোপন অস্ত্র—চন্দ্রশেখর, অস্বাভাবিক রীতির বোলার। ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা এখন থেকেই উঠে পড়ে প্র্যাকটিস সুরু করুন।" "মোহাল হল জয়ী ক্যাপ্টেন আর গাভাস্কর হেরো ক্যাপ্টেন।" "সাবধান ব্যাটসম্যানেরা। ভারতের নতুন স্পিন বোলার চন্দ্রশেখর তোমাদের গোড়া দেখিয়ে ছাড়বে। ইত্যাদি

ইংলণ্ড ভ্রমণের খেলার তালিকা

মে ৩, ৪, ৫—ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে।

মে ৮ ও ৯—গ্রেস এলাভ ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স।

মে ১০, ১১ ও ১২—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

মে ১৭, ১৮ ও ১৯—ওয়ারিকশায়ার।

মে ২০, ২২ ও ২৩—লর্ডস মাঠে এম সি সি'র সঙ্গে।

মে ২৪, ২৫ ও ২৬—গ্ল্যামরগ্যানের সঙ্গে।

মে ২৭, ২৯ ও ৩০—নরথ্যাম্পটনসায়ার।

মে ৩১, জুন ১, ও ২—সারের সঙ্গে।

জুন ৩, ৫, ৬—ল্যাঙ্কাশায়ার।

জুন ৮ থেকে ১৩— প্রথম টেস্ট ম্যাচ (হেডিংলে) লীডস মাঠে।

জুন ১৪, ১৫ ১৬—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

জুন ১৭, ১৯ ও ২০—হ্যাম্পসায়ার।

জুন ২২ ও ২৭—দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ লর্ডস মাঠে।

জুন ২৮, ৩০ ও ৩১—ডার্বিসায়ারের সঙ্গে।

জুলাই ১, ৩, ৪—ইয়র্কসায়ার।

জুলাই ৫, ৬, ও ৭—নটিংহ্যামসায়ার।

জুলাই ৮, ১০ ও ১১—লীসেস্টার সায়ারের সঙ্গে।

জুলাই ১৩ থেকে ১৮—তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ—এজবাটনে।

ক্রিকেটের ঐতিহ্য

(কলকাতা-ক্রিকেটের পুরণো কথা)

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

ক্রিকেটকে যে খেলার রাজা বলা হয় তা বিনা কারণে নয়। এর পরিবেশ, এর উদ্‌যোগ আয়োজন, এর পরিবেশন সমস্ত মিলিয়ে এমন একটা রাজকীয় এবং অভিজাত রূপ গ্রহণ করে তা অন্য কোন খেলায় দেখা যায় না। তারপর, খেলার মধ্যে এত রকমের সূক্ষ্ম শৈলীর প্রকাশ ঘটে যা অন্য খেলায় নেই। একই সঙ্গে খেলার সকল বিভাগের সংবদ্ধ উৎকর্ষের অপেক্ষায় দর্শক প্রতিক্ষণে অধীর হয়ে থাকে। ব্যাটস্‌ম্যানের কখনও জোরাল কখনও নরম খেলার শিল্প কর্ম, বোলারের আঙুলের মোচড় দশজন ফিল্ডারের তড়িৎ-চেতন প্রতীক্ষা, অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরা অথবা ফিল্ডিং, উইকেট কীপারের অলৌকিক ধরণের 'স্টাম্প আউট' অথবা 'ক্যাচ বিহাইণ্ড'—এই সকল বিভাগের উৎকর্ষের সম্বন্ধেই ক্রিকেটের আসর—রাজকীয় আসর।

শুধু তাই নয়। খেলা ছাড়াও ক্রিকেট মানুষকে আরও অনেক কিছু শেখায়। বিপক্ষকে সম্মান করতে শেখায়, ন্যায় বোধ শেখায়, ভদ্রতা শেখায়, সময় শেখায়।

একজন ইংরাজ লেখক বলে গেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে ভদ্র এবং বিশ্বাসযোগ্য তাঁরাই যাঁরা ক্রিকেট খেলেন।

ইংরেজ পৃথিবীকে কিছু কিছু ভাল জিনিষ দিয়েছে। ক্রিকেট তার মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। ক্রিকেট আর ইংরেজী ভাষা। এদুটি ভারতবর্ষে চিরদিন থাকবে (থাকা উচিত)—এবং আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেজন্য ইংরাজকে চিরদিন ধন্যবাদ দেবো।

কোলকাতায় সম্প্রতি ক্রিকেটে ঝড় বয়ে গেল। সে সব খুঁটিনাটি বিবরণ আপনারা কাগজে অনেক পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে টুকিটাকি পুরণো কথা মনে পড়ছে। সেদিন মাঠে একজন প্রশ্ন করলেন আচ্ছা, পৃথিবীতে ক্রিকেট কবে শুরু হয়েছিল? তখনিই উত্তর দিতে পারিনি। বাড়ী ফিরে কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে হোল।

অ্যালেকসিস নামে একজন উনিশ শতকের ইংরেজ লেখক লিখে গেছেন যে, ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রিকেট খেলা চালু ছিল। এদিকে আবার কবি কোপেক বলছেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের চতুর্থ এডওয়ার্ড ক্রিকেটের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, বলেছিলেন, ক্রিকেট একটা বাজে অলস খেলা, এখেলায় ছেলেরা 'বাবু' অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। তার চেয়ে তারা ধনুর্বিদ্যা শিখুক। ষোল শতাব্দীতে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া এবং সারা ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার প্রসার ছড়িয়ে পড়ে।

ক্রিকেটের পাঁজি পুঁথি উল্‌টে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম আনুষ্ঠানিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়েছিল সতেরশ আঠাশ সালে কেন্ট এবং সারে এই দুই কাউন্টি দলের মধ্যে। সতেরশ সাতাশি সালে

ক্রিকেটের সর্বজনমান্য সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এম. সি. সি.) স্থাপিত হয়। সকলেই জানেন এই সংস্থা সারা বিশ্বে ক্রিকেট খেলার নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রা।

কাগজে কাগজে ইংল্যাণ্ডে, অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এইসব দেশের ক্রিকেট ঘুনুজির ঘুলঝুরি। কোন্ দেশে কোন্ সময়ে কোন্ খেলোয়াড় কত কি রান করেছিলেন তার লম্বা লম্বা ফিরিস্তি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, নিজেদের ঘরের কথা কোন কাগজে নেই। নিজের পূর্বপুরুষদের চিন্তা, অন্তদেশের কুশলী নিয়েই মত্ত এবং বিগলিত হয়ে থাকব এ মনোবৃত্তি কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমি খবরের কাগজওয়ালাদের এবং লেখকদের—যাঁরা হালে ক্রিকেট নিয়ে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী মাত্রায় হৈ চৈ করছেন—তাঁদের উদ্দেশ্য করেই এই কথা বলছি।

বলতে পারেন, ভারতবর্ষে ক্রিকেট কবে কোথায় প্রথম খেলা হয়েছিল, ইডেন গার্ডেনে প্রথম কোন্ সালে ক্রিকেট শুরু হয়েছিল, ইডেনে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচে কোন্ কোন দল খেলেছিল, ইডেন মাঠে প্রথম সেঞ্চুরি কে করেছিল, বাঙালীর ছেলেরা কবে ক্রিকেট ব্যাট হাতে ধরে মাঠে নেমেছিল, বাঙালী-ক্রিকেটের জনক কাকে বলা হয়, কোন্ বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড় ইডেনে প্রথম সেঞ্চুরি করেছিলেন, ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করতে অকাতরে নাথ নাথ টাকা খরচ করেছেন অতীতে যাঁরা তাঁদের সেই সব উদ্‌যোগ আয়োজনের চিত্তাকর্ষক কথা?

উপরের প্রশ্নগুলি রাখলাম। এদের উত্তর যে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ এবং উপাদেয় হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কলকাতার ক্রিকেটের আদিকথা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমন রোমাটিক। ইচ্ছা রইল মাঝে মাঝে সেইসব টুকরো কথা প্রবাসীর পাঠকদের পরিবেশন করব। প্রবাসীর সম্পাদক খেলাধুলা বিভাগটিকে নানাভাবে আরও বেশী আকর্ষণীয় করবার জন্যে যে পরিকল্পনা করেছেন তা সর্বাংশে প্রশংসনীয়। তিনি সত্যি কথাই বলেছেন, "জাতীয় জীবনের খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।"

আজকের স্মৃতি চারণে একটি নাম বারেবারে মনে পড়ছে। এক বিদেশীর নাম। বহুবছর তিনি ভারতবর্ষে বাস করেছেন এবং পাতিয়ালা, এবং কলকাতায় তিনি ক্রিকেটের আসরে এক প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিলেন ১৯১৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত। তাঁর নাম এফ. এ. ট্যারেণ্ট। তাঁর সময়মূল্য ষাটা বোলার সেযুগে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলনা। কিন্তু সেই সময়কার বিধি অনুযায়ী তিনি কোন টেস্টম্যাচ খেলেননি। তার কারণ বড় বিচিত্র। জাতিতে তিনি ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান, কিন্তু বসবাস চিরকাল ছিল ইংলণ্ডে। সিডনি সেডন কাউন্টিতে পেশাদার রূপে খেলতেন। কাজেই অষ্ট্রেলিয়া বা ইংলণ্ড কোনো দলই তাঁকে পুরোপুরিভাবে করতে পারত না। অথচ দুপক্ষই স্বীকার করত, তিনি যেদলে থাকবেন সেদলের জেতবার সম্ভাবনা অনেক বেশী হবে। পাতিয়ালার মহারাজা ছিলেন সারা ভারতে ক্রিকেটের সর্বাগ্রগণ্য পৃষ্ঠপোষক। বাস্তবিক, সেকালে দেশীয় রাজন্য বর্গের অন্য আর যে দোষই থাকুক ক্রিকেটের জন্যে তাঁরা যা করেছেন তা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁরা ইংলণ্ড থেকে ক্রিকেটার আনিয়ে এদেশে ক্রিকেট খেলাকে উন্নত এবং জনপ্রিয় করেছেন। এই পাতিয়ালা মহারাজাই প্রথম ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেণ্টকে এদেশে নিয়ে আসেন। আমরা ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেণ্টকে দেখেছি, কুচবিহারের মহারাজার বেতনভুক খেলোয়াড়রূপে ১৯১৭-১৮ থেকে ১৯২৩-২৫ পর্যন্ত। তারপরেও তিনি কয়েকবছর এদেশে ছিলেন অপেশাদার রূপে। শেষ জীবনে

তিনি রেসের ঘোড়ার মালিক হয়ে ছিলেন এবং রেসের ঘোড়ার ব্যবসা করতেন। ১২৩০ সাল নাগাদ দেশে অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান।

অদ্ভুত বোলার ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেন্ট। ছ'টা, মিডিয়াম পেস। বলে আশ্চর্য মোচড় দিতে পারতেন আঙুলের অবিশ্বাস্য কারদায়। ফলে বল ব্রেক করত দু হাত তিন হাত বাইরে থেকে ভেতরে, ব্যাটসম্যানের মাথা গুলিয়ে যেত।

নিজের হাতের বল কোথায় কেমনভাবে ব্রেক করবে এবং ব্যাটসম্যান সেই বলকে কিভাবে মারতে বাধ্য হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানছিল নিখুঁত। তাই এমন ভাবে ফিল্ডিং সাজাতে পারতেন যে ব্যাটস্‌ম্যানের প্রত্যেকটি মার সেই সেই ফিল্ডারের কাছে আসতে বাধ্য হত, এবং প্রায়শই ব্যাটস্‌ম্যান হয় কট আউট না হয় স্টাম্পড হয়ে যেতেন অসহায় ভাবে। তোলা করে বল দিচ্ছেন একটি ব্যাটসম্যানকে। তিনি জানেন এই ব্যাটসম্যানটি লেগের দিকে মারতে ভারী দড়। ঠিক আছে। লেগের দিকেই যায় তুমি। দিলেন লোভনীয় লোভা বল। কিন্তু তারমধ্যে আছে নিখুঁত ব্রেক লেগের দিকে আর নিখুঁত লেংথ। ব্যাটসম্যান লোভ সামলাতে পারলে না। এগিয়ে গিয়ে মারলেন ড্রাইভ। দাঁড়িয়ে আছে একজন ফিল্ডার। তাকে এক পাও এগোতে পিছোতে হল না। বলসোজা মতন ক্যাচটি তার হাতে গিয়ে পড়ল। স্বচক্ষে দেখেছি তাঁর এই বোলিং। প্রফুল্ল বাঁড়ুজ্যে ছিলেন স্পোর্টিংইউনিয়নের সুদক্ষ উইকেট কিপার। কুচবিহারের মহারাজার দলের হয়েও খেলতেন। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সে সময়কার দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যান ছিলেন জে. ডি. গাইস। ক্রিজ থেকে এক এক পা এগিয়ে এসে তাঁর অফস্ট্রোক ছিল অবিস্মরণীয়। সেবছর তাঁর প্রচণ্ড রান। প্রতি খেলাতেই অসম্ভব দ্রুত গতিতে প্রচুর রান করছেন। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে কুচবিহার একাদশের খেলা হচ্ছে মহারাজার কলকাতার প্রাসাদ সংলগ্ন উডল্যাণ্ডস এর মাঠে। প্রথমে ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে ক্যালকাটা লাঞ্চের আগে তিন উইকেটে ১৩০ রান করলে। গাইস নট আউট ৭৫। খুব পিটিয়ে খেলছেন তিনি। লাঞ্চের সময় কুচবিহারের মহারাজা ট্যারেন্টকে বললেন, "কী বল করছ আজ! ওর চেয়ে আমি ভাল বল করতে পারি। গাইস আজ তোমায় ছাড়ু করবে। ওকে আজ আর আউট করতে পারবে না।"

কথা শুনে যোধকরি মনে মনে আঘাত পেলেন ট্যারেন্ট! একটু চুপ করেথেকে বললেন, "লাঞ্চের পর যে ওভারের সুরুতে আমি গাইসকে পাবো সেই ওভারের তৃতীয় বলে তাকে আমি আউট করব!"

মহারাজের পাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা তাঁর কথা শুনে চমকে উঠল। মহারাজা হেসে বললেন—"দশ গিনি। (অর্থাৎ যদি পারো দশ মোহর পুরস্কার পাবে)।"

খেলা আরম্ভ হল। মহারাজার দলের উইকেট কীপার প্রফুল্ল বাঁড়ুজ্যে। ট্যারেন্ট তাঁর সঙ্গে আড়ালে দু'বার কথা বললেন।

এক ওভারের পরেই একটি ওভার ট্যারেন্ট বল করতে এলেন গাইসকে। গাইস তখন প্রবল বিক্রমে হিট করতে সুরু করছেন। প্রথম বল, আগে ব্যাটসম্যানের ডান দিকে যেঁসে ব্যাটের কাছেই পড়ল। আর কোথায়! গাইস এক পা এগিয়ে এসে ব্যাট চালালেন। বল বিদ্যুৎগতিতে এক্সট্রা কভারের পাশ দিয়ে সীমানা পার হয়ে গেল। দ্বিতীয় বল। সেই একই রকম। আবার সেই একই রকম মার। আবার বাউণ্ডারী। সাহেবদের সে কী হাততালি। তৃতীয় বল। সেই একই রকম? না মনে হলেও, একই রকম নয়। লেংথের হেরফের করা হয়েছে। বলের পিচ পড়েছে

হাতখানেক পিছনে। গাইস আগের মতোই এক পা এগিয়ে এসে ব্যাট চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাট বলের নাগাল পেল না। বলটা ব্যাটের ওপর দিয়ে এসে উইকেট কীপারের হাতে চলে এলো। আর উইকেট কীপার প্রফুল্ল তো ঠিক এই বলটির জন্যেই এতক্ষণ তৈরি হয়ে ছিলেন ট্যারেন্টের নির্দেশমত। চলিতে বোল উড়ে গেল আর প্রবল চিৎকার—হউজ দ্যাট! সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ারের ডান হাত উর্ধ্বে উঠল। গাইস ৮৩ রান করে স্টাম্পড হলেন। ট্যারেন্ট এগিয়ে গিয়ে প্রফুল্লর গ্লাভস্পরা দু'হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেলেন নিজের স্থানে। বলটা জোরে জোরে ঘসতে লাগলেন প্যান্টের পিছন দিকে পাছার ওপর। এটি তাঁর বরাবরের অভ্যাস ছিল। প্যান্টের পিছন দিকটার সেই জায়গাটা বলের রং লেগে লাল হয়ে উঠত। বলের চকচকে ভাবটা নষ্ট করে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। বল যত পুরনো হবে ততই তো স্পিন বরবে তাতে। আর ট্যারেন্টের বোলিং হল দুরন্ত স্পিন করা বোলিং!

পরের ব্যাটসম্যান নামলেন। ট্যারেন্ট কিন্তু সাজালেন নতুন করে। মনে হল যেন একটু উত্তেজিত হয়েছেন। চতুর্থ বল! তার ব্রেক ব্যাটসম্যান বুঝতে পারলেন না। বোল্ড! ষষ্ঠ উইকেটে যিনি খেলতে নামলেন তাঁরও সেই অবস্থা হল। ব্যাটে বলে করতে হল না। বোল্ড। সপ্তম উইকেটের ব্যাটসম্যান খেলতে নেমে মরীয়া হয়ে ব্যাট চালিয়ে ছিলেন। বলটা আকাশে উঠল। এবং বোলারের হাতেই ধরা পড়ল। হ্যাট ট্রিক। সারা মাঠ হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সব হাততালি শেষ হবার পরও একজনের হাততালি তখনো শোনা যাচ্ছে। মহারাজা তখনো হাততালি দিয়ে চলেছেন। সেই দিকে তাকিয়ে ক্র্যাঙ্ক ট্যারেন্ট মাথার টুপিটা খুলে অভিবাদন জানালেন।

তারপর আর আধ ঘণ্টার মধ্যে বাকি সবাই আউট হয়ে গেল একশো আশী রানের মধ্যেই।

কুচবিহারের দল তিন উইকেটে সেই রান অতিক্রম করলে। ট্যারেন্ট নট আউট ৫১। ব্যাট করতেন তান হাতে। স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান ছিলেন। দলের সংকটকালে অনেক খেলায় অদ্ভুত ভাল খেলেছেন।

এমনি এক আশ্চর্য ক্রিকেটার ছিলেন ক্র্যাঙ্ক ট্যারেন্ট! তাঁর বোলিং এর চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একদিনের একটা গল্প বলি। উডল্যাণ্ডসের মাঠে সকালবেলা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রাকটিসে নেমেছেন। উঠতি বোলারদের নিজের বলের কায়দা দেখাচ্ছেন। ঠিক এখানে আমার বলের পিচ পড়বে আর এইভাবে ব্রেক খাবে। উইকেট কীপারকে তখন এইভাবে ঝুঁকে বলটা ধরতে হবে।" ইত্যাদি। মহারাজা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পকেট থেকে চার পাঁচটা মোহর বার করে ব্যাটিং ক্রিসের সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন,—বল দাও তুমি। একটা একটা করে মোহরের ওপর বল ফেল তো দেখি! যদি ফেলতে পারো মোহরগুলো তোমার। আশ্চর্য হয়ে সেদিন সবাই দেখেছিল ট্যারেন্ট পর পর বল দিয়ে প্রত্যেকটি মোহরকে ঠিকরে দিয়েছিলেন।

যেদিনকার খেলাটির কথা বলছিলাম, সেই খেলায় যতদূর মনে পড়ছে, ক্যাপ্টেনটা দলে ছিলেন, বিলাতের কাউন্টি খেলায় নাম করা সব খেলোয়াড় যথা, এস. সি. বি. পী. আর বি. ল্যাগডেন, এ. এল. হোসি, আই. পি. এফ ক্যাম্পবেল, সি. পি. জনস্টন, আর. এস. এম হোয়াইট, এফ. এম. গারনেট, এ. এন. সিলবার্ট, আর. এস. হাউলেট, টি. এন. সিলার এবং এস. এন. হাওয়ার্ড! আর কুচবিহার একাদশে ছিলেন, ব্রিস্ট হিটি, ব্রিল ভিক্টর, ক্রাঙ্ক ট্যারেন্ট, প্রফুল্ল ঘাঁড়ুজ্যে, মনিদাস, হেমাঙ্গ বসু, বিধু মুখুজ্যে, এস, আহমেদ, শৈলজা রায়, কালাধন মুখুজ্যে, এবং গোষ্ঠ পাল।

রত্নাকর

সমস্ত জগৎ রঙ্গালয় ও জগতের লোক তাহার অভিনেতা—একথাটি পুরাতন। কিন্তু এক বালকের মুখে একটি নূতন প্রশ্ন স্টেটসম্যানের বিবিধ স্তম্ভে প্রকাশ হইয়াছিল যে, যদি সকলেই অভিনেতা, তবে দর্শক কে? কথাটি হাসির কথা বলিয়াই প্রকাশিত হয়, কিন্তু ভাবুক হৃদয়ে হাস্যরস-উদ্দীপক-কথা নহে। প্রত্যেক অভিনেতার সঙ্গে এক একজন দর্শক আছে ও সেই দর্শক নাট্যরঙ্গ দিন দিন দেখে।

গিরিশচন্দ্র

নাট্য চিন্তা

নাট্যচিন্তা লিখতে গিয়ে লণ্ডনের সেই পাত্রী আর থিয়েটার ম্যানেজারের সংলাপটি মনে পড়ছে। বহুদিন আগেকার কথা। লণ্ডনের এক বিশপ এক থিয়েটার ম্যানেজারের কাছে একদিন দুঃখ করে বলে ছিলেন, দেখ, তোমরা সব মিথ্যে জিনিষ নিয়ে কত কথা বল, মিথ্যে অভিনয় কর, কিন্তু তোমাদের সেই অভিনয় দেখে আর বক্তৃতা শুনে লোকে ভাবোচ্ছ্বাস হয়, মুগ্ধ হয়, হেসে অথবা কেঁদে সারা হয়, প্রত্যহ রঙ্গমঞ্চে লোকের ভীড় হয়। আর আমি পরম সত্য-ধর্মের তত্ত্বকথা বলি, মঙ্গলঘরের সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। কিন্তু তা শোনবার জন্যে লোকের আগ্রহ নেই। সপ্তাহে একদিন মাত্র, রবিবারেও, লোক আমার বক্তৃতা শুনতে আসে না। যাও বা দু'চারজন আসে, তারা নিজেদের আসনে বসে ঘুমুতে থাকে। এর কারণ কি বলতে পারো?

থিয়েটার ম্যানেজার হেসে সবিনয়ে উত্তর দিলেন, প্রভু! আমরা সেই মিথ্যা জিনিষকে এমন আগ্রহ, নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলি যা লোকের মর্মস্পর্শ করে, যাকে তারা পরম সত্য বলে মনে করে। আর আপনারা পরম সত্যকে এমন নষ্ট আর তুচ্ছভাবে প্রচার করেন, যা লোকে সত্য বলে মনে করে না, অসার বিবেচনা করে।

উপরের কথাগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায়, ভাল অভিনয়ের কতখানি প্রভাব। আর সেই অভিনয়কে সার্থক করবার জন্যে একই সঙ্গে নাট্যকার ও অভিনয়-শিল্পীদের দায়িত্ব কত গুরুতর। নাট্যকারের সুগঠিত বক্তব্যের সঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে, শিল্পীদের নিঃশেষে একাত্ম হতে হবে, তবেই সেই নাটক আর অভিনয় চরম সার্থকতা লাভ করবে।

অহীন্দ্র চৌধুরী

আলোচনা

দেশাত্মবোধক নাটক

জাতীয় চেতনা ও চরিত্রকে উদ্বুদ্ধ করতে দেশাত্মবোধক নাটক প্রত্যেক সভ্য দেশে যুগে যুগে বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশেও সে প্রমাণের অভাব নেই।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সেকালে বাংলা দেশাত্মবোধক নাটক সারা দেশকে তোলপাড় করেছে। আজ তারা বিস্মৃত। কিন্তু তাদের প্রয়োজন আজও ফুরোয়নি। সেই কথা মনে করেই থিয়েটার সেন্টার সারা বাংলা দেশাত্মবোধক নাটক প্রতিযোগিতার এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাংলার প্রতি জেলায় এই সব নাটকের অভিনয় হয়েছে। যেসব নাটক নির্বাচিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য, দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ প্রভৃতি।

বাংলার যে সব ইতিহাসাশ্রিত দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।

দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশের ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যে রাণা প্রতাপ দিয়ে সর্বস্বত্যাগের, সর্বপণ করার যে মহত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সে সাধনার সে কৃচ্ছ্রসাধনের সমতুল্য দৃষ্টান্ত আর নেই।

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবেও রাণা প্রতাপ অদ্বিতীয়। রাণা প্রতাপ শুধু যে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক তাই নয়, সারা পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসের কাহিনীকে আশ্রয় করে এই নাটকে তিনি যেমন এক অমোঘ নাট্য সংঘাতের চিত্রকল্প তুলে ধরেছেন, তেমনি এই নাটকের আশ্চর্য সৃষ্টি চরিত্রের মাধ্যমে তিনি সকল মানুষের সর্বজনীন ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছেন।

এই নাটকের একটি পুরুষ (শক্ত সিংহ) আর একটি নারী (মেবের উদিপুরী), এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে তিনি যে চমক লাগানো, প্রশ্ন জাগানো এবং হৃদয় গলানো জীবন নাট্যের সৃষ্টি করেছেন

তার মধ্যে আছে বিভ্রান্ত মানুষের দিশাহারা জীবনের কয়েকটি মৌল প্রশ্ন, সেই সঙ্গে জীবনের মূল্য বোধ ও বিশ্বমানবতা সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা। 'রাণা প্রতাপ' নাটকের এই দুটি চরিত্র বিশ্বনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে দুটি দুর্লভ সৃষ্টিরূপে গণ্য হবার যোগ্য।

রাণা প্রতাপ নাটকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর যে বাণী ধ্বনিত হয়েছে যুগ-যুগান্ত পরে এই সেদিনও তাসখণ্ডে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

আজকের দিনে পররাজ্য লোলুপতা, হিংসা আর বৈরিতা যখন সারা পৃথিবীর আকাশ বাতাসকে কলুষিত করছে সেই সময় এই নাটকের সেই ঐকান্ত আহ্বান স্মরণ করার প্রয়োজন আছে :

"কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, ধর্মের নামে এত বিদ্বেষ এত হিংসা? ঈশ্বর এক, নীতি এক, ধর্ম এক। মানুষ স্বার্থপরতার অহঙ্কারে আলস্যে বিদ্বেষে তাকে বিকৃত করেছে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন, দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন, শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন—সেই এক নাম লেখা। সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে ব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা এই সব নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা করেছে হিংসা করেছে লড়াই করেছে। মানুষ এক। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে তারা ভিন্ন নয়।"

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবনী ও স্মৃতিকথা

শিশিরকুমারের অভিনয়

আমার অনুমানে শিশিরকুমারই সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম নির্দেশক যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো ঘূর্ণন ও অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এই দেশে এনেছিলেন।

আমি আন্দাজ ১৫।১৬ বছর বয়সে প্রথম ভাদুড়ী মশায়ের অভিনয় দেখি। সে নাট্যাভিনয়ের নাম—'দিগ্বিজয়ী'। তখনই পরপর দুবার এই নাটক দেখেছিলুম, পরে আর দেখিনি। সে অভিনয় দেখার আগে মোটের মাথায় আমার নাটক কিছু পড়া ছিল। কিন্তু দিগ্বিজয়ী' নাটকের বক্তব্যই মনে হোল যেন ভিন্ন। অনেক গভীর, অনেক important। এ যেন 'সাজাহান' 'নূরজাহান' থেকে আরম্ভ করে 'কর্ণার্জুন' 'ইরানের রাণী' ইত্যাদ সকলের থেকে ভিন্ন জাতের। সে অভিনয়ের রসিকতাও যেন অন্য জাতের। অপূর্ব অভিনয় হোত যোগেশচন্দ্র ও অমলেন্দু লাহিড়ীর মধ্যে, চতুর্থ আছে। Co-acting কাকে বলে তার প্রথম হদিস আমি পাই তাঁদের সেই অভিনয়ে। সেই অভিনয়ে নায়িকের সাধারণ কণ্ঠস্বরের আবেগে অন্য সকলের যে সম্রদ্ধ মনোযোগ, সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে যে সম্মানের তটস্থতা, এবং চলায় ফেরায় যে সামগ্রিক স্নিগ্ধতা, এ সমস্তই তখন আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয়। বাংলা থিয়েটারের পৌরাণিক বীরদের যে সর্বাইলস্করি চাল চলন, তার সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্যই নেই। এই প্রথম বুঝলুম যে এমন একজন লোক দরকার হয় যার চিন্তা: এইরকম প্রত্যেকটা চরিত্রাভিনয়ের খুঁটিনাটি

পর্যন্ত বিস্তৃত। তাতে যে দক্ষতা আসে, মুখে কিছু না বলেও বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করা যায়, তা অন্যভাবে অসম্ভব। এরই আর এক উদাহরণ হচ্ছে প্রথম অঙ্কে যেখানে নাদিরশাহ সিতারার পরিচয় নিচ্ছে। সেইখানে সিতারা যখন বলে যে, সে তার মৃতবিবাহিত স্বামীকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে, তখন—নাটকে সেটা লেখা নেই—নাদির 'শোভান আল্লা' বলে উঠে হঠাৎ অন্তর্হিত ছিপ্রহাতে সিতারার কোমরের কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা ছোরা তুলে নেয়, তারপর সেটা নিজের কোমরবন্ধে গুঁজে রাখতে রাখতে বলে— 'তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।'

তখন আমার যে বয়স তাতে মনে হোত যেটা অভিনয় হয় সেটা সবই নাটকে লেখা থাকে। কারণ, নাটকের সঙ্গে কোনো রকম পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই নাটকের সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু সেই প্রথম অভিনয় দেখার পর 'দিগ্বিজয়ী' নাটক নিয়ে পড়তে গিয়ে দেখলুম যে যেটুকু লেখা থাকে সেটুকু অতি সামান্য, পুরো নাটকটাই প্রায় শর্টহ্যাণ্ড নোটস-এর মতো সংক্ষিপ্ত। আর যেটা চোখে দেখা যায় এবং কানে শোনা যায় তার প্রাচুর্য অপরিমাণ। এবং সেটা যখন চোখ, কান, বুদ্ধি ও হৃদয়কে, কখনো একটার পর একটাকে, কখনো বা একসঙ্গে সবগুলোকে তৃপ্তকরে তখন অনুভবে যে ঘটনাটা ঘটে তার তুলনা নেই।

ধরা যাক ঐ নাটকেরই তৃতীয় অঙ্ক। নাটকে লেখা আছে, দৃশ্য হচ্ছে একটা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গন। কিন্তু চোখে দেখছিলুম একটা ছাত। ছাতটার পিছনদিকের অংশ বোধহয় এক ধাপের মতো উঁচু ছিল। তারই পেছে ছাতের নীচু পাঁচিল। এবং তারও পরে পিছনে পটে আঁকা দূরের বাড়িগুলোর উপর অংশ ও আকাশ।

এই দৃশ্য দেখামাত্র মন ভরে গিয়েছিল। ছবিতে যেমন বেশির ভাগ জায়গাটা ফাঁকা রেখেই ভরাট করে তুলতে পারেন এক একজন শিল্পী, এ সেই রকম। এই দৃশ্য পরিকল্পনা দেবুবাবুর। তিনি 'সীতা' নাট্যের সময়ে শ্রীচারু রায়ের সহকারী ছিলেন।

'দিগ্বিজয়ী'র তৃতীয় অঙ্কে নাদির শাহ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেন তখন নেপথ্যে বিউগল ট্রাম্প ইত্যাদি বেজে উঠতো, দিগ্বিদিকের শব্দ হোত মুহুর্মুহু আর তার মধ্যে সৈনিকদের আর্তনাদ শোনা যেত। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হয়ে যেত, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতো সেই লালের মধ্যে।

যতক্ষণ দিল্লী ধ্বংসের এই তাণ্ডব চলতো নেপথ্যে, ততক্ষণ মঞ্চের সামনের দিকের আলো নিভে থাকতো। আর একেবারে পিছনে, ছাতের পাঁচিলের সামনে, নাদির শাহ দাঁড়িয়ে থাকতেন ছায়ার মতো, দর্শকদের দিকে পিঠ করে। এইখানে নাদিরের কিছু বক্তৃতা আছে নাটকে, সেটা হয়তো আগে বলা হোত, কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন হোতনা। তার চেয়ে এই ছবিটা ঢের বেশী বিচলিত করতো।

তারপর ক্রমশ যুদ্ধের আওয়াজ মরে যেত। সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়ার kettledrum বাজতো, আর দিল্লীর সাধারণ লোকের হাহাকার ও গোঙানি শোনা যেত। এই নাট্যাভিনয় যদিনা দেখতুম তাহলে নয়ার'র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হোতনা একথা অনস্বীকার্য। আর একটা জিনিষ বিশিরবাবুর কাছে শিখেছি সেটা হোল, নাটক কীভাবে কাটতে হয় বা গাঁথতে হয়। তার প্রমাণ আছে আলমগীর নাটক ও নাট্যের প্রভেদে। লিখিত নাটকের মতো করে

নাট্যাভিনয় আদৌ হোত না। অর্থাৎ নাটককে, দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে, সব কী করে একসঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরকুমারের কাছে থেকেই পেয়েছি। তিনিই আমাদের প্রথম নির্দেশক।

শম্ভু মিত্র

পুরোনো কথা

অভিনয়ের দফা

[বিশ্বরূপের যেসব অভিনেতা আপন বৈশিষ্ট্যে দর্শকচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, "মহর্ষি" মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই রচনাটি নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত ও অপ্রাপ্য অভিনয়শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। রচনাটি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি।]

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একটা অবিরাম চিন্তাধারা রয়েছে। মানুষের উচ্চারিত বাক্য সেই নিয়ত চিন্তাধারার বাইরে ঠেলে ওঠা বুদ্বুদ্। নাট্যকারের কাছ থেকে অভিনেতা এই বাক্যের বুদ্বুদ্গুলি মাত্র পেয়ে থাকেন। তাঁর নিজের কাজ হচ্ছে এই বুদ্বুদ্গুলিকে অবলম্বন করে তলিয়ে তলাকার চিন্তাসূত্রটির সন্ধান করা। সেইটি আবিষ্কার না করা পর্যন্ত চরিত্রাভিনয় করা সম্ভব হয় না। কারণ, অভিনেতার সঙ্গে দর্শকদের সম্বন্ধ ত শুধু কথিত বাক্যের দ্বারা দিয়েই নয়, যতক্ষণ তিনি মঞ্চে থাকেন, ততক্ষণ তাঁর নীরবতার মধ্যে দিয়েও। এই নীরবতার পূরণ হয় অভিনেতার চিন্তা দিয়ে। অভিনেতা যদি নিজেই না জানেন তাঁর এতক্ষণ নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকার কারণ বা সার্থকতা কোথায়, তাহলে দর্শকের কাছে তিনি অনাবশ্যক হয়ে পড়েন। সু-অভিনয়ের মূল রহস্য হচ্ছে যে, অভিনেতা দর্শকের কাছে কখনও অনাবশ্যক হবেন না। তাই অভিনেতার কথার ও কার্যে অবকাশ থাকলেও চরিত্রানুযায়ী চিন্তাটি অবিরাম হওয়া চাই। অনেকসময়ে নাট্যকারের লিখিত বাক্যাংশের সঙ্গে চিন্তার সঙ্গতি স্থাপন করা কঠিন হয়, তখন বরং তিনি বাক্যাংশটি বর্জন করবেন তবু অন্তরে চিন্তার সঙ্গতি নষ্ট হতে দেবেন না। কারণ, তাহলে তাঁর উচ্চারিত বাক্যে নিজেরই আস্থা থাকবে না, আর তাই তাঁর বাক্যও ইপ্সিত রসসৃষ্টি কর্তে সক্ষম হবে না। অবশ্য বাক্যাংশ বর্জন বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কারণ তিনি একাই ত অভিনয় কচ্ছেন না। পার্শ্বাভিনেতার প্রয়োজনকে তিলমাত্র অস্বীকার করবার তাঁর উপায় নেই। এখানেই প্রয়োজন ডাইরেক্টর বা প্রযোজকর্তার। পৃথকভাবে এবং সমগ্রভাবে সমস্ত কার্য ও চিন্তার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনা করবার ভার প্রযোজকর্তার উপর। এইজন্য আধুনিক নাট্যাভিনয়ে প্রযোজকুশলতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে অভিনয় কর্তে হবে অভিনেতাকেই—প্রযোজ-কর্তাকে নয়। সুতরাং যতপ্রকার সাহায্য পাওয়া যায়, প্রযোজকর্তার কাছ থেকে নিয়ে অভিনেতার নেওয়া নিজস্ব করে নেওয়া চাই। নিজের মনে কোন দ্বিধা সংকোচ থাকলে অভিনয় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। মঞ্চে উপস্থিত প্রত্যেক জিনিষ ও প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর

সম্বন্ধের একটি সুস্পষ্ট ধারণা অভিনেতার মনে থাকলো, প্রত্যেকটি তাঁর অভিনয়ের অনুকূল মনে হবে সে সম্বন্ধে মনে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তা' দেওলি বাধা হয়ে উঠবে। এইজন্য অভিনেতার কর্ত্তব্য তাঁর দৃশ্যের প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপন করে নেওয়া।

সমস্ত অভিনয়ের মূল লক্ষ্য দর্শকবৃন্দ। সুতরাং তাদের অগোচরে কোন অভিনয় চেষ্টার অর্থ নেই। কাজেই এমন ভাবে চলতে হবে দর্শকদের কাছে যার অর্থ থাকে, এমন ভাবে বলতে হবে যা তাঁরা শুনতে পান, এমনভাবে চাইতে হবে যা তাঁদের নজর এড়ায় না। অথচ মজা এই, দর্শকরা যেন না ভাবতে পারেন যে তাঁদের প্রয়োজনেই এসব হচ্ছে, তাঁদের মনে এই ভ্রম জন্মিয়ে দিতে হবে যে, নাটকীয় চরিত্রগুলির নিজ নিজ প্রয়োজনেই এই সব চলা বলা চাওয়া হচ্ছে, তাঁরা ফাঁকতালে সব দেখে নিচ্ছেন। অভিনয়ের রসবোধের মূলে এই মায়া রয়েছে। মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রমের মধ্যেই নাটকীয় আনন্দ। সুতরাং অভিনয় যত দর্শক নিরপেক্ষ হয় চরিত্রগুলি ততই যথার্থ বলে প্রতীত হয় এবং দর্শকদের ততই ভাল লাগে। অভিনেতার দৃষ্টি প্রধানতঃ তাঁর অভিনীত চরিত্রের প্রতি থাকলেও—দর্শকদের কথাও সমানে তাঁর মনে থাকা চাই। তাঁদের কাছেই অভিনয়ের সম্পূর্ণ ফলটি নিবেদন করা হচ্ছে এই বোধটি তাঁর হারালে চলে না। তবে একটা সুবিধা এই দর্শকদের আসন একরকমের স্থির আছে, সুতরাং কিরকম চলায় কিরকম বলায় তাঁদের কাছে অভিনয় পৌঁছে দেওয়া যায় সেটা সহজেই আয়ত্ত করে নেওয়া যায়। সেটা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে পাকা অভিনেতার সে দিকে বেশী মনোযোগ দিতে হয় না, সমগ্র মনটি চরিত্রসৃষ্টির দিকে চালনা করতে তিনি অবকাশ পান।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

সাধারণ রঙ্গালয়ের চলতি অভিনয়

বিশ্বরূপায় "জাগো"

সাময়িক জাতীয় সংকট, অথবা সাহিত্যকে নাটকে প্রতিফলিত করে দেশের জনচিত্তকে নূতন ভাবনায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ উদ্বীপ্ত করার কাজ নাটকের।

—এ তত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত। নাটকের যাচাই করা হয়

—জাতীয় দর্পণ। সেদিক থেকে বিচার করলে, "জাগো" এক চমকপ্রদ সার্থক নাট্য সৃষ্টি। শুধু চমকপ্রদ বা সার্থক নয়—বক্তব্যের বলিষ্ঠতা এবং ঘটনা উপস্থাপনের নির্ভীকতাও অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। সাধারণত থিয়েটারের মালিকদের আমরা পুঁজিবাদী ও সরকার সমর্থক বলে গণ্য করি। বহুক্ষেত্রেই তাঁরা গভর্ণমেণ্টের প্রশাসনপুষ্ট। এক কথায়, তাঁরা গভর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হতে চান না মোটেই। কিন্তু এই নাটকে বিশ্বরূপার অন্যতম কর্ণধার শ্রীবাসবিহারী সরকার যেভাবে কংগ্রেসভাবোধের প্রচার করেছেন, রাজ্যসরকারের সমালোচনা করেছেন, তা দেখে তাঁর সাহসেরই শুধু যে তারিফ

প্রশংসা করি তাই নয়, তাঁকে অকুণ্ঠ অভিবাদন জানাই। ভিন্নতর আদর্শে রচিত এই নাটক 'মাস অ্যাপীল' থাকলেও এর অন্তর্নিহিত মহৎ চিন্তা দর্শক মনে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করে।

বিখ্যাত লেখক বনফুলের ত্রিবর্ণ উপন্যাসের আখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচনা করেছেন শ্রীরাসবিহারী সরকার। বহু বিচিত্র টাইপ চরিত্র নাটকে ভীড় করেছে। তার সঙ্গে বহুতর ঘটনা। কিন্তু তাহলেও তার মূল বক্তব্য হারিয়ে যায়নি। অপূর্ব দক্ষতায় নাট্যকার সেই বক্তব্যকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

স্বাধীনতোত্তর এক খণ্ডিত দুঃস্থ সমস্যা-বিধ্বস্ত সমাজের চিত্র নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সঙ্গে আছে উদ্বাস্তু সমস্যা। উপন্যাসের এই সমস্যা আর ঘটনাবিস্তার থেকে কয়েকটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে নাট্যকার তাঁর নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে একটি অসাধারণ নাট্য-আবেদ্য উপস্থাপিত করেছেন। যার মূল বক্তব্য হল—আগে দেশবাসী। আবার তোমরা মানুষ হও।

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেও শ্রীসরকার এই নাটকে তাঁর সৃজনী শক্তির অপূর্ব স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর আছে রিভলভিং স্টেজ! তাতে দৃশ্য পরিবর্তনে সময় লাগে খুব কম—মিনিট খানেক। কিন্তু নাট্য প্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্যে সেই এক মিনিট সময়ও তিনি গ্রহণ করেন নি। একটির পর একটি দৃশ্য—চোখের পলকে দৃশ্যান্তর ঘটেছে। অর্থাৎ নাটকের ভাব ও ভোতনা কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ যাতে না বিঘ্নিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই নাট্য পরিচালক এই বহুতর দৃশ্য বিন্যাসের ব্যবস্থা করেছেন। বিরামের আগে দেড়ঘণ্টা সময় এবং পরে এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট সময় যে কেমন করে কেটে যায় দর্শক তা বোঝবার কোন অবকাশই পান না।

বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মাঝে মাঝেই যে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা দর্শকদের শুধু অভিভূত করে না, তাঁদের অন্তরে নতুনতর সম্বন্ধেরও সাড়া জাগায়। যে দৃশ্যে নাটকের নাট্যকার-নায়ক গণেশ হালদার আর নায়িকা ঝিনুক জনতার উদ্দেশ্যে তাদের আশুপরিত্রাণ আর শাণিত যুক্তিসহ ভাষণ দান করছে আর সেই ভাষণের শেষে অকস্মাৎ প্রেক্ষাগার থেকে পুলিশের দারোগা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উচিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের শাসাচ্ছে—সে দৃশ্যটি ভোলবার নয়। সমগ্র প্রেক্ষাগার যেন স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে আচ্ছন্নের মত সেই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে।

সম্মিলিত অভিনয় গুণে "আলো" অসাধারণত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছে। আদর্শবাদী ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে অনিলবরণের অভিনয় সহজেই দর্শকচিত্ত স্পর্শ করেছে। উদ্বাস্তু গণেশ হালদারের ভূমিকায় নির্মলকুমার যে সংযত অথচ চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁর বাচনভঙ্গী আর বক্তৃতা-ভঙ্গী আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছে। দুর্দান্ত দামাল চরিত্র ডাক্তার ঘোষালের ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে তাঁর জীবনেরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন তাই নয় তাঁর এই চরিত্র সৃষ্টি অধুনিককালের উৎকৃষ্টতম অভিনয় কুশলতার মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। স্ত্রী চরিত্রের ভিতরে নায়িকা ঝিনুকের ভূমিকায় শ্রীমতী অপ্সরী সেন যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা অকুণ্ঠনীয়। এই অভিনয়ের দ্বারা তিনি নিঃসন্দেহে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর আসন দাবী করতে পারেন। শ্রীমতী সুমিত্রা নায়ার সুঅভিনয় করেছেন। অন্যান্য পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্র—সবগুলিই নিখুঁত অভিনয়গুণসম্পন্ন। শ্রীমতী অপ্সরী সেনের নাচের দৃশ্যটি কলাকুশলতার দিক থেকে উচ্চাঙ্গের হলেও মূল নাট্যবক্তব্যের সঙ্গে তার যোগ নেই।

নাটকের আরও সঙ্গীত তাৎপর্যপূর্ণ। দৃশ্যসজ্জা, আলোক সম্পাত, নানা ধরণের শব্দ প্রক্ষেপণ এক কথায় চমৎকার।

"আলো" এখানের এক অবিস্মরণীয় নাট্যযোজনা।

নাটক ও নাটমঞ্চ সম্বন্ধে পঠিতব্য বই

Hodges, C. Walter, *Shakespeare and the player.*

Holzknecht, Karl J. *The Background of Shakespear's plays.*

Hughes, Glenn, *Story of Theatre.*

Mantzius, Karl, *A History of Theatrical Art in Ancient and Modern Times.*

Nagler, A. M., *Sources of Theatrical History.*

Nicoll, Allardyee, *World Drama.*

Nicoll, Allardyce, *The Development of the Theatre.*

Sprague, Arthur Colby, *Shakespeare and the Actors.*

না-স্বর্গ না মর্ত্য

ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

পশমের মত চুলের গুচ্ছটি হাতে নিয়ে রেডিও-কার্বন-ডেটিং যন্ত্রটির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসার চ্যাটার্জি। মুখে চোখে তাঁর পরম বিস্ময়।

রেডিও-কার্বন-ডেটিং যন্ত্র। এ-ও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বিস্তীর্ণ ঘরের একাংশে জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রটি। বহির্বিশ্বের যাবতীয় রশ্মি, সৌররশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, এদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইস্পাতের বর্ম দিয়ে যন্ত্রটি ঢাকা। পৃথিবীর সর্বযুগের কাহিনী যেন এর বর্মে প্রতিফলিত। যুগ যুগ ধরে কত যে পদার্থ পৃথিবীর বুকের উপর ছড়িয়ে আছে, তাদের ইতিহাস, তাদের পরিচয় জন্ম তারিখটি পর্যন্ত এর নখাগ্রে। কার্বনের বয়স তাই রেডিও-কার্বন যে পরিমাণে এদের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে সেই সঞ্চিত রেডিও পদার্থটির বিচিত্র ধর্মের সাহায্যে এ তথ্য নির্ণয় আজ সম্ভবপর। প্রতিটি রেডিও পদার্থের একটা নির্দিষ্ট পরমায়ু আছে। রেডিও কার্বনেরও আছে। কতখানি রেডিও কার্বন পদার্থটির মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে আর সেই পরিমাণ কার্বন সঞ্চিত হ'তে কতখানি সময়ের প্রয়োজন, সেটিই হল পদার্থটির বয়সকাল। এই ভাবে বিজ্ঞানের কয়েক হাজার ফুট উর্ধ্বে ভূপর্যটনের কয়েক শত বর্ষপূর্বে যে মানবিক রংখেলীলা ঘটে গিয়েছে যা এতদিন পরলোক চক্ষুর অন্তরালে ছিল, আজ সেই সব নর কঙ্কালের মধ্যে যিনের পর দিন সঞ্চিত রেডিও কার্বনের সাহায্যে সেদিনকার ঘটনার তারিখ নির্ণয় সম্ভবপর হয়েছে।

এই যে অনুপম কেশগুচ্ছ, এরা যে একদিন এদের জীবন্ত অধিকারিনীর মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করত, সেটা কত যুগ আগে, শত না সহস্র বৎসর—তারই তারিখ এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন প্রফেসর চ্যাটার্জি। এখন তার ফলাফল দেখে নিজেই পরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন।

পাশে দাঁড়িয়েছিল শান্তনু, প্রফেসরের অকৃত্রিম বন্ধু ও একদিনের সহপাঠী। শান্তনুর মুখে চোখে অসীম আগ্রহ। আগ্রহ ভরেই প্রশ্ন করল, কি বুঝলে প্রফেসর?

—তাজ্জব ব্যাপার ভাই। বিশ্বাস করা যায় না।

—অর্থাৎ সব ভুল?

—ভুল! ভুল হবে কেন? এ যন্ত্র দিয়ে কাজ ত আমার নতুন নয়। অনেক কিছুরই কালাকাল নির্ণয় করেছি ও যন্ত্রের সাহায্যে, সে সব ত ভুল হয়নি। ভুল হবে এর বেলায়! না,

তা হবার নয়। সন্দেহ হয়েছে বলে আমি বারবার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে যাচ্ছি কিন্তু ফল সেই এক। তাহলে ভুল বলি কি করে।

—তা হলে তুমি বলতে চাও—।

—না, আমি বলতে চাই না। যা বলবার সব বলেছিল্লে এই যন্ত্র। বলে দিচ্ছে এই কেশগুচ্ছের বয়স আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর অর্থাৎ যে সুকেশিনী এই কেশগুচ্ছের অধিকারিণী ছিলেন তিনি আজথেকে ছ'হাজার বছর আগে এই মর্ত্যধামে বিরাজমান ছিলেন।

শান্তনু ধীরে ধীরে বলে, ছিলেন নয়, আজও আছেন, তবে নিষ্প্রাণ।

প্রফেসর অবাক হয়ে যান। বলেন, বল কি! আজও আছেন?

—আছেন বলেই না এ কেশগুচ্ছ আজ এখানে আনা সম্ভবপর হয়েছে। প্রফেসর, তোমার পরীক্ষার নিরীক্ষার মধ্যে যদি অভ্রান্তি না থাকে, আমার উক্তির মধ্যেও নেই।

—আশ্চর্য্য! জানতাম, একসময়ে শুধু মিশর দেশীয়রাই মৃতদেহকে সংরক্ষিত করে রাখবার উপায় জানতেন। ভারতবাসীরা যে জানতেন এ কথাত কখনও শুনিনি কখনও। প্রমাণও কিছু নেই।

শান্তনু বলে, না। তবে কোন প্রলেপ দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে একে সংরক্ষিত করে রাখা হয় নি।

—তবে?

—প্রকৃতি এর সংরক্ষক। হিমালয়ের অনন্ত হিমের তলায় এ দেহ আজও অম্লান হয়ে রয়েছে।

প্রফেসর বলেন, দেখিনি, তবে শুনেছি আর কাগজেও পড়েছি যে লক্ষ বছরের ম্যামথের দেহ অবিকৃত অবস্থায় সে দিন আবিষ্কৃত হয়েছে বরফের তলা থেকে। শুধুমাত্র টেবিলে বসে তার মাংসে রসনা তৃপ্ত করে সুস্বাদুতার তারিফ করেছেন ভোজন বিলাসীর দল।

প্রফেসর চ্যাটার্জি উঠে পড়েন। পিছন দিকে হাতে হাত আবদ্ধ করে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে পায়চারণ করেন। তারপর শান্তনুকে উদ্দেশ করে বলেন, সত্যকে অবিশ্বাস করে লাভ নেই শান্তনু। হয়ত তোমার কথাই ঠিক। কাল অনুযায়ী মহাভারতীয় যুগের লোক এরা। কিন্তু এমন অপরূপ জিনিষের স্পর্শলাভের সৌভাগ্য তোমার হ'ল কি করে জানতে ইচ্ছে করে। তুমি ভাগ্যবান।

শান্তনু বলে, ছিলাম প্রফেসর। ভাগ্যবানই ছিলাম অতীতে। বর্তমানে নয়, বর্তমানে আমি অভাগা। শেষের দিকে তার স্বরটা ছিঁড়ে শোনায়।

প্রফেসার চ্যাটার্জি শান্তনুর মুখের দিকে তাকান। শান্তনু বলে চলে, সে এক অপরূপ কাহিনী। তোমাকে শোনাব। তবে বাস্তব ঘটনা। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হয়ত এর মধ্যে নেই। সে দৃষ্টি দিয়ে একে যাচাই করে দেখতে গেলে ভুল করবে। আমি অবিজ্ঞানী লোক। বিজ্ঞানের যুক্তি তর্কের ধার ধারিনা। যা দেখেছি, হুবহু বলে যাব সব। বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। তবে ল্যাবটরী থেকে তোমার ঘরে চল। ধীরে সুস্থে বসে আদ্যোপান্ত শোনাব সব।

পাশেই প্রফেসর চ্যাটার্জির বসবার ঘর। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানা টেবিল। টেবিলের সবুজ মখমলের উপর মোটা কাচ। তারই তলায় কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ-

বিজ্ঞানের কয়েকটা সংখ্যা নানা রকম ডেটা। একটা আধুনিক সিন্থিসাইজার টেবিলের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আরও টুকিটাকি কিছু কিছু রেজারেন্স বা প্রয়োজনে লাগে বৈজ্ঞানিকদের।

বড় টেবিলখানাকে ঘিরে কয়েকখানা চেয়ার এপাশে ওপাশে সাজান। ডান পাশে টেলিফোন আর বাঁপাশে বই আর ম্যাগাজিনের স্তূপ। ঘরের দুপাশে দেওয়ালকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রকাণ্ড আলমারী-বই এবং বাঁধান আর্নালে ঠাসা। প্রফেসর চ্যাটার্জির অনেক গবেষণা ঐ আর্নাল গুলি সাক্ষ্য বহন করছে।

শান্তনু একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। ঘরখানির চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, ঘরখানিকে তালই সাজিয়েছ প্রফেসর। যে দিকে তাকাই, সব নিরস। রস কসের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নেই। সব সব অক্ষ থার্মোডাইনামিক্স আর না থার্মোডাইনামিক্স অক সব। জীবনটার আর কোন পদার্থ রাখলে না তুমি। একেবারে নিষ্করুণ করে ফেললে।

প্রফেসর হাসেন। বলেন, ফুল থেকে মধু সব মৌমাছিই আহরণ করতে পারে তার মধ্যে কৃতিত্ব কিছু নেই। কিন্তু ফল থেকে পারে কটি? যা'রা পারে তারাই রসিক।

শান্তনুও হাসে। বলে, কথাটা মিথ্যে বলনি প্রফেসর। পাহাড়ের বুক চিরে ঝর্ণা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু পাথর নিংড়ে রস খুবই আশ্চর্যের। তোমাদের কাজ পাথর নিংড়ে রস বার করা।

প্রফেসর প্রশান্ত মুখে বলেন, তোমরা বিজ্ঞানকে পাথর বলে ধরে ঠেলে রেখেছ। তাকে চেনবার জানবার চেষ্টা করনা। কিন্তু এর মধ্যে সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি ন্যায় ও তর্কের যে কতখানি সমন্বয় তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। সত্যের রূপ উদ্ঘাটনই, বিজ্ঞান। আর যা সত্য তাইত শিব, তাইত সুন্দর। আজ বিজ্ঞান তোমার সামনে যে তথ্যটি উদ্ঘাটন করতে চলেছে তার আদিতে যত কাব্য রসই থাকুক না কেন, সত্যের স্পর্শে যে আনন্দ, যে সৌন্দর্য তা নিশ্চয়ই ছিল না।

কথাটা শান্তনু অস্বীকার করতে পারে না। এই রেশম সুন্দর কেশগুচ্ছ সম্বন্ধে এতদিন মনের মধ্যে তার দ্বিধা ছিল, দ্বন্দ্ব ছিল। অনেক আয়াসে সংগৃহীত এই কেশগুচ্ছ—এদের মধ্যে যে এতখানি পরমাশ্চর্যতা লুকান থাকতে পারে একথা ভাবতে গিয়েও সে পিছিয়ে এসেছিল। একে অকুণ্ঠিত চিত্তে সে স্বীকৃতি দিতে পারেনি। এই সুপ্রাচীন দেশে কিংবদন্তীর অন্ত নাই। হিমালয়কে ঘিরে কত যে কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে তারও সীমা নাই: কিংবদন্তীর মূল্য মনে নয়, কানে। মনে যার মূল্য সে কিংবদন্তীর সীমা রেখা ছাড়িয়ে সত্যের ধাপে উপনীত। পরম বাস্তবের সাথে তার মেলামেশা। সে দিন হিমালয়ের গভীরতম প্রদেশে যে দৃশ্যের মুখোমুখি হ'য়েছিল সে, যে কাহিনী শুনেছিল, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য খোলাখুলি মনে আজও সে স্বীকার করে নিতে পারেনি। এইখিধা দ্বন্দ্বের মাঝে চিত্ত যখন বিশেহারা সেই সময় সে অকূলে কূল পেল। বিজ্ঞান সেই উত্তরের জবাব দিয়েছে।

শান্তনু জোর দিয়ে বলে, ছিল না নিশ্চয়ই। আমি অবিজ্ঞানী মানুষ, তোমাদের মত বিজ্ঞানী নই। সেই আদিই যখন এই অদ্ভুত কিংবদন্তী টাকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তখন তোমাদের মত লোককে বিশ্বাস করতে বলব কি করে? অথচ বিজ্ঞান সত্য তথ্যটিকে তুমিও অস্বীকার করতে পার না।

প্রফেসর চ্যাটার্জি মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, সত্যিই পারি না।

শান্তনু বলে, তা বলে তোমায় বিশ্বাস করতে হবে যে মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধনের ঘোর

যাত্রার সময়ে তাঁরই বাহিনীর কোন দুষ্কৃতের দুষ্কার্যের ফলে এই সুকেশিনীকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে।

প্রফেসর বলেন, বিজ্ঞান যা বলবার বলে দিয়েছে শান্তনু। তবে এমন শোচনীয় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে দুর্যোধনের মেয়ে যাত্রার প্রকাশে অথবা অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু দাহনের আদিতে এমন চুলচেরা সামঞ্জস্য করে কথা বলা আমার বিজ্ঞানের সীমাতীত। কিন্তু ঘটনাটা যখনই ঘটে থাকুক, তোমার সুকেশিনী যে কয়েক হাজার বছর পূর্বে মর্ত্য বিচারিনী ছিলেন এ অবিসম্বাদিত সত্য। এখন জিজ্ঞাস্য, এমন দুর্লভ রত্নটির সাক্ষাৎ তুমি পেলে কিভাবে আর কি অবস্থাতেই বা তার দর্শনলাভ হল তোমার? এইটা জানবার প্রবল বাসনা হচ্ছে।

শান্তনু বলে, তোমার বাসনা আমি মেটাব প্রফেসর, তবে ধীরে ধীরে, একটু একটু করে। আমাদের নগাধিরাজ হিমালয় সমুদ্রেরই মত রত্নের আকর। কত যে অমূল্য তথ্য অমূল্য কাহিনী এর বুকে ছড়ান রয়েছে তার আদি অন্ত নেই। রহস্যের ভাণ্ডার এই হিমালয়। এর রহস্যের ওপর লোভ আমার চিরদিনের। মহাভারতে বর্ণিত অপূর্ব কিন্নরদেশের আবাস ভূমি বলে যাঁরা যে সুপ্রসিদ্ধ দেশ সেও হিমালয়ের কোলেই অবস্থিত।

প্রফেসর চ্যাটার্জি রহস্য করে বলেন, অর্থাৎ হিমালয়ের যে রহস্যময় অন্তরতা তোমার চোখে প্রতিভাত, তার মূলে যে এই আবাসভূমির অলৌকিক অধিবাসিনীদের আকর্ষণ, এ কথা বললে তোমার প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করা হবে না শান্তনু?

—হবে না বলেই তা মনে করি প্রফেসর। ছেলেবেলা থেকে এই সব অপ্সরী কিন্নরীর দল আমার মনের মধ্যে কেমন এক মোহজালের সৃষ্টি করেছিল। ছেলে বেলার এই মোহজাল বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হল অজানাকে জানবার এক সক্রিয় কৌতূহলে। তারা যে রক্তে মাংসে এখনও বিরাজমান এই সত্যটা আমার মনে দিনের পরদিন বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল। তাই তাদের আবিষ্কার করে একবার চাক্ষুষ দেখার দুর্মদ বাসনাকে কিছুতেই আমি পরিহার করতে পারিনি।

—শুধু দেখবার? আর কিছু নয়?

—আর কি?

—একটা রঙ্গা কি একটা তিলোত্তমাকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভাসমান হবার বাসনা জন্মায় নি? স্বপ্নের সঙ্গিনীকে মর্মের মোহিনী করবার কামনা?

শান্তনু হাসে। বলে, না হে পাগল হ'লেও একেবারে বদ্ধ পাগল নই। মহাভারত পড়তে পড়তে কতদিন ভেবেছি এই সব গন্ধর্বলোক, কিন্নর-লোক অপ্সর লোকের কথা। এরা স্বর্গলোকের অন্তর্গত নয় মর্ত্যলোকেরও নয়। অথচ একটা লোকের বাসিন্দা এরা। হয়ত স্বর্গ এবং মর্ত্যলোকের মাঝামাঝি কোন স্থানে। সেই স্থানটির সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কৌতূহল। আমাদের সত্যদ্রষ্টা মুনিঋষির দল, তাঁরা অর্থহীন কোন কথাই বলবেন না। অপ্সর কিন্নরদের কথা ভালভাবে জানা ছিল বলেই না অমন বিশদ বর্ণনা তাঁদের কলম দিয়ে বেরিয়েছে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, বর্ণনা দিয়েছেন বলেই কি মেনে নিতে হবে তাদের অস্তিত্বের কথা?

শান্তনু বলে, সেটা তর্কের কথা প্রফেসর। কিন্তু আমি তর্ক করিনি। আগাগোড়াই মেনে নিয়েছিলাম তাদের বাক্যকে। তাঁরা যে চমৎকার বর্ণনা দিয়ে অসত্যের বেসাতি করেন নি সেইটাই

পরখ করে দেখতে চেয়েছিলাম। আর তারই জন্যে বিপদ আপদ তুচ্ছ করে একদিন দুর্গমতম প্রান্তরে অনুপ্রবেশ করেছিলাম।

প্রফেসর চমকে উঠেন, বল কি? তুমি হিমালয়ের দুর্গম প্রান্তরে প্রবেশ করেছিলে?

—তার সাক্ষ্য তোমার ঐ রেডিও-কার্বন-ডেটিং যন্ত্র প্রফেসর। অবশ্য সবটা না হ'ক এ যন্ত্র কিছুটা সাক্ষ্য দিচ্ছে বইকি। বাকীটা শুনতে পাবে আমার মুখ থেকে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি শান্তনুর মুখের দিকে তাকান। শান্তনু বলতে থাকে, প্রফেসর, তোমরা বিজ্ঞানীরা বলে থাক, পৃথিবী পরিবর্তনশীল। মানে, আকৃতির না হক তার প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে যুগে যুগে। এই মাটির ধরিত্রীর সঙ্গে যারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাদের পাল্লা দিয়ে চলতে হয় এ পরিবর্তনের সঙ্গে যারা পারে তারা থাকে টিকে, যারা পারে না তারা লোপ পেয়ে যায়। এ সব ত তোমাদেরই কথা, বলুন তবে তোমার বলব কি প্রাগৈতিহাসিক অনেক কিছুই লোপ পেয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি মাথা নাড়েন আস্তে আস্তে। বলেন, তা ত যাচ্ছেই আর যাবেও। এর প্রতিরোধ কেউ করতে পারবে না। প্রকৃতির বিধানই এই। শুধু বিধান নয়, এই সুন্দর ক্রমবিকাশের ইতিকথা। এ ক্রমবিকাশকে সাহায্য করতে গিয়ে পৃথিবীর একদিক যেমন ক্ষয় পাচ্ছে, আর একদিক তেমনি পূর্ণ হয়ে উঠছে। এতে কত যে সুন্দর অসুন্দরের বলি হয়েছে তা বলা যায় না। জাতিকে জাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

শান্তনু বলে, এ কথা তোমরাই ভাল করে জানবে। আমি শুধু জানি একটি জাতির কথা ক্ষয়িষ্ণু জাতি, বিবর্তনের চাপ সহ্য করতে না পেরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এরা অসুর কিন্নর জাতি। অতীত দিনের সৌখিন আর বিলাসী জাতি। সেদিন হিমালয়ের যা পরিবেশ ছিল, প্রকৃতি বৈচিত্র ছিল, সেই পরিবেশে সেই বৈচিত্রে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল হিমালয়ের বুকে। হিমালয়ের ছেলেমেয়ে, হিমালয়েরই সৌন্দর্যের অধিকারী। ক্ষুদ্র রাজ্যের অল্প সংখ্যক প্রজা, স্বল্প পরিসর স্থানে বসতি স্থাপন করে বিচরণ করত মনের আনন্দে। অনুপম দেহে, অনুপম মনে সুখ-আস্বাদের অধিকারী হ'য়ে বেড়াত পাহাড়ে পাহাড়ে, সুরম্য পুষ্পাদ্যানে অরণ্যে। পৃথিবীর আবহাওয়া এরা সইতে পারত না বলেই পৃথিবীকে এরা পরিহার করে চলত। তাই মর্ত্যবাসীদের কাছে এরা ছিল দুর্লভ ধন, কামনার বস্তু। কিন্তু মর্ত্যবাসীদের কাছে এরা কামনার ধন হ'লেও মর্ত্যকে এরা ভালবাসতে পারেনি। তার প্রধান কারণ মর্ত্যের আবহ, ধন আর বিষাক্ত বাতাস, যে বাতাস ছিল তাদের জীবনী শক্তির প্রতিকূল। তাই তারা ভালবাসত উচ্চ ভূমিকে। ঊর্ধ্বলোকের আবহাওয়াকে। এইখানে এই সূক্ষ্মমার্গে তাদের বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম-আত্মা বিচরণ করত অনায়াসে আরও উদার পর্বত রাজ্যের বিশুদ্ধতার স্পর্শগুণে তাদের সূক্ষ্মআত্মা সূক্ষ্মতর হয়ে গমনাগমন করত যাকে আমরা বলি স্বর্গপুর, সেইখানে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি দক্ষিণ তর্জনী তুলে বলেন, তুমি বেশ বলেছ শান্তনু। তোমার জেনেসিস্ অথবা ইভোলিউসন থিওরীর মধ্যে কেমন একটা নতুনত্বের স্বাদ পাচ্ছি যেন। তুমি অসুর কিন্নর জাতির ক্রমবিকাশের অথবা ক্রম বিলুপ্তির ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে ফেল। বেশ তাত্ত্বিক হবে। আজ পর্যন্ত কেউ লেখেনি।

—শিখর। আর তাইতেই আমি প্রমাণ করব যে, যে পরিবেশের আনুকূল্যে এখন পৃথিবীর এক নিভৃতাঞ্চলে এই অপূর্ব কিন্নর জাতির উৎপত্তি আর ক্রম বিকাশ ঘটেছিল কালক্রমে সেই পরিবেশের পরিবর্তনে এরা ধরণীর বুক থেকে অপসারিত হয়েছে। তবে আমার ধারণা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

—কারণ? প্রশ্ন করেন প্রফেসর।

—এদের অস্তিত্বের প্রমাণ আমি পেয়েছি মনে হয়, যখন বুঝতে পারল এরা যে বাসভূমির আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, এ পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকা সম্ভবপর নয় তখন তারা পিছিয়ে গেল হিমালয়ের আরও আদিম ভূমিতে যেখানকার পরিবেশ এদের জীবন ধারণের অনুকূল। অথবা কোন বড় রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় এদের ঘরছাড়া করেছিল সেই আদিম ভূমির দিকে। কেন জানিনা, এই ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যার বশবর্তী হয়ে একদা আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম এদের চির উৎসব মুখর নগরীর অনুসন্ধানে।

প্রফেসর অবাক হয়ে যান। প্রশ্ন করেন, অবাক করলে শাশ্বত, তুমি বিশ্বাস কর এ কথা?

—করি। করি বলেই ত এতবড় দুঃসাহসিক অভিযানে পা বাড়াতে সাহস করেছিলাম প্রফেসর। আমাদের সভ্যতাটা মুনিঋষিরা যে বলে গিয়েছেন যে স্বর্গমর্তের মাঝামাঝি এদের স্থান সেটা যে হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়া ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা এ সম্বন্ধে আমি একে বারে নিশ্চিত ছিলাম। মনুষ্যলোকের সঙ্গে এদের খুব একটা যোগাযোগ ছিলনা। তার কারণ দুটি বিভিন্ন স্তরের সমাজ ব্যবস্থা আর আবহাওয়ার বিশেষ তারতম্য। যারা সুউচ্চ পর্বতের নির্মল এবং লঘু আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত, পৃথিবীর গুরু আবহাওয়া তাদের দৈহিক এবং মানসিক কোনটির পক্ষেই উপযোগী নয়। মানুষেরাও চিরদিন গুরু আবহাওয়ার অভ্যস্ত। সুউচ্চ পর্বতের লঘু আবহাওয়া তাদের জীবন ধারণের পরিপন্থী। সুতরাং এ দুটি স্তরের মধ্যে বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিলনা। এক স্তরের লোক অন্য স্তরের পক্ষে অনুপযোগী ছিল। বলেই এ দুই স্তরে যাতায়াতও কম ছিল। অপূর্ব কিন্নরদের দেশ হিম শীতল দেশ। হিম শীতল দেশের লোকেরা সাধারণতঃ সুন্দরই হয়ে থাকে। তাই এদের ছেলেমেয়েরাও সুন্দর। এদের রূপের খ্যাতিও অসামান্য। এরা সঙ্গীত প্রিয়, নৃত্যগীত বাদ্য বিশারদ জাতি। এদের নাচ গান সবাই মনোমুগ্ধকর।

প্রফেসর চাটার্জি রহস্য করে বলেন, তুমি যে বেদ ব্যাসকেও হার মানালে দেখছি। তিনিও বোধহয় অপূর্ব কিন্নরদের সম্বন্ধে এত কথা লিপিবদ্ধ করে যাননি, যা তুমি বলে চলেছ। এত সব সংগ্রহ করলে কোথা থেকে।

শাশ্বত বলে, সত্যকে সংগ্রহ করতে হয় না প্রফেসর। সত্য আপনিই বিকশিত হয়। এ কথা তোমায় বলে দিতে হবে না যে অভিজ্ঞতা না থাকলে এত কথা বলা যায় না।

প্রফেসর বিস্মিত হন। বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলেন, তুমি কি বলতে চাও এ তোমার অভিজ্ঞতালব্ধ ফল?

—যদি বলি তাই।

—চাক্ষুষ না গবেষণা?

শাশ্বত হাসে। বলে, প্রফেসর, গবেষণা বিজ্ঞানীদের জন্য। ল্যাবরেটরীর মধ্যেই তা সীমিত। সাধারণীদের জন্য অভিজ্ঞতা, পৃথিবী জুড়ে তা বিস্তৃত। আমরা চোখ দিয়ে যাচাই করে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারি না।

—অর্থাৎ তোমার অভিজ্ঞতা লব্ধ ফলকে তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বল ?

—হাঁ। কারণ নিজেকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। তোমরা জেনে এসেছ, এই সব উর্বশী কিন্নরী মেয়েরা বড় চটুলা। যৌবন তারাবনত দেহ ফুল সাজে সজ্জিত করে তপস্যারত মুনি ঋষিদের এরা ধ্যান ভাঙিয়ে বেড়ায়। মুনিদের যোগ ভুলে এই রমণীরত্না রূপবতীর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে তপস্যালব্ধ সব ফল এদের রাঙা চরণে বিকিয়ে দেন। এ কথা আদিও হয়তো তাদেরও জানতাম। কবির সরল কল্পনা এ সব। কিন্তু যেদিন সেই অপরূপ দৃশ্য দেখেছি সেদিন থেকে এ কথা আমি আর অবিশ্বাস করতে পারি না। প্রফেসর স্বর্গের অধিবাসীদের আমি দেখিনি। কিন্তু মর্ত্যের অধিবাসী যে এত সুন্দর হতে পারে এ আমার সকল কল্পনার বাইরে।

প্রফেসর বলেন, তোমার কল্পনার দৌড় কতখানি আমি জানি না। যে দৃশ্য দেখেছ তার অরূপতাও অনুমান করতে পারি না। আমার এই অক্ষমতাই আমাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করছে, কি এমন দেখেছ তুমি যার কাছে সকল কল্পনা হার মেনেছে ?

শান্তনু বলে, এর বর্ণনা দেওয়া শক্ত প্রফেসর। হয়ত সামান্যই দেখেছি। কিন্তু যা দেখেছি তাই অসামান্য। তাতেই বুঝেছি সত্যিকারের রূপসিনি এরাই। তোমার ঐ রেডিও-কার্বন-ডেটিং যন্ত্রের বিচারে ছ হাজার বছর পূর্বের পৃথিবীচারিণী এই সুকেশিনীকে আমি দেখেছি। ফুরায়ারত মৃতদেহের সেই অলৌকিক রূপ দেখে আমি বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন।

প্রফেসর চ্যাটার্জি শান্তনুর মুখের দিকে তাকান। দৃষ্টিতে সংশয়। হয়ত সন্দেহ করেন শান্তনুর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে। সে কথাটা শান্তনুই পরিষ্কার করে দেয়। বলে, অপরের মুখ থেকে এমন কাহিনী শুনলে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আমারও সন্দেহ হত প্রফেসর। এইটাই স্বাভাবিক কিন্তু তুমি নিঃসংশয় হতে পার। মস্তিষ্কের কোনরকম বিকার আমার হয়নি। তুমি যদি শুনতে চাও আমি বলতে পারি। কিন্তু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে সবটা।

প্রফেসর চ্যাটার্জি চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে অকস্মাৎ জোর দিয়ে বলে উঠেন, শুনব। তোমার কাহিনী মূলত যাই হ'ক এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমার রেডিও-কার্বন-ডেটিং যন্ত্র। সুতরাং সবটা না শুনলে আমারও কৌতূহল নিবৃত্তি হবে না।

শান্তনু বলে, বেশ, আমিও বলতে প্রস্তুত প্রফেসর। তারপর বাইরের দিকে কিছুক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সুরু করে—

আজ থেকে এগার মাস পঁচিশ দিন আগে আমি ছিলাম দার্জিলিং পাহাড়ে। বেড়াতে এসেছি। এসেই মুগ্ধ হয়ে গেছি এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাহারে। বিচিত্র রূপিণী প্রকৃতি। প্রকৃতি যখন যেমন উদার করে তোলে তেমনি উদাস করে দেয়। এরই মাঝে পদ্মকে আমি ভুলতে বসেছিলাম সব। কিন্তু হঠাৎ একদিনের ঘটনায় পরবর্তী জীবনের সব দিনগুলিই পাল্টে গেল।

প্রফেসর বলেন, এমনিই হয়। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় জীবনের ক্ষেত্রেও। সামান্য একটি ঘটনা তাইতেই প্রবাহমান গতির পরিবর্তন ঘটিয়ে যাকে হারাই পাল্টে দেয়।

শান্তনু বলে, আমারও তাই হল। সে দিন পূর্ণিমার রাত। আমার ঘরের কোণে খোলা বারান্দা। আরাম কেদারায় পা এলিয়ে দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম এক দৃষ্টে। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন একখানা রূপার পাত, দাঁড়িয়ে আছে অভ্রভেদি হয়ে। সেই দিকে তাকিয়ে

একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। অস্তাচলী গাছের ওপর শ্লানালী কিরণ কেমন এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র পাহাড় ঢালোটাকেই মায়াময় বলে মনে হচ্ছিল। যেন জীবন্ত এক মায়াপুরী তার অনন্ত সৌন্দর্য মেলে আমার দিকে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। কত যে রহস্য ওর ভিতর আত্মগোপন করে আছে, কত যে রোমাঞ্চ, কে জানে। দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। সেই অবস্থাতেই এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম অপ্সরী কিন্নরীর দলকে। চাঁদের কিরণ মেখে কাকনজঙ্ঘা বেয়ে নেমে আসছে দল বেঁধে। বিচিত্র তাঁদের বেশভূষা, বিচিত্র তাদের লাবণীল দেহ ভাঙ্গিমা। নামি দিয়ে নেমে আসছে তারা সমস্ত পাহাড়টিকে কলকণ্ঠে মুখরিত করে। মনে হ'ল, এরই মধ্যে হয়ত আত্ম-গোপন করে আছে, মেনকা, উর্বশী, তিলোত্তমা রম্ভার দল। রোমাঞ্চিত কলেবর হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে আছি আর মনে মনে তাদের আবাহন জানাচ্ছি। তারা এগিয়ে আসছে। নৃত্য দোদুল ছন্দে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। তাদের ছন্দোময় পায়ে বাঁধা ঘুঙুর নিক্কনে সারা পাহাড় সচকিত। মুখের হাসিতে বিশ্ববিমোহিত। তাদের চক্ষে মুনি-চিত্তময়ী কটাক্ষ। বক্ষে সুমেরু কুমেরুর ভার। তীক্ষ্ণ সূক্ষের ঘায়ে সূক্ষ্ম বসন বিশীর্ণিত। ক্ষীণ কটি এসে মিশেছে গুরুভারে সঘনে। বিস্ময় লাগে এমন ক্ষীণ কটি অমন সুমেরু কুমেরুর ভার বয় কি করে?

প্রফেসর সশব্দে হেসে উঠেন। বলেন, যাদের তার, বিচলিত বলেন না তারা, হলে তুমি? পুরাণের কাহিনী পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

শান্তনু বলে, শুনতে তোমার যদি ভাল না লাগে প্রফেসর, আমি মুখ ব্যথা করি কেন। পুরাণের কাহিনীর ইতি এইখানেই হ'ক।

প্রফেসর চ্যাটার্জি একটু অপ্রতিভ মুখে বলেন, তুমি রাগ ক'র না শান্তনু, পুরাণের কাহিনী হ'ক আর যাই হ'ক, শুনতে মন্দ লাগছে না। অমন মন্দোদরীর দল, তাদের পীনোন্নত বক্ষ আর গুরুভার নাহিত্ব বয়ে তন্নু নিয়ে নৃত্য দোদুল ছন্দে তোমার দিকে এগিয়ে আসছেন, এও যদি শুনতে ভাল না লাগে, তবে আর কি লাগবে শুনি? অরসিক বৈজ্ঞানিকের মনে রস নেই মানলাম, কিন্তু কৌতূহল ত আছে।

—তা থাক! তোমার কৌতূহল মিটাতে গিয়ে আমি হাসি ঠাট্টার খোরাক হ'তে চাই না।

—তা কেন? যাকে সত্য বলে তুমি জেনেছ তার প্রকাশে অর্বাচীনেরা যদি হাসে, ঠাট্টা করে, কি এসে যায় তোমার। যারা অর্বাচীন তারা হাসবেই। তোমার কথা শুনেও হাসবে, না শুনেও হাসবে। তা বলে তুমি শোনাতে বিরত থাকবে কেন? তবে এ কথাও ঠিক, হাসি আর যাই করি, লজ্জা, খার্মোডাইনামিক্স নিয়ে যত খাটাখাটিই করি না কেন, নিজের মধ্যে কৌতূহল প্রবল চিরন্তন যে মানুষটি ঘুমটি মেরে বসে আছে, তার কাছে ত রেহাই নেই। সবটা না শুনে সে ত তোমাকে ছাড়বে না কিছুতেই।

শান্তনু বলে, তবে শোন। এই সব মন্দোদরীর দল পাথরের ওপর তাদের শ্বেত শুভ্র পা ফেলে এগিয়ে আসতে আসতে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল একটা বাঁকের মুখে। তারপর সেই বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অব্যক্ত ইসারা করে।

—বল কি? ইসারা করে? প্রফেসর নিজের বিস্ময়কে প্রশ্নের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন।

—যদি ভুল না করে থাকি প্রকেসর। যেন বলে গেল, চিনে, রাখ, এইখানে। অর্থাৎ তারা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তাদের যে আবাসভূমির অনুসন্ধানে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি এটা যেন তারা টের পেয়েছে। তাই ইসারায় দেখিয়ে দিল, এইখানে আমাদের বাসভূমি। ওগো পান্থ যদি পার ত এস।

—অর্থাৎ নিমন্ত্রণ। রক্ষা করেছিলে সে নিমন্ত্রণ?

—সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সোজা নয় তাই। করব কি করে? পথও চিনি না। এই দুর্গম পর্বত রাজ্যে তাদের 'এইখান' যে কোন খান, তা ত বুঝতে পারলাম না। তবে জিদ আর সংকল্প দুই বেড়ে গেল। স্থির করলাম, এখান আমি খুঁজে বার করবই।

—সঙ্গে সঙ্গে কোমর বেঁধে লেগে গেলে।

শান্তনু ঘাড় নাড়ে। বলে, ভুটিয়াদের একটি মেয়ে আমার দুধ যোগাত। নাম তার লছমিয়া। কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে। আটো সাঁটো গড়ন। মুখখানা দেখতে হলেও লাবিত্য আছে আর সারা শরীরে যাদুমিও আছে। মেয়েটি একটু গায়ে পড়া। দুধ দিতে এসে ঘড়াটি একপাশে নামিয়ে রাখবে আর মেঝের উপর বসে পড়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবে। তার গল্পের ধরণটা এই রকম:

—বাবুজি, এই বাবুজি?

বই থেকে মুখ তুলে বলি, কি রে?

—তুই ত কলকাত্তার লোক?

—হুঁ!

—কলকাত্তা সহরটা কত বড়?

মস্ত বড়!

—এই দার্জিলিং সহরটার চাইতেও বড়?

হেসে বলি হ্যাঁরে, দার্জিলিং সহরের চাইতেও বড়। এরকম শহর তার মধ্যে কয়েক গণ্ডা ধরবে।

—ইস্! লছমিয়ার চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠে।

—সত্যি রে! কত গাড়ী ঘোড়া, লোকজন। বড় বড় বাড়ী। ট্রামগাড়ী যেখানে তাকে যাবে। তুই যাবি সেখানে?

লছমিয়া ম্লান চোখে বলে, কে নিয়ে যাবে? তারী যেতে ইচ্ছে করে। যারা দেখে এসেছে কত গল্প করে তারা। কিন্তু যাব কার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে যাবি? বলে কিক করে হেসে ফেলি।

—দূর! তুই নিয়ে যেতে যাবি কেন?

—খুব যাব। তবে দুধে জল মেশালে নিয়ে যাব না। তোর দুধে ভারী জল। সোহাগীর দুধ খুব ভাল। তাতে জল থাকে না একটুও।

সোহাগী ওরই বয়সী একটি মেয়ে। সেও বাড়ী বাড়ী দুধ যোগায় আমার বাড়ীতে সোহাগী যতবার দুধ দিতে এসেছে ততবারই লছমিয়া তার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তাকে তাড়িয়ে তবে

ছেড়েছে। সোহাগী কল মূল নিয়ে এলেও লছমিয়ার আপত্তি। আমায় নিতে দেবে না কিছুতেই। বলবে, বিসনে বাবু, সব বাসী ফল। আমি টাটকা ফল এনে দেব।

এনেও সে দেয়। সত্যি সত্যিই ভাল ফল আনে। তার দামও বলে অনেক কম। মাঝে মাঝে এমনিই কত জিনিষ দিয়ে যায়। দাম দিতে গেলেও নিতে চায় না। বলে, বাসানে হয়েছে বাবু এ। ওর আর দাম নিব কি? একেবারে নির্লিপ্তভাব, যেন বাগান জাত দ্রব্যের কোন মূল্যই থাকতে নেই।

এ হেন লছমিয়া সোহাগীর সুখ্যাতিতে সে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? হাত মুখ নেড়ে সতেজে বলে, কক্ষণ না। আমার দুধে জল হতে পারে না। আমি তোকে জল দুধ দেব? নিশ্চয়ই ঐ বজ্জাত সোহাগী মিছিমিছি লাগিয়েছে সব কথা। আজই দেখাচ্ছি তার। চুলের মুঠি ধরে তাকে যদি না টেনে নিয়ে আসি এখানে ত কি বলেছি।

বলি, খুব হয়েছে থাক। তোকে আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। জলও দিবি, আবার চোখও রাঙাবি।

সে জিভ্ কেটে দিব্যি করে বলে, মাইরী বলছি, মা কালীর দিব্যি বলছি বাবু, তোর দুধে আমি এক ফোঁটা জল দিতে দিই না।

কৌতূহল হয়। জিজ্ঞাসা করি, কেন রে, অপরের দুধে জল দিস, আমার দুধে জল দিস না কেন?

বুঝতে পারি লছমিয়া ধরা পড়ে গেছে। তার দুর্বল স্থানে ঘা পড়েছে। তাই সে আরক্ত হয়ে উঠেছে। লছমিয়া মুখ নত করে নেয়। মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে বলে, জানি না।

—জানিস তুই বলবি না। তারপর একটু অভিমানের ভান করে বলি আমাকে তুই একটুও ভাল বাসিস না।

লছমিয়া ঘাড় বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ধ্যাৎ। তারপরই একটা সলজ্জ ভঙ্গিমা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।

ইতস্তত: করেছিলাম কিনা মনে নেই কিন্তু একটা অবিবেকচিত্ত কাজ করে ফেলেছিলাম। কিছু না পেয়ে খপ করে লছমিয়ার হাতটা ধরে ফেলে বলেছিলাম, তা হলে তোর আর কলকাতায় যাওয়া হ'ল না লছমিয়া। তুই আমাকে ফেলে কথা বলতে চাস না।

লছমিয়া দাঁড়িয়ে পড়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। তারপর নতচোখে বলে, না বাবুজি, রাগ করিস না। তুই বড় ভাল লোক আছিস। তোকে ভারী ভাল লাগে আমার।

প্রফেসর চ্যাটার্জি আবার সুউচ্চ হাসির রোল তোলেন। বলেন, প্রেম! শেষ পর্যন্ত ফুটিয়ার প্রেম হে!

শান্তনু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, দেখ প্রফেসর, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ এই সব মানবিক বৃত্তি গুলি তোমার পদার্থ বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। অথবা থার্মোডাইনামিক্স্-এর বিধান মেনে চলে না। এর নিয়ম কানুনই আলাদা। প্রেমের কি জাত আছে? ফুটিয়ার প্রেম বলেই যে অপারেশের আর নৈকষ্য কুলীনের প্রেম বলেই যে পারেক্সের, তা নয়। তুমি একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী, জগৎ

জোড়া তোমার নাম। অর্থও আছে, আভিজাত্যও আছে। তুমি তোমার প্রেয়সীকে যেভাবে ভালবাসবে, চোখের যে দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখবে, তোমার অন্তরের প্রীতিগুলি প্রেমের তড়িৎ স্পর্শ যেভাবে সচকিত চঞ্চল হয়ে উঠবে, ঐ লছমিয়ার অন্তরে সেইসব গুণ-গুলি ঠিক একইভাবে প্রকাশ পাবে, স্পন্দিত হবে। তুমি সভ্য, তোমার শিক্ষিত-ঔদ্ধত্যের মধ্যে যতখানি মাদকতা প্রকাশ পাবে, ওদের এই উদ্ধতার মাদকতা তার চেয়ে অনেক বেশী। মরন খেলার আগে কে যে কখন বরা পড়ে বলা যায় না। সে আগের কাছে সবাই সমান। সবেরই পরিণতি এক।

প্রফেসর হাত জোড় করে বলেন, ক্ষমাং দেহি। আমি মূর্খ, তাই তোমার লছমিয়ার প্রেমের অবমাননা করেছি। তার প্রেম অক্ষয় হ'ক, অব্যয় হ'ক, অমর হ'ক, আমি ঈর্ষা করব না। এখন তোমার কিন্নরীদের কথা যা বলছিলে, বল। তোমার লছমিয়ার প্রেমের চাইতে ঐটি আমার কাছে আরও উপাদেয়।

শান্তনু বলে আশ্চর্য নয়। কিন্নরচিহ্নি লোকাঃ। তবে লছমিয়ার প্রেমের কথা তোমায় আমি শোনাতে চাই নি। এ কাহিনী আপনিই এসে পড়েছে। তুটিয়া মেয়ের প্রেম উপাদেয় হ'ক বা নাই হ'ক তাকে বাদ দিয়ে এ কাহিনী বলা যায় না। এ কাহিনীর আদিতেও সেই। এ অভিযানের সঙ্গেও সে জড়িত।

প্রফেসর বলেন, কিন্নরীদের আখ্যান শোনবার বাসনায় তোমার লছমিয়ার প্রেমকে সহ্য করতে প্রস্তুত আছি শান্তনু। তুমি বলে যাও।

শান্তনু বলে, লছমিয়ার এক ঠাকুর্দা আছেন। বয়সের দিক দিয়ে এক শতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষী তিনি। পাহাড়ী ছেলে, পাহাড়কেই চিনেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। হিমালয়ের সঙ্গে মিতালী করেছিলেন সেই বয়স থেকেই। তাই এ পাহাড়ের আদি অন্ত, তার গোপন স্থানের কোন রহস্যও তার কাছে বড় একটা লুকান ছিল না। লছমিয়ার মুখ থেকে তার বিচিত্র কাহিনী শুনে শুনে কেমন উৎসাহিত হলাম। একদিন বললাম, তোর দাদুর কাছে আমায় নিয়ে যাবি লছমিয়া। তার কাছে থেকে শুনব তোদের এই পাহাড় দেশের গল্প।

লছমিয়া খুশি হয়েই আমায় নিয়ে যেতে চায়। বলে, কত মজার মজার গল্প শুনতে পাবি বাবু। কিন্তু খবরদার! কলকত্তার গল্প তার কাছে করবিনা কক্ষণও। তাহলে আমায় যেতে দেবেনা।

—তথাস্তু। বলেই হেসে ফেলি।

লছমিয়ার ঠাকুরদাদা লোক ভাল। বয়সের ভারে দেহের অবনতি হয়। দৃষ্টির স্বচ্ছতার জন্য যার বয়স বেশী। খাটিয়ার উপর সমাসীন থেকে নাতি-নাতনীদের নিয়ে গল্প করে অথবা নিজের অতীতকে রোমন্থন করে। আমায় পেয়ে খুবই খুশি। আরও খুশি তার মুখ থেকে পাহাড়ের গল্প শুনব বলে। লছমিয়া আমার কি পরিচয় দিয়েছে জানি না কিন্তু মক্কা করলাম সকলেরই একটা সসম্ভ্রম দৃষ্টি আমার উপর।

ঠাকুর্দার গল্পের ঝুলি বিশাল। অতি বিশাল হিমালয় পর্বতটা তার ঝুলির মধ্যে ভরা। উৎসাহ বোধ করলাম। এই রকমই একজন লোকের সন্ধান করছিলাম। যার নখাগ্রে আছে হিমালয়ের পথ ঘাট সব। প্রতিটি চূড়ার ইতিহাস আর সে চূড়ার বাসিন্দাদের কাহিনী। ঠাকুর্দা একে একে বলে যায় সব। মাঝে মাঝে আপশোষ করে উঠে বলে, হায়, কি দিনই সে সব গেছে বাবু।

তখন জোর ছিল রক্তের, সেয়ানে কমি নি কিছু। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি আর দুচোখ ভরে দেখেছি।

শুনি সব। ঠাকুর্দার বৈচিত্র্যময় পাহাড়ী গল্প। তিন দিন ধরে শুনি, তারপর লছমিয়াকে বলি, পাহাড়ের গল্প ত শুনলাম। কিন্তু পাহাড়ের পরীদের গল্প ত শুনলাম না। কোন স্থানে তাদের বাস আর সে রাজ্যের পথই বা কোনখানে এর সন্ধান ত পেলাম না কিছু। লছমিয়া চলছিল আমার পাশে পাশে। আজকাল আমাদের ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। আজকাল গল্প শোনবার ছল করে সে আমাকে ডেকে নিয়ে আসে আবার গল্প শেষ হ'লে পৌঁছেও দিয়ে আসে। বারণ করলে বলে, পাহাড়ের মেয়ের মানুষ আমরা। ভয় ডর আমাদের নেই। এমনি করে চলতে আমার ভাল লাগে। আমি কোন বারণ শুনব না।

এখন চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়াল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হ'লরে লছমিয়া?

প্রশ্নের উত্তরে সে আমাকেই প্রশ্ন করল, তুই বুঝি পরীদের দেশে যেতে চাস বাবু?

—কেন, গেলে কি হয় রে?

—না, কক্ষণও যাবি না। সে দেশে গেলে মানুষ আর ফেরে না। ঠাকুর্দাকে বারণ করে দেব ও দেশের গল্প বলতে।

প্রমাদ গনলাম। সব বুঝি ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সহসা এক কাণ্ড করে বসলাম সেই স্বল্পালোকিত নির্জন পাহাড়ী পথে লছমিয়াকে পাশটিতে সরে এসে তাকে বুকের ঘন সান্নিধ্যে টেনে এনে প্রায় কানে কানে বললাম, শোন লছমিয়া, তোকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাব। তুই শুধু আমাকে ঐ পথটার সন্ধান জেনেদে। লছমিয়া প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলে, বাবুজি, তুই লোক ভাল নয়। কলকাতায় আমি যেতে চাই না। লছমিয়া আমার বাঁধন কাটিয়ে ছিটকে পড়ে।

ভয় পেয়ে যাই। তাকে ছেড়ে দিয়ে বলি, তবে থাক। আমি একাই কলকাতায় ফিরে যাই।

এবার ভয় পায় লছমিয়া। ভয়ে ভয়ে আমার পাশটিতে এসে বলে, ওখানে তুই কেন যেতে চাস বাবু। ওখানে গেলে যে লোকে আর ফেরে না, মরে যায়। তোকে আমি মরতে যেতে দেব না।

লছমিয়ার ভয়ের কারণ বুঝি। তাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, দূর মরতে যাব কেন? আমি মরব না রে, ঠিক ফিরে আসব।

লছমিয়া একটু ভেবে বলে, এখানে কি কেউ নেই যে তুই পরীদের সঙ্গে ভাব করতে চাস?

লছমিয়ার মনেরভাব আজ আর আমার অজানা নেই। তাই বলি, আছেরে আছে। তুই ত আছিস। সেখানে আমি পরীদের সঙ্গে ভাব করতে যাচ্ছি না।

—তবে?

এ তবের উত্তর লছমিয়াকে কেমন করে দি। তারা পাহাড়ী মেয়ে, সরল মেয়ে। ছোট্ট একটুখানি গণ্ডীর মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চায়। আমার যে বাঁধনহারা মন, অপরী কিন্নরীদের রাজ্য আবিষ্কারে ব্যগ্র মন, সে এতটুকু ছোট্ট গণ্ডী মানবে কেন? অথচ লছমিয়াকে হাত ছাড়া করতে চাই না। এ পথের সন্ধান যদি কেউ দিতে পারে, পারবে তার বাদ্য তবে শুনেছি

সে নাকি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এখের সন্ধান সে কাউকে দেবে না। তাই লছমিয়াকে বড় প্রয়োজন। আদুরে নাতনি লছমিয়া। দাদুর কাছ থেকে এ পথের সন্ধান আদায় করা তার পক্ষে হয়ত অসম্ভব হবে না। সুতরাং একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম। বললাম, বাবার ভারী শক্ত অসুখ লছমিয়া। তাই ওষুধ আমায় নিয়ে যেতে হবে। একজন সাধুর মুখে শুনেছি, হনুমান গন্ধমাদন পর্বত থেকে যে বিশল্যকরণী ওষুধ এনে লক্ষ্মণ ঠাকুরকে বাঁচিয়েছিলেন, সে ওষুধ এখনও নাকি একমাত্র তাদেরই কাছে পাওয়া যায়। বাবাকে বাঁচাতে গেলে সে ওষুধ আমায় নিয়ে যেতেই হবে।

—সত্যি বলছিস বাবু? লছমিয়া কিছুটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁরে সত্যি বলছি। এই তোকে ছুঁয়ে বলছি। বলে আরও একটু নিবিড়ভাবে তাকে কাছে টেনে নি। পাহাড়ী মেয়ের নিটোল স্বাস্থের উষ্ণ সান্নিধ্য মনটাকে মাতাল করে তোলে। মুহূর্তের জন্য আমার মনটাও হয় ত মাতাল হ'য়ে উঠেছিল। তাই তাকে হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাহুডোরে আবদ্ধ রেখেছিলাম। এই সময়টুকুর ভিতরই লছমিয়ার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, বাবার অসুখ ওষুধ চাই! আচ্ছা বাবুজি, দাদুকে বলে ওষুধের ব্যবস্থা আমি করে দেব।

প্রমাদ গণলাম। চোখে সিনে চেষ্টা করে বললাম, ওষুধ চিনে নেতে হবে। তোর দাদু ত তা পারবে না। আর অপরে তুললেও হবে না। সগোত্রীয় লোক হওয়া চাই। আমি ছাড়া এখানে সগোত্রীয় আর কে আছে বল। আমাকেই যেতে হবে।

লছমিয়া কি বুঝল বুঝি না। কিন্তু সেদিন সে চলে গেল। তিন দিন তার দেখা নাই। বেশ একটু দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু তিনদিন পরই সে এসে উপস্থিত। উৎফুল্ল মুখে আমায় খবর দিল, জানতে পেরেছি বাবুজি।

—কি রে?

—সেই পথের কথা যেখান দিয়ে পরীদের দেখে যাওয়া যায়। দাদু বলতে চায় না কিছুতেই। বলে, বারণ আছে। কিন্তু আমিও ছাড়বার মেয়ে নই। বলি, আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না দাদু, তবে আমায় বলতে দোষ কি? আর আমি মেয়েছেলে, নিশ্চয়ই তোমাদের পরীর রাজ্যে যাব না কোন দিন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

দাদু বিশ্বাস করল আমার কথা। শেষে বলল, খুব চুপি চুপি আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কেউ যেন শুনতে না পায় এমনিভাবে বলল, ত্রিশূল পাহাড়ের পাশদিয়ে পথ চলে গেছে সোজা উত্তর মুখো। ভারী দুর্গম পথ। এ পথ শেষ হয়েছে একটা নদীতে। পাহাড়ী নদী, খরস্রোতা। এমন স্রোত যে হাতীকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ নদী পার হবার কোন উপায় নেই। তিন দিন দাদু ঘুরে বেড়াল নদীর তীরে তীরে। যখন দ্বিতীয় পথ না দেখে হতাশ হয়ে ফিরবার উপক্রম করছিল, ঠিক সেই সময়ে চোখে পড়ল তার বাঁদরদের খেলা। কেমনভাবে তারা গাছের শেকড় ধরে ঝুলে দোল খেয়ে খেয়ে লাফ মেরে ধরছে ওপারের গাছের মোটা মোটা শেকড় গুলিকে তারপর নেমে পড়ছে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। এই ভাবে দাদু পার হয়েছিল নদী। তার পরই পথ আরও দুর্গম। দাদু বলে, চোখে না দেখলে বোঝাতে পারা যাবে না সে পথের দুর্গমতা। কিন্তু সে দুর্গমতাকেও জয় করেছিল দাদু। এরপর পথ সুগম। হিমালয়ের বুকে উষর সমতল ক্ষেত। শুধু ফুল আর ফুল।

আর তারই সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা সাদা ধপ ধপ করছে। দাদু বলে, এইখান থেকেই পরীদের রাজ্য আরম্ভ।

হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই স্বপ্নের কথা। কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে অপরীর দল নেমে এসে ঝাঁক ফিরে গিয়েছিল এমনি এক স্থানে। তাই সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, হ্যাঁরে লছমিয়া তোর দাদু গিয়েছিল পরীদের দেশে?

লছমিয়া ঘাড় নাড়ে, না যায়নি। চেষ্টা করেছিল দুবার। কিন্তু দুবারই ফিরে আসতে হ'য়েছিল এমনি জায়গা থেকে। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি, কেন রে?

—সে ভারী আশ্চর্যের কথা একবার বাঘের পেটে যেতে যেতে রক্ষা পেয়েছিল দাদু। প্রকাণ্ড বাঘ। হাঁ করে গিলে ফেলতে পারত দাদুকে। কিন্তু গেলে নি। আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে চোট দিয়েছিল খুব। এরপর এগুতে আর সাহস করে নি দাদু। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ফিরে এসেছিল।

প্রশ্ন করি, আর একবার।

—সেবার আরও বিপদে পড়েছিল দাদু। কালান্তক সাপ, ক্রুর দৃষ্টি মেলে মাথা সমান করে ফুলে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মুখোমুখি। নিমেষেই কর্মটা সেরে এল মাথার ওপর। কিন্তু ভগবান ত্রিশূল নাথের অপার দয়া সেই মুহূর্তেই দাদু সরে গেছে এক পাশে। ছোবলটা পড়ল গিয়ে শুকনো ডালের ওপর। আর লক্ষিত সর্পরাজ মাথা না তুলেই বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হ'য়ে গেল পাহাড়ের ফোপর ভেতর।

সত্যি সত্যিই শিউরে উঠি। বলি, সর্বনাশ! তারপর?

—তারপর দাদু ভয় না পেয়ে আরও এগিয়ে গেল। কত যে আশ্চর্য দৃশ্য, কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত জীব দেখেছিল শুনলে আজও গা শিউরে ওঠে। কিন্তু চোখে কাঁটা বিঁধে দাদু যখন অন্ধ হতে বসেছে, তখন ত্রিশূল নাথকে স্মরণ করে কেঁদে উঠল। হাত জোড় করে বলল, এমন কাজ আমি আর কখনও করব না ভগবান, আমার চোখ ভাল করে দাও।

অধীর হয়ে বলি, ভাল করে দিলেন।

—দিলেই ত। না দিলে দাদু চোখ ফিরে পাবে কি ক'রে। সাধুর ছদ্মবেশে বাবা ত্রিশূল নাথ এসে চোখে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে বললেন, আর কখনও আসিস না এদিকে। এ মানুষের রাজ্য নয়। এদিকে মানুষের আশা যাওয়া। তারপর দাদু আর সে মুখো হয়নি কোনদিন। ও পথের কথাও আমায়নি কাউকেও।

পাহাড়ের নির্জন রাস্তায় আমরা দুজন পথিক, চলেছি পাশাপাশি। লছমিয়া গল্প বলে চলেছে আপন মনে। আমার মনে অধীর উত্তেজনা। উত্তেজনায় একেবারে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছি। এক সময় প্রশ্ন করে বসি, লছমিয়া, ত্রিশূল পাহাড়টা কোনখানে রে?

লছমিয়া বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে, কেন যাবি? না না, টের পাবি। চোখ কানা হয়ে যাবে।

কানা হবার ভয় আমি করি না। এ দৈব। অদৃষ্টে থাকলে কেউ রদ করতে পারবে না। তাই ও চিন্তা মনে ঠাঁই দিইনা। অনুনয় করে বলি, আমায় ভয় দেখাসনে লছমিয়া। বাবাকে বাঁচাতে হবে। সে জন্যে ওষুধ আমায় চাই; আমি যাব। একবার চেষ্টা করে দেখি, ওষুধ আনতে পারি কি

না। শুধু বলেছে, ত্রিশূল পাহাড়টা কোন দিকে। সহমিয়া, লক্ষ্মীটি আমার। বলতে বলতে দুটি বাহুর বাঁধনে তাকে আমার একবার বেঁধে ফেলি।

প্রফেসর চ্যাটার্জি এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন সব। এবার মৌন ভঙ্গ করে বললেন, একটা সরল প্রাণা নিরীহ পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে তুমি প্রতারণা করেছ শান্তনু। ভালবাসার লোভ দেখিয়ে তার অনিষ্ট করেছ।

শান্তনু মাথা নেড়ে বলে, আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না প্রফেসর। তার অনিষ্ট হ'ক এ আমি চাই নি বলেই নিজের এতবড় অনিষ্ট করে বসেছি। শুধু তার মুখ চেয়ে জীবনের পরম লগ্ন ত্রষ্ট হয়েছি আমি। তখন জানতাম না যে যার জন্যে আমার এই স্বার্থত্যাগ সে অনেক আগেই ত্যাগ করে গেছে। কিন্তু যা বলছিলাম শোন। সহমিয়া আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করল না। শুধু আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, বলব। ত্রিশূল পাহাড় বড় পবিত্র পাহাড়। ভগবান ত্রিশূল পাণি সে পাহাড়ে থাকেন। সে পাহাড়ে আমি গেছি। দেখিয়ে না দিলে চেনে সাধ্য কার। বিরাট বিরাট পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছেন তিনি। দেখিয়ে দিতে ভয় হয় যদি আর না ফিরে আসিস।

সাগ্রহে বলি, আসবরে আসব। আসব না ত যাব কোথায়। আবার ফিরে আসব এইখানে।

সহমিয়া চোখ নামায় না। বলে, বাবুদের কথায় বিশ্বাস নেই। তারা ভাল ভাল কথা বলে কিন্তু একটাও কথা রাখে না। কিন্তু তুই তেমনি নস্। তোকে আমার বিশ্বাস হয়। তারপর একটু থেমে আমায় বলে, ত্রিশূল পাহাড় এখান থেকে একদিনের পথ। ছুটিয়া পল্লী পার হয়েও একদিন লাগবে। তোকে লুকিয়ে নিয়ে যাব আমি। কাউকে জানতে দেব না। রাত থাকতে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ব দুজনে। তারপর ফিরে এসে একটা কিছু বুঝিয়ে বলব এদের। কেউ ত জানবে না তোকে সঙ্গে নিয়ে গেছি আমি।

উৎসাহের আতিশয্যে আমি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু তখন বুঝিনি, এতখানি ছেলে মানুষি করা উচিত হয়নি আমার। এর বিনিময় কত বড় মূল্য যে দিতে হবে একজনকে এধারণা করতে পারি নি। যুবতী মেয়ে সহমিয়া। তারা পাহাড়ী হলেও তাদের সমাজ আছে, সুনাম দুর্নাম আছে। পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, ঘনিষ্টতা করা তাকে নিয়ে গোপনে রাত্রি বিহারে যাওয়া এ কেউ ক্ষমা করে না। সুতরাং তাকেও ক্ষমা করেনি কেউ।

প্রফেসর চ্যাটার্জি প্রশ্ন করে, ক্ষমা করেনি মানে?

—সেই কথাটাই বলছি। সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিলাম দুজনে। পথ চলতে চলতে সহমিয়াকে প্রশ্ন করি, কাজটা কি ভাল হল সহমিয়া? যদি ধরা পড়ে যাস?

সহমিয়া থমকে দাঁড়ায়। সপ্তমী চাঁদের ক্ষীণ আলোয় মনে হ'ল সে যেন আমাকে তীব্র নিরীক্ষণ করে দেখছে। তারপর একটু কাঁপা গলায় বলল, তুই ভাবিস না বাবুজি। আমি ধরা পড়ব না। বলেই যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। চলতে চলতে একসময় সেই প্রশ্ন করল, আচ্ছা বাবুজি—?

—কি রে?

—একটা সত্যি কথা বলবি? এই আমাকে ছুঁয়ে? বলেই সে তার ডান হাতটা নিঃসঙ্কোচে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

হাতখানা তার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। একটু চাপ দিয়ে বললাম, বল না, কি জানতে চাস তুই?

—আমায় সত্যি সত্যি কলকাতায় নিয়ে যাবি ত?

এবার নিজেই কেঁপে উঠলাম আমি। মন বিদ্রোহ করল। একটা নিষ্পাপ সরল মেয়ের সঙ্গে প্রতারণা করতে চাইল না। মন কেবলই বলতে লাগল, এ মেয়েটি তোর জন্যে অনেক করেছে। একে তুই প্রতারিত করিস না। যা সত্য তাই স্বীকার করে নে। স্বীকার করেই নিলাম। তার হাতের উপর চাপ দিয়ে বললাম, যাব রে যাব। ফিরে এসেই তোকে নিয়ে কলকাতায় যাব।

মহুমিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে, বাঁচলুম! ধরা যদি পড়ি বলব, আমি চললুম কলকাতায়। যা পারিস তোরা কর। সারা পথটাই সে ছেলে মানুষের মত বকতে বকতে চলল, আমি আর কাউকে দুধ বেচতে পারব না বাবুজি। যতদিন না তুই ফিরে আসিস ততদিন আমার ভাবনা। আমি ঐ ত্রিশূল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকব আর দিন রাত ত্রিশূলপাণি বাবাকে ডাকব।

শান্তনু থামে।

প্রফেসর বলেন, তারপর ত্রিশূলপাণি বাবা করলেন কি? মহুমিয়ার সব ভাবনা দূর করলেন?

শান্তনু একটুখানি হাসে। বলে, তা করলেন। সব ভাবনা দূর করে তাকে পরম শান্তি দিলেন।

—অর্থাৎ?

—মেয়েটা অকালে ঝরে পড়ল।

প্রফেসর বিস্মিত হ'ন। প্রশ্ন করেন, ঝরে পড়ল?

—ঝরা পড়ে ঝরে পড়ল মহুমিয়া। সোহাগীই ঝরিয়ে দিল তাকে। সঞ্চিত আক্রোশ সে মেটাল এইভাবে। মহুমিয়ার কোন কথাই শুনল না কেউ। জাত বাঁচাতে জোর করে বিয়ে দিল তার এক প্রাচীন পন্থী অন্ধ, ঘুটিয়ার সঙ্গে। কলকাতায় গিয়ে ঘর বাঁধবার সব আশাই তার শেষ হল। সে ঘর বাঁধল গিয়ে আর এক লোকে। বিয়ের পরই সে আত্মহত্যা করেছিল এক গভীর খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রফেসর একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, এমনিই হয়। প্রকৃত ভালবাসায় সুখের চেয়ে দুঃখের স্বাদটাই বেশী।

শান্তনু বলে, বড় দুঃখ না পেলে কেউ আত্মহত্যা করে না। প্রফেসর। তবে মহুমিয়ার এই পরিণতি শুনে আমার দুঃখটাও বড় কম হয়নি। মহুমিয়ার ভালবাসাকে সেদিন প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে যতখানিই দ্বিধাগ্রস্থ হই না কেন, তার ঐকান্তিক সাধনা আমাকে ভিতরে ভিতরে জয় করে চলেছিল। সে যে আমাকেই ভালবেসে আত্মহত্যা করেছে, এ কথা আর কেউ না জানুক, আমার কাছে ত গোপন নেই। এইটাই কাঁটা হয়ে বিঁধে রইল জীবনে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, কাঁটাটা এতখানি তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধত না শান্তনু যদি না তোমার মধ্যে কিছুটা গোপনচারিতা থাকত। তোমার এই গোপন চারিতার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। যে স্বীকৃতি দেবার বাসনার কথা আজ তুমি বলছ সেটা তোমার মনে উদয় হয়েছিল তার মৃত্যুর পরে, পূর্বে নয়। পূর্বে শুধু ছলনাই করে এসেছ মেয়েটিকে। এটা আমার বিজ্ঞানী বুদ্ধি আমায় বলে দিচ্ছে।

শান্তনু বলে, তোমার বিজ্ঞানী বুদ্ধি তোমায় ফাঁকি দিয়েছে, প্রফেসর। হলনা আমি করিনি তবে এই স্বীকৃতি দেবার বাসনা জন্ম নিল আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পূর্ব মুহূর্তে। তোমাদের বিজ্ঞান বলে বস্তুরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু ছোট আকর্ষণ বড় আকর্ষণের কাছে পরাজিত হয়। যাকে তুমি সোপনচারিতা বলছ সেটা হ'ল ছোট আকর্ষণ কিন্তু সেটা মন দিয়ে সঠিক অনুভব করবার আগেই লহমিয়ার বাঁধন দ্বারা বড় আকর্ষণ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ভাবতে পারিনি এতবড় উন্মত্ততা সে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল কি করে? ত্রিশূল পাহাড়টিকে চিনিয়ে দিয়ে তার গন্তব্য পথের বিশদ বর্ণনা দিতে দিতে সে ভেঙে পড়ল। দু হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, বাবুজি বাবার অসুখের ওষুধ আনতে যাচ্ছিস তুই, তাই বাধা দিতে চাই না। তা না হলে ছেড়ে দিতে আমার মন চাইছে না। বড় ভয় করছে।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, ভয় নেই রে। আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। তারপর দু'হাত দিয়ে তার মুখখানি তুলে ধরতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দু চোখের ধারায় সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে পাহাড় চিরে যেন ঝরণা নেমে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার স্থূল অনুভূতি সূক্ষ্ম অনুভূতিতে পরিণত হল। আর সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সেই মুহূর্তেই স্বীকৃতি দিলাম। তার মুখখানা মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, তুই কাঁদিস না লহমি, আমি ফিরে এসেই তোকে কলকাতায় নিয়ে যাব। তারপরই আমি এগিয়ে গেলাম ত্রিশূল পাহাড়ের দিকে।

প্রফেসর মাথা নেড়ে বলেন, স্ট্রাঞ্জ, ভেরী স্ট্রাঞ্জ ইনডীড্।

ঘরের মধ্যে একটা স্তব্ধতা এসে যায়। একটা অপরিসীম বেদনা সারা স্থানটিকে ঘিরে বিরাজ করতে থাকে। এরই মধ্যে শান্তনুকে যেন বেশ খানিকটা স্থির দেখায়।

এক সময় প্রফেসরই প্রশ্ন করেন, তোমার লহমিয়ার কাহিনী ত শুনলাম। এবার কিন্নরীদের কাহিনী শোনাও যার জন্যে এত আয়োজন। শান্তনু বলে, শোনাব প্রফেসর। শোনাব বলেই তোমার কাছে এসেছি। তোরের আলোয় দূর থেকে ত্রিশূল পাহাড়টিকে প্রথম যখন দেখলাম তখন মনে হ'ল সত্যি সত্যিই মহাদেবের ত্রিশূল যেন মেদিনীতে ভর করে অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটি শৃঙ্গ, উঠেছে পাশাপাশি। উচ্চতা আগে সবগুলিই আছে। তারাই যোগাযোগ রেখেছে পরস্পরের সঙ্গে। মনে হয় এক। যাওয়া কিন্তু তা নয়। কাছে এসে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কোথায় ত্রিশূল আর কোথায় সেই অপরূপ যোগাযোগ। মনে হল এক বিরাটকায় দৈত্য পথ আগলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র মূর্তিতে। ভয় পেয়ে গেলাম। এ যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড, পথ কোথায়? মানুষের স্বভাবই এই যে যতক্ষণ ইপ্সিতকে সে পায় না ততক্ষণই তার ঝোঁক, কিন্তু একবার পেলে সে ঝোঁকে তার মন্দা দেখা দেয়। ত্রিশূল পাহাড়ের সাক্ষাৎ যতক্ষণ পাইনি ততক্ষণ কত কল্পনাই না করেছি, কত ভাবনাই না ভেবেছি একবার সাক্ষাৎ পেলে হয়, পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাব তরতর করে, তারপর পাহাড় ডিঙোতে ডিঙোতে একেবারে চলে যাব অপর কিন্নরদের দেশে। কিন্তু এখন সিঁড়ি দূরে থাক, এতটুকু পথই খুঁজে পাই না পাহাড়ে উঠবার; সব মহারণ্যে ঢাকা। লহমিয়া বলেছিল, ত্রিশূল পাহাড়কে ঘুরে ঘুরে একটা পথ চলে গেছে পশ্চিম দিকে। সেই পথই হয়ত শেষ হয়েছে কিন্নর দেশে গিয়ে। তার বাদ্ এই পথ ধরেই একদা

অনির্দেশ যাত্রা করেছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্নর দেশে গিয়ে পৌঁছুতে পারেনি বটে, তবে তার কাছাকাছি যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এ তার বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কোথায় সে পথ। কোন চিহ্নই তার চোখে পড়ে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় কিন্তু পথের নিশানা নাই। হতাশ হয়ে পড়লাম। নিরাশায় মন ভরে গেল। সহমিয়া আমায় ঠকাল না ত? আমি তাকে ছলনা করে এসেছি, এ তারই প্রতিশোধ নয় ত? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, সহমিয়া পাহাড়ী মেয়ে, এতহীন যে হ'তে পারে না। যে মেয়ে বুকের ভিতর ব্যথা গুঁজে অমন কান্না কাঁদতে পারে, সে মেয়ে ছলনাময়ী হতে পারে না। সহমিয়া হয়ত যেমনটি শুনেছে তেমনটি নির্দেশই দিয়েছে। হয়ত ভুল করেছি আমি। তবে সহমিয়ার মুখে শুনেছি, বড় দুর্গম পথ এ। এর সন্ধান পাওয়াই ভার। এ পথের আবিষ্কারক যিনি তিনি তার ঠাকুর্দা নন। সাধুসন্ত লোক, হিমালয়ের অভ্যন্তরে অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন নিত্য। সহমিয়ার মাদুর পাহাড় প্রীতি দেখে, খুশি হয়ে এপথের সন্ধান তিনিই দিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু সে পাহাড় প্রীতি আমার নেই, আছে শুধু কিন্নরদের রাজ্য আবিষ্কার করার বাসনা। তাই হিমালয় আমার কাছে সে দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

প্রফেসর চাটার্জি বলেন, তুমি পাগল। হিমালয় অনন্ত উদার। তার উদার বক্ষে সহস্র পথ প্রসারিত। সেখানে আহ্বান সকলেরই। তোমার কাছে যার রুদ্ধ হবে কেন?

—তখন সে কথা ভাববার মত আমার মনের অবস্থা নয়। নিরাশায়, অবসন্নতায় আমি টলে পড়েছিলাম, হঠাৎ ধাক্কা খেলাম একটা কঠিন পদার্থের সঙ্গে। তারী আশ্চর্য হলাম। যাকে আমি একটা বিচ্ছিন্ন স্তোপ বলে ধারণা করেছিলাম, অজস্র পার্বত্য ঝটাঝুট আর ভাঙলায় যা পুরাপুরি ঢাকা সেটা যে একটা সুবৃহৎ পাষাণ প্রাচীর। এ ছিল আমার কল্পনাতীত। সঙ্গে সঙ্গে সহমিয়ার একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল বটে যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাথরের প্রাচীর এ গিরিবর্ত্মের দ্বার রুদ্ধ করে এতে লোকচক্ষুর অন্তরাল করে রেখেছে। এ দুর্গম কথাটি লঙ্ঘন করে যেতে না পারলে সে পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না কোনদিনই। আরও বলেছিল, এ পথের সন্ধান যাতে অপরকে জানাতে যাবার নিষেধ করে দিয়েছে বাবুজি।

—তা হলে আমাকে বললি কি করে?

সে গম্ভীর মুখে বলেছিল, কেন যে? দাদু পরকে বলতে বারণ করেছে।

তুই কি আমার পর? পর ভাবলে কখনও বলতাম না একথা।

হেসে বলেছিলাম এই দুদিনেই আমাকে এত আপন ভাবলি কি করে?

সে মাথা দুলিয়ে বলেছিল, দু দিনে নয়, এ জন্মজন্মের। শুধু দেখা হয়নি বলে চিনতে পারিনি।

প্রফেসর বলেন, এ ত গেঁয়ো মেয়ের কথা নয়?

—না। সহমিয়ার কথার ধরণ ঐ রকম। এমন অনেক কথাই সে বলত যা শুনে চমৎকৃত হতাম।

—তোমায় সে যথার্থই ভালবেসেছিল শান্তনু, তুমি তার মূল্য বোঝনি। দূরের কিন্নরীর মোহেই মুগ্ধ, কাছের কিন্নরীর মর্ম বুঝলে না।

শান্তনু একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি মিথ্যে বলনি প্রফেসর। তুটিয়ার মেয়ে বলে তাকে অবহেলা করেছিলাম, তাই চিনতে পারিনি।

—এখন আফশোষ করে লাভ নেই শাশ্বত। যা হবার হয়ে গিয়েছে। বরং তোমার রুদ্ধ কপাটের কথা বল। আর বল কেমন করে সে কপাট উন্মুক্ত হল।

শাশ্বত বলে, কপাট এমনিতে উন্মুক্ত হয়নি প্রফেসর। লাথালাথি, ধাক্কাধাক্কি করতে হয়েছে বিস্তর। পঁচিশ ত্রিশ ফুট উঁচু পাথর, অসংখ্য লতা-গুল্ম জালে সমাচ্ছন্ন। আস্ত্র গা থেকেগুলোতে পিছল। শুধু হাতে একে সমান করা সম্ভব নয়। এরপর হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় কি? অসহায় দৃষ্টি যখন হতাশায় ম্লান হয়ে এসেছে, তখন অকস্মাৎ সাদুদের জটার মত ঝুপাঝি মোটা শিকড় বাতাসে দুলে উঠে তাদের উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ম্লান দৃষ্টি সতেজ হ'য়ে উঠল। এবং এতটুকু ভাবনা চিন্তা না করে দুহাত আর পায়ের সাহায্যে তাদের চেপে ধরে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত উপরে উঠতে লাগলাম।

প্রফেসর অবাক হয়ে যান। বলেন, এতখানি দুঃসাহস তুমি করলে?

—আমি করিনি ভাই। তখন আমার মধ্যে এক অতি মানবের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিল। আমি নিমিত্ত মাত্র। তখন আমি যেন চোখের সামনে বিরাট রাজ্য দেখতে পেলাম। তারই উত্তেজনার প্রাবল্যে কি করে যে উপরে উঠে এলাম জানিনা। যখন সত্যসত্যই উঠে এলাম তখন অবসাদে শ্রান্তিতে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। কিন্তু ঠাণ্ডা পাহাড়ের দেশে শ্রান্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যে আবারও শ্রান্তির অপনোদন হ'ল। দেখলাম, আমি এক পাথরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছি। ছাদটা অনেক দূর পর্যন্ত চালু হ'য়ে গড়িয়ে গেছে। যেখানে শেষ হয়েছে তারপরই সুরু হয়েছে পাহাড়ের এক অতলস্পর্শী কাটল। কাটলের ওপারে অসংখ্য দেবদারুর ফাঁকে ফাঁকে মনে হ'ল একটা যেন সরু পথের রেখা চিরে খেয়ে চলে গিয়েছে। মন যেন সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, এই পথ, লছমিয়া এই পথেরই কথা বলেছে আমায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে পথের সুরু তার শেষ কোথায়? লছমিয়ার কথা যদি সত্য হয় তবে বলব এর শেষ আমার ইপ্সিত স্থানের সুরুতে। সম্মুখের কাটল গভীর, সাধারণ লোকের ভীতিপ্রদ। কিন্তু আমি ভয় পেলাম না। বাবা ত্রিশূল নাথকে স্মরণ করে লাফ দিয়ে পড়লাম অপর পারে।

প্রফেসর বলেন, পাগল ছাড়া ছাড়া এ কাজ কেউ করে না।

—করে। মাতালেরা করে। তবে মদ-মাতালে নয়, মন মাতালে। আমার মন তখন উত্তেজনায় মাতাল হয়ে উঠেছে। আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যখন বোঝবার ক্ষমতা হ'ল তখন দেখলাম কাটল পার হ'য়ে এ পারে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তারপর সেই পথ ধরে এগিয়ে চললাম। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, চলেছি ত চলেছি দিনের পর দিন। ক্ষুধায় খেয়েছি গাছের ফল, আর পিপাসায় পান করেছি ঝরণার জল। সেই সঙ্গে দু'চোখ ভরে দেখেছি হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডার। নিত্য নূতন সৌন্দর্যে দুচোখ আমার ধাঁধিয়ে দিত। সেই সুবিস্তৃত অরণ্যানী, বিশাল অটবী শ্রেণী, আর তারই মাঝে মাঝে পাথর বিগলিত ঝরণার ধারা মনকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করে দিত। রাত্রে জ্যোৎস্না ধারায় দিগন্ত প্লাবিত। যতদূর দৃষ্টি চলে অসংখ্য তরুশ্রেণীর মাথায় দিগ্ধ জ্যোৎস্নার ধারা প্রতিফলিত। কে যেন জ্যোৎস্না চূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে যেত গাছের চূড়ায় চূড়ায়। বন্ধুর পথ কখনও কখনও বন্ধুরতর হয়ে উঠেছে। এক পাশে অতলস্পর্শী খাদ, আমি চলেছি পায়ে পায়ে অতি বৃত্তাকার পথ, উঠে গেছে পাহাড় ঘিরে ঘিরে। এমনও হয়েছে, পাতালস্পর্শী খাদ পরিবৃত আমি দাঁড়িয়ে

আছি পাহাড়াশ্রিত একখানি উপলখণ্ডের উপর। মুহূর্তের অসতর্কতায় জীবন্ত সমাধি। শরীর হিম হ'য়ে এসেছে। চোখ বুজে দাঁড়িয়ে পড়েছি দুহাতে গাছের শিকড় শক্ত করে ধরে। হঠাৎ যেন কানের ভিতর কার স্বর বেজে উঠল, ত্রিশূলনাথকে স্মরণ কর বাবুজি, তিনিই রক্ষা করবেন। চমকে উঠি। লছমিয়ার কণ্ঠস্বর! এখানেও সে এসেছে আমার পিছু পিছু। চোখ খুলি না। চোখ বুজেই বলি, লছমি এসেছিস। বড় বিপদ যে আমার। এই আমার শেষ। পারিস ত হাত ধরে এ পথটুকু পার করে দে আমায়। বাবা ত্রিশূলনাথ ভাল করবেন তোর। প্রফেসর, আমি বিজ্ঞানী নই। সাধারণ মানুষ। অলৌকিকত্বে খুব বেশী বিশ্বাস আমার নেই। তবুও সেই চরম সঙ্কিক্ষণে মনে হয়েছে, লছমিয়া বুঝি সত্যসত্যই এসে আমার হাত ধরেছে। আমি অন্তরে বল পেয়েছি। ধীরে ধীরে সেই দুরতিক্রম্য পথও পার হয়ে গেছি।

—আশ্চর্য! প্রফেসর চ্যাটার্জি বলে ওঠেন।

—এর পরও আশ্চর্য আছে যেদিন পথ হারিয়ে এই হিমালয়েরই গভীর অরণ্যে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম।

—সেদিনও কি তোমায় রক্ষা করেছিল লছমিয়া?

—করেছিল তবে লছমিয়া না হ'ক, তার অভয় মন্ত্র সেদিন আমায় রক্ষা করেছিল।

প্রফেসর স্মিতমুখে বলেন, লছমিয়া তোমার আত্মার সত্তায় একেবারে মিশে গিয়েছে শান্তনু!

—জানি না প্রফেসর। তবে সে যে আমার কত বড় আশ্রয়, পথ চলতে গিয়ে বুঝেছিলাম সেদিন। গভীর অরণ্যানী, তার চেয়েও গভীর অন্ধকার। গাছে গাছে, ডালে ডালে জড়িয়ে সূর্যের আলোকে ছত্রাখান করে ফুটেছে। কোনদিন যে এক টুকরা আলো এর মধ্যে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয় না। প্রতি পদে ভয়। ভয়ঙ্কর কিছু একটা সাক্ষাতের অথবা অঘটনের ভয়। প্রতিপদে মনে হচ্ছিল রজ্জুচক্ষু অজগরের মাথায় পা তুলে দিলাম এখুনি। অথবা হিমালয়েরই কিছু একটা ভয়ঙ্করের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালাম বুঝি বা। গাছের লম্বা লম্বা ঠাণ্ডা শিকড়গুলির স্পর্শকে সাপের স্পর্শ ভেবে ভয়ে শিউরে উঠেছি। সেগুলিকেই আবার মুঠমুঠিতে চেপে ধরে অন্ধকার ভেদ করে পথ খুঁজে চলেছি। কতবার যে ঠোক্কর খেয়েছি, লতায় পা জড়িয়ে কতবার যে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি তার শেষ নাই। শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠলাম। সব আশা তিরোহিত হ'ল। বুঝলাম হিমালয়ের গভীর অরণ্যানী আমায় গ্রাস করতে বসেছে। এর হাত থেকে মুক্তি নাই। জমাট অন্ধকার হিমালয়ের সব ভার নিয়ে আমার বুকের উপর ধীরে ধীরে চেপে বসতে লাগল। অসংখ্য ভয়লতা শিকড়ের দল আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। ভয়ে নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। শ্বাস কষ্ট সুরু হ'ল। হিম শীতল মেঘের হিমেল আবহাওয়াতেও শরীর ঘামে ভিজে গেল। লছমিয়াকে আবার মনে পড়ে গেল আর মনে পড়ে গেল তার অভয়দাতাকে, বাবা ত্রিশূলনাথের পাহাড়, বিপদে পড়লে তাঁর স্মরণ নিস, তিনিই রক্ষা করবেন সব বিপদ থেকে। এ বিশ্বাসের কথা, একে অবিশ্বাস করতে পারলাম না। কাতরকণ্ঠে ডাকতে লাগলাম বাবা ত্রিশূলনাথকে। মেঘ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। মনের মধ্যে প্রেরণা এল। এবার দিক পরিবর্তন করে এগুতে লাগলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে ভেসে এল। আরও কিছুটা এগুবার পর বুঝতে পারলাম এ ঝরণার শব্দ। ঝরণার ঝিরঝির শব্দ কানে এসে লাগছে। একটা বিরাট মহীরুহ, আর তাকে ঘিরে তারচেয়ে বিরাট এক ঝোপ সমস্ত দুইকে এমনভাবে ব্যাহত

করে রেখেছিল। এইবার কোনমতে খোপটাকে ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসতেই মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আলোয় দুচোখ ধেঁ ধেঁ গেল। অন্ধকারের পর আলো, বন্দীত্ব থেকে মুক্তি। একটা মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। আলো যে এতখানি আনন্দদায়ক হ'তে পারে সে কথা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। সামনেই উন্মুক্ত দিগন্ত, মাথার উপর ঘন নীলাকাশ, আর পদতলে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরণ। যাদিকে ফেলে আসা অন্ধকার খাঁচা নিয়ে পাখি দিয়েছে অন্যদিকে। তাই ভাবি, সেদিন যদি বাবা ত্রিশূলনাথের কৃপায় গতিপথ ডানদিকে পরিবর্তন না করতাম, তাহলে সেই চক্রব্যূহ অরণ্য থেকে নির্গমন পথ আর খুঁজে পেতাম না।

প্রফেসর চাটার্জি বলে উঠেন, পেতে যে পেতে। শুধু বাবা ত্রিশূলনাথই তোমায় দয়া করেন নি, আর একজনেরও মঙ্গলশক্তি ছিল এর মূলে। সে শক্তির ক্ষমতা বড় কম নয়।

বুঝেও না বোঝবার ভাণ করে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তনু।

প্রফেসর বলেন, তোমার সহমিয়া। যে মন্ত্র সে তোমার কানে দিয়েছিল আর অহর্নিশি যে প্রার্থনা সে করে চলেছিল তোমার জন্যে, তারই জোরে সব বিপদে উদ্ধার পেয়ে চলেছ তুমি।

শান্তনু একটু চুপ করে থেকে বলে, তুমি অত্যুক্তি করনি ভাই। অনেক সময় আমিও ভেবেছি তাই। কিন্তু হয়ত সঙ্কোচে বাধত বলেই একে স্বীকৃতি দিই নি।

—ভাল করনি। সত্যকে স্বীকৃতি না দেওয়ার মত অন্যায় আর নেই। এবারও শান্তনু চুপ করে থাকে।

প্রফেসর বলে চলেন, যা প্রকাশ্য, তাকে প্রকাশ করাই ভাল। আমি বিজ্ঞানী, সত্যের পূজারী। তার বিকাশ আর প্রকাশকেই আমি ভালবাসি। এখানে সঙ্কোচের কোন মূল্যই আমি দিই না।

শান্তনু বলে, বিজ্ঞান হয়ত সব সঙ্কোচের ঊর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ নয়। তাই সহমিয়ার দয়া, তার নীরব আকুতির সব কথা জেনেও গোপন করতে চাইছিলাম। ত্রিশূলনাথের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস যে এক দুর্ভেদ্য রক্ষা কবচ হয়ে সব বিপদে আমায় রক্ষা করে এসেছে, একথা আমি শতবার স্বীকার করি। কিন্তু এমন একটি সরলপ্রাণা নিরপরাধিনী মেয়ের পরিণাম যে এই হ'বে, এ আমি ভাবতে পারিনি। শান্তনুর দুচোখ ভরে একটা অসহায় বেদনার ছাপ ঘনিয়ে এল। একটা ঘাবড়ানো দৃষ্টি মেলে সে প্রফেসরের মুখের দিকে তাকাল।

প্রফেসর বুঝলেন, তাই প্রসঙ্গটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, তারপর? পায়ের তলায় তৃণাস্তরণ আর মাথার ওপর অনন্ত নীলাকাশ এই নিয়ে তোমের মাঝখানে তুমি দাঁড়িয়ে গেলে? ন যযৌ ন তস্থৌর মত?

—না। দাঁড়াবার মত মনের অবস্থা তখন নয় আমার। উন্মুক্ত প্রান্তরের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সেই আমার প্রথম মনে হ'ল, আমি যেন প্রকৃতির সাক্ষাৎ পেয়েছি। একেবারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। কি তার রূপ বলে শেষ করা যায় না। শরীরে অনন্ত যৌবন। কোথাও অচঞ্চল, স্থির। কোথাও চিরচঞ্চল, অস্থির। মুক প্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে আকাশ কোনদিন তার বক্ষে ধরা দেয়। আকাশ স্থির হয়ে আছে প্রকৃতির উন্নত বুকের দিকে তাকিয়ে যদি প্রকৃতি তার আহ্বানে সাড়া দেয়। দুজনার অন্তরের অব্যক্ত বাণী হয়ত বাতাস পৌঁছে দেয় দুজনার কাছে। এ বাণির মধ্যে

যখন আশা থাকে তখন প্রকৃতি হাসে। আবেগে অধীর হয়ে লক্ষ ফুলের বাসর সাজিয়ে আপনাকে মেলে ধরে আকাশের দিকে। সে ফুলের বাহার যে কত, সুষমা যে কত, বর্ণনা দিয়ে তা বোঝান যায় না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এমনিই কাটে। আবার যখন বাগীতে আষাঢ় নেমে যা, তখন রুদ্র প্রকৃতি চোখের ধারায় ভেসে গিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে কখনও সশব্দনে পাহাড়ের থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে মনের আশা মিটায়, কখনও বা গুমরে কাঁদে। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। বিস্ময়ে মন ভরে উঠে। কিন্তু তখনকার বিস্ময় আমার যত বড়ই হ'ক, এর পরের বিস্ময়ের কাছে যে তা অতি ক্ষুদ্র তা তখন ভাবতে পারিনি।

প্রকৃতির এই রম্য উদ্যানে চোখ বুজিয়ে চলা যায় না। তাই দুচোখ মেলে চলতে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়ালাম। আর বিস্ময়ের অতিশয্যে হতবাক হয়ে গেলাম। নিষ্পলক চোখ, নিষ্পন্দ বুক নিয়ে আমি যখন একটু চেতনা ফিরে তখন মনে হ'ল এল, এই ত! এরই জন্য আজ আমার এই দুর্গম অভিযান। হিমালয়ের বুকে বুকে, জঙ্গলে অরণ্যে আজ আমার মাতামাতি। কখনও পাতালস্পর্শী খাদের পাশ দিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে অতি সন্তর্পণে, কখনও ভুল পথের আড়ালে গাছের শিকড় ধরে ঝুলে ঝুলে আমার অনুসরণ গতি। এইত! এই ত আমার স্বপ্ন লক্ষ ধন। কাঞ্চনজঙ্ঘার বাঁকে বাঁকে যাদের আমি সেদিন নেমে আসতে দেখেছিলাম স্বপ্নে, এরা তাদেরই একজন। মুখে সেই বিশ্ব বিমোহনী হাসি, চোখে মুনি চিত্তজয়ী কটাক্ষ। পীনোন্নত বক্ষ শুভ্র বসনা হাত দুটির ভর পিছনে পাথরের উপর রেখে বুক চিতিয়ে বসে আছেন ঝরণার জলে পা ডুবিয়ে। এই কি বনদেবী? এই কি কিন্নরী, যক্ষিণী, অপ্সরী? বেদ ব্যাসাদের এমন মধুমাখা চেহারা কখনই নয় হয়ত বিস্ময়াতিশয্যে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। তাই বিহ্বলভাবে একবার চারিদিক দেখে নিলাম তারপর উপর দিকে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। কেউ কোথাও নাই। সব শূন্য। কিন্নরী অদৃশ্য হয়ে গেছে। আশেপাশে চিহ্নমাত্র তার নাই। স্থির প্রকৃতি কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনিই আছে। ঝরণার ধারা উপলে উপলে যেমন ছড়িয়ে পড়ছিল, তেমনিই পড়ছে। সুনিবিড় নীরবতায় যেমন চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল তেমনিই রইল। শুধু রইল না সে যে এক মুহূর্ত আগে রমনীয় প্রকৃতিকে রমনীয়তর করে দশদিক উজ্জল আভায় আমোদিত করে আমায় অভিভূত করে ফেলেছিল সে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বললেন, ইলিউসন। দিনরাত যার ধ্যানে তুমি মগ্ন ছিলে তারই একটা প্রতিচ্ছবি তোমার চোখের ওপর দিয়ে বললে গেল।

শাস্ত্র বলে, ছবি থাকলেই তার প্রতিচ্ছবি থাকবে। অস্তিত্ব না থাকলে প্রতিচ্ছবি থাকবে কি করে?

—ভুল প্রতিচ্ছবিও অনেক সময় থাকে। ইংরাজিতে যাকে বলে মিরাজ, বাংলায় বলে মরীচিকা, যক্ষভূমির ঘটনা। এমন একটা ভূখণ্ডে প্রতিফলিত হয় যেন মনে হয় নিকটেই কোথাও স্নিগ্ধ সরোবর আছে। কিন্তু সেই ভূখণ্ডে তুমি এগিয়ে যাও, কা কস্য পরিবেদনা। কোথায় বা সে স্নিগ্ধতা, কোথায় বা সরোবর। সব মায়া। তবু মরীচিকারও একটা উৎস আছে। কোন একটা উৎস আছে। কোন একটা সরোবরের রূপ আলোর খেলায় শূন্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তোমার কোন উৎসই নেই। শুধু মস্তিষ্ক বিকৃতিই সার।

—আমি তোমার উক্তির দৃঢ় প্রতিবাদ করছি প্রফেসর মস্তিষ্কের কোন বিকারই আমার হয়নি।

প্রফেসর মৃদু হেসে বলেন, না হলে তোমার ফিরতী কথা গেলেন কোথায়? বাতাসে মিলিয়ে যাননি নিশ্চয়?

—মনে ত হয় না।

—তবে?

—এর উত্তর আমার জানা নেই। তবে স্বীকার করি, অতো অল্প সময়ের মধ্যে একজন মেয়ের পক্ষে এমনভাবে উধাও হয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ চাক্ষুষ দেখলাম সে গেল। মনে যে ভয় না হ'ল, তা নয়। কিন্তু ভয়কে তুচ্ছ করে, সাহসে বুক বেঁধে ঝরণার ধারে ধারে উপরে উঠে গেলাম বন্ধুর পথ, তার উপর নরম শেওলার আস্তরণে পিচ্ছিল। প্রতিপদে বিপদ অনিবার্য। তবুও আমি উঠে গেলাম যেখানে মেয়েটি বসেছিল সেইখানে আমার বিশ্বাস সেই যেন পথ দেখিয়ে আমায় তুলিয়ে নিয়ে এল এইখানে। মানুষের সাধ্য নাই এ পথ বেয়ে এখানে আসা। এখানেই ঝরণার উৎস, একফালি নদী, রূপার পাতের মত পড়ে রয়েছে। এ যেন আকাশ গঙ্গা, অথবা তারই কোন শাখা মনে হল, এই নদীটিই কথা কহিয়া বলেছিল আমাকে যা তার মাত্র পায় হয়েছিল গাছের শিকড় ধরে ঝুলে ঝুলে। আমি যেখানে পার হলাম, সেখানে নদী একেবারে ক্ষীণকায়া। কোন মতে অস্তিত্ব বজায় রেখে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। স্থানটির দুর্গমতার সম্বন্ধে এই প্রথম উপলব্ধি জন্মাল আমার। অতি দুরারোহ স্থান। মানুষ এখানে কোনদিন আসেনি। কোনদিন আসবে কি না জানি না।

মেয়েটিকে খুঁজলাম। তন্ন তন্ন, পাতি পাতি করে খুঁজলাম। কিন্তু জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। শত শত, সহস্র সহস্র বৎসরের নিস্তব্ধতা বুকে নিয়ে ত্রিকালদর্শী পাহাড় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল আমিই যেন প্রথম মানব সন্তান যার পদধ্বনি জেগে উঠল এই লক্ষ বছরের পুরাতন অনৈতিহাসিক যুগের পাথরের বুকের উপর। পাথরের সঙ্গে একটা শিহরণ আমারও বুকের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। সেই আদিম নির্জনতাকে স্পর্শ করে আমিও কিছুক্ষণ জড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ভুলে গেলাম কিছুর রাজ্য, ভুলে গেলাম নিজের অস্তিত্ব। শুধু মনে হতে লাগল হাজার হাজার বছর ধরে এই আলো, এই বাতাস, বিরাট পাথরের স্তূপ, জলপ্লাবিনী ঝরণা অদ্ভুত হয়ে পড়ে রয়েছে। এদের স্পর্শ করেনি কেউ, এরাও স্পর্শ পায়নি কারও। তাই কেমন যেন একটা নিবিড় অনুভূতি আমার মধ্যে জেগে উঠল। আমি সেই নির্জনতাকে, প্রকৃতির বড় রমণীয় আদিম রূপটিকে ছুঁতে বাড়িয়ে ধরিয়ে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আমার ঘোর টুটে গেল। দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা সঙ্কীর্ণ পাথরের উপর। আমার দক্ষিণে সেই ক্ষীণকায়া নদীটি প্রপাতের রূপ নিয়ে ঝর ঝর করে বয়ে চলেছে। বাঁপাশে সেই অরণ্যানী। তবে এ অরণ্যানির রূপ আলাদা, জাতও আলাদা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছোট ছোট গাছের শ্রেণী, যেন একটু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে দাঁড়ান। যতদূর দৃষ্টি চলে সমান উচ্চতা বজায় রেখে এরা সুদূরের দিকে চলে গিয়েছে দীর্ঘ শ্রেণী হয়ে। মনে হ'ল, এও প্রকৃতির এক রম্য উদ্যান মানুষের দ্বারা এর সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে মানব-উদ্ভব অন্য কোন জীব দ্বারা। এমন বিরাট অরণ্য উদ্যান, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজান এরা মানবের দ্বারা সম্ভবপর নয়। এ উদ্যানজাত গাছের পাতার বাহার

আছে, বর্ণের শোভা আছে। পারিজাত ফুলের কথা শুনেছি। ফুল যখন আছে, গাছও আছে নিশ্চয়। সে গাছের আভিজাত্যের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। তাতে এ গাছ পারিজাত না হ'লেও, তারই বংশাবতংশ হওয়া বিচিত্র নয়। এ গাছের আভিজাত্য আছে, গাম্ভীর্য আছে। মর্ত্যের কোন গাছের সঙ্গে এর তুলনা দেখিনা। তুমি হয় ত বলবে প্রফেসর এও আমার বিকৃত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া। অথবা —

প্রফেসর চ্যাটার্জি থামিয়ে দেন। বলেন, অথবা টথবা নয়। আর কিছুক্ষণ শুভাবে চালালে আমার বলবার ইচ্ছা না থাকলেও একটা কিছু বলতাম নিশ্চয়ই। আরে বিজ্ঞানী মানুষ আমরা, কখনও ধীর, কখনও অস্থির। এক গেয়ে গাছের কথা কাঁহাতক শোনা যায় বলত?

শান্তনু বলে, শোনতাম না। এদের সঙ্গে এ কাহিনীর যোগাযোগ আছে বলেই শোনাচ্ছি। বিশাল পাহাড়টাকে যদি শুধু পাথর দিয়ে গড়া বলতে চাও ত ভুল করবে। পরমাশ্চর্যজনক গাছ গাছড়া এর এক মহা-ঐশ্বর্য। শুধু ঐশ্বর্য নয়, ঐতিহ্যও। এদের বৈচিত্র্যতা এদের রমনীয়তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। একই গাছ কিন্তু পাতার কি বিচিত্রতা, ফুলের কি মনোহারিতা। চোখ দিয়ে না দেখলে শুধু শুণাগুন শুনে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সেই জন্য তোমার এই বীতরাগ।

—বীতরাগ নয় হে, তুমি বল আমি শুনছি। তবে এ কথা গোপন করব না, তোমার বৈচিত্র্যময় গাছের চেয়ে তোমার বৈচিত্র্যময় কাহিনীর ওপর লোভ আমার বেশী।

—কিন্তু গাছ দেখলে উল্টোটাই বলতে নিশ্চয়ই। বলতে কাহিনীর চেয়ে গাছের ওপর লোভটাই বেশী।

—ভগবান রক্ষে করেছেন শান্তনু। দেখলে তোমার কাহিনীটাই মাঠে মারা যেত।

শান্তনু হাসে। বলে, মাঠে মারা যাবার মত এ কাহিনী নয়। এ শাশ্বত কাহিনী এর কদর চিরকালই থাকবে। এখন শোন যা বলছিলাম। সেই অপূর্বদর্শন মেয়েটি, তাকে অন্বেষণ করতে এগিয়ে গেলাম। চোখে পড়ল একফালি অস্পষ্ট পথের রেখা। হয় ত কাল্পনিক রেখা। কল্পনায় গাছের তলায় তলায় ফাঁকগুলি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়ে বিচিত্র পথের রূপ ধারণ করেছে। হ'ক কল্পনা, তবুও কেমন মনে হ'ল এই পথ ধরেই সুদর্শনা চলে গেছে দ্রুত পায়ে তারই ইঙ্গিত সে রেখে গেছে হয়ত আমারই জন্যে। সুতরাং এগিয়ে চললাম সেই মানস পথের রেখা ধরে গাছের তলে তলে। কত পথ এমনিভাবে এগিয়ে গিয়েছি খেয়াল নেই, হয় ত অনেকখানি পথই হবে। অকস্মাৎ খেয়াল হ'ল, চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলাম। কখন যে সেই পারিজাত বংশাবতংশের পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি, কখন যে এক অপেক্ষাকৃত সমতল পথ ধরে এগিয়ে চলেছি, নিজেই জানিনা, এখন তাকিয়ে দেখি, সামনেই ঝুরার শুভ্র কাকনজঙ্ঘা একখানি রূপালী পাতের মত আপন গৌরবে উন্নত শীর্ষে দাঁড়িয়ে আছে। আর নীচে চূর্ণ বিচূর্ণ ফেনায়িত বরফ কণা স্তূপীকৃত হয়ে জমাট বেঁধে আছে। এখানেও সেই আদিম নিস্তব্ধতা। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার মাঝে পর্বতের একাংশে এক আশ্রম দেখে চমকে উঠলাম। এখানেও মানুষ! অথবা এই খানেই সেই সুদর্শনা—। আর চিন্তার অবসর করলাম না। একেবারে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে আশ্রমের দ্বারে এসে দাঁড়ালাম।

প্রফেসর ঠাট্টা করে বলেন, বল কি শেষ পর্যন্ত তোমার রূপসী হলেন আশ্রম বাসিনী?

—হলে ত বাঁচতাম। কিন্তু হলেন কই? এসব আশ্রম তাদের জন্য নয়। যাঁদের জন্য তাঁদেরই একজনকে দেখলাম অজিন চর্মে বসে আছেন নিমীলিত চোখে। বুঝলাম, ধ্যানমগ্ন ঋষি,

ধ্যানের স্থানটিকে পছন্দ করেছেন ভাল। কিন্তু মুনিঋষি লোক, এদের বিরক্তি উদ্রেক করা সমীচীন নয়। অতএব মুনিবরের ধ্যান না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখলাম না।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস। কোথায় রূপসী কন্যা, আর কোথায় সাধু সন্তলোক। একেবারে বিপরীত ধর্মী।

শান্তনু সায় দেয়। বলে, বিপরীত ধর্মীই বটে। কিন্তু তবুও কোথায় যেন এদের সোসোযোগ আছে। ধর্ম আলাদা হ'লেও একের সন্ধান, অপরের অজানা নয়।

প্রফেসর আশ্চর্য হ'ন। বলেন, বল কি! সাধু সন্তলোক, রূপসী মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ?

—ত্রিকালদর্শী লোক এঁরা, এঁদের অদর্শনে নয়। রূপসী মেয়েদের ইতিবৃত্ত, তাদের বাসস্থান, উথান পতন সবেরই খবর পাওয়া যায় এঁদের কাছে।

—তুমি পেয়েছিলে?

শান্তনু ঘাড় নাড়ে। বলে, পেয়েছিলাম। শুধু ইতিবৃত্তই নয়, এদের সুদুর্লভ দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে শুধু এনারই কৃপায়।

প্রফেসরের চোখ বড় হয়ে উঠে। মুখ বিস্ময়ের আকৃতিরও বিস্তার ঘটে। ধীরে ধীরে বলেন আমি বিজ্ঞানী মানুষ শান্তনু। সাধুসন্তদের ক্রিয়াকলাপের ওপর আস্থা যদি না রাখতে পারি নিজেকে দোষী মনে করি না কিন্তু সত্যের সন্ধান দিতে জানি। তুমি যখন চাক্ষুষ দর্শনলাভ করেছ তোমার কিছুটা কৃপারও হয়েছে, তখন ত তোমাকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। এতদিন ধারণা ছিল, পৌরাণিক কাহিনীর অধিবাসীরা সবই বুঝি পৌরাণিক। এখন বুঝছি এরা সত্য সত্যই এই মর্ত্যধামে বিরাজিত আছেন।

—আছেন। তবে মর্তধাম বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। এ ধাম স্বর্গ মর্তের মাঝামাঝি। সেই পৌরাণিক যুগে যে স্থানে ছিলেন তারা আজ আবহাওয়া তার পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে ঠিক সেই স্থানে তাদের থাকা সম্ভবপর হল না বলে সে স্থান ত্যাগ করে সরে গেছে আরও উত্তর মুখে। আরও উর্ধলোকে। মর্তলোকের আবহাওয়া আছে ভারী বিষাক্ত। সে দিন এতখানি বিষাক্ত ছিল না বলে একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল এদের সঙ্গে। সে যোগাযোগ আজ ছিন্ন।

—কিন্তু কেন? প্রশ্ন করেন প্রফেসর।

—এর উত্তর দিয়েছি প্রফেসর। হয় ত পরিবেশ। হয় ত আর কিছু, অনুমানের ওপর সঠিক কারণ নির্ণয় করা শক্ত। যে পরিবেশ জীবের বিকাশ তার পরিবর্তনে তার বিনাশও হয়ে থাকে। প্রকৃতির এই বিধানে পৃথিবীর জীব জগতে কত যে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে সে ত তোমার অজানা নয় বিজ্ঞানী। জীব কুলকে জীবকুলই নয় পেয়ে গেছে। আবার কোন কোন কুল একেবারে লয় না পেলেও ক্ষয়ের মুখে এগিয়ে চলেছে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, ইভলিউসন থিওরী সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট?

শান্তনু বলে হয়ত তাই। এক যায় আর এক আসে।

কেউ কেউ যেতেও আবার ধরকে পড়ে। তবে সব কিছুর যেমন নিয়ম আছে, যাবারও একটা নিয়ম আছে। একটা কিছুর আশ্রয় করেই এরা যায়। পৃথিবীতে যখনই কিছু একটা বড় রকমের পরিবর্তন হতে চলেছে, তখনই একটা না একটা যুদ্ধ বিগ্রহ, মহামারী অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের

সূত্রপাত হয়েছে। এর পরই সুরু হয়েছে নতুন যুগের। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এমনি একটি ঘোরতর দুর্যোগ। পরিবর্তন সুরু হয়েছিল এরই প্রারম্ভে। কিন্তু ঘনঘটা দেখা দিল পরে। ক্ষত্রিয়কুল বহুকুল লয় পেয়ে গেল পর পর। অনাচার অবিচার আর ব্যাভিচারের পরিণতি এসব। এরাই ঠেলে দিয়েছিল জাতিকে ধ্বংসের মুখে। এমনি ঘটনা শুধু এই সমতল ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, হিমালয়ের পার্বত্য ভূমিতেও এর স্পর্শ লেগেছিল, ঢেউ লেগেছিল।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, সমতলভূমির পরিণতির কথা না হয় বুঝলাম, তার ফলাফল কিছুটা লক্ষ্যও করেছি জাতির জীবনে। কিন্তু পার্বত্যভূমিতে ঢেউ, তার কথা ত শুনিনি কোনদিন।

—সে কথা তোমায় আগেই বলেছি প্রফেসর, এদের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের ছিন্ন হয়ে গেছে অনেক দিন। তাই এদের কোন খবরই আমরা রাখি না। এরাই গন্ধর্ব কিন্নর জাতি, হিমালয়ের উচ্চতলবাসী। বন্ধুর পার্বত্য রাজ্যের সুখী প্রজা এরা। সংখ্যায় অত্যন্ত লঘু। তবে রূপে রসে সৌন্দর্যে ভরা। অনুপম সৌন্দর্য আর অনবদ্য নৃত্যগীতের জন্য এরা চিরদিনই বিখ্যাত। হিমবাহের অধিবাসী বলে সমতলভূমির আবহাওয়া ছিল এদের প্রতিকূলে। তাই এদের গতিবিধিও সমতলভূমিতে ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মর্ত্যবাসীদের অনেকেই চাক্ষুষ এদের দেখেনি কোনদিন, শুনেছে শুধু অলৌকিক কিংবদন্তী আর এদের অনন্য রূপের খ্যাতি। সেই জন্য একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভয় এদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আজও প্রচলিত। দেবতাদের পরই এদের স্থান নির্দ্ধারিত করেছি আমরা। উর্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা সব এদেরই রূপসী নৃত্যগীত পটীয়সী কন্যা। নৈতিক বাঁধন এদের বড় আটুনি দিয়ে গড়া নয় বলে সুন্দরী রমণীরা ছিল বহু ভোগ্যা। এদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহকে আমরা বলে থাকি গন্ধর্ব বিবাহ।

শান্তনু চুপ করে।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, নিজের অজ্ঞতাকে গোপন করতে চাই না শান্তনু। এই সব অমর কিন্নর জাতি যাদের সম্বন্ধে এত বিশদ বর্ণনা দিয়ে চলেছ তুমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অতি সীমাবদ্ধ। বাল্যকালে এদের সম্বন্ধে যেটুকু বা জেনেছিলাম, চর্চার অভাবে তার ওপর ছাতা ধরে গেছে।

—আমি কিন্তু ছাতা পড়তে দিইনি প্রফেসর। বরাবরই চর্চা করে এসেছি। এদের সম্বন্ধে কৌতূহল আমার চিরদিনের। সেই কৌতূহল মিটাতে গিয়ে প্রাচীন সাহিত্য ঘাঁটাঘাঁটি করেছি বিস্তর। যতই ঘেঁটেছি ততই মনে হয়েছে এরা সত্য, এরা আছে। তোমার আমার মতই এদের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে ঐ হিমালয়েরই এক নিভৃত কন্দরে। কিন্তু হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে বাস করে বলে, এরাও রেহাই পায়নি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে। একদিন তার রুদ্রকোপ ভেঙে পড়ল এই পর্বতাশ্রয়ী ; আনন্দ মুখর ক্ষুদ্র জাতিটির ওপর। বল পিপাসু, নৃত্যগীত সুনিপুণ, ভোগ বিলাসী জাতি, মারী মহামারীর আক্রমণের সঙ্গে এরা পরিচিত নয়। তাই অনাচারের স্রোতে যখন গা ভাসিয়ে চলেছিল এরা সেই সময় ঘরিয়াসত কিরাত জাতীয় আর এক পার্বত্য জাতির অতর্কিত হিংস্র আক্রমণে এরা হয়ে পড়ল দিশেহারা। শিশু বৃদ্ধ নর নারীর দল সব প্রাণ দিল হাজারে হাজারে। শত্রু আক্রমণের বিভীষিকা শেষ হতে না হতেই দেখা দিল মহামারী। এমন অঘটন এদের ইতিহাসে ঘটেনি কখনও। তাই এরাও রোধ করতে পারল না তাকে। তাই মনে মনে এই পবিত্র বাসভূমি ত্যাগ করে তারা চলে গেল পর্বতের আরও দুর্গম, আরও সুউচ্চ শিখরে। শত্রুর আক্রমণ, মারীর

আক্রমণে যে ক্ষয় ধরেছিল জাতির মধ্যে, তাকে প্রতিরোধ করতে পারেনি বলেই এরা পরিণত হ'ল ক্ষয়িষ্ণু এক জাতিতে। অবশ্য জাতি হিসাবে এখনও ওরা পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি বটে, তবে সামান্য যা আছে কবে যে তাও লোপ পেয়ে যাবে তা বলা যায় না।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, মন্দ লাগছে না শান্তনু, তোমার ঐ উর্বশী কিন্নরীদের কাহিনী শুনতে কিন্তু তুমি এত সব গবেষণা করলে কোথায়? মারী, মহামারী বহিরাগতের আক্রমণ এ সবই কি তোমার গবেষণা লব্ধ ফল না ইতালিউসন মতবাদের আর এক রূপ?

শান্তনু মাথা নেড়ে বলে, এর কোনটাই নয়। এ ত্রিকালদর্শী ঋষির বাণী। যা শুনেছি সাধুজির মুখে তাই বলেছি।

—সাধু যদি তোমায় বোকা বানিয়ে থাকে শান্তনু? তুমি যেমন অপ্সরী কিন্নরী করে লেখিয়ে পড়েছিলে, তারই সুযোগ নিয়ে যদি একটা গল্প ফেঁদে থাকেন তোমার কাছে?

শান্তনু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে। বলে, না, প্রফেসর না। সত্যাশ্রয়ী সাধুসজ্জনলোক এঁরা, এঁদের দিব্য দৃষ্টি আছে। তাই দিয়ে এরা দেখেছেন অনেক, জেনেছেনও অনেক। আমার মত লোককে বোকা বানাবার কি স্বার্থ থাকতে পারে ওঁর।

শান্তনুর দৃঢ়তায় প্রফেসর চ্যাটার্জি একটু বিব্রত বোধ করেন। বলেন, তোমার সাধুজির বয়স কত শান্তনু?

—সে খবর রাখি না ভাই। প্রকৃতই যাঁরা মুনিঋষি তাঁদের বয়সের হিসাব পাওয়া ভার। সৌম্য দর্শন সাধু, দীপ্তিময় চোখ। একটা দিব্য জ্যোতিতে সারা মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত। এ তপঃ জ্যোতি মনে হয় হিমালয়ের অনেকগুলি বছর এ দেহের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। তা না হলে এমন জ্যোতি কখনই সম্ভবপর নয়। সাধুজির সঙ্গে পরিচয় হল। অকপটে নিজের সব পরিচয় তাঁকে দিলাম। সর্বশেষে জানালাম আমার এ দুর্গম অভিযানের উদ্দেশ্য।

আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে সাধুজি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার ভুল হয়নি, শান্তনু, তুমি ঠিক পথেই এসেছ। এক সময় এ স্থানও গন্ধর্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গন্ধর্বরাজ চিত্র সেনের রাজ্য ছিল বহু বিস্তৃত। এ অঞ্চলও ছিল ওঁরই শাসনাধীনে। দুরু দুরু বক্ষে প্রশ্ন করি, কিন্তু এখন? এখন গন্ধর্বদের রাজ্য এখানে নেই?

সাধুজি ঘাড় নেড়ে জানান, না। এ ত্যক্ত রাজ্য। অনেক অনেক বছর আগেই তারা এ স্থান ত্যাগ করে চলে গেছেন।

হতাশ হয়ে বলি, আমার এত শ্রম সব কি পণ্ড হবে প্রভু? এর পর আর অগ্রসর হওয়া আমার সাধ্যে কুলোবে না।

সাধুজি বলেন, সে পরামর্শ আমি তোমায় দেব না। সে স্থান আরও দুর্গম। একা মানুষের পক্ষে সে স্থানে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

হতাশায় এবার ভেঙে পড়ে বলি, তা হলে? এ আশা কি মিটবে না? এ যে আমার আবাল্যের আশা। আর এরই জন্যে এত পরিশ্রম করে, প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে এতখানি পথ অতিক্রম করে এসেছি আমি।

সাধুজি আবার ঘাড় নাড়েন। বলেন, উপায় নেই। শত সহস্র বৎসর আগে নিশ্চিহ্ন

ধরার ভয়ে, এখান ত্যাগ করে চলে গেছে তারা। তবে কিছুদিন আগেও যদি আসতে তোমার বাসনা পূর্ণ হ'ত।

তাঁর একথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তিনি বলেন, এই পাহাড়েরই আরও উত্তরে কয়েক শত হাত উঁচুতে চির তুষারে ঢাকা এক পরম রমণীয় সমাধি মন্দির আছে। এ মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে বৎসরের কোন সময়েই এর তুষার একেবারে গলে যায় না। বৎসরে তিন দিন ধরে এই মন্দিরে এক মনোজ্ঞ উৎসব হয়। এ উৎসব গন্ধর্বদেরই উৎসব। তিনদিন ধরে এখানে অহোরাত্র নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ চলে। গন্ধর্বলোক থেকে দলে দলে লোক এখানে আসে। ছেলেমেয়েরা সব এ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। সেই সময় তাদের দর্শন পাওয়া যায়। তবে সেই সময় তুষারপাতও বড় কম হয় না। তুষারপাতে সব কিছু ঢেকে যায়। তুষার পাতের প্রচণ্ডতা যত বাড়ে, এদের উন্মত্ততাও তত বাড়ে। তিনদিন তিন রাত্রির উৎসব শেষে এরা ফিরে যায় স্বস্থানে। এরপর শত চেষ্টা করলেও এখানে এদের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

মনের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, এ সমাধিটি কার আর একে ঘিরে এ উৎসবই বা কেন? অন্তরের কৌতূহল বাইরে প্রকাশ করে ফেলি।

সাধুজি উত্তর দেন, মানুষ বা দেবতা সকলেই বীরত্বের পূজারী। বীরত্বকে তারা পূজা দিয়ে আসে যুগ-যুগ ধরে। এরাও তাই দিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। দুটি অপরূপ তরুণ তরুণী, গন্ধর্ব রাজ চিত্র সেনের প্রজা। অরাতি নিধন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন বলে গন্ধর্ব লোকবাসীরা সশ্রদ্ধ চিত্তে আজও এদের পূজা করে আসে। যে দিনটিতে এরা প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই দিনটিকে কেন্দ্র করে তিনদিন ধরে এরা আনন্দ অনুষ্ঠান করে। এই যে মন্দির এটা দুই তরুণ-তরুণীর সমাধি মন্দির। অপূর্ব তুষার সমাধির মধ্যে অপরূপ দুটি দেহ পাশাপাশি শায়িত।

ভিতরে ভিতরে বেশ কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠি। হয়ত চোখে মুখে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল। এটুকু স্বামিজির দৃষ্টির কাছে গোপন রইল না। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, তুমি অত্যন্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করে, অনেক আশা নিয়ে এত দূর এসেছ। গন্ধর্বলোকের কাছাকাছি এসেও যদি নিরাশ হ'য়ে ফিরে যাও সে ব্যথা হ'বে অসীম। কিন্তু এদের দেখা পাওয়াও দুর্লভ। তবে ঐ সমাধি মন্দিরে আজও যারা শায়িত আছেন তাদের দেখে তুমি কিছুটা তৃপ্তি পেতে পারবে। এত দূরে আসার শ্রমও কিছুটা সার্থক হবে। সেই পরামর্শই আমি তোমায় দেব।

নিশীথ আঁধারের মাঝে আমি যেন ক্ষীণ আলোক রশ্মির সন্ধান পেলাম। বললাম, আপনারা ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। আপনার পরামর্শ আমার শিরোধার্য। আপনি আমায় পথ বলে দিন। স্বামিজি পথ নির্দেশ করে দিয়ে বললেন, এ সময়ে বরফ গলা সুরু হয়। তোমার অদৃষ্ট যদি সুপ্রসন্ন হয়, দেখতে পাবে পাতলা বরফের আস্তরনে সমগ্র সমাধি মন্দিরটি ঢাকা। তারই মধ্যে শায়িত আছে দুটি বরতনু।

প্রফেসর চ্যাটার্জি মাঝপথে প্রশ্ন করেন, তুমি গিয়েছিলে শাশ্বত—

—না যাবার ত কোন কারণ নেই প্রফেসর। যার জন্ত এতদূরে আসা তাকে নাগালের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দেব কেন? তবে এ কথা অস্বীকার করব না, কি দুর্গম সেই পথ! এত পথও অতিক্রম

করে এলাম, কিন্তু এ দুর্গমতার তুলনা হয় না। এ মানুষের পক্ষে অগম্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বামীজির নির্দেশ না পেলে এ পথের সন্ধান আমি পেতাম না কোনো দিনই। খাড়া পাহাড়, আকাশ চুম্বী হয়ে দাঁড়িয়ে পথ রোধ করে। তুমি কল্পনা করতে পারবে না কি প্রচেষ্টায় সুরুয় আছে এর অন্তরালে? ঘুরে, কাছে, আশেপাশে এতটুকু বরফের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। অথচ এ পাহাড় অতিক্রম করে, দেখবে বরফের শ্বেতশুভ্র শয্যা পাতা রয়েছে দিগন্ত প্রসারিত হয়ে।

প্রফেসর চায়ে চুমুক একটু দা রাখা দিয়ে বলেন, এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না শান্তনু যে এত দূর দেখে এসেছ তুমি?

—না দেখলে বলছি কি করে? এই যে জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ছুটোছুটি এ কি শুধু শুধু? এই যে রেশম নরম চুলের গুচ্ছ এও কি অলীক? না দেখে, এ পাব কোথা থেকে? তুমিই ত বলছ এ সুকেশিনী মর্ত্যধামে বিরাজিত ছিলেন খুব কম করেও দু'হাজার বছর আগে। তা হলে?

প্রফেসর বলেন, এ কথা আমি অস্বীকার করি না শান্তনু দুহাজার বছর আগে এ কেশগুচ্ছ এই পৃথিবীর আলো বাতাসে পরিপুষ্ট ছিল, এ শুধু আমার ধারণা নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তোমার কথা শুনে কেমন রোমাঞ্চ লাগছে।

তোমার শুনে লাগছে, আমার স্বচক্ষে দেখে লেগেছিল প্রফেসর। এরা যে ঠিক দু'হাজার বছর আগেকার নরনারী মহাভারতীয় যুগের সঙ্গে এবং যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সাধুজির এ কথা সেদিন পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু তোমার এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান যে কথা শোনাল তারপর সাধুজির কথা ত আর অবিশ্বাস করতে পারি না।

—সাধুজির কথা মেনে না নিয়েও তুমি এগিয়ে গেলে শান্তনু?

—গেলাম ভাই। না গিয়ে উপায় ছিল না। একদিকে অদম্য কৌতূহল, অন্য দিকে সাধুজির নির্দেশ, এ দুটোকেই মেনে নিলাম এক সঙ্গে। পরের দিন ভোরের শেষে এগিয়ে গেলাম উত্তর দিকে সাধুজির নির্দেশিত পথে পাহাড়ে উঠতে উঠতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বরফ মহাপ্রস্থানের পথে শেষ শয্যাই রচনা করছিলাম কিন্তু অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত পথে বাঁ দিকে মোড় ফিরেই অবাক বিস্ময় হতবাক হয়ে গেলাম। পাহাড়ের পর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে তুষারের বোঝা মাথায় নিয়ে। শ্বেত-শুভ্র তুষারের গায়ে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে রামধনুর সপ্তবর্ণের বাহারে চিরন্তন আলোকিত করে তুলেছে। আর তারই মাঝে শুভ্র কিরীট পরে পাহাড়ের মাথাগুলি আছে সজাগ প্রহরীর মত। এ যে কি বাহার চোখ দিয়ে না দেখলে বোঝান যাবে না। পাহাড়ের গায়ে শুকনোই দেখেছি, তার এক বাহার। আবার বরফের স্তূপ দেখলাম এরও এক বাহার। সমুদ্রের রূপ আছে। অনন্ত সমুদ্র মনোহারিণী সন্দেহ নাই। কিন্তু নীলীম শ্বেতবর্ণের কি তুলনা আছে? প্রথম দৃষ্টিপাতেই দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। নির্মলতা আর বিশুদ্ধতার প্রতীক শ্বেতশুভ্র। তাই শুভ্রাম্বরা দেবী আমাদের এত আনন্দ দায়িনী। এক নতুন পৃথিবী শ্বেতশুভ্র বরিত্রীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। এর রূপ আলাদা, রং আলাদা, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জগৎ যার সঙ্গে কোনদিন আমার পরিচয় ছিল না। এতদিন দুটো রূপের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। মাথার ওপর কখনও শান্ত, কখনও অনন্ত নীলিমা, আর আশেপাশে চারিদিকে হরিতের শোভা! এখন সম্মুখীন হলাম ত্রিবর্ণার সামনে। ঊর্ধ্বে অনন্ত নীলিমা আসল রূপের আভায় ঝলমল দিগন্তে হ'ইৎ, দাঁড়িয়ে আছে মধুর মত তার বর্ণাঢ্য

পেছন থেকে সামনে যেন বাহনের রাজা। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের অপূর্ব সুষমা পান করেছিলাম অনেক নাই, অকস্মাৎ বোধ হল যেন বাহনের রাজো কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে আর সেই আগুন যেন গলে গলে চারিদিকে ছড়ে পড়ছে। সভয়ে চমকে উঠি। পরমুহূর্তেই আবার হই এ সূর্য দেবের খেলা। শ্বেত তুষারের ওপর আপনার রশ্মিগুলিকে প্রতিফলিত করে কত যে বর্ণের মেলা বসায়, কত যে অপরূপতার সৃষ্টি করে তা ভাষাতীত।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সূর্যের তেজ বাড়ে। তখন শ্বেত তার স্নিগ্ধতা ছেড়ে ফেলে প্রখর হয়ে উঠে উগ্র মূর্তি ধারণ করে দৃষ্টির উপর আঘাত হানে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নি। সামনে অগ্রসর হবার পথ নাই। মনে হ'ল অস্তগামী বাহ বুঝি নেমে গেছে পাতালের গহ্বরে। কিন্তু কৌতূহল বশে একটু ঝুঁকে পড়ে দেখেই আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠি। এ সেই মন্দির যার কথা সাধুজি বলেছিলেন আমাকে। মন্দিরের চূড়া নাই। একেবারে বরফে ঢাকা। আশে পাশে সবই বরফ। প্রবল উত্তেজনার বশে আমি যে কখন বরফের স্তূপের উপর এসে দাঁড়িয়েছি এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এখন তাকিয়ে দেখি, আমার পায়ের তলায় বরফ। তাইনে বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে সব বরফ। এত বরফ যে কোথা থেকে আসে প্রফেসর, তাবলে বিস্ময়ে তলিয়ে যেতে হয়।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, ঐ জন্যেই ত নাম হয়েছে হিমালয়। হিম যার প্রসারিত করে রেখেছে নিগড় ঘুমে।

শান্তনু মাথা নেড়ে বলে না প্রফেসরও ঠিক হল না। তোমরা বিজ্ঞানীরা বল একদা বরফের যুগ নেমে এসেছিল এই পৃথিবীতে। তারপর সে যুগের অবসান হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এ যুগের অবসান আজও ঘটেনি। অন্ততঃ হিমালয়ের বুক থেকে নয়। নাগাধিরাজ তাঁর উদার বাহু বিস্তার করে এ যুগকে আজও আপন পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তাই ত অনৈতিহাসিক যুগের অনেক চিহ্নই এ পাহাড়ের দিকে দিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সমাধি মন্দিরটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রফেসর বলেন, তোমার কথাটা বৈজ্ঞানিকদের ভেবে দেখা উচিত শান্তনু। কিন্তু এ যাবের সমস্যা সে যাদের বৈজ্ঞানিক আমি নই। তবে আমার নৃতত্ত্ব বন্ধু প্রফেসর পাণ্ডাদের কাছে তোমার এ কথাটা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতামতটাও তোমায় জানাতে পারি কিন্তু সে পরের কথা। উপস্থিত তোমার বরফে ঢাকা মন্দিরটির কথাই শোনা যাক।

শান্তনু বলে, বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে মন্দিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার অনেকখানি নীচে মন্দির। কিন্তু পথ চোখে পড়ে না। বরফে সব ঢাকা। একটু বিচলিত হয়ে পড়ি। অনেকক্ষণ এক একটা মিনিট মনে হয় যেন এক একটা যুগ। এই রকম অনেক-গুলি যুগ একটার পর পর একটা অতিক্রম হবার পর এক পাশে মনে হল যেন একটা সঙ্কীর্ণ পথ ঘোড় ঘুরে ঘুরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। পথের মাঝে মাঝে যেন বরফেরই খাঁজ কাটা। কল্পনার ভাবনায় এগুলি একদা সিঁড়ি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। হয় ত যেদার সময় অথবা কিরণীর হল, যদেরলে এই পথ দিয়েই নেমেছে আবার এই পথ দিয়েই উঠেছে। তখন ধাপগুলি ছিল হয়ত আরও সুস্পষ্ট। এখন গলে গলে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমিও তারই ওপর পা রেখে রেখে

নামতে লাগলাম অতি সন্তর্পণে। কয়েকটি বাঁক ঘুরেই একেবারে এসে পড়লাম মন্দিরের সামনে। অনাবৃত মন্দির এবার তার পূর্ণ আকৃতি চোখের সামনে প্রতিফলিত হল। বরফের একটা গম্বুজ। বরফ জমে সেটা মন্দিরের চূড়ার মত হয়ে ওঠে। আবার বরফ যখন গলতে সুরু করে তখন মাথাটা গম্বুজের মত গোলাকার হয়ে আসে। সাধুজি বলেছিলেন, মন্দিরটি একটি সমাধির উপর গঠিত। তাই সমাধির অন্তে নীচের দিকে তাকিয়ে যুগপৎ বিস্ময়ে পুলকে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রশস্ত একখানি বরফের শিলা যেন স্ফটিক নির্মিত তারই তলায় শায়িত দুটি মূর্তি নর ও নারী। পাশা-পাশি শুয়ে আছে চক্ষু মুদে। এ যেন মহা নিদ্রা নয়, যোগনিদ্রা। সূর্য কিরণ পরশে এখনি জেগে উঠবে তারা। সে দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি আর ফিরাতে পারি না। মরি, মরি, একিরূপ! রূপের প্রভায় সমস্ত শিলাতল আলোকিত। দেবতা কেমন চোখে তা কোন দিন দেখিনি। তাই তাদের রূপ জানিনা। মানুষ দেখেছি, অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারিণী দেখেছি কিন্তু এরূপের বুঝি তুলনা হয় না। এরূপের ধাত আলাদা। মানুষ হয়ে মানুষের রূপের আমি নিন্দে করি না। কিন্তু তবুও বলব এরূপের মধ্যে অনির্বচনীয় এমন একটা জিনিষ আছে যা মানুষের মধ্যে দুর্লভ। পুরুষটি যুবক। তার তারুণ্যে ভরা সুগঠিত দেহ আর সুবিশাল বক্ষ দেখে মনে হয় যথার্থ বীরপুরুষ অকালে ঝরে পড়েছে। পাশে যে মেয়েটি শায়িত রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। মনে হল এ যেন সেদিনের দেখা সেই ঝরনার জলে পা ডুবিয়ে বসে থেকে সহসা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সেই মেয়েটি। এখানে এর আগমন হ'ল কি করে? এ তারী দুর্বোধ্য ঠেকল আমার কাছে অনঙ্গ তিলকা যাঁকে ঘিরে দু কানে কলিকার দুল, চামরী চুল এলান অনেকখানি স্থান জুড়ে তা ছড়ান। হাত দুটি সুঠাম বুকের উপর জড়ো করা, চোখ বোজা, কিন্তু ঠোঁটের কোল দুটিতে একটা অমলিন হাসি যেন ফুটে রয়েছে। মনে হ'ল নব যৌবনের বাসর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রিয় সম্ভাষণে রত অবস্থায় এই মাত্র তারা প্রসুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টি নিষ্প্রভ হ'য়ে এল, তবুও চোখের পাতা পড়ে না। একটি প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘোরপাক খেতে লাগল, কে এই অনুপম যুবা? আর এই অতুল্য রূপযৌবন সম্পন্না মেয়েটিই বা কে? কি এদের পরিচয়? হিমালয়ের এই নিভৃত কোলে, তুষার শয্যায় শায়িতই বা কেন? এরা কি নানুষ ও উর্বশী কিন্নরীদের ছেলেমেয়ে, সেই কথাই ত সাধুজি বলেছেন। বলেছেন এদের বিচিত্র কাহিনী আছে।

আর একটু সরে এলাম। আর একবার ঝুঁকে দেখলাম, এই যে গন্ধর্বলোক। এই সব কিন্নর কিন্নরী, অপ্সরা অপ্সরীদের কথা দেখা আছে মহাভারতের এরাই উর্বশী তিলোত্তমা, রম্ভা, মেনকার বংশ সম্ভূতা! আশ্চর্য নয়। তুষন তোলান রূপ এদের। এমন অলৌকিক রূপ আমি কখনও দেখিনি। তন্ময় হয়ে এই অনুপম শোভা নিরীক্ষণ করছিলাম। যখন ঘোর কাটল দেখলাম, সূর্যদেব আরও কিছুটা মাথার উপর এগিয়ে এসেছেন। আর দেরী করা চলে না। ফিরতে হবে এবার! কিন্তু হঠাৎ কেমন একটা উন্মাদনা পেয়ে বসল আমাকে। এদের একবার স্পর্শ করে মাথার দোষ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলাম না। কিন্তু উপায় নাই। বরফের স্তূপে সব ঢাকা। প্রকৃতির একটা রহস্য এই যে, অতি শীতলতা অনেক বস্তুকে রক্ষা করে, বিনষ্ট হতে দেয় না। পচনশীল পদার্থেরও পচন রোধ করে। লক্ষ বছরের প্রাণীকেও বরফের তলদেশ থেকে অবিকৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। সে তুলনায় ছ মাসের বছর ও অল্পদিন মাত্র। বরফের তলায় আছে বলে

বিকৃতির কোন লক্ষণই এদের মধ্যে দেখা যায়নি। এ ত তোমাদের বিজ্ঞানেরই কথা প্রফেসর।

প্রফেসর চাটার্জি বলেন, তোমার কথাকে আমি অস্বীকার করি না শান্তনু। পৃথিবীর রেফ্রিজারেটর হচ্ছে এই বরফ। এই রেফ্রিজারেটর অনৈতিহাসিক যুগের কত প্রাণীকে যে সংরক্ষিত করে রেখেছে তার লেখা জোখা নেই। তোমার ঐ দুটি প্রাণীকেও যে রাখবে আশ্চর্য কি।

শান্তনু বলে, বিজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে হয় ত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এ একেবারে অবিশ্বাস্য তোমার বৈজ্ঞানিক মন যত যুক্তিরই অবতারণা করুক না কেন তোমার অবৈজ্ঞানিক মন বা আজও তোমার মধ্যে সুপ্ত আছে সে কিছুতেই সায় দেবে না। নিজের চোখ দিয়ে সব দেখেছি, এদের কাহিনী শুনেছি, তোমার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে কাহিনীর মিলও রয়েছে বুঝি, তবুও সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে, এ সবই বুঝি ভুল। তারা স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙলেই জেগে উঠবে আবার।

—হয় ত উঠত। নাম ধরে ডাকলে না কেন? হয় ত মানুষের গলা পেলে সাড়াও দিত।

—হয় ত দিত। আর না দিলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু নাম কি আর তখন জানতাম ছাই। জানলে ডাকতাম। তবে ওদের স্পর্শ পাবার জন্যে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। তাই বেদীটাকেই প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম বারবার করে যদি সুযোগ কিছু জোটে। কিন্তু সুযোগ জুটবে কি! এযে নিশ্ছিদ্র বেদী, এতটুকু ছিদ্র কোথাও নাই। পাহাড়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে একাত্ম হয়ে রয়েছে। তবুও আমার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির জয় হল। প্রবেশপথ সে খুঁজে পেল না বটে কিন্তু নির্গমনের একটা পথ তার কাছে ধরা পড়ে গেল।

কোণের প্রান্তভাগ পাহাড়ের খাঁজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। সেদিকে কারও দৃষ্টি সাধারণতঃ পড়বার কথা নয়, কিন্তু আমার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, একটা কিছু খুঁজে বার করবার আশায় সর্বত্র সঞ্চালিত হতে হতে সেইখানে গিয়ে থমকে পড়ল। পরমাশ্চর্যে দেখলাম বরফ গলা জল পাহাড়ের গা দিয়ে নিঃসৃত হয়ে বেদীটির কোণটিকে ঘিরে ঘিরে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছে। আর তারই স্রোতের সংঘাতে বেদীটির এই অংশের তলদেশ কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। কতিপয় স্থানের কোথায় যে কাটলের সৃষ্টি হয়েছে বোঝা গেল না কিন্তু দেখলাম মেঝেটির কোণের একটি শুষ্ক অংশ আর্দ্রিত হয়ে এই কাটলের পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। হয়ত কয়েক দিনের জন্য এ আত্মপ্রকাশ তার। আবার চাকা পড়ে যাবে বরফের তলায়। আনন্দে, উত্তেজনায় বারবার শিউরে উঠলাম। স্বপ্ন আবার সফল হ'তে চলেছে। শুধু অপরীর সান্নিধ্যই নয়, তার স্পর্শও আমার করতলগত। আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই। যেটুকু আছে তা বরফের পাহাড়ের কৃত্রিম বাধা। তাকে অতিক্রম করতে আমার বেশ লেগে হ'ল না। আমি একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম চুলগুচ্ছের উপর। পশমের মত চামরী চুলের গুচ্ছের সামান্য কিছুটা সিক্ত হয়ে লেপ্টে রয়েছে পাহাড়ে গায়ে। আর আমি স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে আসন গেড়ে বসে আছি তার সামনে। প্রফেসর, সেই চরম মুহূর্তের কথাটা তোমায় আমি ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না। ভয়, আনন্দ, সঙ্কোচ, উত্তেজনা, অন্তরের মধ্যে দুরু দুরু কম্পন, অনুভূতি গ্রাহ্য সব ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে আমার উপর প্রতিক্রিয়া সুরু করে দিল। চুলগুলিকে স্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়াতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। কেমন একটা দ্বিধা, একটা সঙ্কোচ বোধ হল। ভাবলাম,

মানুষের অনভিপ্রায় স্পর্শে অপ্সরীর শুচিতা যদি নষ্ট হয়ে যায়। বিস্মিতা অপ্সরীর বিস্ময় ঘটি যাবার ঘটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হ'ল। চুলগুলি অতি সন্তর্পণে আমি আঙুলের উপর তুলে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে, বিস্ময়ে আমার যেন চেতনা লোপ হবার উপক্রম হ'ল।

প্রফেসর বলেন, এ ধরণের একটা বিভ্রম। মানুষ যখন নজ্ঞানে বড় রকমের একটা কিছু অন্যায় করতে যায়, যেটা বিবেকে তার বাধে, নৈতিক চরিত্রে আঘাত হানে, সেখানে এমনিই হয়। তখনও কখনও তার জ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়।

শান্তনু বলে, জানি না, সাময়িক ভাবে বাস্তবিকই আমার জ্ঞান লোপ পেয়েছিল কি না, কিন্তু প্রকৃত সম্বিত যখন ফিরে পেলাম, তখন দেখি চুলগুলি আমার হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে। স্খলিত বক্ষে অতি সন্তর্পণে চুলগুলি ধরে একটু আকর্ষণ করলাম। কিন্তু আর প্রশ্রয় পেলাম না। বরফের স্তূপ ঠেলে বলে চুলগুলিকে ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। ও প্রান্তের সঙ্গে এ প্রান্তের আর কোন যোগ নেই। মানুষের কলুষ হস্তস্পর্শে ও প্রান্তের সঙ্গে এ প্রান্তের সকল যোগাযোগ যেন সহসা ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হল এ প্রান্ত যেন অপাংক্তেয়, পরিত্যক্ত।

একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল মনের মধ্যে। এ প্রান্তের চুলের গুচ্ছ যদি অপাংক্তেয়, পরিত্যক্ত হয়, আমার হস্তস্পর্শে এর পবিত্রতা যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমিই বা এগুলিকে যত্নে সংগৃহীত করে রাখি না কেন? কথাটা একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে হ'ল না। চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সন্তর্পণে খুব্বার বরফের প্রান্তে বসতে লাগলাম। এক সময়ে চুলের গুচ্ছটি আমার তিনটি আঙুলের মধ্যে বসে এল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল আমি যেন ভূবেরের ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছি। এ ঐশ্বর্য পৃথিবীতে আর কারও নেই। সেই সঙ্গে একটা ভয়ও মনের মধ্যে দেখা দিল। আমি একটা সহিত অপরাধ করেছি। আমার এ অপরাধ যদি প্রকাশ পেয়ে যায়। যদি জানাজানি হয়ে যায় গন্ধর্ব মহলে, তারা কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না। এমন কি আমার তার্থ-কলাপকে সাধুজিও সমর্থন করবেন না। আমি কেশগুচ্ছকে মুঠি ক'রে চেপে ধরে একবার কেঁপে উঠলাম। মনে হল অপ্সরা কিন্নরের দলের কাছে এ খবর এতক্ষণে পৌঁছে গেছে। তারা সব দলে দলে ছুটে আসছে। সেখানে দাঁড়াবার আর আমার সাহস হ'ল না। সে সমাধি মন্দির ত্যাগ করে পড়ি-কি-মরি ভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপরে উঠে এলাম। উপরে এসে মুখ বাড়িয়ে আর একবার মন্দিরটির দিকে উঁকি মেরে দেখলাম, বোধ হল, গন্ধর্ব কিন্নরের দলে সে সমাধি প্রাঙ্গণ ছেয়ে গেছে। সকলেই যেন গালে হাত দিয়ে পরম বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর মানুষের অকীর্তি, কুকীর্তির কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

হিমালয়ের সেই দুর্ধর্ষ শীতেও আমি ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠলাম। আরও ভয় পেয়ে গেলাম, সাধুজি যদি জানতে পারেন? মুখের ভাষায় নাও যদি কিছু বলেন, চোখের ভাষায় হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, শান্তনু, এই জন্যে তোমায় পাঠিয়েছিলাম ওখানের গন্ধর্ব লোকে মানুষের সম্মান নষ্ট করতে তুমি।

প্রফেসর চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করেন, এ প্রশ্ন সাধুজি করেছিলেন তোমায়?

শান্তনু ঘাড় নেড়ে বলে, না।

—জানতে পারেন নি নিশ্চয়ই?

—মুনি-ঋষি লোক, সিদ্ধ পুরুষ। এঁরা সর্বজ্ঞই হয়ে থাকেন। হয়ত সবই জেনেছিলেন তিনি। তাই লজ্জায় আমার মুখ দেখলেন না আর।

—মানে? প্রফেসর বিস্মিত হ'ল।

—মানে ফিরে এসে তাঁর দর্শন পাইনি। আশ্রম শূন্য। সাধুজি যেন মিলিয়ে গেলেন পাহাড় থেকে। হন্য হয়ে তাঁকে খুঁজেছি, সারা পাহাড় চষে ফেলেছি, কিন্তু কোথায় সাধুজির চিহ্ন মাত্র নাই।

—এসব গন্ধর্ব কিন্নরীদের মায়া শান্তনু। সাধুজির বেশে তোমার চোখে ধুলো দিয়েছে।

—একথা আমার মনেও যে উদয় না হয়েছিল প্রফেসর, তা নয়। আমিও ভেবেছিলাম এসব মায়া। কিন্তু পরে ভুল আমার ভেঙেছিল। সে কাহিনীই এবার শোনাব তোমায়। সাধুজির দর্শন না পেয়ে দুর্ভাবনায় অত্যন্ত মুষড়ে পড়লাম। মনে হতে লাগল আমার এই দুষ্কৃতীই সাধুজির অন্তর্ধানের কারণ। ক্রুদ্ধ সাধু ক্ষুব্ধ হয়েই আশ্রম ত্যাগ করে গেছেন। অকস্মাৎ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ি। মনে হল, মাথার ভিতর একটা গণ্ডগোলের সূত্রপাত আরম্ভ হয়েছে আর তারই যন্ত্রণা সারা দেহে ছেয়ে পড়ে আমাকে অবসন্ন করে আনছে। বুঝলাম, আমার ওই পাহাড়ী অভিযানের প্রতিক্রিয়া এবার সুরু হ'তে চলেছে। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছে। আমি আর দাঁড়ালাম না। নিঝ্‌রোত্তা নদীর মত অস্থির চরণে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নেমে আসতে লাগলাম।

প্রফেসর বলেন, এত সহজে তুমি স্বর্গবাস ছেড়ে মর্ত্যধামে নেমে এসে পাল্লছ?

—মর্ত্যের জীব, মর্ত্যের জন্যই প্রাণটা আকুলি বিকুলি করে। স্বর্গের জন্য তার লালসা থাকলেও মর্ত্যই তার কাম্য। তবে আমি না রইলাম স্বর্গে, না এলাম মর্ত্যে।

—তা হলে থেকে গেলে অন্তরীক্ষে বল? নহুষ রাজার মত?

—নহুষ কি যযাতি জানিনা। তবে অন্তরীক্ষেই থেকে গেলাম। ভগবানের রাজ্যে অলৌকিক ঘটনার অন্ত নাই। এ তারই মধ্যে আর একটা। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা যখন তীব্রতার শেষ সীমায় এসে উপনীত হ'ল, পাহাড়ের আলোর রূপটাও আর যখন চোখের তারায় প্রতিফলিত হতে চাইল না, সেই সময় আমার চৈতন্যদেব আমাকে ত্যাগ করে গেলেন। আমি সেই তিমিত আলোতে পাহাড়ের কোলে ধীরে ধীরে দেহটিকে এলিয়ে দিলাম।

প্রফেসর সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, বল কি? এমন কাণ্ডও করে?

শান্তনু বলে, না, কাণ্ড নয়, এ তারই সূত্রপাত। কাণ্ড যা তা এরপর। শুনলে অবাক হয়ে যাবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতিই হচ্ছে প্রকাশ। অর্থাৎ প্রকাশিত হওয়া। যা ছিল অন্তর্নিহিত বাইরে তাকে প্রকাশ করে দেওয়াই প্রকৃতির কাজ।

মানব প্রকৃতিতেও ঠিক তারই প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ ভাবের প্রকাশ।

কোনও ভাব বা ভাবনাই মানুষের মনে কোনোদিন চাপা থাকে না। সে ভাব প্রকাশিত হবেই। আপনার দুঃখ হলো—চোখের জলে নয় তো মুখের কথায় তা প্রকাশিত হয়। আনন্দও প্রকাশিত হয় মুখের হাসিতে।

মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য সবাই ব্যাকুল। মনের ভাব প্রকাশ করতে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মনের মানুষকে। বন্ধু খুঁজছে বন্ধুকে। স্বামী খুঁজছে স্ত্রীকে, স্ত্রী খুঁজছে স্বামীকে।

এ তো গেল ব্যক্তিগত প্রকাশ।

আবার আর এক ধরণের প্রকাশ আছে যে প্রকাশ মানুষের কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, শিল্প-কলায়, মানুষের সংস্কৃতিতে।

এই প্রকাশ হলো বৃহৎ ভাবের প্রকাশ।

এই প্রকাশ দেশ ভেদে, মানুষ ভেদে বিভিন্ন। যে দেশের মানুষের ঠিক যেমনটি প্রয়োজন, সে দেশে সকলের অলক্ষ্যে সেই ভাব সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সে ভাব যেন আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সৃজনীপ্রতিভাসম্পন্ন হৃদয়ের কাছে সেই ভাব তার প্রকাশ প্রার্থনা করে। বলে, আমাকে তুমি প্রকাশ কর। এ-ভার সকলে প্রকাশ করতে পারে না। সৃজনীপ্রতিভা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন—সে কাজ শুধু তাঁদেরই। তাঁরাই শুধু পারেন সেই ভাবকে প্রকাশ করতে। এবং সে প্রকাশের তখন অবলম্বন হয় কাব্য, সাহিত্য, নাটক, শিল্পকলা প্রভৃতি এমন কতকগুলি বস্তু যা সর্ব-সাধারণের আয়ত্তাধীন নয়। সেগুলি প্রকাশ করেন বিশিষ্ট গুণীজন এবং তাই থেকে আনন্দলাভ করেন সর্বজনসাধারণ।

এমনি এক সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন গুণী নট এবং নাট্যকার ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

কেমন করে তাঁর মোড়াপত্তন হলো তা যদি জানতে হয় তাহ'লে আমাদের অনেকখানি পিছু হেঁটে যেতে হবে। গিরিশচন্দ্রের জন্মস্থান কলিকাতা শহরের উত্তর প্রান্ত বাগবাজারে। গঙ্গার ওপরেই বাগবাজার। গিরিশচন্দ্র বাল্যকালে দেখেছেন—প্রতিদিন প্রভাতে তখনকার দিনের পুণ্যার্থী নরনারী ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে গঙ্গাস্নানে চলেছে। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা

যাচ্ছে। অন্নপ্রাশনের কত উৎসব, কত আনন্দ, কত সংকীর্তন। নিজের বাড়ীতে শ্রীধর-বিগ্রহের নিত্য সেবার আয়োজন। রাত্রে গিরিশচন্দ্রের দুই সম্পর্কের এক পিতামহী শুয়ে শুয়ে তাঁকে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ভাগবতের কত বিচিত্র কাহিনী শোনাচ্ছেন।

সেই থেকে গিরিশচন্দ্রের মনে যাত্রার এই ধর্মভাবটি দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ জীবনগতির এইখানেই হয় সূত্রপাত।

বাংলাদেশে তখন যাত্রা পাঁচালী কবিগানের খুব প্রচলন ছিল। পূজা-পার্বণে আমোদ-উৎসবে এই সবই ছিল তখনকার দিনের বাঙালীর আনন্দের উৎস—ভাবরসের অভিব্যক্তি।

যাত্রার প্রচলন কিন্তু আমরা চৈতন্য ভাগবতেও পেয়েছি। নিত্যানন্দ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রাম ও কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁর যৌবনকালে স্বয়ং যাত্রার অভিনয় করেছেন।

তাঁর পরবর্তীকালে যাত্রা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আবার তার পত্তিহান করলেন বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম সুবল অধিকারী, অদ্বৈত-কেষ্টমণির শিক্ষার অধিকারী। এই যাত্রার নাম ছিল কালীয়দমন যাত্রা। তারপর রামচরিত নিয়ে পালাগান প্রচলিত হলো। তার নাম হলো রামযাত্রা। গোচন অধিকারী শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস লীলা অভিনয় করে যাত্রার একটা প্রণালীর ঘটিয়েছিলেন। তাঁর নিমাই-সন্ন্যাস ছিল দেশপ্রসিদ্ধ।

সেই সময় এলো কথকতা। এই কথকতার প্রথম প্রবক্তা হলেন সোনামুখী গ্রামের গদাধর শিরোমণি। এই গদাধর শিরোমণি পুরাণ পাঠ করতেন প্রথমে। তাঁর শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ আর ব্যাখ্যা শুনে সকলেই মোহিত হয়ে যেতো। একদিন এমনি একটি আসরে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ করতে গিয়ে দেখেন—লোকজন তেমন আসেনি। জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি? এ রকম তো হয় না। কে-একজন বললে—ও পাড়ায় রামায়ণ গান হচ্ছে। সেইখানেই যত লোক গিয়ে জড়ো হয়েছে। গদাধর শিরোমণি তখুনি সবাইকে বলে দিলেন—আগামীকাল এইখানে আমি ভাগবত গান করবো। করলেনও তাই। দিনের পর দিন তিনি কোনোদিন ভাগবত, কোনোদিন রামায়ণ, কোনোদিন মহাভারতের নূতন নূতন আখ্যায়িকা অবলম্বন করে নানান ভঙ্গীতে কথনও আবৃত্তি করে, কখনও-বা গান গেয়ে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতে লাগলেন।

এই সময় তারই ভাবানুকরণে কতকগুলি কথক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো। গ্রামে গ্রামে কথকতা করে তাঁরা এই কথকতাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে জনপ্রিয় করে তুললেন।

এইসব কথার অবতারণা করবার শুধু এই জন্যে যে গিরিশচন্দ্র—যাঁর কথা আমি বলতে বসেছি তিনি একদিন তাঁর বন্ধুমহলে এই কথকতার খুব প্রশংসা করছিলেন। বন্ধুরা তাঁর কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন।

তারই কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র তাঁর কথাটাকে প্রমাণ করবার জন্য তাঁর বন্ধু সঙ্গীত-রচয়িতা কেদারনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে এক আসর পেতে বসলেন। কথকতার আসর। 'ধ্রুবচরিত্র' অবলম্বন করে তিনি সেই সর্বপ্রথম একটি কথকতা রচনা করে নানারকমের হাবভাব দেখিয়ে অভিনয় করলেন। বহু দর্শক সেদিন সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। সবাই মুগ্ধ চমৎকৃত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নাট্য রচনায় উৎসাহিত করে তুললেন।

কলকাতা শহরে তখন নাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে। রামনারায়ণের 'কুলিনকুলসর্বস্ব' অভিনীত হলো। যদিও সেটি নাটক নামের যোগ্য নয় তবু সমপ্রথম হিসাবে তার নাম অগ্রগণ্য। তারপর হলো সংস্কৃত নাটকের অভিনয়, ইংরাজি নাটকের অভিনয়। এই ইংরাজি নাটকের অভিনয়ের বাড়াবাড়ি তখনকার দিনে কয়েকজন ছাত্রের আত্মমর্যাদায় লাগলো, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যেমন করেই হোক্ বাঙলা নাটকের অভিনয় করতেই হবে।

বেলগাছিয়ায় নাট্যশালা স্থাপিত হলো। পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগবাজারের কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী আর যদুনাথ চাটুজ্যের সহযোগিতায়, বেলগাছিয়ার সুসজ্জিত বাগানবাড়ীতে রাম নারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হতে লাগলো। তার ইংরেজি অনুবাদ করবার জন্য ডাক পড়লো মাইকেল মধুসূদনের। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে এসে মাইকেল মধুসূদনের অতুলনীয় প্রতিভা ফুটে উঠলো। সেখানে গিরিশচন্দ্র ছিলেন শুধু দর্শক এবং শ্রোতা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদনের বাংলা নাটক সেখানে অভিনীত হলো। চারিদিক প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো। বাংলার ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাগবাজারের কেশব গাঙ্গুলীকে বললেন ভারতীয় গ্যারিক্। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী কেশবচন্দ্রের প্রশংসায় গিরিশচন্দ্র গৌরব বোধ করলেন। তাঁরও মনে অভিনেতা হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো।

দেখতে দেখতে কলকাতায় চারটি নাট্যশালা স্থাপিত হলো। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 'প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি'। বেলগাছিয়ার একটি। পাথুরিয়াঘাটায় 'বঙ্গ নাট্যালয়'—স্বয়ং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। বৌবাজারে আর একটি। সেখানে নাট্যকার মনোমোহন বসুর নাটক অভিনীত হতে লাগল।

এই সময় বাংলার নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ। ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের প্রতিভা তখন মধ্যাহ্নগগনে —সেই সময় দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব।

মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন বাগবাজারের জামাই। তাঁর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের হলো বন্ধুত্ব। গিরিশচন্দ্র এই সব থিয়েটারের হলেন নিয়মিত দর্শক। গিরিশচন্দ্র বলতেন —এঁদের সকলেই ভদ্র এবং সভ্য, তাই এখনকার নাটকগুলিও খুব সভ্য। কেউ জোরে কথা বলবে না, অভিনেতারা দর্শকের দিকে পেছন ফিরবে না, সভ্যভাবে চলাফেরা করবে। ক্রুদ্ধ ভীম যুদ্ধ করতে করতে দাঁতে দাঁত ঘষবে না, চোখ রাঙাবে না। হ্যাঁ, তবে মূর্চ্ছা যাবার অধিকার ছিল। তাও কিন্তু খুব সংযতভাবে। শুধু দৃশ্য-পটের বাহার, সাজসরঞ্জামের চমক ছিল যথেষ্ট। গিরিশচন্দ্রের মতে তাঁদের অভিনয়ের চেয়ে বাইরের সাজসজ্জার আড়ম্বরটাই ছিল বেশি।

গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন মাইকেল আর দীনবন্ধুর নাটক দেখে। আর কেশব গাঙ্গুলীর অভিনয়। নাটকের দিকে অভিনয়ের দিকে মন ছুটলো গিরিশচন্দ্রের। কিন্তু সংসারে এলো অনভিপ্রেত ধারা। বাবা মারা গেলেন, বিরাট সংসার এসে পড়লো মাথায়। শুধু পারিবারিক বোঝা নয়, মামলা-মোকর্দ্দমা অনেক কিছু।

মানুষের জীবন বড় বিচিত্র। কোন্ ঘটনার সংঘাতে কোন্‌দিক দিয়ে যে জীবনের গতি ফিরে যায় কেউ কিছু বলতে পারে না। মামলা বাধলো আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে। আদালতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র যদি মিথ্যা বলতেন হয়ত-বা জয়ী হতেন, কিন্তু মিথ্যা তিনি বললেন না। তার ফলে যে

আঘাত তিনি পেলেন সেই আঘাত তাঁকে করে তুললো বিদ্রোহী। তখন থেকে যে জীবন তিনি যাপন করতে সুরু করলেন—তাকে ঠিক সত্য জীবন যাপন বলে না। কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, চললেন তিনি সেই স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে।

আমাদের দেশের রীতিই হচ্ছে—কোনও খ্যাতিমান ব্যক্তির জীবনী লিখতে গিয়ে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দোষ-ত্রুটিগুলোকে উপেক্ষা করে যাই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী কালের জীবনের এবং জীবনযাপনের ধারা ছিল সাধারণ ধারা থেকে একটু স্বতন্ত্র।

তিনি যখন থিয়েটারে অভিনয় করছেন, নাটক রচনা করছেন, তাঁর খ্যাতি বাংলার দিগন্ত যখন ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ। অযাচিতভাবে তাঁর যে করুণা তিনি পেয়েছিলেন সেরকম করুণা জীবনে ক'জনই বা পেয়ে থাকে!

'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে গেছেন, চৈতন্য সেজেছেন বিনোদিনী। বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি ভাবস্থ হয়ে গিয়ে নাচতে নাচতে বলতেন—'হরি শুরু, শুরু হরি। বল্ মা—হরি শুরু, শুরু হরি!' তারপর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বিনোদিনীকে বলেছিলেন—'তোর চৈতন্য হোক্!' আরও বলেছিলেন, 'তুই আসল নকল এক করে দিলি।'

বিনোদিনী ধন্যা হয়েছিল, আর ধন্যা হয়েছিল নাট্যকার অপরাহ্নেয়ী গিরিশচন্দ্র। ঠাকুর তাঁকে ভৈরব বলতেন। বলেছিলেন, 'রোজ একবার করে মাকে ডাকবি।' গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন—'ডাকবার সময় কোথায়?' বলেছিলেন, 'খাবার সময় একবার ডাকবি।' গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন—অতটি অবস্থায় দোকানের সিঙ্গাড়া কচুরি খেয়ে দিন কাটে, সে সময় মাকে ডাকা উচিত নয়। 'তবে রাত্রে শোবার সময় নয়ত ঘুম থেকে ওঠবার সময় ডাকবি।' গিরিশচন্দ্র হেসেছিলেন।—'বলেছ বেশ! কোথায় কোন্ বারবনিতার ঘরে তারই শয্যায় শুয়ে মাকে ডাকা বুঝি ভাল? আখো—মদ গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকি, মাকে ডাকার কথা মনেই থাকবে না আমার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ রাগ করেননি। বলেছিলেন—'তাহ'লে আমাকে ব'লবা দিয়ে যে। আমিই তোর হয়ে ডেকে দেবো।'

কে এমন ভাগ্যবান পৃথিবীতে? এ কৃপা কে পায়? কত অপরূপ অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটেছে তাঁদের জীবনে সে সব কথা বলতে গেলে ফুরোবে না। এক কথায় শুধু এইটুকুই বলা চলে যে—যাঁর কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক বাচাল হয়—এ সেই তাঁরই অযাচিত অনুগ্রহ। তাঁরই করুণায় গিরিশচন্দ্র মহাকবি। গিরিশচন্দ্র অপাপবিদ্ধ চিরশ্মরণীয় নট-নাট্যকার।

পরমহংসদেবের স্নেহধন্যা বিনোদিনীর জীবনও তাই। সেও তাঁর অযাচিত কৃপালাভ করেছিল।

গিরিশচন্দ্র একটির পর একটি নাটক লিখে চলেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভিনয় করছেন। দেশের যেদিকে হাওয়া বইছে সেইদিকেই যেন ছুটছে তাঁর মন। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। নাইবার খাবার অবসর নেই। এমন সময় তিনি লিখলেন 'চৈতন্যলীলা'। কে সাজবে চৈতন্যদেব? গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে হাতে করে গড়ে পিটে মানুষ করেছেন। তাকেই দিলেন সে পার্ট।

এইবার বিনোদিনীর নিজের কথাতেই বলি।

বিনোদিনী বলছে—

আমার মত পতিতার দ্বারা সে দেবচরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচিসঙ্গত হোক্ এইটিই চাইতেন

গিরিশচন্দ্র মহাশয়। বারবার বলতেন—'আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিতপাবন। পতিতের ওপর তাঁর অসীম দয়া।

আমার মনে বড় আশঙ্কা হতো, আমি দিবারাত্রি ডাকতাম—'হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন!'

যেদিন প্রথম অভিনয় করি তার আগের রাত্রে আমি ঘুমুতে পারিনি। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা আকুল উদ্বেগ। সকালে উঠে স্নানান্তে স্নান করলাম। পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখে তাঁর চরণে নিবেদন করলাম—মহাপ্রভু যেন আমার এই মহাসঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করতে পারি।

তারপর চৈতন্যের বাল্যলীলা অভিনয় করবার সময় 'হরি' বই কেউ বলতো না আমায়। আমি হরা নামে বাঘাই বাঁধি' এই বলে গান ধরে যতই এগিয়ে যাই ততই যেন একটা শান্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলতে লাগলো।

মালিনীর কাছ থেকে মালা নিয়ে সেটি গলায় পরে মালিনীকে বলতাম, 'কি দেখ মালিনী?'

সেই সময় আমার চোখ যেন বাইরের দৃষ্টি হারিয়ে ভেতরে চলে যেতো। আমি বাইরের কিছুই দেখতে পেতাম না। আমি যেন হৃদয়ের মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম দেখতে লাগলাম। আমার মনে হতো—চোখের সামনে গৌরাঙ্গ যেন এসে দাঁড়ালেন। তিনিই যেন কথা বলছেন, আমি শুধু তাঁর কথা শুনে শুনে বলে যাচ্ছি। আমার দেহ রোমাঞ্চিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—মন আনন্দে উদ্ভাস হয়ে যাচ্ছে—চারিদিক যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। অপরূপ অদ্ভুত সে অনুভূতি—বলে বুঝানো যায় না।

তারপর বলতাম—

গয়াধামে হেরিলাম বিষ্ণুপাদ
বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটি অপরূপ প্রাণী।

তখন মনে হতো অন্য কেউ আমার অন্তরের ভেতর থেকে কথাগুলো বলছে। তখন আমার জ্ঞান থাকতো না। সন্ন্যাস গ্রহণ করে শচীমাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করবার সময় বলতাম—

কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননী
কেঁদো না বিশ্বাই বলে।
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে।
কাঁদিলে বিশ্বাই বলে
বিশ্বাই হারাবে, কৃষ্ণ নাহি পাবে।

তখন মেয়েরা এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো যে আমার বুকের ভেতরটা তরতর করতো। তার ওপর শচীমাতার আর্ত ক্রন্দনে আমাকে এমন অভিভূত করে দিতো যে আমি চোখের জলে বুক ভাসাতাম। তারপর যখন সন্ন্যাসীর বেশ পরে নেচে নেচে গান গাইতাম—

হরি, মন যজ্ঞারে লুকালে কোথায়?
তবে আমি একা, যাও যে দেখা প্রাণসখা রাখো পায়।

তখন এক-একদিন আমি যেন সত্যই উন্মাদ হয়ে যেতাম। জ্ঞান হারিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তাম। চুপ্ পড়ে যেতো। আমাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়তো। একদিনের কথা মনে আছে। আমার লাঞ্ছনা এসেছেন প্রে দেখতে। আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছি। গিরিশ ঘোষ মহাশয় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন আমার কাছে। যখন আমার চৈতন্য হলো, দেখলাম—গৌরবর্ণ এক দাড়িওলা ভদ্রলোক আমার পাশে বসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আস্তে আস্তে হাতে আঙুল চালাচ্ছেন।

আমি উঠে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনিও প্রণাম করলেন। বললেন, এক গ্লাস জল খাও তুমি।

জল খেলাম। দেখলাম—অন্যদিন যেরকম দুর্বল হয়ে পড়ি, সেদিন সেরকম দুর্বল নই।

কত ভক্ত কত জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত যে চৈতন্যলীলা দেখতে এসে আমাকে অজস্র আশীর্বাদ করে গেছেন তার অন্ত নেই। কেউ কেউ বা এমন কাজ করে বসতেন—যা দেখলে আমার নিজেরই লজ্জা হতো। আমাতেই শ্রীচৈতন্য ভেবে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। একদিন কে যেন প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। জ্ঞান রইলো, অথচ মনে হলো যেন জ্ঞান নেই। পরম আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে সমস্ত অন্তর। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেমন যেন একটি হিমশীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। অপরূপ অদ্ভুত সে অনুভূতি।

পরমহংসদেবের করুণার কথা তো আগেই বলেছি। তিনি অনেকবার চৈতন্যলীলা দেখতে এসেছেন। যতবার এসেছেন ততবারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন—'তোমার চৈতন্য হোক্ মা।'

বাংলার নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব যেন যিশুখ্রিষ্টের। যুগের প্রয়োজনে তিনি এসেছিলেন। তাই যুগোপযোগী নাটক রচনা করে গেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন—এযুগে সুশিক্ষিত দর্শকের সংখ্যা বড় কম। সংখ্যায় যদি তারা বেশি হতো, আমার নাটকগুলির চেহারা হতো অন্যরকম। নাটক ও নাট্যশালার আরও উন্নতি করা সম্ভব হতো।

গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা ছিল বলেই তাঁর নাটকের যে-সব চরিত্র যুগের ফসল, তারা সে যুগকে অতিক্রম করে আজও অম্লান।

ভালবাসা

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

[বছর দুয়েক আগে ডঃ আলবার্ট আইনষ্টাইন দিল্লীতে "সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল মেমোরিয়াল লেকচার" দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল "প্রেমদর্শন"। আজকের জড়বাদী জগতে এ বিষয়বস্তু যতই হাস্যকর মনে হক্ না কেন, প্রেম এবং দর্শন দুটোই চিরন্তন সত্য। তাছাড়া, ডঃ আলবার্ট আইনষ্টাইনের বক্তব্যে যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁর ব্যাখ্যায় যে অসীম সৌন্দর্য, আমার অভিজ্ঞতায় তার তুলনা নেই। তাঁর বক্তৃতার ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠেছে "ভালোবাসা"।]

আজ থেকে, বেশী নয়, যদি বিশ বছরের মেয়াদে আমরা পেছন ফিরে তাকাই, তাহ'লে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, চিন্তাধারায়, এমন কি আমাদের জীবন দর্শনেও যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটেছে তার ব্যাপ্তি দেখলে অবাক হ'তে হয়। সব ছেড়ে যদি সাহিত্যের কথাই ধরা যায় তো দেখা যাবে যে রবি ঠাকুরের যুগ পর্যন্ত আমরা হৃদয়ের যে সব আবেগ এবং অনুভূতিগুলোকে বড় ক'রে দেখতাম, ভালো ক'রে জানতাম এবং অন্তর দিয়ে অনুভব করতাম, আজকের 'বিষয়'-সাহিত্যের মধ্যে তার চিহ্নটুকুও আর নেই। কিছুটা পশ্চিমের প্রভাবে, কিছুটা অগ্রগতির আগ্রহে এবং বেশীটা জীবনের জটিলতায়, আমরা হৃদয়কে বাতিল ক'রে দিয়ে, বুদ্ধিবাদের আড়ালে আত্ম-গোপন ক'রেছি। এর কতটা যে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আর কতটা যে চটক্ লাগাবার উদ্বেগে মেকি চাতুর্য্য তা বিচার সাপেক্ষ হ'লেও একটা জিনিষ সহজেই বোঝা যায়। হৃদয়াবেগের সুস্থ অথচ সুন্দর অনুভূতি থেকে সাধারণ মানুষের মনকে বুদ্ধিবাদের বাহ্যিক আড়ম্বরে নিয়ে যাওয়ার আধুনিক প্রগতিবাদীর দল সে আবেগের গলা টিপে মেরেছেন তার নাম 'ভালবাসা'। অন্য কথায় তাঁদের বক্তব্য হল যে আধুনিক জড়বাদী জীবনে ওটার স্থান নেই। ওটা নিছক মেয়েলিপনা। আধুনিক চিন্তাধারায়, বিশেষ ক'রে পশ্চিমের বীটনিক্ আর হীপ দর্শনের ব্যাখ্যায় ভালোবাসা হল অসম-বিন্যাস, সময়ের অপব্যবহার, মনের অধঃপতন। ওরা বলেন, নারীদেহে পৌঁছোবার ওটা একটা সহজ রাস্তা ব'লে পুরুষ ওটাকে প্রশ্রয় দেয় আর লজ্জার মাথা বেহাৎ চট্ ক'রে খেতে পারেনা ব'লে মেয়েরা ভালবাসায় আকিং খায়। বিশ্বজোড়া বীটনিক সম্প্রদায় আর আমেরিকার নতুন উদ্ভট কল্পনা হীপ গোষ্ঠির মূল বক্তব্য হল যে স্ত্রী এবং পুরুষ দু'পক্ষেরই যখন আসল এবং একমাত্র উদ্বেগ হল 'সেক্স' তখন মনের ঐ মুখোসের দরকার কি ?

হীন সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক, অধিকর্তা নরম্যান মেলর তাঁর "Advertisements for Myself" বইতে বলেছেন, "প্রত্যেক পুরুষ এবং মেয়ের জীবনের মূল ভিত্তি হল যৌন-বিদ্রোহ এবং ভালবাসার নামে সে খুঁজে বেড়ায় যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা। মানুষের মনের এই আদিম এবং অকৃত্রিম সত্যগুলোকে ব্যর্থ করার জন্যেই সমাজ এই ভালোবাসা কথাটা আবিষ্কার করেছিল এবং লোকচক্ষুর মানুষরাই ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ, মায়া ইত্যাদি বড় বড় কথার মালা পরিয়ে মানুষের মনকে বন্দি করে রেখেছে। আজ আমরা দেহ জিনিষটাকে জানি ব'লেই মনটাকে বাদ দিয়ে মুক্ত হ'তে পারি।"

আধুনিক এবং পশ্চিমী চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ভালবাসা যতই অবান্তর হক, এটাতো কেউই অস্বীকার করতে পারবে না সে মানুষের ইতিহাস জুড়ে এর ব্যবহার আছে আর সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে এর ব্যাখ্যা আছে। যুগে যুগে পুরুষ নারীকে ভালোবেসেছে, স্বামী স্ত্রীকে ভালবেসেছে। পিতামাতা সন্তানদের ভালোবেসেছে, বন্ধু বন্ধুকে ভালোবেসেছে। কৈশোরের ভালোবাসায় উচ্ছ্বাস আছে, যৌবনের ভালোবাসায় যৌন আছে, বার্দ্ধক্যের ভালোবাসায় বিস্মৃতি আছে। কর্মী দেশকে ভালোবাসে, সাহিত্যিক লিখতে ভালবাসে, খেলোয়াড় খেলতে ভালবাসে, বাঙালী ফুটবল ভালবাসে, চোর চুরি করতে ভালোবাসে, পুলিশ চোর ধরতে ভালোবাসে। আমরা ছবি দেখতে ভালোবাসি, কেউ খেতে ভালবাসে, মা হাসিয়া খাওয়াতে ভালোবাসেন।

জীবনে এতো ভালোবাসার ছড়াছড়ি অথচ ডঃ জনসন (Dr Johnson) বলেছেন, "ভালোবাসা মানুষের একটা প্রবৃত্তি মাত্র, জীবনের মূল্যবোধে এটা নিতান্তই মূল্যহীন।" ওদিকে আবার এরিক গিল (Eric Gill) বলেছেন, "জীবন সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি 'শিল্প' প্রেমান্ধ মানুষেরই সৃষ্টি এবং সেটা ঈশ্বর আরাধনারই প্রতিরূপ।" বাবা মা অসন্তুষ্ট হ'য়ে বলেন, "এটা একটা আধুনিক বিকার, সুখ ও সমৃদ্ধির অন্তরায়।" ওদিকে আবার কবি ও সাহিত্যিকরা বলেছেন, "ভালোবাসা চিরন্তনী, মানবাত্মার ঐকান্তিক আগ্রহ।" কেউ বলে, ভালোবাসায় আনন্দের ঔদার্য্য আছে, কেউ বলে, বেদনার প্রাচুর্য্য। এতে ডিডোর (Dido) বাতুলতা আছে, ট্রোবাদোরের (Troubadour) পত্নী অপহরণের উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, ওভিডের (Ovid) ছেলেমানুষী আছে, রবীন্দ্রনাথের মুহ্যমানবোধ আছে আর আছে বুদ্ধদেব, ভগবান শ্রীচৈতন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরিনির্বাণীয় পরমার্থবোধ।

ভালবাসা আর যাই হক বাসি নয়। ভালবাসা যে কি তা আমরা সকলেই জানি, কারণ অল্প বিস্তর আমরা সকলেই ভালোবেসেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে এ বিষয়ে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ। আর কিছু না জানলেও এটা আমরা সকলেই জানি যে ভালোবাসার ভিত্তিতে জীবন চলেছে, চলছে ও চলবে।

আসল বিষয় ভালোবাসা নিয়ে নয়, ভালবাসার ব্যাখ্যা নিয়ে। বিশ্ব সাহিত্যে ভালোবাসার প্রত্যক্ষ ফলাফল নিয়ে আলোচনার শেষ নেই কিন্তু ভালোবাসাটা যে ঠিক কি জিনিষ তা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামানো প্রয়োজনই বোধ করেন না। কিনসে (Kinsey) আর ফ্রয়েড (Freud) ভালোবাসার যৌন-রূপ বিশ্লেষণ ক'রে জগত জোড়া নাম কিনেছেন, কিন্তু ভালোবাসার সুক্ষ্মতম মূল্যবোধ সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন।

সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল লোক মাত্রেই যে এ বিষয় একমত তা ও নয়। যুগে যুগে মানুষ ভালবাসা সম্বন্ধে তার মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বুদ্ধ প্রেমে অন্ধ ছিলেন, চৈতন্য প্রেমে মুগ্ধ ছিলেন, ভক্তি-

সাধকেরা 'পরম-প্রেমের' বিশ্বাসী ছিলেন আবার ওদিকে নিৎসে (Nier Zche) বলেছেন, 'ঘৃণাই মানুষের সভ্যতাকে সমৃদ্ধিশালী করেছে।' রাসকিন (Ruskin) বলতে দ্বিধা করেননি যে ঘৃণাই শিল্পের কেন্দ্র, সভ্যতার মূল সূত্র। ওদিকে আগস্টীন (Augustine) বলে গেছেন, 'প্রেমই ভগবান, ভগবানই প্রেম।' স্পিনোজা (Spinoza) বলেছেন, 'যে মানুষ ভালবাসার মধ্যে নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করে, সেই আসল মানুষ।'

ভালবাসা তাহ'লে কি? সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করে গেছেন যে ভালোবাসা বিশ্বলোকের ব্যাপ্তির অন্তর সৌন্দর্যবোধ এবং সৃষ্টির উৎস। কবি এবং দার্শনিকরা যখন বলেছেন, তখন সোরোকিনের (Sorokin) ভাষায় বলতে চেয়েছেন যে "প্রেম একটা মহা আগস্টীক শক্তি সেটা অমঙ্গলের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলেছে, ঘৃণার মুখে স্থিতি এনেছে, অনৈক্যতার মধ্যে আনুকূল্য সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশ্বলোকের নিয়মানুবর্তিতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।" প্রাচীন গ্রীসে, এম্পিডোক্‌ল্‌ (Empedocle), যিনি জল, বায়ু, অগ্নি ও মরু এই চারটি মৌলিক পদার্থের ব্যাপ্তিতে বিশ্বকে ভাগ করেছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে "এই চারটি মৌলিক পদার্থ প্রেমে আবদ্ধ থাকে ও সংঘর্ষে বিক্ষিপ্ত হয়। কোন এক সময় একই সঙ্গে এই চারটি মৌলিক পদার্থ প্রেমে একীভূত হয়ে বিশ্বে শান্তির সৃষ্টি করে আবার কখনও সংঘর্ষে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে বিষময় বিশৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটায়। এই প্রেম ও সংঘর্ষের সংগ্রাম চলছে চিরন্তনী রূপে। যখন সংঘর্ষ বিশ্বকে বিক্ষিপ্ত করে তখন প্রেম এসে তাদের একীভূত ক'রে দেয়। প্রেম শুধু মহাকাশগতীক শক্তি নয়, জীবন অঙ্গনেরও উৎস। প্রেম আছে বলেই মানুষের মনে ভগবানও আছে।"

পঞ্চম শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি বেথীয়ুসও (Boethius) অনুরূপ ভাবধারা প্রচার করে গেছেন :

> "কীবাস তার সোনার রথে দিবসকে এনে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়, কীবি হল রাতের রাণী যাকে হেসপরস্ সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। সমুদ্র তার ঢেউয়ের রথে চ'ড়ে আপন আনন্দে ছোটা-ছুটি করে, কিন্তু কখনও সে তার সীমানা পেরিয়ে যায়না। বিশ্বলোকের এই যে সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মানুবর্তিতা সেটা জলস্ত আর জলকে একই সূত্রে গুথিত ক'রে রেখেছে তার মূল উৎস হল 'প্রেম'। প্রেম যদি তার নিয়মের বাঁধন খোলে তো অনিয়মের আবর্তে বিশ্বলোক রসাতলে যাবে। এরাই পৃথিবীর গতি, প্রেম তার সারথী। প্রেমই মানুষকে শান্তির মোহে মুগ্ধ করেছে। পরিণয়ের পবিত্রতায় আবদ্ধ করেছে। সাথীর সঙ্গে সাথীকে গৃঙ্খলিত করছে। হে মানব জাতি, যে প্রেমে স্বর্গের সৃষ্টি, সে প্রেমই যেন হয় তোমার আত্মার ঐকান্তিক কামনা।"

সংঘর্ষে বিক্ষিপ্ত পৃথিবীর দিকে চেয়ে মর্মাহত বেথীয়ুস আর এক জায়গায় বলেছেন :

> "সংগ্রামের মধ্যে যদি বিভ্রান্ত হ'য়ে যাও তো শান্তমনে স্বর্গের দিকে তাকাও। সেখানে দেখবে তারিক নিয়মানুবর্তিতায় প্রতিটি নক্ষত্র তার আপন কেন্দ্রে স্থির, সূর্যের মেলিহান শিখা কখন চন্দ্রের শীতলতাকে সংক্রামিত করেনা। চারিধারের চকল তারাদের দেখেও সপ্তর্ষি কখনও ধৈর্য হারায়না; প্রাত্যহিক নিয়মে সন্ধ্যাতারা এসে রাত্রি আসার শঙ্খও দিয়ে যায়, প্রত্যুষের তারা দিবসকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে আসে। চিরন্তনী প্রেমে তাদের প্রত্যেকের প্রাণ বাঁধা, পথ বাঁধা। স্বর্গের সীমানায় অনৈক্যের ছায়াটুকুও নেই।"

মহাজাগতীক এই শক্তিকে আরস্টটল্ (Aristotle) নিয়ে এলেন জীবনের সীমানার মধ্যে। প্লেটো (Plato) বলেছিলেন, এরোস (Eros) আত্মার গতি যেটা আত্মাকে সৌন্দর্য্যের দিকে এগিয়ে দেয়। আরিস্টটল সেটাকে বিস্তারিত ক'রে বললেন, "এরোস আত্মার গতি নয়, গতির উৎস, প্রেমের অংশও বটে। মানুষ যেমন প্রেমে আর একটা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, আপন আকর্ষণী শক্তি দিয়ে অন্যের ঐকান্তিকতাকে উৎসারিত করে, এরোস তেমনি বিশ্বকে বিকীর্ণ করে ছোটকে বড় হবার আগ্রহ দেয়।'

কবিরা কখন ভালোবাসার প্রশংসায় ক্লান্ত হননি। যুগে যুগে তাঁরা ভালোবাসার পরিবিধানীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, প্রত্যক্ষ প্রেমের প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছেন। কবিদের মধ্যে কবীরের কবিতাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে :

> "ইহজগত ঐশ্বরিক প্রেমিকের আনন্দ আবেগ। গতি, ছন্দ ও আনন্দের মধ্যেই ব্রহ্মার বিস্তীর্ণ বিকাশ। ইহলোক নৃত্যে চঞ্চল, পরিপূর্ণ প্রেমের সঙ্গীত ধারায় বিশ্ব বিলুপ্ত, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ছন্দে ছন্দে তার মূর্ছনা। আনন্দের প্রাঙ্গন রইছে প্রেমের সাগরে। ত্রিভুবনের কোণায় কোণায় তার ছন্দ, প্রেমিকের হৃদয়ে তার স্পন্দন, বিশ্বলোকের ব্যাপ্তিতে তার বিশালতা। যে মানুষ আপন সত্তার সঙ্গে এই মহাপ্রেমকে একীভূত করতে পারে সেইই ঐশ্বরিক।"

কবীরের মতে পৃথিবীর আসল শুরু সেইই যে প্রেমের পূর্ণ পেয়ালা থেকে অমৃত পান করে এবং সহচরবর্গকে পান করায়। ভালোবাসার চোখে ভরার্ত্ত পৃথিবীকেও ভালো লাগে; প্রেমের প্রাচুর্য্যে পৃথিবীর সব অনৈক্য নিঃশেষে হারায়।

মিষ্টি মধুর কাব্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবীর পটভূমিকায় এর মূল্য কি নেই? আছে। বিশ্বলোকের ব্যাপ্তিতে বৈচিত্র্য আছে ঠিকই কিন্তু সুন্দরতাও আছে। নইলে সংঘর্ষের মধ্যেও শান্তি আসে কোথা থেকে?

আসলে, বিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদীতায় আমরা বিক্ষত বলেই কবীরের কথা শুধু কাব্য বলেই মনে হয়। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে অনবরতই আমরা শুনে আসছি 'বাঁচার সংগ্রাম' আর 'উপযুক্তের অস্তিত্ব'। ইদানীং কালের ফ্রয়েডিয়ান আবহাওয়ায় আমাদের মনও বিক্ষত। আমরা আজকাল আর শিশুর সারল্য দেখিনা, দেখি তাদের মধ্যে ইডিপাস কমপ্লেক্স। দেখি ঈর্ষা, ঘৃণা, যৌন আবেগের ইশারা। ফলে আমাদের সহজ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা হারিয়ে বসেছি, মনের ও জীবনের সুস্থ সৌন্দর্যবোধ বিসর্জন দিয়েছি এবং নিতান্ত বাঁচার তাগিদে অমানুষ হবে ভেবে বসে আছি যে সংগ্রামই বাঁচার একমাত্র পথ ও জীবনে যুদ্ধই একমাত্র পাথেয়।

প্রাকৃতিক পরিসীমানায় বাঁচার সংগ্রাম অবশ্যই আছে, কিন্তু মানসিকতায় সেটা থাকবে কেন? অ্যাসলে মনটাগু (Ashley Montagu) বলেছেন, "প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করি বলেই মানুষে মানুষে লড়াই হবে এটা কেমন কথা? আমার বাঁচার জন্যে যদি সংগ্রাম প্রয়োজন তাহ'লে পাশের মানুষটার অস্তেও তার সঙ্গে একীভূত হ'য়ে সংগ্রাম করতে হবে বৈ কি!" এই সহজ কথাটা আমরা ভুলেছি কারণ ভালোবাসাটা আমরা জন্মেও আর কিনসের চশমা দিয়ে দেখতে শিখেছি। আমরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাওয়া ভুলে গিয়ে হাতাহাতির হাতিয়ার ধরেছি। আমরা ভালোবাসতে ভুলেছি, কারণ আমরা ভগবান ভুলেছি।

চিত্র মিত্র

অভিনেত্রীর জীবন

চিত্র-জগতের দিকপাল চার্লি চ্যাপলিনের কন্যা ও বিশ্ব-বিশ্রুত নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের দৌহিত্রী গেরাল্ডিন চ্যাপলিন শীঘ্রই এম-জি-এম নিবেদিত 'ডাক্তার জিভাগো' ছায়াচিত্রে আত্মপ্রকাশ করবে। এই ধরনের বংশ গৌরবের দাবী এ যুগে খুব কম অভিনেত্রীই জানাতে পারে। সমস্ত চিত্রশিল্প জগতের দৃষ্টি আজ শ্রীমতী গেরাল্ডিনের দিকে। তাঁর বয়েস এখন মাত্র কুড়ি।

গেরাল্ডিন চ্যাপলিন

তাঁর বাবা যে একজন বিখ্যাত অভিনেতা গেরাল্ডিন এ-বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। কিন্তু ছায়াচিত্র জগতে নিজে প্রবেশের পর সে উপলব্ধি করলো তাঁর বাবা প্রকৃতপক্ষে কী অসাধারণ প্রতিভাধর। তবে সে হলো রূপালী পর্দার। পর্দার বাইরে চার্লি সর্বদাই স্নেহশীল পিতা।

গেরাল্ডিন প্রায়ই তার শৈশব-স্মৃতির কথা বলে। স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে দায়িত্ববোধ নিয়ে সে বড়ো হয়েছে। তাঁর জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা মনিকায়। চার্লি-পরিবার যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডে চ'লে যায় গেরাল্ডিনের বয়েস তখন মাত্র আট। বাবা বিখ্যাত লোক তবু ওকে পাঠানো হলো লৌসানের কাছে এক কড়া কনভেন্ট স্কুলে। অন্য মেয়েদের থেকে ওকে আলাদা ক'রে দেখার কোনো প্রশ্নই উঠলো না। গেরাল্ডিনদের বাড়ির পরিবেশ ছিলো খুবই শান্ত।

বাড়িতে ছিলো বাচ্চর, খেয়াল ইত্যাদি জীবজন্তু। সেয়াস্তিন অন্য ভাইবোনদেরও সেগুলো করতো। সেয়াস্তিনের চোখ সবুজ চুল কালো।

প্রথম জীবনে ওর আকাঙ্ক্ষা ছিলো নর্তকী হবার। পরে সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি 'অন এ লাভলী সামার মর্ণিং'। ছবির নায়ক করাসী অভিনেতা জী-পল বেলমণ্ডো।

ডাক্তার ফিভাগো ছবিতে সে অভিনয় করেছে টোনিয়ার ভূমিকায়। সেয়াস্তিন একই সঙ্গে পেয়েছে মায়ের রূপ আর বাবার প্রাণচাঞ্চল্য।

জাপানী ছায়াছবির কাহিনী

ঘুণের ভ্রাণ

টোমোকোর বাবা যখন মারা যান তখন ওর বয়েস মাত্র তিন। তার মা ইকুয়ো একজন ধনী লোককে আবার বিয়ে করলো। ইকুয়ো আর সেই লোকটি পালিয়ে গেলো টোকিয়োতে। লোকটি ফিরে গিয়ে দেখলো তার সম্পত্তি অন্যেরা আত্মসাৎ করেছে। ইকুয়ো টোমোকো বিক্রি ক'রে দিলো গেইশাদের কাছে। কিছুদিন পরে সুখ্যাত অঞ্চলে এসে মা যোগ দিলো মেয়ের সঙ্গে। সুন্দর চেহারা আর কর্মনিষ্ঠার গুণে ইকুয়ো কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠলো দলনেত্রী। কিন্তু বেশিদিন তার এই সৌভাগ্য রইলো না। সে হয়ে পড়লো গর্ভবতী।

ইতিমধ্যে টোমোকো রীতিমতো যুবতী হয়ে উঠেছে। তাকে বিক্রি ক'রে দেয়া হলো টোকিয়োতে। সেখানে সে গেইশার জীবন গ্রহণ করলো। একদিন এক ঘরোয়া আসরে নাচ-গান করতে গিয়ে তার পরিচয় হলো সৈন্য বাহিনীর একজন কর্মচারী ইজাকির সঙ্গে। তারা পরস্পরকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলো। টোমোকো ঠিক করলো গেইশা বৃত্তি সে ত্যাগ করবে। কিন্তু এই সময়ে এক ভূমিকম্পে তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

একজন পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যে সে একটা সরাইখানা খুলে বসলো। ভালোই চললো। কিন্তু আগে যে চাকর ছিলো তাকে বিয়ে করার জন্য মা টোমোকোকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। এই নিয়ে মা ও মেয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হলো। কিন্তু টোমোকোর দ্বিতীয় স্বপ্ন-সৌধও ধসে পড়লো যখন ইজাকি জানালো পতিতার মেয়ে টোমোকোকে বিয়ে করতে সে রাজী নয়। শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ।

টোমোকোর মা মারা গেছে। নিজেও সে বহুদিন রোগে ভুগেছে। সে এখন বেঁচে আছে শুধু অতীতের স্মৃতি নিয়ে। তার বয়েস এখন তেষট্টি। দিন রাত তাকিয়ে থাকে সৈকতের দিকে যেখানে অবিরাম ভেঙে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। যে ঢেউ আসে সে তো আর ফেরেনা। টোমোকোর হারানো দিনগুলিও আর ফিরে আসবেনা। শুধু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু থাকবে স্মৃতির সৌরভ।

সামুরাই জলদস্যু

ষোড়শ শতকে জলদস্যুর দারুণ উপদ্রব ছিলো। এক সামুদ্রিক বন্দরে সব চাইতে ধনী ছিলো সুকেজামন ওরফে সুজন। বন্দরের অনেকে, এমন কি পৌর পিতারাও, মনে করতেন যে সুজন আসলে এক জলদস্যু। তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো সত্যি সে এক জলদস্যু। সুজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলো। কিন্তু প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে সুজন পালিয়ে গেলো।

টাকা-কড়ি নিয়ে পাড়ি দিলো সমুদ্রে। কিন্তু ঝড়ে জাহাজ ডুবে গেলো। তার উপরে জল-দস্যুরা এসে তার টাকাকড়ি কেড়ে নিলো। কোনোরকমে সাঁতার কেটে সুজন গিয়ে উঠলো এক দ্বীপে। সেখানে তাকে আশ্রয় দিলো বৃদ্ধ যাদুকর সেনিন।

বৃদ্ধ ও চলৎশক্তিহীন রাজার মেয়ে ইয়াইয়া চলেছে শোভাযাত্রার পুরোভাগে। গলায় তার বহু-মূল্য রত্নহার। রাজপুত্র মিয়াং আসছেন দ্বীপের দিকে। তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে। কিন্তু এদিকে বৃদ্ধ রাজার গৃহাধ্যক্ষ স্বয়ং মতলব ক'ষে রেখেছে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে রাজপুত্রকে হত্যা করবে, রাজকন্যাকে বিয়ে করবে, এবং নিজেই রাজা হয়ে বসবে।

গৃহাধ্যক্ষের দল রাজপুত্রকে আক্রমণ করলো। সুজন রাজপুত্রকে উদ্ধার করলো এবং গৃহাধ্যক্ষের লোকজনের সঙ্গে লড়াই শুরু ক'রে দিলো। কিন্তু যুদ্ধে সে সুবিধা করতে পারছেনা দেখে যাদুকর সেনিন মাছির বেশ ধরে তাকে সাহায্য করতে এলেন।

রাজপ্রাসাদের মধ্যে রাজকন্যাকে জোর করে বিয়ে করার জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছিলো গৃহাধ্যক্ষ। মস্ত এক ঘুড়ির পিঠে চ'ড়ে সেখানে হাজির হলো সুজন। সমস্ত প্রহরী এবং গৃহাধ্যক্ষকে হত্যা ক'রে সে রাজকন্যাকে উদ্ধার করলো।

নট-নটী

'দি অ্যাগনি অ্যাণ্ড দি এক্সটেসি' ছায়াচিত্রে প্রখ্যাত শিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অভিনেতা চার্লিটন হেস্টন। শুধু রূপালী পর্দায় অভিনয় ক'রেই তিনি সন্তুষ্ট হননি বাস্তবেও চেষ্টা করেছেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো জীবন যাপন করতে। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনের নিউ আর্টস থিয়েটার ক্লাব গ্যালারীতে হেসটনের নিজের আঁকা ছবির এক প্রদর্শনী হয়ে গেছে।

• • • •

হলিউডের অভিনেত্রী ক্লডিয়া কার্ডিনাল ফরাসী, ইটালিয়ান, স্পেনিশ আর ইংরেজী এই চারটি ভাষায় কথা বলতে পারে। তাই ভাষা-ভাষী চারদেশের লোকই বশীভূত হয়েছে তার রূপে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে 'দি সেভেন্টিয়ানস' নামে একটি ছায়াছবির কাজ চলেছিলো। তাতে অভিনয় করছিলো ক্লডিয়া। স্পেনের একজন অবিবাহিত যুবক, যার পেছনে মেয়েরা অনবরত ঘুরঘুর করে অথচ যাদের সে পাত্তা দেয় না, সেই যুবকটিও কিনা শ্রীমতী ক্লডিয়াকে দেখে রীতিমতো বিচলিত। নিজেই সে কবুল করেছে "যে মুহূর্তে ক্লডিয়ার চোখে চোখ রাখলুম, আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে গেলো।" তার রূপের চাবিকাঠি কোথায় এর জবাবে ক্লডিয়া বলে: "আন্তরিকতা। আন্তরিক হও তাহলেই তুমি সুন্দর হবে। তুমি ঠোঁট নেড়ে যে কথাই বলো না কেন, লোকে তোমার চোখের দিকে তাকাবে, আর চোখের ভাষাতেই ধরা প'ড়ে যাবে তুমি কপট না অকপট। অনেক মেয়ে নিজে যা নয় তারই ভান করে। এর চাইতে বড়ো ভুল আর কিছু হতে পারে না। অন্যকে অন্ধ অনুকরণ করার মতো হাস্যকর আর কিছু নেই। তার চাইতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলাই অনেক বেশি কাম্য।"

নিজের সাজসজ্জা সম্পর্কে স্টুডিয়া বলে: "চুল কেমন ক'রে বাঁধবো এ বিষয়ে আমি পুরুষ-বন্ধুদের মতামতই গ্রহণ করে থাকিনা। কারণ তারা পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট নয়, তাছাড়া তারা সংস্কারমুক্ত। সৌন্দর্যের একটা প্রধান অঙ্গ হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।"

স্টুডিয়ার শরীরের ত্বক এত সুন্দর ও মসৃণ যে অথথা স্নো-পাউডার ব্যবহারের প্রয়োজন তার আদৌ হয় না।

সে খাওয়া-দাওয়ার দিকে খুব নজর দেয়; কারণ তারই উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে দেহ-ত্বকের লাবণ্য। তার দৈনিক খাদ্য-তালিকায় থাকে দুটা ডিম, দুটো বড়ো টমেটো, গোটা-দুই আঙুর, আর কয়েক কাপ চা ও কফি।

• • • •

হলিউডের চিত্র-জগৎ থেকে অভিনয়ের আমন্ত্রণ পেয়েছে ভারতীয় অভিনেতা শশী কাপুর। যে ছবিতে সে অভিনয় করবে তার নাম 'প্রেটি পলী।' ছবির পরিচালক পী গ্রীন। চিত্র-নাট্যটি প'ড়ে শশী কাপুর সন্তোষ প্রকাশ করে। যে চরিত্রে তাকে অভিনয় করতে বলা হয়েছে তা নাকি সত্যি ভারতীয় অভিনেতার পক্ষে উপযোগী। ছবির নায়িকা হেইলী মীলস। ছবির বেশির ভাগ বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে সিঙ্গাপুরের একটি স্টুডিয়োতে।

• • • •

ওয়াহিদা রহমানের মতো সুন্দরী অভিনেত্রী সত্যি-সত্যি কাঁদছে এ যুক্তি কল্পনা করা যায় না। কিন্তু একটি ছায়াছবিতে অভিনয় কালে সত্যি-সত্যি সে কেঁদেছে। ছবির নায়ক মনোজকুমার। ওয়াহিদা চিত্র-পরিচালককে জানায়, চোখের জল দেখাবার জন্য তার গ্লিসারিনের কোনো প্রয়োজন নেই। তাই যদি দরকার হয় তবে আর অভিনয় হলো কোথায়! হাসি-কান্না সব কিছুরই অভিব্যক্তি হবে স্বতঃস্ফূর্ত।

ছায়াবাণী সংবাদ

আগামী দশ বছরে ভারতে আরো পাঁচ হাজার নতুন সিনেমা হল তৈরী হবে। চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত কালে ভারত সরকার ওই প্রেক্ষাগৃহগুলি নির্মাণ করবেন। এর ফলে প্রতি পঞ্চায়েত এলাকাতেই একটি করে সিনেমা হল হবে। তাছাড়া প্রতি পঞ্চায়েতে একটি ক'রে রঙ-মঞ্চ তৈরীর পরিকল্পনাও ভারত সরকারের আছে।

• • •

এস্. এস্. ভাসান ও এন্. এন্. সিপ্পী হাত মিলিয়েছে একটি রঙিন ছবি তৈরী করবার জন্য। প্রযোজক মেহিনী। পরিচালক ভাসান। ছবিতে প্রধান অভিনয় ভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজেন্দ্রকুমার ও ওয়াহিদা রহমান। সুরকার শঙ্কর জয়কিশেন।

• • •

ইরাণে ভারতীয় ছায়াছবি এত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে তার ফলে ইরাণী ছায়াছবির সংকট দেখা দিয়েছে। ইরাণী ছবির মুক্তির জন্য প্রেক্ষাগৃহ পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ ভারতে ইরাণী ছবি একেবারেই প্রদর্শিত হয় না। তাই ওদেশের কর্তৃপক্ষ ইরাণে ভারতীয় ছায়াছবির আমদানী বন্ধ করার কথা ভাবছেন। অবশ্য ভারত ইরাণী ছবি আমদানি শুরু করলে ইরাণে নিশ্চয়ই ভারতীয় চিত্র প্রবেশাধিকার হারাবে না।

• • •

১৯৬৬ সালে কলকাতায় গুপ্তচর কাহিনী মূলক বিদেশী ছায়াচিত্রের যেন ঘুম প'ড়ে গিয়েছিলো। তার ফলে বিপদ দেখা দিয়েছিলো ভারতীয় ছায়াচিত্রের বিশেষ করে 'বাই-নাটাই' সিরিজ ও জেমস্-বণ্ড চিত্র বাজার মাত ক'রে রেখেছিলো। এই ছবিগুলির সব চাইতে বড়ো আকর্ষণ নারীদেহের নগ্নতা। এই ছবিগুলির জন্য অনেক ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হতে পারেনি, প্রেক্ষাগৃহের অভাবে। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কি টাকা রোজগারটাকেই চিরকাল বড়ো ক'রে দেখবেন, ফলাফলের দিকে একবারও তাকাবেন না।

• • •

ভারতীয় চিত্র-জগতে ১৯৬৬ সাল আরেক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এ বছর চিহ্নিত হয়ে থাকবে বিবাহের বৎসর হিসেবে। পক্ষপাতের আঘাতে এবার অনেকেই আহত হয়েছেন। সাধনা হয়েছে মিসেস আর. কে. নায়ার, মিনীপকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সায়রা বানুর, উদীয়মান অভিনেতা সঞ্জয় বিয়ে করেছে আবিদাকে। রাজশ্রী, শর্মিলা ঠাকুর এবং অরু মহেন্দ্রের বিয়ে ঠিকঠাক। চিত্র তারকারা যদি এই ভাবে পাইকারী হারে পর্দা ছেড়ে সংসার ধর্মে মন দেয় তবে স্টুডিয়োর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে না তো!

শীত-পার্বন

হাসি ভট্টাচার্য

হেমন্তবেলার সুবর্ণকিরণ পল্লী বাংলার শ্যামল প্রান্তরকে উদ্ভাসিত করে তুলত যখন শরতের মনোলোভা প্রকৃতি বিদায় নিত।

বর্ষার জলধারায় সেই মাঠ বর্ষণ-সিক্ত হয়ে গ্রাম্য বাংলার আনন্দের রোল পড়ে যেত—'আইল বরষা, চাষার হৈল ভরসা।'

সেই ভরসাকে অবলম্বন করে বর্ষা, হেমন্ত, শীত বাংলার প্রাকৃতিক বৈভবের ছড়াছড়ি। সেদিনের কবি গেয়েছিলেন—'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্' বাংলার মাতৃভূমির এই রূপ ছিল।

এই রূপকে অনুধাবন করতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দরকার হয় না; কেননা, বাংলার মাতৃভূমির এই রূপ খুব বিগত দিনের বিস্মৃত ছবি নয়। আজকের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলা, রেশনভোজী বাঙালী নবান্ন-উৎসব ভুলে গেছে বটে, অঘ্রাণ্টের আর মেলাও বসে না, কিন্তু মাত্র কিছুকাল আগেও পল্লী বাংলার শস্য-শ্যামল রূপকে নিয়ে কত গান, কত কবিতা, কত প্রবন্ধ-পাথাই না রচিত হয়েছে।

"ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমাদেরই এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।"

মেয়েরা যেন আমলী বাংলা প্রকৃতি। পল্লীবাংলার গৃহাঙ্গনের কবিতা এবং গানের কলকাকলি শোনা যেত ধান্যশ্রী মণ্ডিত বঙ্গ-প্রকৃতিতে প্রণতি জানিয়ে।

প্রকৃতি-প্রাণা পল্লী-রমণী আক্ষরিক কবিতা প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন না বটে; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আর উচ্ছ্বাস ওঁদের অন্তরে ছিল। বাংলা মাসে ব্রতের পার্বণে তাই যে সব ছড়া-গান তাদের মধ্যে কাব্যের স্রোতস্বিনী ধারার ক্ষীণ-প্রবাহকে উপলব্ধি করা যায়, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শোভিত আকাশে দু একটি ঝিটি ঝিটি নক্ষত্রের দীপ্তিও নজরে পড়ে।

'ধান এলো ছালা ছালা
তাই তুলতে এত বেলা।
কোথায় রাখি ধানের ছালা
ওই দেখ না ধানের গোলা
গোয়ালে গরু, মরাই-এ ধান
তাতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।'

হেমন্তের পরপরই শীতের প্রারম্ভে কাটা শুরু হয়ে যায়। কর্মব্যস্ত কৃষকদের জীবন। তার সঙ্গে সমৃদ্ধিশালী পল্লী-বাংলার গৃহস্থ পরিবার। এ-ছবির মধ্যে কাদা নেই; কিন্তু চিত্রটি বড় পরিচ্ছন্ন।

'অঘ্রাণমাসে চৌরাণ পুজি
পুজি লক্ষ্মীর পা
যেন হীরায় মুক্তায় ভরে
আমার সকল গা।'

ধান্যশ্রী মণ্ডিত বাংলার পল্লী-অঙ্গনে ব্রতের আল্পনা, তার মাঝে ব্রতীদের কলকণ্ঠ—যে কোন মনকে আকৃষ্ট করে।

তারপর ধান কোটার গান—

'ধান কুটি ধান কুটি
ধান আমাদের লক্ষ্মী-মাটি!'

ঢেঁকির পাড়ে ধান-ভানা হয়—শীতের পড়ন্ত বেলাতেও অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই।

'ওকলা ভরা সরু ধান
ঢেঁকির পাড় আর কি চান
আয়লো তোরা আয়লো সবে,
আয়লো ছুটে আয়।'

শীতকালীন উৎসব সমারোহের সহিত পালিত হয়। ইংরাজদের বড়দিনের পুণ্য উৎসব, ভারতীয়দের শস্য-সংগ্রহ এবং বাঙালীর নবান্নের পর পৌষ-পার্বণ। বাংলার মেয়েরা এই সময় ঘটা করে ব্রত করে। এই ব্রতে শীতকালীন প্রাকৃতিক বৈভব পূজা পায় মেয়েদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে। ব্রতের উপকরণে দেখা যায় শীতকালীন দ্রব্য-সামগ্রী, নূতন আলোচালের গুঁড়ের নাড়ু পাকিয়ে ব্রত

লক্ষ্মীকে আহ্বান জানানো হয়; তাই ব্রতের নাম তুষ বা তুষালী ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই তুষালী দেবীর ব্রত করা হয়। মূলার ফুল, সরিষার ফুল, গাই গরুর গোবর, নূতন আলোচাল, দূর্বা প্রভৃতি শীতকালীন ফুলফসলের ব্রতের উপকরণে ব্যবহৃত হয়। মাঘফুল, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই ব্রতকে আবার টুসু পূজা বলে।

টুসু হচ্ছে ধান-লক্ষ্মী। টুসুকে কল্পনাদেহে সারা পৌষমাস প্রতিপালন করা হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন স্থানীয় নদী কিংবা জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়। টুসু ভাসিয়ে গ্রামীণ মেয়েরা ব্রতের ছড়া বলে—

টুসালু গো যাই আমরা গাঙ সিনানে যাই
হাতে গো, কাঁখে গো টুসালু ভাসাই।

গ্রাম্য মেয়ের মাতৃত্বের ছবি অলংকৃত হয়ে ওঠে ব্রতের ছড়ায়—'হাতে গো, কাঁখে গো, টুসালু ভাসাই।' টুসু যেন ঘরের আদুরে মেয়ে। টুসু ধানের ব্রত ছড়ায় সেই ছবিই ফুটে ওঠে।

'টুসু সিনাছেন, গা ধোয়াছেন,
হাতে তেলের বাটি,
মনে মনে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাঠি।'

বাংলাদেশে তুষ বা তুষালী ব্রতে কামনা করা হয়—

"তুষ তুষালী কাঁখে ছাতি।
বাপ যায় বন বাটি বাটি।
স্বামীর ধন নিজ পতি।
পুত্রের ধন পরিপাটি।"

ব্রতীরা আরও কামনা করে— "নেত ধুতি, নেত পতি, নেতেরে করি বাস
ঘৃত দিয়া করি মোরা সুখে স্বর্গবাস।"

পৌষ-পার্বণের পিঠা পায়েসের কথাও এই ব্রতের ছড়ায় শোনা যায়।

ব্রত শেষে উৎসবের গর্ব— "তুষ তুষালী যাই
তোমারে পূজিয়া মোরা
পিঠা পায়েস খাই।"

আগেই বলেছি তুষ তুষালী ব্রত হচ্ছে লক্ষ্মী পূজা। লক্ষ্মীদেবীর ব্রত করে বাংলার মেয়ে তাই কামনা করে— "ঘর করবো নগরে
বসবো গিয়ে সাগরে
জন্মাব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে।"

সারা পৌষ মাস ধরে বাংলার ঘরে ঘরে তুষ তুষালী দেবীর ব্রত করা হয়। ছড়ায়, গানে, আল্পনার চিত্র-রেখায় পৌষ উৎসব বাংলার মেয়েলি সমাজে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

বাংলার অন্তঃপুরচারিকার জীবনে আশা আকাঙ্ক্ষা ব্রত কামনায় মুখর হয়। তুষ-তুষালী

বাংলার গৃহলক্ষ্মী, বাংলার নারী-মন তাই ক্ষুধ-কুষাণী দেবীর কাছে আদর্শ ঘর-সংসারেরই কামনা করে থাকে। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ব্রত উদ্‌যাপন করে পিঠা পায়েসের ভূরী ভোজনে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে সন্তুষ্ট করে ক্ষুধ-কুষাণী দেবীর ব্রত-মাহাত্ম্য কীর্তন করে বাংলার ব্রতী—

ক্ষুধ-কুষাণী মাই
তোমারে পুজিয়া মাগো এই বর পাই।
অনন্ত শুক্ল বাস চাই,
ধন সাগরে মা চাই॥
সভা-আলো জামাই চাই।
সভা-পণ্ডিত ভাই চাই॥
ঘরবার পোতা পুত্র পাবো।
রূপ কৌটা কন্যা পাবো
সিঁথের সিঁদুর, মুখে পান।
হাতের নোয়া অক্ষয়-বরদান॥

সোনার বাংলার এই চিত্র বাস্তবে আজ ম্রিয়মান। কৃষি প্রধান দেশে হা-অন্নের হাহাকার রব। তবু মেয়েদের লোক সংস্কৃতিতে ধান্যশ্রী শোভিত সমৃদ্ধিশালী বাংলা দেশের অখণ্ড রূপটি এখনো প্রোজ্জ্বল।

শীতের দিনে রান্নাবান্না

বেলা দে

মানব সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীনকাল থেকেই রান্নার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। রন্ধন সভ্যতার একটি অঙ্গ এবং কলাবিদ্যার অন্তর্গত। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষেরই আহার্যবস্তু একই ধরণের ছিল। ভাত, মাছ, দুধকারী দুধ ছিল বাঙালীর প্রধান খাদ্য—তবে সেদিন শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক বাংলাদেশে খালে বিলে প্রচুর মাছ, ক্ষেতে ছিল তেমনি শস্যাদি ও শাক-সব্জি, ঘরে পোষা হাঁস মুরগী, পালিত গাভীর দুধ, পুকুরের তাজা মাছ আর সেই সঙ্গে বাংলার রান্নাও ছিল সাদাসিদে সহজ রকমের। এমন কি পরবর্তী যুগে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাংলাদেশের মেয়েদের রন্ধন কথা সম্পর্কে অনেক গান বা ছড়াও লিখে গেছেন। এই সময়কার মঙ্গলকাব্যগুলিতে ও ধর্ম মহাত্ম্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

তখনকার আচার রীতি নীতির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ খুল্লনার রন্ধনের বিবরণে লিখছেন—

বাইগুন কুমড়া কড়া
কাঁচকলা দিয়া পাড়,
বেসার পিঠালী বহু কাঠি।
ঘৃতে সম্ভোলিল তবি
হিঙু জিরা দিয়া মেথি
তক্তা রন্ধন পরিপাটি।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি
মৈটা আকে মূলবড়ি
চিংড়ি কাঁঠাল বীচি দিয়া।
ভাজে চিতলের কোল
রোহিতের বৎস ঝোল
মানবড়ি মরিচে ভূষিত।
রাঁধিল পাবদ মাথ
দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর বাটে আল করি ভাটি॥
কলাকড়া মূগ মাউলি
ক্ষীর মোন্‌সা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রাঁধে অবশেষে।

এ বর্ণনার সঙ্গে শুধু প্রাচুর্য নয়, সহজ রন্ধন প্রণালীরও প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার সন্তান-সম্ভবা খুল্লনার জন্য লহনা রান্না করলেন—"ভিজ পলতার শাক কলতা পলতা আর
মটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে
মুহরী শুলফা বড়া ক্ষীরপাই বেতে।"

আবার ভোজন বিলাস যে সেকালের অন্যতম বিলাস ছিল, তার প্রমাণ কবি বিজয়গুপ্ত, বংশীবদন, মুকুন্দরাম প্রভৃতির কাব্যে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায়—

"স্নান করিল গিয়া বণিক সুন্দরী
রন্ধন করিতে যায় অতি তাড়াতাড়ি
... ...
অনেকদিন পরে রান্ধে মনের হরিষ
ষোলো ব্যঞ্জন রান্ধিল নিরামিষ।

প্রথমে পুজিল অগ্নি দিয়া ঘৃত ধূপ।
নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুসুরীর সুপ।
কলায় খোর রাঁধিতে বাটিয়া দিল রাই।
সরিষাবাটা দিয়া রান্ধে পালী কচুর টক
মরিচের ঝাল দিয়া রাঁধে বটবটি।
পাকাকলা গেরু রসে রাঁধিল অথল।

বিয়াষিষ রান্নার পর আমিষের দীর্ঘ বর্ণনা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

"রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে পলতার আগ
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে শিঙ্গ পাচ পাচ
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল,
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।'

শুধু রন্ধনশৈলীর কথা নয় ছোট্ট পল্লীর একটি সাধারণ কৃষকের বউ পৌষমাসে পিঠা তৈরী করতে বসে ছড়া কাটছে—

করে হাতে গো তেল আমলা
সবার হাতে হাতে দিও।
ঘি দিয়া আমরা পকান্ন
লক্ষ ধানে ভোল ভরে কালো পুতে
কোল ভরে।
রসুন কাঠে রেঁধে খায়
আড়ি যাপে কড়ি পায়
বুড়ো শোয়ামী ঘরের মধ্যে বসে
নাতবৌ কথা কয় বিরসে।'

'মলুয়া'র কাহিনীর সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত আছেন। তারই একটি জায়গা উদ্ধৃত করছি। সন্ধ্যাবেলায় জিন্ দেশীয় অতিথি এসেছে। হীরাধর মোড়লের বাড়ীর পাঁচ বৌ রান্নাঘরে গিয়ে খুব ঘটা করে রাঁধতে বসেছে। তারা 'পরম রাঁধুনী', এমন নিপুণ বৌ হয় একটা দেখা যায় না। তারা মানকচু ভাজা, চালতার অথল, কৈ মাছের চড়চড়ি ও নানারকম মাছের ব্যঞ্জন কালোজিরার সম্ভার দিয়ে ভালো করে রেঁধেছে। এমনি করে তারা ছত্রিশ ব্যঞ্জন রান্না করল।

"পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ
পিঁড়াতে বসা যায়।
এমন ভোজন বিনোদ জন্মে না সে খায়।
শুকতা খাইল, বেগুন খাইল,
আর ভাজা বড়া।

পুলি পিঠা খাইল বিনোদ
দুধের সিহার ভরা।
পাত পিঠা, বরা পিঠা, চিতই চন্দ্রপুলি,
মালপোয়া খাইল কত রসে চলি চলি।'

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দু'জন বাঙালী কবি বড় বড় সংস্কৃত কাব্য লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর। এঁর বাড়ী ছিল কাঞ্চনপল্লী বা বর্তমানের কাঁচড়াপাড়ায়। তাঁর কাব্যে শাক, ভাজা, তরকারী, ডাল, অম্বল ছাড়াও নানারকম পিষ্টক বা পিঠার এবং পায়েসের বর্ণনাও পাওয়া যায়। পিঠার নামগুলি কিন্তু বড় সুন্দর, যেমন হংসকেলি, শোভারিকা, বেরী, ললিতা, চন্দ্রকান্তি ইত্যাদি। 'চিত্রা' নামে একটী পিঠা তৈরীর প্রণালীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর রচনায়। দুধের সঙ্গে ভাজা তিল, চালের গুঁড়ো ও নারকেল দিয়ে পুর তৈরী হল তারপর একটি গরম জলপূর্ণ ঘটের মুখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হল ঐ কাপড়ের ভেতর দিয়ে ঘটের মুখ যে বাষ্প উঠছে তাতে পুরগুলি মিনিট দশ ঢেকে দেওয়া হল। ঐ পুরগুলি শক্ত হলে ঘন করে জাল দেওয়া দুধে ছেড়ে দিলে 'চিত্রান্ন' পিঠা প্রস্তুত হলো। তাছাড়া বাংলা দেশে শীতকালে নানা রকমের পিঠা তৈরীর রীতি আছে। দেখতে পাওয়া যায় যেমন, পাটিসাপটা, ধেনো পিঠা, মুলার খোলাচি, গোল-আলুর সুধাপিঠা, চালের ঝাঁকপিঠা, লাল আলুর পিঠা, গোকুলপিঠা, রসনারঞ্জন, চিড়ার পিঠা, লক্ষচাকুলি, ভাজাপুলি, দুধে আওটানো পুলি, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এতো গেল পুরনো দিনের কথা—কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানুষের আচার ব্যবহার রুচি সবই বদ্‌লে যাচ্ছে, তেমনি খাবারদাবারে রুচিও কম পাল্টায়নি। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে 'সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই'। এখন আমাদের মনে করলেই সব জিনিস আসবে না; তাই রুচির পরিবর্তন হলেও অল্পখরচের রান্নাই আজকের দিনে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যেমন গমজাতীয় খাবার, গমের রালুয়া, গমের পায়েস, ব্যাসনের লাড়ু, মালিয়ার খিচুড়ি, বাজরা ও ভুট্টার খাবার, মাইসোর পায়েস, সমাবিনের মিষ্টি ইত্যাদি আজকাল অধিকাংশ বাড়ীতেই তৈরী করছেন। চালের বদলে এখন শাক-সবজি, আলু মাছ মাংস এগুলোই খাওয়া হচ্ছে বেশী। তা ছাড়া স্যাণ্ডউইচ, নানারকম সুপ এগুলোও পরিপূরক খাদ্য হিসাবে নেওয়া হচ্ছে।

শীতের দিনেও কিন্তু আধুনিককালের মা বোনেরা নানারকম পিঠে পুলি ও পায়েস করে থাকেন। যেমন, আলুর সেঁকা পিঠে। আলু সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে লঙ্কার গুঁড়ো, কালোজিরে আদাবাটা নুন একটু বেসন দিয়ে চটকে নিতে হবে। তারপর গোল গোল করে গড়ে নিয়ে ব্যাসনে ডুবিয়ে, চাটুতে অল্প ঘি মাখিয়ে সেঁকে নিলেই হবে।

আটার মালপোয়া :—আটা দুধে ভিজিয়ে রাখবেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ সঙ্গে মৌরী, গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে কেটিয়ে নিয়ে ঘিয়ে ভেজে গুড় বা চিনির রসে ফেলবেন।

পুরণ-পুলি :—ছোলা, অড়হর ও মুগের ডাল এবং কাঁচকলা ও লাল আলু দিয়ে পুরণপুলি করতে হয়। এক কিলো ছোলার ডাল সেদ্ধ করে নিতে হবে। ঐ সঙ্গে এক কিলো গুড় বা চিনি মিশিয়ে দিন। একটু পরে নামিয়ে উপরে ছোট এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে একটি পাত্রে ঘি মাখিয়ে ঐ ডাল সমেত থালাটি ঢেলে সমান করে নিয়ে বরফির আকারে কেটে নেবেন।

কমলালেবুর পিঠে :—সিকি কিলো অথবা চারের চামচের ছ'চামচ সর, ১২৫গ্রাম চিনি কয়েকটী কমলালেবুর দানা ঘরে রাখুন। এইগুলো সব একসঙ্গে বেটে নেবেন। বাটার পর তাতে ১২৫ গ্রাম ময়দা মিশিয়ে রেখে দিন। এদিকে ১২৫ গ্রাম চিনির রসে লেবুর খোসা পাক করে নিন। সমস্ত জিনিস একসঙ্গে করে একটি কানা উঁচু বাসনে সমান করে সাজিয়ে উপরে একটু চিনি ছড়িয়ে দিয়ে এই পাত্রটি কাঠকয়লা বা টিনের আগুনে কিছুক্ষণ তাতিয়ে নিয়ে পছন্দমত চৌকো করে কেটে নেবেন।

শীতের দিনে কমলালেবুর পায়েস, আমুর পায়েস, আউয়ের পায়েস, নলেন গুড়ের পায়েস, দুধের পায়েস, দাল আলুর পায়েস এ প্রায় সকল রাজ্যেতেই প্রস্তুত করার রীতি আছে।

কি দেশকালে, কি একালে রান্নাবান্নার ব্যবস্থার জন্য আমাদের বাংলা দেশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করে এসেছে। তাই আজকের বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থায়ও বাংলার মেয়েরা পিছিয়ে নেই। রাশনে তাঁরা যা পান তাই দিয়েই আত্মীয় পরিজনকে তৃপ্তি দেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই কামনা করি।

শীতের অঙ্গরাগ

স্নেহপ্রভা মল্লিক

শীতের দিনের হাওয়ায় শিরশিরে ভাব। 'খুব করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা'—তা হচ্ছে শীত। কিন্তু এই রিক্ততাই শুধু শীতের রূপ নয়। পৌষের ডাকে ভরা ভরা পাকাফসল। কৃষি বাংলার বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে হাওয়ায় নেশায় মেতে ওঠে। পৌষের সোনারোদটির আঁচলে নবান্নের গানে গৃহাঙ্গন মুখর।

শীত বাংলাদেশের মেয়ের মনে কাছে 'অমৃত-অন্ন-ভোগ-বস্ত্র।' প্রাণের উৎসবে ভরা শীত-ঋতু। কৃষি বাংলার মাঠ থেকে গৃহস্থের ঘরেও শীতের রূপে এই ভাঙা-গড়ার খেলা 'পাতা-ঝরা আর নতুন করার' রূপ।

পুরানো সাজ ফেলে দিয়ে নতুন সাজের আয়োজন। নতুন লক্ষ্মী সন্তার জামাই-বাড়ি শীতের তত্ত্ব, নতুন রান্নায় নব-ব্যঞ্জনে আত্মীয় পরিজনদের পরিতুষ্ট করা,—রূপ চর্চায় দেহের রুক্ষতাকে মুছে ফেলা—শীতের এই আয়োজন মেয়েদের কাছে বিশেষ বরণীয়। শীতের পাকা ফসল গ্রাম-বাংলার পল্লী অঞ্চল থেকে শহরের ঘরে ঘরেও উৎসবের মেলা বসায়।

প্রকৃতি যেমন ঋতুতে ঋতুতে সাজ পাল্টায়, রূপ বদলায়—প্রকৃতিগত মানসিকতায় মেয়েরাও তেমনি ঋতু অনুযায়ী তাদের সাজ-পোষাকের সঙ্গে রূপ-প্রসাধনেও ভিন্ন রীতিকে গ্রহণ করে। গ্রীষ্মে ঘর্মসিক্ততাকে রোধ করতে যে প্রসাধন—তার বিপরীত শীতে। ধারা-স্নানের আনন্দ শীতে নেই বরঞ্চ উত্তাপের আনন্দ শীতে।

আমাদের দেশ গ্রীষ্ম প্রধান। যাঁদের বিশেষ শীত ছুঁই ছুঁই করে, মাসখানেক তাঁর ঝাপট খুবই বেশি। এই শীতের আক্রমণে শুষ্কতায় হাওয়া, গা-হাত-পা-মুখ ফাটেই, দেহ কক্ষতা লাভ করে। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্রসাধনে প্রতিষেধক অঙ্গরাগ ব্যবহারের রীতি অধুনা আমরা শীত-প্রধান দেশ পাশ্চাত্য দেশের কাছ থেকেই শিখেছি। শীতে দেহত্বক পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যেও শুষ্কতাকে দূর করবার জন্যে এদেশে আমরা সাবানের সঙ্গে নানারকম ক্রীম ব্যবহার করি। শীতকালের ব্যবহার সাবানও আলাদা। গ্লিসারিন জাতীয় তৈলাক্ত সাবানই শীতকালের ব্যবহার-উপযোগী। মুখের জন্যে ভেসলীন, ক্রীম, লোশন। এতে ত্বক মসৃণ থাকে, শীতের আক্রমণ থেকেও ত্বক রক্ষা পায়।

আগেকার দিনের মেয়েরা ভালো ঘি দিয়ে বেশ করে ফেটিয়ে তাতে একটু আতর দিয়ে গায়ে মলায়, ঘরে প্রবেশ করতেন। বর্তমানের ক্রিমের তা ছিল রূপান্তর।

রূপ-সজ্জা বা অঙ্গরাগ আগেও ছিল। তবে তা প্রাকৃতিক নিয়মকেই বেশি করে মেনে চলতো। পল্লীর ঘরে ঘরে গো-পালা। অপরিমাণ দুধ, ঘি, মাখন, ছানা। তাতে খাওয়া-দাওয়ার তো কথাই নেই, তাছাড়াও অতিরিক্ত দুগ্ধজাত সামগ্রী দিয়ে মেয়েদের অঙ্গরাগ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেহ-কান্তি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যৌবন—তার সঙ্গে সাবানে পরিচ্ছন্ন বেশভূষা। তাইতেই সেকালের কন্যা বধূ এবং গৃহিনীর যেরূপ শোভা তা সংসারের শ্রী, কল্যাণ এবং সৌন্দর্য।

আজ নগরকেন্দ্রিক জীবন যাত্রার রাষ্ট্র এবং সমাজের বিবর্তনবাদে পল্লী বাংলার মেয়েদের সে স্বাভাবিক রূপটাকে আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বভাবগত এবং প্রকৃতির দেওয়া রূপকে নিয়ে অঙ্গরাগে মেয়েদের এখন কৃত্রিমতার দিকেই ঝুঁকে পড়তে হয়। তারই মধ্যে শীতকালে কিভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে ত্বক পরিচ্ছন্ন রাখা যায় তারই একটু আলোচনা করা যাক।

শীতে দেহের ত্বক বেশ ফাটে। সেইজন্যে সেই ত্বককে ফাটার হাত থেকে বাঁচাতে হলে দুধের সর অথবা এক চামচ করে যদি দুধ রোজ মাখা যায় তাহলে কিছুদিন পর দেখা যাবে মুখের ত্বক বেশ মোলায়েম হয়ে গেছে। এবং চকচকে ভাবও মুখের ত্বকে প্রকাশ পাচ্ছে। শীত আসার আগে থেকে করতে পারলে শীতের সময় আর মুখ ফাটার ও খসখসে ত্বক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। শীতের দিনে উপযুক্ত পরিমাণে গায়ে সরিষার তৈল মেখে তবে স্নান করা দরকার। বেশ কিছুক্ষণ গায়ে তেলটিকে ঘসে ঘসে মাখা উচিত। ঘসে ঘসে তেল মাখলে লোমকূপ বেশ সতেজ হয়ে ওঠে এবং কোন প্রকার ময়লা জমলে গা মাজার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি উঠে যায়। এর ফলে ত্বক হয় পরিষ্কার মসৃণ। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হয়। মুখে যখন সর বা দুধ মাখবেন তখন বেশ ঘসে ঘসে বসাবেন। ঘসে ঘসে সর দুধ বা তেল মাখায় একটি মস্ত উপকার হল মুখের বা দেহের রক্ত সঞ্চালন হয়। দেহের বা মুখের পেশীগুলি সতেজ হয়ে ওঠে। এর ফলে দেহ শ্রীবৃদ্ধি পায় এবং মুখ সুষমামণ্ডিত হয়। সর বা দুধের সঙ্গে যদি সামান্য একটু কাঁচা হলুদ বেটে মাখা যায় তাহলে মুখের উজ্জ্বল ভাবটি আরও ফুটে ওঠে। সরিষার তেল অথবা নারিকেল তেলের সঙ্গে পরিমাণ মত কাঁচা হলুদ বেটে ঐ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর তা ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা করে প্রতিদিন মাখলে দেখা যাবে গায়ের রংটি বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আর গায়ে কোন চুলকানি, ঘুসঘুড়িও বেরুবে না। পরিমাণ মত তেল হলুদ ফুটিয়ে নিয়ে গায়ে মেখে স্নানের সময় গামছা দিয়ে গা ঘসে ফেললে হলুদ আপনা হতেই উঠে যাবে। সাবান মাখবার প্রয়োজন হবে না। সরিষার তেলের বদলে যদি

নারিকেল তেল ব্যবহার করা যায় তাহলে ত্বক বেশ নরম থাকে। অনেকের শরীরে সরিষার তেল ঠিক কাজ করে না। তেলমাখা সত্ত্বেও গা ফাটে, গা খস খস্ করে। তখন যদি নারিকেল তেল ব্যবহার করা যায় তাহলে তা হবে না, সুন্দর নরম থাকবে। শরীর বেশ স্নিগ্ধ থাকবে শীতকালে সাবান না মেখে স্নানের আগে বেশ করে তেল মেখে যদি দু'তিনদিন অন্তর একটু ব্যাসন বা দুধ জলে গুলে গায়ে মেখে স্নান করা যায় তাহলে দেখা যাবে সমস্ত দেহে এক অপূর্ব লাবণ্য ফুটে উঠেছে। শীতকালে বেশি সাবান ব্যবহার না করাই ভালো।

অল্প দুধের সঙ্গে ময়দা মিশিয়ে গায়ে মাখুন না কেন! দুধ মেশানো ময়দা গায়ে একটু শুকুক তারপর হাতের চেটোতে সরিষার তেল নিয়ে ঐ দুধ ময়দা মাখা গায়ে ঘোসলে দেখা যাবে ময়লাটা উঠে আসছে গায়ের যত ময়লা নিয়ে। মুখে এইভাবে প্রত্যহ সরময়দা মাখতে পারলে কোন কিছু আর মাখার প্রয়োজন হবে না। দুধ ময়দা মাখার বিশেষ একটা গুণ হল মুখও গায়ের ত্বককে কোমল ও চকচকে করে তোলা। আগেকার দিনে মিহিরা ঠাকুমারা খোস ব্যবহার করতেন। এখনও খোঁজ করলে খোস পাওয়া যায় বাজারে। ঐ খোসকে বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে গায়ে মুখে মাখলে গা পরিষ্কার তো হবেই উপরন্তু তার মধ্যে তৈলাক্ত জিনিস থাকায় অন্য তেল মাখার প্রয়োজন হবে না। তবে খোস মাখার আগে তেল মাখাও চলে। শীতকালে অনেকের পায়ের গোড়ালি ফাটে। শীত আসার আগে থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। স্নানের সময় বেশী করে নারিকেল তেল মেখে নেওয়া দরকার ও রাত্রে শোবার আগে গোড়ালিতে গ্লিসারিন দিয়ে ডলে ফাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। নারিকেল তেল দিলে গোড়ালি নরম থাকবে, ফাটবে না। মাঝে মাঝে খামা দিয়ে পা ঘসে পরিষ্কার করে নেওয়া খুব দরকার।

একালে এত সব ঝঞ্ঝাট কে পোহায় বলুন! ঘি, দুধ, সর, মাখন,—এমন কি সরষের তেল এসব তো দুষ্প্রাপ্য। শহরে কেন, গ্রামেও আজ আর গোশালা নেই, মাঠা নেই, তেলের ঘানি নেই তা হলে আসুন আধুনিক কালের রূপ প্রসাধনের রীতি-নীতির সঙ্গে আগেকার দিনের যেটুকু পাওয়া যায় তাই নিয়েই শীতের হাওয়ার শুষ্কতার আক্রমণ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করি। অলিভঅয়েল, গ্লিসারিন, ক্রিম্, তৈলাক্ত সাবান, তেলসিন,—এ-সব প্রসাধন সামগ্রী আজ আমাদের দেশেও তৈরী হচ্ছে। তাই দিয়ে শীতের অনুরাগ সম্পন্ন করে আমরা বলি না কেন,—'শীতের হাওয়ায় আসল নাচন।'

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

লণ্ডনে আবার 'বিসার হাটিং' সুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে সন্ত লণ্ডন-ফেরৎ বিজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যের মুখে এই সম্পর্কে নানা কাহিনী শুনলাম। বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে উচ্চতর পাঠের জন্য শ্রীভট্টাচার্য দু'বছর বিলাতে ছিলেন। এদেশের সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা সমর্থন করে শ্রীভট্টাচার্য বললেন, প্রকাশ যা পেয়েছে তা সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার আরও ভয়ঙ্কর। লণ্ডন ও সহরতলীর কয়েকটা অঞ্চলে বিশেষ করে হ্যাম্পস্টেড এলাকায় ভারতীয়, পাকিস্তানি, সিংহলী এবং পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের ছাত্র ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত নরনারীর প্রতি লণ্ডনের গুণ্ডারা অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে অবাধে, এই সব গুণ্ডারা প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী জীব। সব দেশেই এদের সমগোত্রীয় মানুষ আছে—বিশেষ করে ছোকরাদের মধ্যেই এদের বেশী করে দেখা যায়। চ্যাংড়া, বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো বিকর্মা সন্তানের দল এইভাবে নিরীহ বিদেশীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সাংবাদিক সুব্বয় কাবাডি লিখেছেন, ভারতীয় মেয়েরা পর্যন্ত এই সব কালা-আদমি-শিকারীদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন। লণ্ডনে অধ্যয়নরতা পাঠরতা একটি ভারতীয় ছাত্রী অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তাঁকে জানিয়েছেন যে একদিন পথে এক দুর্বৃত্ত তাঁকে 'আটক করে তাঁর কাছ থেকে হ্যাণ্ডব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিবেশক মোটরে করে যাচ্ছিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁর মোটর আটক করে তাঁকে মারধর করা হয় এবং বলা হয়, কালা আদমি, এ দেশ থেকে দূর হও।

এইভাবে সিংহলী, পাকিস্তানি এবং পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জবাসীরাও লণ্ডনের পথে গুণ্ডাদের দ্বারা নিগ্রহ ভোগ করছেন।

এবিষয়ে সেখানকার মন্ত্রীসভায় আবেদন করা হয়েছে। ঘটনাও ইয়ার্ডও তৎপর হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। মানব অধিকার সমিতি নামে সেখানে যে প্রতিষ্ঠান আছে তার সভ্যরাও এবিষয়ে যথাসাধ্য প্রতিকারের আশ্বাস দিয়েছেন এবং যাঁরা নিগৃহীত হয়েছেন তাঁদের জন্য সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু ওই সব কুখ্যাত গুণ্ডাদের পুলিশ কর্তারা ব্যাপারটাকে যেন তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছেন না এবং তাঁদের দায়িত্বকেও এড়িয়ে যেতে চাইছেন, তাঁরা বলছেন, কী করব, আমাদের পুলিশ বাহিনীতে এত লোক নেই যে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রত্যেক রাস্তায় আমরা পুলিশ মোতায়েন রাখতে পারি। লণ্ডনে শীতকালে বেলা তিনটার পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আর সেই সময়েই

দুর্ভিক্ষ নামাস্থানে তাদের কারবার চালায়। তারা এত অন্তরালে ছড়িয়ে থাকে যে তাদের নাগাল পাওয়া মুস্কিল হয়।

সত্যেনের পুলিশ কর্তাদের কথা শুনে তাজ্জব বোধ করছি। তারা আত্মবিদের কথার অত বোধ করি তাদের তেমন মাথা ব্যথা নেই।

• • •

তেজালে সকলের রাজা তেল রাজা। রাজস্থান। লাখো লোককে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে যে রাজা সেই রাজস্থান! সে রাজ্যের অনেক মহাপুরুষকে আমরা দেখছি ও তাঁদের মহিমা উপলব্ধি করছি! তেজালের রাজা হিসাবেও তাঁরা যে অগ্রগণ্য হবেন তাতে আর বিচিত্র কি! এ আপনার আমার কথা নয়—খাস সরকারী পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে (মাঝেমাঝের খবর) সমস্ত রাজ্যের মধ্যে খাদ্যে তেজাল দানের ঘটনা রাজস্থানেই বেশী। শতকরা একটি তেজালের ঘটনা ধরা পড়েছে। ১৯৬৬ সালের মার্চ থেকে আগষ্টের শেষ নাগাদ এই রাজ্যে মোট ১০৬৯টি ঘটনা ধরা হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় এরমধ্যে ৫৬৯টিতে তেজাল আছে। রাজস্থানের পরে মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ। এই দুটি রাজ্যে তেজালের অনুপাত যথাক্রমে ৪৯ ও ৪৩ শতাংশ। বারোটি রাজ্যে প্রায় ১লক্ষ ৩০ হাজার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে ৪৮ হাজার নমুনা তেজাল প্রমাণিত হয়েছে। সরকার মামলা করে এইসব ঘটনা থেকে অতিমানা আদায় করেছেন ২৩ লক্ষ টাকা। ১৫০০ ব্যক্তির শ্রীঘর লাভ হয়েছে। এখনো ১০ হাজার মামলা বিচারাধীন।

যাকে বলে এলাহি কাণ্ড! পরশুরামের সেই শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিঃ বাইশাক্রিয়ার সত্যেনিয়াকে আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই। রক্তবীজের মত তাঁর বংশ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—বিশেষ করে এই হতভাগ্য ভূখণ্ডে বাঙলা দেশে।

• • •

সারা দেশ জুড়ে নির্বাচনের ঢোল বাজছে। দিকে দিকে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই। অনেকে এই ভাঙে দেশ দু'পয়সা করে নিচ্ছে! এই নির্বাচন উপলক্ষে রঙ তামাসাও কম হচ্ছে না। এর মধ্যে অনেক মধু আছে নিশ্চয়। নইলে বাপবেটায় মনান্তর, দুলক্ষ দুই ভিন্ন গোয়ালে ঢুকে তাল ঠুকছে, ভাই ভাইএর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এমন কী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারকৎ হয়ে যাচ্ছে! আর সে স্বামী-স্ত্রী সাধারণ ঘরের নয়, রাজা রাজড়ার ঘরের। এক রাজা দাঁড়িয়েছেন তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। পরগাছের রাজা বীরেন্দ্র বাহাদুর সিং আর রাণী পদ্মাবতী। কংগ্রেস নির্বাচনী পরিষদ মধ্যপ্রদেশ থেকে লোকসভায় রাণী পদ্মাবতীকে মনোনয়ন দিয়েছেন। রাজা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি গত দশ বৎসর রাজনন্দগাঁও থেকে বিধান সভায় কংগ্রেসীরূপে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এবার লোকসভায় নির্বাচনপ্রার্থী। আর তাঁর আবেদন বাতিল করে তাঁর রাণীকে মনোনয়ন দিলেন কংগ্রেস। রাজা রাণীর মধ্যে অবশ্য অনেকদিন আগেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে যদিও আইনত নয়। দু'জন আলাদা থাকেন। রাণীও কম যান না, তিনি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের মধ্যে আছেন। এই কলহ নিয়ে কামরাজ অবধি মধ্যস্থতা করেছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। অতএব রাজার সঙ্গে রাণীর নির্বাচনী সংগ্রাম।

আর একটি মজার খবর এক বাড়িওলা হঠযোগী সাধুকে নিয়ে। পাঠকদের মনে আছে বোধকরি গত বছর জুন মাসে আমরা এক হঠযোগীর জলের ওপর দিয়ে হাঁটার ভেল্কির কথা

জানিয়েছিলাম। সেই সাধু তো জলে পড়ে কেলেঙ্কারী করলেন। লাখ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল সাধুর সেই খেলা দেখবার জন্যে। তারপর সেই সাধুবাবার আর কোন খবর ছিল না। হঠাৎ জানা গেল হঠযোগী কে. এস. রাও (সেই সাধুটি) বোম্বাই-এর এক কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচনপ্রার্থী। সাধুর হঠাৎ রাজনীতিতে ঢোকবার সখ হল কেন, কে জানে। যাইহোক তিনি দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর প্রতীক চিহ্ন হিসাবে বোতল পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন অফিসার তাঁকে বলেন, বোতল চলবে না। আপনি সিংহ, ঘোড়া অথবা সূর্যের প্রতীক নিতে পারেন। হঠযোগী বলেন, বেশ আমি সিংহকেই নিলাম। সিংহ যখন গর্জন করবে তখন ভোড়া বন্দ মূর্ছা যাবে। হঠযোগীকে জিগেস করা হয় যে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তো তলিয়েছিলেন, নির্বাচন সমুদ্র পার হতে পারবেন কি? উত্তরে হঠযোগী বলেছেন, সেবার পারিনি, কিন্তু এবার? এবার দেখবেন সবাই, একশোর মধ্যে একশো ভোটই আমিই পাব।

হঠযোগীর আর এক খেল্!

• • •

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে কলকাতার মাঠে ভারতীয়দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে যেভাবে ঠেঙানি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে নাভিশ্বাস টানতে লাগল তা দেখে অনেক ক্রীড়ামোদী চিন্তিত হয়েছেন এবং নানা তথ্য অনুসন্ধানের পর তাঁরা অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ এনেছেন।

এই ধরণের জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে জড়িত যে প্রতিযোগিতা তার জন্যে সকল দেশেই জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁদের আচার আচরণ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের যাতে খাওয়াদাওয়া না ঘটে, মানসিক ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়, দলের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে সেজন্যে প্রতিদেশেই ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেন।

কলকাতায় ভারতীয় দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রকাশ্যেই সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। তারা যেখানে মদ্যপান করেছে, নানা অজ্ঞানে ঘুরেছে এবং রাত বারোটা একটায় হোটেলে ফিরেছে। ভারতীয় বোর্ড থেকে নিয়ম করা হয়েছিল যে খেলোয়াড়রা অবশ্যই রাত ন'টার মধ্যে হোটেলে ফিরবে এবং কোন রকম জলীয় আসবে অংশ গ্রহণ করবে না। কিন্তু শোনা গেছে, তারা শুধু যোগদানই করেনি রীতিমতো সাঁতার কেটেছে। খেলোয়াড়রা যাতে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে তার জন্যে বোর্ডের পক্ষ থেকে একদিকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল তারাও তাদের কর্তব্য পালন করেনি, এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। এখন বোর্ডের এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করা উচিত এই দাবী জোরদার হয়েছে। দেখা যাক কর্তৃপক্ষ কী পথ গ্রহণ করেন। এই সফরের জন্যে ভারত সরকার দেশের বর্তমান আর্থিক সংকট সত্ত্বেও মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেছেন। খেলোয়াড়দের তুষ্টি করবার সুযোগ দেবার জন্যে তাঁরা নিশ্চয়ই এতটাকা মঞ্জুর করেননি।

আরও একটা ব্যাপার যা সকলেই লক্ষ্য করেছেন তা হচ্ছে—আমাদের দেশে ইয়ার্কিং খেলার মাঠে প্রজাপতির দল এমনভাবে পাখা মেলেছে যে অনেক খেলোয়াড়ই সেই পাখার আড়ালে গিয়ে বুঁদ হয়ে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে আছে সিনেমা প্রডিউসারদের চোখ। সোহাগের সঙ্গে সোনা :

তার লোভ অনেকেই কাটাতে পারছেন না। ইতিপূর্বে সেদিন দুয়ারি আর অরুণীমা সিনেমার নামবার জন্যে ঝুলোঝুলি করেছেন। তুনী গোস্বামী তো ইতিমধ্যে রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এখন শোনা যাচ্ছে, পতৌদির নবাব ছবির পরদায় নায়করূপে নীরুই দেখা দেবেন। কলকাতার একজন প্রযোজক-পরিচালক ক্রিকেট খেলার পটভূমিকায় একটি ছবি তৈরী করবার পরিকল্পনা করেছেন এবং পতৌদিকে তার নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তাব করেছেন। ছবির নাম হবে—মহব্বৎ পহেলি ঝলক যে, অর্থাৎ পলকে প্রণয়, প্রথম দেখাতেই প্রেম। গল্পে আছে একজন ক্রিকেট বীর এক নর্তকীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। ছবির শুটিং হবে বেশীর ভাগ ইংলণ্ডের লর্ডস ও ওভাল-এর ক্রিকেট মাঠে। পতৌদিকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ছবি আমি খুবই ভালবাসি এবং অভিনয় করতেও ইচ্ছুক, কিন্তু সময় পাব কি? অর্থাৎ আসছে বছর তিনি তো সাসেক্স-এর হয়ে ক্রিকেট খেলবেন, তাই সময় পাওয়ার কথা বোধহয়। ওটা বলতে হয় বলা! আসলে এ আকর্ষণ কি তিনি ঠেকাতে পারবেন? তার ওপর প্রণয়িনী যখন আবার কিম স্টার! তাঁর বিপরীতে একজন নায়-করা কিম-অভিনেত্রীকেই নামানো হবে। শর্মিলা ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পতৌদির বিপরীতে অভিনয় করতে পারলে তো খুবই খুশী হব।' পতৌদিকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে তুনি গোস্বামীকে সেই ভূমিকা দেওয়া হবে বলে প্রকাশ!

অতএব? অতএব এখন থেকে সুদর্শন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একটা চোখ থাকবে ক্রিকেট মাঠে আর একটা থাকবে রূপালী পর্দায়। ফলে ক্রমশঃ ক্রিকেট শিকেয় উঠবে রূপালী পর্দার আলোর দিকেই তাঁরা ধাবিত হবেন, এমন আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়।

উঁচু নীচু

কুমারলাল দাশগুপ্ত

কয়েকদিন হোলো বাড়ী বদল করে বউবাজার থেকে বেহালা এসেছি। অনন্তার চাপাচাপি থেকে হঠাৎ বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, অনেকদিন পর মাঠ, পুকুর আর নারকেল গাছ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পাড়া নতুন, বাড়ীও নতুন, একতলায় থাকেন এক ভাড়াটে, দোতলা ভাড়া নিয়েছি আমরা, আমরা মানে আমি, আমার স্ত্রী উমা, ছ'বছরের ছেলে খোকা ও কুকুর পুতুল।

আমার অভ্যাসে খুব ভোরে উঠে খানিক বেড়ানো। এতদিন যা বিতাড়ই খাদ্যের খাতিরে করেছি এখানে এসে খোলামাঠ পেয়ে তা হয়েছে আনন্দজনক। পথে লোক চলাচল শুরু হবার আগেই আমি পুতুলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। পুতুলের গায়ের লোম ঝিসকালো, আছে সে কলার স্পেনিয়াল, লম্বা কান দুটো দুলিয়ে আমার চারিদিকে চক্রাকারে সে দৌড়ে বেড়ায়। মাইলটাক হেঁটে বাড়ী ফিরে আসি, চা খেয়ে বাজার করতে যাই, তারপরে নিয়মিত নাওয়া খাওয়া, এবং ঘড়ি ধরে দশটায় দিনের কাজে বেরিয়ে যাওয়া।

সেদিন রবিবার, অন্যদিনের মত খুব ভোরে না উঠে দেরি করে উঠেছি, পুতুলকে নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ি পথে তখন লোক চলতে শুরু করেছে। ভ্রমণের পালা কিছু কমিয়ে বাড়ী ফিরে আসছি, দেখি একতলার সদর দরজা খোলা। অন্যদিন এ দরজা খোলা দেখিনি, ওরা সবাই দেরি করে ওঠে। পুতুলকে দেখে ভিতর থেকে ছ'সাত বছরের ফ্রকপরা একটি মেয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করেছি শিশুরদল প্রথম দর্শনেই পুতুলকে ভালবেসে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও হোলো তাই, মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ডাকলো "আয় ধাধা আয়।" পুতুলের বাবানাম এতই বেয়াদব যে আমি হেসে ফেল্লাম, বল্লাম "ওর নাম ধাধা নয় খুকী, ওর নাম পুতুল।" খুকী আবার হাত নেড়ে ডাকলো "আয় পুতুল আয়।" নতুন বন্ধু পেলে পুতুল যা করে আজও তাই করলো, লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেল। বেশী নয়, মাত্র দু পা এগিয়েছে এমন সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল, মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো "ও মা গো", তারপরে ছুটে ভিতরে যেতে হুড়মুড় করে আছাড় খেয়ে পড়লো। কি হোলো রে" বলে একটি আধাবয়সী ভদ্রমহিলা ছুটে এলেন। মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে বল্ল "কুকুর।" "কুকুর, কোথায় কুকুর?" মহিলা প্রশ্ন করলেন। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি বললে "ঐ যে ওখানে।" এইবার দরজার দিকে তাকাতেই পুতুলকে দেখে মহিলা থমকে দাঁড়ালেন। তারপরে দরজার পাল্লা দুটো দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন "ওগো শিগ্‌গির এসো, বুচিকে কুকুরে কামড়েছে।" ভিতরে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল, শুনলাম দুমদাম করে কয়েকজন ছুটে এসে তারপরে একসঙ্গে অনেক কণ্ঠে অনেকগুলো প্রশ্ন হোলো "কখন কামড়ালো, কোথায় কামড়ালো, কোন কুকুর?" মহিলা বল্লেন "বেথ সিরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে তা আমি কল্পনাই করতে পারি নাই, যার কি থাকবো ভাবছি এমন সময় দরজা খুলে গেল, সুলকায় টাকমাথা একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখখার করে পুতুলকে দেখেই এক পা পিছিয়ে গিয়ে হাঁকলেন 'তুতো, লাঠি নিয়ে আয়, শীগ্‌গির।' শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, লাঠি আসবার আগেই আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসে। তাড়াতাড়ি বল্লাম 'আপনারা কেন এমন করছেন, কুকুর কাউকে কামড়ায় নাই. এ কুকুর কাউকে কামড়ায় না, তা ছাড়া···!' কথা শেষ হবার আগেই তুতোর মারফৎ লাঠি এসে পড়লো। আমি পুতুলকে কোলে তুলে নিলাম। লাঠি হাতে পেয়ে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে গর্জন করে উঠলেন— "জানকুত্তা নিয়ে বেড়াবার আর জায়গা পেলেন না মশাই, লোকের বাড়ীতে ঢুকে মানুষ কামড়াচ্ছে।" বিনীত ভাবে বল্লাম 'আগে কথাটা শুনুন, এ বড় শান্ত কুকুর, কামড়ানো দূরের কথা, কাউকে তাড়া পর্যন্ত করে না।' ভদ্রলোক মাটিতে লাঠি ঠুকে বল্লেন 'কামড়ায়নি। নিশ্চয় কামড়েছে।' বল্লাম খুকীকে জিজ্ঞাসা করুন তাহলেই জানতে পারবেন।' ভদ্রলোক পিছন দিকে তাকালেন। দরজার পাশ থেকে নারী কণ্ঠে জবাব এলো "বুঁচি বলছে কুকুরটা দাঁতবার করে আসছে দেখেই সে ছুটে পালায়। আর একটু হলেই কামড়ে দিতো। কি রাক্ষুসে কুকুর, তুমি খানায় খবর দাও।' ভদ্রলোক আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বল্লেন 'শুনেছেন মশাই, আর একটু হলেই কামড়ে দিতো।' বল্লাম "আমি বলছি, বিশ্বাস করুন, পুতুল কাউকে কামড়ায় না।" আমার বিনয় বচনে ভদ্রলোক একটু নরম হয়ে লাঠি নামিয়েছেন এমন সময় পিছন থেকে তুতো বলে উঠলো 'বাবা, কুকুরটা তোমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে দেখো।' পরমুহূর্তে লাঠি ফেলে ভদ্রলোক তাঁর স্থূলদেহ নিয়েই পিছন দিকে এক লাফ দিয়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পড়লেন। এই সুযোগে আমিও পুতুলকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লাম। উপরে এসে যখন পুতুলকে বারান্দায় চেন দিয়ে বাঁধছি তখন নীচে শুনতে পেলাম তুতোর গলা, ক্রন্দনরত বুঁচিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে 'তুই কাঁদিসনে বুঁচি, ও কুকুর রাস্তায় বেরোলে আমি ইট মেরে ওর পা ভেঙে দেব।' উমা এসে বল্ল 'আমি আলসা দিয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিলাম। মিছামিছি কি হৈ চৈটা করলো। আবার বলছে ইট মেরে কুকুরের পা ভেঙে দেবে, এরা কেমন মানুষ গো!' বল্লাম 'মানুষ সুবিধের নয় মনে হচ্ছে। কাল থেকে আরো আধঘণ্টা আগে বেড়াতে বেরোবো। শ্রীমান তুতোর চেহারা দেখে মনে হোলো সে ইট মেরে পুতুলের পা ভেঙে দিতে পারে।'

খেয়ে দেয়ে দুপুরে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি এমন সময় খোকা এসে বল্ল 'বাবা, দেখো কে এসেছে।' উঠে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে পুতুলকে কোলে নিয়ে আদর করছে। নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গিয়ে উমাকে বল্লাম 'তুমি যাও।' উমা বাইরে যেতেই মেয়েটি বল্ল কি সুন্দর কুকুর, দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছা করে। কি নাম এর?' উমা বল্ল "পুতুল।" পুতুলের গায় হাত বুলোতে বুলোতে মেয়েটি বল্ল "ঠিক পুতুলের মতই দেখতে। এর মুখে হাত দিলেও কামড়াবে না, অথচ সকালবেলা কি কাণ্ডই করলো। আমার ভারি লজ্জা করছিল। জানেন, বুঁচি বড় ভীরু মেয়ে, ও ঐরকম করে, আপনারা কিছু মনে করবেন না।" উমা বল্লে "কেউ যে, পুতুলকে দেখে ভয় পেতে পারে এ ধারণা আমাদের ছিল না। যে দেখে সেই ওকে ভালবাসে।" "সত্যিই তাই, আমি কাছে এসে ও এমনভাবে তাকালো যে ওকে কোলে তুলে নিতেই হোলো" বলে মেয়েটি পুতুলকে নামিয়ে দিয়ে একটু হেসে তাড়াতাড়ি নীচে চলে গেল।

পুরুষ যে নির্দোষ নীচের তলার অন্ততঃ একজনও তা স্বীকার করেছে জেনে অবশ্যি অনেকখানি কমে গেল। তবে দেখলাম একটা অতিরিক্ত আহ্লাদে মেয়ের কাণ্ড দেখে তার পরিবারের সবাইকে দণ্ড দেয়া উচিত হয় না।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন আপিস থেকে ফিরে কর্মক্লান্ত দেহটা সবে বিছানার উপর এলিয়ে দিয়েছি এমন সময় সিঁড়িতে দুমদাম পায়ের আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম, মনে হোলো এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যদের যেন, যে যে করে ছুটে আসছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি প্রায় তাই, নীচের তলার একপাল ছেলেমেয়ে ভুতোর নেতৃত্বে ঘুড়ি ও মাটাই হাতে উপরে উঠছে। দেখতে দেখতে দোতলায় উঠে কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তারা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। তারপরে ঘণ্টাখানেক ধরে মাথের উপর যা চল্ল তাতে উমার ব্লাডপ্রেসার তো বেড়ে গেলই, আমার মাথাটাও টিপটিপ করতে লাগলো।

পরদিন আবার যাতে এ দুর্ভোগ না ভুগতে হয় তাই আপিস থেকে ফিরেই সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই বন্ধ দরজায় দমাদম ঘা পড়তে লাগলো। উমা বল্ল "খুলে দাও।" আমি মাথা নেড়ে জানালাম কিছুতেই খুলবো না। অনেক ধাক্কাধাক্কিতেও যখন দরজা খুল্লো না তখন ভুতো চেঁচিয়ে উঠলো "বাবা।" নীচে থেকে জবাব এলো "কি বলছিস ভুতো।" ভুতো বল্ল "দেখ না, দরজা বন্ধ করে রেখেছে, কিছুতেই খুলছে না।" "যাচ্ছি" বলে ভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন, হাঁক দিলেন "ও মশাই, শুনছেন?"

উত্তর দিতে হোলো, বল্লাম "শুনছি, বলুন, কি বলবেন।"

—দরজা বন্ধ করে রেখেছেন কেন?

—বাধ্য হয়েছি। ছাদের উপর হুটোপুটি করলে আমাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়। আমার স্ত্রীর হাই ব্লাডপ্রেসার।

—ডাক্তার দেখান। দরজা খুলবেন কিনা বলুন। ছাদ আপনার একার নয়।

উমা বল্ল "খুলে দাও, আর তর্ক কোরোনা।" তবু ইতস্ততঃ করছি এমন সময় ভুতোর কথা কানে এলো, বলছে "না খুল্লে পটকা মেরে উড়িয়ে দেব।" আর দেরি করা সঙ্গত মনে করলাম না, দরজা খুলে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ভুতোর দল হৈ হৈ করে ছাদে উঠে গেল। কংক্রিটের ছাদ বলে সেদিন ছাদ ভেঙে পড়লো না।

সকাল বেলা উমার ওঠবার ক্ষমতা ছিল না, শুয়েই ছিল। আমি বাথরুমে ঢুকি কানাচ্ছি এমন সময় কানে এলো সেই মেয়েটির গলার আওয়াজ। উমাকে বলছিল—"কি কাণ্ড করেছে কাল ছাতের উপর, ওদের একটুকু বিবেচনা নাই। এমন করলে ভালমানুষের অসুখ করে, আপনি তো অসুস্থ। কেমন আছেন জানতে এলাম।" উমা বল্ল "শরীর ভাল নেই।" মেয়েটি বল্ল "ভুতো বড় একগুঁয়ে, কারু কথা শোনে না। ওর জন্যে বড় ভয়ে ভয়ে থাকি। আপনারই যদি অমন একটি ধাড়ি ছেলে থাকতো তাহলে সহ্য করতেই হোতো। তাই বলি কিছু মনে করবেন না।"

ঘরে ঢুকে দেখি মেয়েটি চলে গেছে, উমা উঠে বসেছে। বল্লাম "উঠোনা, চুপচাপ শুয়ে থাকো। একটু হেসে উমা বল্ল "কত শুয়ে থাকবো বলো, মাথাব্যথা এখন কমেছে।" শুনে আশ্বস্ত হলাম, "কিন্তু এমন ভাল বাড়ী কি আর পাবে" বল্লে উমা। বল্লাম "বাড়ী ভাল কিন্তু দেখছো তো,

প্রতিবেশী তেমন ভাল নয়। আমরা থাকতে চাইলেও এরা থাকতে দেবে না, লাঠিবাজি করে আর পটকা মেরে তাড়াবে। কয়েকটা দিন আরো দেখ, অতো ব্যস্ত হয়ো না" বলে উমা "ওরা ছেলেমানুষ, দুদিন বাদে আর ঘুড়ি ওড়াবে না।"

হোলোও তাই, সেদিন ভুতোর দল আর ছাদে উঠলো। ভাবলাম কেটে গেল, এখন থেকে শান্তিতে বাস করতে পারবো। কিন্তু পরদিন সকালবেলাই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। বাজার করে ফিরছি, বাড়ীতে ঢুকেই শুনলাম একতলার দোতলায় তর্ক চলছে। একতলা থেকে বহু কণ্ঠ চিৎকার করছে এবং তারই কোন কোন ফাঁকে উমার গলা শোনা যাচ্ছে। লাফিয়ে সিঁড়ি কটা টপকে উপরে এসে দেখি বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়েছে উমা। তার হাত ধরে টেনে এনে বল্লাম "ব্যাপার কি, কি হয়েছে?" উত্তেজনায় কাঁপছিল উমা, বল্লে "দেখ না, নীচের ওরা বলছে খোকা উপর থেকে ইট ফেলেছে, মিথ্যাবাদীর দল।" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম "তার মানে?" খোকা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বল্লে "খেলতে খেলতে রবারের বলটা নীচে পড়ে গেছে, ওরা দিচ্ছে না বাবা।" ধরা গলায় উমা বল্ল "দেবে আবার, বলছে বল পড়েনি, ইট পড়েছে।" বাজারের থলেটা নামিয়ে রেখে রেলিংএর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। নীচে তখনও চেঁচামেচি চলছিল, চেয়ে দেখি ছোট, বড়, স্ত্রীপুরুষ সবাই উপস্থিত। ভদ্রভাবেই বল্লাম "ছেলের খেলার রবারের বলটা নীচে পড়ে গেছে, দয়া করে সেটা ফেরৎ দিন।" বাড়ীর কর্তা মোটা ও বেঁটে উর্দ্ধমুখী হয়ে গর্জন করে উঠলেন—"হ্যাঁ মশাই, আপনারা একটা খুনজখম করতে চান?" শান্তকণ্ঠেই জবাব দিলাম "শুনেছি সব কথা খোকার বলই নীচে পড়েছে, আর কিছু পড়ে নাই।"

"আর কিছু পড়েনি!" ধমক দিয়ে উঠলেন নীচের কর্তা, "ভুতো, কি পড়েছে বলতো? ভুতো চেঁচিয়ে উঠলো" ইঁট পড়েছে বাবা।" আমি বল্লাম "অসম্ভব, ইঁট পড়তেই পারে না।" নীচের কর্তা হাঁকলেন "ভুতো, কোথায় সে ইঁট, নিয়ে আয়।" মুহূর্তের মধ্যে ভুতো দুহাতে ধরে আস্ত একখানা ইঁট এনে সামনে রাখলো। দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল, খোকা ও তুলতেও পারে না তাছাড়া এখানে ইঁট পাবে কোথায়!

নিঃশব্দে সরে এলাম, উমাকে বল্লাম "কালকেই এ বাড়ী ছাড়তে হবে। আপাতত হরহরে মেজদার বাড়ী গিয়ে উঠবো, তারপরে যেখানে হোক একটা বাড়ী খুঁজে নেব। উমা বল্লে "তাই করো।" ক্লান্ত দেহমন নিয়ে ঘরে এসে বসেছি এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন মৃদু গলায় ডাকলো "খোকা।" খোকা ছুটে বাইরে গেল। আন্দাজ করলাম নীচের মেয়েটি এসেছে। শুনলাম সে বলছে "এই নাও খোকা তোমার বল। আর কখখনো নীচে ফেলো না লক্ষ্মী ভাই।" বল নিয়ে হাসতে হাসতে খোকা ঘরে ঢুকলো।

পরদিন সকাল থেকে জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করে তৈরি হতে প্রায় বারটা বেজে গেল। ট্যাক্সিতে উঠতে যাব এমন সময় উমা বল্লে "নীচের সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হোলো না, দেখা হলে ভাল হোতো।" গেটের দিকে এগিয়ে চলেছি, দেখি সে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। উমা তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বল্লে "এক্ষুনি আপনার কথা বলছিলাম। আমরা চলে যাচ্ছি, আপনার কথা মনে থাকবে, নমস্কার।" মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে হাত তুলে বল্লে "ওকি করছেন, আমাকে কেন নমস্কার করছেন, আমি যে এবাড়ীর ঝি।" তারপরে গড় হয়ে উমাকে প্রণাম করে ভিতরে চলে গেল।

রূপসী নেশা

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্তী

এক নম্বর কোলিয়ারীর প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। একেবারে আকাশের নীচে, প্রাকাস্ত দিনের আলোয় ওরা সবাই এই প্রথম শম্পা রায়কে দেখল। শম্পা রায় রূপসী তো বটেই, তার উপর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল পড়ন্ত সূর্যের সোনালী মায়া। শ'চারেক কুলী কামিন, মেসীর তাগ সাঁওতালী পুরুষ আর মেয়ে আর কিছু বাঙালী কেরাণী। গালিচা জোগাড় করা হয়নি, ফুল নয়, লাল দালুনয়, খানকয়েক চেয়ার মাত্র। মাঝখানের চেয়ারটিতে শম্পা রায় বসল। কোলের উপর দুটি হাত, সাদা সিল্কের শাড়ির জরির পাড়ে আলোর ঝলকানী। বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, ডান হাতে একটি মাত্র বালা।

সকলেই নির্বাক। অসংখ্য লোকগুলি পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনছে শুধু। অদূরে শালগাছে পাখীর জটলা আর মৃদু বাতাস। স্বর্গত মালিক অনল রায়ের স্ত্রী, তাদের নূতন মনিব। অনল রায়কে ওরা বলত 'রাজাবাবু' আর এই মুহূর্তে দুটি শব্দ তাদের হৃদয়ে দোলা দিতে পাগল: 'রাণী মা।' সম্ভ্রম আর ভক্তির শেষ দুটি কথা।

সভার আয়োজন একেবারে আকস্মিক। তাই ম্যানেজার বসলাবাবুই ছোটোখাটো বক্তৃতা করে শম্পা রায়ের পরিচয় দিলেন সকলের কাছে। বক্তৃতা শেষ হবার পরে বার বার তাঁর মনে হল শম্পা রায়ের এমন মামুলি পরিচয় কতই না তুচ্ছ আর অযাচার।

অনল রায় সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ দিন পড়ে থাকত কোলিয়ারীতে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চারটি কয়লার খনিই ছিল তার জীবন। তার বাবা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মালিক। তিনি আগে দেখতেন মুনফা, তারপর মজুরদের প্রাপ্য। অনল দেখত মুনফা এবং মজুরদের স্বার্থ ঠিক সমান সমান। শনিবার বিকেলে সে গাড়ীতেই কলকাতা ফিরত। শম্পা শহরের শিক্ষিতা মেয়ে, নাচ-গান সাহিত্য অনেক নিয়ে মেতে থাকত। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যা থেকে, অনলকে পাবার পর সেই দিনের জন্য জীবনের অন্য সব কিছু এক নিমেষে বাতিল করে দিত সে। তারপর তারা দুজনে একা, পৃথিবীতে আর কিছু নয়। অনল শম্পাকে কোনদিন কলকাতা ছেড়ে খনি মহলায় থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। শম্পাও দেখায়নি কোনো আগ্রহ। বরং কয়টা দিন বিচ্ছেদের পর তাদের সেই দিনের মিলন মুহূর্তগুলি পরস্পরের সান্নিধ্যে ভরাট হয়ে থাকত।

কোয়ার্টারে ফিরে অনলের আরাম কেদারায় শরীরটা ঢেলে দিল শম্পা। বাড়ীর পিছনে গ্যারেজের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। শাশুড়ী আহ্নিকে বসলেন। ঠাকুর রান্নায় ব্যস্ত। মোট। দুয়েক চাকর ছিল অনলের। শম্পা তাদের ছাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতা থেকে শাশুড়ীর সঙ্গে

এসেছে সাবেক কালের ঝি। এই তার সংসার। চারদিন ধরে বগলাবাবু শম্পাকে বুঝিয়েছেন। এখন অনেক কিছু আছে জানবার। এখানে, এই ঘরে শম্পা জানত, অনল অনেক রাত পর্যন্ত কাজকর্ম করত, তারপর ঘুমত এই আরাম কেদারায়। মনে আছে শম্পার অনলের সেই চিঠিখানি: 'তুমি কাছে নেই, শম্পা, জানালার বাইরে তাকালেই তারা মাখানো আকাশ, নিঃসঙ্গ বাতাস আর রাত্রির দুঃসহ নির্জনতা। মনে হয় কাছেই তুমি আছ, খুব কাছে, যেন পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেই তোমাকে দেখতে পাব। কান পাতলে যেন শুনতে পাই তোমার শাড়ীর খসখস আর চুড়ির টুংটাং।

কলকাতার বাড়ীতে শম্পা মুখে হাসি নিয়ে বলেছিল: আমাকে তুমি নিয়ে চল, কালই যাব তোমার সঙ্গে।'

'যাবে? সেখানে তোমার কষ্ট হবে না শম্পা?'

'কষ্ট? তোমার কাছে থাকতে কষ্ট? যাব আমি।'

আর কথা এগোয়নি। অনলের বুকের মধ্যে মুখ রেখে চুপচাপ পড়েছিল শম্পা।

কিন্তু অনলের কাছে যাবার আর সুযোগ পেল না সে। দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল শম্পা।

কয়েক মাসের মধ্যেই সব জানা হয়ে গেল শম্পার, এমন কি কুলী মজুরদের নাম পর্যন্ত। অনলের মৃত্যুর সঙ্গে এখানকার যে ক্লার্কেরও মৃত্যু হয়েছিল, শম্পা আস্তে আস্তে বাঁচিয়ে তুলল তাকে। সেই হল নূতন প্রেসিডেন্ট। বাঙালী কর্মচারী, ইঞ্জিনীয়র, তাদের স্ত্রী সবাই আবার আস্তে আস্তে সন্ধ্যার পর ক্লাবে জমায়েত হতে লাগল। আর শম্পা হল তাদের মধ্যমণি। মাইনিং ইঞ্জিনীয়র প্রকাশ চৌধুরী কথার জাল বুনতে লাগল। সুদর্শন, অবিবাহিত যুবক, মুগ্ধ, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শম্পার দিকে। সন্ধ্যার পর কোনদিন চার মাইল রাস্তা সাইকেল হাঁকিয়ে আসে শম্পার কোয়ার্টারে। বিশ্রম্ভালাপ, চা-পান, রেডিও, কোন দিন তারা-ভরা রাত্রি, কোনদিন ভাঙা চাঁদ।

একদিন বগলাবাবু বললেন, 'কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি, মিসেস রায়।'

'নিশ্চয় বলবেন। কিছু মনে করব না আমি।'

বগলাবাবু বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ঈর্ষার আগুনে ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে তাঁর। চুলে পাক ধরেছিল তার। রক্তের শাসনে ত্রয়োদশের মত কালো হয়ে উঠেছে আবার। পেশীবহুল দীর্ঘ চেহারা। এখনও প্রতিদিন সকালে আধঘণ্টা ব্যায়াম করেন। এখনও শিরায় যৌবনের তেজ।

বগলাবাবু বললেন, 'প্রকাশ একটা এ্যাডভেঞ্চারার। তাছাড়া ওর উচ্ছৃঙ্খলতারও কিছু কিছু পরিচয় আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি। আপনার একটা সম্মান আছে এখানে। ওকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া আপনার ভাল হচ্ছে না। লোকে যেদিন অশোভন আলোচনা শুরু করে দেবে সেদিন ওদের মুখ আপনি বন্ধ করবেন কি দিয়ে?'

শম্পা রায় অদ্ভুত শ্রীবাভঙ্গি করে রূপালী গলায় হেসে বলল, 'ও এই কথা? আমি ওদের মুখ কোন কিছু দিয়েই বন্ধ করব না, বগলাবাবু।'

'করবেন না?' বগলাবাবু বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন।

'না, করব না। কেন না, এ বিশ্বাস আছে একদিন ওরা বুঝতে পারবে ওদের অনুমান কতটা ভিত্তিহীন। ওদের অশোভন আলোচনার জন্য ওরাই একদিন অনুতপ্ত হবে।'

বসন্তবাবু বুঝলেন, চালে ভুল হয়ে গেছে। শম্পা রায়ের অন্তরঙ্গ হবার পথ এটা নয়। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, 'মাপ করবেন আমার ধৃষ্টতা, হয়ত আমারই ভুল। আপনার শুভ কামনায় হয়ত একটু বেশী রকম কল্পনা করে ফেলেছি।'

শম্পা রায় আবার সেই হাসি ছড়িয়ে বলল, 'আপনার শুভ ইচ্ছাটা না বোঝবার মতো নির্বোধ আমি নই।'

বসন্তবাবু হতাশ বোধ করলেন, কিন্তু আর রাত করা শোভন হবে না ভেবে তিনি উঠলেন, বিদায় নিলেন।

রাস্তার স্তিমিত আলোয় দূর থেকে দেখতে পেলেন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার সাইকেল হাঁকিয়ে আসছে কি একটা সুর সুর গুঞ্জন করে। বসন্তবাবু সরে দাঁড়ালেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা পাগলা ঘোড়ার মত লাফাতে লাগল।

সাইকেল চলে গেল কিন্তু বসন্তবাবু নড়তে পারলেন না। কেউ যেন পায়ে দড়ি বেঁধে আটকে রেখেছে তাঁকে।

এদিকে রেডিওর মৃদু আবহ-সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ হঠাৎ শম্পার হাত দুটি তুলে নিজের হাতে, বলল, 'ভালবাসি।'

আস্তে আস্তে শম্পা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? মনে হয় আর একটু ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারলে একটু শোভন হত খেলাটা নয় কি প্রকাশবাবু?"

'পারলাম না' প্রকাশ চৌধুরী বলল, 'পারলাম না। চরিত্রের এই দুর্বলতা প্রকাশ না করে পারলাম না। জানি, আপনার মতো মেয়ে এ-ভাবপ্রবণতাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না। দেখুন কতখানি সম্মান হারাবার ঝুঁকি নিয়ে এমন কথা বলে ফেললাম আপনাকে? কিন্তু এটা কি শুধু আমারই অপরাধ? আপনার রূপ আর সৌন্দর্য কি এর জন্য দায়ী নয়?'

বক্তৃতা শেষ করে প্রকাশ তাকাল শম্পার মুখের দিকে। মনে হল তার, শম্পা রায় সত্যিই দূর আকাশের নক্ষত্র। পৃথিবীর কোন এক পতঙ্গ একটুখানি পাখা ঝাপটে উঠল মাত্র; নক্ষত্রের কিছু এসে যায় না তাতে; ঠাণ্ডা, নীল নক্ষত্র!

যখন এমনি ছুটো পুরুষ অনছিল তুষের আগুনে দুদিক থেকে ছুটো প্রবল আবেদন শম্পাকে উন্মাদ করে তুলেছিল, তখনই সে এক সন্ধ্যার কিছু আগে অনলের টুরারখানি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এই গাড়ীতে এমনি তারা-ভরা কত রাত্রে সে বেরিয়েছে অনলের পাশে বসে। ঝড়ের বেগে তারা ছুটে গেছে সহর ছাড়িয়ে লোকালয় ছাড়িয়ে।

অ্যাক্সিলেটরে পা ডুবিয়ে দিল শম্পা, চুল উড়ছে তার আর উড়ছে সাড়ে সাতশো টাকার শাড়ির আঁচল। এই শাড়ি, এই পোষাক ভাল বাসত অনল। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল তার। এক দুঃসহ মর্মান্তিক বেদনার উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে সে। হোক, একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হোক, যেমন অ্যাক্সিডেণ্টে তার অনল চুরমার হয়ে গেছে, সব ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাক।

মাথার উপরে ছুটে চলেছে তারা চাঁদ আর দুপাশে অস্পষ্ট ছায়ার মতো গাছের সারি? সত্যিই কি শম্পা মরবে?

হঠাৎ মনে পড়ল তার অনলের কথা। অ্যাক্সিলেটর থেকে আস্তে আস্তে সে আলগা করতে

লাগল না। না, আর তো মরলে চলবে না, অনন্তের অসম্পূর্ণ কাজ তাকেই তো শেষ করতে হবে। কয়না-ধনি, এত লোকজন, এদের দায়িত্ব এড়িয়ে সে কি চলে যেতে পারে?

গাড়ীর গতি কমে এল, নির্জন পথ; অনেক দূরে সাঁওতাল বস্তির আলো কাঁপছে বাতাসে। শম্পা গাড়ী থামাল, হেডলাইট নিভিয়ে দিল, আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, গাড়ীর দরজা খুলে নামল, খোপ থেকে টর্চটা নিয়ে একটু হাঁটল, এইবার বুঝি তার উত্তপ্ত স্নায়ুগুলো শান্ত হবে। শম্পা কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল না। সে হাঁটতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রির মৃদু বাতাস তার চুলে নাড়া দিতে লাগল। মাঝে মাঝে টর্চ জেলে পথ দেখে নিচ্ছে সে।

এসব অঞ্চল তার পরিচিত। চার নম্বর খনি এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে। যারা খনিতে কাজ করে এবং যারা কাজ করে না, তারা প্রত্যেকেই শম্পাকে চেনে। কিছুটা পথ হাঁটবার পর স্বাভাবিক হল তার মন। খানিক আগে রক্তে যে মাতন লেগেছিল, তার সবটুকুই শান্ত হয়ে এসেছে।

কিসের কিসা ভাবছিল শম্পা; হঠাৎ টর্চের আলোয় কিছুদূর এক ভাঙা মন্দির ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। শম্পা একটু যেন আশ্চর্য হয়ে ভাবল এখানে মন্দির! ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টর্চের আলো ফেলতে লাগল সে। ছোট মন্দির, কবে কোন্‌দিন চূড়াটা ভেঙে গিয়েছে; সামনের ছোট বারান্দার দুটি থাম; চূণবালি খসে ইট বেরিয়ে গেছে, ভাঙা দরজা দুটি কোন রকমে ভেজানো।

শম্পা এগিয়ে গেল, মন্দিরের বারান্দায় উঠল সে। বাঁ-হাতে টর্চ রেখে ডান হাতে দরজায় ধাক্কা দিল। মরচে-ধরা কব্জা আর্তনাদ করে উঠল। কয়েকটা চামচিকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে পালাল। শম্পা ঢুকল মন্দিরের মধ্যে। সামনেই মহাকালের মূর্তি। একখানি হাত ভাঙা। ধুলো, মাকড়সার জাল জমে জমে মূর্তিটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ব্লাউজের ভিতর থেকে 'ক্যালিফর্ণিয়ান পলি'-র গন্ধ-মাখা রুমালটা বের করে সে মূর্তিটার মুখ পরিষ্কার করতে লাগল অতি সন্তর্পণে, আস্তে আস্তে। প্রথমে স্পষ্ট হয়ে উঠল পাথরের চোখ দুটি। শম্পা পেছিয়ে এল কয়েক পা, চোখের উপর টর্চের আলো ফেলল। পাথরের মূর্তির চোখ যে এমন ভয়ংকর হতে পারে, এমন নিষ্ঠুর আর ক্রূর হতে পারে না দেখলে শম্পা কোনদিন বিশ্বাস করতে পারত না। শম্পা অপলক দৃষ্টিতে মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ধ্বংস আর বিনাশ, ধ্বংস আর প্রলয়, মহাকালের দুর্বার বাসনায় সৃষ্টির সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শম্পা একটু কেঁপে উঠল, আঁচলটা সে টেনে দিল পিঠের উপর, একটু যেন আরাম বোধ করল সে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল শম্পা মূর্তির দিকে? হাতে তার টর্চ জ্বলছে।

মিনিট তিনেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শম্পা, তারপর সে আস্তে আস্তে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। টর্চের আলো ফেলে দেখল শম্পা মন্দিরের গায়ে নানা রকমের দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। প্রাচীন জিনিষের প্রতি শম্পার খুব শ্রদ্ধা। ইতিহাসে সে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ। শম্পা ঠিক করল কাল দিনের আলো থাকতে থাকতে ক্যামেরা এনে সে এখানকার ফোটো নিয়ে যাবে; মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। টর্চের আলো ফেলে দুটো তিনটে সিঁড়ি নামতেই শম্পা যেন একটু চমকে উঠল।

'একি! আপনি এখানে?'

'ফিরছিলাম। দেখলাম আপনার ড্রাইভারখানা রাস্তার পাশে, তারপর টর্চের আলোটা চোখে পড়ল।'

'সত্যি বলছেন, না আমাকে ফলো করছিলেন ?' শম্পা হাসল, নীচে নেমে এল।

প্রকাশ বলল, 'আপনি একলা এসেছেন ! কত সাপ-খোপ এদিকে, কত—'

'সাপ-খোপকে আমি ভয় করি না।'

'করেন না ? বাঘ-ভালুকও তো থাকতে পারে।'

'তাদেরও না।' শম্পা হাসল।

'আশ্চর্য!'

শম্পা টর্চ নিভিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাশের সামনে আর প্রকাশ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে।

শম্পা গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি গিয়েছিলেন কোথায় ?'

'দু'নম্বর কোলিয়ারীতে।'

'কেন ?'

'একটু প্রয়োজন হয়েছিল।'

'আপনার কাছ থেকে তো বেশ বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।'

'ও। গন্ধটা তা হলে চেনেন দেখছি।' প্রকাশ একটু হেসে দূরে সিগারেট ধরাল।

শম্পা টর্চ জ্বালাল। আর একবার মন্দিরটা দেখে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, এইবার যেতে হবে।'

কিন্তু শম্পার যাওয়া হল না। সে থমকে দাঁড়াল।

সাঁওতালী গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছে। একটু যেন মত্ত গলা।

গায়ক একেবারে কাছে এসে পড়ছে। টর্চের আলো দেখেই জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মন্দিরে কে ঢুকিয়েছিস রে !'

শম্পা টর্চের আলো ফেলল তার মুখের উপর ; গায়ের উপর।

জোয়ান চেহারা ; মাথায় পাগড়ি, গলায় লাল পুঁতির মালা, কাঁধে লাঠিতে ঝুলানো পুঁটলি, একটি যেন কালো দৈত্য, চোখ দুটি লাল, গা থেকে মহুয়ার মদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে।

সাঁওতাল হো হো করে হেসে উঠল। রাণীমা ! রাণীমা ! মাথা হেঁট করে প্রণাম করল শম্পাকে আর বার বার বলতে লাগল : 'রাণীমা' 'রাণীমা'।

প্রকাশ চৌধুরী চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল, এবার সে থমক দিয়ে বলল, 'রঘুয়া ভাগো।'

রঘুয়া চমকে উঠল প্রকাশ চৌধুরীর গলা শুনে, হো হো করে হেসে বলল, আপনি ভি ?' এই বলে সে ঘুরে ঘুরে শম্পা আর প্রকাশকে নমস্কার করতে লাগল হাত জোড় করে। 'রাণীমা।' 'রাণীমা।' —কি বিকট হাসি রঘুয়ার।

প্রকাশ জোর গলায় বলল, 'রঘুয়া, সিপাহী রাখো, ঘর যাও।'

'সিপাহী।' আবার উচ্চহাস্য করে উঠল রঘুয়া, সারা বনে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল : 'রাণীমা।' 'রাণীমা।'

'যা এখান থেকে।' প্রকাশ চৌধুরী চীৎকার করে উঠল।

রঘুয়া আর দাঁড়াল না সেখানে। তার গা টলছে, অন্ধকারে কালো চেহারাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বনের মধ্যে। শুধু বাতাসে ভেসে আসতে লাগল দুটি কথা : 'রাণীমা ! 'রাণীমা।'

শম্পাও আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি চলে এসে মোটরে উঠল। হুইলে হাত রেখে পিছনের দিকে চেয়ে দেখল প্রকাশ তার দিকেই আসছে।

প্রকাশকে দেখে শম্পা বলল, 'আপনি কিসে যাবেন, মিষ্টার চৌধুরী ?'

'কেন! আমার মোটর বাইকে। সামনেই তো রয়েছে।'

'কিন্তু সে যে আপনার কাঁপছে' হাসতে হাসতে শম্পা বলল, 'সামলে যেতে পারবেন এতটা পথ ?'

'পারব, ঠিক পারব। আচ্ছা, গুড্ নাইট্ মিসেস রায়।'

'আমার মোটরে আসবেন ?"

'আপনার মোটরে! আর আপনি ড্রাইভ করবেন।' প্রকাশ সরে এসে একেবারে শম্পার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে—সৌভাগ্য কি এই অধম করেছে ?'

শম্পা টিপে হাসতে লাগল প্রকাশের দিকে চেয়ে।

শম্পা মুখে বলল, 'আপনি ছুটির জন্ত অ্যাপ্লাই করেছেন ?'

'হ্যাঁ মিসেস রায় কিন্তু বসলাবাবু তো রাজী হচ্ছেন না।'

'ঠিক আছে। আমি আপনাকে ছুটি দেব। আজ আপনার কাগজ পেয়েছি। আচ্ছা, গুড নাইট।'

'গুড্ নাইট।'

শম্পা মোটরে স্টার্ট দিল। প্রকাশ একটু পিছনে হেঁটে বাইকে উঠল।

শম্পার শাশুড়ী একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে কেউ নেই, ড্রাইভারকেও নেয় নি সে, নিজেই ড্রাইভ করছে অথচ এতখানি রাস্তির পর্যন্ত তো শম্পা কখনও বাইরে থাকে নি বিশেষ করে অনল মারা যাবার পর। সিঁড়ি মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সুরবালা এইসব ভাবছিলেন হঠাৎ গাড়ীর শব্দ হল। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন সুরবালা, দেখলেন শম্পা ফিরল। সুরবালা নিশ্চিন্ত হলেন।

দেওয়াল ঘড়িতে চং চং করে আটটা বাজল।

শম্পা উপরে উঠে এল। সুরবালা শম্পার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীর ভাল তো বৌমা ?'

'হ্যাঁ মা, শরীর ভাল আছে।'

'কোথায় গিয়েছিলে মা ?'

'একটু গোলমালে পড়েছি, মা। আপনার দু'চারটি কর্মচারী বেশ একটু অশান্তির সৃষ্টি করেছে, তাদের সম্বন্ধেই জানতে গিয়েছিলাম।'

সভয়ে সুরবালা জিজ্ঞেস করল, 'কারা বৌমা ?'

'পরে জানতে পারবেন, মা। তাদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।'

'দেখো, মা। খুব সাবধান। কুলী-কামিনের দল।'

'এরা কুলী-কামিন নয় মা, এরা ভদ্রলোক।'

এই বলে শম্পা তার ঘরে ঢুকল। সুরবালাও আর দাঁড়ালেন না সেখানে।

রাত্রে ঘুম হল না শম্পার। মাথা গরম হয়ে উঠল তার। ভাঙা মন্দিরের কাছে যে পরিবেশ সৃষ্টি হল আজ সন্ধ্যায় তাকে তো তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। শম্পা যখন আবছা অন্ধকারে প্রকাশ চৌধুরীর কাছে দাঁড়িয়েছিল, তখনই তো রঘুয়ার আবির্ভাব। তাদের দুজনার দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, সুরাহা এই যে রঘুয়া মহুয়ার মদ খেয়ে ফিরছিল, অপ্রকৃতিস্থ ছিল সে। কিন্তু যদি সে কাল কুলী মহল্লায় রটিয়ে দেয় যে সে তাদের দুজনকে একসঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় ভাঙা মন্দিরের কাছে দেখেছে, তাহলে শম্পাকে কেন্দ্র করে শুরু হবে নানা গুঞ্জন—আর বসলাবাবু যদি জানতে পারেন, তাহলে সোনায় সোহাগা হবে। শম্পা বিছানায় থাকতে পারল না। খাট থেকে নেমে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে লাগল।

শম্পা যে আশঙ্কা করেছিল তাই হল। শম্পার অসাধারণ মনোবল থাকা সত্ত্বেও তার বুকখানা কেঁপে উঠল, এরকম বিশ্রী পরিস্থিতির সম্মুখীন সে কখনও হয়নি। শোকতপ্ত ব্যথাহত নারি হৃদয় ভিতরে ভিতরে কেঁদে উঠল কিন্তু পরক্ষণেই সে তার মনকে পাথরের মত কঠিন করে ফেলল। কর্তব্য, সামনে যে তার বিরাট কর্তব্য পড়ে রয়েছে, তাকে তো একটুতেই মুষড়ে পড়লে চলবে না। শম্পা মনে মনে জানে সে প্রকাশ চৌধুরীকে একটু আধটু প্রশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু সেটি যে এরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করবে তা শম্পা কল্পনা করেনি। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই প্রকাশ মাত্রা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। যখন তখন ফোনে ডাকছে সে শম্পাকে, তার কোয়ার্টার্সে আসাও বেশ বাড়িয়েছে প্রকাশ। তাই নিয়ে চারিদিকে কানাঘুষা চলছে, কুলী মহল্লায় সব জানাজানি হয়ে গেছে। রঘুয়া প্রকৃতিস্থ হয়ে ভাঙা মন্দিরের ব্যাপার সকলকে বলে দিয়েছে। আপিস মহলে, ক্লাবে অফিসার আর বাবুদের বাড়ীতে শম্পা প্রকাশকে কেন্দ্র করে নানারকমের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সুচতুর বসলাবাবু এত দিন অপেক্ষা করে বসেছিলেন, এমন সুবর্ণ সুযোগটা আর তিনি ছাড়লেন না। তিনি রটিয়ে দিলেন শম্পা রায় মাইনিং ইঞ্জিনীয়র প্রকাশ চৌধুরীকে বিবাহ করবে, ওরা পরস্পরে প্রণয়াসক্ত।

সংবাদটি শম্পার শাশুড়ী সুরবালার কানে গিয়ে পৌঁছল। পুত্র শোকাতুরা বৃদ্ধা চমকে উঠলেন। কাঁপতে কাঁপতে এসে তিনি শম্পাকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি শুনছি, বৌমা?'

শম্পা বুঝতে পারল, হেসে বলল, 'যা শুনছেন সব মিথ্যে, মা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার পুত্রবধূকে অত হেয় মনে করবেন না।'

বাষ্পভারাক্রান্ত কণ্ঠে সুরবালা বললেন, 'কিন্তু, মা, আমার কানে যে সব আসছে। আমার বুকখানা যে ফেটে যাচ্ছে, আমি তো এখানে থাকতে পারছি না।'

শম্পা সুরবালার কাছে সরে এসে, তাঁকে দুহাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, আপনাকে ছুঁয়ে বলছি, মা, যা শুনেছেন এবং সব মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। ও জিনিষ কখনও হবে না, হবে না, হবে না।

সুরবালার চোখে জল এল, বললেন, 'সত্যি মা? আমি তা হলে নিশ্চিন্ত হব?'

'নিশ্চয় হবেন।'

'কিন্তু ওদের মুখ কি করে বন্ধ করবে মা? এরা যে তোমার শত্রু হয়ে রইল। শত্রুপুরীতে কি করে বাস করবে, মা?'

'আপনি কিছু ভাববেন না। আমি শিগগির সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

'পারবে, মা ?'

'পারব। আপনি ঠাকুর ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পুজো করুন গে।'

এক সপ্তাহ পরে।

শম্পা বগলাবাবুকে ডেকে পাঠাল তার কোয়ার্টারে। জরুরি কল। বগলাবাবু কালবিলম্ব না করে আধঘণ্টার মধ্যেই মোটরে শম্পার কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন।

শম্পা রায় আপিস ঘরে বসে আছে। অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ, কপালে চিন্তার কয়েকটি রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

'আমাকে ডেকেছেন, মিসেস রায় ?'

'হ্যাঁ। বসুন।'

শম্পা রায় ডান দিকের ড্রয়ার খুলে একখানি সোনালী রঙএর খাম বের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বগলাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমি মাইনিং ইঞ্জিনীয়র মিঃ প্রকাশ চৌধুরীর সাভিস টার্মিনেট করলাম। এই নিন আমার অর্ডার।'

'সে কি, মিসেস রায় ? প্রকাশ যে এখন এসেনশিয়াল।'

'না। পৃথিবীতে কেউ এসেনশিয়াল নয়। একজন যাবে, আর একজন আসবে। এই হচ্ছে চিরন্তন নিয়ম। আপনি এক কাজ করুন। তুরন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। আমি দেখেছি কাজ অনেক বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু প্রকাশবাবু যে এখন ছুটিতে।'

'তা হোক। তাঁর বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি রেজেস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিন।'

'কিন্তু মিসেস রায়, কাজটা যেন একটু—'

'তর্ক করবেন না, বগলাবাবু। গ্রীজ ক্যারি আউট হোয়াট আই সে। আপনিই আমার কাছে প্রকাশবাবুর বেশী নিন্দা করেছেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন ?'

বগলাবাবু মাথা হেঁট করলেন।

শম্পা রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বগলাবাবুও খাতাখানা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

শম্পা রায় বগলাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকেও আমি সতর্ক করে দিচ্ছি, বগলাবাবু। আপনার বয়স হয়েছে, অনেক সম্পত্তি করে ফেলেছেন আপনি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করেন, এই বার থেকে সিধে পথে চলবেন। আপনার একটু সুনাম আছে, তাই আপনি রক্ষা পেলেন। আমাদের ডিসিপ্লিন নেই, আমাদের কিছু নেই, আমরা কেবল নামে স্বাধীন হয়েছি।'

এই বলে শম্পা রায় পর্দা ফাঁক করে ক্ষিপ্রপদে ভিতরে ঢুকে গেল আর বগলাবাবু বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চলতি দুনিয়া

বি. বি. সি-র দুঃসাহস

সম্প্রতি বি. বি. সি-র টেলিভিশন প্রোগ্রামে একটি যৌন আবেদন মূলক নাটক পরিবেশিত হ'লে তাকে কেন্দ্র ক'রে ইংলণ্ডে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বি. বি. সি-র কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে নারাজ। নাটকটির নাম 'এক্সিট ১৯।' এর আগে এ-রকম উগ্র যৌন-আবেদন মূলক নাটক বি. বি. সি-র তরফ থেকে আর প্রচারিত হয়নি। নাটকের একটি দৃশ্যে আছে এক যুবক এবং তার সঙ্গিনী বিছানার শুয়ে আলাপ করছে। যুবক সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করছে।

"আচ্ছা বলতো শুকুর তিনদিন তুমি কি খুবই বিব্রত বোধ করো?"

"তোমার বাবার সঙ্গে তোমার কখনো প্রেম করার ইচ্ছা হয়েছে?"

"তোমার কোনো সমকামের অভিজ্ঞতা আছে?" নাটকের নায়িকা চব্বিশ বছরের মেয়ে, ভাস্কর্য শিল্পের ছাত্রী মৌরিন সাকদিল। ছায়াচিত্র প্রযোজক জ্যাক থণ্ড-এর সঙ্গে একটি চিত্রে সে কিছুদিন আগে প্রায় নগ্ন অবস্থায় অভিনয় করেছে।

নাট্যকার কিলিপ সাকদিল। 'এক্সিট ১৯-এ অভিনয় করার জন্য শ্রীমতী সাকদিল পারিশ্রমিক পেয়েছে ১৪০ পাউণ্ড। ১২০টি মেয়ের মধ্য থেকে তাকে বাছাই করা হয়েছে ওই অভিনয়ের জন্য। নাটকে যে দুঃসাহসী সংলাপ রয়েছে বাছাইয়ের সময় নাট্যকার মেয়েদের ওই প্রশ্নগুলিই করেন। তা শুনেই বেশির ভাগ মেয়ে ভড়কে যায় এবং সরে পড়ে। মৌরিন কিন্তু ওই সব প্রশ্নে নির্বিকার থাকে; তাই অভিনয়ের সুযোগ সে-ই শেষপর্যন্ত পায়।

মোটর চালকদের জন্য স্তোত্র

বুকে যাদের হাসির ফোয়ারা আর চোখে যাদের গতির নেশা সেই প্রাণোচ্ছল মোটর চালকদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার রেভারেণ্ড কপার্ট হার্ক কয়েকটি স্তোত্র নির্বাচিত করেছেন। আশি মাইল গতি বেগের জন্য একটি, নব্বই মাইল বেগের জন্য একটি আর স্পীডোমিটারে যখন শত মাইল ঘরো ঘরো সেই প্রচণ্ড মুহূর্তের জন্য একটি। পরিকল্পনাটি সত্যি অভিনব। মোটর চালাতে গিয়ে যদি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে তাতেও দুঃখের কারণ নেই: ঈশ্বরের নাম গান করতে করতেই মৃত্যু হবে।

পাদ্রীর দুরবস্থা

রোমান ক্যাথলিক চার্চে কাদার মার্ক ওয়াইনবের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। তিনি খুবই প্রগতিশীল। মূলতঃ ফরাসী এই ভদ্রলোক চুয়াল্লিশ বছর বয়সে পাদ্রীর জীবন বরণ ক'রে নেবার আগে পর্যন্ত ছিলেন একাধারে সৈনিক, লেখক, ডাক্তার এবং মনস্তাত্ত্বিক। তিনি যৌনবাদে একজন বিশেষজ্ঞ। ক্যাথলিক

যাজক ও সন্ন্যাসিনীদের যৌন সমস্যা সম্পর্কে তিনি বহু বছর ধরে আলোচনা ক'রে আসছেন ও অনেক বই-পত্র লিখেছেন। মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসা করার জন্য ছ' বছর আগে পীরেনিজ অঞ্চলে একটি ক্লিনিক স্থাপন করেছেন। ফাদার ওয়াইসনের বয়েস বর্তমানে বাহান্ন। ফরাসী বিশপ ও রোমান বিশপদের সঙ্গে বহুদিন ধ'রেই তাঁর বিরোধ চলে এসেছে। বর্তমানে রোমের চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁর উপরে আদেশ জারী করেছেন যে তিনি যৌনবিদ্যা বিষয়ে কোনো আলোচনা করতে বা বই লিখতে পারবেন না। ১৯৫৩ সালে ওয়াইসনের প্রথম গ্রন্থ 'ক্রিশ্চিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড প্রব্লেমস অব সেক্সুয়ালিটি' ক্যাথলিক চার্চের নিষিদ্ধ পুস্তক-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। চার্চ তাঁকে বিপজ্জনক বিদ্রোহী ব'লে মনে করে এবং তাঁর মতবাদকে ভয়ের চোখে দেখে। ফাদার ওয়াইসনের বক্তব্য: "যে সব যাজক ও পাদ্রীদের সারা জীবন অবিবাহিত অবস্থায় কাটাতে হয় তাদের নিশ্চয়ই নানারকম যৌন-সমস্যা রয়েছে। সেইসব সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ ও সান্ত্বনা চাইবার অধিকার নিশ্চয়ই তাদের আছে। ভূতপূর্ব চিকিৎসক হিসাবে আমারও অধিকার আছে তাদের নির্দেশ দেবার।"

মেয়েদের সম্পর্কে চার্চিলের অভিমত

স্বর্গত চার্চিল মেয়েদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন? সম্প্রতি এ-বিষয়ে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক কথা জানা গেছে। চার্চিল মেয়েদের খুবই পছন্দ করতেন। চাইতেন নারী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে; চাইতেন তাদের হাতের সেবা শুশ্রূষা। চাইতেন মেয়েরা হবে সুন্দরী, কর্মনিপুণা, কিন্তু তারা কথা বলবে কম। মেয়েদের ভালো শ্রোতা হতে হবে; বক্তা নয়।

বড়োদিনের বিস্ফোরক উপহার

বৃটিশ কলাম্বিয়াতে এক কারারক্ষী 'বড়োদিনের উপহার' লেখা প্যাকেটটি খুললো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হাত দুখানা উড়ে গেলো। তার দশ বছরের ছেলেটিও আহত হলো। রক্ষীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর সে একটু সুস্থ হয়ে ওঠে। এই ঘটনার পর পুলিশ ফোন মারফত বাকি ২০০ জন কারারক্ষীকে সতর্ক ক'রে দেয় যে তারা যেন 'বড়োদিনের উপহার' ওই ভাবে আর না খোলে।

সুপ ডাক্তার

জার্মানীতে সুপের একটি সংগ্রহশালা খোলা হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে সংগ্রহ করা প্রায় ৩৫,০০০ রকম সুপ এতে স্থান পেয়েছে। দর্শকরা তা দেখে নিজেরাও বাড়িতে গিয়ে সুপ তৈরী করতে পারেন। 'ভোজনকে যদি অপেরার সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে সুপকে বলা যায় সুর মূর্ছনা'—বলেছেন উর্সুলা। তিনি বারো বছরে রন্ধন বিদ্যায় ২৫টি উপাধি লাভ করেছেন। তিনি আরো বলেন "রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অনেক ওষুধের চাইতে সুপের বেশি।"

ভল পুতুল আপনার গাড়ী চুরি করতে দেবে না

"আপনার মোটর গাড়ি চোরের হাত থেকে বাঁচাতে চান? তাহলে বড়োদিন উপলক্ষে আপনার স্ত্রীকে একটা ভল দিনে দিন—" বেলজিয়ামের এক কোম্পানী এই বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কম্বলে জড়িয়ে ওই পুতুলটিকে রেখে দিতে হবে গাড়ির পেছন দিকের সীটে। গাড়ির ভিতরে বাচ্চা ঘুমুচ্ছে দেখলে আর কোনো চোর মোটর চুরি করতে আসবে না।

———

মৃত পুতুলের জন্ম

নির্মলেন্দু গৌতম

টেবিলের ওপর সাজানো পুতুলটা। চীনেমাটির পুতুল। সাদা ধবধবে। কেবল চোখে আর ঠোঁটে কালো আর লাল রঙের স্পর্শ যাই যাই করেও লেগে আছে। পুতুলটা বড়ো না ছোট্ট। বড়ো হলে কি আর আনা সম্ভব হতো সেদিন?

এতো উপহারের মধ্যে ওই পুতুলটা না থাকলে কি হতো না? সহসা মনে হতেই সুধাময়ের দুর্বল মনে হোলো নিজেকে—অবসন্ন মনে হোলো। সামান্য একটা চীনে মাটির পুতুলের সামনে সুধাময়ের সমস্ত শিক্ষা সমস্ত ভাবনা যেনো সংকুচিত হয়ে উঠলো। পুতুলটার সুতোর মতো সরু ক'রে কালো রঙে আঁকা চোখের মধ্যে একটা বিদ্রূপের হাসি যেন ঝিলিক দিচ্ছে। ঠোঁটের কোণায় সেই হাসির স্পর্শ।

'আজকে হঠাৎ পুরোনো বাক্সটা থেকে বের হয়েছে পুতুলটা। দেখেই খেয়াল হলো, না হলে মনেও পড়তো না কোনোদিন।' অপর্ণা হাসতে হাসতে বললো। কথাটা না জানালেও চলতো। কথাটা তেমন প্রীতিকরও নয়। কারণ কারো উপহারকে অবহেলায় ভুলে যাওয়া অন্যায়। অবশ্য অপর্ণা এতোটা ভেবে দেখেনি। ভাবলে হয়তো কিছুতেই বলতো না। অন্য কথা বলতো। সুধাময়ের মনে কথা বলবার আরো হাজারটা প্রসঙ্গ আছে। কেবল সুধাময়ের মধ্যে যে অস্বস্তির রেখাটা ঘনিয়ে উঠছে, সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে একমুঠো রোদ্দুর দিতেই চায় অপর্ণা।

কিন্তু রেখাটা ঘন থেকে ঘনতরো হলো।

পুতুল—একটা সামান্য চীনেমাটির পুতুল—ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে উঠেছে। সুধাময়ের স্থির থাকবার শক্তিটুকু একটা মুমূর্ষু অজগরের মতো নিঃশেষে টেনে নিচ্ছে সুধাময় আর পুতুলটার চোখে চোখ রাখতে পারলো না। মুখটাকে ঘুরিয়ে অপর্ণার মুখোমুখি হতে চেষ্টা করলো। পারলো না সমস্ত শিক্ষা সমস্ত ভাবনা এমন কি সুধাময় নিজেও সংকুচিত হতে হতে একটা বিন্দুতে এসে পৌঁচেছে।

তোমাকে সুস্থ মনে হচ্ছে না তো।' একটু যেন বিবর্ণ গলায় বললো অপর্ণা। যদিও সামান্যতম সময় অতিক্রান্ত হয়েছে প্রথম কথাটা বলবার পর তবু এই সামান্যতম সময়টুকুর মধ্যেই সুধাময়ের মুখের রেখাগুলো যে অস্থির চঞ্চলতায় এঁকে বেঁকে ভেঙে চুরে নতুন কোনো ভাবনাকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলো। এবং সফলও হয়েছিলো তা অপর্ণার চোখ এড়ায়নি। এলোমেলো ছড়ানো মুখের রেখাগুলো সুধাময়ের মনের কোন ভাবনাকে ব্যক্ত করছে অপর্ণা তা ধরতে পারেনি।

রেখাগুলোর মানচিত্র তার অপরিচিত। সুধাময়ের মুখের রাগ, ঘৃণা, অভিমানের কোনো রেখাই অপর্ণার কাছে অপরিচিত নয়। আজ মিলছে না বলেই অপর্ণা বুঝতে পারলো সুধাময় সুস্থ নয়।

বিপন্ন অস্তিত্বটুকু বিন্দু থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই উঠে দাঁড়ালো সুধাময় বললো, 'না আমি অসুস্থ নই। কিন্তু আমি যাবো এবার—

'যাবে। এখুনি উঠবে কি?' অপর্ণা বিস্মিত হলো।

'আমার একটু কাজ আছে।' জানালার ঘষা দিয়ে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিলো সুধাময়। যেখানে দৃষ্টিটা স্থির হলো সেখানেই নিজেকে স্থাপন করতে চেষ্টা করলো। একটা চারতলাবাড়ীর ছাদে।

'হঠাৎ কাজের কথা মনে হলো? এসে তো বলোনি?'

'এসেই যে বলতে হবে এমন কোনো কথা আছে নাকি?'

'নেই।' অপর্ণা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো। সুধাময়ের কণ্ঠ কিছুটা রুক্ষ। রেখাগুলো মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। অপর্ণা একটু থেমে ফের বললো, 'চা খাবে বলেছিলে—'

'দরকার নেই আর।'

'বাব্বাঃ, তোমাকে বুঝতে আমার কয়েকটা কুমারী জন্ম লাগবে।' অপর্ণার গলায় কিছুটা ক্লান্তি ঝরলো।

সুধাময় এবার কোনো প্রতিবাদ করলো না। এমনকি অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মুখে কৌতুক বা হতাশা তাও দেখলো না। নিজেকে সেই চারতলার ছাদ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড় করালো। 'চলি' কথাটা অপর্ণার দিকে ছুঁড়ে দেবার জন্য মুখ ঘোরাতেই সেই মাটির পুতুলটার ওপর চোখ পড়লো। পুতুলটা আরো বড়ো হবার জন্য হাতে মাথা ঘষছে।

'চলি, কথাটুকুও বলতে পারলো না সুধাময়, চৌকাঠের পর্বতটাকে প্রবল শক্তিতে পার হয়ে বারান্দায় এলো। হাঁপাচ্ছে সুধাময়। নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে বারান্দাটা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফুটপাথে এসে দাঁড়ালো।

মুখ ওপরে তুলে দেখলো অপর্ণার অসহ্য মুখ। মুখ নামিয়ে হন হন করে এগুতে লাগলো সুধাময়। সোজা। বাইশ বছর আগেকার ছোট্ট একটা পুতুল কেমন বিশাল হয়ে সংকুচিত করে ফেলেছে সুধাময়কে। পুতুলটা হারিয়ে গেলে ক্ষতি কি হতো! সুধাময়ের মনে হলো আবারও।

সামান্য একটা চীনেমাটির পুতুল।

কিন্তু এই পুতুলটাই সেদিন অসামান্য হয়েছিলো। অসামান্যই বটে। বাইশ বছর আগে এই চীনে মাটির পুতুলটার অসামান্য হতে কোনো বাধা ছিলো না।

অপর্ণা ছাদের ওপর আপন মনে পুতুল খেলছিলো। একরাশ পুতুল অপর্ণার। একটাও পুতুলও এই চীনেমাটির পুতুলটার মতো সুন্দর ছিলো না। সবগুলো ন্যাকড়ার তৈরী। কালো সুতোয় তার চোখ মুখ তৈরী। চুলও তৈরী কালো সুতোয়।

পকেটের মধ্যে পুতুলটাকে লুকিয়ে দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিলো সুধাময়। মনের মধ্যে প্রবল এক উত্তেজনা ঝোড়ো হাওয়ার মতো মাতামাতি করছিলো। অপর্ণা অমন করে সুধাময়কে উঠতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো।

'আমার পকেটে একটা চমৎকার জিনিস আছে। হাসাতে হাসাতে বলেছিলো সুধাময়।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে সুধাময়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো অপর্ণা। এক মুহূর্তে।

'কী দেখি—লক্ষ্মীটি দেখাও না।'

'চমৎকার জিনিসটা কি বলতে পারলে—' বলতে পারলে কি হবে তা ভাববার অবকাশটুকুর মধ্যেই অপর্ণা নির্দ্বিধায় বলেছিলো, 'পারবো না।'

কাজেই পুতুলটাকে বের করতে হয়েছিলো তখুনি। অপর্ণা পুতুলটা হাতে নিয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলো।'

'বা কী চমৎকার পুতুল। কী আনন্দ যে লাগছে—' অপর্ণা একটা ঝাকড়ায় পুতুলকে ন্যাংটো করে তার সুন্দর শাড়ীটা তখুনি পরিয়েছিলো চীনেমাটির পুতুলটাকে। তারপর পুতুলটাকে সুধাময়ের সামনে এনে বলেছিলো, 'কী কেমন দেখাচ্ছে এবার?'

'এবার আরো বেশী চমৎকার লাগছে কিন্তু।' বলেছিলো সুধাময়। ভালো লাগছিলো তা সত্যি। মনে হচ্ছিলো যেমো মেম সাহেবকে কেউ কাপড় পরিয়েছে।

তখুনি ঝাকড়ার সব পুতুল বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। অপর্ণার খেলাঘরে একটি পুতুলেরই রাজত্ব—চীনেমাটির পুতুলের। সুধাময়ের দিকে আর নজর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি অপর্ণা।

পুতুলটা আর সামান্য চীনেমাটির পুতুল হয়ে থাকে নি সেদিন। রোমাঞ্চিত আনন্দে দুলে উঠেছিলো সুধাময়। আস্তে আস্তে ছাদ থেকে নেমে অপর্ণাদের বাড়ীর বাইরে গলিতে নেমেছিলো। নামতেই ওদের মুখোমুখি।

'জানিস ও টের পেয়েছে বোধহয়।' ওরা বলেছিলো।

'যাঃ, টের পেতেই পারে না।' বিবর্ণ মুখে বলেছিলো সুধাময়, 'আমি তেমন ভাবেই আনিইনি।'

'তোর খোঁজ করে বললো যে—' ওরা বলেছিলো।

'বলতেই পারে না।' ভীষণ কান্না পাচ্ছিলো সুধাময়ের। চোখের সামনে ভাসলো পুতুলটা পাবার পর অপর্ণার খুশী খুশী মুখ।

'আমরা অবশ্য ভয়ংকর ঝগড়া করে এসেছি তোর জন্য।' ওরা বলেছিলো এবং বলেই চলে গিয়েছিলো।

ওদের জন্যই আজ নিজেকে এমন হতে হলো—ভেবেছিলো সুধাময়। ওরাই শিখিয়েছিলো। ওরাই টেনে টেনে নিয়ে যেতো। না গেলে কেমন বিশ্রী সব কথা বলতো। নিজেদের মধ্যে কী সব বলে হাসাহাসি করতো।

প্রথম যেদিন ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়েছিলো সেদিনের কথা মনে হয়েছিলো তখুনি।

সুধাময় একটা বেল্ট কিনবে। ছোট্টকা পয়সা দিয়েছেন। লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিলো সুধাময়। ওরা গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিলো। বললো, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বেল্ট কিনবো।'

'বেল্ট কিনবি? চল আমরাও যাই তোর সঙ্গে। দেখেশুনে কিনে দেবো। দাম বেশী চাইতে পারবে না।' ওরা বললো।

সুধাময় ভাবলো মন্দ কি। ছোটো দেখে যা খুশী গছিয়ে দিতে পারে দোকানদার। কিন্তু ওরা মেলে আর সেটি করবার জো নেই।

'বেশ তো চল।' সুধাময় বললো।

হৈ চৈ করতে করতে ওরা দোকানে ঢুকলো। তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে নানারকম বেল্ট বাছলো সবাই। বেছে বেছে একটা বেল্ট বের করলে ওরা সুধাময় সেটাই কিনে ফেললো।

ওরা বললো, 'চল এবার ফেরা যাক্।'

গলির মোড়ে আসতেই ওরা বললো, 'দেখবি একটা মজা।'

'মজা, কি মজা দেখি? সুধাময় অবাক হলো একটু, কী মজা দেখাবে ওরা? ওরা সবাই একসঙ্গে জামা তুলে ফেললো। আর সুধাময় অবাক হয়ে দেখলো, সবার কোমরে একটা করে নতুন বেল্ট।

'একী, ওখান থেকে নিয়েছিস বুঝি?'

'নেবো না? তোমার মতো ছাঁদা নাকি? যে পয়সা দিয়ে বেল্ট কিনবো? ও পয়সা দিয়ে ম্যাটিনি শো—মেমের ছবি দেখলে অনেক আনন্দ পাওয়া যাবে।' ওরা এই বলেই এ ওর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। যে হাসিকে সুধাময়ের সর্বদাই রহস্যময় মনে হয়।

'এরপর কিছু কিনতে হলে আমাদের নিয়ে যাবি কিন্তু।' ওরা বললে আমায়, 'আমাদের কিছু হ'লে তোর আপত্তি কি, এ্যাঁ?'

না, আপত্তি নেই। বরং মজাই লাগছে ব্যাপারটা।

সুতরাং সেদিন থেকে দোকানে যেতে হলেই সুধাময় ওদের নিয়ে যায়। গলির মোড়ে এসে ওরা দেখায় সুধাময় যা কিনেছে তার একটা করে সবার কাছে। জিনিসটা তেমন কাজের না হলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওরা। অথবা সুধাময়কে দিয়ে দেয়—অবশ্য ফেলে দেওয়াতেই ওদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ।

সেদিন কাজ ছাড়াই মোড়ে এলো সুধাময়। ওরা কেমন রহস্য রহস্য ক'রে গোপন কথা বলে। ইংরেজী সিনেমার মেয়েদের গল্প বলে। ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে মাঝেই ইংরেজী সিনেমা দেখে কি না।

একটা গোপন অরোজা আবরণ থাকে ব'লে ওদের আকর্ষণটা তীব্র সুধাময়ের কাছে। অনেক কিছু জানবার ইচ্ছেটাকে ওরা হাসাহাসি করে। ওরা সব জানে বলেই অমন করে বোধহয়। মনে হয় সুধাময়ের।

মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরা সব গল্প করছিলো আর হাসছিলো। সুধাময়কে দেখেই ওরা গল্প বন্ধ করলো। বোধহয় মেয়েদের গল্প করছিলো। বললো, 'তুই হঠাৎ, কোথাও যাবি নাকি?'

'উহু।'

'সিগ্রেট খাবি?'

'সিগ্রেট।' প্রায় চমকে উঠেছিলো সুধাময়। 'না খাবো না। খাইনা আমি। অল্প বয়সে সিগ্রেট খাওয়া খারাপ।'

'যেচে যে মেয়েদের গল্প শুনতে চাও ? সেটা বুঝি খারাপ নয় ?' ওরা বললো, সুধাময় অপ্রস্তুত হলো, 'খাইনি তো কোনোদিন। তাই যদি খারাপ লাগে ?'

'আচ্ছা থাক, আজ খেতে হবে না তোকে, আজ পয়লাও নেই যে তোর জন্ত কিনবো।' ওরা বললো। তারপর সুধাময়কে নিয়ে সোজা এলো দোকানে।

দোকানী ভদ্রলোক তাঁর পুতুলগুলো চীনেমাটির পুতুল সাজিয়ে রাখছিলো। ওদের হঠাৎ নজর পড়লো সেদিকে। সুধাময়েরও।

'বাঃ, সুন্দর তো পুতুলগুলো। দেখি দেখি—কতো করে ?' ওরা জিজ্ঞেস করলো। দাম শুনে দোকানী পুতুলগুলো এগিয়ে দিলো।

ওরা সবাই নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। যেন খেলছে নিজে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের দামে হাত দিলো সুধাময়।

হঠাৎ কী যেনো হয়ে গেলো মাথার মধ্যে। সুধাময় একদিক ওদিক তাকিয়ে একটা পুতুল ঢুকিয়ে দিলো পকেটের মধ্যে।

থরথর করে উঠলো শরীরটা, পকেটটা যেন নিজের চেয়েও বেশী ভারি হয়ে গেলো। কার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ওরা হাসছে আর পুতুল বেছে চলেছে।

হঠাৎ সুধাময় বললো, 'আমি যাইরে—'

'আচ্ছা যা, ওরা বললো, সুধাময়ের দিকে নজর রেখেও ওরা বুঝি ভুল মনে করলো না। পুতুল পছন্দ করতে ব্যস্ত ওরা। যেন অনেক পুতুল কিনবে।

সুধাময় ছুটতে ছুটতে এসেছিলো অপর্ণাদের বাড়ীর সামনে। বুকের মধ্যে তখন ঝড়ের উত্তেজনা। অপর্ণাকে ডাক দিয়ে ডেকে। প্রবল আনন্দে অপর্ণাকে পুতুলটা দেবার পর ছুটতে ছুটতে ওদের সঙ্গে দেখা করেছিলো। আর সেই কথাগুলো বলেছিলো ওরা।

সেদিন ওরা চলে যেতেই সুধাময় দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলো। না আর ওদের সঙ্গে নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে ওইসব খারাপ গল্প শুনতে সুধাময়ের ঘেন্না হয়ে গেছে। খারাপ গল্প শুনলে পড়লে মন বলে না। কেমন অস্বস্তি বোধহয় মনের মধ্যে।

সত্যি সত্যি সুধাময় আর কোনোদিন মেশেনি ওদের সঙ্গে।

তারপর অনেকদিন সুধাময় অপর্ণাদের বাড়ী যায়নি। চীনে মাটির পুতুলটা যেনো পুলিশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো সামনে। সেই পুলিশ পুতুলকে অতিক্রম করবার মতো সাহস ছিলো না সুধাময়ের অপরাধটা বিশুণ হয়ে ফিরেছিলো সুধাময়কে। সেই ছোটো বয়সটা যেন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো সেদিন।

তারপর অপর্ণা যেদিন উঁকি দিয়েছিলো একখানা রৌদ্রের মতো পুতুল খেলার বয়সটা অতিক্রম করে সেদিন আর কোনো সংকোচ ছিলো না সুধাময়ের মনে। কারণ খরাদগ্ধ পুতুলটার তখন মৃত্যু ঘটেছে। অনেকগুলো বছরের সমুদ্রের জলে ধুয়ে যে স্মৃতিও ফিকে হতে হতে একেবারে মুছে গিয়েছিলো।

আজকে দীর্ঘ বাইশ বছর পর অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছে পুতুলটা। বাইশ বছর আগেকার সেই দিনটা। দুরু দুরু করে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলো সুধাময়, বড়ো ঘরে ঘরে অন্ধকার অবরোধ করে ফেলেছে। পেছনে তাকালো সুধাময়—ওরা হাসছে। মেয়েরা সব ওরাই যেন চক্রান্ত করে পুতুলটাকে মৃত্যুর অতীত দিয়ে পাঠিয়েছে। মৃত পুতুলের মৃত্যু হয়ে গেছে। সেদিন ওদের সব ত্যাগ করবার জন্য সুধাময়ের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। সুধাময়ের মুখটুকুতে ওরা চুমুকের মতো গ্রাস করে ফেলতে চায়—কারণ ওরা মেয়ের পায়ের মতো সুখ খুঁজে মরছে অন্ধকারে ঘুরছে।

অভিজয় করে আসা লম্বুগুলো যেন চেতনার সারল্য মাখায় করে মৃত্তিকানিস্তব্ধতাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওদেরই চক্রান্তে।

সুধাময়ের হাঁটার গতি দ্রুত হলো। অবসন্ন লাগছে। একটা বাইটপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো সুধাময় অবসন্ন ভাবে ভাবলো ওদের বিভিন্নই তো প্রতিমুহূর্তে বিশ্বলোক থেকে বাঁচিয়ে রাখছে চিরকালের জন্য। তাদের সবার সঙ্গে এ পুতুলটা বাঁচিয়ে রেখে কী-ই বা ক্ষতি হতো।

জলরঙ

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

'তুমি বলছ এটা ভালোবাসা নয়?'

শশাঙ্কের কথায় দৃঢ়স্বরে হরিপদ বললে, 'না, ভালোবাসা নয়। এ হচ্ছে নিছক রোমান্স।'

'রোমান্স কী?'

'রোমান্স হচ্ছে চোখের রঙ। যে-চোখে তুমি দেখবে। ধরো না কেন, দূরের পাহাড়কেও নীল দেখা যায়। আকাশের রঙ তাও নীলাভ হয়ে ওঠে,—এগুলি তোমারই চোখের চাওয়ার রঙ। রোমান্সই কখনো কখনো ঘন মাছপাতাকে সবুজ থেকে বেগুনে দেখতে দেখায়।'

'রোমান্স কী তা হলে কল্পনা নয়?'

'না নিছক কল্পনা রোমান্স নয়। রোমান্সটা গড়ে ওঠে কোন এক ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে। সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে তুমি চোখের সামনে দেখতে পাও,—তাকে তুমি স্পর্শ করতে পারো, অনুভব করতে পারো।'

'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা।'—শশাঙ্ক বললে হরিপদকে। হরিপদ একজন সাহিত্যিক—মনস্তত্ত্ববিদ। শশাঙ্ক বাকি সম্প্রতি কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি তাঁরই অফিসের সহকর্মিনী। এতদিন শশাঙ্ক তাকে তেমন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নি; কিন্তু সম্প্রতি মেয়েটি তার ধ্যান জ্ঞানের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক মোটামুটি সুপুরুষ যুবক। বাড়ির অবস্থাও ভালো। তারপক্ষে মার্চেন্ট অফিসের সামান্য বেতনের চাকুরিজীবী অত্যন্ত এক সাধারণ মেয়ের পাণি গ্রহণ করা একেবারেই হতাশার ব্যাপার। বন্ধু-বান্ধবরা অবশ্যই কেউ কেউ উৎসাহ দিয়েছে, যেমনা, নত উষ ইটার্ন্যাল। সেক্ষেত্রে চেহারা আর অবস্থা বড় কথা নয়। কিন্তু শশাঙ্কের বাড়ির সকলেই এ-ব্যাপারে একবাক্যে বলা হত। অমন মেয়ের সঙ্গে ভদ্র বংশের সদ্ভ্রান্ত বংশজের বিয়ে নিতান্তই অব্যাপারেষু ব্যাপার।' বাড়ির সকলেই বলেছে, এটা প্রেম নয়, নিতান্তই চোখের নেশা। এ-নেশার স্থায়িত্ব বেশি দিনের নয়। চোখের রঙ ঘুচে গেলে ও মেয়ে তখন সলগ্রহই হয়ে উঠবে।

হরিপদ এ-বাড়ির নিকটজন। তাই এ বিষয়ে একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে শর্মিতা। শর্মিতা শশাঙ্কের ছোট বোন। বেশ বিত্তবান ঘরের মেয়ে। হরিপদ তার বিশেষ অনুরাগী।

শর্মিতা হরিপদকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'হরিপদদা, এ-বিপদ থেকে উদ্ধার করো আমাদের।'

'কীসের বিপদ?'

'দাদা ক্ষেপেছে।'

'মানে?'

'মানে, দাদা তার অফিসের একজন মেয়ের প্রেমে পড়েছে। তাকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে চায়।'

'তাতে আর তোমাদের আপত্তির কারণ কী?'

শর্মিতা বাঁকা চোখে তাকালে হরিপদর দিকে।—'বলো কী? তুমিও এই কথাই বলবে!'

'কেন, অন্যায়টা বলবার কোথায়?'

'অন্যায় নয়?'

'আহা, সেই কথাটাই বুঝিয়ে বলো আমাকে।'

'মেয়েটি আমাদের পাল্টা ঘরের নয়।'

'তাতে কী? অসবর্ণ বিবাহ এখন আর অসামাজিক কিছু নয়।'

'আচ্ছা, তাও না হয় মেনে নিলাম।'

'তবে?'

'মেয়েটি অত্যন্ত কুৎসিত দেখতে।'

শর্মিতার কথায় হরিপদ হেসে বললে, 'সে তো তোমার চোখে!'

শর্মিতা ক্ষেপে গেল, 'শুধু আমার চোখে কেন? যারাই তাকে দেখেছে,—তাদের চোখেই। তুমি যদি দেখ, তোমার চোখেও ঠিক আমাদেরই দৃষ্টির প্রতিবিম্ব দেখা যাবে।'

হরিপদ তাতেও হটে গেল না। বললে, 'কিন্তু সে মেয়ে তো তোমার আর আমার ঘরের ঘরণী হতে যাচ্ছে না। যে বিয়ে করবে তার চোখে যদি সে প্রকৃত সুন্দরী হয় তা হলে তোমার আমার বলবার কী আছে?'

শর্মিতা অভিমানে এবার কেঁদে ফেললে। বললে, 'এই তুমি আমাদের আত্মীয়? আমাদের সংসারের ভালো মন্দের প্রতি এই তোমার দৃষ্টি?'

হরিপদকে মোড় ঘুরতেই হল এবার। শর্মিতার চোখের জল তাকে কাবু করেছে। বললে, 'তা আমি কী করতে পারি বলো?'

'তুমি যুক্তি দিয়ে দাদাকে বুঝিয়ে বলো।' হরিপদ যুক্তি দিয়েই সে কথা বলতে এসেছে আজ শশাঙ্কতে। তাই ভালোবাসা আর ভালো লাগা নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত।

হরিপদ বললে শশাঙ্কতে, 'দেখ, ভালোলাগার পরমায়ু হয়ত বেশি দিন নাও হতে পারে। আর ভালোলাগাটা বড় হাল্কা জিনিস—তার স্থায়িত্ব অধিকের। কিন্তু ভালোবাসা তা নয়।'

শশাঙ্ক বাধা দিলে, 'কিন্তু ভালোলাগা থেকেই তো ভালোবাসা?'

'না, সর্বক্ষেত্রে তা নয়।'

'বুঝিয়ে বলো হরিপদ দা। কনক্রীট কিছু।'

'হ্যাঁ, আমাদের আলোচনাটা আবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আমি একটা গল্প বলি শোন।'

'গল্প!—সেও তো কল্পনার কথা!'

শশাঙ্কের কথায় হরিপদ বললে, 'না বিলুক গল্প নয়। আমারই জীবনের একটি ঘটনাকে বলছি শোন।'

গল্প এবং তা প্রত্যক্ষ আত্ম-কাহিনীর কথা শুনে শশাঙ্ক শান্ত হল। আর ঘরের দরজার বাইরে বারান্দায় বসে শর্মিতা যে আত্মগোপন করে শশাঙ্ক এবং হরিপদের কথাবার্তা শুনছিল এইবারে সেও আর নিজেকে আড়ালে রাখতে পারলে না। শর্মিতাও দ্রুতপদে সে ঘরে এসে একটা মোড়ায় বসে পড়ল।—'কী গল্প হরিপদ দা'?'

'ভালোলাগার একটা আত্ম-কাহিনী।'

'বলো, শুনি।'

'শোন।' হরিপদ গল্প সুরু করল :

'ললিতাকে দেখেছিলাম একটা চায়ের দোকানে।'

'মেয়েটির নাম কী ললিতা?' শর্মিতাই হরিপদর দিকে আগ্রহের দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল।

'ঠিক ললিতা কিনা তা আমার জানা নেই। তবে সেদিন তাকে আমি ললিত-রাগিনীর ছন্দেই দেখেছিলাম।' হরিপদ উত্তর দিলে।

শর্মিতা আবার প্রশ্ন করল, 'ললিত-রাগিনীর ছন্দ আবার কী? ও তোমাদের কবির ভাষা আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝি না। পরিষ্কার করে বলো।'

'পরিষ্কার করেই বলছি শোন।' হরিপদ আবার গল্প সুরু করল।

'সেদিন আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নেমেছে। আফিস-ফিরৎ একটা চায়ের দোকানে আশ্রয় নিলাম। দোকানের ছলঘরের সাধারণ আসনগুলি খরিদ্দারে পরিপূর্ণ। তাই একটা কেবিনে ঢুকলাম। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে আমাকে রিসিভ করলে।'

শর্মিতার চোখে আবার আগ্রহের দৃষ্টি,—'বোষ্টমের মেয়ে?'

'হ্যাঁ, ইংরেজিতে যাকে ওয়েট্রেস' বলে আর কী? বাংলায় বলো পরিচারিকা।'

শশাঙ্ক মন্তব্য করলে, 'হ্যাঁ, আজকাল কলকাতার কিছু কিছু বোষ্টমের মেয়েরাও কাজ করে।'

শর্মিতা আবার আগ্রহের সুর তুললে, 'মেয়েটি দেখতে কেমন? বয়েস কত?'

'সেই কথাই বলছি শোন।' হরিপদ আবার কাহিনী সুরু করলে :

'বাইরে শ্রাবণের অবিশ্রা ধারা। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণ বর্ষণ-গীতি শোনা যাচ্ছে। মেয়েটির পরণে একখানি মেঘরঙা শাড়ি। গায়ে শর্ট স্লাউজ। ঠোঁট দুটিতে ঈষৎ লিপষ্টিকের ছোঁওয়া। বয়েস? হ্যাঁ, সে বয়সে যে-কোন মেয়েকে সুন্দরী দেখায়—সেই বয়েসই তার।'

'অর্থাৎ যৌবনে কুরূপাও সুন্দরী—এইতো!' সরস টিপ্পনি কাটলে শর্মিতা।

হরিপদ বলতে লাগল 'তা ঠিক জানিনে। তবে সেদিনের পরিবেশে তাকে আমার ভালোই লেগেছিল। তার এগিয়ে আসার ভঙ্গি, তার বিনম্র কণ্ঠস্বর, তার সুকোমল ব্যবহার—আমাকে স্নিগ্ধ করেছিল। সমস্তদিন আফিসে হাড়-ভাঙা খাটুনির পর বাইরে ঘন বৃষ্টির আচ্ছাদন স্বরূপ বোষ্টমের এই ছোট্ট কেবিনটা সত্যিই ভালো আশ্রয়স্থল বলে বোধ হচ্ছিল।'

'তার ওপর যৌবনবতী এক মেয়ের লাবিণ্য এবং বৃষ্টির সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত অবশ্যই ভালোলাগবার কথা।'—আবার টিপ্পনি কাটলে শর্মিতা।

'তা বলতে পার।'—হরিপদ আবার বক্তব্যে ফিরে এল। 'মেয়েটি আমার কাছে এগিয়ে এসে টেবিলে হাত রেখে দাঁড়ালো।—চা, তার সঙ্গে আর কী দেবো আপনাকে? কবিরেজী কাটলেট দিই?' মেয়েটির চোখে স্নিগ্ধ প্রশ্ন।

'চা নয়, কফি। আর কবিরেজী কাটলেট নয় ফিস ফ্রাই।'

'আচ্ছা'। মেয়েটি মেঘ শাড়ির আঁচল দুলিয়ে যাচ্ছিল। ডাকলাম তাকে। কী যেন এক নেশায় আমেজ আমার মধ্যে। বললাম, 'হ্যাঁ দেখ, কফি এককাপ নয়। দু'কাপ। আর ফিস্ ফ্রাই বা কবরেজী কাটলেট যা তোমার পছন্দ।'

'তার মানে?'—মেয়েটি আমার দিকে তাকালে

বললাম—'অনুরোধ ঠুলে বুঝোনা। আমি অভদ্র নই। তোমাকে অমর্যাদা করবার জন্যে বলিনি। আমার সঙ্গে তুমি বসে যদি খাও,—তাতে কী তোমার আপত্তি আছে?'

মেয়েটি কুণ্ঠিত স্বরে বললে, 'না। আচ্ছা দু'জনের জন্যেই নিয়ে আসছি।' মেয়েটি লঘুপদে চলে গেল।

'কী আশ্চর্য হরিপদদা! তুমি এমন বেহায়াপনা করতে পারলে সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে?'—তীক্ষ্ণ স্বরে শর্মিতা প্রশ্ন করলে।

হরিপদ বললে, 'ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে হয়ত পারতাম না। কিন্তু বৃষ্টির মেঘার নিঃসঙ্গতাকে মুখর করে তুলতে সেদিন কেমন যেন পারলাম।'

শর্মিতা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'তারপর? তারপর কী হল তাই বল হরিপদ দা।'

'বলছি শোন।' হরিপদর কাহিনী আবার এগিয়ে চলল 'মেয়েটির নামকরণ আমিই করলাম ললিতা। তার লালিত্যকে ঘিরে সেদিনের চায়ের আসর ঘুরে তবে উঠল। ললিতা এসে বসল আমার সামনে। আমরা দুজনে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম অতি অল্পক্ষণের মধ্যে।' চুপিস্বরে কথা চলতে লাগল, —'এখানে চাকরি কর কেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে ললিতা বললে, 'লেখাপড়া তো শিখিনি। আর কী চাকরি করতে পারি বলুন।'

'কত মাইনে পাও?'

'পঞ্চাশ টাকা মাইনে। আর তার সঙ্গে কমিশন।'

'কমিশন কী?'

'বিক্রির অনুযায়ী। যেমন বিক্রী করতে পারব। আর উপরি কিছু টিপস্।'

'এ-চাকরিতে অনুবিধে বোধ কর না?'

'তা যে একেবারে করি নে তা নয়। তবে প্রোপ্রাইটর আমাদের দেশের লোক, তাই আপনে রাখেন।'

'সংসারে আর কে আছেন?'

আমার কথায় ললিতা আমার দিকে তাকালে। বললে, 'অনেক ঝামেলা-ঝামিত্ব আমার। অথর্ব বাপ, অসুস্থ মা, আর কচি-কাচা অনেক ভাই-বোন। সব ভার আমারই।'

ললিতার কথায় মন ভিজে উঠল! বললাম, 'বিয়ে হয়ে গেলে করবে কি?' ললিতা আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকালে, 'আপনি জানলেন কেমন করে?'

'তোমার চোখ দুটি দেখে।'

'সেইকথাই তো রাতদিন ভাবছি।'

'ছেলেটি কী করে?'

'চাকরি করে।'

'কোথায়?'

'এক কারখানায়।'

'তার সংসারে আর কে আছেন?'

'তাদের সংসার অবস্থাপন্ন নয়।'

'তবে আর তোমার ভাবনা কী!'

'বিয়ে হলে কী আর চাকরি করতে দেবে?' ললিতার কথায় সমস্যার সুর। আজকালকার ছেলেরা চাকরি-করা বৌ-পাবে মেয়েই পছন্দ করে বেশি। তাতে সংসারের আয়পয়। কিন্তু বিয়ের পর প্রণয় মনে মেয়েদের অফিসি-জীবন আর স্বাধীন চলাফেরা বেশামেশা কেউ আবার গ্রহণ করতে পারে না। বিশেষ করে হোটেল গার্লদের সর্বক্ষণই পুরুষ খরিদ্দারের মনকে আকর্ষণ করতে হয়।'

ললিতা বললে—'সে বলছে বিয়ের পর আর আমায় এ-চাকরি করা চলবে না।'

'তাহ'লে তোমার বাপের 'বাড়ির' সংসার চলবে কেমন করে?'

ললিতা বললে, 'সে-কথার জবাবে সে বলে সব ভার নাকি তার।'

'তবে আর ভাবনা কী?' টুকিটাকি এইসব কথার মাঝখানেই ফকির পেয়ালা নিঃশেষিত হয়ে গেল। এই স্বল্প সময়-টুকুর মধ্যেই ললিতা আমার মনের সান্নিধ্য লাভ করল।

'আর কিছু খাবেন?'

'না। তুমি যদি কিছু—'

ললিতা বললে—'আমি তো আপনার অনুরোধে খেলাম।'

আমি বললাম, 'তা হলে এবার বিদায় নিই।'

ললিতা আমার দিকে তাকালে। বললে, 'বাইরে এখনো বৃষ্টি পড়ছে।'

আমি বললাম, 'ভিজেই যেতে হবে তা হলে।'

'না ভিজে যাবেন কেন? বসুন। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।'

'কতক্ষণ অপেক্ষা করব?'

'যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু শুধু শুধু বসতে দেবে কেন এরা?'

ললিতা বাধা দিলে—'না, না, আমাদের প্রোপাইটর সেরকম লোক নয়।'

'তাহলে আর একটু বসি। কিন্তু তুমি কী করবে?'

'যতক্ষণ না অন্য খদ্দের আসছে ততক্ষণ আমার এখানে বসে থাকার আপত্তি নেই।'

আমরা দু'জনেই বসলাম। মুখোমুখি দু'জনায়। বৃষ্টি আরো জোরে নামল। বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টির শব্দ। রাস্তার একহাঁটু জল জমে গেছে। কেবিনের মধ্যে শুধু আমরা দু'জন। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে। কী একটা আধুনিক গান বর্ষা বিরহ-কাতরতায় ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ ফিরছে।

ললিতাকে জিগ্যেস করলাম, 'কত রাত পর্যন্ত ডিউটি এখানে তোমার?'

'রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর আমাদের ছুটি।'

'আমাদের মানে ?'

'আরো দুজন মেয়ে এখানে কাজ করে। আপনি দেখেন নি তাদের ?'

'না। আমি আজ প্রথম এই রেস্তোরাঁয় এলাম।'

নিরনের আলো জ্বলছে। খানিকটা নীল আলো। সেই আলোতে আবার মুখ দেখলাম ; দেখি তার সে মুখ কীসের এক প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ললিতা, কোথায় থাকো ?'

ললিতা উত্তর দিলে—'উল্টোডাঙায়।'

'আর তোমার ভাবী—'

আমার কথায় লজ্জা পেয়ে গেল ললিতা। বললে, 'বাগবাজারের খালের ধারে।'

'তবে তো কাছাকাছিই দু'জনে থাক। মনের সঙ্গে যেমন কাছাকাছি দু'জনায়।'

আরো হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিলাম ; কিন্তু বাধা পেলাম। আমাদের কেবিনের বাইরে কাদের যেন আনাগোনা। ললিতা বার হয়ে গেল। তার কণ্ঠে অভ্যর্থনার সুর শোনা গেল। এই বৃষ্টির মধ্যেই একজোড়া তরুণ-তরুণী। দম্পতি ?—না, মেয়েটির সিঁথের সিঁদুর নেই। আফিস-ফিরৎ কোন অফিস-কর্মী এবং সহকর্মিনী হবে। উঠে কেবিনের বাইরে এলাম।

এ-বৃষ্টি আর থামবে না। অগত্যা বৃষ্টিতে ভিজেই বাড়ির পথ ধরতে হবে। হরিপদ বাবুল।

শমিতা বললে, 'যাঃ, প্রেমটা মাঝপথে একেবারে মাঠে মারা গেল যে। পুরোই বিচ্ছেদ ! তাহলে পরিণতি হল কী ?'

শশাঙ্ক বললে, 'হরিপদবা গল্পের উপসংহার করো।'

হরিপদ বললে, 'গল্পের আরম্ভ যখন আছে,—তখন উপসংহার যাহোক কিছু আছে বৈকি !' শমিতা এবং শশাঙ্ক দু'জনেই সমস্বরে বললে, 'সেই উপসংহারেই ফিরে এসো তাহ'লে।'

'সেই কথাই বলি শোন।' হরিপদ এইবার একটা মোটা চুরুট ধরালে।

শমিতা এরই মধ্যে কফির ব্যবস্থা করেছে। আর কিছু টুকিটাকি জলখাবার। চাকর এসে একটা ট্রে টেবিলের ওপর রাখলে।

শমিতা কফি পরিবেশন করতে লাগল।

'না, তোমার বুদ্ধির তারিফ করি শমিতা। কফির পেয়ালায় গল্পের পরিণতি অনেক ভালো।' হরিপদ কিছুক্ষণ বিরতির বেগা টানলে। তারপর সুরু করলে আবার সেই কাহিনী। 'হ্যাঁ প্রথমেই বলছিলাম যে কথা সেই কথা দিয়েই পরিণতিকে সাজানো যাক ! কী বল শশাঙ্ক ?'—হরিপদ শশাঙ্কের দিকেই তাকালে।

শশাঙ্ক বললে, 'তোমার মত এইতো ?'

'হ্যাঁ, ভালোলাগা আর ভালোবাসা। ভালোলাগা শুধু চোখের রঙ আর ভালোবাসা হচ্ছে হৃদয়ের রঙ। চোখের রঙ মুছে যায় তাড়াতাড়ি ; কিন্তু হৃদয়ের রঙের ছোপ অনেক গভীরতর।'

শশাঙ্ক বললে, 'আবার কিন্তু এ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে হরিপদ দা।'

হরিপদ হাসলে মিলে, 'না, এইবার ফ্যাক্টর অফ ফ্যাক্ট-এ ফিরে আসা যাক।'

শমিতা এখন আর কোন কথা বলছে না। গভীরভাবে হয়ত ললিতার কথাই ভাবছে সে।

হরিপদ বললে, 'আর একদিন গেলাম সেই অফিস-পাড়ার রেস্তোরাঁয়। আফিসের ছুটির আগেই কী একটা কাজে যার হয়েছিলাম যেন। ঠিক দুপুর বেলায়—কাজে যাওয়ার আগে চা-খেতে ঢুকলাম সেই রেস্তোরাঁয়। পরপর তিনটে বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়েছিল তিনটে মেয়ে। তখ দুপুর বেলা। খদ্দেরপাতি তখনো এসে হাজির হয়নি। তাদের শুশোটে ভরা দুপুর। টিকিন পীরিয়ডও তখন সুরু হয়নি। এই বেলা আন্দাজ বারোটা,—মানে বারোটা হবে আর কি।'

শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করলে, 'সেই তিনটে মেয়ের মধ্যে তোমার নলিতাও ছিল?'

হরিপদ উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'তারপর আমাকে দেখেই নলিতা ধড়মড় করে উঠে বসল। কিন্তু এ-নলিতা সে নলিতা নয়।'

নলিতা এইবার মুখ খুললে, 'তার মানে?'

হরিপদ বললে, 'সেই শ্রাবণ-বর্ষণ-সন্ধ্যায় মেসবাড়ী পার্টিতে যে-মেয়েটিকে দেখেছিলাম, আমার সেদিনের দৃষ্টিকে আজ আর ফিরে পেলাম না। এ-মেয়েটি তাদের শুশোটে নিতান্তই কুৎসিত। লাল টক্‌টকে একখানি শাড়িতে আচ্ছাদিত তার যৌবন দেহ আমাকে পীড়া দিতে লাগল। তার কর্কশ কণ্ঠে ঘরে চমকে উঠলাম।'

'কেবিনে চলুন!'

মেয়েটির কথায় কোন আকর্ষণের সুর নেই। বললাম, 'না, তাড়াতাড়ি আছে। শুধু এককাপ চা চাই। এককাপ চায়ের জন্যে অতিথি অভ্যর্থনায় খুব একটা আগ্রহকে লক্ষ্য করা গেল না। শুধু ঘোলা ঘোলা চোখ দুটি মুছে নলিতাই চা-এনে হাজির করলে। আর আমার দিকে তাকিয়ে আর দুটি মেয়ে কী যেন এক কদর্য ইঙ্গিত প্রকাশ করলে।'

'কেন?'

'চোখের চাওয়া শেষ হয়ে গেছে তাই।'

শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করলে, 'তারপর?'

নলিতাই উত্তর দিলে, 'তারপর আবার কী? এইখানেই গল্প শেষ।'

শশাঙ্ক বললে, 'এ তোমার নিতান্তই বানানো গল্প হরিপদ বা।'

হরিপদ মৃদু হাসলে, 'বানানো কিনা জানিনে। তবে এইটে ঠিকই জানি ভালো লাগার আর ভালোবাসায় এই হচ্ছে প্রভেদ।'

'তা হলে তুমি বলতে চাও—'

নলিতার কথায় বাধা দিয়ে হরিপদ বললে, 'বলতে আর আমি কিছুই চাই-নে। শুধু একটা কথা বলে গল্প শেষ করি—'নলিতার বাড়ি উল্টোডাঙায় যদিও তার প্রেমাস্পদ আসলে একটি জানোয়ার। বাসবাজার বাসরাতে তার ভাবী স্বামীর কোন আস্তানাই নেই। বর্ষার মেঘ সিন্দুর রঙে তাঁর মনের একটা আকাঙ্ক্ষার অনলও দাও।'

হরিপদ উঠে পড়ল।

নলিতা নির্বাক।

শশাঙ্ককে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছে।

ভারত

পৃথিবীর বৃহত্তম
গণতান্ত্রিক দেশের
চতুর্থ
সাধারণ নির্বাচন

Thoughts on Democracy

This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing government, they can exercise their constitutional right of amending it, or their revolutionary right to dis-member or overthrow it.

Abraham Lincoln.
March 4, 1861.

Democracy is not a state in which people act like sheep. Under democracy, individual liberty of opinion and action is jealously guarded.

Mahatma Gandhi.
March 2, 1922.

We want a living constitution, a free constitution, a constitution in which honourable men can work with honourable friends...

It is not very difficult to understand that if you feel that Government must mean a government by the people, for the people, and for the good of the people.

Deshbandhu Chittaranjan Das.
Speech at the Bengal Legislative Council,
March 1925.

The history of the growth of freedom is the history of the perfection of human relationship.

Rabindranath Tagore.
1931.

We believe that it is an inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom and enjoy the fruits of their toil and have necessities of life so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any Government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it.

Independence Pledge
Indian National Congress.
January 1942.

অন্তরীক্ষে

ভোট রঙ্গ

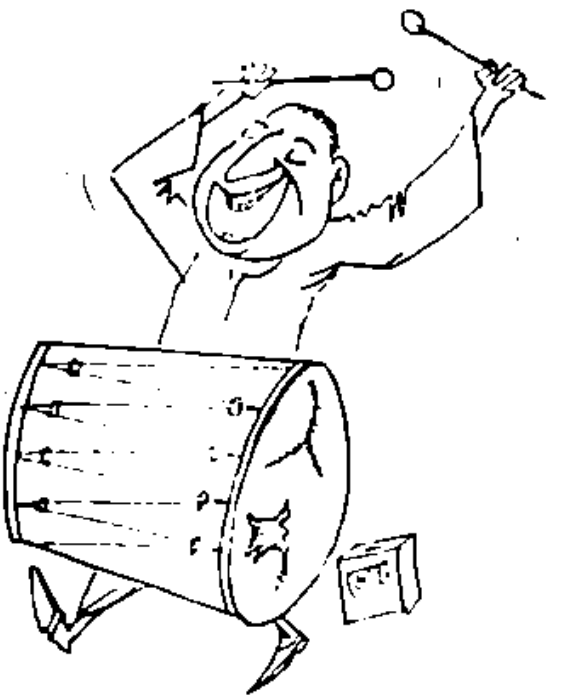

নিজের ঢাক নিজেই বাজাই
নিজগুণে ক্ষমা চাই।

আপনাদের সেবার জন্যেই তো তৈরী হাচ্ছ।

গত টাইমমে জিস্‌কো আব ভোট দিয়াথা।
আবে ভাই হামি তো সেই আদমি।

.....আপনারাই তো আমার বল ভরসা

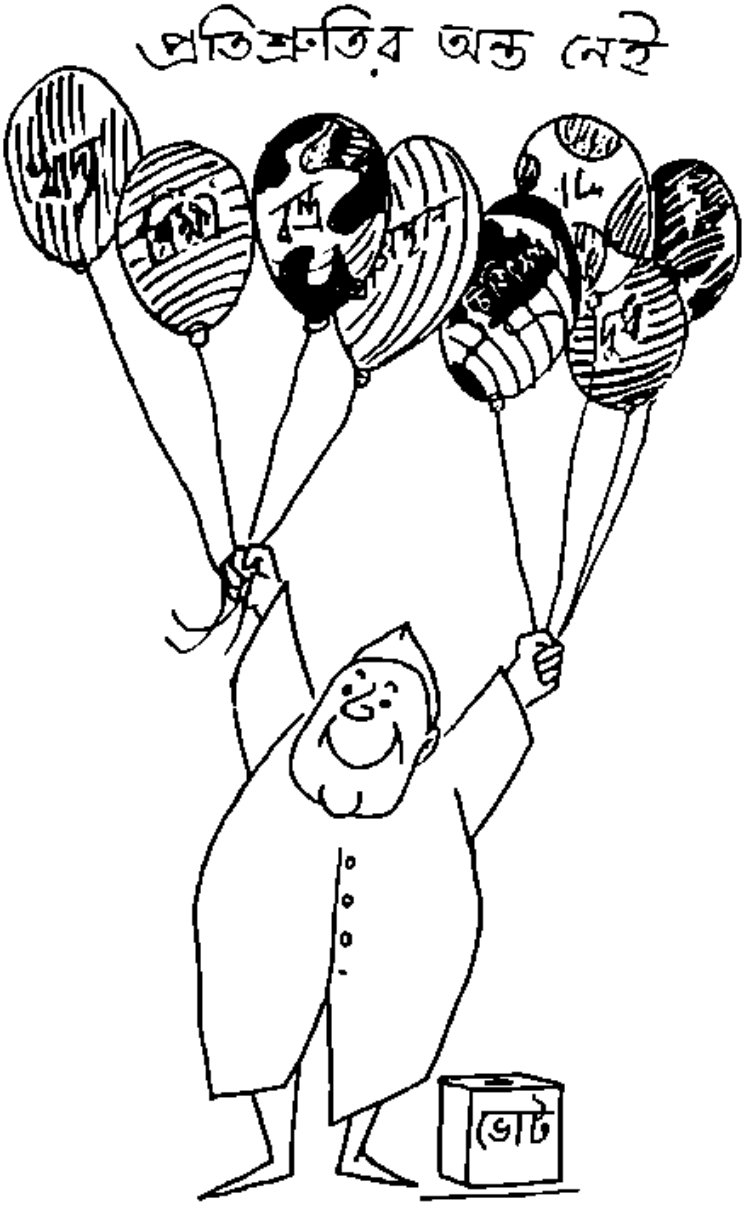
প্রতিশ্রুতির অন্ত নেই
ভোট

..... সবাই তো নিশ্চিন্ত করলো, কিন্তু তারপর।

একই বাড়িতে চারটি দল। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা।

এ কি। ছুনো পুঁটিও ভোট ভোট করছে ॥

—সম্মিলিত পন্থী দল

সেদিন
ভোট ভিক্ষা
ভোট
আর
আজ
আরে এ যে চিনতেই পারেনা

গণতন্ত্র ও ভারত

অজিতীরঞ্জন মিত্র

গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের সরকার অর্থাৎ A form of Government by the people, for the people and of the people গণতন্ত্র হচ্ছে জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের প্রতিফল। প্রতিটি লোকের সর্বাধিক সুখ সুবিধা স্বচ্ছন্দভাবে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা ও কাজ করার অধিকার লাভের জন্য জনসাধারণের সমর্থনে, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের নিকট দায়িত্বশীল সরকারই গণতান্ত্রিক সরকার। গণতন্ত্রের জন্ম হয় কয়েক হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রীস নগর রাষ্ট্রে। বিশেষ করে এথেন্স ও স্পার্টায় গণতন্ত্রের বিকাশ হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্রে নারী ও ক্রীতদাসদের ভোটাধিকার ছিল না। অন্যান্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকেরা একস্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন করতো এবং শাসনকার্য্য তারাই নির্বাহ করতো। এটা তখন সম্ভব হয়েছিল কারণ ঐসব রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও জনসংখ্যায় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক রাজনৈতিক দলের মত কোন রাজনৈতিক দলের তখন ছিল না।

গণতন্ত্রের সূত্রপাত প্রাচীন গ্রীসে হলেও গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ প্রথম আমরা দেখতে পাই ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে রাজা ও প্রজার মধ্যে অনবরত সংঘর্ষের ফলে ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের পর গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জনলক্ তাঁর Two treatises on civil Government-এ জনগণের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে সরকারের স্থায়িত্ব জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইটালীর মেকিয়া ভেলীও গণতন্ত্রই যে শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা এ কথা স্বীকার করেছেন। মহামতি রুশোও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এরপর আমেরিকাবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম গণতন্ত্রের পথ সুগম করেছিল। উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি ১৭৭৬ খৃঃ প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রচার করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল—We the people of the United States in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic franquility, provide for common defence, promote general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States."

এই প্রসঙ্গে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ দেশের জনসাধারণ 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে এক গুরুতর বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন।

ফ্রান্সের এই বিপ্লবের ভাব ধারা পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ইউরোপের জনগণ স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্যে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে আধুনিক গণতন্ত্রের জন্ম মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর গণতন্ত্র এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ সোভিয়েট সরকার গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দার্শনিক মূল উৎস তিনটি। প্রথমত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব (Doctrine of Natural right) যার ঘোষণা ছিল : নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করবার অধিকার নিয়ে প্রত্যেক মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত, হিতবাদী তত্ত্ব (Utilitarian theory) অর্থাৎ সমাজের লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের প্রভূততম সুখ সাধন (Greatest good of the greatest number)। তৃতীয়ত, আদর্শ বাদীতত্ত্ব, যা J. S. Mill এর লেখনীর মারফৎ প্রচারিত হয়েছে যে একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যার মাধ্যমে প্রতিটি লোকের অন্তর্নিহিত সর্ববিধ ভাবনীয় শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

গণতান্ত্রিক সরকারকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায় : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে বুঝায় যেখানে সকল নাগরিক একত্র মিলিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে আইন প্রনয়ন করে ও তারাই সে আইনকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এরূপ ব্যবস্থা অবশ্য প্রাচীন গ্রীসের মত ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রেই একমাত্র সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নাগরিকের সংখ্যা এতবেশী যে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব নয়। কেবল Switzerland এর কোন কোন ক্ষুদ্রাকৃতি ক্যান্টনে এ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। সুতরাং আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলতে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকেই বোঝায়। অর্থাৎ শাসকমণ্ডলী নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। শাসকগণ নির্বাচকদের নিকট দায়িত্বশীল থাকবে এবং নির্দিষ্টকাল অতিবাহিত হলে অথবা কোন বিশেষ জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, পুনরায় নির্বাচনের জন্য নাগরিকদের নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু প্রতিনিধিমূলক সরকারেও নাগরিকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যেমন গণভোট, গণউদ্যোগ ও প্রত্যাহার ব্যবস্থা দ্বারা। 'গণভোট ও গণউদ্যোগ ব্যবস্থা Switzerland এ ও প্রত্যাহার ব্যবস্থা একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রচলিত আছে। সোভিয়েটের সদস্যগণ যদি জনস্বার্থমূলক কাজ না করে। নিজস্বার্থে বা কোন গোষ্ঠীস্বার্থে কাজ করে তবে তাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দুইটি রূপ, দায়িত্বশীল সরকার ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। দায়িত্বশীল সরকার বৃটেন ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এর দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে শাসন বিভাগকে জন প্রতিনিধিমূলক কক্ষের নিকট দায়িত্বশীল রাখা হয়। এর ফলে সরকার আইন সভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং সে জন্যে সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা বিভাজনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে শাসন বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে। শাসনবিভাগের শীর্ষস্থ কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে।

সে যাই হোক এখনও গণতন্ত্র নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপ বা ও সার্থকতা এখন পর্যন্ত কোথাও দেখতে পাওয়া যায় নি C. D. Burns তাই মন্তব্য করেছেন—

"Democracy is not yet achieved. It is the ideal of those who desire a society of independent groups so organised that every man shall have an equal opportunity to develop what is finset in him and such a society no where exists."

বৃটেন

গণতন্ত্রের জন্মভূমি যদিও প্রাচীন গ্রীসে, গণতন্ত্র প্রথম সার্থক রূপ নিয়েছিল গ্রেট বৃটেনে। ১২১৫ খৃষ্টাব্দে 'Magna carta' এর পর থেকে বৃটেনের জনগণ রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করে। ১৬৮৮ খৃঃ এর গৌরবময় বিপ্লব বৃটেনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রাজা দ্বিতীয় জেমস্ এই বিপ্লবের সময় ইংলাণ্ড ছেড়ে পালিয়ে যান। ফলে পূর্ণ শাসন ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে এসে পড়ে। এবং তখন থেকে বৃটেন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়।

সম্ভবত আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বৃটেনেই দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই এখন ব্যক্তি স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এত বেশী মাত্রায় অন্য কোন দেশে প্রতিপালিত হয় না।

বৃটেনের শাসনতন্ত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আছে। এ এক অলিখিত শাসনতন্ত্র। বহু বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে এ শাসনতন্ত্র গঠিত হয়েছে। এবং ইংলাণ্ডে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে। এবং ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই ব্যবস্থাই আদর্শ মনে করে গ্রহণ করেছে।

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে প্রধানতঃ দুটি দল অংশ গ্রহণ করে থাকে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২১ বছরের উর্দ্ধে প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। ১৯৬৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হয়েছে। এই দলের নেতা উইলসনই এখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আটলান্টিক মহাসমুদ্রের উপকূলে বৃটেনের তেরটি উপনিবেশ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। তাদের ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—

That all men are created equal, that they are endowed by their creater with certain unalienable rights; that among these are life. liberty, and the pursuit of happiness··· · that whenever any from of govetnment becomes dostructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it·····."

এ ঘোষণাই একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণার উৎস হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় সেখানকার অধিবাসীরা ঐ ঘোষণাপত্রে দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

তারপর জর্জ ওয়াশিংটনের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সংবিধান রচিত ও প্রবর্তিত হয়। ঐ সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে Presidential form of Government প্রচলিত। এখানেও বৃটেনের মত যুক্ত দুটি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় দু' দলের মনোনীত প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এখানেও প্রাপ্ত বয়স্কদের পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নারী সমাজও সার্বজনীন ভোটাধিকার লাভ করেছে।

১৯৬২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭ কোটি নরনারী সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। এবং প্রদত্ত মোট সংখ্যক ভোটের শতকরা ৭০ ভাগই প্রদত্ত হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় প্রত্যক্ষভাবে। গত সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থী মিঃ জনসন বিপুল ভোটাধিক্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মিঃ গোল্ডওয়াটারকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমান পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকারের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এখানকার সংবিধানের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে Seperation of powers নীতি গ্রহণ করে শাসন বিভাগের তিনটি অংশকে পৃথকীকরণ করা হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর সোভিয়েট রাশিয়ার শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সেখানে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের এক অপূর্ব যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ায় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৩৬ সালে স্ট্যালিন সংবিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে এই সংবিধান অনুসারে নির্বাচনের মাধ্যমে এক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় কোন কম্যুনিষ্ট দেশে গণতন্ত্র চালু হতে পারে না। যেখানে বিরোধী দল বলে কিছু নেই সেখানে কিভাবে গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পারে? সেখানে নাকি ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। কিন্তু স্ট্যালিন সংবিধান গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। সোভিয়েট নেতাদের বক্তব্য এই যে সমাজতান্ত্রিক দেশেই একমাত্র সত্যিকারের গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পারে। এবং যেখানে সরকার সর্বান্তিত জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত সেখানে বিরোধী দলের কোন প্রয়োজনই হয় না। সোভিয়েটগুলির মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সোভিয়েটের ক্ষমতা সম্পর্কে একবার লেনিন বলেছিলেন—The Soviets are a form of power open to all, operating in full view of the people, within their reach. stemming directly from them, a direct and immediate organ of the people and of their will.

আঠারো বছরের উর্ধ্বে প্রত্যেক নাগরিক এই সোভিয়েটের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩৭০০০ সোভিয়েট রয়েছে বর্তমান সুপ্রিম সোভিয়েট গত ১৯৩৯ সালের নির্বাচনের পর কার্যকরী হয়েছে। সুপ্রিম সোভিয়েট চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। তাছাড়া গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র প্রত্যাহার আজ্ঞা (recalling) একমাত্র রাশিয়ার সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। এর দ্বারা নির্বাচকগণ যে কোন সময়ে যে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধির, অবশ্য সে সমস্ত যদি জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করে, নির্বাচন বাতিল করে দিতে পারে। একেই বলে recalling। এ বিষয়ে নির্বাচকদের সভায় সভ্যগণ হাত তুলে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করে। তারপর পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে অন্য সদস্যকে মনোনীত করা হয়।

রাশিয়ার জনগণকে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে সেখানে কোন পেশাদারী পার্লামেন্টেরিয়ানকে নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয় না। কৃষক, শ্রমিক বুদ্ধিজীবি যারা জনগণের মধ্যে কাজ করেন বা জনসাধারণের প্রিয়পাত্র তাদেরই সোভিয়েট নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

সুতরাং বলা যেতে পারে যে সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা রীতিমত গণতান্ত্রিক। "But is a democracy of new type—the dircet, active democracy of the working people. Moreover, it is not static but a growing democracy, growing in the dircation of a self managed society of the people."

জি, ডি, আর (গণতান্ত্রিক জার্মাণী)

যদ্ধ ইউরোপের এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ক্রমশ গণতান্ত্রিক পথে জাতীয় উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে। এখানেও সোভিয়েট রাশিয়ার ন্যায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এক অপূর্ব সংমিশ্রন হয়েছে। জার্মাণীর সংবিধানের তিন নম্বর ধারায় খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—"All power derives from the people. Every citizen has the right and the duty to take an active part in the public affairs of his locality, his district, his land and of the German Democratic Republic.

গত বছর অক্টোবর মাসে এখানে স্থানীয় পরিষদ গুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গণতান্ত্রিক জার্মাণীর সমাজতান্ত্রিক বিকাশের একটি লক্ষণ এই যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও স্থানীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে পরিষদগুলির অধিকার ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এখানে শতকরা ৭৪ জন ভোটদাতা নিজ নিজ ডেপুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন।

গণতান্ত্রিক জার্মাণীতে রাজনৈতিক দল আছে পাঁচটি। প্রতি চার বছর অন্তর সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভাই হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সর্বশ্রেণীর লোক এখানে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রার্থী মনোনয়নের সময় তাদের পূর্ব কার্যাবলী যাচাই করা হয়। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখাই এর উদ্দেশ্য।

সুতরাং সাম্রাজ্যের গণতন্ত্র স্থাপিত করতে গেলে যে সব রীতিনীতি কার্যকরী করা প্রয়োজন তার সবগুলিই গণতান্ত্রিক জার্মানীতে প্রচলিত আছে।

ভারত

বহু প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যখন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে তখন ভারতের পূর্বপ্রান্তে বৈশালীতে এক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। যদিও বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈশালী প্রজাতন্ত্রের কোন সাদৃশ্য ছিলনা তবুও একথা প্রমাণিত হয়েছে যে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে ভারতের জনগণ সর্বত্র নিরঙ্কুশ রাজপ্রাধান্য মেনে নেয়নি।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তেও কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু এগুলি ছিল খুবই ক্ষুদ্র এবং তাদের কোন গুরুত্বও ছিলনা।

এর পরের ইতিহাস বৈদেশিক আক্রমণকারীর হত্যা ও লুণ্ঠনের লোমহর্ষক বর্ণনা করছে। শক-হুণ-মোগল-পাঠান আক্রমণের যুগে ভারতবাসী প্রায় বিনা প্রতিরোধে বিদেশী শাসকের আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হাতে শাসনভার ন্যস্ত ছিল। সাধারণত কেন্দ্রীয় শাসকগণ গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনে অথবা হস্তক্ষেপ করতেন না।

ব্রিটিশ যুগের প্রথমভাগে ভারতবাসী খুব সহজভাবে বৈদেশিক শাসন মেনে নিয়েছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কুড়ি বছর মডারেট গ্রুপ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে এবং বিশেষভাবে বাংলা ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এই আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকার তখন উপলব্ধি করলেন যে ভারতবাসীকে কিছু সুবিধাসুযোগ না দিলে ও সংস্কারমূলক কোন ব্যবস্থা না করলে ভারতবর্ষ আর অধিকারে রাখা সম্ভব হবেনা। তাই এল Morly-Minto Reforms (১৯০৯)। এই সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতীয়দের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে অংশ গ্রহনের অধিকার দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনারেলের Executive council-এ একজন ভারতীয় সদস্যকে স্থান দেওয়া হয়। যদিও প্রাদেশিক কাউন্সিলে ভারতীয়দের নিয়োগের কোন ব্যবস্থা এতে ছিলনা, কিন্তু পরে বাংলা কাউন্সিলে কিশোরীলাল গোস্বামীকে নিয়োগ করা হয়। এই আইন দ্বারা কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। যদিও সর্বত্র সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল, সদস্যগণ সাধারণত স্থানীয় সভা, অভিধায়, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাণিজ্য সভা কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। এ আইনে সর্বপ্রথম সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অর্থাৎ মুসলীম সদস্যগণ শুধুমাত্র মুসলীম ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। আপাতদৃষ্টিতে এ আইন ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে হয়; কিন্তু কার্যতঃ এর দ্বারা পার্লামেন্টারী সরকার একবিন্দুও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯০৯ সালের আইনে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এক হচ্ছে পরোক্ষ নির্বাচন আর দুই কমিউন্যাল রিপ্রেজেনটেশন।

স্বভাবতই ভারতীয়দের অসন্তোষের মাত্রা দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবী আরও প্রবল হয়ে ওঠে। তখন অনন্যোপায় হয়ে মন্টেগু সাহেব ঘোষণা করেন যে এখন থেকে ভারতবাসীকে নিজেদের শাসন ব্যবস্থায় আরও বেশী পরিমাণে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। তার পরই Montagu chemsford সংস্কার এল। এই আইন দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ এক দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। কিন্তু ভোটাধিকার উচ্চ সম্পত্তির উপর নির্ভর করতো। অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার তখনও দেওয়া হ'ল না। আর তাছাড়া জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কোন পরিকল্পনাও এতে ছিলনা। উপরন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে নির্বাচিত হবার অধিকার দিয়ে ভবিষ্যৎ গোলযোগের পথ সুগম করা হয়েছিল।

তারপর এল ১৯৩৫ এর ভারত আইন। এ আইন দ্বারা চল্লিশ শতাংশ লোককে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল—নির্বাচন একটু ব্যাপকতর করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ এর আইনেও ভারত-বাসীকে সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়নি।

এই আইন অনুসারে ১৯৩৬ সালের নির্বাচনের পর পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে গণপরিষদও গঠন করা হয়েছিল নতুন সংবিধান রচনার জন্য। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে গণপরিষদ ৪৫ কোটি ভারতবাসীর জন্যে গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনায় ব্রতী হয়। অবশেষে ভারত বিভক্ত হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা পেল।

ভারতের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী থেকে বলবৎ করা হয়। বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত নতুন সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হচ্ছে। এখানে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার শপথও গ্রহণ করেছে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারতবাসী ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর আরও দুটি নির্বাচন হয়ে গেছে। আজ ভারতের পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। সারা পৃথিবীর লোক ব্যাকুল আগ্রহে এর ফলাফল জন্যে অপেক্ষা করছে।

রঙবেরঙের খবরাখবর

ভোট ফর ডিভোর্স !

লক্ষ্ণৌ, ৭ই ফেব্রুয়ারী (বাকেন) —ঝাঁসী লোকসভা কেন্দ্রের এক পরিবারে ভোটের ব্যাপারে মত বিরোধ শেষে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছেছে বলে এক সংবাদে পাওয়া গেছে।

সংবাদে প্রকাশ, ওই পরিবারের গিন্নী তাঁর ভোট কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ সুশীলা নায়ারকে দিতে চান ; কিন্তু তাঁর স্বামী চান তাঁর স্ত্রী তাঁর নির্বাচন প্রার্থী বন্ধু শ্রীশিবচরণকে (বিপাবলিকান) তাঁর ভোটটি দেন।

এই নিয়ে ওই পরিবারে লেগে গেছে হৈ-চৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। শেষে বাড়ীর কর্তা গিন্নীকে 'ডিভোর্স' করবেন ব'লে জানিয়ে দিলেন সরাসরি। কিন্তু গিন্নী বলেন, "আমি মেয়ে, সুতরাং মেয়ে প্রার্থীকেই আমি ভোট দেবো! তোমার যা খুশী তাই করো……"।

ব্যাপার বড়ই গোলমেলে দেখে ওই রিপাবলিকান প্রার্থী তাঁর সমর্থক ওই বাড়ীর কর্তাকে ব'লে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যেন তাঁর স্ত্রীকে ভোট দানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।

সারা ওড়িশায় ঘুড়ি উড়ছে

কটক, ৩ ফেব্রুয়ারী—স্বতন্ত্র পার্টির নির্বাচনী প্রতীক 'তারকা' অন্যান্য দলের প্রতীক অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে উড়ে বেড়াচ্ছে।

স্বতন্ত্র পার্টি ওড়িশায় কংগ্রেসকে কব্জাচ্যুত করবার আশা রাখেন। তাঁরা অন্তত একটি ব্যাপারে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে এরই মধ্যে হারিয়ে দিয়েছেন। ১০১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট-দাতারা নির্বাচনে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছেন। সমস্ত কেন্দ্রে হাজার হাজার ঘুড়ি স্বতন্ত্র পার্টিকে ভোট দাও বলে আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। —ইউ এন আই

What a Life !

"Does she mean we can't afford to purchase votes this time?"

Courtesy Hindustan times

—সেখানে বাঘের ভয়

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ২ ফেব্রুয়ারী—বনের বাঘরা মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চলের ভোটদাতাদের ভোটদানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াই ব্যাঘ্রকুল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

এইসব ভেবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন অঞ্চল অধ্যুষিত বস্তারের কয়েকটি অংশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আগামী নির্বাচনে ওই সব জায়গায় ভোটদাতারা যখন ভোট দিতে আসবেন, সেই সময় সশস্ত্র পুলিশ তাঁদের সাথে থাকবে।

নির্বাচনী প্রচারে সিংহ

নির্বাচনী প্রচারের কাজে শেষ পর্যন্ত বনের সিংহও লেগে গেছে।

উত্তর প্রদেশের বুলান্দ শহর থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে, এই নির্বাচন কেন্দ্রের নির্দলীয় প্রার্থী শ্রীকিষাণ সিং তার্থার নির্বাচনী প্রচারের জন্য, তাঁর সমর্থকরা শহরে যে শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন তার পুরোভাগে ছিল একটি জ্যান্ত সিংহ।

প্রার্থী ভদ্রলোকের নির্বাচনী প্রতীক হল সিংহ। সেইজন্যই মানুষের শোভাযাত্রায়, এই পশু রাজের নিমন্ত্রণ। এই শোভাযাত্রা দেখতে অবশ্য ভীষণ ভীড় হয়। আর বেশ কয়েক হাজার লোক পশু রাজের নেতৃত্বে পরিচালিত এই শোভাযাত্রায় যোগদানের লোভও সামলাতে পারেন নি।

তবে একবার পশু রাজ মুখ গোমড়া করে আর এগোতে চাইছিল না। কিছুটা যে তর্জন-গর্জন করেনি তাও নয়। পশু রাজের এই বেয়াড়া চেহারা দেখে শোভাযাত্রীরা যে দৌড় ! বোধ হয় শেষ পর্যন্ত প্রার্থী ভদ্রলোকের কথা ভেবে, সিংহ মশায় আবার চলতে শুরু করে।

হাঁ, বলে রাখা ভাল, সিংহটি সার্কাসের এবং তাকে খাঁচার মধ্যেই রাখা হয়েছিল। খবরটা দিয়েছেন —পি টি আই।

গাছের পাতাও নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত

কটক, ৮ই ফেব্রুয়ারী (ইউ এন আই)—গাছের পাতাও উড়িষ্যায় নির্বাচনী প্রচারে লেগে গেছে।

নির্দলীয় প্রার্থীদের প্রতীক চিহ্ন হ'ল "দু'টি পাতা"। এঁদের নমোই অনেকেই দু'টি পাতা হাতে নিয়ে ভোটারদের কাছে ঘরবার করছেন।

একজন প্রার্থী শুধু দুটি পাতা হাতে নিয়ে যাচ্ছেন না। ৩২ হাজার পাতায় ছাপ দিয়ে তা বিতরণও করছেন।

এই প্রার্থীকে সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কারণ তিনি সরকারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।

ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিবেন না।

দু'টি সংস্থার আহ্বান

নয়াদিল্লী, ৯ই ফেব্রুয়ারী (পি, টি, আই)—বা ম পৈ ন্থি ক দলগুলো ও নির্দলীয় প্রার্থীরা যখন ভোটদাতাদের দলে দলে ভোট-কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময় অন্ততঃপক্ষে দু'টি সংস্থা ভোট-দাতাদের ভোটদানে বিরত থাকবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এই দু'টি সংস্থা হল—নিখিল ভারত অহিংস সমিতি ও পূর্ণ স্বরাজ সমিতি।

আজ এখানে এক যুক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে হিন্দী সাহিত্যিক ও অহিংস সমিতির সভাপতি শ্রীজনেন্দ্র কুমার এবং পূর্ণ স্বরাজ সমিতি সভাপতি মিঃ জে, জোসেফ স্মিথ বলেন যে, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নতির ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষতঃ বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ভোটকেন্দ্রে অনুপস্থিতির মাধ্যমে জানানো যাবে।

তাঁরা বলেন যে, এটা প্রাথমিক ব্যবস্থা। তবে, এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করা যেতে পারে এবং এই সম্মেলনে ভারতে কি ধরণের সরকার জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম হবে, তাও বিবেচনা করে দেখা হবে।

ভোটার বাড়লেও ব্যালট বাক্স কমেছে

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি—প্রথম নির্বাচনের পর ভোটার সংখ্যা আট কোটির মত থেকে এখন দাঁড়িয়েছে পঁচিশ কোটি। কিন্তু গত তিনটি নির্বাচনের তুলনায় এবার ব্যালট বাক্স সংখ্যায় কমানো সম্ভব হয়েছে। প্রথমবারের চেয়ে এবার লক্ষ ব্যালট বাক্স কম লাগবে। এবার দরকার হবে তের লক্ষ। তবে ভোট কেন্দ্র অনুযায়ের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেড়ে যাবে।

—পি টি আই

ডাকে আড়াই লক্ষ ভোট

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২ লক্ষ ৬৩ হাজার লোক ডাকে ভোট দেবেন। ইতিমধ্যে ভোটদাতার সংখ্যা ৮৫,৩০৬ জন বেড়ে এই রাজ্যে সর্বশেষ ভোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭ শ ৯১।

ডাকে ভোটদাতাদের মধ্যে সেনাবাহিনীর লোক আছেন ৭,৪৩৭ জন। এ ছাড়া ভোট গ্রহণের কাজে নিযুক্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার সরকারী ও বেসরকারী কর্মী, নির্বাচন তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত প্রায় ১০ হাজার সরকারী অফিসার, পুলিশ বাহিনীর ৫০ হাজার, হোম গার্ডের ২০ হাজার, এবং ৩ হাজার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য আছেন।

সবচেয়ে আটশ এবং প্রায়াকলে চাঁদ'র থেকে মাত্র ৯ ভোটারের জন্য একটি করে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থাকছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হচ্ছে ২২,৭২৫টি।

ভারতের ক্ষুদ্রতম ভোট গ্রহণ কেন্দ্র

কালিকট, ৪ ফেব্রুয়ারি—আরব সাগরে লাক্ষাদ্বীপ ও আমিনিদিবি দ্বীপপুঞ্জের যে ২০টি দ্বীপ আছে মিনিকয় দ্বীপ তাদের মধ্যে একটি। আগামী সাধারণ নির্বাচনে ভারতে এই দ্বীপটি সর্বাধিক ক্ষুদ্রতম ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হবে।

এই অতি ক্ষুদ্র দ্বীপটির আয়তন ২৬ একর। মোট জনসংখ্যা ৮৫। তাদের মধ্যে ৫০ জন ভোটদাতা।

এই দ্বীপপুঞ্জের মন্ত্রণ অনুযায়ী আরও ৯টি দ্বীপে কর্তৃপক্ষ পুরুষ ও নারীর জন্য আলাদা আলাদা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করেছেন।

এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ মিনিকয়। এই দ্বীপের ভোটদাতার সংখ্যা ৩০০০।

এই দ্বীপপুঞ্জের মোট ভোট-দাতার সংখ্যা ১৩,৫৫৭। ভারতে ক্ষুদ্রতম লোকসভা কেন্দ্র।

১৮ ফেব্রুয়ারি এই দ্বীপপুঞ্জে ভোট গ্রহণ হবে। ৫ জন প্রার্থী একটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সকলেই নির্দলীয়।

—ইউ এন আই

এবারের নির্বাচন

নয়াদিল্লী, ৯ই ফেব্রুয়ারী (পি টি আই)—১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে যে ভোটার সংখ্যা (১৭৩২১৩৬৩৫) ছিল, এই নির্বাচনে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪০৬১৫০০১ কিন্তু এবার ব্যালেট-বাক্স ও ব্যালেট-পত্রের সংখ্যা আগের ৩য় নির্বাচনের তুলনায় কম।

বর্তমান নির্বাচনে ব্যালট-বাক্সের সংখ্যা হচ্ছে তের লক্ষ। ১৯৫২ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৪৭৩৮০০, ১৯৫৭ সালে ২৬০০৯৩১ এবং ১৯৬২ সালে ১১৮০০০০। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে মাদ্রাজে অতিরিক্ত ১১১০৯৫টি কাঠের বাক্স ব্যবহৃত হয়।

এই নির্বাচনে যা ব্যালট-পত্র ব্যবহৃত হবে, তার সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি। ১৯৫২ সালে এই সংখ্যা ছিল ষাট কোটি, ১৯৫৭ সালে ৫৭৯৩৭১০০০ এবং ১৯৬২ সালে বিয়াল্লিশ কোটি।

এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হবে আগের তিনটি নির্বাচনের তুলনায় বেশী—অর্থাৎ ২ লক্ষ ষাট হাজার। ১৯১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩২৫৬০, ১৯৫৭ সালে ২২০৪৭৮ এবং ১৯৬২ সালে ২৩৮০৩১।

হেলিকপ্টার থেকে ভাষণ

ধানবাদ, ২রা ফেব্রুয়ারী—শেষ পর্যন্ত তাঁকে হেলিকপ্টারে বসেই বক্তৃতা করতে হয়েছে। হেলিকপ্টার দর্শনার্থীদের ভিড়ের ফলে মাটিকে নীচে নামানো যায় নি। বক্তা তখন যানে বসেই বক্তৃতা করেন। মাটিতে পোঁতা একটি লম্বা ডাণ্ডে লাগানো মাইকের সাহায্যে জনগণ তাঁর ভাষণ শোনেন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সন্ধ্যায় নিকটবর্তী ঝুলারীটাঁড়ে। নব গঠিত জনক্রান্তি দলের সংসদীয় বোর্ডের সভাপতি শ্রীকামাখ্যানারায়ণ সিং এখানে নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য হেলিকপ্টারে করে এসেছিলেন। অতিরিক্ত ভিড়ের ফলে তাঁকে হেলিকপ্টারের জানালা দিয়েই ভাষণ দিতে হয়।

—পি, টি, আই

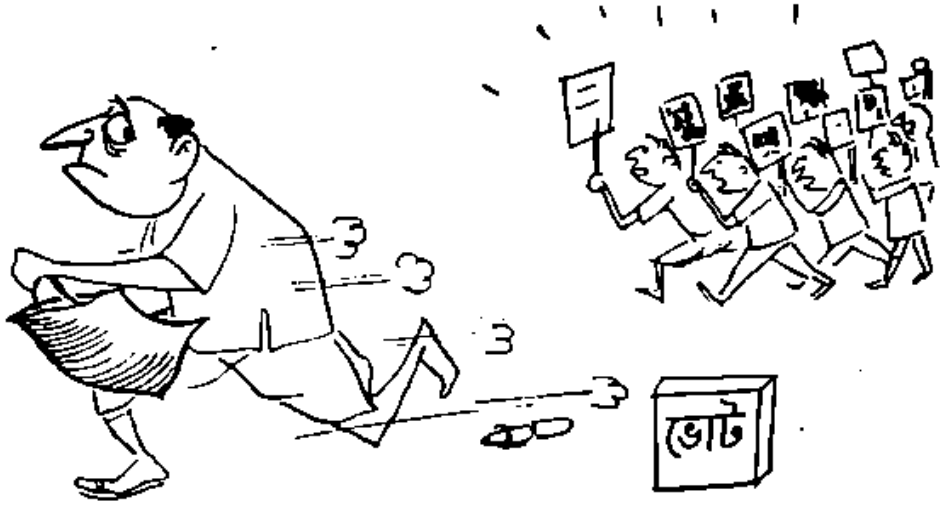

ভোট না দিয়ে পালাবেন কোথায়!

নির্বাচনী সভায় হাঙ্গামা : বিভিন্ন রাজ্যের হিসাব

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি—১ জানুয়ারি থেকে এযাবৎ বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের ৭৩টি নির্বাচনী সভায় বিঘ্ন ঘটেছে। এ ছাড়া অন্যান্য দলের ৬টি সভায়ও হাঙ্গামা হয়েছে। ঐ ছয়টি সভার আহ্বায়ক দল—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সোস্যালিষ্ট পার্টি, জনক্রান্তি দল, বিশালহৃদিস্থান পার্টি, সংযুক্ত বিরোধী ফ্রন্ট ও একজন নির্দলীয় প্রার্থী (শ্রী ডি কে কৃষ্ণমেনন)।

সবচেয়ে বেশী বিঘ্ন ঘটেছে উত্তর প্রদেশে। বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী সভায় যে বিঘ্ন ঘটেছে তার সংখ্যা দেওয়া হল :— উত্তর প্রদেশ—২১, বিহার—১৬, রাজস্থান—৮, মধ্যপ্রদেশ— ৭, গুজরাট—৩, জম্মু ও কাশ্মীর —৩, মহারাষ্ট্র—৩, দিল্লি—৪, পশ্চিমবাংলা—৩, মহীশূর—২, উড়িষ্যা—২, মাদ্রাজ —১, পাঞ্জাব—১, অন্ধ্রপ্রদেশ—১।

ভোটে রঙ বেরঙ

(গত নির্বাচনের ঘটনাবলী থেকে সংকলিত)

জয়পুরে লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে এক প্রজা সোশালিষ্ট সমর্থক ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখলেন একটি কুঁড়ে ঘরে ভোট বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। তাঁরী খুশী হলেন তিনি। ব্যালট কাগজ নিয়ে তিনি বাক্সের মধ্যে না ফেলে কুঁড়েঘরের চালার মধ্যে গুঁজে দিলেন। কুঁড়ে ঘরই তো তাঁর প্রার্থীর প্রতীক অতএব এখানে যদি জায়গায় তিনি কাগজ গুঁজে দিলেন মনে করে তাঁরী আনন্দ বোধ করলেন তিনি।

—উড়িষ্যার কোরাপুট কেন্দ্রে একজন মহিলা ভোটার ছাপ দেবার স্ট্যাম্পটি হাতে নিয়ে ভোট-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কী ব্যাপার? না, তিনি জোড়া বলদের খোঁজ করছেন। তিনি কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। বলা হয়েছে, জোড়া বলদের গায়ে ছাপ দিতে। তা কোথায় সেই বলদ, যার গায়ে তিনি ছাপ লাগাবেন!

—ভোট দেবার সময় ভোট দাতাদের আঙুলের ডগায় যে উল্কির মত ছোট ছাপ দেওয়া হয় তাতে অনেকের আপত্তি দেখা গেছে। বারানসীর এক কেন্দ্রে একটি তরুণী ভোট দিতে এসেছেন। দু'তিন দিন বাদেই তাঁর বিয়ে। তিনি আঙুলে ছাপ লাগাতে নারাজ। বন্ধুরা তাঁকে বোঝালেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বিয়ের দিন আঙুলে এরকম একটা বিশ্রী চিহ্ন মোটেই ভাল দেখাবে না। তারচেয়ে ভোট না দেওয়াই ভাল। এই বলে তিনি সত্যি সত্যিই ভোট না দিয়েই চলে গেলেন।

—মহীশূরে একজন নামজাদা আইন ব্যবসায়ী কিছুতেই আঙুলে ছাপ দিতে সম্মত হলেন না। কেন্দ্র-অফিসারকে তিনি বললেন, এভাবে আঙুলে ছাপা মারা ক্রীতদাস প্রথার মতো জঘন্য। এ তিনি বরদাস্ত করবেন না। তিনি ভোট দিলেন না।

—অন্ধ সংস্কার এবং ধর্মবিশ্বাসও দেখা গেছে অনেক স্থলে উৎকটরূপে। মাদ্রাজের এক কেন্দ্রে এক মহিলা ভোটার ভোট দিতে গিয়ে লম্বা লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল তিনি লাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, তিনি ভোট দেবেন না। কেন? কারণ, যাত্রাবেলা পড়ে গেছে, সময় খারাপ পড়ল। অশুভ সময়ে ভোট দিলে তাঁরও খারাপ হবে, তাঁর প্রার্থীরও ভাল হবে না। অতএব ভোট না দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

—কায়াক্লেশে কয়েকটি মেয়ে ভোট দিতে গিয়ে, যাবার স্ট্যাম্প-এর কালি নিজের নিজের কপালে লাগিয়ে টিপ পরল। ফলে তাদের আর ভোট দেওয়া হল না। অনেকে ভোটপত্রে বুড়ো আঙুলে কালি লাগিয়ে তার ছাপ দিয়ে চলে এলো।

—যুদের ভোটকেন্দ্রে একজন উকিল ভোট দিতে গেছেন। তাঁরী চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। কাকে ভোট দেবেন, কিছুতেই তা স্থির করতে পারছেন না। ভোটপত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তখনও

তাঁর সেই দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ভাবছেনই। পোলিং অফিসর বললেন, একটু তাড়াতাড়ি করুন। তিনি বললেন, তাড়ার দরকার নেই, একটা তাড়াতাড়ির কাজ। আবার অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, না, হল না। এই বলে কাগজখানি পোলিং অফিসরকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কিছুতেই মন স্থির করতে পারলাম না। কোন নির্বাচন প্রার্থীই আমার ভোট পাবার যোগ্য নয়।

তাঁর কথা শুনে পোলিং অফিসর তো অবাক।

—আর এক নির্বাচনকেন্দ্রে এক পোলিং অফিসরকে একজন মহিলা ভোটারকে নিয়ে ভারী মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। দক্ষিণ মাদ্রাজের এক ভোটকেন্দ্রে এক বৃদ্ধা ভোট দিতে এসে সরাসরি তাঁকে বললেন যে কাকে ভোট দিতে হবে তা তিনি স্থির করতে পারছেন না, অতএব অফিসর তাঁকে সাহায্য করুন।

অফিসর তো মহা অস্বস্তিতে পড়লেন। তিনি তো আর বিবেক ও আইন বিরুদ্ধ কাজ করতে পারেন না। তিনি তখন প্রত্যেক প্রার্থীর নাম বললেন এবং জানালেন যে যাকে ইচ্ছা তিনি ভোট দিতে পারেন। বৃদ্ধা তাতেও সন্তুষ্ট নন। অফিসর তখন বললেন, ভোটপত্রে ভোটপ্রার্থীদের ছবিও আছে। দেখুন না তিনি ছবিগুলি, তারপর যাঁকে পছন্দ হয়···। হ্যাঁ, এ একটা কথার মতো কথা বটে! ছবি দেখে অবশ্যই ভোট দেওয়া যেতে পারে। বৃদ্ধাটি তখন খুশী হয়ে ভোট দেবার ঘরে ঢুকে কাগজ ভাঁজ করে অফিসরের হাতে দিলেন।

—মথুরার এক ভোটকেন্দ্রে একজন মহিলা ভোটার ভোট দিতে এসে অফিসরকে বললেন, এ কী রকম ব্যবস্থা। কোথায় প্রদীপ আর কোথায় জোড়া বলদ। তাদের তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না! পোলিং অফিসর তাঁকে বোঝালেন যে ওগুলি হচ্ছে, প্রার্থীদের প্রতীক, তাদের এখানে হাজির থাকার কথা নয়। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলেন না সেই মহিলা। রাগ করে ভোট না দিয়েই চলে গেলেন।

—বাঙ্গালোর সহরের এক ভোটকেন্দ্রে একজন এসে পোলিং অফিসরকে বললেন যে, তাঁর স্ত্রী যখন ভোট দেবেন তখন তিনি স্বামী হিসাবে তাঁর স্ত্রীর কাছে থাকতে চান আরও বললেন, স্বামীরূপে স্ত্রীর কাছে থাকবার তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এবং তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে ভোট দেবেন, পোলিং অফিসরের অনেক সময় লাগল তাঁকে বোঝাতে যে ভোটের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা হচ্ছে প্রথম শর্ত! এবং এ শর্ত লঙ্ঘন করবার উপায় নেই, অতএব একসঙ্গে ভোট দেওয়া চলবে না।

—দক্ষিণ মাদ্রাজের এক ভোটকেন্দ্রে ওই রকম আর একজন পত্নীবৎসল স্বামী এসে জানালেন যে তাঁর দুখানি ভোটপত্র চাই। একটি তাঁর এবং অপরটি তাঁর স্ত্রীর। তিনি স্ত্রীর ভোটটিও দেবেন। কারণ তাঁর স্ত্রী গৃহে সংসার ধর্মে ব্যাপৃত বলে তিনি নিজে ভোট দিতে আসতে পারবেন না স্ত্রীর তরফে তিনিই ভোট দেবেন। পোলিং অফিসর যখন বললেন যে তা সম্ভব নয়। তখন তিনি রাগ করে নিজের ভোটটিও না দিয়ে চলে গেলেন।

—লক্ষ্ণৌএর এক নির্বাচনকেন্দ্রে কয়েকজন হিজড়াকে নিয়ে একবার মহা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। হিজড়ারা দলবদ্ধ হয়ে মেয়েদের পোলিং বুথের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যখন

তাদের জানানো হল যে তাঁরা পুরুষদের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেবার অধিকারী তখন তারা মহাআপত্তি জানালো। অবশেষে তাদের অনেক বুঝিয়ে তবে পুরুষদের কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে রাজী করানো গেল।

—বোম্বাই-এর কোন ভোটকেন্দ্রে একজন মধ্যবয়সী ভোটার ভোট দিয়ে গিয়ে পোলিং অফিসারকে মহাসমস্যায় ফেলেছিল, যথা নিয়মে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে অফিসারের সম্মুখে গিয়ে লোকটি বললে—আমার ভোট দেবার মেহনৎ-আনা।

ভোটদেবার মেহনৎ-আনা! সে আবার কী! লোকটি বললে, সে একজন কুলী। কারুর তরফে কোন কাজ করলে সে টাকা পায়। শুধু তাই নয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কর্মীরা তাকে বলেছিল, লোকসভার ভোটের জন্যে দশ টাকা আর বিধান সভার জন্যে পাঁচ টাকা।

ভোট পনেরো টাকা সে পাবে। তা কোথায় সেই টাকা! আপনি ভোট নিচ্ছেন, আপনিই দেবেন সেই টাকা। পোলিং অফিসার তো মহাবিপদে পড়লেন। কোন কথাই শোনে না লোকটি। পনেরো টাকা তার চাই-ই চাই! ধমক কড়ি মেরে দিলেই হল। কথা দিয়ে কথার খেলাপ! ওসব চলবে না। সেখানে রণক্ষেত্র। মহা গণ্ডগোল। অনেক কষ্টে লোকটিকে ঠাণ্ডা করা হল। কিন্তু লোকটি একেবারে ঠাণ্ডা হল না। তার স্ত্রীও ভোট দিতে এসেছিল, বললে, ওরে সব বুজরুকি! টাকা দেবে না, চল, চল, আর ভোট দিয়ে কাজ নেই। এই বলে স্ত্রীকে ভোট দিতে না দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে বলে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে সেই ভোটকেন্দ্রে ভারী কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল লোকটি।

—পাঞ্জাবের অমৃতসর ভোটকেন্দ্রে একজন বৃদ্ধ ভোট দিতে এসেছেন। এসেই বললেন, তিনি পণ্ডিত নেহরুকে ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবেন না। কিন্তু কোথায় তাঁর ছবি? ভোটপত্রে তো তাঁর ছবি নেই। ছবি না দেখলে তিনি ভোট দেবেন না। পোলিং অফিসার তাঁকে যথাসাধ্য বোঝালেন, কিন্তু বৃদ্ধ বুঝলেন না, ছবি না দেখতে পেয়ে ভোট না দিয়েই তিনি চলে গেলেন। পণ্ডিত নেহরুর ভাগ্যে একটি ভোট কম হল।

—আমাদের কলকাতার শ্যামপুকুর কেন্দ্রের এক ঘটনা। দুই বন্ধু। একজন কংগ্রেস, অপর জন ফরওয়ার্ড ব্লক! কয়েকদিন ধরেই দুজনের মধ্যে তুমুল তর্ক চলছে। যে যার স্বপক্ষে জোরালো যুক্তির অবতারণা করছে। কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে বা ঘায়তে আনতে পারছে না। ভোটের দিনে সকাল বেলায় দুই বন্ধু মিলিত হল! আবার চলল তর্ক! তর্ক করতে করতে দুজনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হল। তারপর দু'জনেই অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। তারপর দেখা গেল, দু'জনেই ভোট না দিয়ে বেরিয়ে এল।

সেদিন সন্ধ্যায় দু'জনে একসঙ্গে সিনেমায় গেল এবং তাদের সকল তর্কের অবসান হল। এবার তর্ক বাধবার আগে থেকেই তারা স্থির করেছে ভোটের আগের দিন যখন ছুটি পাওয়া গেছে তখন দু'দিনের ছুটিতে তারা দুজনে দীঘা বেড়িয়ে আসবে।

———

জেলা হিসাবে বিভিন্ন দলের বিধানসভা প্রার্থী

জেলা	মোট আসন	কংগ্রেস	কম্যু: (বাম)	কম্যু: (দক্ষিণ)	ফরোয়ার্ডব্লক	বাংলা কং	এস এস পি	আর এস পি	জনসংঘ	পি এস পি	অন্যান্য ও নির্দলীয়
কলকাতা	২৩	২৩	১৫	৪	৫	১	১	১	৯	২	৩৬
২৪ পরগণা	৫০	৫০	৩০	১৬	৩	১৮	২	১	১৪	৪	৬১
হাওড়া	১৬	১৬	১১	২	১০	৩	—	—	২	১	১১
হুগলী	১৮	১৮	১২	৫	৪	৪	১	—	২	—	১৩
নদীয়া	১৪	১৪	৫	২	—	৬	২	—	৩	—	১৫
বর্ধমান	২৫	২৫	১৯	৬	৪	৩	২	—	৩	৬	১৬
বাঁকুড়া	১৩	১৩	৬	২	—	৮	৩	—	৫	১	১২
বীরভূম	১২	১২	৪	১	৫	৩	—	—	—	১	১৭
পুরুলিয়া	১১	১১	১	১	২	২	—	—	১১	—	৩২
মেদিনীপুর	৩৫	৩৫	১১	১০	—	১৮	৭	—	৪	৪	১৯
মুর্শিদাবাদ	১৮	১৮	৩	১	—	৪	২	৭	১	—	২৯
মালদহ	১০	১০	৩	৩	—	৪	—	—	১	—	২১
প: দিনাজপুর	১১	১১	৫	৩	২	৩	২	৩	—	৪	২৪
কোচবিহার	৮	৮	৪	১	৬	—	—	—	—	—	৯
জলপাইগুড়ি	১১	১১	৩	২	১	৪	৩	৩	১	৩	১২
দার্জিলিং	৫	৫	৩	১	—	১	—	—	২	—	৭
মোট প্রার্থী		২৮০	১৩৫ ×	৬১ ×	৪২	৮২	২৫	১৩	৪৮	২৬	৩৩৪ × ×

(২৮০টি আসনে মোট ১০৫৯ জন প্রার্থী)

× বাম কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ২জন ম: ক: ধরে ধরা হয়েছে। ঐ দুজন বাম কম্যু:দের প্রতীক নিয়েছে।

× দক্ষিণ কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ৪জন বলশেভিককেও ধরা হয়েছে। কারণ তাঁরা কম্যু: (ম:)-এর প্রতীক গ্রহণ করেছে।

× × অন্যান্যের মধ্যে ২১জন শতন্ত্র ও ১৩জন হিন্দু মহাসভা আছে।

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রা: লি: ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

General Election 1967

details at a glance.

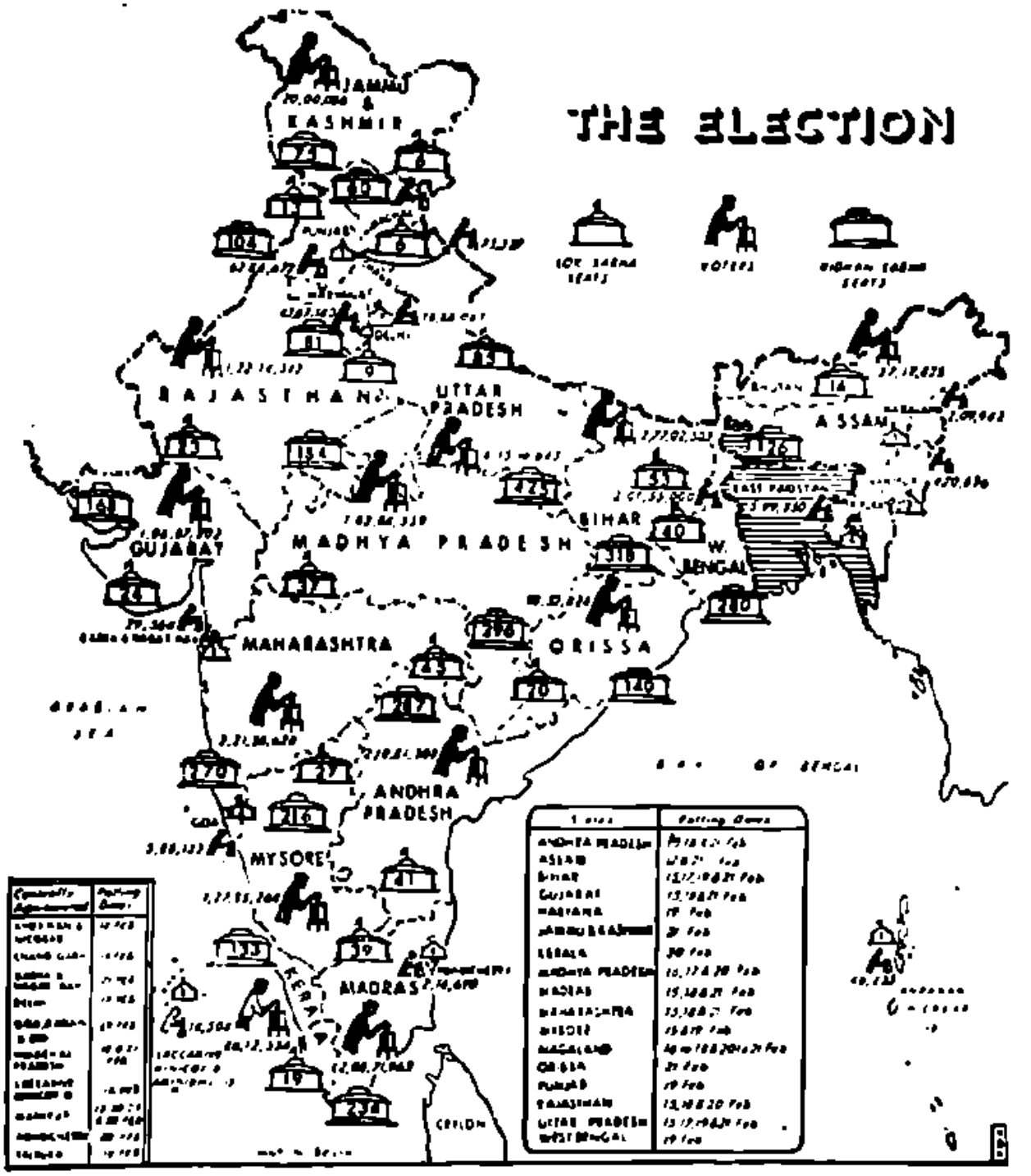

PARTY POSITION IN PREVIOUS ELECTIONS

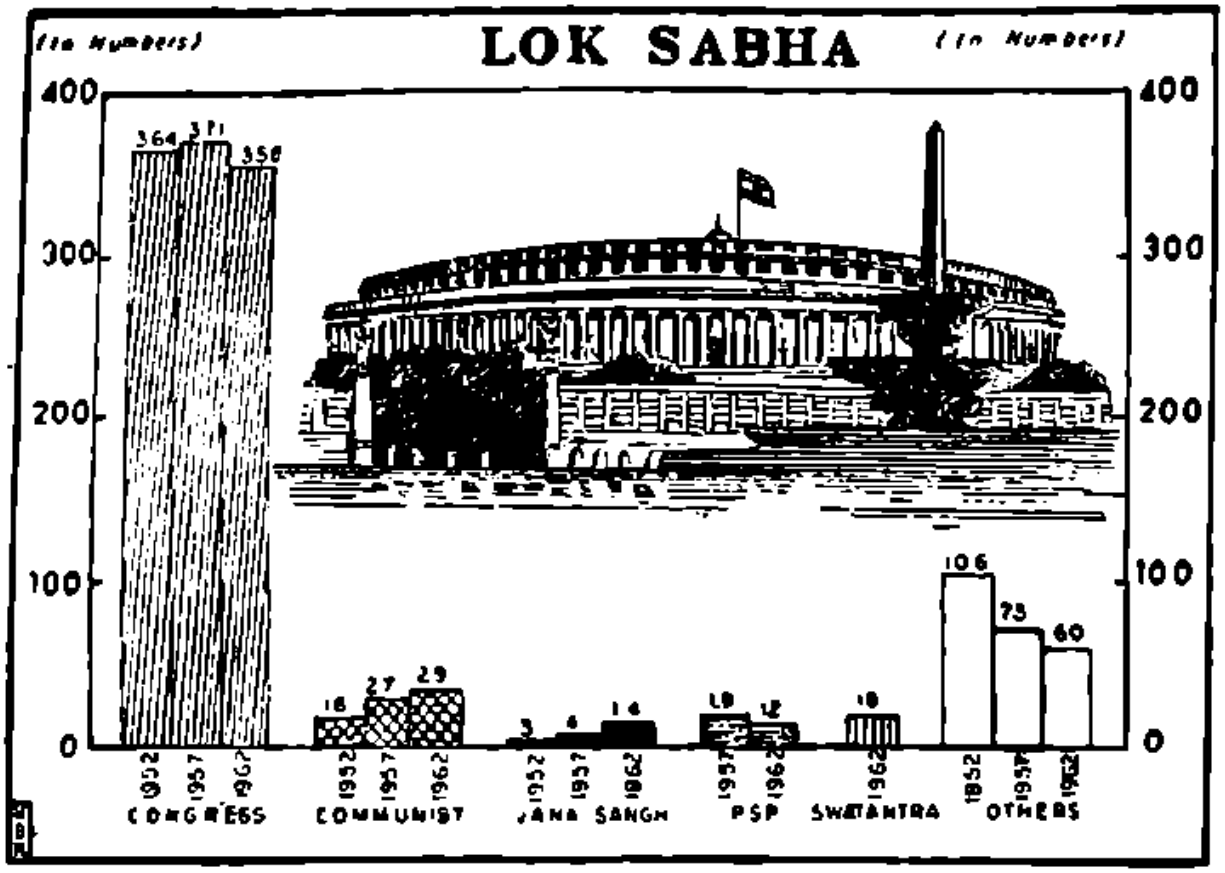

PERCENTAGE OF VOTES POLLED IN LOK SABHA

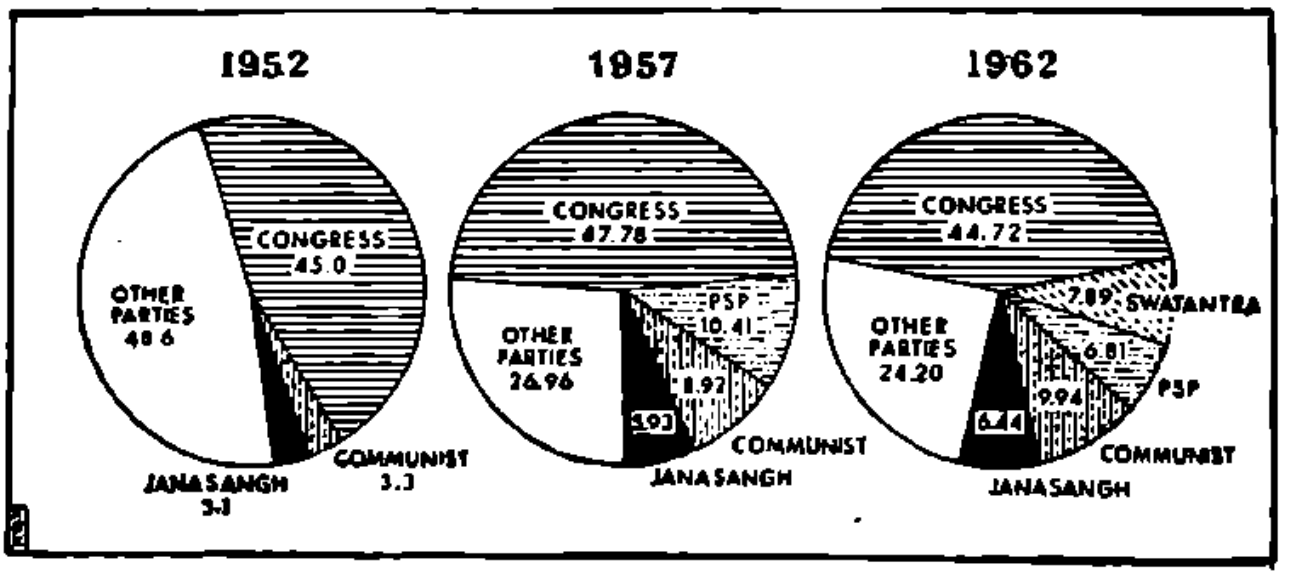

PARTY POSITION IN PREVIOUS ELECTIONS

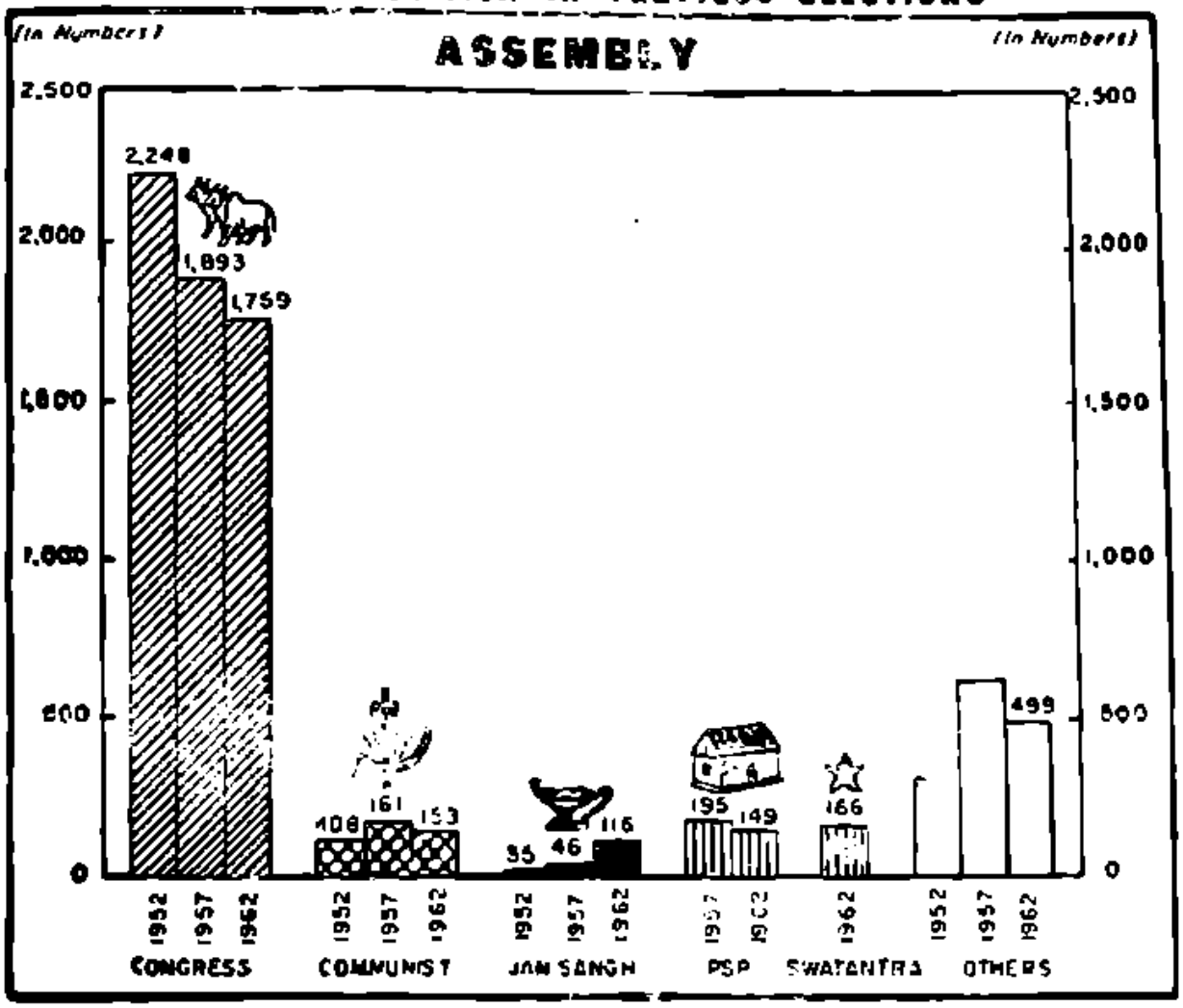

PERCENTAGE OF VOTES POLLED IN ASSEMBLY

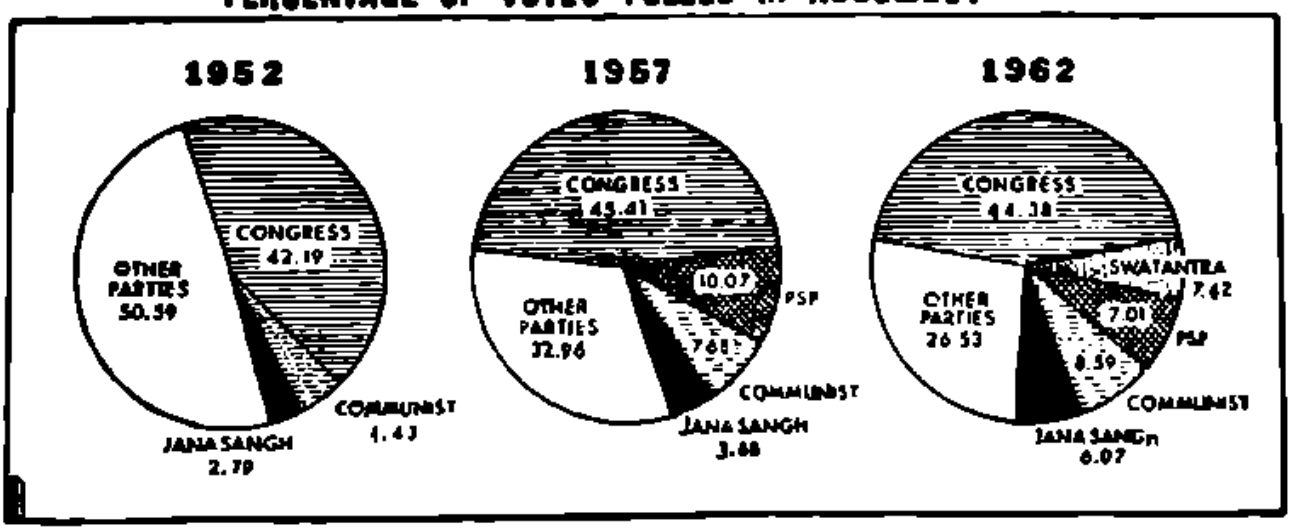

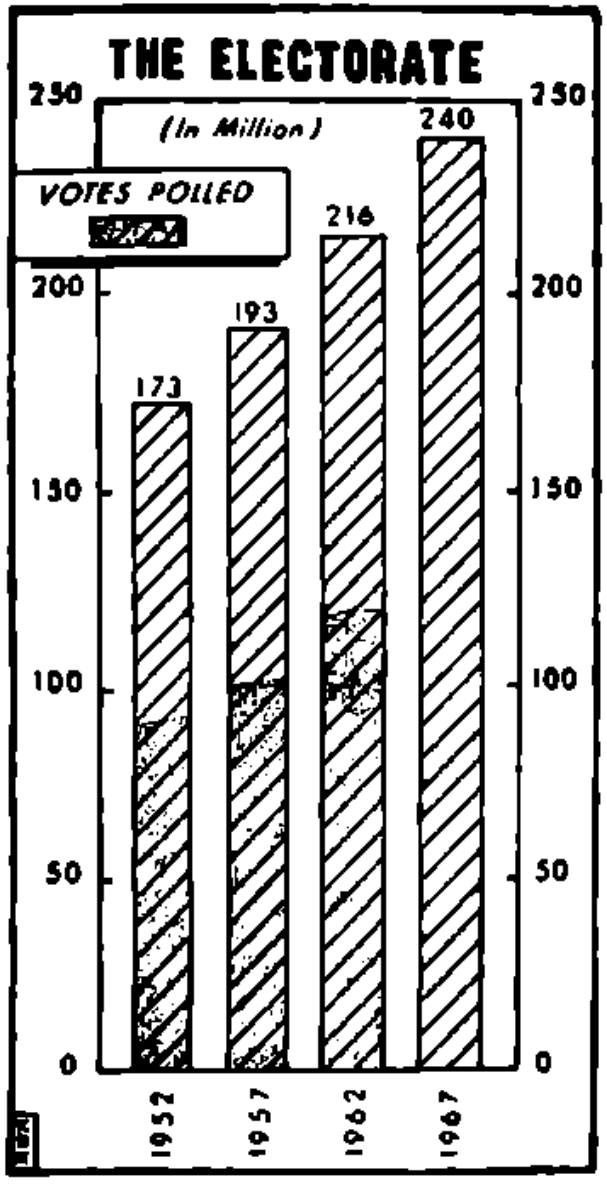

Courtesy National Herald

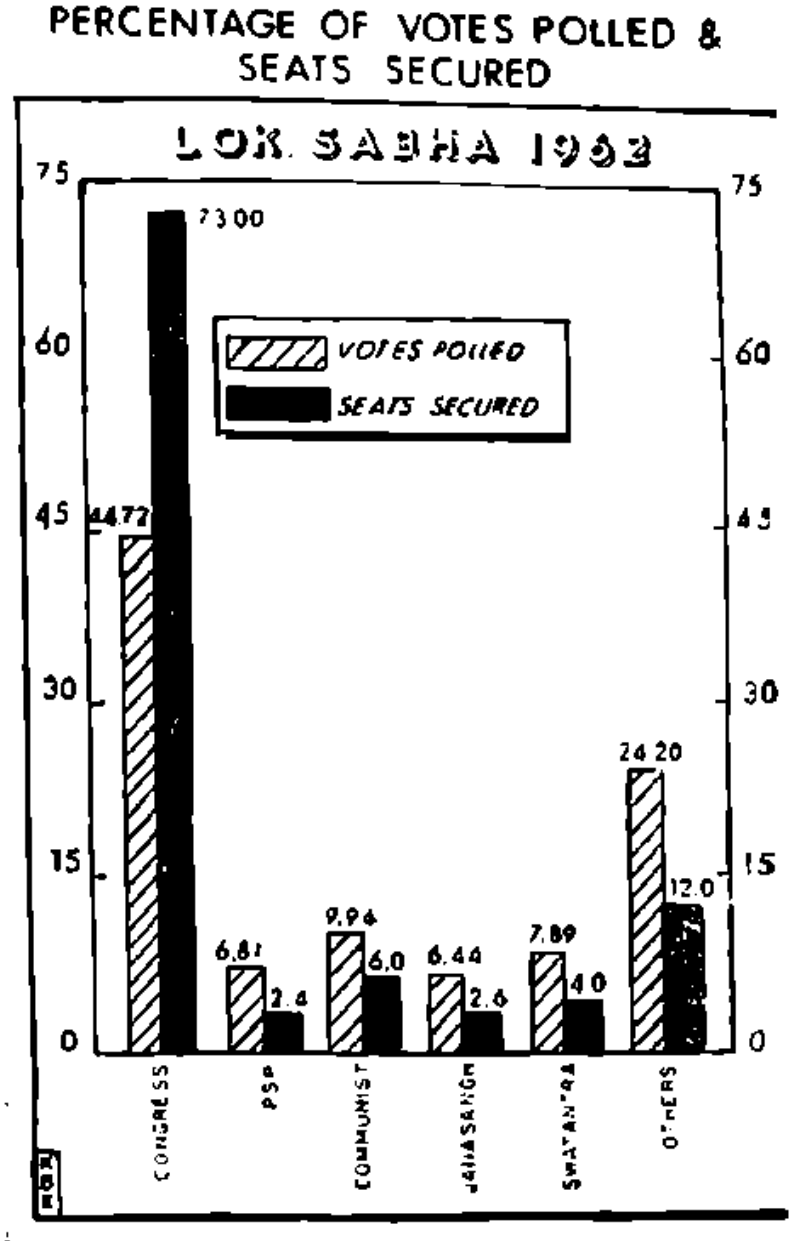

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের সিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

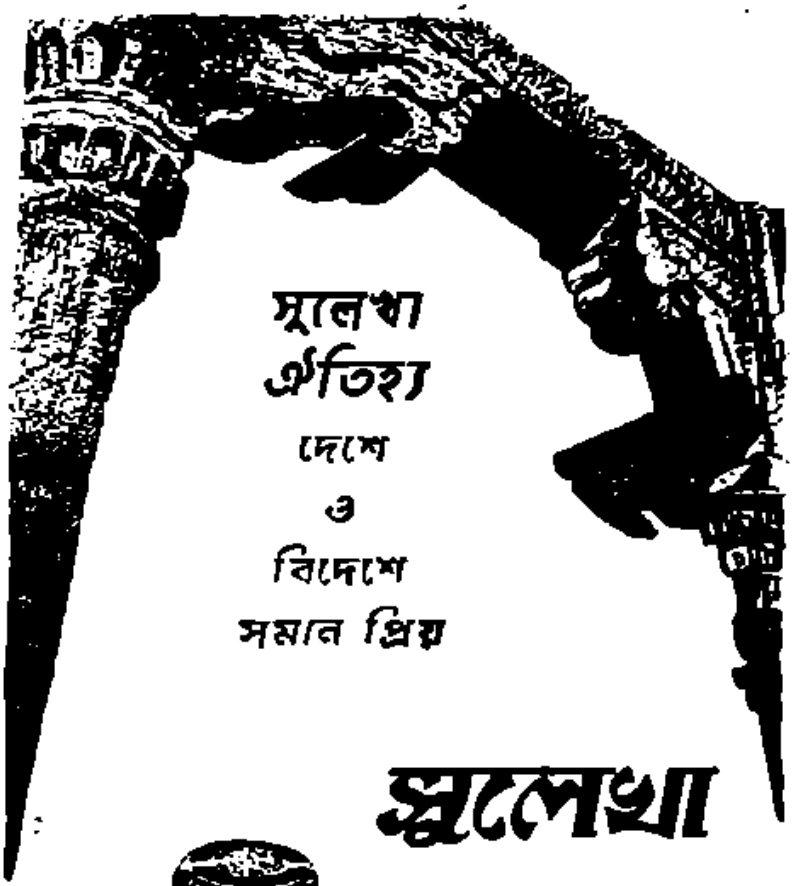

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউণ্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • তারোয়েজ

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive SW-318

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
মাঘ ১৩৭৩. FEBRUARY. 1967
দ্বাদশবর্ষ ৫ম—৮ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক সডাক টাকা

পোড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

শিশুর কাছে
রাখুন

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং

O&L

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৫৯৭
ভাববার কথা	৬০১
ভোটে রং বে-রং	৬০৩
কল্লা কল্লা (উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৬১১
না-স্বর্গ না মর্ত্য (বড় গল্প)—ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়	৬১৯
নাটমঞ্চ—রত্নাকর	৬৬১
ছায়া বাণী—চিত্র মিত্র	৬৭১
বৈচিত্রের যাদুকর ওয়াল্ট ডিজনী—হীরেন চৌধুরী	৬৭৫
চলতি দুনিয়া—	৬৭৯

বলা পিয় সহি–

বলা পিয় সহি

উদ্যানের অলোকনে নয়,

কুসুমাকীর্ণ আসরে আহ্বানে নয়

–গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে

এ কালের বরবর্ণিনী শকুন্তলা আজও

'বলা পিয় সহি' 'বলা পিয় সহি' ব'লে

দীপ্তমহিমের কণ্ঠলগ্নে সৌন্দর্যের বরণডালায়

আজ তার না বলেই নয়

বোরোলীন চাই

সকল কাজে সবার সাজে

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস্ – কলিকাতা-৩

এই সংখ্যায়

সুদাস পুবের দিনকাল (গল্প)—সুনীলগুহ ৬৮১

খেলাধুলা—

ক্রিকেট প্রসঙ্গ—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৮৮

মেয়ে-মজলিশ

যৌবন সুলভ রূপশ্রী ধরে রাখতে হলে—আভা পাকড়াশি ৬৯৩

চুল আঁচড়াতে সত্যি জানেন?—সুরঞ্জনা সেন ৬৯৬

তাজমহল (গল্প)—বিমলকুমার ঘোষ ৬৯৭

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৭০৪

কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্য্যায়

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

নিখুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই এর পরিচর্য্যা করা উচিৎ। উপযুক্ত উপাদানে প্রস্তুত হিমানী গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাবণ্য ও মসৃণতা বাড়ায়।

হিমানী
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২

Kesoram Industries & Cotton Mills Limited.

15, India Exchange Place, Calcutta-1.

Manufacturers of :

Cotton Textile & Piece Goods, Rayon Yarn Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid, CS2, Cnst Iron Spun Pipes & fittings, Readymade Garments, etc. etc.

Head Office :
15, India Exchange Place,
Calcutta-1.

Mill :
42, Garden Reach Road,
Calcutta-24

Rayon Unit

Head Office :
4A, Council House Street,
Calcutta-1

Mill :
Tribeni,
(Dist. Hooghly)

Spun Pipe Unit

Head Office :
P-46A, C. I. T. Scheme XLV
Radha Bazar Lane, Cal-1.

Mill :
Bansberia,
(Dist. Hooghly)

Managing Agents :

Birla Brothers Private Limited

15, India Exchange Place,
CALCUTTA-1

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদকীয়

সারা ভারতবর্ষ ভোটে মেতেছে। অনেকগুলি দল একসঙ্গে হাত বাড়িয়েছে দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে হাত করবার জন্য। স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। আর এখন এই ১৯৬৭ সালে চতুর্থ নির্বাচন।

ভারতের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ এই নির্বাচনের রহস্য প্রথমে কিছুই বুঝতো না। ভোট দিতে হয় বলেই যেখানে হোক্ একটা ছাপ মেরে দিয়ে চলে আসতো। জোড়া বলদ, কাস্তে আর ধানের শিষ্, ঘড়ি, সাইকেল, ছাতা—এই রকম সব প্রতীক চিহ্নের পাশে একটা ছাপ মেরে দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করতো। এ ছিল যেন একটা লটারি খেলা। যে দলের প্রচার হতো ভাল, যেমন করে হোক্, ছলে বলে কৌশলে ভোটারদের দিয়ে দিয়ে তারই কাজ হাসিল করতো। ভাল ভাল খাবার খাইয়ে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে কত মিথ্যাচার যে করতো তার অন্ত নেই। এই নির্বাচনী প্রচারের সর্বপ্রধান অস্ত্র ছিল নির্লজ্জ গালাগাল। একদল আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতো। বলতো—'ওদের ভোট দিও না, আমাদের ভোট দাও।'

শুধু ভোটের জন্যে নতুন নতুন কাগজ বেরুতো। কি বিশ্রী লেখাই না লেখা হতো সেই সব পত্র-পত্রিকায়। একজন সম্পাদক লিখলেন—'তোর বড় ছেলেটার গায়ের রং কালো, আর ছোটটা কর্ণা। এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেবো নাকি? এই নির্বাচন যুদ্ধ থেকে তুই সরে দাঁড়া, নইলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো।'

অথচ যাঁর বিরুদ্ধে এই সব কথা লেখা হলো, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি অবিবাহিত। তিনি বিয়েই করেননি তো ছেলে পাবেন কোথায়? লোকটা যে কিরকম ভণ্ড এবং মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত হতে দেরি হলো না।

এ-সব হলো গিয়ে সেই প্রথম যুগের কথা।
এখন যে সে-রকম কিছু লেখা হয় না তা নয়।
এখনও রাস্তায় রাস্তায় এই বলে ভোট ভিক্ষা করে—

'ওবলে পরে হাসি পায়
জোড়া বলদ ভোট চায়।'

জোড়া বলদের গল্প তখন চেঁচায়—

'চীনের চিহ্ন কাস্তে হাতুড়ি
পাকিস্তানের তারা
এর পরও কি বলতে হবে
দেশের শত্রু কারা ?'

কিংবা

'গড়তে দেশ ভাঙতে চীন
কংগ্রেসকে ভোট দিন।'

এমনি সব শ্লোগান আমরা এখনও শুনতে পাই। প্রতিপক্ষের কুৎসা প্রচার, নিন্দা গালাগালি এখনও এই নির্বাচনপর্বের মূল হাতিয়ার। একদিকে আত্ম-প্রশংসা, অন্য দিকে পরনিন্দা।

এইরকম বিকৃতরুচি এবং সর্বৈব নিম্নার্হ অপকর্মে যাঁরা মেতে উঠতে পারেন, এক একসময় ভাবি কেমন করেই-বা তাঁরা জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবেন, আর জনগণই-বা কেমন করে তাঁদেরই হাতে রাজদরবারে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করবার দুরূহ কর্মভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন ?

আবার অপরপক্ষের অবাব হচ্ছে এই যে আমরা যদি নীরবে শুধু হাত জোড় করে ভোটভিক্ষা করি, বিরক্ত এবং অশিক্ষিত জনগণ সেদিকে ফিরেও তাকাবে না। সুতরাং নিজের ঢাক নিজে তাদের পেটাতেই হবে।

এবং পেটাতে হবে বেশ উচ্চগ্রামে।

বিশ্রি-খেউড় যারা পছন্দ করে, তাদের কাছে এই নিম্নরুচির বিশ্রিখেউড়ের আবেদনই সব চেয়ে বেশি।

কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে—এখন আর বিশ্রি-খেউড় নয়। জনগণের রুচির মান এখন যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। শুধু শুধু গলাবাজি করে আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে বিপক্ষের মুখে কালি মাখিয়ে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে জয়ী হবার দিন আর নেই।

সর্বপ্রকার হীনতা এবং নীচতার ঊর্ধ্বে যে মানুষ—মনুষ্যত্বের মহিমায় মহিমান্বিত, পরার্থে জীবন যার উৎসর্গীকৃত, জনগণের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সেই মানুষের পদতলেই নিবেদিত হয়।

ভারতবর্ষের মত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে তার চতুর্থ নির্বাচন নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হলো।

একপক্ষ জয়লাভ করলে আর এক পক্ষকে পরাজিত হতে হবে—এটি হচ্ছে গিয়ে প্রতিটি রণাঙ্গনের চিরন্তন ইতিহাস।

আমাদের দেশেও তাই হয়েছে।

বিমলবাবু আনন্দে উল্লসিত হয়ে হাসতে হাসতে এসে আমাকে এই সংবাদটি দিলেন। বললেন, 'শুনেছেন তো! কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে!'

বললাম, 'এতে আনন্দ করবার কি আছে ? আপনিও তো কিছুদিন আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের জয়গান গেয়েছেন।'

'কখন ? আমি আবার কখন জয়গান গাইলাম ?'

অর্থাৎ বিমলবাবু অস্বীকার করতে চান কথাটা। আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে এই বিমলবাবুই তাঁর তিনটি বেকার ভাইপোর চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কত লোকের যে খোসামুদি করেছেন তাঁর অন্ত নেই। প্রায়ই বলতেন—আর পারছি না মশাই। ধারের পুরীটি আমার মাথায় ওপর। তিনটে ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়ে এখনও বিয়ে হয়নি, বিধবা বৌদিদি, আর তিনটে আহাম্মক ছেলে। সবগুলি অন্নধ্বংস করছে বসে বসে। তিনটে ছেলেই বি-এ পাশ করেছে অথচ কোনও কাজ পাচ্ছে না। তিনটে ছেলে—মাসে মাসে যৎসামান্য যাহোক্ কিছু যদি আনতে পারে তো আমি বেঁচে যাই।'

'তারপর একসঙ্গে সেই তিনটে ছেলের যখন চাকরি হলো দুর্গাপুরে, তখন আপনি কি বলেছিলেন মনে করে দেখুন।'

'কি জানি মশাই কি বলেছিলাম আমার মনে নেই।'

এমনি আরম্ভ করে এসে বলেছিলেন—'বেঁচে থাক্ আমাদের কংগ্রেস গভর্নমেন্ট! তা সত্যি কথা বলতে কি—দেশের জন্যে এরা অনেককিছু করেছে। দুর্গাপুরের মতন কারখানাটা করেছিল বলেই না তিনটে ছেলের একসঙ্গে চাকরি হয়ে গেল। দুটোর দুশ' দুশ', আর ছোটটার দেড়শ'।'

আমি বলেছিলাম, 'আপনি তো বেঁচে গেলেন!'

তাতেও দেখলাম খুশী ন'ন বিমলবাবু। বললেন, 'বেঁচে আর গেলাম কোথায়? ওরা কি একটি পয়সা আমাকে দেবে ভেবেছেন? যতদিন পারলে আমার ঘাড় ভেঙে খেলে, এইবার টাকা চাইতে গেলেই পালাবে।'

তা-সত্যিই পালিয়েছে।

বিমলবাবু বললেন, 'যাক্‌গে মশাই, কি বলেছি না বলেছি—সতত শোচনা বাস্তি। এখন কেমন মজাটি হলো তাই বলুন।'

মজাটা কি হলো সেই কথা জানতে চাইলাম বিমলবাবুর কাছ থেকে।

বিমলবাবু বললেন, 'মজা হলো না? চাল বিক্রি হচ্ছিল দু'টাকা কিলো, সরষের তেল উঠেছিল সাড়ে পাঁচ টাকায়। আর যেমনি কংগ্রেস ফিৎপটাং, আর অমনি চালের দাম নেবে গেছে একটাকা পঁচিশ পয়সায়, আর সরষের তেল পাঁচ-বশে।'

এইটিই খাঁটি কথা। কংগ্রেসও নয়, কমিউনিষ্টও নয়, যেই হারুক আর যেই জিতুক—এই দাম-জিনিষের সঙ্গে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ওঠা নামা যদি নির্ভর করে তো যারা এই অমিতব্যয়ী বুদ্ধি নামিয়ে দিতে পারবে তাদেরই জয়ধ্বনি করবে জনসাধারণ।

জনসাধারণের প্রতিভূ এই বিমলবাবু।

দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের চাওয়া খুব বড় চাওয়া নয়। তারা চায় শুধু অন্ন আর বস্ত্র, আর চায় একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়।

এই চাওয়া চেয়েও যারা পায় না, কিংবা চাইতে গিয়ে বিদ্রূপিত হয়, তারাই সাধারণতঃ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাদের ওপর—যারা রাজশক্তিতে অধিষ্ঠিত।

কিন্তু অনগ্রসর এবং অশিক্ষিত জনগণের মনের এই বিক্ষোভ ভোটের মাধ্যমে অনেক সময় প্রকাশিত হয় না।

অথচ এই চতুর্থ নির্বাচনের ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে দেশ এখন আর অনগ্রসরও নয়,

অশিক্ষিতও নয়। নিজেদের শুভাশুভ সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন রাজিতন্ত্রটি এবং সুশিক্ষিত দেশের মত এবারের এই অভ্যাশ্চর্য গণরায়ের প্রতিফলন ভারতের আপামরসাধারণকে বিস্মিতও যেমন করেছে, আনন্দিতও করেছে তেমনি।

যে-ভারতের অগণিত জনসমাজকে শতবাবিচ্ছিন্ন দুর্বল বিমূঢ় এবং কলহপরায়ণ বলে জানতাম—সেই জনসমাজের মানসলোকে অনির্বান একটি চেতনার আলোক কেমন করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে তাকে এক এবং অবিচ্ছিন্ন করে দিলে। কেমন করে সেই অজ্ঞানের মোহান্ধকার বিদীর্ণ করে একটি অনন্ত প্রেমশক্তি উদ্বোধিত হলো! এইটিই ভাববার কথা।

সুদীর্ঘ কাল ধরে ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে যাঁরা অধিকার করে ছিলেন আজ তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে কিছুই আমরা বলতে চাই না। কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহঙ্কারকে বিসর্জন দিতে হলো বলে তাঁরা যেন আত্মকলহে নিমজ্জিত হয়ে জনকল্যাণকে বিঘ্নিত না করেন! এখন আমাদের একমাত্র প্রার্থনা, বিজয়ী এবং বিজিত উভয় শক্তি একত্রিত হয়ে সুখসমৃদ্ধ একটি অখণ্ড মহাভারত রচনা করুক! বিরোধের সমস্ত দাহ মিলনের ধারাস্নানে স্নিগ্ধ হোক্!

বিভিন্ন মত, বিভিন্নপথ, কিন্তু লক্ষ্য সেই এক। লক্ষ্য জনকল্যাণ। তাই যদি হয় তো পরাজয়ের গ্লানি আমাকে বিচলিত করবে কেন? আমি এবং আমার বিরোধী পক্ষ—উভয়েই যখন জনকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ, তখন আমার সামান্যতম বিচ্যুতি যদি অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে আমাকে কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তো আমাকে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে যে কর্তৃত্ব আমি করে এসেছি আজ যদি সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়ের প্রয়োজন হয় তো যে ব্রত আমি গ্রহণ করেছি সেই জনকল্যাণব্রতের জন্যই আমার কর্তৃত্বকে অপর পক্ষের হাতে প্রসন্নমনে তুলে দিয়ে আমাকে প্রেমের আনন্দ লাভ করতে হবে। তা যদি না করতে পারি, যদি প্রতিপক্ষকে আমার শত্রু মনে করি তাহ'লে বুঝতে হবে জনকল্যাণ আমার বাইরের মুখোস মাত্র, আমার লক্ষ্য শুধু কর্তৃত্ব লাভ।

জনকল্যাণকে উপলক্ষ্য খাড়া করে যে মানুষের লক্ষ্য শুধু তার ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধি, একদিন-না-একদিন তার পরাজয় অনিবার্য।

জনকল্যাণই যদি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে পরাজয় আমার চলার পথে বাধা নয়—পরাজয় আমার পথপ্রদর্শক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাববার কথা

নং ১

আমরা মুখে বলি ভারত-ধর্ম। ভারতীয়তায় গর্ব করি কিন্তু কার্যতঃ তাকে অস্বীকার করি। আমরা মুখে বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের জয়গান করি। কিন্তু কার্যতঃ আমাদের জীবনের ক্ষেত্র থেকে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাঁদের সসম্মানে দূরে সরিয়ে রাখি। যদি এই ভাবে তাঁদের সরিয়ে না রাখতাম তাহলে আজ আমাদের এই ভয়াবহ মানসিক দৈন্যের অভিশাপ ভোগ করতে হতো না।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁসের স্রষ্টারা আমাদের জীবন ও সাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমস্ত মূল সমস্যাগুলিকে সমাধান করবার পন্থা নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। ধর্ম আর শিক্ষা সম্বন্ধে আজ যে ভ্রান্ত অর্ধনগ্নতা আর অর্ধ নিষ্ঠায় আমরা নিজেদের প্রতারিত করে চলেছি বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ তার ভুল করে, বিরাট ভাবে, ব্যাপক ভাবে, বৈজ্ঞানিক ভাবে তার অনুশীলন করে গিয়েছেন। সমস্ত প্রাদেশিকতা আর ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তাঁরা ভারত ধর্মকে মানব ধর্মের সত্যরূপে প্রকট করে গিয়েছেন। শিশুকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষতম স্তর পর্যন্ত যদি আমরা এই সব মহামনীষিদের বিশাল বিপুল রচনাকে নির্দিষ্ট পাঠক্রমে নিয়মিত শিক্ষা দেওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে এক যুগের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। জগৎ সভায় আবার খুঁজে পাব আমাদের শ্রেষ্ঠ আসন। বিশ্বের সঙ্গে নূতন করে সখ্য স্থাপন করবার পরিচয় পত্র তাঁরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের বিপুল বিস্ময়কর সাহিত্যে। সে সাহিত্য যে কত গভীর, কত বিশাল আর কত ব্যাপক তার সন্ধান আমরা জানিনা। জানবার কোন ব্যবস্থাই আমাদের নেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এতবড় লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে?

স্বাধীনতার পর আজ আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য ঘটেছে যে, সামনেই রয়েছে অমৃত-সাগর অথচ তার তটে বসে আমরা তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি। এর চেয়ে ট্রাজেডী আর কি হতে পারে?

... ...

নং ২

আজকে ভারতব্যাপী আর্থিক দুরবস্থার চাপে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘূর্ণাবর্তে, জীবনতত্ত্বের মূল কথাগুলি চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনও মস্তিষ্কের সামনে শুধু একটা চিন্তাই সর্বগ্রাসী হয়ে রয়েছে। তা হলো শাসন যন্ত্রের অধিকার নিয়ে দলীয় রাজনীতির চিন্তা। আর মন ও মস্তিষ্ক নিয়ে যাদের কোনও দুর্ভাবনাই নেই। সেই সব জনসাধারণের সামনে একমাত্র চিন্তার বিষয় হলো, অন্ন ও বস্ত্র। প্রত্যেক মানুষের চিন্তার পরিধি তার ব্যক্তিগত অন্ন ও বস্ত্রের ভাবনায় আজ সীমাবদ্ধ। সেইটুকু হয়ে গেলেই সাধারণ মানুষের চিন্তার আর কিছু থাকে না। তাই আজকের আমাদের সামাজিক জীবনের নিয়ামক হলো দুটি জিনিস, সম্পর্কহীন দলীয় রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং একান্ত স্বার্থান্ধ অন্ন-বস্ত্র চিন্তা।

মানুষ সামাজিক জীব। আর সামাজিক জীব হিসাবে তাকে রাজনীতি নিয়ে থাকতেই হবে। কিন্তু আজ আমাদের দেশে রাজনীতি সর্বরকম জীবন-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হল প্রভুত্বের বীভৎস মূর্তিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। এই অন্ধ রাজনীতি সমগ্র দেশকে যে পথে নিয়ে চলেছে তার শেষে যে রয়েছে অতলস্পর্শী বিরাট গহ্বর সে সম্বন্ধে তার কোন চেতনাই নেই। অন্ধের মতন নির্ভাবনায় সে এগিয়ে চলেছে।

অন্ন-বস্ত্রের অভাব নিশ্চয়ই জীবনের অতি বাস্তব ঘটনা, যাকে উপেক্ষা করে মানুষ চলতে পারে না। কিন্তু এই অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে মানুষ যখন নিজের দেহ ও নিজের উদরের বাইরে আর কিছু দেখতে পায়না বা দেখতে চায় না, যখন এই অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে মানুষ আজকের দিনকে ছাড়িয়ে অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভুলে যায়, যখন সে মনে করে তার অন্ন-বস্ত্রের অভাব মিটে গেলেই তার নিজের ও তার জাতির সমস্ত দুঃখ কষ্ট মিটে গেল, তারপরে দেশে ও সমাজে যে আরো মানুষ আসবে তারাও এমনি অন্ন-বস্ত্রের অভাবে যে কাঁদতে পারে সে কথা তার মনেই হয় না দেখে,—যখন তার ব্যবহারে মনে হয় যে সেই যে তার জাতির সেই শেষ জীবিত লোক,—তখন জগতের কোন শক্তিই তার অন্ন-বস্ত্রের শেষ অভাব দূর করতে পারে না। তার দারিদ্র্যে সে নিজেই মরে। সেই সঙ্গে সে তার জাতিকেও হত্যা করে। আজ আমাদের জীবনে দেখা দিয়েছে সেই মারাত্মক দারিদ্র্য-বুদ্ধি। কাজেই সেই ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে বুদ্ধির ক্ষেত্রেই, চেতনার ক্ষেত্রেই। এই দারিদ্র্য দূর হবে না রঙগজ কাপড় বা অনগ্রসর একসের চালের ব্যবস্থায়। এই দারিদ্র্যকে দূর করতে হবে চেতনার ঐশ্বর্যে। এই দারিদ্র্যের বাস্তবতার মূল নেই বাইরে কোথাও, এই দারিদ্র্যের বাস্তবতার মূল রয়েছে মানুষের দরিদ্র মনে। যে জাতির অন্তর রয়েছে দরিদ্র, বাহিরে তার সর্বাঙ্গে মখমল জড়ালেও ঘুচবে না তার দুঃখ।

চির-ছাত্র

রামকৃষ্ণ বাচস্পতি শ্রীহট্টের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বৃদ্ধ। দেশ-দেশান্তর থেকে তাঁর টোলে ছাত্ররা পড়তে আসে।

একদিন ছাত্ররা দেখে টোলের দরজা বন্ধ। বৃদ্ধ বাচস্পতি মশাই টোল ছেড়ে যাত্রা করছেন। ছাত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—কোথায় যাচ্ছেন গুরুদেব?

বৃদ্ধ বাচস্পতি বলেন, আমি এখন আর গুরু নই। আমি ছাত্র। শুনেছি নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণি নতুন শাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই ছাত্র হয়ে তাঁর কাছে পড়তে যাচ্ছি।

এবারের সাধারণ নির্বাচনের কয়েকটি অসাধারণ ঘটনা

সমস্ত ব্যাপারটার বিরাটত্ব অনুভব করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নির্বাচন আর কোথাও কোনদিন হয়নি। ভোটারের সংখ্যা ২৫ কোটির উপর। নির্বাচনপ্রার্থীর সংখ্যা ১৮৫৯।

লোকসভা ও বিধানসভা মিলিয়ে আসনের সংখ্যা ৪০৮০। ভোটপত্র ছাপা হয়েছে ৫০ কোটি। দশলক্ষ তিরিশ হাজার ব্যালট বাক্স সরবরাহ করা হয়েছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বহু দুর্গম স্থান জুড়ে ভোট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে দুলক্ষ আট হাজার। এই বাবদ মোট খরচ হয়েছে ৯ কোটি টাকারও বেশী।

বিদেশ থেকে প্রায় ৪০০ রিপোর্টার ক্যামেরাম্যান এসেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছে, এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এ যেন এক অলৌকিক ঘটনার মত। তাদের দেশজুড়ে এ কি বিরাট স্পন্দন।

সেই স্পন্দনের মধ্যে হাসিও ছড়িয়ে আছে।

• • •

ভোটের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ, বাপ বেটার কারবৎ, ভাইএ ভাইএ মামলা পর্যন্ত।

ওমরাটের কৈবা লোকসভা নির্বাচনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভাই, বরম দেশাই, আর বলবন্ত দেশাই। বড়ভাইয়ের নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে কিছুতে এঁটে উঠতে না পেরে বন্ধুদের কুপরামর্শে বলবন্ত তখন বড় ভাইএর কেচ্ছা ছেপে বিলি করতে লাগল—তার মধ্যে পারিবারিক কেচ্ছাই

বেশি! অর্থাৎ বলবন্ত নিজের বাপদার কেল্লা নিজেই গাইল। কতখানি মানসিক স্থৈর্য থাকলে মানুষ রাজনীতির নোংরা খেলায় এত নীচে নামতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। বলবন্ত খেলাই শেষ পর্যন্ত ভাইএর নামে মামলা ঠুকেছে।

• •

দক্ষিণ ভারতে পটমন্তি কেন্দ্রে 'বামকমু' নামুস্রিপাদ-এর এলাকায় তাঁর বিপক্ষরা তারী এক মজার চাল চেলেছিল। হাজারে হাজারে ইস্তাহার বিলি হয়েছে, তাতে লেখা, "প্রত্যেক ভোটের জন্যে ১৫ টাকা—নির্বাচনী কর্মীদের জিন্দাবাদ।" ইস্তাহারে প্রকাশক মুদ্রক ইত্যাদি কারুর নাম নেই। কিন্তু ইস্তাহারটি নামুস্রিপাদকে বিপদে ফেললে। তাঁর যেসব পকেট ভোট ছিল তারা এসে ১৫ টাকা চাইতে লাগল। ইস্তাহার যখন বিলি হয়েছে, তখন যখন দিচ্ছে, তখন আপনিই বা দেবেন না কেন?

নামুস্রিপাদ ইলেকশন অফিসারের কাছে ইস্তাহারের নকল পাঠিয়ে লিখলেন, "মশায়! কী দুষ্টুবুদ্ধি দেখুন। এই ইস্তাহারে মহা ফুলঝোকার সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে অনেক ভোট পড়বে না। আমার সব ভোট আটকাবার জন্যে এ এক অদ্ভুত ফন্দী।"

আর ফন্দী! সে তো কবেই শিকেয় উঠেছে। তাছাড়া নামুস্রি কী জানেন না "প্রেমে বা আহবে, কিছুতেই অন্যায় না হবে?"

• • •

এক বৃদ্ধার করুণ কাহিনী। নিউ দিল্লীর পথে ঘাটে ক'দিন ধরে একটি বৃদ্ধাকে দেখা যাচ্ছিল, পরনের পথে তিনি ঘুরছেন, হাতে একটি প্লাকার্ড, তাতে লেখা—'কাউকে ভোট দেবেন না।'

বৃদ্ধার নাম পার্বতী। এককালে তিনি সম্ভ্রান্তসম্পন্ন গৃহস্থকর্ত্রী ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন তহশিলদার। ফুগালে তাঁর তিনটি বাড়ি ছিল। সেই তিনটি বাড়িই সরকার দখল করে নেয়। তারপর থেকে সুরু হয় পার্বতীর দুর্দিন। স্বামী মারা যায়, সরকার বাড়ি দখলের কোন ক্ষতিপূরণ দেয় না। শেষ পর্যন্ত পার্বতী পথের ভিখারীতে পরিণত হন। কিন্তু তাঁর তেজ আর প্রতিবাদের ভঙ্গী আজো তিমিত হয়নি। তিনি বলেন, 'একটু শুধু মাথা গোঁজবার ঠাঁই। এই চাওয়া কি আমার অন্যায়? সকলেই বলে সাহায্য করব। কিন্তু কেউ করে না। ভোটের আগে প্রার্থীরা সবাই বলে তোমায় চারতলা কোঠা বানিয়ে দেব। কিন্তু নির্বাচনের পর অষ্টরম্ভা, তাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। সব সমান। কংগ্রেস, বিরোধীপক্ষ—সব সমান। অনেক নেতার সঙ্গে আমি দেখা করেছি—সব শেয়ালের এক রা। তাই তো বলছি, তোমরা কাউকে ভোট দিও না। কাউকে ভোট না দিলে দলগুলির উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা হবে। তাহলে তারা বুঝবে, দেশের লোক তাদের কি চোখে দেখে! রাস্তায় শুয়ে আছে কত লোক, কত বুড়ো কচি ছেলে মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের জন্যে কেউ নেই; কোন দল নেই, নেতারা খালি নিজেদের ঢোলে ঢোল টানছে, তাইতো আজ দেশের লোক, সরকারী বা বিরোধী কোন দলের প্রতিই

আরাধ্য নয়, কোন মনের কোন নেতাকে তারা অন্ধের চোখে দেখেনা। তাই তো বলছি—কাউকে ভোট দেবেন না।'

পথচলতি মানুষ ঘরকে দাঁড়িয়ে পার্থীর কথা শোনে। কথা শেষে করে পার্থী এগিয়ে যান। ক্রমে পথের বাঁকে তিনি হারিয়ে যান। কিন্তু তাঁর কথার সুর হারায় না। অনেক মানুষের মনেই তা তরঙ্গ তোলে।

• • •

রাজস্থানের জয়পুরের এক কেন্দ্রে এক প্রার্থী বাড়ি বাড়ি ভোট ভিক্ষা করে ঘুরছেন। একটি বন্ধ দরজার কাছে দিতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক বয়স্কা মহিলা। প্রার্থীটিকে তিনি বিলক্ষণ চিনতেন, বললেন, 'আপনি?' 'নমস্তে, নমস্তে', বলে প্রার্থী তাঁকে নমস্কার জানালেন। মহিলা তাঁর নিজের পা দেখিয়ে বললেন, আমার খালি পা দেখেছেন তো? জুতো চাই।

নিশ্চয় নিশ্চয়, বলে প্রার্থী তাঁর সঙ্গের সহকারীকে বললেন, এখনি এর জন্যে বাজার থেকে ওঁর পছন্দসই একজোড়া ভাল জুতো এনে দেবে।

মহিলা বললেন, এক জোড়ায় হবে না। দু' জোড়া চাই।

একেবারে দু'জোড়া! প্রার্থী একটু অবাক হয়ে বললেন, এতগুলো এক সঙ্গে। সব তো আর এক সঙ্গে পরবেন না।

মহিলাটি বললেন, পরব কেন? জুতোর মালা গেঁথে আপনার গলায় পরিয়ে দেব।

কী সাংঘাতিক কথা! প্রার্থী এক লাফে গলি পার। পিছনে হাসির হররা।

অবশ্যই ভোটারনি বটে।

• • •

হিন্দুধর্মে অবিশ্বাসী হও, ভগবান না মনো, প্রথাগুলোকে বল কুসংস্কার—অন্ত সময় ঠিক আছে, কিন্তু ভোটের সময় ওসব বলা চলবে না। কট্টর কমুনিষ্ট ভগবান বিরোধী হিন্দুপ্রথা বিরোধী ডি. এম. কে নেতা আন্নাদুরাইএর ধর্মবিরোধী মতামত শিকেয় উঠেছিল সেদিন। মাদ্রাজের এক কেন্দ্রে তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন। এক পাড়ায় পৌঁছোতেই মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। (শাঁখ আন্নাদুরাই-এর দুজনের বিরু) তারপর তাঁকে পিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে রীতি মতো হিন্দু প্রথায় বরণ করে কপালে তিলক কেটে কুমকুম দিয়ে দিলেন।

আন্নাদুরাই-এর চেলাদের চোখ ছানাবড়া। গুরু বোধ হয় এবার ভেঙে ফেলে উঠবেন। কিন্তু না, ভোটভিক্ষু গুরু অত বোকা নয়। তিনি বেশ হাসিহাসি মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ সাজলেন।

• • •

সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, ভোটগ্রহণের দিন সেই রাজ্য শুকনো মুখে থাকবে—অর্থাৎ মদ্যপান সেদিন নিষিদ্ধ—মানে, মদের দোকান সেদিনের জন্যে বন্ধ।

তা মাহলে হয়? একে ভোটের উত্তেজনা, তার আবার যদি মেলা তার সঙ্গে যোগ হয় তাহলে তো হুলস্থুল ব্যাপার। পাড়ায় পাড়ায় ভোটার আর গুণ্ডাটিয়ার এক হয়ে গান ছুড়ে দেবে—'যদি মুদিনির গলি সরাবের দোকান খালি, যত চাও তত পাবে পয়সা মেবে না'। সেই সঙ্গে হয়ত দেখা যাবে, যোগেশের মতো নির্বাচনপ্রার্থীও গানের দলে ভিড়ে নাচতে শুরু করছে।

কয়েক বছর আগে এই কলকাতাতেই রামরাজ্যের অকলে কর্পোরেশন নির্বাচনে সত্যিই এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল।

• • •

উলটোটাও হয়। ভোটের সময় দেখা যায় তাবড় তাবড় মানী লোক নির্বাচনপ্রার্থী হয়ে গরীব ভোটারের দরজায় দরজায় ঘুরছেন ভোট ভিক্ষা করে। আবার এবারকার নির্বাচনে দেখা গেল, ভোটাররা প্রার্থীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। রামরাজ্যের বেলওলা গ্রামে রামগড়ের রাণী শ্রীমতী ললিতা রাজ্যলক্ষ্মী যখন তাঁর নির্বাচনীলকরে গিয়েছিলেন তার সেখানকার মহিলা ভোটাররা তাঁর সামনে এসে সেই গ্রামের রীতি মত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছিল এবং সেই সঙ্গে পুরুষরাও ভক্তিভরে দণ্ডবৎ হয়েছিল। প্রত্যেকটি ভোট তিনিই পাবেন সকলের একবাক্যে মত এইরকম।

• • • •

বিয়ের বরও ভোট দিতে ছোটে। একআধজন নয়। তিন তিনজন বর শুভদৃষ্টির এক গ্রামে বিয়ে করতে গিয়ছিল। বিয়ের পর তিনজনেই ফুলে বিয়ে বাড়ি বেরবার সময় দেখলে ভোটের দল শেষ হয় হয়। বেলা শেষ হয়ে এলো। তখন তারা নতুন ফুলের গয়ের বাসরঘরে ছেড়ে দিয়ে সেই বরবেশেই ছুটলো ভোট কেন্দ্রের দিকে। ভোট দেওয়া চাই।

• • •

উত্তর কলকাতার একটি ভোটকেন্দ্রের রং বেরং। পাড়ায় থাকেন এক বৃদ্ধ পণ্ডিত। একা থাকেন। সংসারে তাঁর কেউ নেই। একটি ঠিকা লোক আছে। অল্পস্বল্প কাজকর্ম করে দিয়ে সে চলে যায়। বৃদ্ধ স্বপাকে আহার করেন। আর সারাদিন গীতা পাঠ করে সময় কাটান। রাজনীতির কোন ধারই তিনি ধারেন না। খবরের কাগজ কোনদিন উল্টে দেখেছেন কিনা সন্দেহ। ভোটের ব্যাপারে সেই কেন্দ্রের পাঁচজন বিধান সভা পদ প্রার্থীর পাঁচজন প্রতিনিধিই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং হাতজোড় করে ভোট ভিক্ষা করেছেন। তিনিও সকলকেই করজোড়ে বলেছেন, হ্যাঁ, আপনাকেই দেব বৈকি। ভোটের দিন তিনি তাঁর কথার খেলাপ করেন নি। ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পাঁচজন প্রার্থীর নামের পাশেই ছাপ দিয়ে এসেছেন।

আমাদের রাজ্যপাল শ্রীমতী মাইমু ভোট দেননি। এ রাজ্যে তাঁর ভোট নেই। অথচ প্রবেশে ভোটার তালিকায় তাঁর নাম আছে।

• • • •

ভোটের গানের রেকর্ড কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে। সাংঘাতিকরাম বাটপাড়িয়ার' (পরশুরামের গল্প দ্রষ্টব্য) সব কারবারেই চোরাবাজার চালু করেছেন। এবার প্রায়োফোন রেকর্ড আর ভোটের গান নিয়েও চোরাকারবার চলেছিল ইক্ষোরে। বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফির একটি ভোটের গান বেরুলো—"কংগ্রেসকো ভোট দেও" !

কী দরদ ! কী গানের চং ! লোকে সেই রেকর্ড কেনবার জন্যে পাগল হল। ব্যস ! সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে রেকর্ড উধাও ! কালোবাজারে সেই পাঁচ টাকার রেকর্ড ষোলো টাকায় বিক্রি হয়েছে। সাংঘাতিকরাম বাটপাড়িয়ারের মাথা কী সাফ। এই না হলে আর ব্যবসা বুদ্ধি।

• • •

দাড়ির জন্যে বেচারা প্রার্থী কমলে কম ৩০০ ভোট হারালেন। অমলপুরের এক নির্বাচনকেন্দ্রে এক জনসংঘ প্রার্থীর দাড়ি ছিল। ভোট সংগ্রহে বেরিয়েছেন তিনি। একজন ছোকরা বললে, 'দাদু, দাড়িটা কামিয়ে ফেলুন, কেমন কেমন যেন লাগছে দেখতে।' কথা শুনে ভদ্রলোক রেগে আগুন। কী ব্যাটা ! আমার দাড়ি নিয়ে ঠাট্টা ! ভদ্রলোক ছোকরাকে এই মারেন কি সেই মারেন। ব্যস। আর যায় কোথায় ! চতুর্দিকে হৈ হৈ।

গ্রামের লোক জড় হয়ে গেল। সকলে একবাক্যে বললে, আগে আমরা ঠিক করেছিলাম যে এবার জনসংঘকেই ভোট দেব। কিন্তু এই দাড়িবাবার ব্যবহারে আমরা মর্মাহত। জনসংঘ ভোট পাবে না।

কী দুর্ভাগ্য বলুন তো। লোকে ভোট পাবার জন্যে কত কী ত্যাগ করে। সামান্য দাড়িটা তো তার তুলনায় কিছু নয়।

• • •

রায়পুর বিধান সভার নির্বাচনপ্রার্থী মোহনলাল ভট্টর ভোট ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন নতুনতর সাজে ! এক যাত্রাওলার কাছ থেকে ঘোড়ার পোষাক ভাড়া করেছিলেন। আর ভাড়া করেছিলেন একটি ঘোড়া। সেই সঙ্গে কয়েকজন সানাইওলা। তারপর ঘোড়বেশে সেই ঘোড়ার পিঠে তিনি গ্রামের পথে পথে ঘুরলেন, ঘোড়ার আগে আর পিছে সানাইওলারা ঘুলতানি রাগে কানাড়া বাজাতে বাজাতে চলছিল !

• • • •

মায়ী ভিখা নর ? এ ভোটারের কোন ঘর ? হনুমুল কাণ্ড থেকে বলে। বিহার শরিফের এক ভোট কেন্দ্র। নামটি তার খরখরি। এক ভোটার এলেন, পুরুষ, কিন্তু তাঁর নাম সুমিত্রা দেবী।

পুরুষের এ রকম নাম তো হয় না। পোলিং অফিসারের সন্দেহ হল! ভদ্রলোক বহু বলেন, আরে মশাই, বাপমা আমার এই নাম রেখে গেছে তা আমি কি করব! পোলিং অফিসারও তবুই মাথা নেড়ে বলেন,না, আপনি স্ত্রীলোক! মেয়ে-ভোটার আপনি! শেষ পর্যন্ত গ্রামের চৌকিদার দফাদার গ্রামসেবক ইত্যাদিদের ডেকে ভোটদাতা স্ত্রীলোক না পুরুষ সেই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে তাঁকে ভোট দিতে দেওয়া হল।

—আমিই সুমিত্রা দেবী

• • •

মুদেরে একশ বছর বয়স একজন ভোটার ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মারা যান। তিনজন লোক তাকে ধরাধরি ক'রে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে যাবার পর তিনি ব্যালট পেপারে নিজের হাতেই ছাপ দেন। ফেরার পথে তিনি রাস্তায় মারা যান। আরেকজন ভোটদাতা ডাক্তারকে অনুরোধ করেন "আমাকে আরেকটি দিন বাঁচিয়ে রাখুন; ভোট দিয়ে তারপর আমি মরতে চাই।"

• • •

ভোট-কলহে নাক গেল! সত্যিই এক কামড়ে আধখানা নাক সাফ! আমেদাবাদের পাঁচমহল জেলার এক জায়গায় এক তরুণ দম্পতী ভোটের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীকে ভোট দেন। বাড়ি ফিরে এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে তুমুল কোঁদল! স্বামী রেগে গিয়ে স্ত্রীর নাকে এক প্রচণ্ড কামড় দিয়ে নাকের একাংশ বিলকুল উড়িয়ে দেন। পরিণামে স্ত্রী হাসপাতালে। স্বামী শ্রীঘরে।

• •

ক্রিকেটে রাজনীতির কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু রাজনীতিতে ক্রিকেট? বর্তমান নির্বাচনে ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন ক'রে অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। খেলোয়াড়দের রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকার ফলে অনেক ক্রিকেটদল পঙ্গু হয়ে পড়ে। ইংল্যাণ্ডগামী ক্রিকেট খেলোয়াড় সঞ্জয় মঞ্জরেকর তাঁর বাবার পক্ষে প্রচার চালান। তাঁর বাবা একজন মুসলমান এবং মহারাষ্ট্র বিধান সভায় সদস্য। আরেকজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া সফর বাতিল ক'রে নির্বাচনের প্রচার কাজে নেমে পড়েছিলেন। ইনি হলেন রাজস্থানের ক্রিকেটদলের অধিনায়ক এস, কে, রাজসিংহ। তাঁর বাবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। সৌরাষ্ট্রের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি নিজেই কংগ্রেস প্রার্থী রূপে দাঁড়িয়েছিলেন।

• • • •

ভুবনেশ্বরে এক মজার কাণ্ড হয়েছে। ওখানে একই কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন জামাই এবং শাশুড়ী। শাশুড়ী সত্যভামা দেবী জনকংগ্রেস প্রার্থী রূপে দাঁড়িয়ে জামাই ভুবনমোহন মল্লিকের ৩২,২১৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, জামাইয়ের জামানত পর্যন্ত জব্দ হয়েছে। ওই কেন্দ্রের অন্য দুজন প্রার্থীরও একই হাল। উড়িষ্যা থেকে এ-পর্যন্ত যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে সত্যভামা দেবীই সব চাইতে বেশি ভোট পেয়েছেন।

• • •

মুরবাদের গ্রাম্য এলাকায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসে কাবকাবি এবং ওয়ারলিস ইত্যাদি কয়েকটি বন্য জাতি। এই ভোটদাতাদের দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যায়। কারণ এদের পরনে ছিলো মেটি আর হাতে তীর-ধনুক। অন্য একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ছিলো ভারী সুন্দর। চারদিকে জলা; বাঁশ আর নারকেল গাছের বন।

•

বুলসার গ্রামে উৎসবের পোশাক প'রে গরুর গাড়িতে ক'রে ভোটদাতারা এসে ভোট দিয়ে যায়। জগদলপুরে আরো মজার কাণ্ড হয়েছে। সেখানে একজন লোক বস্তারের স্বর্গত মহারাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে ভোট চায় এবং তার পরিবর্তে প্রতিশ্রুতি দেয় যে গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে বেশন দেয়া হবে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

• • •

নির্বাচনী প্রচারে এবার চিত্র তারকাদের কয়েকজন নেমে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে আছেন তনুজা এবং আবীর। স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী মিঃ নানা চৌহানসহার পক্ষে এরা প্রচার চালিয়ে যান। ওয়াকেফর এলেখনীর প্রার্থী হিসেবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।

• • •

গোবী অঞ্চলে, দুজন পোলিং অফিসার ভীপে চড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি মস্ত বড় ভালুক তাদের আক্রমণ করে। তখন ভীপ ফেলে রেখে গাছের ডগায় আশ্রয় নেন।

• • •

মধ্যরাত্রে একজন অন্ধ মহিলা ভোট দিতে এসেছিলেন। পোলিং অফিসার সাহায্য করতে চাইলে তিনি তাঁর সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন। পরিবর্তে তিনি নিজের বিশ্বাসী একজন লোকের সাহায্য নিয়ে ব্যালট বাক্সে ভোটের কাগজ ফেলেন।

• • •

রাজ্যের এক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে একই ব্যক্তির দুই স্ত্রী ভোট দেবার অন্য লাইনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কে আগে ভোট দেবে তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। একজন দাবী করে স্বামী তাকেই বেশি ভালবাসে সুতরাং আগে ভোট দেবার অধিকার তারই।

• • • •

সত্যিই ভোট দেবার এমন কী মহা উদ্দীপনা। মধ্যপ্রদেশের রামপুরি গ্রামের মহিলারা ভোট দেবার ব্যাপারে এবং তাঁদের মনোনীত প্রার্থী যাতে জেতে তার জন্যে এমনই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে ভোটের দিন ঘর সংসার তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। উনুনে সেদিন আর আগুন পড়েনি। ফলে বাড়ির পুরুষরা কেউ বা হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছেন। কেউ বা কলার করেছেন। ভোর বেলাতেই সেই গ্রামের বয়স্কা এবং অল্প- বয়সী মেয়েরা দলে দলে ভোট কেন্দ্রের দিকে চলে গেছেন। শুধু নিজেদের ভোট দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। তাঁদের প্রার্থীর অনুকূলে সারাদিন কাজ করেছেন। রাত দশটায় ভোট শেষ হবার পর মেয়েরা ঘরে ফিরেছেন।

ভোটের বাঁশী শুনে শুনে আকাশ রাঙা হল
ঘরেতে আজ কে রবে গো ঘোল দুয়ার খোল।

• • • •

এবারকার নির্বাচনে অনেকের অনেক রকম রসবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি চিতা বাঘও আছে। শিবাস্রবের ন' মাইল দূরে জেমবারামে একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেই ভোটকেন্দ্রে বহু সময় একটিও ভোট পড়ে নি। কারণ? কারণ একটি চিতাবাঘ। এই চিতা বাঘটি নাকি ভোটার দেখলেই তাড়া করেছে। অতএব ভোট দেবার যতই উৎসাহ থাক, জেমবারামের অধিবাসীরা চিতা বাঘের খপ্‌পরে পড়তে রাজী ছিল না। তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইল। এদিকে পোলিং বুথের অফিসার সেজে গুজে বসে আছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ভোটার আর আসে না। তিনি তখন খোঁজ খবর নিয়ে চিতা বাঘটির রসিকতার কথা জানতে পারলেন এবং আরও জানলেন যে বাঘটি একটি সার্কাস কোম্পানীর। বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়ে চিতা বাঘটি সোজা চলে গেছে ভোটের রঙ দেখবার জন্যেই। পরে অবশ্য গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে বাঘটিকে খাঁচায় পাঠিয়ে দেয় এবং তার পর ভোটকেন্দ্র সরগরম হয়ে ওঠে।

উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৫)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

'এই!' জানলার বাইরে থেকে ডাক দিয়েই সরে গেল বনছায়া।

সুবীর শুধু ডাকই শুনল মানুষটাকে দেখতে পেল না। কে জানে অশরীরী ডাক কিনা। এমন ডাক কি কখনো বৈধ হতে পারে, এমন মৃদু অথচ এমন মধুর! কিন্তু কই, কই আমার 'এই'?

বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল সুবীর, এক লাফে উঠে দরজা খুলে দিল।

খুলে দিল মানে একেবারে হাট করে খুলল না, পাল্লা দুটো আস্তে অল্প একটুখানি ফাঁক করল। সেই ফাঁক দিয়েই দেখতে পেল শাড়ির আভাস। আর সেই আভাসেই একটা অদেখা দেশের নিমন্ত্রণ।

সুবীর দরজার ফাঁকটা আরো একটু বড় করল যাতে বনছায়া সংকীর্ণতর হয়ে ঢুকতে পারে। অর্থাৎ ঢুকতে গেলেই সুবীরের সঙ্গে তার একটা অনিবার্য সোহার্দ্য ঘটে যায়।

'সকাল বেলায়ই দরজা বন্ধ যে।' দরজার পাট আরো প্রসারিত হবার আশায় স্থির থেকে বললে বনছায়া।

'আমার আবার কে আসবে যে দরজা খোলা রাখব?'

'কেন, তোমার 'এই' আছে।' দরজার অপ্রশস্ত ফাঁকের মধ্যে দিয়েই গলতে চেষ্টা করল বনছায়া।

'কই, কই আমার এই?'

সুবীর বুঝি নিজেই বনছায়াকে দরজার এ প্রান্তে টেনে আনল। টেনে এনেই পাল্লা দুটোর মধ্যেকার ফাঁকটা অল্প চেষ্টাতেই বন্ধ করে দিল আর নিজেই বনছায়ার নড়া-চড়া বা এগিয়ে যাবার পক্ষে প্রস্তুত বাধা হয়ে দাঁড়াল।

'ছাড়ো। জানলাটা খোলা।'

'থাক খোলা। বিশ্বজগতের সবগুলো চোখ খোলা থাক।'

হাত তুলে আত্মরক্ষার কোনো বেড়া বানাতে চাইল না বনছায়া। বরং হাত তুলে সুধীরের কপালের থেকে চুলগুলি মাথার উপর সস্নেহে সরিয়ে দিতে লাগল। বললে, 'একেক সময় এমন ছেলে-মানুষি করো না—'

'সমস্ত সৃষ্টিটাই তো ছেলেমানুষি। একটা ছেলেমানুষের খেলা।'

'জানো, একটা সুখবর আছে।'

'সুখবর? তোমাকে এই বুকের মধ্যে পেয়েছি এই যথেষ্ট সুখবর।' এর বাইরে আর যেন কিছু জানবার নেই সুধীরের। জানবার বিষয়ও কিছু থাকতে পারে না।

'শোনো। আমার বিয়ে।'

'সত্যি?' সুধীর উল্লাসের একটা শব্দ করল বটে কিন্তু সেই মুহূর্তেই কেন কে জানে আলিঙ্গন শিথিল করে দিল।

আর ছাড়া পেয়েই বনছায়া প্রায় ছুটে গিয়ে তক্তপোশে সুধীরের বিছানার উপর বসে পড়ল। আর একেবারে পা তুলে আসন-পিঁড়ি হয়ে। আর হাসতে লাগল ছেলেমানুষের মত।

'কবে বিয়ে?' সুধীর লেখবার টেবিলের সামনেকার চেয়ারটা বনছায়ার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বসে পড়ল।

'এই কাছাকাছি একটা দিনে।'

'পাত্র কে?'

বনছায়া কিছু না বলে খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে কোলের উপর ফেলে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল।

'বলো না তার নাম কী?' সুধীর বনছায়ার হাঁটুতে একটা ঠেলা দিল।

'নাম জেনে তোমার লাভ?' বনছায়া চোখও তুলল না।

'তাকে গিয়ে একটা তাড়া দিই। তার পথের কণ্টক হয়ে দাঁড়াই।'

'কণ্টকের সাধ্য নেই সে ঝড়কে তাড়া দেয়। একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।' চোখ তুলল বনছায়া, বেদনাদুস্থ চোখ: 'টেরও পাবে না।'

'কোথায় নিয়ে যাবে?' সুধীর উত্তপ্ত হয়ে উঠল: 'যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে গিয়ে হাজির হব। লড়ব তোমার জন্যে। যদি সঙ্গায় নিয়ে যায় সেখান থেকে উদ্ধার করে আনব।' বনছায়ার হাঁটুটা আবার স্পর্শ করল সুধীর: 'তোমার জন্যে আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি।'

সুধীরের হাতটা সরিয়ে দিল না বনছায়া। বললে, 'তা আমি জানি। খালি এই ঘরটুকুতেই আমাকে জায়গা দিতে পারো না।'

সুধীর যেন উঠল শব্দ করে। হাত সরিয়ে নিল। বললে, 'এটুকু ঘরের জায়গাতে তোমার কুলুবে কেন? তুমি থাকবে রাজপ্রাসাদে, সপ্তঘরের মিনারে। আমি পথের লোক, পথে দাঁড়িয়ে লড়ব। যে রাক্ষস আমার প্রেয়সীকে বন্দিনী করেছে, যুদ্ধে তাকে উচ্ছেদ করব, তার স্বর্ণপুরীও খাড়া থাকতে দেব না।'

উজ্জ্বল চোখে রাজ্যপ্রাপ্তীত সুধীরকে একবার দেখল বনছায়া। পরমুহূর্তে ম্লান করে বললে, 'তুমি তো শুধু লড়তেই পারো, লড়তে পারো না। পরের ঘর ভাঙতেই ওস্তাদ, নিজের ঘর বন্ধ করতে

আর মন ওঠে না।' বলেই বনছায়া লাফিয়ে উঠে ছুটে ভিতরের দিকের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, 'আচ্ছা, ভেতরের এই বাহাদুরটা কি তোমার ভাঙার মধ্যে?'

এহেন আকস্মিক প্রশ্নে সুধীর কেমন চকচকিয়ে গেল। বললে, 'কেন, এ প্রশ্ন কেন?'

'বলো না তোমার মধ্যে কিনা।'

'আমার মধ্যে বৈকি। আর ঐ প্রায়েই তো থাকব।'

'তা হলে এদিকটা একটু ঘিরে নিলেই দিব্যি রান্নাঘর হয়ে যাবে।' বনছায়ার কণ্ঠে যেন একটি তৃপ্তির সুর লাগল!

'কেন, রান্নাঘর কেন? রাঁধবে কে? আমি তো দিব্যি দুবেলা বাইরে খেয়ে আসছি।'

'তাই তো অমন চেহারা হচ্ছে।' বনছায়া বাইরের চোখকে ভিতরে নিয়ে এল। বললে, 'এ ভক্তপোশটা বিদেয় করে দিতে হবে। তার বদলে ছোট্ট ক্যাম্পখাট নিয়ে আসতে হবে। ছোট্ট দু' বেয়ান কেঁদে বেশ সহাবস্থান করতে পারবে। কী বলো, পারবে না?'

'তুমি কী বলছ বা তা!' সুধীরের কথায় বুঝি বা একটু রাগের সুর বাজল।

'বা-তা বৈকি! এই বা-তা বলবার জন্যেই তো সকালবেলা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।'

'কিন্তু ক্যাম্পখাট—ক্যাম্পখাটে শোবে কে?'

'পাত্র-পাত্রী শোবে।' বনছায়া শব্দ করে হেসে উঠল: 'এক খাটে পাত্র আরেক খাটে পাত্রী।'

'পাত্র কে?'

'পাত্র আমি।'

'কী যে বলছ তার মাথামুণ্ডু নেই। পাত্র তুমি?'

'ঠিকই বলছি। আমিই পাত্র। পাত্র মানে কী? পট্—আধার। আর সেই আধার যে ধরে, সে পাত্রে যে ধনী, সেই পাত্রী। কী, ঠিক বলিনি?'

'উঃ, ঠিক বলেছ। বেশ, তাই সই, কিন্তু—কিন্তু সেই পাত্রী কে?'

'ইস, তাও বলে দিতে হবে?' বনছায়া চোখের কোণে আভিমানের ছায়া ফেলল।

'বলে দিতে হবে বৈকি।' সুধীর অস্থির হয়ে উঠল: 'সব খোলাখুলি বলছ এটাও বা চেপে যাবে কেন? তোমার সেই পাত্রীর নাম কী?'

'তার একটাই শুধু নাম জানি। সে আমার 'এই'।

'সত্যি?' সুধীর উঠে গিয়ে ভক্তপোশে বনছায়ার ডান পাশে বসে পড়ল। দুবাহুতে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমিই পাত্রী?'

কানে-কানে বলার মত করে বনছায়া বললে, 'হাঁ'। আধার কপালের উপর থেকে কটি চুল তুলে দিল কানের পিঠে। বললে, 'শোনো। তুমি তৈরি থেকো। আমি যে কোনোদিন আমার জিনিসপত্র নিয়ে—জিনিসপত্র আর কীই বা হবে—এখানে তোমার কাছে চলে আসব।'

'তুমি চলে আসবে!'

'তা ছাড়া উপায় কী। তুমি তো গিয়ে ছিনিয়ে আনবে না। তাই আমাকেই আসতে হবে।' বনছায়া হাসল: 'পাত্রই পাত্রীকে উদ্ধার করবে।' তারপর ধীরে মুখ নোয়াল: 'শোনো, শুধু আসব, তাই না—থাকবও।'

'থাকবে!' দুরাশার মধ্যে পরিপূর্ণ পেয়েও যেন সুধীর বিশ্বাস করতে পারছে না বনছায়া এই ঘরে আসবে, থাকবে এই ঘরের ঘরণী হয়ে। তাই বুঝি একটু পরীক্ষা করার মনোভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু ছুটো যাই কেন?'

'প্রথমটা তোমাকে একটু রাখতে হবে শাসনে।' দুষ্টুমিভরা চোখে হাসল বনছায়া: 'নাও, ছাড়ো, আফিসের বেলা হয়ে গেল।'

সত্যিই তো—তড়াক করে সুধীর লাফিয়ে উঠল। টেবিলের উপর ঘড়িতে দেখল, ন'টা বেজে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে কিসে? তোমার গাড়ির গাড়ি তোমাকে তুলে নিতে আসবে?'

'গাড়ির গাড়ি নাকচ করে দিয়েছি।' বনছায়া উঠে পড়ে শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিল। বললে, 'আমি এবার থেকে ট্রামে-বাসেই যাব—যেমনভাবে তুমি যাও।'

কথাটা বুঝি পুরোপুরি বিশ্বাস হল না সুধীরের। তাবল একবার লুকিয়ে পিছু নিয়ে দেখবে হয়, সত্যি কিসে করে যায়। কথায় সেই সন্দেহের গন্ধ রেখে বললে, 'যদি রাস্তায় খালি ট্যাক্সি পেয়ে যাও তবে তাইতেই চলে যেও।'

'আর ট্যাক্সি চড়ে না!' বনছায়া বললে অভয়কের মত: 'এখন কষ্ট সহ্য করবার দিন আসছে, এখন একটি পয়সাও অপব্যয় করা নয়।' বলেই চোখে আমার সেই মদির ইঙ্গিত আনল: 'অন্তত প্রথমটা'—ছুপা ঘরজার দিকে গিয়েই আবার পিছন ফিরল: 'আচ্ছা, তোমার অফিস কটায়?'

'ঘারোটায়।'

'উঃ, কী আরামে আছ! তাই বেলা নটা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকতে পারছ।'

'আমার আফিসেও এই দোষ। মাড়োয়ারির গদি তো, চেয়ার-টেবিলের আফিস নয়, ফরাস আর জলচৌকি—তাই মাঝে মাঝে দিব্যি এলিয়ে পড়া যায়। যা মাইনে দেয়, ঐ এলিয়ে পড়বারই মত।'

'কত দেয়?' মুখোমুখি প্রশ্ন করবার মত সুযোগ পেয়ে বনছায়া যেন স্বস্তি পেল।

'তোমার চেয়ে ঢের কম।'

'এখন আর তোমার-আমার কী। বলো না কত?'

'একশো বাষট্টি।'

'যথেষ্ট'।

'যথেষ্ট?'

'তার সঙ্গে আমার আড়াইশো টাকা যোগ করো। মিলিয়ে চারশো টাকার উপর। তা হলে দাঁড়াচ্ছে কী?' সর্বাঙ্গে খুশি ঝরিয়ে বনছায়া বললে, 'দাঁড়াচ্ছে, একজন চারশো টাকা মাইনের এক অফিসরকে আমি পতিত্বে বরণ করছি। মধ্যবিত্ত ঘরে বেশ সম্ভ্রান্ত শোনাবে। তারপর উন্নতি তো আছেই—'

সুধীর মুগ্ধের মত মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল। বিশ্বাস করতে চাইছে না আবার অবিশ্বাস করতেও বুকটা যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তবু মুখে হাসি টেনে বললে, 'সমস্তই ভবিষ্যৎ।'

'হাঁ, তাই, তবে প্রথমটা একটু কষ্ট, একটু নিবৃত্তি—'

'দুদিকে দুটো ক্যাম্পখাট—'

'কিন্তু মাঝখানে কোনো দেয়াল নেই—শুধু পরস্পরের পরিচ্ছন্ন বোঝাপড়া।'

'যেন পাশাপাশি বিছানায় জেলখানার কয়েদি।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সুধীর। বললে, 'শোনো যদি প্রথম ঘরে কিছু থাকে, তা হচ্ছে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আফিসে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলা।'

'সে সব কাগুজে ব্যাপার হবেখন আস্তে সুস্থে।' বনছায়া স্থির হয়ে দাঁড়াল : 'আসল হচ্ছে আমার এখানে চলে আসা, তোমার সঙ্গে একত্র এক ঘরে থাকা, তোমার বুকে আশ্রয় পাওয়া। বিয়ে বলে একটা কাগজের ব্যাপার তো আছেই, সেটা যথাসময়ে হবে, তার জন্যে আজই ব্যস্ত কী।'

সুধীর যেন ঠিক আমা ভাবতেই পারছিল না বনছায়াকে সে প্রেমিকারূপে পেয়েও আবার স্ত্রীরূপে পাবে। তার মনে একটা সন্দেহ সব সময়েই থেকে যাচ্ছে বনছায়া তাকে ভালোবাসলেও বিয়ের বেলায় সে তার নিজের কোটিতে ফিরে যাবে। রূপবতী ধনী মেয়ে দরিদ্রকে ভালোবাসতে পারে কিন্তু স্বামীরূপে জীবনে স্থাপিত করতে পারে না। ভালোবাসায় বিচারের কথা ওঠে না কিন্তু বিয়েতে আগাগোড়া বিচার আর সে বিচারে সুধীরের নম্বর পাশ-মার্কের অনেক নিচে, শুধু আবেগের ঝোঁকে তাকে একশোতে একশো করে দেওয়া যায় না। আর আজকের সমাজে শুধু আবেগের খাতিরে আদর্শের খাতিরে রাজরাণী মেয়ে সানন্দে ঘুঁটেকুড়ুনী সেজেছে এ অসম্ভব। তাই যদি তুমি প্রেমের আন্তরিকতাকে সমাজে সপ্রমাণ করতে চাও তো আগে বিয়ে করো, পরে তুমি জোড়াঘাট করো কি আলাদা বাট করো, সে অন্যকথা।

'না, যদি কিছু হয় তো বিয়েটাই আগে হওয়া ভালো।' সুধীর বুঝি আরো একটু দৃঢ় হল : 'আর সব ডিটেল্‌স পরের কথা। বিয়ে হয়নি অথচ দুজনে একসঙ্গে আছি, লোকে কী বলবে?'

'লোকে কী বলবে! যাই বলুক, যা বলবার নয়, তাও বলুক, কিন্তু তাতে আমাদের কী এসে যায়? সমাজকে মানো না, শাস্ত্রকে মানো না, এই বড় বড় কথা যে মুখে বলো তা কি শুধু মুখেই থাকবে, আর কখনো-কখনো শুধু কবিতায়? সুযোগ এলেও নিজের জীবনে তা করে দেখাবে না?'

সুধীর বিষাগ্রন্থের মত বললে, 'আর কিছু না মানি, আইন মানতে হবে তো।'

'আইন! বেআইনি কোনখানটায় হচ্ছে? আমি নাবালিকা নই যে কেউ বলবে আমাকে তুমি কিডন্যাপ করে এনেছ। র‍্যাপিডাই করে এনেছ তাও বলা চলবে না— আমি বলব আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি—নিজে পায়ে হেঁটে। কোনো রামশক্তি নেই আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখান থেকে ধরে নিয়ে যায়।'

'আমি পুরুষ, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না, কিন্তু তুমি মেয়ে, তোমারই কুৎসা রটবে।'

'কুৎসা! তুমি আমার পুরুষ, তুমি তো কুৎসা করবে না, তা হলেই হল।'

'কিন্তু বিয়েটা আগে করে নিতে আপত্তি কী?'

'কিছুমাত্র আপত্তি নেই, তবে অসুবিধে হতে পারে।'

'অসুবিধে!' সুধীর অন্যমনস্কের মত টেবিলের উপরে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল : 'কিসের অসুবিধে।'

'রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে তো অন্তত একমাস সময় লাগবে—নোটিশের একমাস—কিন্তু ধরো যদি তার আগেই, ধরো, আজ কিংবা কাল ঝগড়া করে আমাকে যদি বাড়ি ছাড়তে হয়, আমি তো তখন এখানে তোমার কাছেই আসব। তুমিই তো তখন আমাকে আশ্রয় দেবে, তোমার বুকে

আশ্রয় দেবে। যদি আমার খোঁজে তোমার দরজায় কেউ এসে ধাক্কাও দেয়, তুমি দরজা খুলে দেবে না। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বনছায়া এখানে আছে, তুমি বলবে কে বনছায়া? যে মহিলা আমার ঘরে আছেন তিনি আমার স্ত্রী—'

'কিন্তু যদি দলিল দেখতে চায়?'

'বলবে দলিল হারিয়ে গেছে।'

সুবীর হেসে উঠল; 'বিশ্বাস করবে না।'

'বলবে দলিল ছিঁড়ে ফেলেছি। দলিল নেই। বলে খোলা দরজা মুখের উপর বন্ধ করে দেবে।'

'তা বাড়ির সঙ্গে তোমার ঝগড়া হতে যাবে কেন?' এবার সুবীরের হাসিতে যেন একটু বিজ্ঞতার ছাপ পড়ল: 'ঝগড়া হলেই বা বাড়ি ছাড়বে কেন? তা তোমার ঝগড়াও হবেনা বাড়িও ছাড়বেনা।'

'তার মানে যদি আজ কাল পরশু আমাকে বাড়ি ছাড়তে হয়, তা হলে তোমার কাছে, তোমার ঘরে আমি আশ্রয় পাবনা?'

'তার চেয়ে আজ কাল পরশু একদিন এস আমরা রেজিস্টারের অফিসে গিয়ে নোটিশ দিই।'

'সে মামুলি তো সবাই পারে। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি কিছু অসম্ভব করতে পারো।' বনছায়া খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'এরপর আমাকে যদি আর আমার বাড়িতে বা অন্য কোথাও খুঁজে না পাও, আমাকে ডুবো না। তখন এ বোলো না, কই, আমার কাছে তো আসনি!'

বনছায়া দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

কিছুক্ষণের মত স্তব্ধ হয়ে রইল সুবীর। চেয়ারে বসে টেবিলের বই নিয়ে নাড়াচাড়া সুরু করল কিন্তু, কী যে সে খুঁজছে, কোন পৃষ্ঠায়, বুঝে উঠতে পারল না। বই ফেলে দিয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিল। ভাবল যেমনি পড়ছিল সে প্রথমে, তেমনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তে গেলেই বুঝি আগেকার শান্তি ফিরে পাবে। সেই ভেবে সুবীর বিছানায় শুল, খবরের কাগজটা চোখের উপর মেলে ধরল, কিন্তু কোন খবরটা আগে পড়বে, আগে পড়বার মত, খুঁজে পেল না। এ-পৃষ্ঠায়, ও-পৃষ্ঠায়, কোনো পৃষ্ঠায় না।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সুবীর। এ সে করেছে কী? যে তার প্রকাণ্ডতম খবর তাকেই সে কিনা তার জীবনের কাগজের থেকে বাদ দিতে বসেছে!

বড়লোকের বিলাসিনী মেয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করবে না ফাঁকি দিয়ে পালাবে, সেই সন্দেহে সে তাকে আগেই তাড়িয়ে দিল। যে পালাবার বস্তু, যাকে শিকলি দিয়ে বেঁধেও খাঁচার ঘরে রাখা যায় না বলে তার বিশ্বাস, সে যথাসময়ে পালিয়েই না হয় যেত, আগে থাকতেই তাকে সন্দেহ করে তাড়ায় কে। ঘরে আনা পাখিকে খাঁচার দোরগোড়ায় আগেই ছেড়ে দেয় কে? তার কাছে বাস্তব যখনের চেয়ে ঘুমের স্বপ্নটাই বড় হল? এই জীবনের উপরেই যা তার স্বত্ব কী, এও তো একদিন ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে, এ তো সে শুধু যখনের জোরেই উপভোগ করছে। কই, যখন সে বনছায়াকে বুকের উপর টেনে এনেছিল, সেই গোলব-উজ্জ্বল সায়ংসাগরকে, কই, তখন তো সে স্বত্ব নিয়ে

বাধা মানেনি। সে এসেছে, ভালোবাসায় সন্নিহিত হয়েছে, একটি নীরব ইচ্ছায় দাঁড়িয়েছে উন্মুখ হয়ে, তার বেশি কিছু তো সে বিচার করেনি—বলেনি তো, যাও এই সান্নিধ্যটুকুকে রসিদে পাকা করে নিয়ে এস। ছি-ছি-ছি, বনছায়া তার কাছে আশ্রয়ের জন্যে আসবে আর সে তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে, রসিদ নেবে বলে। এই তার ভালোবাসা! এই তার পুরুষত্ব! বড়লোকের প্রতি তার অবজ্ঞা, তার ছায়া কি সে বনছায়ার উপরেও ফেলবে? বনছায়া কি বড়লোক? তার জন্যে যে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে চায়, তার মাইনের সঙ্গে নিজের মাইনে মিলিয়ে একঘর ও এক রান্নাঘরের সুখী সংসারের ছক কাটে, সে কি বড়লোকের অভিমানে? ভালোবাসার আবার বড়লোক কী! লোক তো বড় কেবল ভালোবাসায়।

দু' পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে গায়ে সেজির উপর শার্ট চাপিয়ে সুবীর প্রায় পাগল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই ছুটে গেলে পথের মাঝখানেই ধরতে পারে বনছায়াকে। বলবে, তুমি চলে এস আমার ঘরে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। তুমি আসবে বলেই তো সকলের থেকে আলাদা হয়ে আমি একা-একা এই এক ঘরের সংসার পেতেছি। তুমি চলো, আমার সেই এক ঘরের সংসারকে এক আকাশের সাম্রাজ্য করে তোলো। হয়তো রাজি হবেনা, অভিমান করে থাকবে। তা হলে তখন তার পায়ে পড়বে, হ্যাঁ, পথের মাঝখানেই পায়ে পড়বে। বলবে, বুঝিনি, তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মানে তোমার একেবারে চলে যাওয়া।

কিন্তু, কই, রাস্তার যতদূর চোখ যায়, বনছায়াকে দেখা গেল না। সুবীর আরো খানিকটা ছুটল, কিন্তু কোথাও বনছায়ার ছায়াটুকুও নেই। ট্যাক্সি পেয়ে চলে গিয়েছে, না, রিকশা করে আশা-পাশের গলি দিয়ে, কিছু হদিস করতে পারল না। আর তবে কী করা, সুবীর তার নিজের ঘরে ফিরে চলল। ফিরে চলার প্রতি পদক্ষেপে বুঝতে লাগল কাকে বলে ফিরিয়ে দেওয়া।

হঠাৎ মনে হল ঘর খোলা রেখে এসেছে, গিয়ে ঠিক দেখতে পাবে তার বিছানার উপর বনছায়া তেমনি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে। বসার গুণে না দোষে, কে বলবে, বনছায়ার একটি পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছিল, জুতো পরলে কী হবে, পায়ের নিচে অল্প-অল্প মাটি মাখা। সুবীরের ইচ্ছে হচ্ছিল মুঠো করে সেই পা-টি একবার ধরে। কিন্তু মুহূর্তের লোভে সে আর তখন পায়ের দিকে তাকায়নি। এখন যদি ঘরে ফিরে বনছায়াকে সে হাজির দেখে, সে জোর করেই পাদুখানি চেপে ধরবে, বুকে নেবে, চুমু খাবে আর বলবে, তুমি থাকো, তুমি যেমন বলবে আমি তেমনি করব, তোমার কথায় এতটুকু অবাধ্য হবনা।

ঘরে ফিরে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি স্নান করে বেরিয়ে পড়ল, যে হোটেলে রোজ খেতে যায় সে রাস্তায় গেল না, মনে করল উপোস করে থাকলেই বুঝি ঠিক হবে। বনছায়ার আফিসে গিয়েই বনছায়াকে ধরবে, বার করে নিয়ে এসে চুকবে কোন রেস্তরাঁয়, সারা দিন কিছু খাইনি বলে তাকে সেবার মমতায় চকল করে তুলবে।

হ্যাঁ, যা বলবে তাই শুনব। দেখবে সারা রাত আমার ক্যাম্পখাটে আমি স্থির থাকব, আমি তোমাকে ডাকবনা, তোমার পাশে উঠে যাবনা, কথা দিচ্ছি, তোমার একটি চুলও ছোঁবনা ভুল করে। তোমাকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দেব। হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, স্খলিত হবনা, প্রমাণিত করব আমার

কঠিন সংযম, গুরুর শৌকর্য। তুমি যেখে নিও কাকে বলে ধনিষ্ঠ বৈরাগ্য। তোমার অনুশাসন অব্যাহত থাকবে।

আফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বনছায়ার আফিসে গিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে জানল বনছায়া অনেক আগেই বাড়ি চলে গিয়েছে।

কাজে মন লাগাতে পারেনি বনছায়া, মাথা ধরে শরীরটা জ্বর-জ্বর-করতে সুরু করেছে। ঘরজ্যোতিকে দিয়ে বলতেই ছুটি পেয়ে গেল। হ্যাঁ, বাড়িই ফিরে যাবে সে, তার পরিচিত কোটরে, ফিরে গিয়ে তার বিছানায় পড়ে ঘুমোবে। বালিশে মুখ ডুবিয়ে ঘুমোবে।

দোতলায় উঠেই নরসিংহের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

'কি রে, এত সকাল-সকাল ফিরলি?'

'সকাল-সকাল ছুটি মিলে গেল।' বনছায়া অল্প একটু হাসল।

'তাহলে, কী বল, বিমাণ্ডেকে চা খেতে ডাকি।'

'আজ?'

শুধু যেন তারিখেই আপত্তি, চায়ে নয়—নরসিংহ তাই আহত হয়ে শুধালেন: 'আজ তোকে ছুটি না করে তো কবে বলব?'

'কাল বলো।'

ঘরে গিয়ে হালকা হয়ে বিছানা নিল বনছায়া। ভাবছে ভেবেছিল কিন্তু কান্না এলনা। তাই উঠে নিজে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করে খেয়ে লাজগোজ সেরে আবার বেরিয়ে পড়ল।

সিঁড়ির মুখে নরসিংহ আবার ধরলেন: 'কালই আসতে বলে দিলাম। কাল যেন ঠিক বাড়ি থাকিস।'

'বাড়ি থাকব বৈ কি। আমি নেমন্তন্ন করলাম আর আমিই বাড়ি থাকবনা?' বনছায়া নির্মল মুখে হাসল।

আফিসে না পেয়ে সুধীর বনছায়ার বাড়ির দিকে চলল।

হ্যাঁ, কিসের ধলিল, বিনা ধলিলেই তোমাকে আমি অঙ্গীকৃত করে নেব। তার জন্যে যদি জেলে যেতে তাও যাব। কোনো পীড়ন-নির্যাতন আসে তাও সহ্য করব অক্লেশে। তুমি যার কাছে আছ তার কিসের ভয়, কিসের দারিদ্র্য, কিসের লোকলজ্জা।

বনছায়ার বাড়িতে এসে জানল বনছায়া বাড়ি নেই।

'কিছু কি বলতে হবে?' চাকর জিজ্ঞেস করল: 'নাম দিয়ে যাবেন?'

'দরকার নেই।'

(ক্রমশঃ)

না-স্বর্গ না মর্ত্য

ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রকেশর বলেন, 'বেশ তুমি বল, আমি অবাক হয়েই শুনব।'

শান্তনু বলে, 'জ্ঞান যখন ফিরে পেলাম, তখন মনে হল আমি যেন সাধুজির আশ্রমে আবার ফিরে এসেছি। সাধুজি এতক্ষণ যেন আমার মাথায় তাঁর স্নেহসিক্ত হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে অতি সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করে শান্তি কামনা করছিলেন। ঘরের ভিতরটা আগো অন্ধকার, কিন্তু বাইরে আলো ফুটে উঠেছে। অনুমানে বোধ হ'ল গায়ে বেশ একখানা ভারী কম্বল। শীতের হাত থেকে বাঁচোবার জন্য এই দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একটু ভাল ক'রে ঠাহর ক'রে বুঝলাম, ঘরের ভিতর সাধুজির আশ্রমের কিছুটা ছাপ থাকলেও এটা আশ্রম নয়। তক্তোপোষ অপ্রশস্ত খরও এ নয়। এ ঘরের বৈধ্য আছে, প্রস্থ আছে, আর আলোর কাছে ধরা পড়ে গেল এ ঘরে সাংসারিক বস্তুর প্রাচুর্যও আছে। এ সাধু সন্ন্যাসীর ডেরা হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই একটু বিস্মিত হয়ে মাথাটা তুলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বাধা পেলাম। কে যেন ধরে আমায় শুইয়ে দিল। বলল, 'বাবুজি আপনার দুর্বল শরীর, এখন ওঠবার চেষ্টা করবেন না।'

দুর্বোধ্য ভাষা। তবুও ভুটিয়া পাহাড়ীদের ভাষা কিছুটা জানতাম বলে, একটা অর্থ অনুমান করে নিতে পারলাম। বিস্মিত হয়ে তাকাতে গিয়ে দেখি আমার শিয়রের উপর ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে একখানা মুখ। প্রশান্ত সুন্দর মুখ। তেমনি একটা মৃদু হাসি সেই মুখখানিকে ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ী ভুটিয়াদের মত এ মুখের গড়ন নয়। এ মুখে রুক্ষতা নেই, স্নিগ্ধতা আছে। মুখের সুপরিচ্ছন্ন ডৌলে একটা আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে ভদ্রলোক খুশি ভরে কাকে উদ্দেশ করে কি একটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় মানুষের পদধ্বনি শুনতে পেলাম। তারপরই ভদ্রলোক যে কটি কথা বললেন, তা অনুধাবন করবার চেষ্টা করলাম, গরম দুধটা যে আস্তে আস্তে এঁর মুখে ঢেলে দিতে হবে মালিনী।'

মালিনীর ভাষা শুনলাম না কিন্তু ভাবে বুঝলাম সে আমার শিয়রের অনেকখানি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোক এবার আমাকে উদ্দেশ করে তার দুর্বোধ্য ভাষাকে যথাসম্ভব সুবোধ্য করে অর্থাৎ দার্জিলিংয়ের ভুটিয়াদের মত করে বললেন, 'একটু গরম দুধ এবার খেতে হবে বাবুজি, তা না হলে ত দুর্বলতা সারবে না।'

আমার মধ্যে কোন রকম ইতস্ততের ভাবপ্রকাশ পেয়েছিল কিনা জানিনা। কিন্তু ভদ্রলোক তাড়া দিয়ে বললেন, 'এখন ইতস্তত: করবার সময় নয় বাবুজি। আগে প্রাণটা বাঁচুক, তারপর

যত পারেন আপত্তি করবেন। চট করে একবার মুখটা খুলুন, দুটোক খেয়ে আবার শুয়ে থাকবেন।'

মালিনী আমার ডান পাশে এগিয়ে এসে দুধের পাত্রটি তুলে ধরে ঈষৎ আনমিত হয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখি, পাহাড়ী মেয়ে, পরিধানে পাহাড়ী মেয়েদেরই বেশভূষা। তবে তেমন অমকাল নয়, হাল্কা পরিপাটী। বছরিয়ারই সমবয়সী। তবে আকৃতিতে তফাত অনেকখানি। একজন পটুয়ার পট, অন্যজন শিল্পীর চিত্র।

কিন্তু শিল্পীর চিত্র দেখবার মত মনের অবস্থা নয়। দেহ ও মন দুই অবসন্ন। ভিতরে ভিতরে একটু সুধার উদ্রেক অনুভব করছিলাম। তাই আর আপত্তি না করেই হাঁ করলাম। মালিনী আরও একটু মতলবী হয়ে ধীরে ধীরে গরম দুধটুকু আমায় খাইয়ে দিল। এই সময় হয়ত এই দুধটুকুই আমার প্রয়োজন ছিল। তাই তারী আরাম পেলাম।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এইবার কি একটা পাতার রস আমার চোখে, মুখে, কপালে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে চোখের পাতা দুটি বুজে এল। ঘুমের কোলে অঘোরে চলে পড়লাম।'

প্রফেসর চ্যাটার্জি একটু বিস্মিত হয়ে বলেন, 'সে কি! আফিং দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল নাকি?'

শান্তনু বলে, 'আফিং নয় ভাই; গাছের পাতার রস। কি গাছের পাতা আমি জানিনা। অবশ্য জিজ্ঞাসাও করিনি কোনদিন। বার কয়েক ঘুম পাড়াবার পর আমি নিজেই আপত্তি করলাম। বললাম, এভাবে ঘুমোতে ভাল লাগে না আমার।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমারও ভাল লাগে না এভাবে ঘুম পাড়াতে। কিন্তু যে রোগের যা ওষুধ। ঘুমই এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক। দুদিন পূর্ণ বিশ্রাম পেলেই সেরে উঠবেন আপনি।'

কি যে আমার রোগ এ জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। শুধু তার মুখের দিকে চোখ মেলে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ভয় পাবার মত কিছু নেই বাবুজি। অত্যধিক পরিশ্রম আর অনিয়মের ফলে শরীরের মধ্যে গ্লানির স্তূপ জমে উঠেছে। সে স্তূপ বেরিয়ে না গেলে সুস্থ হবেন না আপনি।'

পরিশ্রম আর অনিয়মের কথা অস্বীকার করতে পারি না। তাই এবারও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকি।

ভদ্রলোক বলেন, 'ডাক্তারী বিদ্যে যেটুকু শিখেছি তার দ্বারা বলতে পারি, ভয়ের যা কারণ ছিল তা কেটে গেছে। তবে এখন বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।'

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, 'আপনি ডাক্তার?'

ভদ্রলোক স্মিতমুখে বলেন, 'পেশায় নয়, নেশায়। এ পাহাড়ে জঙ্গলে পেশা চলবে কেন? রোগী আসে, ওষুধ দিই। সাধুজির কৃপায় রোগ সেরে যায়। এর মধ্যে নিজের কৃতিত্ব কিছু নেই। সবই সাধুজির আশীর্বাদ।'

—সাধুজি! কথাটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সাধুজি। তিনিই বলে গিয়েছিলেন আপনার কথা। নইলে কিছুই জানতে পারতাম না আমরা।'

সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু সাধুজি কোথায় ?'

—চলে গেলেন প্রয়াগে। সন্ধ্যা যমুনা সঙ্গমে। সেখানে বিরাট যজ্ঞ আছে। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হ'বে, সেই সমাগমে গেছেন তিনি। যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, ওপরে অসুস্থ শ্রান্ত অতিথি রইল। তার সেবার প্রয়োজন। ত্রুটী যেন না হয়। সাধুজির এটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট। তাই একটু সন্ধান নিলাম। আমার স্ত্রী মালিনী আর মেয়ে উমা ওষুধের জন্য গাছ গাছড়া সংগ্রহ করতে পাহাড় ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠেছিল। তারাই আপনার সন্ধান দিয়ে এল।

অতিথি পরায়ণ গৃহস্বামী। মুমূর্ষুকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ওষুধ দিয়ে পথ্য দিয়ে তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। এখনও বিরামহীন চিত্তে অকাতরে তার সেবা করে চলেছেন। এ সত্যই দুর্লভ।

গৃহস্বামী ডাক্তার আবার বলেন, 'আপনার পকেট থেকে পেয়েছিলুম আপনাকে নিয়ে। চিকিৎসা বিদ্যার কি-ই বা জানি। পাহাড়িয়াদের চিকিৎসা করি গাছ গাছড়া দিয়ে। মাটির মানুষের চিকিৎসা কখনও করিনি। তাই ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু সাহস দিল মালিনী। বলল, এ পাহাড়ী রোগ নয়, মাটির রোগ নয়। মাটির চিকিৎসকেরা এ রোগ সারাতে পারবে না। পারবে শুধু তুমি। সাধুজির ওষুধ দাও, দেখবে সেরে উঠবে। সাহস পেয়ে ওষুধ দিলুম আমি আর সেবায় ভার নিল মালিনী। রোগ আপনার, ওষুধ আমার আর সেবা মালিনীর। এই তিন আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে চলতে লাগল টানা পোড়েন। শেষ পর্যন্ত জয় হল মালিনীর। তার ঐকান্তিক সেবার ফল ফলল। চিকিৎসক ওষুধ আর পথ্যের নির্দেশ দিয়েই খালাস। সব সময় বাড়ীতে থাকতেও পারি না। ঘুরে ঘুরে যেতে হয়। তাই গাছ গাছড়া যোগাড় করে এনে ওষুধ প্রস্তুত করে নিয়মিত সেবন করবার ভার পড়ল মালিনীর ওপর। অবশ্য আমার মেয়ে উমাও সাহায্য করেছে তাকে। গভীর রাত্রে পাহাড় নিস্তব্ধ যখন হয়ে আসে, কোথাও যখন প্রাণের এতটুকু সাড়া জাগে না, সেই সময় সাধুজির ইষ্টমন্ত্র মালিনী জপ করে শোনায় আপনাকে। এ ইষ্টমন্ত্রের ফল অব্যর্থ। শুদ্ধাচারে নিস্তব্ধ নিশিথে এ মন্ত্র যদি জপ করে শোনান যায়, মরা মানুষও প্রাণ পায়। তিন দিনই রাত জেগে এ মন্ত্রই সে শুনিয়েছে আপনাকে।

শুনে চমৎকৃত হই। মনে পড়ে এ কদিনে স্বপ্ন দেখেছি অনেক। স্বপ্ন দেখেছি সমাধি মন্দির থেকে সেই গন্ধর্ব কন্যা উঠে এসে আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে তাই কল্যাণকর স্পর্শে রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি আনন্দ পেয়েছি, যাতনার তীব্রতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। সে আমায় গান গেয়ে শুনিয়েছে। এ স্বর্গীয় সুর বড় মধুর ভাবে আমার কানে এসে বেজেছে। আমি সেই সুধা নিঃস্বন আকণ্ঠ পান করেছি। আর মনের মধ্যে বল পেয়েছি। তখন বুঝিনি যে এই গন্ধর্ব কন্যা।

এতক্ষণে প্রফেসর একটু কথা বলবার সুযোগ পান। বলেন, 'বুঝে আপশোষে মনটা ভরে গেল ?'

শান্তনু ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, আপশোষ নয়, বরং আনন্দই হ'ল। গন্ধর্ব কন্যা যত রূপসীই হ'ক সে মৃত। তার চোখ দিয়ে আলো ঠিকরে পড়বে না কোন দিন। কণ্ঠে এমন সুধা নিস্বনও হ'বে না কোনদিন। আর ওষ্ঠে হাসির এ লহরীও খেলে বেড়াবে না কোন দিন। শিল্পীর চিত্র বলছিলাম না। একটুও বাড়িয়ে বলিনি। তবে সিসি আইবি দুজনার মধ্যে আইবি উমার রূপটাই ছিল প্রখর। মালিনী বয়সে উমার চেয়ে হয়ত কিছুটা বড়। রূপের প্রভেদও ছিল দুজনার। একজনের প্রখর রূপ চোখ ঝলসে দেয় আর একজনের কমনীয় রূপ চোখে স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়।'

প্রফেসর বলেন, 'তা হলে মালিনীর জয়।'

—রূপের ক্ষেত্রে মেয়েরা পরাজয় মানতে চায় না। রূপেরও ভাষা আছে—সেটা ভঙ্গিমা। এই ভঙ্গিমার সাহায্যেই তারা নিজেকে প্রকাশ করে। উমা যখন কোমরে হাত দিয়ে, বুকটান করে, বাঁকা চোখে একটু হেসে দাঁড়ায় তখন এমন শান্ত চিত্ত মানুষ দেখিনা যার বুকে তুফান জাগে না।

—তোমার বুকেও তুফান জেগেছিল তা হলে?

—তুফানের যাচ বিচার নেই! যখন আসে, নদী নালা খাল বিল খানা ডোবা সব ভরিয়ে তোলে। আমি অদ্ভুত বলে আমি যে রেহাই পাব, এ আশা করা বাতুলতা। বিশেষতঃ নারীর এ বিশ্ব বিজয়িনী রূপকে স্বীকৃতি না দেবার মধ্যে কৃতিত্ব কিছু নেই।

প্রফেসর হেসে বলেন, 'তুমি সার্থকনামা শান্তনু। দেবীই হ'ক, মানবীই হ'ক আর যৎসত কন্যাই হ'ক কোন কিছুতেই তোমাদের অরুচি নেই।'

শান্তনুও হাসে। বলে, 'মেয়েদের রূপের জাত নেই প্রফেসর। সেখানে রুচি অরুচির প্রশ্ন অবান্তর। সে কথা উমাও বোধহয় জানত। তাই সে বাঁকা চোখে একদিন বলেছিল, শান্তনুর মহিমা তার জানা আছে। তবে। আমি নাকি দেবী শান্তনু।'

হেসে বলেছিলাম, 'দেবী বলেই রক্ষে। আসলের হাঙ্গামা অনেক। সেখানে গঙ্গা আছে, যমুনা আছে। সতীনের জ্বালাই আছে। দেবীর সে বালাই নেই। তার কাছে গঙ্গা যমুনা, উমা পার্বতীর মধ্যে তফাৎ কিছু নেই।'

এরা পাহাড়ী পরিবার কিন্তু অশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নয়। শিক্ষার জৌলুস এদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে। উমারাও শিক্ষিতা। শিক্ষিতা বলেই আমার ইঙ্গিত সে চট করে বুঝে নেয়। তাই একটু সরে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে, বুকটান করে, মুচকি হেসে, বাঁকা চোখে কটাক্ষ হেনে বলে আমি, যে যুগ ছিল সতীনের কিন্তু এযুগ অসতীনের। সে যুগ গঙ্গাপ্রধান এযুগ উমা প্রধান।'

তারী ভাল লেগেছিল এ দৃশ্যটি। নগাধিরাজের উদার বক্ষে সুচারু দৃশ্যের অভাব কিছুই নেই। কিন্তু এমন মনভোলানী দৃশ্য সত্যই দুর্লভ হয়ত শত যুগ পূর্বে এমনি এক বিমোহন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল এই পাহাড়েরই বুকে যেদিন মেনকা ধ্যান ভাঙিয়েছিল বিশ্বামিত্রের। আমি মুনিও নই ঋষিও নই, আমার ধ্যান ভাঙাতে হল না আমি সহজেই যুদ্ধ হ'লাম আর পরাস্ত হ'লাম। পরাস্ত হয়ে হয়ত সহজ দুর্বলতারই প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু এমনি সময় আবির্ভাব হ'ল মালিনীর।'

প্রফেসর চাটার্জি মাথা নেড়ে বলেন, 'মেয়েদের বুদ্ধি বলে কোন পদার্থ নেই। তা না হ'লে এমন বলতে কেউ করে।'

—করে। মালিনী করে। তার ধারণা এ অধিকার তার আছে।

—সত্যি?

—মিথ্যে বলিনি। মালিনী আর উমা পার্বতী সোলাপ আর পারিজাত। দুজনের একজন, একপ্রাণ। মিলও অসম্ভব রকমের। শুধু গরমিল দেখা দিল এইখানে।

—এযে নাংঘাতিক জিনিষ। এর সব কাজ বে-আইনী। অন্তর কোন আইনের আওতায় এ পড়ে না।

শান্তনু হেসে বলে, 'এমন কি বিজ্ঞানীদের থার্মোডাইনামিক্স এরও কোন বিধান এ মেনে চলে না।'

—সেই জন্যেই ত যত বিভ্রাট।

এ কথায় শাশ্বত কান দেয় না। সে বলে চলে,

—মালিনী শান্ত মেয়ে। চঞ্চলতা তার মধ্যে নেই। আমি যে শাশ্বত হ'য়ে আজও মর্ত্যধামে বিচরণ করছি এর জন্যে সে কোন ত্রুটিরই দাবী করে না। কিন্তু দাবী করে উমা। বলে, এ উমার তপস্যার জোর। শুনে আমার যে চমক লাগেনি তা নয়। তবে জানতাম, উমা পার্বতী নয়। তির চঞ্চল, উচ্ছল যুবতী। তাই কথাটাকে আমল দিই নি সেদিন।

—ভাল করনি। উমারা শাশ্বত মেয়ে। যুগে যুগে তাদের আবির্ভাব। সে যুগে তার তপস্যা ছিল শিবের জন্য; এ যুগে সে যদি শাশ্বতের জন্য করে তাকে দোষ দিই না। কিন্তু মালিনী মেনে নিল উমার উক্তি?

—বলেছি ত মালিনী শান্ত মেয়ে। উচ্ছ্বাস মুখর নয়। কিন্তু তারও অন্তরের গভীরে যে আদিম চঞ্চলতা বয়ে চলেছে এ বুঝিনি। একদিন অজান্তে সেখানে আঘাত হেনেছিলাম। সেদিন ধরা পড়ে গিয়েছিল মালিনী। ধরা পড়ে গিয়েছিল তার অন্তর রহস্যটি।

প্রফেসর হাসেন। বলেন, 'এইটাই আমি এতক্ষণ আশঙ্কা করছিলাম শাশ্বত। ভাবছিলাম মালিনীর ভবে এত অনভ্যস্ত হয় কি করে?'

—তলের কথা তাকে বলিনি প্রফেসর। বলেছিলাম তটের কথা।

আরও বলেছিলাম, মালিনীর তট ঐতিহ্যমণ্ডিত। শুধু চির সুন্দর, চির সরসই নয়, অমৃতপ্রাণীও।

এ ইঙ্গিত মালিনী বুঝেছিল। তবুও না বোঝার ভান করে বলেছিল, সে মালিনী আর নেই। সে রাজার ছেলেও নেই। সে রাজার ছেলেও নেই, সে ঋষির মেয়েও নেই। তাই তার শোভাও আর নেই।

ফস্ করে বলে ফেলি, 'আছে। মালিনী শোভাহীন হবে না কোনদিন। অনবদ্য শোভা তার। তাতে মুগ্ধ সকলেই, মুগ্ধ আমিও। এই যে এতখানি অনন্তসৌন্দর্য, এই যে মহানুভবতা, উদারতা এতখানি কার আছে?'

শিশির সিক্ত পাতা শিশিরের ভারে যেমন নত হয়ে আসে মালিনীর চোখ দুটিও তেমনি কিসের আবেগে নত হ'য়ে এল।

আমরা বসেছিলাম উদাস্ত পর্বতের এক বিস্তীর্ণ শিলাখণ্ডের উপর। এ সময়টিতে মালিনী আসে একবাটি দুধ হাতে করে। এ সময়কার পথ্য এইটি। আমার শুধু আর পথ্যের ভার মালিনীর উপর। উমা চঞ্চলা, নেচে কুঁদে বেড়ানই তার স্বভাব। তাই মালিনী তার ওপর নির্ভর করে না। নিয়মিত সময়েই সে তার কাজ করে যায়। উমা এ সময়ে সাহায্য করে তার মাকে, লাংসারিক কাজে। ডাক্তার গেছেন ভিন্ন পাড়ায় এক অসুখী কলে। ডাক্তারী তার পেশা নয়, নেশা। তার ব্যবসা আছে। ভেড়ার লোমের ব্যবসা, রেশম গুটির ব্যবসা। মৃগনাভির ব্যবসা এ জন্য অধিকাংশ সময়ই তাকে থাকতে হয় পাহাড়ের উচ্চ শিখরে। শীতকালে যখন বরফ পড়ে, সাদা বরফে পাহাড় ঢেকে যায়, তখন নেমে আসে নিম্নভূমিতে, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীকে নিয়ে। অনেক অনেক বছর আগে আরও উঁচু পাহাড়ের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের যোগাযোগ ছিল। যত দূর আমি

দিয়েছিলাম সে পাহাড় ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে তাদের গতি বিধি ছিল। কালের প্রবাহের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে এ গতিবিধিতে একদিন ছেদ পড়ল। সে দিন থেকেই সব বন্ধ হয়ে গেল।

কাহিনীটি শোনে মালিনীর মুখে একটু একটু করে। মালিনীকে লজ্জা পেতে দেখে বলি 'রাজা রাজড়া হলেই কিছু ঐতিহ্য গজায় না। ঐতিহ্য তোমার মধ্যেও আছে। তোমার বাবার মুখে শুনেছি সব। বলতে পার, কোন শকুন্তলা একজন অজ্ঞাত কুলশীল অতুর লোকের রোদমুক্তির জন্য শিয়রের কাছে বসে রাতের পর রাত জেগে ইষ্ট মন্ত্র জপ করেছিল? এ যদি অন্তরের ঐতিহ্য না হয়, তা হলে ঐতিহ্য কাকে বলে আমি জানি না।

মালিনী এতক্ষণে চোখ তোলে। চোখের কোল দুটি তার চক্‌চক্ করে উঠে। আমার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে ধরা পড়ে আবার নত করে নেয়। সেই ভাবেই নত কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'এতখানি সুখ্যাতির যোগ্য আমি নই। কি-ই বা করেছি আমি। এ করে থাকে সবাই।'

ঘাড় নেড়ে বলি, 'না করে না'। করে না বলেই ত বললাম তোমায় তোমার ঐতিহ্যের কথা।'

মালিনী এর প্রতিবাদ করে না। হয় ত মেনে নেয় আমার কথাটা। হয় ত এই প্রথম শোনে নিজের ঐতিহ্যের কথা। শুনতে ভাল লাগে তাই চুপ করে থাকে।'

শান্তনু একটু থেমে বলতে থাকে, 'জান প্রফেসর, জীবনে দুঃখ পেয়েছি অনেক। অনেক দুঃখকে ভুলেও গিয়েছি, অনেক দুঃখকে সহেও গিয়েছি। কিন্তু মালিনীর এক দুঃখটা অন্তরে এমন জমাট ভাবে চেপে বসে আছে যে তাকে তোলা দুঃসাধ্য। মা বাপ মরা মেয়ে, ছেলেবেলা থেকেই তাদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বাবার অনাবিল স্নেহ পেয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তরুণী মেয়ের মন ভরে না।'

প্রফেসর হেসে বলেন, 'অর্থাৎ তরুণী মেয়ের মন ভরাতে আর এক রকম স্নেহের প্রয়োজন? যদি বুঝেছিলে, অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে অনুরূপ স্নেহ দিয়ে তার এ উপকারটুকু করতে পারতে?'

'পারতাম। মালিনীও হয় ত এই আশাই করেছিল। হয় ত নিজেরই অজ্ঞাতে এগিয়েও এসেছিল কিছুটা। ভেবেছিল বাকীটুকু এগিয়ে যাব আমি। কিন্তু সহস্র পদ এগিয়ে আর এক পদ এগুতে পারলাম না কিছুতেই। ঐ এক পদের ব্যবধান রয়ে গেছে আজও।'

প্রফেসর আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'শুধু এক পদের ব্যবধান। এটা আর অতিক্রম করতে পারলে না কিছুতেই? দুজনে আধ পা করে এগিয়ে এলেই ত এ ব্যবধান শূন্যে মিলিয়ে যেত? যোগাযোগটাও সম্পূর্ণ হ'ত?'

—হত। কিন্তু বিবেক আর লজ্জিয়া এরা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। আজ তিন মাস হ'ল পাহাড় থেকে নেমে এসেছি। বেচারা মালিনী! আজও হয়ত সে আনমনে বসে আছে সেই প্রস্তর শিলার ওপর, পথ চেয়ে।

প্রফেসর বলেন, 'তোমার না হয় বিবেক ছিল, লজ্জিয়া ছিল। কিন্তু মালিনীর ত সে সব কিছু ছিল না। সে আর আধপদ এগিয়ে এল না কেন?'

—জানি না। হয়ত আমার নিষ্ক্রিয়তাই তার এগোবার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—মুখেও কিছু প্রকাশ পায় নি তার?

—মুখ ছিল তার নির্বাক কিন্তু চোখ ছিল সবাক। চোখের ভাষা তার বারবার বুঝিয়ে দিত আমায় তার অন্তরের কথা। দিনের মধ্যে শত অছিলায় শতবার সে এসেছে আমার কাছে। কখন সরব,

কখনও নীরব, আর যখন কিছুই পারনি তখন একটুকরো হাসি উপহার দিয়ে সে চলে গেছে। তার চোখ আর কান-দুই সতর্ক প্রহরী সর্বদাই আমার দ্বারে মোতায়েন থাকত, এ বুঝতে আমার বাকী ছিল না।'

প্রফেসর বলেন, 'আমরা বিজ্ঞানী মানুষ, তোমাদের মুখের একটু খানি হাসি, চোখের একটুখানি খুশি, এ আমার দুর্বোধ্য। এর রসতত্ত্বও আমার অজ্ঞাত। এ সব আমরা বুঝি না।'

—না বোঝাই ভাল। এ রসতত্ত্ব বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে যেও না অথবা থার্মোডাইনামিক্সের বিধানও এর ওপর আরোপ করতে চেও না। তা হলে এর সৌন্দর্যে বিকৃতি ঘটবে। নিজেও ঠকবে।

—আমার জিতে কাজ নেই শান্তনু। জিতে সব সময় তোমার মত হয় হতাশ করবার মত অবসর বা বাসনা কোনটাই আমার নেই।

—নেই বলেই কোনদিন বুঝবে না এ অমৃতের স্বাদ কি? পার্বতা প্রায়শ যে এতখানি অমৃত প্রসবিনী হতে পারে এ ছিল আমার কল্পনার অতীত।

—দুঃখ করে লাভ হবে না। কস্তুরী মৃগের ধর্মই এই। তার সুবাস ছড়িয়ে সরে যায়।

শান্তনু ঘাড় নাড়ে। বলে, 'দোষ তার নয়। সে সরে যেতে চায় নি। সরে এসেছি আমি। সে হয় ত আজও বিশ্বাস করতে পারে নি যে মানুষ এতখানি অকৃতজ্ঞও হতে পারে রূপে গুনে গুণবতীকারিনী দুটি মেয়ে, রাজভোগ্যা। কিন্তু রাজপুত্র দূরে থাক, কোটাল পুত্রেরও সন্ধান নাই। মালিনীর দাদা ব্যবসায়ী লোক, ধনাঢ্য। কিন্তু অর্থের বিনিময়েও মনের মত পাত্র খুঁজে পান না তিনি। এইটাই তার সাইডে বড় দুঃখ। উমা পার্বতা ধরণী, উচ্ছল চঞ্চল। কিন্তু মালিনী বুদ্ধিদীপ্ত, শান্তধীর। তার স্নিগ্ধ-রূপের এতটুকু পরশ পাবার জন্য তৃষিত চাতকের দল ঘুরে বেড়ায় আশে পাশে। এ কথা মালিনীর অবিদিত নয়। কিন্তু নিজে সে অচঞ্চল, তাই প্রশ্রয় দেয় না কাউকেই। তার বিরল মনোভাব প্রকাশ পায় আভাষে ইঙ্গিতে।'

সেই কথাটাই একদিন স্পষ্ট করে বলেছিলাম আমি, 'এদের প্রতি এতখানি বিরূপ হওয়া উচিত নয় তোমার। একদিন এদেরই কেউ একজন ত হবে তোমার আপন জন।'

মালিনী চোখ নত করেই বলেছিল, 'জানি না। তবে এমন দিন যদি সত্যিই আসে নিজের দুর্ভাগ্যকে বিদায়ই অভিনন্দন জানাব না আমি।'

—কিন্তু তোমার দাদার যে দুর্ভাবনার অন্ত নেই মালিনী।

—সেইটাই আমার পরম দুঃখ। অথচ এ দুর্ভাবনা যে কি ক'রে তার দূর হবে বুঝি না।

কৌতুক করে বলি, 'কিন্তু আমি জানি। তোমরা যদি একটু লক্ষ্মী হও।'

মালিনী চোখ বড় করে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'অন্যায় ত কিছু করি নি আমরা।'

বলি, 'তোমরা করনি। তোমাদের প্রকৃতি করে নি। করেছে তোমাদের আকৃতি। দাদার দুর্ভাবনা এইখানেই।' এ উক্তি মালিনী বোঝে। তার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি চট করে সারা অঙ্গের উপর দিয়ে সে একবার বুলিয়ে নেয়। বলে 'মেয়েদের একদিনের যা ঐশ্বর্য তাই আর একদিনে অভিশাপ। এদের গৌরব অগৌরবের সব ভারই আমাদের বইতে হয়। দাদার দুর্ভাবনা বুঝি, কিন্তু তার চেয়েও যে দুর্ভাবনা আমাদের। অগৌরবের ভার বহা যায় একদিন কিংবা দুদিন। কিন্তু চিরদিন এ ভার দুঃসহ।'

—কিন্তু এ অগৌরবের ভার ইচ্ছে করলেই ত তোমরা ফেলিয়ে ফেলতে পার। ভগবানের দয়ায়

অভাব তোমাদের কিছু নেই। তাঁর দয়ায় সৎ পাত্রেরও অভাব হবে না। তোমার দাদারও দুর্ভাবনার কারণ হবে। মালিনী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, 'উমাকে এই কথা বলেছিলাম আমি। উমা বলেছিল, ভগবান সবই দিয়েছেন সত্যি, শুধু যদি বিদ্রোহী মনটা না দিতেন! মনের বিরুদ্ধে যাই কি ক'রে দিদী, সেও এক আপদ্ভি।'

বলি, 'মনের বিরুদ্ধে যেতে বলি না। কিন্তু ভগবানের এতবড় রাজ্যে মনের স্বপক্ষে কি কিছু থাকতে নেই? এ কথা উমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?'

—না। তবে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর পেতাম তাও আমার অজানা নেই। বলত, স্বপক্ষে থাকলে মন বিদ্রোহ করত না। মন যা চায় না, তাকে মেনে নেব কি করে?

—আশ্চর্য! প্রকৃতির এই বিচিত্র রাজ্যে মন বসতে চায় না। এই বিচিত্র রাজ্যের অধিবাসী যারা মন বিদ্রোহ করে তাদের বিরুদ্ধে? আর যে এ রাজ্যের অধিবাসী নয়, যার সঙ্গে এ রাজ্যের আত্মিক যোগ এতটুকু নেই, দৈবক্রমে এ দেশে এসে অসুস্থ হয়ে দুদিনে অতিথি হয়েছে, মন বিদ্রোহ করে না তার বিরুদ্ধে? এ হয় কেমন করে? বল?

মালিনী একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ নত করে নেয়। আনত চোখেই বলে, 'এর উত্তর আমার জানা নেই। উমা জানে কিনা জানি না। তবে এই টুকু জানি মন অন্তর্যামী। তার কাছে ধরা পড়ে যায় সব। সে যখন বিদ্রোহ করল না, তখন স্বপক্ষ বলেই মেনে নিলাম তাকে। কিন্তু তাতে ত আমি ঠকি নি?'

—ঠকনি? তার মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে বলি, 'তুমি ঠিক বলছ, মালিনী?'

মালিনী একটু বিস্মিত হয়েই মুখ তোলে। প্রশ্ন করে, 'কেন? মিথ্যে ত আমি বলিনি।'

মালিনী যে মিথ্যা বলেনি, এ আমি বিশ্বাস করি। পাহাড়িয়া জাতি ছলা কলায় যে অভ্যস্ত নয়, এদের সঙ্গে মিশে সে কথা বুঝেছি। তাই আমিও কিছু গোপন না করে বললাম, তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। তুমিও বিশ্বাস কর যাকে তুমি স্বপক্ষে বলে মনে ঠাঁই দিয়েছ, সে তোমার বিপক্ষে যাবে না কোন দিন। তারপর একটু থেমে 'বলি, তোমার কাছে যে আমি কত ঋণী এ আমি ভুলব কি ক'রে? ঋণী আমার প্রাণের জন্যে। ঋণী এই নবলব্ধ ধ্যানের জন্যে। এই বন্ধু-বান্ধবহীন পার্বত্য প্রদেশে এই অচেনা লোকটিকে এমন যত্ন ভরা সেবা দিয়ে কে সুস্থ করে তুলত বলত? তুমি না থাকলে, তোমার সেবা না পেলে আজ আমার পাথর সমাধি হয়ে যেত।'

মালিনী মাথা নেড়ে বলে, 'আমাদের পাষাণ দেশ বটে কিন্তু দেবতা পাষাণ নন। আপনার অনিষ্ট কোন দেবতাই করতেন না।'

বলি, 'দেবতার কথা জানি না, তবে একটি দেবীর কথা জানি যে আমার অনিষ্ট হতে দেবে না কোনদিন। প্রাণ দিয়েছে যত্নভরা সেবা দিয়ে, আর সেই প্রাণে প্রেরণা জাগিয়েছে তাকে নিজের মনে একটু ঠাঁই দিয়ে। গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম দেবদারু কুঞ্জের মধ্যে। স্থানটি আমার ভাল লাগে শুধু এর স্নিগ্ধ রমনীয়তার জন্য নয়, সামনে দিয়ে যে ঝুরার শীতল জলধারাটি বয়ে গেছে তার বক্রগতি তন্বিমার জন্য। তারী ভাল লাগে নদীটির এই শিশু সুলভ তরলতাকে। মালিনী একথা জানে। তাই বেড়াতে বেড়াতে আমরা এইখানেই চলে আসি। এ স্থান মালিনীর আবিষ্কার।

আমার ভাল লাগে বলে তারও ভাল লাগে। এ কথা সেই আমায় শুনিয়েছিল। আজও সেই কথাটাই সে আবার বলল। হয়ত আমাদের আলোচনার ধারাটা এমন স্থানে এসে গিয়েছিল যার মোড় ঘোরাবার জন্যই সে যেন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাই নতুন প্রসঙ্গ অবতারণার আশ্রয় তাকে নিতে হ'ল। বলল, 'ভারী সুন্দর জায়গা এটা। কতবার ত এসেছি এখানে কিন্তু এমন রূপ ত এর আগে দেখিনি কখনও আশ্চর্য!'

বলি, 'আশ্চর্য নয়, স্বাভাবিক।'

—কেন? প্রশ্ন করে মালিনী আমার মুখের দিকে তাকায়।

দুজনার চোখাচোখি হয়। তাকিয়ে দেখি স্নিগ্ধ মনোরম মুখ। পার্বত্য সরলতা সেখানে মাখান। ছলার আভাষ এতটুকু কোথাও নাই। প্রেমের যে একটা মাধুর্য আছে যা সচরাচর সব মুখে দেখা যায় না—তা এ মুখে বিদ্যমান। মুহূর্তের জন্য আবার মুগ্ধ হয়ে যাই। নিজের দুর্বলতাকে গোপন করবার চেষ্টা না করেই বলি, 'মালিনী তুমি শিক্ষিতা মেয়ে। সংস্কৃত কাব্য পড়েছ অনেক। কেন যে আশ্চর্য নয়, এ কথা তোমায় বলে দিতে হবে না। আজ তোমার অন্তরে যে আলোর শিখা জ্বলে উঠেছে সে শিখায় তোমার সব কিছুকেই ভাল লাগাবে।'

মালিনী দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমি বাধা দি। তার নিটোল মণিবন্ধ দুটি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বলি, 'কিন্তু ভুল কর না মালিনী। এ যে সম্ভবপর হবার নয়। দুদিনের অতিথি, তোমার বাড়ীতে এসেছে। সে পেল অনেক কিছুই, কিন্তু প্রতিদান দিতে পারল না এতটুকু এইটাই তার চরম দুঃখ।'

মালিনীর মণিবন্ধ দুটি আমার হাতের মধ্যে বাঁধা। কিন্তু তার মুখখানা আমার দিক থেকে অন্য দিকে ফেরান। জানি না সে কিছু গোপন করতে চায় কিনা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলি, 'কই কিছু ত বললে না তুমি?'

মালিনী মুখ ফেরায় না কিন্তু একটু ভারী গলায় বলে, 'পাহাড়ী মেয়ে, শিক্ষার সৌভাগ্য আমাদের নেই। কিন্তু যেটুকু শিক্ষা পেয়েছি তাইতে বুঝেছি আন্তরিক দান, প্রতিদানের স্পৃহা রাখে না। আর দান যদি প্রত্যাখ্যাত না হয়, সেইটাই ত হ'ল প্রতিদান। সেইটাই তার পুরস্কার।'

চমৎকৃত হই। পার্বত্য দুহিতার এমন সরল উক্তিতে মুগ্ধও হয়ে যাই। হয়ত অতিথির নিয়ম বহির্ভূত অতিরিক্ত রকমের কিছু একটা দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলতে যাচ্ছিলাম এমনি সময় অদূরে শুকনো পাতার মচমচানি শব্দে দুজনেই সচকিত হয়ে উঠলাম। মালিনীকে ছেড়ে দিয়ে একটু তফাতে সরে যেতেই দেখতে পেলাম উমাকে। সে গাছ কোমর বেঁধে হাতে একটা লাঠি নিয়ে হৈ-হৈ করে কি একটা জীব বিশেষকে তাড়া করে ছুটে আসছে এদিকে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর মেয়েলী ভঙ্গিমায় চিবুকে একটা আঙুল তুলে দিয়ে বিস্ময়ের ভান করে বলে উঠল, 'ওমা, দিদী তুমি এখানে? আমি আসমুদ্র হিমাচল অর্থাৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে গৌরীশৃঙ্গ পর্যন্ত খুঁজে এলুম তোমাকে।'

মালিনী মুখে হাসি টেনে এনে বলে, 'আসমুদ্র হিমাচল আমাকে খুঁজে বেড়াবার মেয়েই তুমি বটে! এসেছ চ্যাংরের ভাঙা ঠ্যাং জোড়া লাগাবার ওষুধ খুঁজতে, সে কি আমি বুঝি না।'

উমা মুখ তেংচে বলে, 'আমার বয়ে গেছে চ্যাংয়ের ভাঙা ঠ্যাং জোড়া লাগাবার।'

প্রফেসর জিজ্ঞাসা করেন 'চ্যাং-কে? তার ইতিবৃত্ত এর আগে তুমিত কিছু বল নি শান্তনু?'

বলি, চ্যাংয়ের আসল নাম চেনচেন। এদেরই প্রতিবেশী। অবস্থা ভাল। উমার ওপর আকর্ষণটা তার খুব বেশী। উমা আদর করে তার নাম রেখেছে চ্যাং। সে চায় উমাকে বিবাহ করতে। প্রস্তাবও একটা এসেছে তাদের পক্ষ থেকে। কিন্তু উমার বাবা মতি স্থির করতে পারেননি। চেন উমার উপযুক্ত নয় এ কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু পাত্রের বাজারে যেখানে ছুভিক্ষ সেখানে চেনকে সুপাত্র বলা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু উমা পার্বত্য ঝরণা। কখনও হাস্যমুখর, কখনও লাস্যমুখর এ সব দিকে তার যে বিশেষ কিছু খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। সে কখনও চেনকে নাচায়, কখনও আমাকে তাতায়। তার নিটোল ছন্দ দেহের স্থানে স্থানে যে খাঁজগুলি দেখা যায়, যা দেহের স্থান বিশেষকে সীমিত করে রেখেছে তা সত্যই মন মুগ্ধকর। তাতে মুগ্ধ হয় সকলেই। উমার তপস্যার জোর বলে সে যেমন আমায় তাড়িয়েছে, তেমনি ছোটখাটো আঘাত আর অত্যাচারে চেনকে হাতিয়ে রেখেছে। চেন যে আজ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আহত, সে শুধু উমার আঘাত রাখতে গিয়ে। সেই কথার উল্লেখ করেছিল মালিনী।'

উমার দিকে তাকিয়েছিলাম। হয়ত দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা সপ্রশংস ভাব ছিল। উমা সেটা বুঝেছিল কিনা জানি না। একবার অপাঙ্গে মালিনীকে আর আমাকে দেখে নিয়ে মুখ টিপে আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'বাবুজি শরীর ভাল ত? আর না হবেই বা কেন? এমন মধুর পরিবেশে শরীর আপনিই ভাল হয়।' বলে সে দু পাটি দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

মালিনী কপট রাগ দেখিয়ে বলে, 'হাসি দেখলে গা জ্বালা করে। এবার পাথর দিয়ে সব দাঁতগুলো তোর ভেঙে দেব উমা।'

কিন্তু সকলের ইচ্ছা সমান নয়। এক্ষেত্রে মালিনীর ইচ্ছা আর আমার ইচ্ছাও সমান নয়। যে হাসি দেখলে তার গাত্রদাহ হয়, যন্ত্রণা করবার বাসনা জাগে সে হাসি সাধারণ হাসি নয়। এ হাসির ছটায়, এ দাঁতের মাধুর্যে ভোলে না কে? মালিনীরও কুন্দ দাঁত আছে, হাসির ছটা আছে। সে হাসির দামও আছে। তবুও বলব উমার এ হাসি বিশ্ব বিজয়িনী। এ হাসি মুনির মনকে টলায় মানুষত ছার।

উমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। বললাম, 'যার জন্যে উমার তপস্যা, তার শরীর ভাল হবে না ত কি? অয়ি পর্বতরাজ দুহিতে তোমার তপস্যার প্রভাবেই আমার রোগ মুক্তি। তোমার তপস্যা যত আন্তরিক হবে আমার রোগ মুক্তিও তত শীঘ্র হবে।'

উমা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর স্নিগ্ধ ভঙ্গিমায় বলে, 'পর্বতরাজ দুহিতার তপস্যার আন্তরিকতায় কেউ সন্দেহ করে না ঠাকুর। তবে রোগ মুক্তি শুধু তপস্যার জোরে হয় না, পরিবেশের গুণেও হয়।'

প্রফেসর চ্যাটার্জি এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার কৌতূহলভরে বলেন, 'উমার তপস্যা তাহলে বিফলে গেল বল?'

শান্তনু বলে, 'তপস্যা বিফলে যায় না। তবে উমা দুর্বোধ্য: তাকে বুঝে উঠতে পারিনি। মালিনীকে বুঝেছি তার অন্তরকে চিনেছি। কিন্তু উমার অন্তরের নাগাল পাইনি।'

—অর্থাৎ বলতে চাও তার অন্তরের জটিলতা খুব বেশী ?

—হয়ত তাই। অথবা তার মনস্তত্ত্ব আরও গভীর।

—গভীর নয় যৌবনবতী সব মেয়েদের মনস্তত্ত্বই এক। কারোরটা সহজ প্রতিধ্বনি তোলা। কারোরটা বা সময় লাগে একটু বেশী। পাহাড়ী মেয়ে শকুন্তলারই বংশ সম্ভূতা। পরম পুরুষ দেবার সৌভাগ্য তাদের বিশেষ হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে হয়, সে মুহূর্তে মদন দেবের আশীর্বাদ থেকে আর তারা বঞ্চিত থাকে না।

—অর্থাৎ বলতে চাও উমাও বঞ্চিত থাকে নি। পরম পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ সে করেছে ?

—এর উত্তর দিতে পারে উমা আর কিছুটা পার তুমি।

—আমি ? শান্তনু একটু হাসে।

—আমি বিজ্ঞানী। বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ করে যে সত্যে উপনীত হয়েছি সেইটাই বলেছি মাত্র। আর তা থেকে সিদ্ধান্ত করেছি উমা মহাভুল। সে পথ ছেড়ে দিল তার সিদ্ধান্তকে।

শান্তনু চুপ করে থাকে। তারপর এক সময় বলে, 'বিজ্ঞানীর কল্পনা বাস্তবধর্মী প্রফেসর। উমা সত্যই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। যেদিন সে বুঝতে পারল মালিনীর মনোভাবটিকে সেই দিনই সে তার তপস্যার ফল অঞ্জলি দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল আমার মনের কাছ থেকে। আশ্চর্য! দুটি মেয়ে, এক আত্মে, এক সঙ্গে প্রতিপালিত, অথচ একেবারে বিপরীত ধর্মী। একজন কত শান্ত গভীর, আর একজন বীচি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল। একজনের গভীরতা মনকে স্পর্শ করে আর একজনের চঞ্চলতা মনকে নাড়া দেয়। এক এক সময় আপাদোড়া যখন সব কথা ভাবি, তখন নিজেই অবাক হয়ে যাই প্রফেসর। আমার জীবনে এতখানি বৈচিত্র্যতা সম্ভবপর হ'ল কি করে ? সপ্তর্ষি রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলাম মনে মনে সে স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য একদিন সত্যসত্যই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়েছিলাম। সেদিন সঙ্গী হ'ল সহযিয়া। পথ দেখাল সেই। বিনিময়ে তাকে দিলাম সাহচর্য, তার মনের গোপন কুঁড়িতে ফুল ফোটালাম। অবশ্য তার সঙ্গে আমি ছলনা করিনি। আর করিনি বলেই পর্বতের এই রম্য দুহিতা মালিনী, আমার প্রাণপ্রার্থী মালিনীকে স্বীকৃতি দিতে পারিনি।'

প্রফেসার চ্যাটার্জি বলেন, 'এ যে একটা বড় রকমের ট্র্যাজেডি এ কথা আমি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি শান্তনু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার স্বীকৃতি না দেওয়া সত্ত্বেও মালিনী তোমার স্বীকৃতি দিল কিভাবে ?'

শান্তনু বলে, 'জানিনা। তবে কবি যে বলেছেন, "প্রেমের ফাঁদ পাতা এ ভুবনে, কে ধরা পড়ে কে জানে।" কথাটা অতি সত্য। তা না হলে মালিনীর মত মেয়ের অনুরাগে, আমি রক্তিত হ'ব কি করে ? রক্তের দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতাই মালিনীর অন্তরকে আকৃষ্ট করেছিল আমার প্রতি। মালিনী প্রকারান্তরে স্বীকার করেছিল নির্জন রাতে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে যখন সে সাবুদির দেওয়া মন্ত্র জপ করত, তখনই সে হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। এক সময়ে সে একটু ম্লান হেসে বলেছিল, থাক সে সে সব কথা। কি হবে শুনিয়ে যখন জানছি ধরে রাখতে পারব না কাছে। এই রমণীয় পার্বত্যভূমি কোনদিন রম্যভূমি হয়ে উঠবে না আপনার।'

বলেছিলাম, 'এইটাই কি তুমি চাও মালিনী যে এই পার্বত্যভূমি চিরদিনের রম্যভূমি হয়ে উঠুক আমার।'

—মেয়েরা অনেক কিছুই চায় কিন্তু পায় না। বলে সে একটুখানি হেসেছিল। মাত্র একটুখানি হাসি। তারই মধ্য দিয়ে সে যে কি বলতে চেয়েছিল জানি।

প্রফেসর বলেন, 'সব জেনেও তুমি চলে এলে? পার্বতীভূমি তোমার যদি রম্যভূমি না হয়, তার কি এ সমতল ভূমি রম্যভূমি হ'তে পারত না?'

—হয়ত পারত। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করিনি তাকে। করিনি, এ শুধু ভাগ্যের পরিহাস বলে। তা না হ'লে লছমিয়ার সঙ্গে অমনভাবে জড়িয়েই বা পড়ব কেন?

—তুমি পাগল। তোমার পাগলামির জন্যই ভাগ্য তোমার সঙ্গে পরিহাস করেছে। গন্ধর্বদের প্রথা তোমার ত অজানা ছিল না। গন্ধর্ব কন্যার সঙ্গে তাদেরই প্রথায় আশ্রয় নিলে না কেন? তাতে ত দোষ ছিল না শান্তনু?

—দোষ গুণের কথা নয় প্রফেসর। গন্ধর্বমতেই বল, শাস্ত্র মৈত্র মতেই বল, দোষ কিছুতেই ছিল না। দোষ ছিল শুধু মনে। মন চাইল না মালিনীকে ঠকাতে। সে না জানুক আমি ত জানি, এই রমণীয় পাহাড়, এই রমণীয় ভূমি, এসব দুদিনের। মানুষের কাছে সে চিররম্য হ'য়ে থাকতে পারে না কখনও। জানি, মালিনীর বড় প্রেম হয়ত অনেক কিছুই ভুলিয়ে দিত আমাকে। কিন্তু ধরিত্রীর আকর্ষণ? সে আকর্ষণ যেদিন পুঞ্জীভূত হয়ে আমাকে টেনে আনত তার বুকে, তখন কি হ'ত এই গন্ধর্ব কন্যাটির? হয়ত লছমিয়ার পথ অনুসরণ করতে হত একেও। এত বড় মহাপাপের হাত থেকে রেহাই পেতাম কি করে? প্রফেসর, তুমি বৈজ্ঞানিক মানুষ। অণুপরমাণু। নিউট্রন প্রোটন এইসব নিয়েই তোমার কারবার। কিন্তু এ সবের বাইরে, নিউট্রন প্রোটনের চেয়েও হাজার গুণ সূক্ষ্ম ভারহীন অথচ তীব্রগতি সম্পন্ন। মন বলে সে বস্তুটি সব মানুষের অন্তরে আছে, বুঝবে না তার অপার রহস্যকে। সব রহস্যের বাইরে এ।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম শান্তনু; তোমার মনন-ই তোমায় হনন করেছে। এই ভারহীন অভিবেগ সম্পন্ন বস্তুটি তোমাকে ঠিক সময়ে ঠিক পথে চালিত করেনি।'

—হয়ত করেনি। কিন্তু প্রফেসর, আমি সুবিচার করতে চেয়েছি সকলের ওপর।

—তোমার চাওয়া তোমাকে তার প্রাপ্য দেয়নি। সুবিচার, লেখা দিয়েছে অবিচার রূপে। লছমিয়ার প্রতি তুমি যতখানি না অবিচার করেছ; তার চেয়ে অনেক বেশী করেছ মালিনীর ওপর।

শান্তনু একটু অসহায়ভাবে প্রফেসরের দিকে তাকায়।

প্রফেসর বলে চলেন, 'লছমিয়ার প্রতি তোমার লোভ ছিল না। একটা আকস্মিক দুর্বলতা তাকে তোমার কাছে টেনে এনেছিল। এ দুর্বলতা যৌবনধর্মী সব ছেলেমেয়েদেরই থাকে। তুমিও ব্যতিক্রম ছিলে না বলেই সে তোমায় আকর্ষণ করতে পেরেছিল তার ঐ যৌবন পুষ্ট দেহ দিয়ে। মন দিয়ে পারে নি। তোমার আসল মন উন্মুখ ছিল গন্ধর্বরাজ্যের সন্ধানে। এরই সন্ধানে এসে তুমি পেলে মালিনীর সন্ধান। পর্বত দুহিতা মালিনী, পার্বতী সহোদরা। তাই সে রূপ দিয়ে তোমায় আকর্ষণ করতে চায় নি, চেয়েছিল মন দিয়ে। মানসিক আকর্ষণের ধার কম কিন্তু ভার বেশী। এই ভারটাকেই তুমি ঠিক বুঝতে পারনি শান্তনু।

শান্তনু বলে, 'পেরেছিলাম তবে ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে এ ভার চেপে বসছিল আমার বুকের ওপর। সত্যসত্যই ভয় পেয়ে গেলাম। এ ভার ফেলে ফেলতে চাইলাম। তাই স্বরূপায় হলাম

মালিনীর ব্যাপার। তিনি আলহিলেন দার্জিলিং-এ ব্যবসায়ের খাতিরে। সেই সঙ্গে পাত্রেরও সন্ধানে। মালিনীরা ঊর্ধ্বমার্গের লোক। নিম্নমার্গের সঙ্গে তাদের লেন দেন বিশেষ হয় না। কিন্তু উপায় বা কি? ছোট তাদের পরিবেশ। এ পরিবেশের ভিতর উচ্চভূমিতে উপযুক্ত পাত্র যদি না মেলে, তা হলে নিম্নভূমির আশ্রয় না নেওয়া-ছাড়া গত্যন্তর নেই।

প্রফেসর বলেন, 'পাত্রের অভাব বল?'

—অভাবও বলা যায়। অন্ততঃ এ দুটি মেয়ের উপযুক্ত পাত্র আমি ত দেখলাম না সেখানে। মালিনীর মুখে শুনেছি, গন্ধর্ব বংশ-সম্ভূত তারা। কালের আবর্তে ছিটকে এসেছে তাদের মূল উৎস থেকে। এই পাহাড়েই আশ্রয়, যোগ্যতা তাদের নেই। নিম্নভূমিতে নেমে আসার আগ্রহও বিশেষ নেই। ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। তাই মাঝামাঝি বিচলিত হয়ে পড়েছেন বড় বেশী।

প্রফেসর বলেন, 'আশ্চর্য নয়। অবুঝা কন্যা বা ভগ্নীকে নিয়ে বিচলিত হয় সব অভিভাবকেরা। কিন্তু তুমি তাদের এ চাঞ্চল্য অর্ধেকটা প্রশমিত করতে পারতে পারতে।'

—পারতাম। মালিনীর মনোভাব আমার কাছে অবিদিত ছিল না। আমাকে সে টেনে রাখতে চাইত প্রাণপণে। আমি অসুস্থ, আমি দুর্বল, আমার নড়াচড়া এ অবস্থায় আদৌ উচিত নয়, এই ছিল তার একমাত্র যুক্তি। একদিন হেসে বলেছিলাম, সামর্থ্য আমার যেটুকু ছিল তুমি তা হরণ করে নিচ্ছ মালিনী। এমন সেবা পেলে আমি সুস্থ হ'তে পারব না কোনদিন। চিরদিন পঙ্গু হয়ে এখানে বাঁধা পড়ে থাকতে হ'বে।

মালিনী তার বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আপনি পঙ্গু হয়ে থাকুন এবি আমি চাইতে পারি। আর আপনাকে বেঁধে রাখব সে তপস্যার জোরই বা আমার কোথায়—যে তপস্যার জোরে শিবানী বেঁধে রেখেছিলেন শিবকে।'

কৌতুক ভরে বলেছিলাম, 'যদি সে জোর থাকত?'

—যদি থাকত? বলে এক মুহূর্ত সে তার প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে ধরল আমার মুখের উপর। তারপর একটি একটি করে উচ্চারণ করল, 'আমিও ছেড়ে দিতাম না আমার শিবকে। নব কৈলাসের সৃষ্টি করতাম এইখানেই।'

'মালিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা অবিশ্বাস করতে পারিনি প্রফেসর। পার্বতীরা তাদের শিবের জন্য সব করতে পারে।'

প্রফেসর বলেন, 'শিবানীর দল এরা। প্রেম আর প্রীতির প্রতিমূর্তি। এদের জীবনে পাওয়াও সৌভাগ্য শুধাই।'

—জানি। সব জেনে শুনেও এ সৌভাগ্য আমার ত্যাগ করতে হ'ল প্রফেসর। সেই রমনীর পরিবেশ ছেড়ে আমি চলে আসতে প্রস্তুত হ'লাম। অসুস্থ পথ, সঙ্গী যখন পেয়েছি মালিনীর দাদাকে তখন সঙ্গ ছাড়া যুক্তিযুক্ত বোধ করলাম না। কিন্তু আমার যুক্তি আর অপরের যুক্তি এক হওয়া সম্ভব নয়। তাই অপর পক্ষ থেকে দৃঢ় প্রতিবাদ আসে। বলে, না।

বিস্মিত হয়ে মুখের দিকে তাকাই। উত্তেজনায় বিকশিত মুখ। চোখে ঈষৎ ক্রুদ্ধ টানা। মাথাটাকে বাঁদিকে ঈষৎ হেলিয়ে তেমনি জোর দিয়ে বলে, 'শরীর এখনও সারেনি। এখন যাওয়া হতে পারে না।'

বলি, 'দুর্গম পথ। একেবারে অজানা। নদী যখন পেরেছি—'

উত্তর দেলাম, 'এ পথে আসতে যখন পেরেছেন তখন ফিরতেও পারবেন ঠিক। ভাববার কিছু নেই।'

ভাববার আমার কিছু নেই, যা আছে ওদের। সুতরাং এ নির্দেশ মানতে পারলাম না। হঠাৎ একটু দুষ্টুমি করে বলে ফেললাম, 'যাপ কর মালিনী, শরীর আমার ভালই আছে। এবার আমায় ফিরতে হবে।'

এতখানি রহস্য হয়ত মালিনী আমার কাছ থেকে আশা করেনি। ভেবেছিল তার জোর খাটবে। তাই সে একটু ঘমে গেল। আমার চোখের উপর কিছুক্ষণ চোখ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'বেশ, তাই যান। কিন্তু কিছুতেই আমি যাওয়া হেব না।'

কিন্তু মালিনী যাওয়া না দিলে কি হয়, যাওয়া দিল তাদের। যাত্রার পূর্বক্ষণেই সুরু হ'ল বৃষ্টি। পার্বত্য বৃষ্টি, যেমনি বর্ষণ তেমনি গর্জন। বিদ্যুৎ চমকের বাহারই বা কি? সুতরাং এ দুর্দিনে যাত্রা স্থগিত রাখা ছাড়া গত্যন্তর কিছু রইল না। নিজের ছোট ঘরখানির ভিতর নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কিন্তু মন যেন বলতে লাগল, এ আর কিছু নয়। এ মালিনীর অভিসম্পাত, তারই ইষ্টমন্ত্র জপার ফল। মালিনীর জমাট অশ্রুধারা আজ অজস্র বর্ষণে পার্বত্য ভূমিকে বিগলিত করে তুলেছে। তা না হ'লে এতদিনের মধ্যে আজই বা সহসা এ দুর্যোগ দেখা দেবে কেন?

রাত ঘোর ঘটায় অক্লান্ত বর্ষণ। আর তারই অন্তরালে সন্ধ্যার নিঃশব্দ আগমন। এ টের পাইনি। অকস্মাৎ চোখের উপর আলো পড়াতে তাকিয়ে দেখি, সিক্ত বসনা মালিনী কাপড়ের আড়াল দিয়ে আলোটিকে নির্বাণের হাত থেকে কোন মতে বাঁচিয়ে ঘরে এসে ঢুকেছে। তখনও তার চোখে মুখে জলের ছিটে। ওড়নাখানি স্থানে স্থানে ভিজা।

ধাঁধাতে উঠে বললাম, 'এ কি মালিনী! ভিজে একেবারে নেয়ে গেছ যে? এ দুর্যোগে না এলেই পারতে?'

—না এসে পারলুম না, তাই আসতে হ'ল। জানি এই দুর্যোগে অন্ধকার ঘরে আপনি বসে আছেন একলাটি। তাই আলোটা দিতে এলুম।

—ভাল করনি। আমার ঘরে আলো জ্বালাতে এসে নিজে ভিজে যেয়ে যাবে এত ভাল কথা নয়।

—তা হ'ক। অতিথি রক্ষনীয়, তার যেন কিছুতে ত্রুটি না হয়।

—কিন্তু মালিনী, অতিথি হয় একদিনের। নিত্য দিনের হ'লে আর আর অতিথি বলা যায় না।

—যায়। দুদিনের হলেও অতিথি, দশ দিনের হ'লেও অতিথি। অতিথি কখনও আপন হয় না।

হেসে 'বলি, না?'

—না। তারা দুঃখ পেয়েছিলাম। ভেবেছিলুম আসব না। যেখানে অনুরোধের কোন সম্মান নেই, সেখানে এসে লাভ কি?

কথাটা আন্তরিক। দুঃখ যে আমারও না হয়েছিল তা নয়। কিন্তু উপায় কি? নিজের

অধিমূঢ়তাকাতিতার জন্য বার বার অপরের দুঃখ ভাজন হওয়া ঠিক নয়। মালিনীর দুঃখের এই সুত্র। অন্তরে ক্ষত যদি তার কিছু হয়ে থাকে, সে সব ক্ষতের এখনও প্রলেপ আছে। তার ক্রম বাড়িকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাই নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইলাম।

বললাম, 'অনুরোধের সম্মান আছে বই কি মালিনী, বিশেষ করে তোমার অনুরোধের। কিন্তু আমি শুধু ভবিষ্যতের বড় দুঃখটাকেই এড়াতে চাইছি আর কিছু নয়। তুমি দুঃখ পাও, অশান্তিতে তোমার জীবন ভরে উঠুক এ আমি চাই না।'

মালিনী একটু চুপ করে থেকে বলে, 'রাগ করে বসেছিলুম। তাই বিকেলে দুধ টুকুও খাওয়াতে আসিনি। তার জন্যে নিজেই তখন থেকে জলে পুড়ে মরছি। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলুম না। ভাবলুম তাও কি অভিশাপ কুড়িয়ে।'

হেসে বললাম, 'তোমায় আমি অভিশাপ দেব মালিনী? এত ছোট তুমি আমায় মনে কর?'

মালিনী জিভ কেটে বলে, 'ছোট মনে করতে পারিনি বলেই ত এত আশা। তাই ছুটে এলুম আলো দেখাবার ছল করে।'

হেসে বলি, 'বেশ করেছ। এসেছ যখন একটুখানি বস। বৃষ্টি একটু থামুক, তখন যেও কিন্তু মালিনী, অতিথির ঘরে ঐ শুকনো গামছাটুকু ছাড়া এমন আর কিছু নেই যা দিয়ে চোখে মুখের জল তুমি মুছতে পার।'

মালিনী বলে, 'শুকনো গামছা শুধু মুখের জলই মোছাতে পারে, চোখের জল নয়। মেয়েদের চোখের জল মোছাবার মত গামছা আজও বোধ হয় সৃষ্টি হয়নি।' বলতে বলতে মালিনী অদূরে একটা কাঠের চৌকীর ওপর বসে পড়ে।

মালিনীর কথা শুনে নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাই। তবুও বলি, 'হয়েছে বই কি মালিনী। বিধাতার ভাণ্ডারে অভাব কিছু নেই। এ সব জলহারী গামছার অভাব তিনি রাখেন নি। সময় হলে তুমিও পাবে। তখন চোখের মনের কোন জলই তোমার অ-মোছা থাকবে না। সে গামছা সব জলই তোমার শুষে নেবে।' মালিনী একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসে। কিন্তু আর কেন কথা বলে না। শুধু আলো আরও একটু উজ্জ্বল করে বাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন করি, 'হাসলে যে?'

উত্তর দেয়, 'এমনিই।'

—কখন না। শুধুশুধু কেউ হাসে না। বল হাসলে কেন?

—জোর?

—না, অনুরোধ।

—কিন্তু—।

—জানি, তুমি বলবে তোমার অনুরোধের মর্যাদা আমি রাখিনি। কিন্তু এও জানি আমার অনুরোধের মর্যাদা তুমি দেবে।

—দেব। কিন্তু কি হবে শুনে? মেয়েদের সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান পরিমিত তাদের কথা শুনে হাসব না ত কি। মেয়েদের মন আর সে মনের সমস্যা যাদের জানা নেই তারাই গামছার কথা বলতে পারে। জানলে বলত না কখনও।

একটু যে অপ্রস্তুতে না পড়ি তা নয়। কিন্তু আমার অপ্রস্তুতকে প্রশ্রয় না দিয়েই মালিনী বলে, সাধু সন্ত মানুষ যে নয় তা চোখ দেখেই বোঝা যায়। পাহাড়ের এই দুর্গম পথ ভেঙে আমাদেরও যে দেখতে আসেন কি ঠোঁও ঠিক। তবে? এ প্রশ্ন প্রথম জাগে উমার মনে। সেদিন এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিনি। ভেবেছিলাম, এর সদুত্তর জেনে নেবে আপনার কাছ থেকে মেয়েরা।

বলি, 'দেব। কিন্তু শুনতে ধৈর্য থাকবে ত? সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার দীর্ঘ কাহিনী, নিরসতায় ভরা।'

মালিনী বলে, 'পার্বত্য অভিধানে মধুরতা আশা করা যায় না। আমিও করি না।'

হেসে বলি, 'একেবারে যে যায় না, তা নয়। তুমি সংস্কৃত রসজ্ঞ। সে সাহিত্য পার্বত্য ভূমির মধুর রসে ভরা। বনভূমিও বাদ যায় না তার স্বাদ থেকে। ঈশ্বরের রাজ্য মধুরতা সর্বত্রই বিরাজমান। কুড়িয়ে নিতে পারলেই হ'ল।'

মালিনী ঘাড় নেড়ে বলে, 'ভগবান শুধু মধুরতাই ছড়িয়ে রাখেন নি, বিষুরতাকেও জাগিয়ে রেখেছেন আশেপাশে। যারা ভাগবান নয়, তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেন বিষুরতা।'

বলি, 'এ তোমার অযথা দোষারোপ মালিনী। সে নিজে মধুর, তার কাঁধে বিষুরতা চাপাতে পারেন না কখনও।'

মালিনী কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে। সেই স্তিমিত আলোকেও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলে রেখে আমি রহস্য করছি কিনা। তার পর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, 'দোষারোপ হ'লেও অযথা নয়। আমি জানি কেন আপনি আমাকে মধুমতী বলেন। রোগ শয্যায় আপনার সেবা করেছি বলে আমাকে খুশি করবার জন্য আপনার এ অনুগ্রহ। কিন্তু ওটা ত মৌখিক, আন্তরিকতা ওর মধ্যে কিছু নেই।'

একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলি, 'তুমি ছেলে মানুষ নও মালিনী। কোনটা আন্তরিক আর কোনটা মৌখিক এটুকু বোঝবার বয়স তোমার হয়েছে। রোগ-শয্যায় সেবা করেছে বলেই মধুমতী বলব আর তা না হলে বলব না, এতখানি অনুদার স্বার্থপর তুমি আমায় ভাবলে কি করে? বেশ বল, কি করলে আমার আন্তরিকতার পরিচয় তুমি পাবে, আমি তাই করব।' বাইরের প্রাকৃতিক উষ্ণতার পরশ হয়ত ভিতরেও এসে লাগে। তাই আমি উঠে আসি একেবারে মালিনীর ঊরু সান্নিধ্যে। হয়ত আমার বাহুর পরশ তার কাঁধে এসে ঠেকে। হয়ত মুহূর্ত একটা বিদ্যুৎস্তরঙ্গ দুজনার মধ্যেই বয়ে যায়। আমি যেন এতদিনকার সকল সংযমকে হারাতে বসি। তার মাথাটিকে নিবিড় বাঁধনে বুকের কাছটিতে টেনে নিতে চাই! নিজের মুখখানিকে তার মুখের অনেকটা নামিয়ে এনে ঊরু ঠোঁট দুখানির স্পর্শ নিজের ঠোঁট দুটির উপর বুলিয়ে নিতে চাই। একটা আবেগ মধুর অধীরতা সেই মুহূর্তে আমায় পেয়ে বসে।

প্রফেসর ঠাট্টা করে বলেন, 'তোমার আবেগ মধুরতার অন্ত নেই শান্তনু। আর তার স্থান কাল পাত্র পাত্রীরও বিচার নেই।'

শান্তনু বলে, প্রফেসর শুধু পার্থোডাইনামিকসই ঘেঁটে মরলে জীবনে। কিন্তু নিগূঢ় রসের সন্ধান পেলে না।

প্রফেসর বলেন, 'তোমার নিগূঢ় রস আরও গাঢ় হয়ে উঠুক ভাই, আমি এতটুকু হিংসে করব

না। কিন্তু ওতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। শান্তনু হেসে বলে, 'তুমি একেবারে বেরসিক। যে রসে সাতার কাটতে ভালবাসতেন স্বয়ং ভগবান, যে রস আকণ্ঠ পান করে উন্মত্ত হয়েছিলেন তিনি, সে রস পানে আপত্তি তোমার! নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না জেন।'

প্রফেসর তেমনি মহান্ত মুখেই বলেন, 'বৈজ্ঞানিক মানুষ, স্বর্গ নরক নিয়ে চিন্তা আমার নয়, চিন্তা ইলেকট্রন-প্রোটন নিয়ে। আমার মনে হয়, তোমাদের এই আবেগ বিহ্বলতা এটা ইলেকট্রন প্রোটনেরই এক রকম প্রতিক্রিয়া। সেখানে তারসাম্যের অভাব হ'লেই এরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তোমারও অভাব হয়েছিল বলেই এমন বিহ্বলতা দেখা দিয়েছিল। এখন বল, তোমার আবেগ বিহ্বলতার কি পরিণতি হ'ল?'

—পরিণতি হ'ল রসভঙ্গে। আর রসভঙ্গ করল উমা।

—এখানেও উমা? অবাক কাণ্ড।

—অবাক কাণ্ডই বটে। ভাবতে পারিনি, এই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে উমা এসে উপস্থিত হবে এই ঘরখানিতে। উপলক্ষ্য নিশির অন্বেষণ। আগে থেকে উমার সাড়া পেয়েছিলাম বলেই সাবধান হয়ে ফিরে এসেছিলাম স্বস্থানে। ঘরে ঢুকেই উমা বলে, 'আমি জানতাম তুমি এখানে থাকবে। এতবড় বৃষ্টিতে যাবেই বা কোথায়। উঃ কি বৃষ্টিই নেমেছে। তিন দিনের আগে এ থামবে না দেখ।'

মালিনী বলে, 'মুস্কিল হ'বে তোমার। তিনদিন চায়ের কোন খোঁজই পাবে না।'

উমা মালিনীর কোল ঘেঁসে দাঁড়ায়। বলে, 'চায়ের জন্যে আমার ভাবনা নেই। আমি সে নেয়ে উঠবেই। ভাবনা তোমার জন্যে। এরপর তুমি নেয়ে উঠবে কি করে?' বলে একটা কটাক্ষ দিয়ে সে আমায় বিঁধবার চেষ্টা করল। তারপর আমাকেই সাক্ষী মেনে বলল, 'আচ্ছা বাবুজি তুমিই বলত, রুগী যে তাকে সারিয়ে তোলা যায়, কিন্তু যে রোগী নয় তাকে সারান যায় কি করে?'

হাসি মুখে বলি, 'রোগী সকলেই উমারাণী। কারো রোগ অন্তরে কারো রোগ প্রকাশ্যে। একেবারে নিরোগী কেউ নয়।'

মনে হ'ল উমা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েছে। মালিনীর দিকে তাকালাম। দেখি, তার চোখ দুটি খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। উমাকে আবার বলি, 'তুমি ঠিকই বলেছ, বহির্মুখী রোগ সারান যায়, কিন্তু অন্তরমুখী রোগ সারান যায় না। এ দুরারোগ্য।'

উমা বলে, 'রোগের কথা থাক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এসে বিশ্রাম্ভালাপের বিঘ্ন ঘটালাম। আমি উঠে তাহলে।' বলে সত্য সত্যই সে উঠে দাঁড়াতে যায়।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলি, 'দেবি, ক্রোধ সংবরণ কর। তোমার অন্তর্ধানে আমি যতখানি সন্তাপিত হ'ব এমন আর কিছুতে হ'ব না।'

উমা মালিনীর পাশটিতে আবার বসে।

উমাকে বলি, 'তোমারই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল মালিনী আমার কাছ থেকে। তোমার দুরন্তপনা আবিষ্কার সম্বন্ধে। আমি যে সাধু সন্ত লোক নই এ কথা আমার চোখ নাকি ধরিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে।'

উমা অপ্রস্তুত না হয়েই উত্তর দেয়, 'দিয়েছেই ত। অমন যার চোখ আর সে চোখে ভাষা যার এমন, সে কখনও সাধু পুরুষ হ'তে পারে না।'

হেসে ফেলে বলি, 'তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। আমি সাধু পুরুষ কোনদিনই নই। আর তোমরাও আমাকে জোর করে সাধু বানাতে যেও না। রক্তে মাংসে গড়া মানুষ আমি। আমার মধ্যে কামনা বাসনা সবই আছে। সেই বাসনা মেটাবার জন্যেই মালয়ের এই দুর্গম পথে অভিযান আমার।'

উমা নির্বোধ মেয়েটির মত বলে, 'সেই কথা আমিও বলছিলুম বাবুজি। রক্তে মাংসে গড়া মানুষ আমরাও। আমার পিসীটিও বাদ যায় না। বাসনা কামনা তারও আছে এ মেটাবার জন্য তাকে দুস্তর গিরি অভিযান করতে হয়নি বটে, কিন্তু নিজের কুটিরে বসেই যা পেয়েছে তার মর্ম্যাদা যদি পায় তাহলে সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।'

শুনে চমৎকৃত হই। রক্তে মাংসে গড়া মানুষ সকলেই। উমা রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, বাসনা কামনা তারও আছে। আর আমার ত আছেই। আছে বলেই না, এতদূরে এই দুর্গম পর্বতারণ্যে এমন বিপদ সঙ্কুল অভিযান আসা।

প্রফেসর চাটার্জি বলেন, 'এই সংক্রামক ব্যাধি শান্তনু। তোমার ছোঁয়াচ লেগেই উমা আর মালিনীর মধ্যে এ ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছে।'

শান্তনু মাথা নাড়ে। বলে, 'উঁহু প্রফেসর, এ উক্তি ঠিক হ'ল না তোমার। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। বাসনা কামনার হিল্লোল দেখানে লেগেছিল। আমি নিমিত্ত মাত্র। কই আমার ছোঁয়াচ ত তোমাকে লাগল না প্রফেসর?'

প্রফেসর সাহাস্যে বলেন, 'লাগছে। মনে হচ্ছে যেন একটু একটু লাগছে। যেটুকু লাগছে তাতেই বুঝছি এ মন্দ নয় এর আমেজটাও ভাল। এখন তুমি বল, আমি পরমানন্দে তুমি আর মাঝে মাঝে শিহরিত হয়ে উঠে।'

শান্তনু বলে, 'উমার কথায় মালিনী রাগ করতে যায়। তাকে আশ্বস্ত করে বলি, উমাটা দুর্মুখ মালিনী, তুমি ওর কথায় রাগ করতে যাও কেন। এবং তার চাইতে শোন আমার এই দুর্গম পথে অভিযান কাহিনীটি।'

উমা বলে, 'শুনতে রাজি আছি বাবুজি, কিন্তু একটা সর্তে।'

প্রশ্ন করি না। কিন্তু সর্ত শোনবার জন্য প্রশ্ন চোখে তার দিকে তাকাই।

সে বলে, 'আচারটাই বড় নয় বাবুজি, মানুষটাই বড়। পাহাড়ী মেয়ে তারাও মানুষ তাদেরও প্রাণ আছে।'

—কিন্তু আমি ত না বলছি না উমা।

—মুখে বলছ না বটে, কিন্তু বলছ মনে। সমস্যা সেইখানে। তা না হ'লে, এই যে পাহাড়ী মেয়ের বাসনা কামনা, এর প্রতি তত্তখানি বে-দরদ কেন?

শুনে আমি যতখানি না বিচলিত হই, তার চেয়ে বেশী বিচলিত হয় মালিনী। সে তাইঝিকে চেনে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে এসে দুহাত দিয়ে উমার মুখখানিকে চেপে ধরতে যায়। কিন্তু উমা একঝটকায় তাকে ঠেলে দিয়ে বলে, 'আমায় বাধা দিও না পিসী বলতে যাও। অসময়ে সেবা করেছ বলে তার কি এই প্রতিদান?'

এবার আমিই উঠে এসে বলি, 'আমরা মর্ত্তের মানুষ উমা তোমাদের মত স্বর্গবাসী নই।

মর্ত্যবাসী হলেও বলব, এখেনারে অকৃতজ্ঞের দাস হয়ে পড়িনি আজও। মালিনীর কথায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি, এ আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রতিদানের কথা আদৌ কিছু জানতাম না উমা?'

দানের একটা প্রতিদান আছে। এ প্রকাশ্যে না বলেও অপ্রকাশ্যে কিছু না কিছু সকলেই মনে মনে কামনা করে। এ অহঙ্কারিত কথা। প্রশ্ন করে জানবার প্রয়োজন হয় না। তবুও আমি প্রশ্ন করলাম উমার মুখ থেকে কথাটা শোনবার জন্য। কিন্তু আমার হলেও উমা মেয়ে। অপরিণত বয়সের উত্তেজনা তারমধ্যে যতখানি থাক না কেন, সহসা এ প্রশ্নের উত্তর তার মুখে জোগাল না। তাই পিসীর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

কিন্তু উত্তর দিল মালিনী। মেয়েটি শান্ত আর ভীরুস্বভাবী। চোখে মিনতি ভরে বলল, 'উমাটা ছেলে মানুষ। ওর কথায় দোষ নেবেন না। কি বলতে কি বলে ফেলে, সব সময় ও নিজেই বোঝে না। আপনি আপনার কাহিনী বলুন, আমরা শুনি।'

উমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলি, 'কি উমা, বলব?'

বুঝতে পারি উমা ভিতরে ভিতরে ফুলছে। তার মন আবুলি বিকুলি করছে একটা চরম বোঝাপড়া করে নেবার জন্য। কিন্তু পিসীর কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে সে যেন হেসে শুধু স্নেহ ভরে বলল, 'বলবে বই কি বাবুজি। নিশ্চয়ই শুনব। কিন্তু আমার পিসীটি একটি কালিদাস। যে ডালে নীড় রচনা করতে চেয়েছে, সেই ডালই সে নির্দ্বিধাতে কেটে চলেছে। কিন্তু বুঝছে না, এরপর শত হাহাকারেও এ ডাল আর জোড়া লাগবে না।'

মালিনী বলে, ভারী মিষ্টি কণ্ঠেই সে বলে, 'বুঝিয়ে উমা বুঝি। আমরা পাহাড়ী মেয়ে, একটু বোকা হয়েই থাকি। এরজন্যে স্বামী আমাদের অদৃষ্ট।'

—বাবুজিকে শুধু শুধু দোষী করতে যাই কেন।

শুনে অবাক হই না শুধু ভাবি

পুরুষের প্রীতিমুগ্ধ সব নারীর রূপই এক। এখানে লছমিয়াও যা মালিনীও তাই। এখানে বিদ্যাবুদ্ধি রূপের কোন মূল্য নেই। শুধু অন্তরই এখানকার একমাত্র সম্রাট। তারই ভাষা একমাত্র ভাষা। এই ভাষাই মালিনীর মুখে আগল ছিল আমার বিরুদ্ধে বলতে। তাই সে দোষ দিল নিজের অদৃষ্টকেই। হয়ত কিছু একটা বলতে গিয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। এ মেয়েটির নিষ্ঠায়, আন্তরিকতায় এতখানি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে কোন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারলাম না। ভালবাসা নরনারীর স্বর্গ এ স্বর্গের অমৃত সবাই চায় ভালবাসতে আর ভালবাসা পেতে। কিন্তু রূপসী তরুণীর ভালবাসা পেয়েও তার যোগ্য প্রতিদান দিতে পারে না সে হতভাগ্য।

—হতভাগ্য নয় যে, নরাধম। প্রফেসর বলেন, 'তোমাকে আমি তাই বলব। স্বর্গ বাসিনীর এমন মধুর প্রেমকে যে লোক এমন ক্ষুব্ধ করে চলে আসতে পারে তার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে।'

শান্তনু কাতর কণ্ঠে বলে, 'আর অভিশাপ দিও না ডাক্তার। মালিনীর দীর্ঘশ্বাসে অহরহ দগ্ধ হচ্ছি। এর ওপর তোমাদের অভিশাপে জলে পুড়ে মরব। স্বর্গ বাসিনীর প্রেমকে আমি ক্ষুব্ধ করিনি। সমস্ত সত্তা দিয়েই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে হৃদয়ের আশ্রয় নিতে রাজি হইনি বলেই আমি সব হারালাম।'

শান্তনু চুপ করে। চুপ করে যায় প্রফেসরও। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই শান্তনু আবার বলে,

'মালিনীর মুখের দিকে তাকাই। সে মুখে ক্ষোভ বা অভিমানের কোন চিহ্নই লক্ষ্য করি না। বরং রক্তাধরে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে সে বলে, 'এইবার দুর্গম অভিযান কাহিনী আরম্ভ হ'ক বাবুজি, আমরা শুনি।'

সুতরাং আর দ্বিরুক্তি না করে অভিযান কাহিনী সুরু করলাম। বললাম, ছেলে বেলা থেকেই রামায়ণ মহাভারত পড়তে আমি ভালবাসতাম। অবশ্য এ ভালবাসে সব ছেলে মেয়েরাই। তবে তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ ছিল এই যে অন্যান্য ছেলেরা যেখানে ভালবাসে রাম-রাবণের যুদ্ধ পড়তে, ভীম বকাসুরের যুদ্ধ শুনতে, আমি ভালবাসতাম কিন্নর লোক, গন্ধর্বলোক আর তাদের অধিবাসীদের কাহিনী পড়তে। অনেকদিন অবাক হয়ে গেছি এই না-স্বর্গলোক, না-মর্ত্যলোক বাসীদের কীর্তি কলাপে, আচার ব্যবহারের কথা শুনতে শুনতে। এদের অনায়াস স্বর্গমর্ত্য বিহারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আর মুগ্ধ হতাম এদের অলৌকিক রূপের খ্যাতি শুনে, দুর্নীত পটুতার কথা শুনে। অনেক দিন কল্পনায় এদের ছবি মনের মধ্যে আঁকবার চেষ্টা করেছি, স্বপ্নে এদের দর্শন প্রার্থী হয়েছি। একটা তীব্র আকর্ষণও অনুভব করছি মনে মনে। এ আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। উমা ঠোঁট উল্টে বলে, 'আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

মালিনী ধমক দেয়, 'উমা, তুমি চুপ কর।'

উমার দিকে তাকিয়ে বলি, 'বিশ্বাস করা না-করা তোমার খুশি উমা। কিন্তু আমি যা অনুভব করেছি কোন কিছু গোপন না করে সেই কথাটাই বলছি। দুর্বার আকর্ষণ একদা আমায় টেনে নিয়ে এল এই হিমালয়ের কোলে। সেদিন এ পর্বতের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম যার নিজের রূপ এত, তার অঙ্গে লালিত পালিত পুত্র কন্যাদের রূপ না জানি কত কিন্তু সেদিন আনন্দ আমার যতখানিই হ'ক, নিরানন্দও হয়েছিল অনেকখানি। কোথা সেই পথ, যে পথে ছড়িয়ে আছে এই সব অপূর্ব সুষ্ঠ ছেলে মেয়ে, নরনারীর দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আবল্যের স্বপ্ন সফল হ'ল। পথের সন্ধান পেলাম। উমা প্রশ্ন করে, 'কিন কে এই সন্ধান?'

উত্তর দি, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। ভগবানই এ পথের সন্ধান পাইয়ে দিলেন। উমা মাথা নাড়তে নাড়তে আবার বলে, 'ভাল করেন নি। আমি বলব খুবই অন্যায় করেছেন তিনি বাবুজিকে এ পথের সন্ধান দিয়ে। শুধু অনিষ্টই করলেন একটি সংসারের, আর একটি নিরপরাধিনী পার্বত্য—।'

মালিনী উমাকে ঠেলা দেয়। বলে, 'তুমি ঝগড়া করবে না শুনবে?'

—দুই। ঝগড়া করতে করতেই সব শুনব পিসী। তারপর ঠিক করে হেসে বলে, এত 'এত আশা। বাবুজিকে কোন কথা বলবার জোটি নেই, অমনি পিসির রাগ হবে। তুমি বল বাবুজি, তোমার ভগবানের দয়ার কথা। আমি মুখ বুজে চুপটি করে শুনে যাব সব।

আমি হেসে বলি, 'তোমার মুখ বুজে শুনতে হবে না উমা। তুমি ঝগড়া করতে করতেই শোন। যার কাছে থেকে এ পথের সন্ধান পেয়েছিলাম, তিনি একজন এই পর্বতেরই অধিবাসী, শতবর্ষের মানুষ তিনি। যৌবনে যখন ভেসেছিল অমিত তখন সারা পর্বতটাকেই তিনি চষে ফেলেছিলেন ঘুরে ঘুরে এর প্রবল আকর্ষণ তাকে গৃহ ছাড়া, ছন্নছাড়া করে টেনে নিয়ে গেছে দিকে দিকে। অজানার আঘাত তাকে মাতিয়ে তুলেছে বারবার। আর তারই জন্য পরাজয়ের মাঝে তিনি যে অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে, এ পথের কথা বলে ফেলেছিলেন আমার

কাছে। জান উমা, তোমাদের কাছে আমি যেমন ঋণী আমার প্রাণের জন্যে, তেমনি তার কাছেও আমি ঋণী এই পথের সন্ধান দেবার জন্যে।'

উমা বলে, 'বাবুজি বড় বিনয়ী দিদি। কথায় কথায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নিজের ঋণের কথা। কিন্তু পরিশোধের কথা একটিবারও মুখে আনছে না।'

বলি, 'মানুষের স্বভাবই এই উমা, তারা ভালবাসে ঋণ করতে কিন্তু পরিশোধ করতে নয়।'

উমা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'সেটা মাটির মানুষের কথা বাবুজি। পর্বতের মানুষের কথা নয়। তারা ঋণ করবার আগেই ভেবে রাখে পরিশোধ করবার কথাটা। বলি, আমি আপনার ব্যাপারী, আমাদের খবর রাখি না। মাটির মানুষ, ঘুরে বেড়াই মাটিতে। পর্বত বিহারী উচ্চস্তরের লোক, ওঁদের খবর পাব কি করে বল?'

উমার মুখে যেন উত্তর খুঁজিয়েছিল। বলে, 'চেষ্টা করনি তাই পাওনি। চেষ্টা করলে পাবার অভাব হ'ত না নিশ্চয়ই।'

হেসে বলি, 'তুমি বড় দুর্মুখ উমা গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও।'

মালিনী সামাল দেয়। বলে, 'আপনাকে ত বলেছি, উমা ছেলে মানুষ, ওর কথা ধরবেন না আপনি। আমাকেও ও কটু কট ক'রে বলে।'

উমা ফোঁস করে ওঠে, 'বলবই ত। এক'শ বার বলব। তুমি বোস', কালিদাস। নিজের মরণ ডাক নিজেই কাটছ। আমি হ'লে—তারপর আমার দিকে তাকি তাকিয়ে কিছু করে হেসে ফেলে একটা মর্মভেদী কটাক্ষ হেনে বলে, 'কিন্তু আমি হ'লে এমনভাবে বেহাই পেতে না বাবুজি। আমি যে শুধু চোখের জলে ভাসব, আর তুমি ঘুরে বেড়াবে মনের সুখে এ হতে দিচ্ছুর না কিছুতেই। ঋণের দায়সহ লিখিয়ে নিয়ে পায়ে বেড়ী এঁটে দিচ্ছুর।'

মনে মনে স্বীকার করি, তা পারতে। তোমার ঐ মর্মভেদী কটাক্ষ আমি কোন ছার, স্বয়ং মহাদেবও চঞ্চল হয়ে উঠবেন। মালিনীর কটাক্ষ আছে বটে, তবে এমন প্রাণঘাতী নয়। সুমিষ্ট কটাক্ষ প্রাণে জ্বালা ধরায় না, মনের কিনারে কিনারে শুধু আছাড় খেয়ে মরে।

প্রফেসর বলেন, 'অমন সোনার বেড়ী পায়ে না পরে ভুল করেছ পাগল। কি হবে তোমার এই কাথনডেটিং যন্ত্রে কোন এক আফ্রিকানের অপ্সরী মেয়ের জন্ম তারিখ শুধে।'

—জানি না প্রফেসর, হয়ত এই আমার নির্বুদ্ধ। না চাইতে পেয়েছিলাম অনেক কিছু তেবে তার কিছুই নেলাম না। কিন্তু থাক ও কথা। যা বলছিলাম বলি শোন।

—বলছিলে ত উমার কটাক্ষের কথা।

—শুধু উমা কেন, বলেছিলাম মালিনীরও কটাক্ষের কথা। কিন্তু দুয়ের সোতকে সেদিন সংবরণ করে উমাকে বলেছিলাম, 'দায়সহ আমিও লিখে দিতে পারি উমা, কিন্তু তার ফল ভাল হবে না। নিজের প্রয়োজনের তাগিদে অপরের অনিষ্ট করব, স্বর্গের অজ্ঞান পারিজাতের ঘ্রাণ হরণ করে তাকে ম্লান করে দিয়ে যাব, এমন নরাধম আমি নই। এই স্বর্গোদ্যানে এসে এ কদিনে যা পেয়েছি তাইতেই অন্তর আমার ভরে গেছে। এরই স্মৃতির ঐশ্বর্যে নিজেকে ঐশ্বর্যবান করে রাখব চিরজীবন।'

হয়ত কথাগুলির মধ্যে একটু ভাবালুতা ছিল তাই প্রতিপক্ষের অন্তর স্পর্শ করল। তারই সুযোগ নিয়ে আমি আবার বললাম, 'তোমরা হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না আর আমিও হয়ত

তেমনভাবে তোমাদের বিশ্বাস করতে পারব না, কিন্তু এ কথা সত্য। তোমাদের অনিষ্ট হ'ক এ কামনা করি না। বরং ইষ্ট হ'ক, তোমরা সুখে থাক এই কামনাই করব চিরদিন।'

মালিনী যেন সইতে পারছিল না। আমার আন্তরিকতাকে সে এতটুকু সন্দেহ করেনি। আমি যে সত্যই তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার দ্বারা কোন অনিষ্টই যে তাদের হতে পারে না, এ ধারণা মালিনীর বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই একটু বিচলিত কণ্ঠেই সে বলল, 'এ আমি বিশ্বাস করি বাবুজি।'

প্রশ্ন করি, 'সত্য ?'

মালিনী উত্তর দেয়, 'পাহাড়ী মেয়ে আমরা, সমতলভূমির সভ্যতার গৌরব আমাদের নেই, হয়ত তাদের সে শিক্ষার সৌভাগ্যও নেই। কিন্তু অনৃত ভাষিনী হতে শিখিনি।'

মুখটা আমার যে অনুপাতে কালো হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি উমার মুখখানা ঠিক সেই অনুপাতেই ঝলমলিয়ে উঠেছে। সিসি যে এভাবে আমায় বলতে পারে এ ছিল তার কল্পনার অতীত। তাই আনন্দে হাততালি দিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মালিনী তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল, 'ও কথা থাক বাবুজি, আপনার কাহিনীটা বলুন, শুনি ?'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, 'পথের সন্ধান পাবার পর আর স্থির থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম ভগবান ত্রিশূলনাথকে স্মরণ করে।'

মালিনী বলে, 'এটা ত্রিশূলনাথের পাহাড়। কিন্তু সকলে এর সন্ধান রাখে না। হয়ত এর দুর্গমতাই একে লোকচক্ষুর অন্তরাল করে রেখেছে।'

বলি, 'সেই জন্যে এ পাহাড় আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এর ঐশ্বর্য থেকে মানুষ আজও বঞ্চিত রয়েছে। গন্ধর্ব কিন্নরদের কথা লোকে জানে, কিন্তু জানে না স্বর্গমর্তের কোনখানে তাদের আবাসভূমি, কোনখানে তাদের রাজধানী। একদিন স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যে যোগাযোগ ছিল, হয়ত এই ছিল তার প্রধান পথ।'

মালিনী ঘাড় নেড়ে বলে, 'সে কথা আমরাও শুনে থাকি। আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা ছিল, শুধু ধারণা নয়, দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে এটাই ছিল স্বর্গদ্বার। এই দ্বার দিয়েই ছিল তাদের আনাগোনা। একদিন এ স্থানেও ছিল তাদের বসবাস। আজ এ স্থান ত্যাগ করে চলে গেছেন তারা আরও ঊর্ধ্বলোকে। পথও ঢাকা পড়ে গেছে দুর্গমতায়। ছিন্ন ভিন্ন যোগাযোগের আর চিহ্নমাত্র নাই।

একটু ভেবে বলি, 'না হয়েও উপায় ছিল না। পরিবর্তনশীল পৃথিবী। তার পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সবেরই পরিবর্তন হয়েছে। তবে সর্বত্রে আর সর্বস্থানে এ পরিবর্তন ঘটে নি। এখনও আদিম পৃথিবীর আদিমতার ছাপ অনেক স্থানেই রেখে গেছে। যারা পরিবর্তন সইতে পারেনি, তারা লয় পেয়ে গেছে অথবা সরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে অপরিবর্তনীয়তার মাঝে। যেখানে মনোমত পরিবেশ পেয়েছে আশ্রয়নিয়েছে সেইখানেই।

মালিনী বলে, 'সাধুজির মুখেও এই কথাই শুনেছি। সাধুজি বলেন, এই বৈচিত্র্যে ভরা অনাদিকালের পর্বতরাজির অন্তর্লোকে এখনও পুরাণকাল তার পারিপার্শ্বিকতাকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে। তাই প্রকৃতি যখন একস্থানে নবকলেবর ধারণ করতে সুরু করল, তখন যারা এ সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারল না, তারা পুরাণ কলেবর আশ্রয় করে সরে গেল আরও উত্তরে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি তার কারণ এই। এ স্থান ত্যাগ করে তারা সরে গেছেন আরও উত্তরে।'

বলি, 'সাধুজি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর অবিদিত কিছু নাই। এখানে যে একদিন অমর কিন্নর অধ্যুষিত ছিল এ তিনি জানেন। এর চাক্ষুষ প্রমাণও তিনি আমায় দেখিয়েছেন।'

—সত্যি। মালিনী ও উমা দুজনে একসঙ্গে বলে উঠে। সায় দিয়ে বলি, সত্যিই আমায় দেখিয়েছেন। তবে জীবন্ত নয়, মৃত। জীবন্ত অমর বা কিন্নরেরদল সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে বহু শতাব্দী পূর্বে। বসন্তবিরাজের আরও নিবিড় ক্রোড়ে। কিন্তু যা দেখেছি তা সত্যই অপূর্ব।

উমা ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'জানি। যাদের দেখেছে তাদের কথা আমরাও শুনেছি। এ যুগের লোক তারা নন, তারা মহাভারতের যুগের।'

মালিনী বলে, 'আমরা তাদেরই বংশধর। কিন্তু আমাদেরও সৌভাগ্য হয়নি তাদের দর্শন লাভ করবার। আপনার সৌভাগ্য যে মহাভারতের যুগের লোকের দর্শনলাভ করলেন আপনি।'

বিস্ময়ের আধিক্যে হয়ত চোখ দুটি আমার বড় হয়ে উঠেছিল। সেটুকু লক্ষ্য করে মালিনী বলল, 'প্রথম যেদিন শুনি সেদিন আমরাও বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ লোক সাধুজি। তাঁর অবিদিত কিছু নেই। তিনি আমাদের বংশানুক্রমিক একটা ইতিহাস করে দিয়েছিলেন। তাই থেকে অনুমান করা যায় যে উর্ধ্বতন প্রায় একশো পঞ্চাশ পুরুষ কি তারও আগে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের বৃহদ্রথ নামে যে প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন যাঁর পরাক্রমে পাণ্ডবদের বনবাসকালে কৌরবেরা পরাজিত হয়েছিলেন এমন কি দুর্যোধন প্রমুখ রথীমহারথীদেরও যিনি কারাগারে দিয়ে বন্দী করেছিলেন তাঁরই এক আত্মীয়া ছিলেন মেয়েটি। নিজের সম্মান রক্ষার্থে যাকে ভালবেসেছিলেন তারই পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন বলে আজও বীরাঙ্গনা রূপে পূজা পেয়ে আসছেন অমর কিন্নরদের।'

উমাকে লক্ষ্য করে বলি, 'তোমরাও বাদ পড় না নিশ্চয়ই। তোমাদেরও পূজা পেয়ে আসছেন এরা?'

—নিশ্চয়ই। উমা জোর দিয়ে বলে, প্রেমের পূজারিণীকে পূজা করে না কে?

উমাকে রাগাবার জন্য বলি, 'করে না আমার মত অর্বাচীনরা উমা।' উমার কলহ প্রিয়তা আবার ধূমায়িত হয়ে উঠবার উপক্রম করছিল।

কিন্তু নিবারিত করল তাকে মালিনী। বলল, 'শুনেছি অপূর্বদর্শনা এই নারী বীর বিক্রমে পরাজিত নিধন করতে করতে চিরনিদ্রায় মগ্ন আছেন। নানা অলংকারে শোভিতা, নানা অস্ত্রে সজ্জিতা বীরাঙ্গনা তাঁর শেষ শয্যা বিছিয়েছেন এখানে। শীতের শেষে যে দিনটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি, সেইদিন সারা গন্ধর্বরাজ্য এক আনন্দ মুখর উৎসবে মেতে ওঠে। এ উৎসবের নাম রতি উৎসব। তরুণ-তরুণীর উৎসব, কিন্তু যোগ দেয় সকলেই বালক বালিকা, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারাও বাদ যায় না কেউ। নিস্তব্ধ পার্বত্যভূমি একটা দিন নাচে গানে, আনন্দ কোলাহলে মুখর হয়ে উঠে। বাধা নিষেধের কোন বালাই নেই। ছেলেমেয়ের দল মেলা মেশা করে অবাধে। অনেক মন ছোঁয়াছুঁয়ি, মন জানাজানির পর্বও সমাধা হয়ে থাকে এখানে। গন্ধর্ব বিবাহের কথা শুনেছেন, মহাভারতেও লেখা আছে। এদিনগুলি গন্ধর্ব বিবাহের প্রকৃষ্ট দিন। বাপ মায়ের অলক্ষ্যেতে অনেক বিবাহও হয়ে থাকে এখানে।'

উমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলি, 'মেয়েদের একটা অপূর্ব সুযোগ বল?'

উমা ক্র কুঁচকে বলে, 'শুধু ঘরে কেন, ছেলেদেরও।'

—এ ঘরার গেছে কোনদিন ?

—না।

—কারণ ?

—প্রয়োজন বোধ করেনি। একেবারে নির্লিপ্ত উত্তর।

—এবার যাবে।

উমা তির্যক ভঙ্গিমায় ঘাড় কাত করে। চোখে শুধু যোজনা করে বলে, 'যাব মানে ?'

—মানে ? 'উৎসব রজনী আসিছে সজনি আর নাহি কর হেলা,
রাঙা অম্বরে বাসা বাঁধিয়াছে মিলনোৎসব মেলা।'

উমা অপ্রতিভ না হয়েই বলে, 'বেরেছেই ত। কিন্তু শুধু কি আমার একা ? চোখ মেলে আশেপাশে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে সেখানে উৎসবের স্রোত বয়ে চলেছে।' তার তির্যক চাহনী একবার মালিনীর মুখের উপর দিয়ে ঘুরে যায়।

এ চাহনীর অর্থ মালিনী বোঝে। মালিনীকে দেখে, পার্বত্য দুহিতা হলেও শ্রীড়ার অনবদ্য মাধুরী থেকে সে বঞ্চিত নয়। ভাইঝির দিকে সে একবার তাকিয়ে দেখে তারপর আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই ক্রীড়া ভঙ্গিমায় চোখ দুটি নত করে নেয়।

মালিনীকে বাঁচালাম আমি। বললাম, 'দেবী প্রসীদ! তোমার একার কথা বলিনি আমি, চাঁদের কথাও বলেছি। শুনলাম, এ উৎসবের স্রোতের মুখে তার নাকি স্থবের মত অবস্থা। তাই তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে 'বেচারা অধীর আগ্রহে মুহূর্ত গুনে চলেছে শুধু মিলনোৎসবের মিনিটির জন্য।'

উমা অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠে। জোর দিয়ে বলে, 'মিথ্যে কথা। কক্ষণ না। ধরে গেছে চাঁদকে বিয়ে করতে আমার।'

উমা রাগ করলে মানায় ভাল। দু'চোখ দিয়ে হীরের দীপ্তি যেন ঠিকরে পড়ে। কিন্তু তাতেই আমার ভয় হ'ল। উমা রাগ করেই হেরে গেল। সে তার কাঁজ হারিয়ে ফেলল। সেটুকু বুঝতে পেরে ভাল মানুষের মত বললাম, 'জানি না। হতেও বা।'

উমা বলে, 'জেনে কাজ নেই। এখন যা কথা হচ্ছিল তাই হ'ক।'

বলি, 'তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি বক্তা নই, শ্রোতা।' তারপর মালিনীকে বলি, 'তোমাদের উর্বশীন মেয়েদো পুরুষের কাহিনীর আমি শুনলাম। যথা এবং অন্ত শুনলে বুঝতে পারি প্রকৃত কাহিনীটা কি ? অতএব এবার সুরু হ'ক তোমার মন জানাজানি, মন ছোঁয়াছুঁয়ির ইতিবৃত্তটা।'

মালিনী বলে, 'প্রতি উৎসবের কাহিনী এ পার্বত্য অঞ্চলে সব বাপ মা-ই জানেন। তাই তারা সতর্ক হয়ে থাকেন। মেয়েরা যখন শুভ্র ভালে চন্দন চর্চিত হয়ে বেণীতে ফুলের মালা জড়িয়ে বাড়ী ফেরে তখনই বাপ মায়ের আশা নিরাশার সকল দ্বন্দ্বেরই অবসান হয়। বোঝে স্বয়ং বধূ বেশে ইষ্টলাভ করে ঘরে ফিরেছে। বলবার কিছু নেই। প্রথা যখন এই, তখন সব বাপ মা-ই একে মেনে নেন।'

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, 'এ উৎসবের চাক্ষুষ সাক্ষী হয়েছ কোনদিন ?'

—না, সে সৌভাগ্য হয়নি। সাধারণ মানুষের পক্ষে এপথ দুরতিক্রম্য। আমি ত জানি না আজ পর্যন্ত এ পথে পাড়ি দিয়েছে কেউ। দাদার মুখ থেকেও শুনিনি এমন ঘটনার কথা। শুধু

দেখলাম আপনাকে। আশ্চর্য! আমরা শুধু পর্বতবাসীই নই, ওদের বংশধরও। আমরা যা পারিনি আপনি পারলেন তাই। এ সম্ভব হল কি ক'রে?'

কি করে যে হয়েছে এ রহস্য আমি শুধু আমরা তিনজন। বাবা ত্রিশূল নাথ, লছমিয়া আর আমি। একজনের করুণা অপর জনের ভালবাসা আর তৃতীয় জনের অসীম অক্ষয় প্রীতি। দেবতার কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু লছমিয়া? তার পাহাড়ী অন্তর যদি অনুরাগে রঞ্জিত না হয়ে উঠত তা হলে এ গোপন পথের সন্ধান আমি পেতাম না কোন দিনই। সত্য বটে অপ্সরাদের দুর্বার আকর্ষণ আমাকে প্রবলভাবে টান দিয়েছিল, স্বপ্নে কাঞ্চনজঙ্ঘার পথ বেয়ে নেমে এসে পথেরও সুস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত রেখে দিয়েছিল কিন্তু সে ত শেষ পথ। চক্রব্যূহে প্রবেশ পথ নয়। এ পথের চাবিকাঠি আমার হাতে এনে দিল লছমিয়া তার বাহুর অপরূপ অভিজ্ঞতার ঝোলা থেকে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে প্রাজ্ঞ করেছে। লছমিয়ার একনিষ্ঠ ভালবাসা, আর ত্রিশূলনাথের প্রতি তার অবিচল ভক্তি আমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, আর অপ্সরীদের হাতছানি আমাকে এ পথে টেনে এনেছে।

কিন্তু এত কথা বললাম না মালিনীকে। শুধু একটুখানি হেসে বললাম, 'এ আমার অধ্যাবসায়ের পুরস্কার। কে জানে কোন দূর অতীতে কয়েক পুরুষ আগে আমি হয়ত তোমাদেরই একজন ছিলাম। তাই তোমাদের মায়া কাটাতে পারিনি বলে আবার আসতে হ'ল আমাকে।'

মালিনী সায় দেয়। বলে, 'আশ্চর্য নয়। পুরাণ মাটির মায়া চট করে কাটাতে পারা যায় না তাই এসে স্বচক্ষে দেখে গেলেন অতীতের লীলা ভূমিকে।'

উমা চট করে বলে, 'যখন জানছ বাবুজি যে তুমি এ দেশেরই মানুষ ছিলে একদিন, তখন এর মায়া কাটিয়ে আবার ফিরে যেতে চাইছ কেন? দেখ এখানে কত শান্তি পাবে তুমি কোন অভাবই তোমার থাকবে না। এই হিমগিরি পবিত্রভূমি, দেবতাদের আবাস স্থল। অপ্সর, কিন্নর, বিদ্যাধর বিদ্যাধরীদের লীলাভূমি। এমন অপূর্ব স্থান তুমি পাবে না কোথাও। এখানে ঘর বাঁধ তুমি সুখী হবে।'

আন্তরিক কথা, ঐকান্তিক আবেগে বলে গেল উমা। অন্তরের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলল। মনে শিহরণও জাগিয়ে দিয়ে গেল। এই অপ্সরা অধ্যুষিত দেশে বাস, এই অপ্সরী সাহচর্য বিহার মুহূর্ত ভরে মনটাকে উন্মনা করে দিল। শত তপস্যা করেও মানুষ যা পায় না, তা আমার কাছে আজ অনায়াস লভ্য। কিন্তু বিস্মৃত অতীত আমার হয়ে যা সাক্ষাই দিক না কেন, আজ আমি মাটির মানুষ। এই স্বর্গপুরীর অপ্সর কিন্নরীদের বিলাসভূমি অপেক্ষা মাটির আকর্ষণটাই আমার কাছে উগ্র। তাই উমাকে পাশ কাটাতে পারলাম। বললাম, 'ঘর বাঁধতে পারলে সত্যই আমি সুখী হতাম উমা, কিন্তু পারলাম কই। ভাগ্য আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কখনও বিড়ম্বিত, কখনও প্রতারিত করাই হল তার কাজ। আজ তোমাদের দাক্ষিণ্য থেকেও সে আমাকে বঞ্চিত করেছে। এ যে কতখানি মর্মান্তিক সে কথা আমি বুঝি।'

মনে হ'ল মালিনীর চোখ দুটি হঠাৎ চকচক করে উঠল। সে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বলতে দিল না উমা। একেবারে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। বলল, 'ভাগ্য তোমায় প্রতারিত করেনি বাবুজি। করেছে তোমার অহংকার। আমরা নিরক্ষরা, অশিক্ষিতা পাহাড়ী মেয়ে, এইখানে বেঁধেছে গোল।'

মালিনী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। বলে, 'আঃ উমা থাম।'

—না, না, না। উমা মাথা নেড়ে বলে চলে, 'আমি যাব না কিছুতেই। মাটির মানুষের এত অহংকার কেন? কি সে আমরা কের আমি সেইটুকুই জানতে চাই শুধু।'

উমাকে থামাবার চেষ্টা করে বলি, 'তোমরা হের নও উমা, তোমরা নক্ষত্রলোকের প্রেয়। কোন-খানে আমার অপারগতা সেইটা আমি বোঝাতে পারছি না বলেই তোমার এ সংশয়।' মালিনীকে বলি, 'আমি অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমায় অকৃতজ্ঞ করে তুলেছে তোমাদের কাছে।' মালিনী মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'বাবুজি, উমা ছেলে মানুষ, ওর কথায় দোষ নেবেন না। শুধু শুধু মন খারাপ না করে যে কথা বলছিলুম শুনুন।'

মালিনী বুদ্ধিমতী। গল্প শোনার আগ্রহটা তার মৌন, মুখ হ'ল প্রসঙ্গান্তরে ফিরে গিয়ে গুরু পরিবেশটিকে লঘু করে তোলা। সঙ্গে সঙ্গে মত দি। বলি, 'বল তোমাদের ঊর্বশীর পুরুরবের বিচিত্র কাহিনী।'

মালিনী বলে, 'গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সভাতে উমা নামে অপূর্বদর্শনা এক অপ্সরী ছিলেন।'

উমা রাগ করে বলে, মুখে আগুন তোমার। উমা নয় উমাশশী।'

মালিনী হেসে ফেলে বলে, 'তাই। উমাশশী নামে এক অপ্সরী ছিলেন। তার মেয়ের নাম উমা। মায়ের মত রূপবতী কন্যা, মায়ের মতই নৃত্যগীত পটীয়সী ছিল। অনেকের মতে মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল উমা রূপে এবং গুণে। মা মেয়েকে অপ্সরী করবার আগে সবদিক্ দিয়ে পারদর্শিনী করে তুলেছিলেন। ছেলেরা বড় বেশী পছন্দ পছন্দ করত উমাকে। সমস্ত আমোদ অনুষ্ঠানে উমার ছিল সর্বাধিকার। তাই একটা অহংকার জেগে ছিল উমার মনে। সকলেই যখন তার গুণ স্তুতিতে ব্যস্ত সকলের ওপর যখন তার অধিকার অপ্রতিহত, তখনই উমা আবিষ্কার করল যে সকলের বাইরেও একজন আছে সে অনন্ত। সারা গন্ধর্বরাজ্যে ঐ একটি মাত্র ছেলে যে তার গুণ স্তুতিতে এতটুকু ব্যস্ত নয়, যার ওপর তার বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। উমা আশ্চর্য হয়ে ভাবে, সারা গন্ধর্বলোক যার স্তবনায় ব্যস্ত, যার স্তুতিতে সদাসর্বদা, কি এমন আছে অনন্তর যার জোরে এসব সে উপেক্ষা করতে পারে। উমা কৌতূহলী হয়ে উঠে আর অনন্তর দিকে তাকিয়ে তার একটা দৃষ্টি মেলে রাখে।

অনন্ত যোয়ান ছেলে। তার মধ্যে কোন অহংভাব নেই। গন্ধর্বলোকের ছেলে মেয়েদের মত হৈ-হল্লড় সে ভালবাসে না। একটু ভাব প্রবণ ছেলে। সকলের কাছ থেকে একটু দূরে দূরে থাকতেই সে ভালবাসে। তাই অন্তরঙ্গতা সে কারো সঙ্গেই করে উঠতে পারেনি। তার প্রিয় ছিল তিনটে জিনিষ গান, বাঁশী আর তীর ধনুক। পাহাড়ে পাহাড়ে গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে আর শীকার করে ঘুরে বেড়াত অনন্ত। সে পেয়েছিল তার পিতার প্রকৃতি। পিতা অনন্তদেব ছিলেন প্রকৃতই সুধাকণ্ঠ সুগায়ক। যৌবনে অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন তন্বী তরুণী উমাশশীর। কিন্তু উমাশশী তখন গন্ধর্বরাজ প্রিয়া। অহংকারে গর্বে দিশেহারা। সামান্য লোক অনন্তদেব, তার প্রতি দৃষ্টি পড়বে কেন? তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রত্যাখ্যাত মর্মাহত অনন্তদেব বিবাহ করলেন তারাকে। তারাও সুধাকণ্ঠী; গন্ধর্বলোকে সুপরিচিতা। সব জেনে শুনে স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছিল অনন্তদেবকে। শুধু বিবাহ করেনি, সুখীও করেছিল তাকে। গন্ধর্বলোকে একদিন দু'জনে হয়ে উঠল আদর্শ দম্পতি। এদেরই ছেলে হ'ল অনন্ত। মায়ের রূপ আর বাপের গুণের অধিকারী হ'ল একসঙ্গে।

সেদিন পাহাড়ে পাহাড়ে আগুন লেগেছিল। লালফুলের ভারে পাহাড় রাঙা হয়ে উঠেছিল।

শিকার করতে বেরিয়ে অন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল প্রকৃতির শোভাতে। আর শিকার করা হল না তার। শিকার আর তীর ধনুক ফেলে রেখে পাহাড়ে হেলান দিয়ে বসে সুর তুলল বাঁশরীতে। পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে রাগিনী ফিরতে লাগল দিকে দিকে।

সেই পথ দিয়ে ফিরছিল উষা বন্ধুদের সঙ্গে জল কেলি ক'রে। মুখ তার আবেশে ভরা, তারই আবেশ লেগে রয়েছে হরিণ কালো চোখ দুটিতে। সুর সাথে উষা, সুরের জালে জড়িয়ে পড়ে থমকে দাঁড়াল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে। এ সুরকে সে চেনে, এ সুরকে সে জানে। এ সুরে তার বৃথা চঞ্চল মন শেষম খুলে দাঁড়ায়। অনেকবারই শেষম মেঘে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু সুর সৃষ্টিকারের নিষ্ঠুরতায় শেষম গুটিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে।

এক সময় সুর থামে। তার লহরীগুলি পাহাড়ে পাহাড়ে শিহরণ তুলে স্তব্ধ হয়ে যায়। উষা বৃথা দোদুল ছন্দে এগিয়ে আসে। চটুল চাহনী মেলে বলে, 'দেবতার সুরটি খুব মিষ্টি। এই সুরের জাল মেলেই শিকার ধরা হয় নাকি?'

অন্ত বাঁশীটি পাশে রেখে দিয়ে বলে, 'না। সুর দিয়ে শিকার হয় না, শিকার হয় শর 'দিয়ে।'

—সুর দিয়েও হয়। আমরা থাকলে দেখতে শরের চাইতে সুরের অমোঘতা কত বেশী।

—আমার জেনে কাজ নেই। যার আগ্রহ বেশী সেই আসুক। অন্ত উঠতে যায়।

উষা বাধা দেয়, 'ছিঃ. এমন করে উঠতে নেই ঠাকুর আর একটু বাজাও শুনি।'

—কি হবে শুনে?

—দেখি, সুরের অমোঘতা কত বেশী। সুরের জালে শিকার ধরা পড়ে কিনা।

অন্ত একটুখানি হাসে। স্থির দৃষ্টিতে উষার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'এমন ভর দুপুরে উষার উদয় হল কেন?

উষা চট করে উত্তর দেয়, 'সেত তোমার ধরার ঠাকুর। অমন মিষ্টি করে সুরটি না বাজালে অসময়ে উষার উদয় ত হ'ত না।'

—তা হ'ক। তোমাদের মত অবলাদের শিকার করার চাইতে ধরাই শিকার অনেক পুণ্যের। একটাও শিকার না করতে পারলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে।

—উঃ! তুমি এত নিষ্ঠুর? প্রাণী হত্যা না করলে তোমার আনন্দ হয় না?

—প্রাণী হত্যা নয়, শিকার। শিকার রাজকীয় ব্যাপার। সব রাজারাই শিকার করে থাকে।

—তুমি রাজা নও। তুমি শিল্পী! তোমার কাজ সৃষ্টি। সংহার নয়। তবে সংহার করতে চাও কেন?

অন্ত প্রসারিত দৃষ্টি মেলে উষার দিকে তাকায়। এমন পরিপূর্ণভাবে সে উষার দিকে তাকায়নি কখনও। কোমল মুখশ্রীতে করুণ দুটি চোখ টল টল করছে।

উষা একটু দৃঢ়ভাবেই বলে, না, 'শিকার তুমি করতে পাবে না।'

অন্ত অবাক হয়ে বলে, 'বাঃ, শিকারেই ত আমার আনন্দ। জান, যখন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বড় বড় বন বরাহগুলোকে শিকার করি, তখন আমার কত আনন্দ। এইসব সূচী মুখ, শিলিমুখ তীর, যার একটিতেই একটি বরাহ নিপাত যায়, এসব নিজ হাতে আমি তৈরী করেছি। এক যোজন দূর থেকেও আমার লক্ষ্য অব্যর্থ। তারা আমাকে এড়িয়ে পালাতে পারে না। তাদের সঙ্গে

সামনাসামনি মল্লযুদ্ধেও কত যে করতে হয়েছে তা বলা যায় না। আমার এই সুদৃঢ় বাহুর চাপে বাঘাযতীনের জিভ বার হয়ে এসেছে।'

উষা শিউরে উঠে। বলে, 'বল কি? কোন দিন তাদের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে প্রাণটা হারাবে যে?'

জয়ন্ত এক টুকরা হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তোলে। বলে, 'আশ্চর্য নয়। এ আমার নেশা।'

—এ সর্বনেশে নেশা তোমরা ছাড়তেই হবে। জান জয়ন্ত, তোমার মধ্যে এক অনন্ত সাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে রয়েছে। অনর্থক ব্যায়ামবৃত্তি না করে সে প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলছ না কেন?

জয়ন্ত চুপ করে থাকে। উষা মনে করে, মৌন সম্মতি লক্ষণং। জয়ন্তর মন বুঝি সত্য সত্যই ফিরেছে। সে বোধ হয় ফেরাতে পেরেছে। মনটা খুশিতে ভরে উঠতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই ফুল ভেঙে যায় যখন জয়ন্ত বলে, বেশ এতক্ষণ তোমার উপদেশ শুনলাম। এবার আসি তা হলে।'

উষা রাগ করে বলে, 'মূর্খকে উপদেশ দিতে নেই। তুমি একটি নৃশংস অবতার। নৃশংস নয়, নৃসিংহ অবতার।' জয়ন্ত উপেক্ষার হাসি হাসতে হাসতে চলে যায়। উষা দুচোখে অনল বর্ষণ করে ফুলতে থাকে।

আবার তাদের দেখা হয়।

উষা ফিরছিল এক নাচের আসর থেকে। অঙ্গে অঙ্গে নাচের সাজ। ফুলের আভরণে উত্তরীয় ঢাকা। পায়ের ঘুঙুর বেজে চলেছে রুনু রুনু তালে। অকস্মাৎ সে তালে ছেদ পড়ে। সামনে এসে দাঁড়ায় জয়ন্ত। হাতে সেই তীর ধনুক, মুখে সেই উপেক্ষার হাসি। বলে, 'তোমার নাচের পা আছে। তবে বড় চটুল। একটু সহনশীল শিক্ষার প্রয়োজন। সেটুকু অর্জন করলে নাম করবে।'

রাগে উষার সর্ব শরীরে জ্বালা ধরে যায়। তার নাচের খুঁত আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে সাহস করেনি। এক অর্বাচীন এসে ধরবে তার নাচের খুঁত! দাঁতে ঠোঁট চেপে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে, 'ধন্যবাদ, আর কিছু?'

—না। থাকলেও বলা উচিত নয়।

—কারণ?

—তোমার ঠোঁট দিয়ে তা হলে রক্তের ধারা বইবে। এমনিতেই যা করেছ তাইতেই সে আমি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে।

উষা একটু অপ্রতিভ হয়ে ঠোঁটের উপর থেকে দাঁতের চাপ সরিয়ে নেয়।

তুমি আমার নাচ দেখেছ?

—ইচ্ছে করে দেখিনি। ওখানে আমাদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। মায়ের আদেশে একবার গিয়েছিলাম ওখানে। দেখলাম আমার সুরের সঙ্গে তোমার পা মিলছে না।

—তালকাটা সুরের সঙ্গে পা মেলে না। মেলা উচিত নয়। সেটা পায়ের দোষ নয়।

—সুরের দোষ! হুঁ! অন্য কেউ একথা বললে তার কাণ মলে দিতাম আমি।

—কী! স্পর্ধা! উষা বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু ততক্ষণে জয়ন্ত পাশ কাটিয়ে চলে যায় দূরে।

এবার তাদের দেখা হয় একটি রাজকীয় মেলায়। উষা এসেছিল উৎসবের সাজে অঙ্গভূষণ পরিবৃত হয়ে। জয়ন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিল নিঃসঙ্গ, চোখে কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে। তাকে অনুসরণ করে

কিরছিল যে অপ্সরী মেয়েটি তাকে উষা চেনে। নাম তার মদনিকা। ঘৃতাচির মেয়ে, যে ঘৃতাচি একদিন রাজ সভায় প্রেঃ আসনের অধিকারিনী ছিলেন। মদনিকা অপ্সরী কন্যা। কিন্তু বীরাঙ্গনা। তীর ধনুক চালনায় কুশলী। একবার একটা বরাহ নাকি শিকার করেছিল তীর মেরে। উষা সইতে পারে না। কেন যেন মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করে। একসময় নিজের বলবল ত্যাগ করে একেবারে এসে দাঁড়ায় অনিরুদ্ধর সম্মুখে বলে, 'বরাহ শিকার ছেড়ে তুমি এখানের শিকারে যাও নি? কটা শিকার হ'ল? উষার কণ্ঠে একটু শ্লেষ।'

উষার দিকে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ বিস্মিত হয়। পরক্ষণেই খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠে, 'নাঃ, শিকারে আমি যাইনি। কিন্তু তোমাকে যে এখানে দেখবো এ আশা করিনি।'

—তুমিও এসেছ তা হলে?

—কেন, অন্যায় করেছি কিছু?

—না, মেলায় যার খোলাস সকলের জন্য। তুমি ত সকলের বাইরে নও, তবে অন্যায় করবে কেন? কদিন ধরেই তোমায় খুঁজছি একটা কথা বলবার জন্য। আমায় অভিনন্দন গ্রহণ কর তুমি?

উষা বিস্মিত হয়। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এ কথার অর্থ?

—সেদিন ঠিকই বলেছিলে তুমি। আমারই সুর ছিল তাল কাটা। নিজের খুঁত ধরতে না পেরে খুঁত ধরেছিলাম তোমার নাচের।

—কিন্তু নিজের খুঁত ধরা পড়ল কি করে?

—ধরিয়ে দিল মা। বলল, উষার নাচের তাল কাটতে পারে না। সুর কেটেছে তোর। তোমার নাচের ওপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস। বলে অমন নাচ কটা মেয়ে নাচতে জানে, আমি কি দেখিনি।

উষার চোখ নত হ'য়ে আসে। বলে, 'তুমি মেনে নিলে মায়ের কথা?'

—বাঃরে! মা ভুল করতে পারেন! সত্যিই সেদিন তোমায় এমন রূঢ় কথা শুনিয়ে অন্যায় করেছিলাম আমি।

আনত মুখী উষা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ভুল কার হয়েছিল জানি না। কিন্তু আমি ত তোমায় বলেছি অনিরুদ্ধ, তোমার মধ্যে অপূর্ব প্রতিভা লুকান রয়েছে, ব্যাধবৃত্তি করে সে প্রতিভার অপচয় হ'তে দিও না।'

অনিরুদ্ধ উত্তর দেয়, 'সকলের মুখেই ঐ এক কথা প্রতিভা, প্রতিভা। আমি প্রতিভাবর।'

উষা ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে, 'সকলে মানে? আর কে বলে?'

—তোমার মত অনেকেই বলে। নাম করব কার। এতক্ষণ মদনিকাও ঐ কথা বলছিল। উঃ মেয়েটা বক বক ক'রে কি বকতেই না পারে। বলছিল, আমার মত তীরন্দাজ সে নাকি কখনও দেখেনি। একদিন আমার সঙ্গে শিকারে যেতে চায়। কবে সেও নাকি এক বরাহ শিকার করেছিল সেই গল্প শোনাচ্ছিল আমাকে।'

উষা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'মদনিকা কি বলে জানিনা না কিন্তু আমি জানি অনিরুদ্ধ, এ ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ না করলে, তোমার প্রতিভা বিকাশ হবে না আর এ ত্যাগ করতে তুমি পারবে না।'

অরন্ত বলে, 'তুমি ভুল বুঝেছ উষা। ব্যাধ বৃত্তি আমার পেশা নয়, ও আমার নেশা। দ্বিতীয় আর কোন নেশারই আমি বশীভূত নই। তবে এ নেশা ত্যাগ করলেও আমার প্রতিভা বিকাশ হবেনা।'

—হবে না? কেন?

—প্রতিভা বিকাশের জন্যে প্রেরণা চাই। এ প্রেরণা যোগাবে কে? আমি চিরদিনই নিঃসঙ্গ। নিজের প্রেরণা নিজে যোগাবার পারঙ্গমতা আমার নেই। উৎসাহও বোধ করি না। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? একটু যদি উৎসাহ পাই কারো কাছে হয়ত অনেক কিছু গড়ী উৎরে যেতে পারি আমি। কিন্তু কে কে দেবে সেই উৎসাহ সেই প্রেরণা? উষা নির্নিমেষ চক্ষে অরন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'একটা কথা বলব বিশ্বাস করতে পারবে তুমি?'

অরন্ত বলে, 'অবিশ্বাস আমি কারোকে করি না। সকলকেই বিশ্বাস করি।'

—যা বলব পারবে?

—অন্যায় না হলে, না পারবার কারণ কিছু নেই।

—বেশ, আমি তোমার প্রেরণা যোগাব, তোমার প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করব। তুমি শুধু আমার নির্দেশকে অবহেলা কর না।'

তারপর থেকেই উষা এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করল আর তার অধিবাসী করল অরন্তকে। দুজনে মিলে এই জগতে শুধু সুর আর সুর আর সুরের সৃষ্টি করে চলল। দিনে, দুপুরে গোধূলি লগ্নে যখন তখন অরন্তর বাঁশীর সুর পাহাড়ে পাহাড়ে মুহিত হয়ে ফিরতে লাগল আর সেই সঙ্গে মুখর হয়ে উঠল উষার পায়ের নূপুর। শুনে যুদ্ধ হ'ল অনেকেই আবার ঈর্ষায় ক্রুদ্ধও হ'ল কেউ কেউ। কিন্তু এই যুদ্ধের আর ক্রুদ্ধের রাজ্য পার হয়ে উষা অরন্তকে নিয়ে গেল আর এক রাজ্যে যেখানে কেউ তার নাগাল পেল না।

তারপর একদিন এই সুখী আর স্বাধীন বিহঙ্গম দুটির মাঝে দুর্দিন এসে দেখা দিল। বিধাতা বোধ হয় প্রেমিক নন তাই প্রেমের প্রতি ঈর্ষা তাঁর চিরদিনের। এই দুই প্রেম বিহল কুরঙ্গ কুরঙ্গী কারোর অনিষ্ট না করে সর্বত্রের আনন্দ বিতরণ ক'রে ঘুরে বেড়াত পাহাড়ে পাহাড়ে। একদিন বজ্র-পাত হয়ে গেল তাদেরই মাঝে। পাণ্ডবেরা তখন দিন কাটাচ্ছিলেন বনবাসে। সেই সময় কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে প্রবল পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের। কৌরবেরা যখন পরাজিত হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল দিকে দিকে, সেই সময় তাদেরই বাহিনীর এক অর্বাচীন সেনাপতি হংসধ্বজের দৃষ্টি পথে ধরা পড়ে যায় উষা। তখন অপরাহ্ণ বেলা। উষা তার অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে, এক নতুন সুরে নূপুরের তাল তুলে চলেছিল অদূরবর্তী পাহাড়ে যেখানে অরন্ত অপেক্ষা করছিল তারই জন্যে। কথাছিল আজ অরন্ত তার প্রতিভার পরিচয় দেবে বাঁশীতে নতুন নতুন সুরের জাল বুনে আর উষা তাকে অভিষেক করে নেবে সেই সুরেরই তালে তালে নৃত্যের অবাঙ্ মুখর অভিনয় করে।

রূপমুগ্ধ হংসধ্বজ এসে দাঁড়াল উষার পথ রোধ ক'রে। বলল, 'কৌরবের সেনাপতি আমি। তোমাকে নিয়ে যাব হস্তিনায়। পাটরাণী করে রাখব সেখানে।'

রাগে উন্মত্ত প্রায় উষা কটূক্তি করে হংসধ্বজকে। একের মিনতি, অপরের কটূক্তি শেষ পর্যন্ত চরমে পরিণত হয়। হংসধ্বজ বলপূর্বক আকর্ষণ করে নিয়ে চলে উষাকে। যদিনিকার মত উষা বীরাঙ্গনা নয় কিন্তু কাপুরুষ হংসধ্বজের তুলনায় সে বীরাঙ্গনা। তাই তারই অস্ত্র কেড়ে নিয়ে

সিংহীনীর বিক্রমে তাকে আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। সেনাপতির আর্তনাদে সৈন্যরা ছুটে আসে। বিপন্ন বুঝে উষা ডাক দেয় অনঙ্গকে। তারপর সেইখানেই সুরু হয়ে যায় কুরুক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। তফাৎ এই যে এখানে ধর্মের জয় না হয়ে হ'ল অধর্মের জয়। উষাকে পাশে নিয়ে জয়ন্ত যুদ্ধে ছিল সিংহবিক্রমে। কিন্তু সে একা, সঙ্গে নারী। তার ওপর অস্ত্রবলও তার পর্যাপ্ত নয়। সংখ্যাধিক্য শত্রুর সঙ্গে সে বুঝতে পারল না বেশীক্ষণ। অনেক বৈরী নিহত করে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে শেষ পর্যন্ত চলে পড়ল মাটির ওপর। আর উষা? সমস্ত শরীর তার রক্তে ভেসে গিয়েছে। জয়ন্তর ওপর অনেক আঘাতই সে আপন শরীরের ওপর গ্রহণ করেছে। যেখানে যত অস্ত্র পেয়েছে দুহাতে জয়ন্তকে ঘুরিয়েছে। তাকে ভরসা দিয়েছে, শত্রু নিধনে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু জয়ন্তর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভেঙে পড়ল। আছাড় খেয়ে পড়ল তার দেহের ওপর। মুহূর্তের জন্যে তাকে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। তারপরই স্থির হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

খবর পৌঁছুতে দেরী হল না গন্ধর্ব রাজ্যে। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন কড়া আদেশ দিলেন সব বৈরী নিপাত করতে আর হংসধ্বজকে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলতে। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। শুধু হংসধ্বজকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল না। শেষ মুহূর্তে উষার কৃপাণের এক চরম আঘাতে তার তরলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। সুতরাং তার মৃত দেহটাই মাটিতে পুঁতে ফেলা হল। তারপর সেই ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ গন্ধর্ব সেনারা সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল কৌরব বাহিনীর উপর এবং শেষ পর্যন্ত তাদের হতমান করে কি অবস্থায় করেছিল সে কথা লেখা আছে মহাভারতে। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডবেরা এসে তাদের আতিকুল সব বাঁচায়।' কাহিনী শেষ করে মালিনী থামে।

মনে পড়ে যায় মহাভারতের কাহিনী। বনপর্বে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। যুদ্ধ হয়েছিল গন্ধর্বদের সঙ্গে এবং সে যুদ্ধে কৌরব বাহিনীর কি যে শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল তাও লিপিবদ্ধ করা আছে সেখানে। এর পিছনে যে এক অপূর্ব কন্যার বিচিত্র কাহিনী জড়িত আছে এ কথা জানবে কে?

মালিনী আবার বলতে থাকে, 'সেদিন সারা গন্ধর্বদেশে শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল এই দুই বীর তরুণ তরুণীর জন্য। রাজাদেশ হ'ল, শুধু বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতেও উত্তর পুরুষেরা যাতে এদের দেখে প্রেরণা লাভ করতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা করতে হবে। তাই ভূবারের মন্দির গড়ে, ভূবার শিলা তলে এমন স্থানে তাদের সমাধি রাখা হ'ল যেখানে ভূবারের অভাব কোনদিনই হবে না। আর এই দিনটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্যে সারা গন্ধর্ব রাজ্যে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হ'ল। সেই থেকে এই দিনটিতে সমস্ত গন্ধর্বরাজ্যে উৎসব চলে আসে যুগ যুগ ধরে। আগে এ উৎসবের কি নাম ছিল জানা যায় না কিন্তু এখন উৎসবের নাম হয়েছে রতি উৎসব। নব দম্পতীরা আসে তাদের ভালবাসা স্থায়ী হবার কামনা নিয়ে। তরুণ তরুণীরা আসে তাদের ভালবাসা মুদ্রিত হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এদের মন্দির স্পর্শ করে তারা শপথ করে, আবার এদের সাক্ষ্য রেখে তারা গন্ধর্ব বিবাহেও প্রবৃত্ত হয়। অপর লোকের ছেলেমেয়েরা যখন যজ্ঞের বেলায় যাতে তখন কায়মনবাক্যে এদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কোন বাপ মা-ই তাদের বাধা দেন না। অপর লোকের কাছে এরাই আজ রতি দেবতা। আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বাবুজি যে এ দেবতার দর্শন লাভ আপনি করেছেন। আমাদের সে সৌভাগ্য কিন্তু কোন দিনই হবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালিনী থামে।

বলি, 'এ যে সত্যই আমার সৌভাগ্য এ আমি অস্বীকার করি না। একে ঘিরে আমার স্বপ্ন অনেক দিনের। সে স্বপ্ন আমার সার্থক হ'য়েছে শুধু সাবুদির কৃপায়। তাঁর কৃপা না পেলে এ সম্ভব হ'ত না। আর আমি যে এতদিন মর্ত্যলোকে বিরাজ করছি এও সম্ভব হ'ত না! তিনি মহান।' বলে ভক্তিভরে দু-হাত জোড় করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করি।

আমার দেখাদেখি তারাও দুজনে সাবুদির উদ্দেশে প্রণাম করে।

উমাকে উদ্দেশ করে বলি, 'এমন সুন্দর কাহিনী, তুমি বুঝি কিছু জানতে না উমা?'

—জানব না কেন বাবুজি, এত আমাদের ঘরের কাহিনী। এ কাহিনী এ দেশের সব ছেলে মেয়েরাই জানে।

—কিন্তু একটা কথাও বলনে না, লক্ষ্মী মেয়েটির মত শুনে গেলে সব।

উমা বলে, 'বক্তা একজনই হয়, শ্রোতা বহুজন। তা না হলে বলেও আরাম নেই, শুনেও সুখ নেই।'

কথাটা সত্য। আর মালিনী যেমন সুললিতভাবে কাহিনীটি বলে গেল, অমনভাবে কজনই বা বলতে পারে। সেই কথাটাই ভাবছিলাম, এমন সময় উমার প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠি।

—অপ্সরী মেয়ের কাহিনী কেমন লাগল বাবুজি?

—মন্দ বলব কেন, ভালই লেগেছে। তবে উমার জন্যে দুঃখ হয়।

—হয়? আশ্চর্য ত?

—আশ্চর্য কেন? একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি।

—কেন? বিগত যুগের কোন এক উমা তার দুঃখে চিত্ত বিগলিত হ'ল কিন্তু আর কারও জন্যে ত সে চিত্ত বিগলিত হ'ল না। এমন উমার ত অভাব কিছু নেই এ যুগেও। তবুও ত উমার বাসনা চরিতার্থ হয়েছিল। সে চেয়েছিল যা পেয়েও ছিল তা। ভালবাসার পাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অহর্নিশি মিলন করতে করতে প্রাণ দিয়েছে, সে জন্যে দুঃখ করবার ত কিছু নেই। কিন্তু যাদের ভাগ্যে তা জোটে না, এমন কি ভালবাসার পাত্রের পাশে দাঁড়াবারও সৌভাগ্য হয় না, তাদের জন্য কি হয়?

উমাকে নিয়ে মুস্কিল। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কাহিনীতে আমাকে নিয়ে আসতে চায় বার বার। ভারী বিব্রত বোধ করি। সময় সময় মালিনী আমায় তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এখন সেও কেমন যেন নির্বাক। তাই অস্বস্তির একটা ভাব ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। ভিতরে ভিতরে একটা উত্তরের আশায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় উমাই আবার বলল, 'উমা অপ্সরী কন্যা, নেচে গেয়ে বেড়াত সে। কিন্তু অমৃতের স্পর্শ পেয়ে সেও খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে স্বর্গ নীড় রচনা করতে চেয়েছিল অমরকে নিয়ে। এ কামনা শুধু উমার একার নয়। এ মেয়েদের শাশ্বত কামনা। সব মেয়েরই মনের মানুষকে নিয়ে নীড় রচনা করবার বাসনা থাকে।'

উমার বলার ভঙ্গিমা দেখে মনে হ'ল মালিনী, যেন একটু নড়ে চড়ে বসল। আমার অস্বস্তিটা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল। তাই কথার মোড়টাকে ঘোরাবার জন্য সচেষ্ট হলাম। বললাম, বেশত উমা তোমার যদি নীড় রচনা করবার ঐকান্তিক বাসনা হয়ে থাকে, তাহলে আমি থাকতে থাকতেই তোমার বাবাকে বলে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাই। চ্যাং যদি তোমার মনের মানুষ হয়—।'

'থামো বাবুজি, রসিকতা করে সব কিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব জেনে শুনে যারা রসিকতা করে তারা ভণ্ড।'

মালিনী ব্যাকুল হয়ে উঠে আসে। দু-হাত দিয়ে উমার মুখখানা চেপে ধরে ওঠে, 'উমা! উমা! কাকে কি বলছ তুমি! বাবুজি যে আমাদের অতিথি।' উমা মালিনীর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, জানি, বাবুজি আমাদের অতিথি। অতিথির কাপড় কিছু করব না। কিন্তু তাই বলে—।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, বৃষ্টি থেমে গেছে, আমি যাই। মা হয়ত এতক্ষণ খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিয়েছে।' বলে সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে ঘর থেকে বার হয়ে যায়। মালিনীকে এতটুকু সময় দেয় না তাকে ফিরিয়ে আনবার।

অপরাধীর মত মুখ করে বলি,,'কি কাণ্ড দেখত?'

মালিনীও অপ্রস্তুতে পড়ে। অপ্রস্তুত ভাবেই বলে, 'ওটা চিরকালই ভাবপ্রবণ। তার ওপর একটু আদর পেয়েছে বেশী। ওর কথায় আপনি কিছু মনে করেন না বাবুজি। একেবারে ছেলে মানুষ।'

এরপর আসর জমে না। জমাবার চেষ্টাও করেনা। মালিনীর সান্নিধ্যে এই প্রথম মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ দেখা দেয়। কেমন যেন মনে হয় মেয়েটিই যেন উমা। অতৃপ্ত কামনা তার আজও মেটেনি। তাই আবার জন্মগ্রহণ করেছে এই পার্বত্য প্রদেশে। এবারও যে মিটবে, মনে হয়না নিষ্পাপ কুমারী মনটা তার বিষিয়ে দিয়ে গেলাম আমি।

পার্বত্য প্রদেশে বৃষ্টিও যেমন নামে মুষল ধারায়, জ্যোৎস্নাও তেমনি ফুটে উঠে সহস্র ধারায়। এই একটু আগে যে এত বৃষ্টি হ'য়ে গেল, আকাশের দিকে তাকালে তা বোঝা যাবেনা। সেখানে নক্ষত্র খচিত আকাশ আর তারই কোল বেয়ে ঝিনঝিনে জ্যোৎস্নার অমিয় ধারা। দুচোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তখন আমার চোখ জুড়ান বা মন জুড়ান অবস্থা নয়। উমা মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সুরু করে দিয়ে গেছে। তারই হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য মালিনীকে আস্তে আস্তে বলি, তোমারও হয়ত এবার খোঁজ পড়বে মালিনী। আর রাত করা উচিত হবে না।

মালিনী কথাটা মেনে নেয়। উঠে পড়ে বলে, 'আসি বাবুজি।'

বলি, 'এস মালিনী।'

মালিনী যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে বাইরে এসে আপনি আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। আমি যেতে পারব ঠিক।' বলতে বলতে সেও ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নার মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রফেসর চাটার্জি সিগারেটে সজোরে একটা টান দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'আই সিটি ইউ সুব্রত। এত কাছে এসেছিলে তোমরা তিনজনে অথচ নাগাল পেলে না কেউ কারও। এর চেয়ে পরপুরুষের কাছে মেয়েরা আর কত স্পষ্ট হতে পারে। একজন পরিপূর্ণ নারী তার নীড় বাঁধবার আকাঙ্খা তোমায় খোলা খুলি ভাবে জানাল আর তুমি তার স্বপ্নের নীড় ভেঙে দিয়ে চলে এলে।'

বলি, 'এত উমার কথা। মালিনীও কোন কথা বলেনি আমায়।'

প্রফেসর বলেন, 'মালিনী সচেতন, মালিনী ধীর। সে তার গোপন নীড় রচনা করে চলেছিল মনে মনে অতি সাবধানে। উমা বাচাল, তাই সে তার নীড় রচনার কথা গোপন রাখতে পারেনি। তবুও আর উমার প্রীতি মধুর সংস্পর্শে এসে এক আবেগ মুখর মুহূর্তে সে নিজেকে প্রকাশিত করে ফেলেছিল।'

শান্তনু সবিস্ময়ে বলে উঠে, 'এ তুমি জানলে কি করে? এও কি তোমার থার্মোডাইনামিক্স এ লেখা আছে নাকি?'

প্রফেসর বলেন, 'না। এ থার্মোডাইনামিক্স্ এর কথা নয়, এ তোমাদের 'হর্মডাইনামিক্স্'। যার কার্য কারণ তোমার মতে অতি সূক্ষ্ম এত সূক্ষ্ম। যে, কোন নিয়ম কানুন, আইনের গণ্ডী এ মেনে চলে না। আর মানে না বলেই থার্মোডাইনামিক্স এর মতে যা ছিল করুনীয় মালিনীর, সেই কাজ করে বসল উমা। মালিনীর স্বপ্নের নীড় উমার জীবনের রূপ নিল! নিজেই প্রকাশ করে ফেলল, তার নীড় বাঁধার কথা।

—কিন্তু এ আমি ভাবতে পারিনি প্রফেসর। উমা জানত তার পিসীর মনোভাবের কথা। এই ইঙ্গিতই সে বরাবর দিয়ে এসেছে আমাকে। প্রফেসর হেসে বলেন, ঐটাইত 'হর্মডাইনামিক্স্ এর নিগূঢ় রহস্য। এমনটি কোথাও খুঁজে পাবেনা তুমি। সে যতক্ষণ মিডিয়ম্ বেছে নিয়েছিল পিসীকে। তাকে সম্মুখে রেখে নিজের অন্তরকে উদ্ঘাটিত করছিল তোমার কাছে। কিন্তু যে মুহূর্তে জানল, যথার্থ ই তুমি চলে যাচ্ছ তার সব নাগালের বাইরে, তখন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সব আগল খসিয়ে ফেলে মিডিয়ামের আশ্রয় ত্যাগ করে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলল।'

শান্তনু বলে, 'হয়ত এ-ও সত্য। তোমরা বৈজ্ঞানিকের তথ্য-সন্ধানীর দৃষ্টির কাছে সব রহস্যই ধরা পড়ে। এ দৃষ্টি আমাদের নেই বলেই এসব রহস্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।'

—না পড়বার কারণ, তোমরা অন্ধ। মনসিজ তার ঝোঁয়াটে রাখো ভক্ত প্রজাদের দৃষ্টি প্রতিহত করে রেখে দিয়েছেন। সেখানে এসব ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব কম।

—অবাক করলে প্রফেসর। পদার্থ বিজ্ঞানের চর্চা। মনসিজের খবর তোমার কাছে পৌঁছল কি করে?

—পৌঁছেছে। কথাটা অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য। থার্মোডাইনামিক্স্-এর চর্চা করি। সে স্থান নিষ্ফল। সেখানে মনসিজের মাথা গলাবার সাধ্য নাই। কিন্তু মনসিজের শতেক ছিদ্র। সেখানে থার্মোডাইনামিক্স এর মত সূক্ষ্ম জিনিষ অনায়াসে মাথা গলাতে পারে। তারই প্রভাবে দেখলাম তপস্বিনী উমা শিব সাধনায় মগ্ন। তাইত বলতে পারলাম, 'তোমার জন্যে দুঃখ হয় শান্তনু, এত কাছাকাছি এসেও নাগাল পেলে না কারও।'

শান্তনু বলে, 'এখানে নাগাল পাওয়াটা খুব একটা কৃতিত্বের ব্যাপার ছিলনা প্রফেসর। এ আমার অপারগতা নয়, এ বিবেকী মনের সঙ্গে অন্তর্যামী যুদ্ধ ঘোষণা। দুপ্রাপ্য জিনিষ অথচ কত না সহজলভ্য। যা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করখানি যে মর্মান্তিক তা অন্তর্যামীই জানেন। দিনের পর দিন কত বিকত হয়ে গেছি তবুও নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। এই হারিয়ে না ফেলার মধ্যে আছে দুটি শিরিষদীর নির্মলতা আর বিশুদ্ধতা। এইটাই আমার সাধনা।

—তোমার ত সাহস। কিন্তু গিরিনদীগুলির কি? তাদের কথা ভেবে দেখেছিলে না সময় ছিল না?

—সময়ের কোন অভাব ছিলো না প্রফেসর। কিন্তু পরিবেশটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না তুমি। সেই অমন্ত উষার পর তাদের কোন চিন্তাই মনের মধ্যে স্থান পাবার পারে না। শরতের লঘু পক্ষ মেঘের মত অনিদিষ্ট ভাবে ভেসে বেড়ায় এদিক ওদিক। কিন্তু যাবা ত্রিশূল নাথের কৃপায় ঐ একটিমাত্র চিন্তা মনের এক কোণে ঠাঁই করে নিয়ে অনড় হয়ে রইল আর বিবেকী চেতনাকে সতর্ক করে দিল। সেই আমায় জানিয়ে দিল তোমার যেমন পূর্ণ চরিতার্থ করবার জন্য গিরিনদীগুলির জল ঘোলা করবার অধিকার তোমার নাই। তাতে জল ভাল হবে না।

প্রফেসর বলেন, 'সত্যই ভাল হ'ত না শান্তনু। শান্ত গিরি নদীতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল তার জন্য দায়ী তুমি নয়, অপরাধিও তোমায় হয়নি। জল ঘোলা করাটাই হত অপরাধের। কিন্তু গিরি নদীর পরিণতি হলকি?'

সুদূর প্রসারী পরিণতির কথা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি প্রফেসর। তবে আশু পরিণতি যা হ'ল তা সত্যই হৃদয় বিদারক।

প্রফেসরের মুখের ভাষায় কোন প্রশ্ন ফুটে উঠল না। কিন্তু দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে প্রশ্ন ফুটে উঠল তারই জবাবের শান্তনু বলে চলল 'এর পর আরও দুটো দিন কেটে গেল। শরীরটা ভাল ছিল না জানতে পেরে যাওয়াটা মালিনীই স্থগিত করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'কাজ নেই গিয়ে। শরীরটা যখন সুস্থ নয়, তখন নাই বা গেলেন আরও দুটো দিন। দাদাকে বলে যাওয়াটা পেছিয়ে দেব আমি।'

একটু লজ্জিত হয়ে বলি। 'এ ভাল হবে না মালিনী। কি মনে করবেন তিনি।'

—কিছু না। তিনি জানেন আপনি খুব সুজন। তিনি নিজেও রাজি হবেন না অসুস্থ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এতখানি পথ পাহাড় ঠেঙিয়ে যেতে।

হয়ত ঠাণ্ডা লেগে ছিল। পাহাড়ী ঠাণ্ডা কখন যে লাগে বোঝা যায় না। শরীরটাকে কিছুটা কাবু করে ফেলেছিল। মালিনীই যা কিছু করবার সব ব্যবস্থাই করে দিল। কিন্তু আশ্চর্য! এ দুদিন উষার টিকি দেখা গেল না একটিবারও। ইচ্ছা করেই মালিনীকে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিনি। হয়ত সেও এড়িয়ে গেল প্রসঙ্গটিকে। মালিনীর সব ব্যবস্থা নিখুঁত। তার যাওয়া আসাও নিয়মিত। সুতরাং অসুবিধে হল না কিছু।

কিন্তু দুটো দিনের পর তিনটে দিন কাটল না। কাটতে দিল না মালিনীই। আগের দিনও জানতে পারিনি যে এ পর্বত রাজ্যে বাসের মেয়াদ আমার ফুরিয়ে আসবে কালই। তাই নিশ্চিন্ত মনেই আগের দিন শয্যা আশ্রয় করেছিলাম। কিন্তু ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে দরজা খুলে সামনে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে আছে মালিনী-আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে। শুধু পার্বত্য জ্যোৎস্না ধারায় মুখের একাংশ দেখা যাচ্ছিল তার। সবিস্ময়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সে-ই ইঙ্গিতে নিষেধ করে দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। তারপর নিঃশব্দে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল। ঘরের কোণে হ্যারিকেন জ্বলছিল। সিখাটিকে কিছুটা উস্কে দিয়ে তারই আলোতে মালিনীকে দেখলাম। চপলা পার্বত্য দুহিতার যেন কি হয়েছে।

বিষণ্ণ ম্লান মুখ। মনে হল বিনিদ্র রজনী যাপনে চোখ দুটি ক্লান্ত। চুলগুলি উস্কখুস্ক। মাথার খুড়ি খুলে দু-হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলিকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙাতে হ'ল বলে আমি ভারী লজ্জিত বাবুজি। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না আমার। বিস্ময়ের ঘোর তখনও আমার কাটেনি। প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপার কি?'

মালিনী একটু থেমে, একটু দম নিয়ে বলে, 'আপনার শরীর ভাল নয়, আমি জানি। আরও যে দুটো দিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার এও আমার না জানবার কথা নয়। কিন্তু তবুও আমায় বলতে হচ্ছে আপনি যান। এ পর্যন্ত রাজা ছেড়ে, আমাদের এই শান্তির নীড়টুকু ছেড়ে আপনি চলে যান আপনাদের লোকালয়ের মাটির পৃথিবীতে। শুধু এইটুকু বলবার জন্যে এত রাতে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।'

হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যে আমাকে চলে যাবার জন্য তাগিদ দিতে ছুটে আসতে হয়েছে মালিনীকে এত গভীর রাতে। অথচ কালও সে জিদ করে আমায় ঘরে রেখেছিল এখানে আরও দুটো দিনের জন্য, শরীরটাকে আর একটু সারিয়ে নিতে। সেই কথাটাই মনের মধ্যে। তোলপাড় হচ্ছিল এমন সময় সেই আবার বলল, 'দোষ আপনার নয় বাবুজি। আমিই আপনাকে জিদ করে আটকে রেখেছিলাম। রেখে ভাল করিনি।'

বলি, 'হয়ত ভাল করনি। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাও ত খুলে বলছ না মালিনী?'

মালিনী নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল ঘরের ভিতর জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে। এখন মুখ ফিরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলছি। কিন্তু বলাটা যত সোজা ভেবেছিলুম, এখন দেখছি ততটা সোজা নয়। বেশ বুঝছি, আপনার দোষ কিছু নেই, কিন্তু তবুও সব দোষটাই আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি। বাবুজি, আপনি চলে যান, প্রাণ ভরে একথা বলতে আমার মন চাইছে না কিন্তু উমার ইষ্টের কথা ভেবে না বলেও পারছি না।'

কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। তবুও কোনমতে বলি, 'কি বলছ তুমি মালিনী?'

—উমার কথাই বলছি বাবুজি। সারারাত এতটুকু ঘুমোয় নি। আমাকেও ঘুমোতে দেয়নি। শুধু কেঁদেছে।

—কেঁদেছে? কেন?

—মেয়েদের মন, তার অন্তরে কত যে খেলা, কত যে মেলা আর কত যে বেসাতি আপনারা বুঝবেন না। উমার অন্তরে যত ঘরেছে আর সে যত ঘুসিয়েছেন আপনি।

—আ-মি!

—তার কান্নার যদি কোন অর্থ থাকে, তাহলে বলব, আপনি! শুধু আপনার কথাই সারারাত সে বলেছে। নিজেকে উমা আর আপনাকে অন্তর ভেবে সে এতখানি ভয় হয়ে উঠেছে যে এ থেকে তাকে নিবৃত্তি না করলে তার পরিণাম মঙ্গলময় হবে না। আমার যত অনিষ্টই হ'ক আমি সইতে পারব। কিন্তু উমার অনিষ্ট আমি সইতে পারব না। তাইত মুখ ফুটে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি যান, আপনাকে আর ঘরে রাখব না আমি।

শুনে স্তব্ধ হয়ে যাই। একটু পর বলি, 'উমা তোমায় কি বলেছে মালিনী আমি জানি না। কিন্তু আমার দ্বারা তোমাদের কোন অনিষ্ট হ'ক এ আমি চাই না। আমি যাব সকালেই আমি এ স্থান ত্যাগ করে চলে যাব।'

—তাই যাবেন। যাহাকে আমি যেমন করে হ'ক রাজি করাব। তিনি বাধা দেবেন না।

—তোমরা আমার পরম উপকারী বন্ধু। আমার প্রাণ দিয়েছ এ কথা আমি কোনদিন ভুলব না। কেন এমন হ'ল আমি জানি না। আমার দুর্বলতা যে কোথায় এ কদিনের মেলামেশায় সেকথা অন্ততঃ তোমার অজানা নেই। বুঝি বিশ্বাস কর মালিনী, উষার প্রতি এতটুকু অন্যায় আমি করিনি। সেখানে কোন দুর্বলতাই আমার নেই।

—জানি। আমিও কোনদিন ভাবিনি যে সব জেনে শুনেও সে এমন বোকামি করে বসবে। অথচ কাল রাতে সেই কথাই সে বলল আমায়। বলল, 'বাবুজির মনকে আমি জানি। কিন্তু নিজের মনকে আমি কিছুতেই বশে আনতে পারছি না দিদি। আমি পাগলা হ'য়ে যাব।' মনে মনে বললুম তার আর বাকি কি? মুখে বললুম আমি তোর মঙ্গল কামনা করি উষা। আমার কাছে লুকোসনে বল, এ সম্ভব হ'ল কি ক'রে। তোর ত জানতে বাকী ছিল না কিছু তবে সব জেনে শুনে এ বোকামি করতে গেলি কেন?

এর উত্তর কি দেবে সে। দু-চক্ষের ধারায় ভেসে গেল। সারারাত না ঘুমোল নিজে, না দিল ঘুমোতে আমায়। মালিনী একটু হাসে। তারপর আবার বলে, 'উষাকে সান্ত্বনা দেব কি? এর কি আদৌ সে কথা বুঝি বলে আর সান্ত্বনা দিতে যাই না। বাবুজি, উষাকে আমি ভালবাসি। নিজের সব কিছুই আমি সইতে পারি, কিন্তু তার এতটুকু অনিষ্ট সইতে পারব না। যদি বুঝতাম এ ভালবাসায় তার ইষ্ট আছে সে সুখী হবে আমি বাধা দিতাম না। হাসি মুখেই তার অভিলাষ পূর্ণ করতাম। কিন্তু জানি এ যে হবার নয়। শুধু মরীচিকার পেছনে ঘুরে বেড়ানই সার হবে তার।'

অপরাধীর মত মুখ করে বলি, 'উষাটা ছেলে মানুষ। এ তার একটা খাম খেয়াল। দেখ, দুদিন বাদেই সে এ সব ভুলে যাবে।'

মালিনী দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'ভগবান ত্রিশূল নাথ তাই করুন। সে যেন এর ব্যথা ভুলে যেতে পারে। কিন্তু ভয় হয়, পাথরের গায়ে একবার ঘাস গজালে সে ঘাস সহজে মুছতে চায় না। আমরা পাথর নই কিন্তু পাহাড়ী মেয়ে। পাহাড়ী মেয়ের বুকে যদি ভালবাসার ধারা একবার পথ তাকে মুছে ফেলা সহজ নয়।'

আমার চমকে উঠি। উষাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে মালিনী নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে।

জানতাম সবই। এই গিরি কন্যাটির অন্তরের নিগূঢ় রহস্যের খবর আমার অজানা ছিল না। তবুও একেবারে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। একটু গাঢ়স্বরে ডাকলাম 'মালিনী।'

—বলুন।

—তোমার নির্দেশ আমি অমান্য করব না। আজই চলে যাব আমি তোমাদের ছেড়ে, এখান ত্যাগ করে।

—বাবুজি!

—হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর একবার আসবার সম্ভাবনা ছিল আমার সে শুধু তোমার জন্যে। তোমাকে চিনেছি, তোমার অন্তরকে জেনেছি। অপরাধী কল্পনার প্রতি আমার একটা মোহ ছিল অনেক দিনের। তাদেরকে নিয়ে আমার মনের আকাশে একটা কল্পলোক গড়ে উঠেছিল। সেই

স্বপ্নলোককে সার্থক করে তোলবার জন্যই আমার আজকের এই অভিযানের শেষ প্রান্তে এসে দেখা পেলাম তোমার। এ সবই দৈব। আমার যে স্বপ্নলোক তোমার মধ্যেই হয়ত তবে সার্থকতা খুঁজে ফিরছিল। সেই কথাটাই গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম কদিন ধরে, তাকে রূপদানের প্রচেষ্টাও চলেছিল মনে মনে। তাইত অসুখের ছল করে যাবার কথাটিকে পিছিয়ে দিচ্ছিলাম একটু একটু ক'রে। কিন্তু আজ স্বর্গের স্বপ্নলোক আমার মর্ত্তে আছাড় খেয়ে মরল। সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঘরের এক কোণে বসান ছাদিকের আলো থেকে যে স্বপ্নালোক নির্গত হচ্ছিল তাতেই মালিনীর মুখখানিকে অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। দাঁতের চাপে অধরোষ্ঠকে নিষ্পীড়িত করে কোনমতে নিজেকে সংযমাবার চেষ্টা করছিল সে। তারপর একসময় বলল, 'এ-ও দৈব তবু দৈব নয়, আমি বলব দুর্দৈব। তা না হলে এমন হবে না কেন। ঈমা ত কারস্থ সব। জেনে শুনে একাজ সে কেন করতে গেল। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'না বাবুজি না, এ আমি পারব না। ঈমাকে অসুখী করে নিজে সুখী হতে আমি চাই না।'

দ্বিতীয় বার আমি মালিনীকে স্পর্শ করলাম। নিজে শিহরিত হলাম, তাকেও শিহরিত করে তুললাম। তার হাত দুখানি মুখ থেকে মুক্ত করে নিয়ে নিজের হাতে ধরে বললাম, 'আমি তোমায় দুঃখ দেব না মালিনী। তুমি যাতে সুখী হও সেই কাজই করব। কি করতে হবে তুমি আমায় বলে দাও।'

—কিছু না, তুমি যাও। যাবার সময় জেনে যাও, তোমার স্বপ্নলোককে সার্থক করে তুলতে পারলুম না বলে আমি মর্মাহত। পাকাটী মেয়ের বুকের ব্যথা কোনদিন মিলোবে না। তবুও আমি সহে যাব শুধু ঈমার দিকে চেয়ে।

মালিনীর কোমল হাত দুখানির উষ্ণতা আমার কঠিন হাত প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছিল। একটা উন্মাদনার শিহরণ আমার অন্তর থেকে সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির ধারবার শিহরিত করে তুলল। এই পাকাটী কন্যা! ঊর্বশী-কিন্নরী-রম্ভা-তিলোত্তমা বংশ সম্ভূতা! হয়ত তাদের সেই চঞ্চল রক্ত-কণিকা আজও এর রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে অপরীরের অলৌকিকত্ব এবং অরূপতা দুই দান করেছে। আমার আজন্মের কল্পনা আজ বাস্তব রূপ ধরে আমার সামনে ফুটে উঠেছে, নিজেকে আমার হাতে ধরা দিয়েছে। আজ আমি মহা সৌভাগ্যবান। এই অপরী কন্যা একাধারে আমাকে গৌরবান্বিত করে তুলেছে, অন্যধারে ঐশ্বর্যশালীও করেও তুলেছে।

কিন্তু আমার চিত্তের এ বিলাসিতা দীর্ঘস্থায়ী হল না। মালিনী সম্বিত ফিরে পেল। ডাকল, 'বাবুজি'।

—মালিনী!

—আমি যাই। তোর ঘরে এস। এখুনি হয়ত ঈমা ঘুম ভেঙে উঠে আমায় খুঁজবে। আমি চাই না তার সামনে এমনিভাবে ধরা পড়ি।

ব্যথায় অন্তর ভেঙে গেল। এতদিন সান্নিধ্যে পেয়েও যার তার বুঝিনি, অতি সন্তর্পণে যাকে গ্রহণ করেছিলাম আজ বিচ্ছেদ বেদনায় তার তার শুরু হয়ে অন্তরকে চূর্ণ করে দিল।

করুণ কণ্ঠে বললাম, 'এতদিন তোমাকে আর নিজের অন্তরকে এক সঙ্গে মুক্ত করে দেখিনি মালিনী তাই আধাআধি সব কিছুকে অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করেছি। আজ সেই সন্তর্পণ শুরু হয়ে উঠেছে। এ ভার আমি সইব কি করে। মাটির পৃথিবীর আকর্ষণ যাকে বড় করে দেখতে শিখে

পাহাড়ের এই আকর্ষণকে তুচ্ছ করে ফেলেছিলাম, সে আকর্ষণ আমার কাছে লীন হয়ে গেছে, পাহাড়ের আকর্ষণ আজ প্রবলতর রূপ ধারণ করেছে।'

মালিনীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল 'এক পরমুহূর্তে বিস্রস্ত হয়ে গেল। মলিন মুখে বলল, 'পাহাড়ের আকর্ষণ আজ যদি তোমার প্রবল হয়ে ওঠে, সে সম্ভব হয়েছে উমার তপস্যার জোরে, আমার জন্যে নয়। উমা যদি সুখী হয় আমি খুশি হব বাবুজি। তাকে এখুনি আমি এ সুখবর জানাচ্ছি।'

মালিনীর হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরে বলি, 'না, তুমি আমায় ভুল বুঝনা মালিনী। উমার তপস্যা তার শিবের জন্য। আমি শিব নই। আমি মানুষ। তাই মালিনীর আন্তরিকতাতেই আমি তুষ্ট। এর বড় প্রলোভন আর আমার কিছু নেই। তাই তোমার নির্দেশেই আমি মেনে নিলাম। আমি যাব। আজই আমি মাটির পৃথিবীর বুকে আবার রওনা হ'ব। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার।'

মালিনী এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নেয়। তারপর আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে সরে এসে বলে, 'দেব। আর আমি প্রহর গুণে চলব তবে আবার এই পর্বতের আকর্ষণ তোমায় টেনে নিয়ে আসবে আমার পাশটিতে। সেদিন এমনিভাবে তোমায় ছেড়ে দেব না আমি।'

শান্তনু থামে।

প্রফেসর প্রশ্ন করেন, 'থামলে কেন?'

—মানুষ থামে, 'যখন সে তার গতি হারিয়ে ফেলে। আমার সব গতি স্তব্ধ হয়ে আছে এইখানে। তাই আমাকে থামতে হ'ল।' তারপর একটু চুপ। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, 'যা চাইতে যা পাওয়া যায়, তার মূল্য আমরা দিই না। কিন্তু চেয়েও যে জিনিস পাওয়া যায় না, সেই জিনিসই আমাদের কাছে দুর্মূল্য। এতদিনের মূল্যহীন মালিনী একদিনেই আমার কাছে দুর্মূল্য হ'য়ে উঠল। কিন্তু এরপর আর সেখানে অপেক্ষা করা চলে না। তাই স্বর্গভূমি ছেড়ে মর্তভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সেই দিনই। আসবার সময় উমার মাথায় হাত রেখে বলেছিলাম, কায়মনে আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও বোন। মাটির মানুষের জন্যে বিধাতা এমন উমার সৃষ্টি করেন নি কখনও। তোমার জন্যে যে শিব সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুল নাথে, সেই তোমায় সুখী করবে তাই।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বলেন, 'অভিনয়টা তুমি বন্ধ করনি শান্তনু। শুনে উমা একেবারে জল হয়ে গেল নিশ্চয়ই।

—জানি না। তবে হেঁট হয়ে প্রণাম করে যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন তার সেই বিমর্ষ মুখের দিকে ফিরে তাকাতে পারিনি আমি।

—বেশ করেছ। উমা পর্ব ত শেষ করলে নমঃ নমঃ ক'রে। আর একটা পর্ব শেষ করলে কিভাবে? ষোড়শোপচারে বোধ হয়।

—পারলে মনে অন্ততঃ কিছুটা শান্তি পেতাম প্রফেসর। কিন্তু ষোড়শ কেন একোপচারেও পারিনি।

—কেন?

—শুনে বিশ্বাস করবে না, শেষ সময়ে মালিনী দেখা করেনি আমার সঙ্গে।

—বল কি? অবাক কাণ্ড। মনের দুঃখে মালিনী কি উদাস্ত হ'য়ে গেল শেষ পর্যন্ত?

—না ঘরেই ছিল সে। কিন্তু চরম মুহূর্তে নিজেকে সে সংবরণ করতে পারেনি। এক জাতের মেয়ে আছে যারা ভালবাসাটাকে জীবনের চরম বলে ধরে নেয়। তারাই কোলায় দুলতে ভালবাসে। মালিনী সেই জাতের মেয়ে। যতদিন তার ভালবাসা সার্থকতার রূপ দেখেনি, ততদিন সে নিজেকে সামলে রেখেছিল। কিন্তু যখন দেখল, তখন অন্তরের তার সামো ব্যাঘাত ঘটল। না পাওয়ার চেয়ে, পেয়ে হারানর ব্যথাটাই তাকে চুরমার করে দিল। উষা প্রকাশ্যে সে কথা বলল না বটে কিন্তু তার অপ্রকাশ্য উক্তি থেকেই বুঝতে পারলাম সব। বুঝলুম, ছিন্নমূল লতা, মেরিনীর সঙ্গে সব যোগসূত্র হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। আর যে এ মূল দিয়ে সে রস সংগ্রহ করবে কোনদিন এ সম্ভাবনা নাই।

উষাকে বললাম, 'যাবার সময় মালিনীর সঙ্গে দেখা হ'ল না উষা এর জন্যে আমি মর্মাহত। ভগবান ত্রিশূল নাথ তার মঙ্গল করুন।'

এইখানেই শেষ হয়ে গেল আমার অভিযান, সেই সঙ্গে এই অলৌকিক কাহিনী। তারপর সেই আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ ধরে, সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর অরণ্যানী ভেদ করে এগিয়ে চললাম নাচির পৃথিবীর উদ্দেশে। তখন কোথায় রইল সেই বৈচিত্র্যময়, রহস্যময়ী অপূর্ব রাজ্য, তার অপরূপ তরুণ-তরুণীর দল আর কোথায় রইল সেই অপূর্ব অমর কন্যা যার অনুগ্রহে এ জীবন ফিরে পেয়েছিলাম আমি।' শাশ্বত চুপ করে।'

কিছুক্ষণের জন্য ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা এসে যায়। প্রফেসর চ্যাটার্জিও একটু যেন বিমনা হয়ে পড়েন। তারপর এক সময় বলেন, 'সত্যই অলৌকিক কাহিনী শাশ্বত, এ আমিও অস্বীকার করি না। শুধু জানতে ইচ্ছে করে এ অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে তোমার মনের মধ্যে সবচেয়ে রেখাপাত করেছিল কে?'

—অর্থাৎ?

—প্রকৃতি আর রমণী, কে তোমার চিত্ত জয় করেছিল বেশী?

—এ বড় শক্ত প্রশ্ন প্রফেসর। একজন মনে নাড়া জাগায়, সরগোল তোলে, আর একজন নিঃশব্দে মনের ভিত্তিতে নাড়া দেয়, রুদ্ধ কপাট সব খুলে দেয়। সেখান দিয়ে যে অনির্বচনীয় আলো ঘরে ঘরে পড়ে তার মাধুর্য প্রকৃতির যে কোন আলোর চেয়ে কম নয়।

প্রফেসর মাথা নেড়ে আবার প্রশ্ন করেন, 'ঠিক হ'ল না শাশ্বত। আমারই প্রশ্নের মধ্যে গলদ থেকে গেছে। আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল, তোমার অভিযানে যে কটি মেয়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, তার মধ্যে কে তোমার মনের ভিত্তিতে বেশী নাড়া দিয়েছিল?'

শাশ্বত একটু চিন্তা করে। তারপর বলে, 'আমায় মুগ্ধ করেছিল উষা, তার অপূর্ব দেহলাবণ্য আর সৌর্য বীর্যের ইতিবৃত্ত দিয়ে। মরিতের পাশে যে অপরূপ শয়নশয্যা সে বিছিয়ে নিয়েছে তা সত্যই অনির্বচনীয়।'

প্রফেসর বলেন, 'মুগ্ধ করা এক, আর চিত্ত জয় করা আর এক। আমি চিত্ত জয় করার কথাই বলছি শাশ্বত।'

শাশ্বত একটু চিন্তা করে বলে, 'তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি প্রফেসর। তবে জয় করা যদি বল ত জয় করেছিল দুটি মেয়ে। প্রথম সহমিয়া আর দ্বিতীয় উষা। সহমিয়ার

সরলতা, আন্তরিকতার কথা আমি ভুলতে পারিনি প্রফেসর। আর ভুলিনি তার আমারই জন্ত আত্ম বিশ্লেষণের কথা। সরল মেয়ে, বড় আন্তরিক ভাবেই ভালবেসেছিল আমাকে। তাই নিঃসঙ্কোচে আত্মদান করেছিল আমাকে। এ জিনিষটা অপরকে দিতে পারেনি বলেই নিজের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল সে। উমার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল উষার। তেমনি লাবণ্যময়ী, তেমনি তেজস্বিনী সে। তার বিপুল বাক্ চাতুর্যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে সে আমাকে প্রতিপদে বিব্রত করেছে, বিমুগ্ধ করেছে। কিন্তু কোনদিন আমি ভাবতে পারিনি যে উমার মত মেয়ে আমায় ভালবাসতে পারে।'

—কারণ?

—আত্মজ্ঞান, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মেয়ে, পিসির সব কথা জেনে শুনে এমন কাজ করল কি করে সেইটাই আমার পরম বিস্ময়।

প্রফেসর বলেন, 'উমা পিসির অন্তরকে জেনেছিল কিন্তু বুঝতে পারেনি তোমার অন্তরকে। বারবার ঘা দিয়ে দেখছিল পিসি সেখানে দাগ বসাতে পেরেছে কিনা। তোমাকে বিমুগ্ধ দেখে, সে সেইখানে নিজের দাগ বসাতে গিয়েছিল। পিসির ঘরে যত কথা সে বলতে গিয়েছে সে সবই তার নিজের কথা। হাইপথেসিস্-ই যে একদিন 'সত্য' হয়ে দাঁড়াবে, হেঁয়ালি যে তার বাঁকা পথ ত্যাগ করে সোজা পথ ধরবে এ সে ভাবতে পারে নি। অথচ তাকে দোষও দেওয়া যায় না। পৃথিবীর যে স্তরে তারা বাস করছে সেখানে এমন মনের মানুষ পাবে কোথায়? সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ মেয়ে, অতীতের সংস্কৃত যুগের প্রথানুযায়ী দর্শনমাত্রেই আত্মদান করে বসেছে। আচ্ছা শান্তনু, মালিনী কি তোমার চিত্ত এতটুকু জয় করতে পারে নি?'

শান্তনু প্রফেসরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, 'মালিনী চিত্ত জয়ের চাইতেও বড় জয় করেছে প্রফেসর। সে চিত্ত হরণ করেছে। আজ সারা চিত্ত আমার মালিনীময় হ'য়ে উঠেছে। এতদিনের স্বপ্ন আমার সফল হয়েছে, অপূর্ব রসের নাগাল পেয়েছি। তাকে জয়ও করেছি সত্যি কিন্তু সেই জয়ের মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আজও পূর্ণিমার রাতে যখন আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি তখন কেবলই মনে হয় আর একজোড়া অনুপম চোখের দৃষ্টি আগে থেকেই সেখানে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে: তারপর এই চার চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তখন যে মিশে এক হয়ে যায় সে কথা বুঝতে পারি না। তখন আমার অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে একেবারে বিলুপ্তি হয়ে যায়। জানিনা, বাস্তবে সে দৃষ্টির কল্যাণ স্পর্শ আর কোনদিন পাব কিনা।'

—তুমি কি সে স্পর্শ পাবার জন্তে খুব বেশী ব্যাকুলিত হয়েছ শান্তনু?

—প্রফেসর মন জিনিষটা এমনি যার অন্ত পাওয়া দুষ্কর। যখন একটিমাত্র কথার অপচয়ে সব কিছু পেতাম তখন মন লালায়িত হয়নি। আজ যখন সমস্ত কথায় তার নাগাল পাব না তখন চাপা যন্ত্রণায় মন হাঁপিয়ে উঠেছে। এ যন্ত্রণার হাত থেকে এ জীবনে আমার নিষ্কৃতি নেই।

প্রফেসর চ্যাটার্জি বসে থাকেন। দৃষ্টি তাঁর সমবেদনায় ভরা। কিন্তু ভাষা দিয়ে সে সমবেদনা তিনি প্রকাশ করতে পারেন না।

একসময় শান্তনু উঠে পড়ে। বলে, 'তোমায় অজস্র ধন্যবাদ প্রফেসর আর ধন্যবাদ তোমার ঐ রেডিও কার্বন-ডেটিং যন্ত্রটিকে যার প্রসাদে আমার মনের মধ্যে এতদিন যেটুকু যা সন্দেহ ছিল তা নিরসন হয়েছে। এখন বুঝেছি যথার্থই অপূর্ব লোকের সন্ধান আমি পেয়েছি। মালিনীরাও অপূর্ব রসে

সম্ভূতা। সুতরাং আমার জীবনের কোন বাসনাই আর অপূর্ণ নাই। অমর লোক দর্শন আর সেই সঙ্গে অপরা সুধাময়ীর মন দুই আমার ভাগ্যে জুটেছিল। কিন্তু নিজের অবিমৃষ্টকারীতার দুই-ই হারিয়েছি।'

'এর পর কি করবে শান্তনু?' প্রফেসর প্রশ্ন করেন।

—জানিনা। একদিন ত্রিশূলনাথকে সাক্ষী রেখে লছমিয়াকে কথা দিয়েছিলাম। সে কথা আমি রেখেছি। তাকে প্রবঞ্চিত করিনি। কিন্তু নিজে বঞ্চিত হয়েছি। লছমিয়ার পরিণতি যদি জানতে পারতাম তবে হয় ত আমার অভিযানের মোড় অন্য দিকে ঘুরে যেত কিন্তু এখন আর উপায় নেই। ত্রিশূল নাথ তাঁর দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সহস্র চেষ্টা করলেও সে দ্বার উন্মুক্ত হবার নয়। সুতরাং নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নিজেকেই করতে হবে প্রফেসর। তোমার অনেকখানি সময়ের অপচয় করলাম। আবার যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তোমার ঐ অপরূপ যন্ত্রটির স্মরণাপন্ন হব। চলি আজ।' বলতে বলতে শান্তনু তার দীর্ঘ ঋজু দেহখানিকে মাথা নমিয়ে নমস্কার করে ফিরল। আর প্রফেসর চ্যাটার্জি হাঁ করা দৃষ্টি মেলে বন্ধুর অপসৃয়মান দেহখানির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইলেন।

রত্নাকর

আধুনিক ইউরোপীয় নাট্য-মঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী, লোকের চোখ ভোলবার চেষ্টা।···এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।···

নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপর দাবী রাখে। চিত্র সেই দাবীকে খাটো করে। তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত···দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে।

রবীন্দ্রনাথ

আলোচনা

নাটক ও দর্শক

নাটক এমন একটি শিল্প যা বহুজন একসঙ্গে বসে দেখবে, শুনবে, বুঝবে এবং উপভোগ করবে। সেই জন্যে সার্থক নাটকের বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গী এমন হওয়া চাই যা মোটামুটী সকলের হৃদয়ে পৌঁছতে পারে। যে একজনের কথা নাটক বলবে সে একজনের সঙ্গে দর্শক-সাধারণের আত্মিক যোগ স্থাপিত হওয়া চাই এবং নাট্যকারের রচনা কৌশলে তা ঘটানো চাই। আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলতে হবে। এই সূত্রে Audience-patticipation-এর কথা প্রায়ই বলা হয়। এবং এই উদ্দেশ্যে যে কৌশলটি প্রায়শ ব্যবহার হচ্ছে তা মঞ্চকে দর্শকদের আসন অবধি বাড়িয়ে টেনে নিয়ে আসা। দর্শকদের আসনের পাশ দিয়ে, মাঝখান দিয়ে, নাটকের চরিত্রদের যাওয়া আসা করানো এবং কথা বলানো ইত্যাদি। এ সব কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক। আসল audience-participation হয় যেখানে মঞ্চের চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে দর্শকের মনের যোগাযোগ ঘটে। মঞ্চে যা ঘটছে তা সাজানো ব্যাপার এ কথা জানা থাকলেও মঞ্চের ওপরের চরিত্রদের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্খা যখন দর্শককে সজোরভাবে স্পর্শ করবে তখনই হবে

সত্যিকার audience participation। যেহেতু অধিকাংশ আধুনিক নাটক ঘটনা নির্ভর, স্বল্প নির্ভর নয়, যেহেতু তারা একটি ব্যক্তিক্রম-পর্যায়ভুক্ত চরিত্রের ব্যতিক্রম-পর্যায়ভুক্ত সমস্যা বা পরিস্থিতি নিয়েই অনেক সময় ব্যস্ত থাকে, সেই হেতু আমরা অভিনয় দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু ভুলে যাই। অভিনয় দেখে শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করি, প্রয়োগ কৌশলের বাহবা দিই, কিন্তু যে চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে নাটক, তার কথা একবারও ভাবি না। তার কারণ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের আত্মিক-যোগ ঘটেনি। বর্তমানে থিয়েটার দেখা মানে দিনের ফটিন থেকে ঘণ্টা আড়াই সময় ছুটী নেওয়া। যা দেখলুম বা শুনলুম তা ঐ থিয়েটারেই রেখে এলুম। বড় জোর অভিনয় ভালো হ'লে সে কথা এসে বন্ধুবান্ধবদের বলুন, নক-চাতুর্যের প্রশংসা করলুম, ঐ পর্যন্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটক আমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে না। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নাটকের দুর্বলতা অতি সহজেই ঢেকে দেওয়া হয় প্রয়োগ নৈপুণ্য ও অভিনয় চাতুর্যের দ্বারা। এই দুটি বিষয়েই অসাধারণ উন্নতি হয়েছে গত বিশ বছরের ভেতর। গত বিশ বছরে অসাধারণ শক্তিধর কোনো মঞ্চাভিনেতার আবির্ভাব ঘটেনি এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথা যে সামগ্রিক ভাবে অভিনয়ের মান অসাধারণ উন্নত হয়েছে, বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী সুঅভিনয়ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন, পেশাদারী অপেশাদারী এবং আধা পেশাদারী সম্প্রদায়গুলিতে। এবং এই রকম সম্প্রদায়ের সংখ্যা কম নয়। এঁদের অভিনয়গুণে এবং নক-চনায়নের কৃতিত্বে বহু দুর্বল নাটক আজ জনপ্রিয় হয়েছে। একসময় দুঃখ করা হোতো যে বাঙলায় নাটক নেই, নাটক লেখা হয় না, অথচ উপন্যাস ছোট গল্পের ছড়াছড়ি। আজ আর সে কথা বলা চলে না। আজ এত নাটক লেখা হচ্ছে যে তার হিসাব রাখা সম্ভব নয়। প্রত্যেক পল্লীতে এখন নাট্য-সংস্থা। এগুলি আগের দিনের সখের Dramatic Club-এর মত নয়। এদের উদ্দেশ্য, সংবিধান, কর্ম-পদ্ধতি সবই আলাদা। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব নাট্যকার আছেন—অনেক সংস্থার একাধিক নাট্যকার আছেন। এই সব নাট্য-সংস্থা আছে বলেই নতুন নাটক লেখার ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং তাই লেখাও হচ্ছে। শুধু পেশাদার থিয়েটারের ওপর যতদিন নাটক নির্ভরশীল ছিল ততদিন নাট্যকারের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। নাটকও তাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নাটকের চাহিদা খুব বেশী। নতুন নাটক লেখাও হচ্ছে। অবশ্য সবই যে সার্থক নাটক হচ্ছে তা নয়, তা হতেও পারে না। যে সব বড় নাট্যকারের নাম আমরা জানি, তাঁদের বহু লেখার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র আজও বেঁচে আছে। বাকীগুলি কালের অনিবার্য নিয়মে বিস্মৃতপ্রায়। সব নাটক টেঁকে না। সুতরাং আজকের দিনে যে বহু নাটক লেখা হচ্ছে তারা সবাই যে থেকে যাবে তা নয়। এর অধিকাংশই হয়ত থাকবে না। কিন্তু যদি কয়েকখানিও থাকে তাহলেও কম কথা নয়। সুতরাং নাটক লেখা চলতে থাকুক, নতুন নতুন নাট্যকারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটুক।

তবে মনে রাখতে হবে নাটক লেখা বড় সোজা কথা নয়। একটা কারণ বলি। নাটকের বিচার হয় মঞ্চে, বহু লোকের সামনে। নাটককে public-এর সম্মুখীন হতে হয়। এই public কিন্তু নীরব public নয়। প্রকাশ্য আদালতে আসামীর বিচারের সময় জনসাধারণ উপস্থিত থাকতে পারে, কিন্তু চীৎকার করে আসামীর মুণ্ডপাত করার অধিকার তাদের নেই। কিন্তু নাটক যখন মঞ্চের কাঠগড়ায় তখন দর্শক ইচ্ছে করলে, যদি নাটক, বা নাটকের কোনো অংশ ভালো না লাগে, চীৎকার করে নাট্যকারের মুণ্ডপাত করতে পারেন স্বচ্ছন্দে। সুতরাং নাট্যকারকে সদাই সজাগ থাকতে

হয়। আলো হলে যেমন প্রশংসা হাতে হাতে পাওয়া যায়, মন্দ হলে নিন্দাও তাই। উপন্যাস ছোটগল্প কাব্যের লেখককে এই অবস্থায় পড়তে হয় না। সেখানে নিন্দা, প্রশংসা দুই-ই হয় পরোক্ষে, লেখকের সামনে নয়। সুতরাং নাট্যকারকে যথেষ্ট সাবধান হতে হয়। এছাড়া অনেক কথা ভেবে তবে নাটক লিখতে হয়। নাট্যকারের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত। কত রকম চিন্তা মাথায় রেখে নাট্যকারকে নাটক লিখতে হয় তার চমৎকার বর্ণনা করেছেন বার্নার্ডশ। শ' বলেছেন কীভাবে নাটক লিখবো সেটা নির্ধারিত হবে আমার রুচি, পছন্দ বা ইচ্ছা অনুসারে নয়। আনুষঙ্গিক বহু কথা ভেবে তবে স্থির করতে হয় কীভাবে লিখবো।

সুশীল মুখোপাধ্যায়

জীবনী ও স্মৃতিকথা

গিরিশচন্দ্রের অভিনয়

কলিকে আমি মেলুর স্কীমে প্রথম থিয়েটার দেখতে। প্রথম থিয়েটার, প্রথম 'প্রডুস' আর প্রথম দেখার আলোকে 'যোগেশ' দেখে নটচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র।

তখন আমার সতেরো বছর বয়েস। থিয়েটার দেখতে এসে বসলাম গিয়ে মেয়েদের সীটে। মনে হল যেন, খাঁচা। সামনের দিক, যেখানটা দিয়ে থিয়েটারের নাটক দেখব, সেটা একেবারে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। শুধুই কি জাল? তার সামনে আবার মন করে চিক ফেলা। থিয়েটার হলের মাঝখানে ওপরের ডোম থেকে একটা ঝাড় ঝুলছে। তার জোরাল আলো পড়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে। কিন্তু, কতটুকু আর দেখব? সেই সৌখিন আর চিক ভেদ করে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় তা থেকে বুঝতে পারছি, নীচেটা একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। সামনে, সারা মুখ জুড়ে মস্ত 'ষ্টেজ' ফেলা আছে, তাতে ছবি আঁকা। বিরাট ছবি। কী যে ছবি, আজ তা অবশ্য ঠিক মনে করতে পারছিনা।

চিকের আড়াল থেকে সবকিছু দেখবার চেষ্টা করছি, মনে জাগছে নানান কৌতূহল, কিন্তু সেই আলোকে উদ্ভাসিত বিচিত্র পরিবেশ আর অনন্যসাধারণ সজ্জা করে যাকে কোন প্রশ্ন করতেও যাচ্ছি ভুলে, একেবারে বোবা হয়ে বসে আছি বলা চলে। নীচে থেকে অনবরতই একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে, "পান-বিড়ি সিগারেট! অ্যাই, পান-বিড়ি-সিগারেট।"

এমন সময়, যেমন করে আমাদের স্কুলের পেটাঘড়িতে ঘণ্টা বাজে, ঠিক তেমনি করে কোথা থেকে যেন এক ঘণ্টা বেজে উঠল, চং-চং-চং!..... পান-বিড়ি-সিগারেট—তখনো চলছে কিন্তু।

আবার বাজল ঘণ্টা, চং-চং-চং করে। শুরু হলো কনসার্ট। এটা আমার কাছে তেমন নতুন লাগেনি কারণ বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে পাড়ার কনসার্ট বাজনা শোনা আমার অভ্যাস ছিল। সুরটাও নতুন নয়, ঠিক এমনি ধরণের সুরই শুনেছিলাম, মনে হলো।

কনসার্ট একসময় থেমে গেল। আবার একটা ঘণ্টা পড়ল, চং-চং-চং।

এইবার দেখলাম, মাঝখানে যে ঝাড়টা ঝুলছিল, সেটা ক্রমশঃ ওপরে উঠে গেল। আর সেটা উঠে যেতেই আলো গেল একেবারে কমে। কিন্তু আজ চিন্তা করে এটুকু বুঝতে পারছি, তখনকার

দিনে অডিটোরিয়াম একেবারে অন্ধকার করে দিত না, মৃদু একটা আলোর আভা থেকে যেত। কি-রা তৎক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে চোখের সামনেকার চিকগুলি গুটিয়ে তুলে নিল। রইল শুধু জাল। সেই জালের আড়াল থেকে সবই যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওদিকে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি এখনো লোক আসছে।

অবশেষে থামল কনসার্ট। আর সামনেকার সেই বিরাট ছবিওয়ালা ড্রপটি আস্তে আস্তে গুটিয়ে গুটিয়ে উঠতে লাগল ওপরে। বিস্ময়াবিষ্ট দুইচোখ মেলে দেখলাম, বড়লোকদের বাড়ির ঘরের যতই একখানি সুসজ্জিত ঘরের ছবি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেরকম উজ্জ্বল দৃশ্য ইতি পূর্ব্বে দেখিনি। কত গাঢ় রং যে চোখের সামনে ঝলমল করতে লাগল তা বলার নয়। রামধনু রঙের রঙীন পোষ্টার ও হ্যাণ্ডবিল তখন থিয়েটার থেকে ছাড়া হত, মনে হত যেন বড় বড় হরফের অক্ষরের ওপর দিয়ে রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে! আজ যেন সেই রঙেরই প্রতিফলন দেখলাম মঞ্চের দৃশ্যে! সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল এত আলো যাত্রাতেও দেখিনি। তখনকার দিনে সাধারণত বুধবারের অভিনয়-বিজ্ঞপ্তি সাদা কাগজে কালো অক্ষরে ছাপা হত, কিন্তু শনিবারের পোষ্টার-হ্যাণ্ডবিল ছিল রঙে-রঙে-রঙ করা।

সেই উজ্জ্বল ঘরের দিকে শুদ্ধ নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে আছি আর দেখছি মেয়েরা কথা কইছে। এমন সময় অন্তরাল থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রবেশ করলেন গিরিশচন্দ্র। 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' নামটা হ্যাণ্ডবিল প্রাকার্ড থেকেই বানান করে পড়ে পড়ে জেনে গিয়েছিলাম কিন্তু নামের মহিমাটা জানা ছিল না। মহিলা দর্শকদের মধ্য থেকে কয়েকজন একসঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন,—গিরিশবাবু!

গিরিশবাবু! মানে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ! মনে হল, এক ব্যক্তি যেন ঘরে ঢুকলেন না, যেন প্রবেশ করলেন। এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেন প্রবেশ শব্দটাই খাপ খায়। সেদিন এতটা বুঝবার কথা নয়, স্মৃতিপটে আঁকা সেদিনকার সেই দৃশ্যটিকে আজ আবার দেখতে গিয়ে এই মহিমার ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্তরের পট ভূমিকায়। মনে হচ্ছে নাট্যকাররা চরিত্রকে মঞ্চে আনবার প্রাক্কালে যে ব্রাকেটে অমুকের 'প্রবেশ' কথাটি লিখে রাখেন 'অমুকের ঢোকা বা অমুক ঢুকলেন'—এর বদলে, তার তাৎপর্য্য বোধহয় এই-ই। ঢোকা বা ঢুকলেন এর মধ্যে যেমন একটা হীনতা আছে, 'প্রবেশ'-এর সঙ্গে মিশে আছে এক ম্যাজেষ্টিক ভাব। এই ভাবের সঙ্গে সব সময়ই যে একটা রাজসিকতা মিশিয়ে থাকবে, এমন কোন কথা নেই, কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী অনুপ্রবেশের একটা দ্যোতনা আছে।

যাই হোক, গিরিশচন্দ্রের মঞ্চ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন নিমেষে স্থির হয়ে গেল। আর ঐ স্থিরতা বোধহয় সংক্রামক। শিশুদের এসব বোঝবার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য্য, তারাও স্থির হয়ে গেল। দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, শিশুরাও চুপ করে আছে। যদি কোন শিশু দৈবাৎ অন্তরিধার সৃষ্টি করে কেঁদে উঠত, নীচে থেকে নানান মন্তব্য উঠত শিশু এবং তাদের মায়েদের লক্ষ্য করে। বড় হয়ে পরবর্ত্তীকালে যখন নিজে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি তখনো লক্ষ্য করেছি দর্শকমণ্ডলীর একাংশের এই অশোভনতা।

গিরিশবাবুর অভিনয়কে সেদিন অভিনয় বলেই মনে হয় নি। অন্য লোক যখন মঞ্চের

অভিনয় করছে লোকেরা তখন কোথাও কোথাও মৃদু গুঞ্জন করছে; কিন্তু উনি যেই এলেন, অমনি সব গুঞ্জন মুহূর্তে সেন স্তব্ধ হয়ে। এই স্তব্ধতার যে একটা রূপ আছে, সেটা আজ বুঝি, তখন বুঝিনি,—কিন্তু তার স্পর্শ থেকে সেদিন আমি বঞ্চিত হইনি। ঐ চলাফেরা, ঐ বাগভঙ্গী আর, ঐ গম্ভীর কণ্ঠস্বর,—কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার অনুভূতিতে মনে। আমি মায়ের কোলের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলুম। সেই মুগ্ধ অভিনয় বুঝবার ক্ষমতা ঐ বয়সে আমার থাকার কথা নয়। কিন্তু শেষের দিকে যখন খালি গায়ে ছেঁড়া কাপড়ে হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন, 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষতম সংলাপ,—'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল'—তখন মনে হল, যত সহজে কথা-গুলি বলছেন উনি, তত সহজ হয়ে এসে তা মানুষের মনে সঁপছেনা! মানুষের বুকের ভিতরটা বুঝি প্রবলভাবে গুমরে গুমরে উঠছে! আমার বেশ মনে আছে, বাড়ীতে ফিরে আসবার পর ত'তিন দিন যাবৎ কেমন যেন একটা ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করতে পারছি না! মনে হচ্ছিল, সেই যে 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' শুনে সমস্ত দর্শক নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে এলাম, সেই কান্না বুঝি আমার ভিতরের সবগুলি তন্ত্রীর মধ্যে তখনো ক্রমাগত বেজে চলেছে, তার আর বিরাম নেই! আজ মনে হয় অনুভূতি ব্যাপারটাই বুঝি এই! আর্ট যেখানে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে অনুভূতির ক্ষেত্রে এসে পৌঁছয়, সেখানে সে বালক-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবারই মনে জাগিয়ে তোলে তরঙ্গ! আর্টের জয় বুঝি সেখানেই!

অহীন্দ্র চৌধুরী

নব নাট্য গোষ্ঠী

শিল্পীদলের "মুক্তধারা"

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' খুবই ভাবনাটক। এই নাটকে বন্ধনমুক্তির যে বাণী তিনি প্রচার করেছেন তার মধ্যে আছে অহিংস সংগ্রামের এক মূর্ত আদর্শ এবং সেই সঙ্গে একটি তরুণ জীবনের আত্মদান। এই নাটকে জনগণের প্রতিনিধি ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে ১৩২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছেন:—

আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বারে, আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে।

• • •

আমার পাড়ায় পাড়ায় ফেলিয়ে বেড়ায় কোন ক্যাপা সে?
আকাশ ছুড়ে মোহন সুরে কি যে বাজায় কোন বাতাসে।

• • •

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না
তোর মারে মরম মরবে না।
আগুন আমার ভাই আমি তোমারই জয় গাই।

এই সব গানগুলি একদা স্বাধীনতাকামী নরনারীর মনে যে তরঙ্গ তুলেছিল তা আজও থেমে যায়নি। রূপকের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবাত্মার জয় ঘোষণা করেছেন। অবাধ্য প্রজাদের আঘাতে

আনতে উত্তরকুটের রাজা বসুজিৎ বহুরাজ'বিভূতির সাহায্যে যুক্তধারার বুকে যে বিশাল বাঁধ গড়ে তুলেছিলেন তারই বিরুদ্ধে প্রজাদের বিক্ষোভ ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে। আর সেই বাঁধ তাঙ্গতে গিয়ে যুবরাজ নিজের প্রাণ দিল।

কঠিন নাটক যুক্তধারা। বস্তুগর্ভ অর্থবাহী সংলাপে সংবদ্ধ এর বিন্যাস। সাধারণ প্রচলিত নাট্যের সঙ্গে এর প্রায় আকাশ পাতাল তফাৎ। এই জটিল নাটকে নিয়মিত অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত করে শিল্পীদলের সভ্যরা যে অমিত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। নাটকে প্রায় চল্লিশটি চরিত্র। একটি অপেশাদার নাট্যসংস্থার পক্ষে এতগুলি চরিত্রের শিল্পীকে যথাযথভাবে মঞ্চে উপস্থিত করা সহজ কম নয়। কিন্তু সেই কঠিন কর্ম শিল্পীদলের প্রযোজকর্তারা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে পালন করেছেন গত ২৭শে জানুয়ারী মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন রজনীতে। সে জন্যে এই নাট্যের পরিচালক অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বাধিক প্রশংসা দাবী করতে পারেন। এই নাট্যা-ভিনয়ের সাফল্যের মূলে সংস্থার উপদেষ্টা অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমন্ধ প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

প্রযোজনা ও অভিনয় দুই ই দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। নাটকের প্রাণ—ধনঞ্জয় বৈরাগী। গানে অভিনয়ে অভিব্যক্তিতে চরিত্রটিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতিয়ে রেখেছিলেন তিনি সারাক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ চিন্তাটি তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

তারপর বলতে অভিনয়ের উৎকর্ষের কথা উল্লেখনীয়।

গৌর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজা), বিমল মুখোপাধ্যায় (বিভূতি), মদন বন্দ্যোপাধ্যায় (অভিজিৎ), মণ্টু দাসগুপ্ত (সঞ্জয়), অমল বসু (বিশ্বজিৎ), মানিক ভট্টাচার্য (মন্ত্রী), রজত সেন (কফর), অরুণ ধর (নরসিং), এবং অনিল চট্টোপাধ্যায় (বটুক) বিশেষ ভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছোট ছোট ভূমিকাগুলির অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হয়েছিল। তাদের মধ্যে সমর সেন, অমল নাগ, কুমার সেন, পরিমল ধর, সুধীর পাল, অপূর্ব মৈত্র, বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দত্ত, অরবিন্দ গঙ্গো, অমর দাস, শিশির ঘোষ, ইন্দু ঘোষ, নাদু গঙ্গো, এবং বাউলরূপে অনুত্তোষ চক্রবর্তী সুঅভিনয় করে চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দুটি মাত্র স্ত্রী চরিত্রে অধারূপে বীণাপানি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে দর্শকদের অভিভূত করেছিলেন। সাতমী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তধারাণী অতি সুন্দর।

মঞ্চ পরিকল্পনায় গোপাল মুখোপাধ্যায় স্বল্প আয়োজনে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় এবং আবহ সঙ্গীত প্রয়োগে অরুণ দাস এবং মহুয়া অর্কেস্ট্রা নাটকটির সর্বাঙ্গীন সাফল্যকে বিশেষ সাহায্য করেছে।

আগামী ১৩ই এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে এই নাটকের পুনরভিনয় হবে। শিল্পীদলের এই সৎপ্রচেষ্টাকে সমর্থনা জানাই। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটির অভিনয় কেউই করতে চাননা। অথচ এই নাট্যের মধ্যে যে মূর্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ আছে তা আজকের যুগে একান্ত ভাবেই অনুভবের এবং উপলব্ধির যোগ্য। সেই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় শিল্পীদল আধুনিক যুগে নবনাট্য প্রচেষ্টার একটি বিশেষ প্রশংসনীয় কৃতীর স্বাক্ষর রাখলেন।

গত মাসের নানা অনুষ্ঠান

পূর্ব-রেলপথ হবি রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি এঁদের উৎসবে অভিনীত হয় শচীন ভট্টাচার্যের "সম্রাটে যুদ্ধ"। অভিনয়ে এঁরা গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শিল্পী সমবয়ে ছিলেন,— কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর সাহা, সুধেন্দু বসু, দেবকুমার রায়, সুকোমল শর্মা, অরবিন্দ সেনগুপ্ত, পঙ্কজ তালুকদার, অমল গুপ্ত, সুকুমার ঘোষ, নিতাই চট্টোপাধ্যায় প্রেমবিলাস মুখোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায় ও লতিকা বসু।

• • • •

সেন্ট্রাল একসাইজ ও কাসটমস ক্লাব

এঁরা সম্প্রতি 'স্বীকৃতি' নাটকটি অভিনয় করলেন। অমিলবরণ বসু বিরচিত এ-নাটক বর্তমান-কালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অভিনয়ে এঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পরিচালকের (সুশান্ত লাহা) সুস্থ শিল্পচিন্তার ছাপ এর সর্বত্র।

সরোজ দে, সত্যেন মিত্র, সুশান্ত লাহা, প্রদ্যোৎ বসাক, ত্রিলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ দাস, শিবদাস মুখোপাধ্যায়, অনিল ঘোষ দস্তিদার, সুবর্ণন চক্রবর্তী পুরুষ চরিত্রগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। স্ত্রী চরিত্রে লতিকা দাস ও অরন্ধতী করকে ভাল লেগেছে। সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, সুতারা চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন অন্যান্য চরিত্রের রূপকার।

• • •

আমতা ব্লক ২-এর প্রমোদ বিভাগ

সম্প্রতি এঁরা দুটি নাটক অভিনয় করেন। প্রথমে 'সাজাহান', পরে বনফুল বৈরাগীর 'রূপালী চাঁদ'। শিবদাস চক্রবর্তী শেষোক্ত নাটকে, ও শিপ্রা লাহা দর্শক বিচারে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন।

• • •

নন-মেডিক্যাল স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব

এই ক্লাবের সদস্যরা বীরু মুখোপাধ্যায়ের "সংক্রান্তি" নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রমেন চক্রবর্তী, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু পাল, সুবল দাস এবং অসীম মুখোপাধ্যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় নাটকটির নির্দেশনায় দায়িত্ব ও যোগ্যতার সঙ্গে বহন করেন।

• • •

ছাত্রীদের অভিনয়

গত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে মুরলীধর গার্লস কলেজের ছাত্রীরা দুটি নাটক অভিনয় করেন। এ দুটি নাটকের একটি মলিয়ের 'ছাট ছাউনড্রেল ব্যাপিন', অন্যটি রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। উভয় নাটকের অভিনয়ই নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে।

'ছাট ছাউনড্রেল ব্যাপিন' প্রহসনটির পরিবেশ রচনায় এই দল অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। সাজ পোষাক, রূপসজ্জা এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় ও অভিনয়ে এঁরা সতেরো শতকের ফরাসী আবহটি যথাযথ সৃষ্টি করেছিলেন। সম্মিলিত অভিনয়ে কয়েকজন শিল্পী বিশেষ করে 'ব্যাপিন' 'আরজানট' ও গেরেনেট ভূমিকা রূপায়ণ নিঃসন্দেহে তুলনারহিত।

দ্বিতীয় নাটক 'চিরকুমার সভা' কৌতুকরসের কমেডি হলেও এর অভিনয় তত সহজসাধ্য বা উপাদেয় নয়। কিন্তু অভ্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, অরুণ, নীহারদা প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয়ে এঁরা এই নাটকের বাহ্যিক পরিবেশটি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ছাত্রদের, ছাত্রীর কি ধরণের চরিত্রগুলিতে যে কৌতুক রয়েছে, তা যেমন এখানে সমুজ্জ্বলিত, তেমনি রসিক, চন্দ্রবাবু ও মহিলা অভিনেত্রীদের সঙ্গে যতটুকু বাস্তব করা সম্ভব ততটুকুই হয়েছে। শৈল ও রসিকের চতুরতায় যে প্রেমরস ও ভ্রান্তিবিলাসের সৃষ্টি, তাও সুন্দর ভাবে ফুটেছে।

• • •

দীপশিখা

দীপশিখা নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা সম্প্রতি স্টুডেন্টস হল-এ শচীন ভট্টাচার্যের 'বেসরকারী জামাই' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি হাস্যরসের। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় এ নাটকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল গুহ, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষ চক্রবর্তী, রবীন্দু বিশ্বাস, রথীন চক্রবর্তী, শঙ্কর গুহ, শুভেন মুখোপাধ্যায় ও পরিচালক স্বয়ং। অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

• • •

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংঘ

এঁর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের নবম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপায় 'উল্কা' নাটকটি অভিনয় করলেন। পরিচালনা করেছেন নরেন মুখোপাধ্যায়। বিনীত দাস ও বসন্ত সেনের অভিনয় এদিন সবচেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছে। বাকি চরিত্রগুলিতে বিজয় চক্রবর্তী, প্রফুল্ল রায়, মালতী চৌধুরী, সুদীপ রায় ও অনিন্দ্য রায়ের অভিনয় সুঅভিনীত হয়েছে।

• • •

হাউসিং রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্টার রঙ্গমঞ্চে সলিল সেনের 'মৌচোর' অভিনয় করলেন। নির্দেশনায় অনিল বসু। অভিনয়াংশে :—চিত্ত দে, বলরাম পাল, রমেন ভাদুড়ী, রাধেশ্যাম পাল, গোকুল ভট্টাচার্য, শিবনাথ পাল, সমর বসু, অমিতাভ ঘোষ, অজন্তা চৌধুরী ও মানসী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকাকে চরিত্রাচরণ করে তুলতে পেরেছিলেন।

• • •

বেঙ্গল পেপার মারচেন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব

এই সুখ্যাত প্রমোদ সংস্থা কিছুদিন আগে তাঁদের প্রথম নাট্যার্ঘ্য উপহার দেন রঙমহলে। এ-দিনের 'দুই পুরুষ' খুবই মনোগ্রাহী হয়েছিল। নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় 'শিবনারায়ণ'। বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রটি সজীব করে তোলেন তাঁর অভিনয় দক্ষতায়। পূর্ণ শীলের 'সুশোভন', গোপাল দাস 'গোপীনাথ', নির্মল নাগের 'ভূতবিহারী', পূর্ণেন্দু সুরের 'দেবনারায়ণ', ও রতন দাঁর 'মহাভারত' বলিষ্ঠ অভিনয়ে ভাস্বর। রেণু ঘোষ, মীরা মুখোপাধ্যায়, বিভাবনী দেবী, শৈলেশ্বরী বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী চরিত্র রূপায়ণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য চরিত্রকে মানুষ্যময় করে তুলেছিলেন জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, রামরঞ্জন সিংহ, অনিল দাস, অমল সেনগুপ্ত, সন্তোষ শীল ও বহ্নি রায় চৌধুরী।

• • •

রেলওয়ে বোর্ড ষ্টাফ সোস্যাল এণ্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

এঁদের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তাপস চট্টোপাধ্যায়ের 'মনীষীরা' নাটক অভিনীত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের ক্রমাবনতি এ নাটকের উপজীব্য। অভিনয়ে শিল্পীরা তাঁদের চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। অমলী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। চরিত্র শিল্পীদের মধ্যে শিশির চক্রবর্তী, অশোক বসু, প্রভাস সিংহ, প্রফুল্ল ঘর, অধীর কাঞ্জিলাল, রমেন চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু ভট্টাচার্য, অমল গুহ, শিশির গাঙ্গুলি, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, নেপাল লাহা, কালী ভট্টাচার্য, সুনীল সরকার, প্রতিমা চক্রবর্তী, ইরা মিত্র, দীপালি ঘোষের অভিনয় দর্শক মাত্রই পূরণ করতে পেরেছেন।

• • •

পি এণ্ড টি-র কলকাতা টেলিফোন ভবন ইউনিট

এঁরা সম্প্রতি ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'বন্ধন' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। ব্রজেন চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা দাস-এর দুটি ভূমিকায় তাঁদের অপূর্ব অভিনয় দক্ষতার নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। বাকি চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিই ভূমিকানুগ হয়। পরিচালনায় সরোজ দেবনাথ রায়।

• • •

বোকারো কোলিয়ারী রিক্রিয়েশন ক্লাব

সম্প্রতি এঁদের নিজস্ব মঞ্চে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে' অভিনয় করেন। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায়। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, সুধেন্দু বিকাশ সোম, অমর গোস্বামী, পার্বতী সরকার, কল্পনা ভট্টাচার্য, চিত্রা রায়, উৎপল মুখোপাধ্যায় ও পরিচালক স্বয়ং এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন।

নানা প্রসঙ্গ

নোবেল কাওয়ার্ড, জে বি প্রিস্টলি এবং টেরেন্স রেটিগানের পর বর্তমানে গত দশ বছরে যে সব ইংরাজ নাট্যকার প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইংরাজ নাট্যকার

জন অসবর্ণ। Look back in Anger নাটকটি লিখে তিনি রাতারাতি প্রভূত যশ অর্জন করেন। এঁর দ্বিতীয় নাটক The Entertainer লরেন্স অলিভীয়ারের প্রযোজনায় বহুদিন পর্যন্ত চলেছিল। এঁর ঐতিহাসিক নাটক Luther বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়নি।

এন. এফ. সিমপ সন। এঁর প্রথম নাটক Resounding trible ১৯৫৬ সালে মঞ্চস্থ হয়ে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এঁর দ্বিতীয় নাটক One Way Pendulem হাসির নাটকরূপে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। এঁর নাটকে ঘটনার বিন্যাস কম। চরিত্র সৃষ্টির উপরেই নাট্যকারের বেশী ঝোঁক।

অ্যান জেলিকো। এই মহিলা নাট্যচরিত্রীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক My mad Mother. ১৯৫৬ সালে এরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। এঁর সবচেয়ে সফলতম নাটক হচ্ছে The Knack। এটির চলচ্চিত্রও হয়েছে।

জন আয়ডেন। এঁর নাটকে সাধারণতঃ বহু চরিত্র এবং বহু ঘটনার সমাবেশ। এঁর তিনটি নাটক, Little pigs, Dance এবং Happy Haven সমসাময়িক জীবনের সমস্যাও সঙ্কটকে প্রতিফলিত করেছে।

শেলাগ ডেলানি। লেখিকা দুটি মাত্র নাটক লিখেই অপেক্ষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। আঠারো বছর বয়সে লেখা তাঁর ঐ নাটক দুটি, যথা—Taste of honey এবং Lion is Love বহুদিন পর্যন্ত চলেছিল এবং পরে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল।

আরনল্ড ওয়েসকার। মেহনতি মানুষের জীবননাট্যের রূপকার হিসাবে এঁর প্রসিদ্ধি। Roots, Chicken Soup, Jeruselem, বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর জীবন নিয়ে রচিত।

• • •

রাশিয়ায় ভারতীয় নাটক

রাশিয়ার নানা শহরে ভারতের নানা ভাষার নিয়মিত চর্চা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন নাটক এবং কাহিনীর নাট্যরূপ ও পরিবেশিত হচ্ছে।

মস্কোর থিয়েটার-দর্শকদের কাছে "রামায়ণ"-এর নাট্যরূপ সম্প্রতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গত ২৬শে জানুয়ারী মস্কোর কেন্দ্রীয় শিশু রঙ্গমঞ্চে তা মঞ্চস্থ হয়েছিল। অমর ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে করে এর নাট্যরূপ রচনা করেন বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতী নাতালিয়া গুসেভা।

অভিনয় দেখতে এক হাজার আসন সম্বলিত প্রেক্ষাগৃহটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মস্কোর বিশিষ্ট নাগরিকরা ছাড়া বিশেষ করে তরুণ তরুণী ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা 'রামায়ণ' দেখতে ভীড় করে।

অভিনয়কালে যে দৃশ্যে বনবাস-পর্বে সীতা লক্ষ্মণের আঁকা গণ্ডীটি থেকে বেরিয়ে আসার রাবণের হাতে পড়েন, সে দৃশ্যে দর্শকদের মধ্যে দেখা যায় উদ্বেগ এবং অভিনয়ের শেষাংশে যখন দুষ্ট শক্তিকে পরাস্ত করে শুভশক্তি জয়ী হয়, তখন জেগে ওঠে স্বস্তি ও আনন্দ।

মস্কোর কেন্দ্রীয় শিশু রঙ্গালয়ে 'রামায়ণ' অভিনয়ের শেষতম রজনী খুব শীঘ্রই পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এই নাট্য সম্প্রদায় মনে করছেন যে, সোভিয়েত ইনিয়নের অন্যান্য অঞ্চল ও শহরেও 'রামায়ণ'-এর নাট্যাভিনয় অনুরূপভাবে সাফল্য মণ্ডিত হবে।

অভিনেত্রীর জীবন

কে কেণ্ডাল

বহু চিত্র তারকার মতো কে কেণ্ডালও একদিন স্বপ্ন দেখতেন খ্যাতির। আজ যখন তিনি খ্যাতির মন্দিরে পৌঁছে গেছেন তখন খ্যাতির জন্য আর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার প্রযোজিত 'স্যুয়েটিন ডারওয়ার্ড' ছবিতে যখন তিনি অভিনয় করছিলেন তখন ব্রিটেনের একটি বিখ্যাত সাময়িক পত্রের তরফ থেকে তার কাছে একটি লোভনীয় প্রস্তাব আসে। শ্রীমতী কেণ্ডালকে বলা হয় ছটি কিস্তিতে আত্মজীবনী লিখে দিতে। কিন্তু শ্রীমতী কেণ্ডাল সেই প্রস্তাব সবিনয়ে বাতিল ক'রে দিয়ে জানান "আত্মজীবনী লেখার মতো যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারিনি। কী ই বা করেছি। অপেক্ষা করুন। আমার বয়েস আগে পঞ্চাশ হোক।" তিনি জানালেন যে, এখন তাঁর জীবনী বেরুলে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কারুরই তা ভালো লাগবে না।

শ্রীমতী কেণ্ডাল বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, সংগীত-প্রধান 'লণ্ডন টাউন' ছায়াচিত্রে অভিনয় ক'রে দর্শকদের কাছ থেকে যে অকপট সাধুবাদ পেয়েছেন তাই তাঁর সব-চাইতে বড়ো বিজ্ঞাপন।

ইয়র্কশায়ারের অভিনেত্রী শ্রীমতী কেণ্ডালের মা রোজা টেরী এবং মেইন কেণ্ডাল দুজনেই ছিলেন নর্তকী। তাঁর মাতামহী মেরী কেণ্ডাল ছিলেন পুরোনো যুগে এক সংগীত ভবনের পরিচালিকা।

মা রোজা যখন দেশে-দেশে নৃত্য প্রদর্শনী ক'রে বেড়াতেন শ্রীমতী কেণ্ডাল তাঁদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন নানাদেশে। ভ্রমণরত অবস্থাতেই শ্রীমতী লেখাপড়া শিখেছেন। তিনি পড়েছেন প্রায় চৌদ্দটি স্কুলে। দশ বছর বয়সে ভর্তি হয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এক কনভেণ্ট স্কুলে। কিন্তু সেখানকার স্কুল তাঁর কাছে মনে হতো কারাগার। তাই দুবছর পরে পালিয়ে যান লণ্ডনে। মাথায় লম্বা ছিলেন ব'লে নতুন স্কুলের খাতায় বয়স লেখালেন চৌদ্দ। এক নাচের দলে কাজও পেলেন এই বয়সে। দলের নাম 'ওয়াইল্ড ভায়োলেটস'। পরে বোনের সঙ্গে একত্রে তিনি বিচিত্রানুষ্ঠান করে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু 'লণ্ডন টাউন' ছায়াচিত্রে অভিনয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। আর নর্তকীর জীবন নয়, শুরু হলো তাঁর অভিনেত্রী জীবন।

অভিনয় করলেন 'লেডি সোফিয়া রাইডস এগেন' ছবিতে। ছবির পরিচালক ক্লাড লাভার। অভিনয় করলেন একটি পার্শ্ব-চরিত্রে। তা-ও চারদিকে হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো।

এর পরে তিনি আরো অনেকগুলি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। এদের মধ্যে আছে দি কনস্ট্যাণ্ট হাসবেণ্ড, কুয়েস্টিন ডারওয়ার্ড, আর লাইমন অ্যাণ্ড লরা। দি কনস্ট্যাণ্ট হাসবেণ্ড ছবিতে তাঁর সহযোগী অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন রেক্স হ্যারিসন ও মার্গারেট লেইটন, আর কুয়েস্টিন ডারওয়ার্ড ছবিতে রবার্ট টেইলর ও রবার্ট মর্লি।

অভিনয় পর্যায় বিপুল সাফল্য লাভ করার পরেও কিন্তু শ্রীমতী কেণ্ডালের মন প'ড়ে আছে মঞ্চের দিকে। পর্দার চাইতে মঞ্চই তিনি বেশি ভালোবাসেন। বার্নাড শ-য়ের 'পীগমেলিয়ন' নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন লিজার ভূমিকায়। তবে নর্তকী রূপে শ্রীমতী কেণ্ডালকে বোধ হয় আর দেখা যাবে না।

শ্রীমতী কেণ্ডাল অবিবাহিতা। তিনি থাকেন লণ্ডনের হাইড পার্কের ধারে ছোট একটি ফ্লাট বাড়িতে। নাইট ক্লাবে তিনি একেবারেই যান না। সুরাপান কদাচিৎ যদিই বা করেন ধূমপানের অভ্যাস একেবারেই নেই।

পোশাক-পরিচ্ছদের বাহারের দিকে তাঁর আকর্ষণ নেই। বেড়াতে ভালোবাসেন। ঘুমুবার আগে তাঁর ভালো লাগে মোটা পাতার গল্প পড়তে। তাঁর সব চাইতে প্রিয় গায়ক নাট কিং কোল। কিং-এর গানের অনেক রেকর্ড তিনি কিনেছেন।

কিন্তু স্টুডিয়োতে তাঁকে সবাই ভালোবাসে। তখনো সর্বদাই তাঁকে দেখা যায় ব্যস্ত অবস্থায়। কিন্তু মেজাজ খারাপ করতে কখনো তাঁকে দেখা যায় না। জীবনের প্রাথমিক ব্যর্থতার ছাপ তাঁর চরিত্রে নেই, সাম্প্রতিক খ্যাতি তাঁকে এতটুকুও অহংকারী ক'রে তোলে নি। সকলের প্রতিই তাঁর বন্ধু ভাব। অন্যের উপরে টেক্কা দিয়ে নয়, নিজের গুণে তিনি বড়ো হতে চান।

জাপানী ছায়াছবির কাহিনী

শিকারীর ডায়েরী

স্ত্রী জাতির প্রতি হনডার অতিরিক্ত আসক্তি। অথচ সে যাকে বিয়ে করেছে সে শীতলকায় স্ত্রীলোক। স্ত্রী-র সঙ্গে হনডার দেখা হয় সপ্তাহে মাত্র একবার। অবসর সময়ে হনডার একমাত্র কাজ হলো স্ত্রীলোক শিকার ক'রে বেড়ানো। শুধু তাই নয়, কত জন মহিলার সে সর্বনাশ করেছে হনডা তা গর্বের সঙ্গে টুকে রাখে একটা নোট বইতে। নোট বইটার সে একটা নামকরণও করেছে—'শিকারীর ডায়েরী'।

হঠাৎ শুরু হয় এক রহস্যময় হত্যাকাণ্ড। কে এক অজ্ঞাত আততায়ী হত্যা ক'রে চলে হনডার রক্ষিতাদের একে একে। তাদের মৃত্যুর জন্য হনডাকেই অভিযুক্ত করা হয়। হনডার পক্ষের অ্যাটর্নি চেষ্টা করে প্রকৃত খুনীকে খুঁজে বের করতে। আততায়ী কখনো স্পষ্ট আলোতে আবির্ভূত হয় না। শুধু শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় হনডার স্ত্রী-ই আসল খুনী। স্বামীর ডায়েরী প'ড়ে সে রাগে জ্ব'লে উঠেছিলো কেন না ওই ডায়েরীর প্রথম পাতায়ই নিজের স্ত্রী সম্পর্কে হনডা লিখেছে : মেয়েটি নিশ্চয়ই কুমারী নয়।

নট-নটী

রুশসী ফরাসী-কানাডীয় অভিনেত্রী সুজান ক্লটিয়ার পিটার উসিনভকে বিয়ে করার জন্য অভিনেত্রীর জীবন ত্যাগ করেছিলেন। তিনি জেট বিমানে প্যারিস থেকে হলিউডে গিয়ে হাজির হয়েছেন তাঁর বিখ্যাত স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। অভিনেতা উসিনভ বর্তমানে ওয়াল্ট ডিসনের সর্বশেষ কমেডি 'ব্ল্যাক বিয়ার্ড'স ঘোষ্ট' ছবিতে অভিনয় করছেন। পামা, ইগর, আন্দ্রিয়া এই তিনটি সন্তানকে নিয়ে মিসেস উসিনভ হাজির হয়েছেন স্বামীর কাছে।

• • •

ওয়ার্নার ব্রাদারস প্রযোজিত 'দি অব হাউার' ছবিতে অভিনয় করবেন জ্যাক লেমন। জ্যাক ওয়ার্নার এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। ছবিটি তৈরী হবে ইয়র্কে এবং হলিউডে। ১৯৬৭ সালের শেষ দিকে। সাম্প্রতিক কালের সমস্যা নিয়ে রচিত 'দি অব হাউার' এর কাহিনী। এতে আছে একজন সফল কর্মচারী হঠাৎ বেকার হয়ে পড়ার পর তার জীবনে কী ক'রে সমস্যা ঘনিয়ে এলো। ছবিটি পরিচালনা করবেন স্টুয়ার্ট রোসেনবার্গ।

'ডেডলিয়ার দ্যান দি মেল' ছায়াছবির পরিচালক রালফ টমাস রহস্য-চিত্রটির নায়িকার সন্ধানে সারা য়ুরোপ চষে ফেলেছিলেন। হঠাৎ তিনি মনোমত নায়িকার খোঁজ পেয়েছেন। ইনি

হলেন ইয়াসুকো নাগাত্সুমী। একজন জাপানী অভিনেত্রী। সুন্দরী অভিনেত্রী। পরিচালক একদিন অলস মুহূর্তে লণ্ডনের একটা সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রজ্ঞাচক্ষে দেখতে পেলেন ওই জাপানী অভিনেত্রীর ছবি। সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ।

• • •

বিশ বছর আগে হলিউডে এসেছিলেন অভিনেতা ডন গর্ডন। কিন্তু এরি মধ্যে তিনি অভিনয় করেছেন ২৫০টি ছায়াচিত্রে। এর ভিতরে আবার ২০০টি ছবিতেই তিনি অভিনয় করেছেন শেরিফের ভূমিকায়।

• • •

অ্যাডলী পারকিন্স অভিনয় করেছেন 'ফাস্টেন যার্ডার' ছায়াছবিতে। তিনি প্রায়ই গর্ব ক'রে ব'লে থাকেন যে তিনি জগদ্বিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর আঁকা চারখানি ছবির মালিক। টনি ওই ছবি-গুলিকে কায়দা ক'রে এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রেখেছেন যাতে সর্বদাই চোখে পড়ে। কোথায় তা অনুমান করতে পারেন কি? বাথরুমে।

• • •

ইতালীর সুন্দরী অভিনেত্রী লুসিয়ানা পালুজি প্যারামাউন্ট প্রযোজিত 'চুকা' ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ওই ছবিতে অভিনয় করছেন অভিনেতা রোড টেইলর এবং জন মিলস। মিস পালুজি অভিনেত্রীর জীবন শুরু করেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে। তাঁর অভিনীত সর্বপ্রথম ছবি 'থ্রি করেল ইন দি কাউকেন্'।

• • •

'বেয়ারফুট ইন দি পার্ক' ছবিতে বহু ইপ্সিত নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন জেন ফণ্ডা। চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন নেইল সাইমন। হলিউডে অভিনয় করার জন্য মিস ফণ্ডা প্যারিস থেকে চ'লে এসেছেন।

• • •

রুশসী অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন এক হিন্দুমনা প্রতিশোধ সন্ধানী নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ওই নারী গোপনে একটি দেশে ঢুকে হারানো স্বামী ও সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ছবির পরিচালক ভানিয়েল মান। ছবিতে অভিনয় করছেন সোফিয়া লোরেন, পিটার ফিনচ এবং অ্যাঙ্ক হকিন্স। ছবির নাম 'হুডিথ'। এই ছায়াচিত্র শীঘ্রই 'নিউ এম্পায়ার'এ প্রদর্শিত হয়ে কলকাতার দর্শকদের আনন্দ দেবে।

• • •

ছায়াবাণী-সংবাদ

ইউনিভার্সাল প্রযোজিত 'গান ফাইট ইন অ্যাবিলেন' ছবিতে বৃষ্টির একটি দৃশ্য দেখাবার জন্য ১৪,০০০ ফুট লম্বা একটি পাইপ এবং ২,০০০,০০০ গ্যালন জল ব্যবহার করতে হয়। এর জন্য মোট খরচ হয় ৪০০০ ডলারেরও বেশি। ছবিটির রসিক পরিচালক মন্তব্য করেছেন যে, একেই বলে জলের মতো টাকা খরচ করা।

• • •

এই সপ্তাহে দুটি হিন্দী রঙিন ছায়াছবি কলকাতায় প্রদর্শিত হবে। একের নাম 'আম্রপালী' এবং 'দিল নে ফির ইয়াদ কিয়া'। 'আম্রপালী' চিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বৈজয়ন্তীমালা। নায়কের ভূমিকায় আছেন সুনীল দত্ত। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে আছেন প্রেমনাথ, বিপিন গুপ্ত, কে. এন. সিংহ, জয়শ্রী, সুলোচনা এবং আরো অনেকে। সংগীতে আছেন শংকর জয়কিষণ।

• • •

ইসমাইল মার্চেন্ট প্রযোজিত ইংরেজী ছায়াচিত্র 'শেক্সপীয়ারওয়ালা' ছবিটি এবার ভারতে প্রদর্শিত হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ছবিটি দেখানো হবে দিল্লীর উদ্যোগ ভবনে। ওই প্রদর্শনী থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা সবই চ'লে যাবে প্রধানমন্ত্রীর বন্যা-ত্রাণ তহবিলে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলির কাছ থেকে শুধু নয়, ওই দুই দেশের অসংখ্য দর্শকদের কাছ থেকেও এই ভারতীয় ছবিখানি অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে।

• • •

মিঃ রায়াবিন সাগর মন্তব্য করেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়াতে ভারতীয় ছায়াচিত্রের বেশ চাহিদা এবং একটি ভালো বাজার রয়েছে। কিন্তু আগামী দু তিন বছরের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা যদি সে বাজার দখল করতে না পারেন তবে তা অন্য কোনো দেশের দখলে চলে যেতে পারে। ভারতীয় সেন্সর বোর্ড নয়খানি 'বাই নাইট' ছবির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। এই ছবিগুলি হলো: এমেরিকা বাই নাইট, ইউনিভার্স বাই নাইট, ওরিয়েন্ট বাই নাইট, ওয়োমেন অব দি ওয়ার্ল্ড, প্যারিস আপেন, সুইট সুইট নাইটস, টোকিয়ো বাই নাইট, কোপাকাবানা প্যালেস এবং ওয়ার্ল্ড বাই নাইট। ছবিগুলি বন্ধ করার যে কারণ দেখা হয়েছে তা কিন্তু হাস্যকর। নানা জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে তাই নাকি ছবিগুলি নিষিদ্ধ হলো। কিন্তু এতদিন প্রদর্শিত হওয়ার পর সেন্সর বোর্ডের শুভ বুদ্ধির উদয় হলো। কর্তারা দেখছি একটু লেটে যোগেন। তাঁরা কি লক্ষ্য করছেন যে 'বাই নাইট' ছবির বদলে এখন আবার শুরু হয়েছে 'সিক্রেট এজেন্ট' ছবির দৌরাত্ম্য!

বৈচিত্র্যের যাদুকর ওয়াল্ট ডিজনী

হীরেন চৌধুরী

অবশেষে ডিজনী বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে। ভগবানের নিয়মে জন্ম হ'লে মৃত্যু আছেই, মানুষকে তাই ধরে রাখা যায় না, রয়া পড়ে তার প্রতিভা। ছায়াছবির জগতে বৈচিত্র্য প্রেমিক ওয়াল্ট ডিজনী নানা রঙের, নানা স্বাদের, বিচিত্র সব আঙ্গিকের ছায়াচিত্রের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাকে, চেতনাকে এবং সর্বোপরি কার্টুন ছবিতে তাঁর সমগ্র সত্তাকে উপস্থিত করেছেন স্মরণীয় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষরে। জগতে বরেণ্য প্রতিভাবানদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হবে চিরকাল একই শ্রদ্ধায়।

ডিজনীর জন্ম আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৯০১ সালের ৫ই ডিসেম্বর। আর্থিক দুর্গতির জন্য তাঁর লেখাপড়ার সুযোগ তেমন পাননি, কিন্তু তখন থেকেই অন্তরের তাগিদে তাঁকে ছবি আঁকবার

প্রেরণা দেয়, এছাড়া ছিল অভিনয়ের স্পৃহা। তখন চার্লি চ্যাপলিনের চিত্রধারার যুগ, শিশু ডিজনী চ্যাপলিনের গভীর অনুভবের দিকটা ঠিক অতখানি না বুঝলেও চার্লির অভিনয় দক্ষতায় একনিষ্ঠ পূজারী ছিল। খুব জীবনে চার্লিকে অনুকরণ করেই অভিনয় খ্যাতিতে পরিচিত হয় বালক ডিজনী। কিন্তু কৈশোরের জীবনের এই নির্মল আনন্দে বেশীদিন নিমগ্ন থাকতে পারেনি ওয়াল্ট। বাবার অনিয়মিত রোজগার এবং সাংসারিক অনটন ওই বয়সেই ডিজনীকে ঘরছাড়া করে টেনে নিয়ে গেল বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের বিরাট হুঙ্কারের আঙিনায়। শিল্পী অভিনেতা ওয়াল্ট ডিজনী হ'ল পুরোদস্তুর সৈনিক। যুদ্ধশেষে ওয়াল্ট ফিরলেন দেখে সৈনিক জীবনের বীভৎস রূপ দেখে। তাঁর চিন্তাধারায় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে অনিবার্য্য নিয়মেই, মানুষে মানুষে হানাহানি আর জীবনের ব্যাপক ক্ষয় দেখে ওয়াল্ট ডিজনী আরো ভালবাসতে শিখলেন মানুষকে, জীবনে আনন্দের মন্ত্র প্রচারের চেষ্টায় নিজেকে ঢেলে দিলেন অতঃপর।

কোন কাজের মধ্যে দিয়ে নিজের চেতনাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় ভাবতে গিয়ে শেষে একদিন পথ খুঁজে পেলেন ডিজনী, ঠিক করে ফেললেন তিনি হবেন কার্টুনিষ্ট। তাঁর অন্তরের সত্তাকে প্রকাশের এই-ই একমাত্র পথ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া কোন পথেই বেশীদূর এগোনো যায় না তাই ডিজনী অনেক দিয়ে আরো পারদর্শিতা দেখার জন্য ভর্তি হলেন চিকাগো আকাডেমি অফ্ আর্ট-এ ছাত্র হিসেবে। চলনো ছবি আঁকা, কিন্তু যে পদ্ধতিতে তখন শেখানো হ'ত চিরাচরিত সেই পদ্ধতিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না ওয়াল্ট। শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই ঢুকে পড়লেন এক চাকরীতে প্রথম সুযোগেই, অবশ্য চাকরীও ছবি আঁকার, বিজ্ঞাপনের ছবি।

হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে ডিজনী ভাবতে লাগলেন আরো বিরাট কিছু করার। এ-ও বুঝলেন যে হলিউড না গেলে তাঁর স্বপ্ন সফল হবার নয়, কারণ হলিউড হচ্ছে পৃথিবীর চিত্রজগতের কেন্দ্রস্থল।

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে অবশেষে ভাই রয়-কে সঙ্গে নিয়ে হলিউডে এসে পৌঁছলেন ডিজনী। সঙ্গে মাত্র তিনশো ডলারের পুঁজি। দিন কয়েকের মধ্যেই সামান্য ভাড়ায় পরিত্যক্ত এক গ্যারেজ পাওয়া গেল। কালবিলম্ব না করে গড়ল ফেললেন ডিজনী স্টুডিও-র। এমনি করেই আগামী দিনের মহীরুহের বীজ রোপিত হ'ল নোংরা দুর্গন্ধপূর্ণ প্রায়ান্ধকার পরিবেশে।

ওয়াল্ট এবং রয়, ডিজনী স্টুডিও-র এই দুজন হোতা। রয়ের কাজ হোল নানা উপায়ে টাকার জোগাড় করা এবং ব্যবসার যাবতীয় কাজকর্ম দেখা। ওয়াল্ট ডিজনী মেতে রইলেন নতুন সৃষ্টির নেশায়।

ডিজনী স্টুডি-র প্রথম ছবি হোল 'অ্যালাইস্ ইন্ কার্টুন ল্যাণ্ড'। ছবিটি পুরোপুরি কার্টুন চিত্র নয়। জীবন্ত চরিত্র আর হাতে আঁকা ছবির বিচিত্র সমন্বয়। দর্শকরা ছবিটা তেমনভাবে গ্রহণ না করলেও, খানিকটা বিস্মিত হোল ছবিটির প্রয়োগ কৌশলের নতুনত্ব দেখে।

এ ছবি দেখে এক প্রযোজক এগিয়ে এলেন। ডিজনীকে দিয়ে পরপর বাটখানা ছবি করালেন ওই একই ধরণের। কিন্তু বরাত খারাপ ডিজনীর, এতগুলো ছবির কোনটাই তেমন সাড়া জাগাতে পারল না। প্রযোজক ভদ্রলোক ব্যবসায়ী, হালচাল দেখে সোজা ডিজনীকে জানিয়ে দিলেন, নতুন আর কোন ছবিতে টাকা ঢালবেন না তিনি।

মনে আঘাত পেয়ে ডিজনী ফিরে এলেন নিউইয়র্ক থেকে। সেখানে গিয়েছিলেন যার আহ্বানে, তার ব্যবহার হতাশ করেছে তাঁকে। ডিজনীও মন স্থির করে ফেলেছেন, এবার যা কিছু করবেন, স্বাধীন ভাবে করবেন।

ট্রেনে ভাবতে ভাবতে ফিরছেন ওয়াল্ট। কী এমন নতুন চরিত্র কিংবা কার্টুন ছবির মাধ্যমে উপস্থিত করা যায় যা দেখে লোকে তাক্ষিক হবে। 'আলিস্ ইন্ কার্টুনল্যাণ্ডের' চেয়েও যা হবে মনোগ্রাহী। মনোরাজ্যের অপরিসীম চিন্তা-ভাবনার মাঝেই বিদ্যুৎ চমকের মত আইডিয়াটা মাথায় এল। মনে পড়ল মোরো গ্যারেজে ডিজনী স্টুডিও-র ছবি আঁকতে আঁকতে কতদিন লক্ষ্য করেছেন একটা নেংটি ইঁদুরকে। ওরকে গেলে একরকম বন্ধুত্বই হয়ে গিয়েছিল ক্ষুদে ইঁদুরটার সঙ্গে। তিনি ছবি আঁকতেন, আর খাবারের খোঁজে ইঁদুরটা খুব খুব কাছে কাছাকাছি, নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে। ভারী চঞ্চল, চকিতে সতর্ক হওয়ার প্রতিটি ভঙ্গি তার মনে গেঁথে গিয়েছিল ডিজনীর। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, অ্যালাইস্ নয়, আগামী ছবিতে ওই ইঁদুরটাকেই নায়ক করে নেবেন।

প্রতিভাবানদের ধরণই বোধকর এইরকম। স্মৃতির এ্যালবামে সব কিছুকেই ধরে রাখে, তা না হলে অমন নিখুঁত ভাবে 'মিকি মাউস'-কে সৃষ্টি করতে পারবেন কেন ডিজনী! প্রথম ছবি 'প্লেন ক্রেজি'-তে দেখা দিয়েই 'মিকি' মন জয় করল সব শ্রেণীর দর্শকদের। তার আর তার স্রষ্টা ডিজনীর জয় জয়কার পড়ে গেল চতুর্দিকে। এ হোল ১৯২৮ সালের কথা।

ডিজনী নিজে খুব খুশী হলেন 'মিকি'র রূপায়ণে। একটু মায়াও হোল ওঁর 'মিকি'র ওপর, বেচারী বড়ই নিঃসঙ্গ, একাকী। ওর চাই একজন সঙ্গিনী। আঁকলেন এবার 'মিনি'কে। দ্বিতীয় ছবি 'গ্যালোপিন গোচো'তে ওদের দুজনকে দেখা গেল একত্রে। এ ছবিও খুব সাফল্য লাভ করল।

কিন্তু এক আইডিয়াকে বেশীদিন আঁকড়ে ধরে রাখতে চান না ডিজনী। তিনি বৈচিত্র্য-প্রেমিক, হৃদয় ওঁর নিত্যনব রসের সন্ধানে আকুলিত, তাই তিনি আবার ভাবতে লাগলেন আরো নতুন কিছু করার।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে ছায়াছবিতে শোনা গেল। 'অল্ জলসন্'-এর কণ্ঠস্বর 'দি জাজ্ সিঙ্গার' চিত্রে। মূক রূপালী পর্দা মুখর হোল, অবসান ঘটল নির্বাক যুগের। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ডিজনী, এতদিনের ভাবনা ঘুচলো। পেয়েছেন তিনি নতুন আইডিয়া। 'মিকি' আর 'মিনি'কে শুধু ছবি নয়, ভাষার মাধ্যমেও ফুটিয়ে তুলবেন। তারা আর পাঁচজনের মতই ছবিতে হাসবে, গাইবে, কথা বলবে। শব্দ যোজনা করে কার্টুন ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন ডিজনী।

১৯২৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ডিজনী স্টুডিওর নতুন 'স্টিমবোট উইলি'র মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমেরিকায় সাড়া জাগলো। অভাবিত আদর কাড়ল 'মিকি'র। ডিজনীর নাম উচ্চারিত হতে লাগল সর্বত্র সেই সঙ্গে। এবার পর পর ছবি তৈরী করে চললেন ওয়াল্ট। 'দি অপেরা হাউস' (মার্চ ১৯২৯) 'স্কেলিটন ডান্স' (মে ১৯২৯), 'দি বার্থ ডে পার্টি' (১৯৩০)। প্রত্যেকটি ছবিই অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করল। বিশ্ববাসী কাছে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ডিজনী।

টেকনিকালার পদ্ধতিতে তোলা রঙিন ছবি তখন বাজারে বেরিয়েছে। এ পদ্ধতি দেখে সঙ্গে সঙ্গেই ভাবতে শুরু করেছেন ডিজনী,—রঙীন ছবি করলে কেমন হয়? নানা রঙের পোষাক

পরে 'মিকি' 'মিনি'র হাত ধরে বেড়াচ্ছে ফুলের মেলায়, আকাশ, পৃথিবী, ফুল ফল, গাছপালা সবই বর্ণ সুষমায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে ছবিতে। ছবি পাবে রঙের মাধ্যমে নতুন জীবন।

প্রথম ছবি হোল 'স্লাওয়াল অ্যাণ্ড ট্রিম।' ছবি দেখে দর্শকেরা, তারাও যে ঠিক এমনটিই চাইছিল। ডিজনী নিজেও খুশী হলেন, তবু আরো নতুন কিছু করার ব্যাকুলতা তাঁর ঘুচল না। পরের ছবি 'সিলি সিম্ফনী'তে তাই রঙের সঙ্গে যুক্ত দিলেন সংগীত, ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে। এ ছবি শুধু খ্যাতিই অর্জন করল না, ডিজনীর পকেটে পয়সা এনে দিল প্রচুর। আর্থিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ওয়াল্ট পরের পর এই ধরণের ছবি তৈরী করলেন। 'দি এ্যাসহপার অ্যাণ্ড দি আর্টস' (১৯৩৪); দি টমটমেস্ অ্যাণ্ড দি বেয়ার' (১৯৩৫), 'দি ব্যাণ্ড কনসার্ট' (১৯৩৫), 'হু কিল্ড কক্ রবিন' (১৯৩৫) 'দি ফ্লক ফীনার্স' (১৯৩৭), 'সোন্সাস্ ঘোষ্টস্' (১৯৩৭) প্রভৃতি।

'সিলি সিম্ফনী' ছবিটি নির্মাণের সময় থেকেই ডিজনী চিন্তা করে চলেছিলেন একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য কার্টুন ছবি তোলার কথা। বাধা ছিল শুধু টাকার, অপ্রত্যাশিত ভাবে তার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ব্যাঙ্ক এগিয়ে এল প্রচুর টাকা ধার দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ডিজনী। নতুন ধরণের ক্যামেরা ব্যবহার করে বহু অর্থব্যয়ে তৈরী হতে লাগল পূর্ণদৈর্ঘ্যের কার্টুন ছবি 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফস'।

১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর টাকা দিতে লাগল এই ছবি। আশাতীত পুরস্কার লাভ করলেন ডিজনী। রাণীর ছদ্মবেশের হাতে মহাদেবী লক্ষ্মী তুলে দিলেন তাঁর ফাঁসি।

১৯৪০ সালে ডিজনী তার স্টুডিও স্থানান্তরিত করলেন বারব্যাঙ্ক-এ। পাহাড়ে ঘেরা তার কারনাল্বো উপত্যকার বুকে তৈরী হল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিস্ময়। ডিজনীর এই নতুন স্টুডিওতেই পরবর্তীকালে নির্মিত হল পৃথিবী বিখ্যাত সব ছবি, 'পিনোকিও' (১৯৪০), 'ফ্যান্টাসিয়া' (১৯৪১), 'ব্যাম্বি' (১৯৪২), 'ভিক্টরি থ্রু এয়ার পাওয়ার' (১৯৪৩), 'দি থ্রি ক্যাবালেরোস্' (১৯৪৪), 'মেক মাইন্ মিউজিক্' (১৯৪৬)।

এতো গেল কার্টুন ছবির দিক। এ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়বস্তু নিয়ে ডিজনী যেসব ছবি করেছেন তার মধ্যে তাঁর বৈচিত্র্য অনুসন্ধানী মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণী জীবন নিয়ে প্রামাণ্য ছবিগুলি তো অপরূপ বিস্ময়ের নিদর্শন। তাঁর 'নীডার ল্যাণ্ডী' (১৯৪০), 'ওয়াটার বার্ডস' (১৯৫২), 'সীল আইল্যাণ্ড' (১৯৫৩), 'লিভিং ডেজার্ট', (১৯৫৩), 'দি আফ্রিকান লায়ন' (১৯৫৬), 'হোয়াইট ওয়াইলডারনেস্' (১৯৬০) প্রভৃতি ছবিগুলি মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের এক অপূর্ব সঞ্চয়।

ডিজনীর নিজস্ব ছিল অনুসন্ধিৎসু শিশুমন। শিশুদের তাই তিনি কম ভালোবাসতেন না। তাদের জন্য তৈরী করে গিয়েছেন পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞাত-অজ্ঞাত বৈচিত্র সম্ভারে সুসজ্জিত উদ্যান ডিজনী ল্যাণ্ড। ডিজনীর অবাক করা ছবি 'সুইস ফ্যামিলী রবিনসন্'-এ 'ডিজনী-ল্যাণ্ড'-এর খানিকটা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

যারা যাওয়ার আগে ফ্লোরিডার উপকূলে 'ডিজনী-ল্যাণ্ডে'র নামে এবং সুবৃহৎ পর্য্যায়ের কাজে হাত দিয়েছিলেন ডিজনী। কিন্তু অকস্মাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল আমাদের মাঝখান থেকে। শিশুদের জন্য বৃহত্তর ভালবাসার অফুরন্ত চিহ্ন রেখে তিনি বিদায় নিয়েছেন বটে কিন্তু মহাকালের চিরস্মরণীয় অমোঘ ইতিহাসের বুকে তাঁর নাম জ্বল জ্বল করবে আকুল ভালবাসার বহ্নিতে অগ্নির মুখের শুকতারার মত।

চলতি দুনিয়া

দাঁড়কাকের কারাদণ্ড

বিলাতের খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে। লণ্ডনের ঐতিহাসিক কেল্লার দাঁড়কাকদের চৌদ্দদিনের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ওরা নাকি খারাপ ব্যবহার করেছিলো।

গম্ভীর দর্শন প্রস্তর-দুর্গের ওই সাতটি দাঁড়কাক বহুদিন ধ'রে ওই দুর্গে বাস ক'রে আসছে। রাজার পক্ষ থেকে ওরা বুঝি খোরাক পাহারা দিচ্ছে।

ইংল্যাণ্ডের বহু প্রচলিত একটি জনশ্রুতি বলে—ওই কাকগুলো যেদিন চ'লে যাবে সেদিন ইংল্যাণ্ডের রাজলক্ষ্মীও হবেন অন্তর্হিত। সেই কাকগুলোকেই কিনা খাঁচায় আটক ক'রে রাখা হলো। যেমন অনেক ব্যক্তিকে একদিন আটক ক'রে রাখা হয়েছে ওই কেল্লার কারাগারে।

ওই কাকগুলোর খাদ্য কিন্তু জল্ আর রুটি নয়। কেল্লাদারকী প্রতি সপ্তাহে মাংসের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

কয়েক শ' বছর আগে মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ করার অভিযোগে পশুদেরও আদালতে হাজির করা হতো এবং অপরাধ গুরুতর হ'লে তাদের প্রাণদণ্ডও দেয়া হতো। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের য়ুরোপে কোনো শহরে যদি বিশেষ ধরণের কোনো পশু-পাখির উৎপাত দেখা দিতো তবে আদালতের নির্দেশক্রমে সরেজমিনে তদন্ত করা হতো। তদন্তে যদি দেখা যেতো পশু বা পাখি সত্যি জনসাধারণের গুরুতর ক্ষতি করেছে তবে অপরাধীর তরফ থেকে উকিলকে অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করতে বলা হতো। আধুনিক কালে এই ধরণের মুক্ত নিতান্ত বিরল।

নব যৌবন

ঘটনাটা ঘটেছে আরব দেশে। ১৫০ বছর বয়স্ক শেখ বটল বিবাহ করেছেন ৫০ বছর বয়সের এক মহিলাকে। কনের সঙ্গে শেখের বয়সের ব্যবধান এই মোটে ১০০ বছরের। খবরটা বেরিয়েছে মস্কোর খবরের কাগজ 'নাদ-ওয়াতে'। ওই কাগজ থেকেই জানা যায়, শেখ বটল থাকেন মরুভূমি এলাকায়, রোজ তিনি অন্তত ৯ মাইল হাঁটেন। তাঁর স্বাস্থ্য এখনো বেশ অটুট। সত্যি বয়সে কি আসে যায়!

মৃত সঞ্জীবনী ছাড়াই

মৃত-সঞ্জীবনী ও বিশল্যকরণীর সাহায্যে সুষেন বৈদ্য মৃত লক্ষ্মণের দেহে প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন ব'লে রামায়ণে উল্লেখ আছে। আমেদাবাদের হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটে গেছে তা তার

চাইতে কম বিস্ময়কর নয়। ১০ মিনিট মৃত অবস্থায় থাকার পর এক ব্যক্তির দেহে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে। ৬০ বছর বয়স্ক লোকটি এসেছিলো হাসপাতালে তার ভাইপোকে দেখতে। হঠাৎ তার হৃৎযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ম্যাসাজ করে তার রক্তসঞ্চালন অব্যাহত এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-কার্য চালু রাখা হয়। ১০ মিনিট পরে তার হৃৎযন্ত্রটি আবার কাজ শুরু করে। হৃৎ-স্পন্দন থেমে যাওয়া যদি ডাক্তারী শাস্ত্রে মৃত্যুর লক্ষণ ব'লে ধরা হয় তবে ওই ১০ মিনিট লোকটি মৃত ছিলো বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে এই ধরণের ঘটনার কথা খুব কমই শোনা যায়।

উই আর ইঁদুরের কাণ্ড

এলাহাবাদে সরকারী কর্মচারীরা ছুইবাস ব'য়ে ধর্মঘট চালিয়েছিলো। কিন্তু তারা ধর্মঘট করলে কি হবে, যারা কাজ করার তারা ঠিকই কাজ ক'রে চলেছিলো। মানে উই আর ইঁদুরেরা। বরং মানুষের আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাদের সোয়াস্তি হয়েছিলো। এলাহাবাদের হাইকোর্টের গুদামের প্রাগারে ছিলো বহু পুরাতন ও প্রাচীন আইন-পুস্তক। উই আর ইঁদুরেরা মনের সুখে সেই সব বই কেটে ছারখার করেছে। আইনের পুঁথি কেটে-কেটে ওরা দিনের পর দিন বে-আইনী কারবার চালিয়েছে।

গাছের ডালে মোটর গাড়ি

গল্পের গরু নাকি গাছে ওঠে। কিন্তু মোটর গাড়ি কি কখনো গাছে ওঠে? সম্প্রতি এ-রকমই একটা কাণ্ড হয়েছে আমেরিকায়। এক ভদ্রলোক হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলেন তিনি মোটর শুদ্ধ গাছের ডালে। মোটর চালাতে গিয়ে এক চিবির সঙ্গে ধাক্কা লাগে, তাতে গাড়িখানা ছিটকে উঠে যায় শূন্যে, আটকে থাকে একটা গাছের ডালে।

যৌবন বাঁচাতে ভিটামিন

যে সব নারী-পুরুষ যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করতে চান তাঁদের বিশেষ বন্ধু ভিটামিন সি। বার্ধক্য ও জরার এত বড়ো শত্রু আর নেই। শীতকালে অল্পেই অনেকে সর্দি-কাশিতে ভুগে থাকেন; এর কারণ দেহে ভিটামিনের অভাব। ভিটামিন সি দেহে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করে। ৪০ বছর বয়সের পর দেহে ভিটামিনের প্রয়োজন আরো বাড়ে। ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে চান আর না চান, প্রচুর পরিমাণে লেবু এবং কমলালেবু খান।

প্রাণ সংশয় করেও বিবাহ

ফ্লোরিডার বহু-বিতর্কিত প্রজাতান্ত্রিক প্রদেশপাল রুড কার্ক একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে গোপনে মধু-চন্দ্রিমা যাপন করেছেন। প্রদেশপালের বয়েস বর্তমানে ৪১। তাঁর জন্ম জার্মানীতে। এর আগে দুবার তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে। প্রাণের ভয়ে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে থাকেন। এরি মধ্যে তিনি বিবাহ করলেন।

প্রেম না মুক্তি?

পূর্ব জার্মানীর তেইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে এবং পশ্চিম জার্মানীর একটি ছেলে পরস্পরকে ভালোবাসে। তারা সম্প্রতি প্রেমের জন্য জীবন পণ ক'রে রুশ-প্রভাবাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে

অষ্ট্রিয়াতে পলায়ন ক'রে এক চাঞ্চল্যকর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সাঁতারুর পোষাক প'রে মধ্যরাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তুষার-শীতল নদীতে। এই পলায়নের পরিকল্পনা ওরা করেছে মাস কয়েক আগে থেকে। হামাগুড়ি দিয়ে তারা সীমান্ত অতিক্রম করে। নয়তো সীমান্ত-রক্ষীদের মেশিন-গানের গুলিতে তাদের মাথা উড়ে যেতো।

কোসিগিনকে উইলসনের উপহার

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনকে বেটারী-চালিত একটি পকেট টেলিফোন উপহার দিয়েছেন। লন্ডনীয়ের সঙ্গে সর্বদা যাতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী যোগা-যোগ রাখতে পারেন তার জন্য ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই উপহার। এমনিতে টেলিফোনটির কর্ম-ক্ষমতার এলাকা মাত্র ৬ মাইল, কিন্তু টেলিফোন বা রেডিয়োর সঙ্গে লাগিয়ে নিলে এর এলাকা অসীম।

ভোটে ডাকাতদের নিঃস্পৃহ ভাব

চম্বল উপত্যকার ডাকাতেরা আগের কয়েক বছর ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেবার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছে। কিন্তু এবার তারা কেমন নিঃস্পৃহ। এর একটা কারণ হয়তো ডাকাতদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্য এবং মতবিরোধ। গ্রামের লোকদের বাকি নিজেদের খুশিমতো ভোট দিতে পরামর্শ দিয়েছে। এর আগের তিনটি নির্বাচনে চম্বলের ডাকাতেরা কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। তার ফলে বহু শক্তিশালী কংগ্রেস নেতাদেরকেও তখন পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

ই দুরের ভয়াবহ কীর্তি

সিসিলিতে এক রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে গেছে। সমুদ্রের ধারে একটি কুটীরে সুইজারল্যাণ্ডের একজন ছাত্র ঘুমুচ্ছিলো। তাকে অসহায় অবস্থায় ইঁদুরেরা খেয়ে ফেলে। প্রকাণ্ড চেহারার ওই ইঁদুর-গুলি শরীরে মাংস আর রাখেনি। পুলিশী পরীক্ষায় জানা গেছে শোবার আগে ছেলেটি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলো। তা নইলে এ রকম কুম্ভকর্ণ হয়!

সুদাসপুরের দিনকাল

সুশীল গুহ

আসবেন একদিন। যদি আপনার নিজের নানান ঝামেলাগুলি থেকে নিজেকে খানিক সময়ের জন্যও আলগা করে নিতে পারেন কোনদিন। যদি কোনদিন এই নগর মহানগর প্রাসাদ এবং প্রাচীরের বীভৎসতার মধ্যে প্রবহমান সময়টাকে অসহ্য মনে হয়। এবং সত্যি সত্যি সেদিন যদি একটু আড়ালে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বিশ্রাম ভোগ করতে চান, এবং সেই মুহূর্তে একটা নতুনত্বের স্বাদ পেতে যদি মনটা আপনার উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, তাহলে এখানে আসবেন একদিন।

সুদাসপুর আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। এ হল নীল আকাশের নীচে একটু নিরিবিলিতে কোমল ছায়াঘেরা একটা নিবিড় জনপদ। পৃথিবীর মানচিত্রে এর নাম লেখা নেই। ধরণীর এককোণে এর স্থান হয়েছে বটে, কিন্তু জনাকীর্ণ নয় বলে মানচিত্রে এর নাম লেখা হয়নি।

আর শহর কলকাতা থেকে এর দূরত্বই বা কতটুকু। ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে। এত কাছে হয়েও এর আবেদন নেই কোন। তাই আকর্ষণও নেই। ইতিহাস খুঁজলে কোন বিস্ময়কর দূরের কথা এর সূচনার সঙ্গে জব চার্নকের মত কোন সংগঠকের নামও শোনা যায় না।

বাসে অথবা ট্রেনে, এর যে কোন একটিতে আপনি চেপে বসতে পারেন সুদাসপুরে যাওয়ার জন্য। তবে ট্রেনে যদি যান তবে গাড়ি থেকে নেমে অল্প সময়ের জন্য আপনাকে আরেকবার বাসে চাপতে হবে।

সুদাসপুরের জন্মক্ষণের কাহিনী অবশ্য অজ্ঞাত। তবু অনেক কাহিনীর জন্ম হয়েছে তা নিয়ে। সত্য মিথ্যার ভাবনা সেখানে অবান্তর। তবু আজ এখানকার জমিনে দাঁড়িয়ে এর সূচনার দিনের বিস্মৃত অধ্যায়টি কৌতূহলের সঙ্গে আপনার মনে উদিত হতে পারে। তবে সে কৌতূহল বেশীক্ষণ আপনার মনকে তরাক্রান্ত করে রাখতে পারবে না। মুহূর্তেই মন থেকে মুছে যাবে তা। কেননা আপনি এই বিরাট আত্মবিস্মৃত জাতির একজন। তাই আপনার মনে হয়ত তখনকণে এই আধা শহরের ইট কাঠের ব্যবহার দেখে উদিত হয়েছে এর অতীত বিত্তের কথা। হয়ত সত্যি সত্যি এ শহর একদিন বিত্তশালী বলে পরিগণিত হত। ধনশালী বলশালী শ্রেষ্ঠিগণ হয়ত এখানে একদা বসবাস করতেন। সম্ভবতঃ ধূলোর স্তরে স্তরে তাঁদের পদচিহ্ন এখানে সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। তাঁদের এই ইট কাঠের কীর্তিও আজ ক্ষয়ের সামনে পড়ে নিশ্চিহ্ন হবার মুখে।

সুদাসপুরের সেদিন আজ আর নেই। আপনি দেখলেই তা বুঝতে পারবেন। আজ সে বিধবা। আজ তার চারিদিক জুড়ে জড়ো হয়েছে অনেক মালিন্য। সবটুকু না জানলে, না দেখলে মনে হতে পারে এটা একটা বিধ্বস্ত জনপদ। সড়ার পরেই কারা যেন এসে ভেঙে দিয়ে গেছে। হয়ত এও

মনে হতে পারে যে তৈমুরলঙ্গ বা নাদির শাহ এই পথেই এদেশ আক্রমণ করেছিল। তাদেরই আক্রমণের সামনে পড়েছিল বলে এত ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়েছে এর সর্বাঙ্গে। ধুলোয় মিশে ধুলো হয়ে গেছে অনেক অনেক কীর্তি কাহিনীর চূড়ো। সেই ধূলিত সেনাবাহিনীর পদভারে সন্ত্রস্ত কেঁপেও উঠেছিল এই ভূমিখণ্ড।

অনেক দুঃখেই এই অতিরঞ্জিত কল্পনা আপনার মনটাকে ঘিরে ধরবে। তবু মানতেই হবে যে কোন আক্রমণকারীর নৃশংস তরবারীর সামনে পড়ে নয়, কোন যুদ্ধে নয়, কোন বন্যা মহামারী বা ভূমিকম্পেও নয়, কালের করাল গতি এই সুপরিচিত জনপদকে করেছে পুরোপো। একে ঠেলেছে, একে ভেঙেছে, কোথাও ধ্বংসের স্তূপ গড়েছে। আর ইতিকথার আলোটুকুকে নিভিয়ে দিয়েছে বলে, আজকালের পথে এসেছে অনেক কাল্পনিক কাহিনী। তবু এর কঠিন মেরুদণ্ডের উপর যে ধ্বংসস্তূপের সৌধ নির্মিত হয়েছে, একবার এসে অন্তত: সেইটেই যদি দেখতে পারেন, তবে বুঝবেন একালের অবক্ষয়ের রূপটি কি প্রকট, ইতিহাসের কি সুদূরবিদারক পরিণাম।

আজ যদি কোন আলেকজাণ্ডার তাঁর কোন প্রিয় সহচরকে নিয়ে এখানে এসে হাজির হতেন তবে তিনিও বিস্মিত হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে পড়তেন হঠাৎ। অন্তত: কয়েক মুহূর্তের জন্ত হলেও মোহিত হয়ে যেতেন। আর এর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, আহা মরি মরি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ, পৃথিবীর এত গ্রাম নগর জনপদ দেখে এলাম, এত সমস্ত ধ্বংসস্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে বিজয়ীর অট্টহাসি হেসে এলাম তবু আজ মনে হচ্ছে এর মত এমন রূপটি আর কোথাও দেখিনি।

সুদাসপুরের পত্তনের সঙ্গে কোন মহান সংগঠকের নাম জড়িত নেই বটে, থাকলেও সেটি ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়, তবে আজকের এই ক্ষয়ের সঙ্গে মানদা ঠাকুরদের মত নীরিহ ধার্মিক লোকগুলোর নাম কেমন করে যেন জড়িয়ে গেছে! এটা যেন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির মত একটা কিছু।

শ্রীমন্ত ঘোষালের অবশ্য দোষ নেই কোন। আজ যে তিনি তাঁর পরিবারবর্গসহ সমস্তমত ভাত জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছেন সেটা নেহাতই লোকের কথার খেলাপে। তিনি ত সবার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হতে চান, চেষ্টাও করেন, কিন্তু শিকরা কেমন যেন কারাকে কারাকে ঘোরে। একদিন যারা পরমশ্রদ্ধাভরে তাঁর পায়ে ষোড়শ উপাচারে ডালি দিত,—তারা যেন তাঁর কাছ থেকে এখন আড়াল খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাপ ঢুকেছে মানুষের ঘরে বাইরে সমানভাবে। নইলে এমনভাবে ধর্মজান লোপ পাবে কেন?

সেবারে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে উত্তরপাড়ার নারকেল গাছটা নিজের ঘাড় থেকে ছিটকে এসে যে পশুপতি চক্রবর্তীর ঘাড়ে ঠাঁই নিতে চেয়েছিল, আর তার ফলেই যে পথিমধ্যে পশুপতির মৃত্যু হল তা ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা আর কিছু নয়। পৃথিবীর এই যাবতীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে এই পুণ্যবান মানুষটা আর বেঁচে থাক এটা যেন ঈশ্বরের অনিচ্ছা।

মানদা ঠাকুরও সেকেলে রীতিনীতিতেই মানুষ। তবে কিছুটা শক্ত এবং মুঠাম। অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র। কিছুটা বুদ্ধিদীপ্ত। এ যুগেও কেমন করে বাঁচতে হয় সেটা জানা আছে তাঁর। দারুণ দুর্দৈবের মুখে পড়ে কাতরাচ্ছে যে শহর সেই সুদাসপুরের তিনি যেন এক অবিকল প্রতিচ্ছবি। আপনি এখানে এলেই শুনতে পাবেন এর নাম। যাকে শুধাবেন সেই বলে দেবে এর ঠিকানা। একে চেনে না, জানে না এমন লোক নেই এ শহরে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের মুখে এ নামটি অতি সহজেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কেউ ভালোবাসে। কেউ ভয় করে। কেউ ভক্তি করে। কেউ গালি দেয়।

শুধু এ শহর ছাড়া সুনিবিড় এক শান্তির নীড়। বিচিত্র এক জনপদ। উচ্চগ্রামের কোন কোলাহল নেই। ধাঁপদ সঙ্গীত নয় বলে তাকে তরলও নয়।

যদি সত্যি এখানে আসেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এ কোন বানানো কথা নয়, সবই সত্যি কথা। সুদামপুরের আজকের উপাখ্যান।

প্রতিদিন খুব ভোরে গঙ্গাস্নান সেরে খড়ম পায়ে সশব্দে ফেরেন তিনি। মুখে সংস্কৃত শ্লোক। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর দৃঢ়হীন ভক্তি। সত্যের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা। বর্ষজ্ঞান গভীর। কোঁটা-তিলক কাটেন। সেই সকাল থেকে দুপুর অবধি ঠাকুর পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তারপর গীতা চণ্ডী পাঠান্তে আহার গ্রহণ করে থাকেন। বিকেলবেলা ভক্ত শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালাপ করেন।

আপনার কাছে হয়ত এসব যুগের পক্ষে অনুপযোগী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সুদামপুরের যাদবঠাকুরের এই হল দৈনন্দিন জীবন কথা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত বারোমাসের এক রীতি। এ থেকে কোনদিন তিনি বিচ্যুত হননি। লোকের নিন্দা তর্ক থেকে সযত্নে দূরে সরে দাঁড়াবার মত মনোবল অর্জন করেছেন।

আজ অবশ্য বার্দ্ধক্য দুই হাত প্রসারিত করে তাঁর সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরেছে। জীবনের অমোঘ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন তিনি। মাথার সামনের দিকে বিরাটকায় টাক পড়েছে বটে, কিন্তু পিছনের দিকের একগুচ্ছ চুল ঝুলে পড়েছে পিঠে। কেউ বলে, সত্তর পেরিয়ে গেছে তাঁর, আবার কেউ বলে, না অত হবে না। দাঁত নেই মুখে একটিও। সোজা হয়ে চলেন। ঘাড় গুজে যাননি। হেসে কথা বলেন। সবার জন্যই ঈশ্বরের কাছে মঙ্গল কামনা করেন। শুধু একদিন তাঁর একমাত্র সন্তান নিতাকে গালি দিয়ে বলেছিলেন, 'মরবি তুই, মরবি একদিন, আর তোর সেই মরণ যেন আমার চোখের সামনেই হয়।'

আজ যদি আপনি আসেন তবে শুনতে পাবেন এখানকার আবর্তিত বাতাসে একটি কণ্ঠস্বর। যাদবা ঠাকুর যেন আবহমানকাল ধরে বলে চলেছেন, —'মরবি, মরবি একদিন।'

কেননা বছরের ছয়ঋতু বারোমাস যে জনপদ শুধু ঘুমিয়ে কাটাতো, সেই সুদামপুর ছায়ানিবিড়ে ঘরে রেখেছিল একটা নিঃশব্দ, সেই জনপদে একদিন কোলাহল উঠল। উঠল নিতাকে নিয়েই। সেদিন যাদবা ঠাকুরের চীৎকারে খুব ছুটলো শহরের। শান্ত ধ্যানমৌন জনপদে উঠল আলোড়ন।

ঈশ্বরভক্ত সেদিন ঈশ্বরের এ পৃথিবীতে যেন কিসের দহনে জ্বলে উঠেছিলেন। সামাজিক নিয়ম কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা তাঁর গৃহমধ্যে সেদিন প্রবেশ করেছিল পাপ। সে পাপের নাম ভালোবাসা। নিতা ভালোবেসেছিল বিভূতিভূষণকে। ঘরের ছেলের মতই এ গৃহে যার গতি ছিল অবাধ। সেই বিভূতি কিনা পাপ নামক ভয়ানক পদার্থটি তাঁর ঘরে নিয়ে এসে সবকিছু কলুষিত করে দিয়ে গেল।

সে ভালোবাসা অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর শুধু ভালোবাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল।

সৌম্যদর্শন সুপুরুষ যুবক বিভূতিভূষণ একদিন তাঁর ঘরে এসেছিল অনেক ভক্তদের একজন হয়ে। এর দিকে তাকিয়ে সেদিন তিনি ভেবেছিলেন ঈশ্বর যেন নিজেই এ ভক্তটিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাদবার ভিতর দিয়েই যেন ভগবান বিভূতিকে চেয়েছিলেন। তিনি বিস্মিত না হয়ে পারেননি সেদিন। এত অল্পবয়সে এমন ধর্মপিপাসা। তাই সে নিজেই এসেছে তাঁর ঘর খুঁজে।

সুদাসপুরের আনাচে কানাচে তখন এই নিয়ে অজস্র কথার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। অনন্তকালের ঘুম ভেঙে গেল বলে যেন সুদাসপুর রাগে গড়গড় করতে লাগল। কেউ কেউ বলে নিয়েছিল এ চালাকি মামদার। যত বাধিকই হোক না কেন, সন্তায় বাজিমাৎ করতে পারলে এ যুগে ছাড়ে কে! মামদা ঠাকুর ত আর মূর্খ নয়। ধার্মিক। সাংসারজ্ঞানশূন্য নয়। সব দিনিয়েরই ভূত ভবিষ্যৎ জানেন। বিভূতিভূষণ সুপাত্র। মেয়ে বড় হয়েছে। মনের মত পাত্র পেয়েছেন হাতের কাছে। তাকে বশীভূত করেছেন। নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করে আত্মরক্ষার জন্য এখন বাতাসের মুখে মুখ রেখে মালি পাড়েন।

অল্প বয়সের ছোকরারা আবার একটু বেশী বেয়াদপ। সব কিছুতেই কেমন যেন একটা বাড়াবাড়ি করে। অনেক সময় সত্য মিথ্যার যাচাইটাকে পর্যন্ত স্বীকার করে না। যেন অনেকদিনের ক্ষুধার্ত হাতেনা খাবার পেয়েছে হাতের কাছে। এমনি একটা ভাব এদের মধ্যে বিভূতি আর নিভার কাণ্ড কারখানায়। আর মামদা ঠাকুরের শুকনো মুখখানার মধ্যে যেন ওরা এক কৌতুকের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলো। চায়ের দোকানের মজলিসটা তাই ওদের সপ্তম হাসিতে ফেটে পড়ে আসকাল, একজন হয়ত বলে,—'বিভূতি আর মামদা কাউকেই আর জানতে বাকি নেই।'

—'আর নিভা, নিভাকে জানিস না?' আরেকজন মুখরোচক কথাটাকে টেনে বড় করবার চেষ্টা করে।

একটা গোল আসর মুহূর্তের মধ্যে যেন সচকিত হয়ে ওঠে, নিভা, নিভা, নিভা। যেন অনন্তবার প্রতিধ্বনী ওঠে তাই একটি নামের। সবাই যেন গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনল সেই প্রতিধ্বনী।

আরেকজন বললে,—তাকেও কি চিনতে বাকি আছে কিছু, সে হল সেই দেবতার পূজারিনী।

—'কোন্ দেবতার?' সবাই একসঙ্গে উৎসুক হয়ে উঠল।

—'প্রেমের দেবতার, বুঝলি?' হো হো করে হেসে উঠল সবাই। যেন ফেটে পড়ল গোলাকার কুণ্ডলীটা।

এ কাহিনী আজ শুনতে পাবেন আপনি সুদাসপুরে। অল্প বয়সের ছোকরারা পথে ঘাটে এ নিয়ে হাসাহাসি আর ঠাট্টা তামসা করে। আর বয়স্ক ব্যক্তিরা দুঃখ প্রকাশ করেন মামদা ঠাকুরের জন্য। মামদা যে এখানকার নাড়ির স্পন্দন। অন্ধকারের আলো। যখনই এখানকার মানুষ অসময়ে পড়েছে তখনই তারা ছুটে গেছে তাঁর কাছে। দিয়ে হাত পেতে দিয়েছে। খুঁজে খুঁজে হাতের রেখা বার করেছেন তিনি হাতে অশুভ সময়ের ইঙ্গিত রয়েছে। তারপর সেই হাতেই তুলে বেলপাতা গুঁজে দিয়েছেন। বলেছেন, যাও এখন,—অগ্রহায়ণের শেষ দিক থেকে সময়টা আবার ভালো যাবে।

—'যদি তাই হয় ঠাকুর, তবে তখন এসে ডালি দিয়ে যাব।'

আজ তিনি দেখেন সর্বত্র যেন পাপের ছড়াছড়ি। তিনি নিজে পাপী। নিভা পাপী। বিভূতি পাপী। পাপের আগার এই সুদাসপুর। এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে তিনি বাঁচেন এখন। কিন্তু যাবেন কোথায়? পাপ কি শুধু এখানে। সর্বত্রই বোধ হয় ছড়িয়ে পড়েছে। আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ছুটে চলেছে সবাই। মরবে, ওরা সবাই মরবে।

সত্যি অভিশাপ কাজে লাগল। বিভূতি মরল। যেভাবে মরল বিভূতি সেভাবে মানুষ মরে না। ঈশ্বরভক্ত পূজা আহ্নিকের মানুষ নিজেই বিভূতি আর নিভার অমঙ্গল কামনা করেছেন, কিন্তু

বিভূতির মৃত্যু সংবাদ শুনে প্রথমেই চীৎকার করে উঠলেন, আমি ত এমনটা চাইনি, কেন এমন হল, ঈশ্বর কেন এমন করল আমার।

সেই শোকার্ত্ত মানদা ঠাকুরের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন সুদামপুরের মানুষ অবাক হয়েছিল। তিলক কাটা প্রশান্ত চোখ মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন যেন শুকিয়ে উঠল। সম্ভবতঃ কাঁদতেই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পারেননি। নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

নাক মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল বিভূতির। আগের দিন রাত্রেই জ্বর এসেছিল। ভোরবেলার দিকে সে জ্বর কমতির দিকে ছিল বলে, সাধারণ জ্বর ভেবে বেশ একটু বেলায় সময় কাটিয়েছিল ওরা। দুপুরের দিক থেকে সে জ্বর ক্রমাগত বাড়তির দিকে যেতে লাগল। তবু অবহেলা করেছিল ওরা। ডাক্তার ডাকেনি তবু। মাঝরাতে জ্বরে বিভূতি যখন অজ্ঞান হয়ে গেল, তখন ওদের হুস্ হলো—এবারে ডাক্তার ডাকা খুবই দরকার। কি যে হচ্ছে, কোন দিকে যে হাওয়া বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তার এসে আর বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারেননি। তার আগেই মুখ থেকে লাল ফেনা উঠতে আরম্ভ করেছিল।

জীবনে সুখী হতে চেয়েছিল নিভা। পারল না। সুখ ওর কপালে লেখা নেই। কোষ্ঠি বিচার করতে বসলেন মানদা আরেকবার। বৃষ্টি ঝির করে বার বার দেখলেন কোষ্ঠির লম্বা কাগজটা। ইস্ বড্ড ভুল হয়ে গেছে ত। এ কাগজে ত স্পষ্টই লেখা রয়েছে ওর এমন হবে। বিচক্ষণ পণ্ডিত ঈশ্বরভক্ত মানদা ঠাকুরের জীবনে এতবড় ভুল হলো। বিয়ের সময় অবশ্য রাগের অন্ত ছিল না তাঁর। জন্মের দিন থেকেই ওর বৈধব্যযোগ বর্ত্তমান! এতবড় একটা জিনিস তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। তবে জীবনের অবধারিত পরিণামকে কেউ কখনো রোধ করতে পারে না। এই ভেবে তিনি শুদ্ধ হয়ে রইলেন।

নিভা কাঁদল। ওর বুকফাটা আর্ত্তনাদে কেঁপে উঠল সুদামপুর। সে কান্নার বেশ ঠোঁটে করে নিয়ে বাতাস ছুটল দিক হতে দিগন্তরে।

মানদা ঠাকুর বললেন,—মানুষ মরলে তার জন্য কাঁদতে নেই, কাঁদলে আত্মার মুক্তি হয় না, তারে মায়া পড়ে থাকে সংসারে, তখন সেই আত্মা কষ্ট পায়।

শুনে নিভার আরো কান্না পায়। রেগে কেমন যেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন মানদা ঠাকুর। বড় বেশী বেয়াদপ ত এ মেয়ে। ঈশ্বরভক্তি নেই, জ্ঞান নেই নীতিজ্ঞান। নিভা আরো চীৎকার করে। মানদা ঠাকুরের রাগ বাড়তে থাকে ক্রমাগত। বলেন,—'ভুলে যেতে হবে, ওর সবকিছু ভুলে যেতে হবে তোকে। কান্নার বাঁধ ভেঙে পড়ে নিভার। বলে—পারব না বাবা, আমি যে ওকে কিছুতেই ভুলতে পারব না।'

—'পারতে হবে তোকে।'

—'না, না, না, কিছুতেই আমি পারব না তা।'

—'না পারলে যে ওর কষ্ট হবে। মানে বিভূতির আত্মা কষ্ট পাবে।'

—'তাই নাকি বাবা, তাই নাকি।' আরো চীৎকার করে ওঠে নিভা।

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

—'কেন, ওর কষ্ট হবে কেন?'

—'ও যে পায় না বলে—তোকে আরো বেশী করে পেতে চায়।'

—'তাই নাকি বাবা, তাই নাকি ?'

সমুদ্র নেমে আসে নিতার চোখে। শুকিয়ে ওঠে গলা। আরো বেশী করে জ্বলে ওঠে বুকের ভিতরটা। আর পারে না, কান্না আসছে যে বুকের ভিতর থেকে। তবু যে বুক ভেঙে ওর কান্না আসছে। ও যে আটকাতে পারছে না তা।

মানদা ঠাকুর আবার বলেন—চুপ কর, ওকে ছেড়ে দে, ওকে মুক্তি দে।

—'না, না বাবা, আমাকে একথা বলো না তুমি।'

দুচোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে মানদার। যেন এই বীভৎস অন্যায় তিনি আর সইতে পারছেন না।

নিতার মনে পড়ল—বাবাই একদিন ওকে অভিশাপ দিয়েছিল,—মরবি, তুই মরবি আর সে মরণ যেন আমার সামনেই হয়।

ও ত মরল না। মরল বিভূতি। বাপের রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে আরো ভয় পেয়ে গেল ও। তাই মানদার পায়ে লুটিয়ে পড়ল,—'আমি কেন মরিনি বাবা, আমার কেন মরণ হল না।'

থাক এ কাহিনী। আর শুনিয়ে লাভ নেই। এ কাহিনী একটা চাপা গোঙানীর মত অজস্র ধারায় বিকৃত হয়ে লোকের কানে কানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি এলে তা নিজেই শুনতে পাবেন।

স্বর্গ ও নরক

একজন খৃষ্টান মিশনারী বহুদিনের চেষ্টার ফলে এক নিগ্রো রাজাকে খৃষ্টধর্মের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। দীক্ষার জন্য নিগ্রো রাজা গির্জায় এসেছেন। এখুনি দীক্ষা হবে।

মিশনারী রাজাকে বলেন, আর তোমার ভয় নেই। খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তুমি নরকের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

হঠাৎ নিগ্রো রাজার মনে একটা কথা জেগে উঠলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আমার বাবাতো খৃষ্টান হননি। তিনি তাহলে কোথায় ?

মিশনারী গম্ভীর কণ্ঠে বলেন। নরকে !

নিগ্রো রাজা জিজ্ঞাসা করলে, আমার পিতামহ ?

মিশনারী তেমনি উৎসাহে বলে, নিশ্চয়ই নরকে !

নিগ্রো রাজা দীক্ষাসন থেকে নেমে আসেন। মিশনারী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন। একি নেমে যাচ্ছো কোথায় ?

নিগ্রো রাজা বলে, আমার বাবা-ঠাকুরদাকে ছেড়ে আমি স্বর্গে গিয়ে কি করবো ?

মিশনারীর সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল।

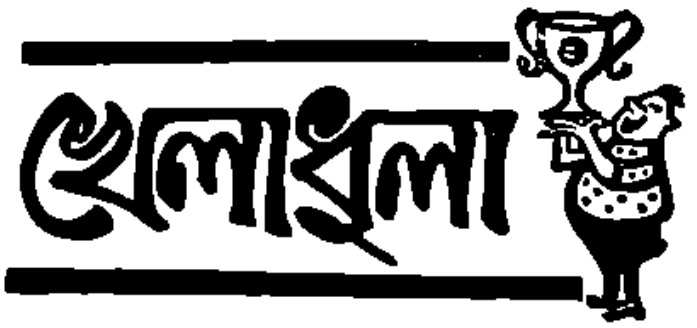

ক্রিকেট-প্রসঙ্গ

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যেসব আন্তর্জাতিক খেলায় ভারত যোগ দেয় সেসব খেলায় হারজিতের চেয়ে ভারতের মর্যাদার প্রশ্নটা বেশি করে জড়িত হয়। সেই মর্যাদার সঙ্গে খেলোয়াড়দের আচার আচরণ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায়।

গত সংখ্যায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের খেলা প্রসঙ্গে "ব্যাপার যা চলছে" বিভাগে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আচার আচরণ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে এবিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট-কর্তাদের অবহিত হওয়া কর্তব্য।

সাম্প্রতিক সংবাদে দেখা যাচ্ছে, সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের সময় অনেক ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে উপযুক্ত সংযমের অভাব ও শিথিল আচরণ নিয়ে ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ড চিন্তিত হয়েছেন। সফরকারী দলের বিরুদ্ধে অথবা ভারতীয় সফরগত দলের যে সব খেলোয়াড় দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে নির্বাচিত হন, তাঁদের মধ্যে কিভাবে কঠোর শৃংখলা বজায় রাখা যায় তার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যে সম্প্রতি মাদ্রাজে ক্রিকেট বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এক বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে।

ক্রিকেট বোর্ড খবর পেয়েছেন যে, টেস্ট খেলার সময় কোন কোন খেলোয়াড় অধিক রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। তাছাড়া কেউ কেউ এমন সব অসংযত আচরণে লিপ্ত হন যা তাঁদের খেলার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে পরাজয় এবং মাদ্রাজে অনুশীলনে অক্ষমতার জন্যে কয়েকজন খেলোয়াড়ের ঢিলে মনোবৃত্তি ও অসংযত আচরণকেই দায়ী করা হচ্ছে।

বোর্ডের কর্মকর্তাদের অভিমত এই যে, টেস্ট খেলার সঙ্গে দেশের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং খেলোয়াড়রা যাতে ভালো খেলতে পারেন সেজন্যে তাঁদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজন আছে।

অবশ্যই আছে। এবং কঠোর হাতে সেই শৃংখলা বজায় রাখতে হবে, এবিষয়ে দ্বিমতের স্থান না থাকাই বাঞ্ছনীয়। "রাজার দুলাল" বলে কেউ যেন অব্যাহতি না পায়।

ভারতীয় দল ইংলণ্ড সফরে যাচ্ছে। সেখানে যেন এই মর্যাদার প্রশ্ন আবার না ওঠে, এবিষয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের যথোচিত কঠিন নিয়ম কানুন প্রবর্তন করা উচিত। খেলায় হারজিতটা বড় কথা নয়—আমাদের খেলোয়াড়রা যেন লোক না হাসান তাঁদের আচার আচরণের দ্বারা, এটাই বড় কথা।

• • •

ক্রিকেট খেলায় দলের কাপ্তেনের উপর সেইদলের সাফল্য অসাফল্য বহুখানি নির্ভর করে এমন আর কোনো খেলাতেই নয়। কাপ্তেন শুধু দলের নেতা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি খেলার মাঠে তাঁর দেশের মুখ্য প্রতিনিধিও। সুতরাং তাঁরই ওপর সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব বর্তায়। এবং এই কারণেই কাপ্তেনের কাছ থেকে দল এবং জাতি যথোপযুক্ত গুণের বিকাশ কামনা করে। তিনি শুধু ভাল খেলোয়াড় হলেই চলবেনা। তাঁর মধ্যে নেতানুলভ গুণও থাকা চাই। তাঁর থাকা চাই বুদ্ধ ক্ষেত্রবার অদম্য আকাঙ্খা, সুযোগ বুঝি, নিজের দলের এবং বিপক্ষদলের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, অসীম সাহস, স্থিতপ্রজ্ঞা, নিজের পতন এবং অপমৃত্যুকে বড় না করে নিরপেক্ষ মনে বিচার করার শক্তি, সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করবার ক্ষমতা, খেলার মাঠে এবং মাঠের বাহিরে আদর্শ আচরণ বিধির প্রকাশ, সদয় উত্তেজনাকারী ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।

অধিনায়কের উপরোক্ত গুণাবলীর কথা ভাবতে গিয়ে আজ যে মানুষটির কথা মনে পড়ছে তিনি হচ্ছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ক্রিকেটার সি. কে. নাইডু। কলকাতার মাঠে প্রত্যেক খেলার দিন সকালে কালীঘাটে পূজো দিয়ে দলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যখন মাঠে নামতেন, সে ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমণ্ডলী বিস্ময়ে মনে করতেন, হ্যাঁ, একজন কাপ্তেন মাঠে নামলেন বটে।

নাইডু দরাবরই অন্তভাষী। কিন্তু সেই অল্প স্বল্প কথার মধ্যে দিয়ে তিনি সতীর্থদের মনে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছেন। এমনিই তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র মাধুর্য। যাঁরা তাঁর সঙ্গে খেলেছেন তাঁরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং ভালবেসেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাইডুর যুগে ভারতীয় ক্রিকেটে রাজা মহারাজাদেরই একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। তাই তাঁকে কখনো বা গোবরডাঙ্গা কখনো বা পাতিয়ালা কখনো বা ভিজিয়ানাগ্রাম—এইসব রাজা বাদশাদের কাপ্তেনীর অধীনে খেলতে হয়েছে। তারই মধ্যে যখন যে খেলায় তিনি অধিনায়কত্ব করেছেন তখনই সেই খেলায় তাঁর অসামান্যসাধারণ ক্ষমতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডের ভারতসফর কালে কলকাতার অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের কথা। দুর্ধর্ষ জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে খেলা।

কুখ্যাত বডিলাইনের প্রবর্তক নিষ্ঠুর কাপ্তেন জার্ডিন তাঁর দলের দুই বোলার ফ্রার্ক এবং নিকলসকে আদেশ দিয়েছেন, যেমন ইচ্ছে বডিলাইন বাম্পার ছাড়। নিকলসের সেই বাম্পারে আহত হলেন হিলওয়ার হোসেন। তাঁর কপাল কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। নাইডু প্যাভিলিয়ন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে, বাপ যেমন আহত ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যায়, তেমনি মেহে হিলওয়ারকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে প্যাভিলিয়নে নিয়ে গেলেন। সেদিন সেইসময় নাইডুকে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ উত্তেজনার অধীর হতে দেখা গিয়েছিল। ব্যাট হাতে করে খেলতে নামবার সময় হিলওয়ারকে বলে গেলেন, নিকলস আর ফ্রার্কের প্রত্যেক বলকে ঠেঙিয়ে আমি এর প্রতিশোধ নেব।

মাঠে নেমে অবশ্য তা পারেননি। অল্প রানেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন প্রথম ইনিংসে। যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন তখন হিলওয়ার হোসেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খেলতে নামবার জন্যে প্রস্তুত। নাইডু তাঁকে বললেন, কেমন আছ এখন? হিলওয়ার বললেন, ভাল। তুমি ভেবনা সর্দার, আমি ঠিক পারব।

নাইডু অনেকক্ষণ তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। খেলতে নামলেন হিলওয়ার। মাথায়

সাতপুরু ব্যাণ্ডেজ। দর্শকরা ভাবল, ইনি আর কতক্ষণ। কিন্তু আহত সিংহের সেদিনকার সে বিক্রম তোলবার নয়। মরিয়া হয়ে খেলছেন দিলওয়ার। সেই সঙ্গে অনুভব করছেন পিঠে কাপ্তেনের হস্ত-প্রলেপের উষ্ণ স্পর্শ। বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী। সেই সঙ্গে ওভার বাউণ্ডারীও। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ৫১ রান করে দিলওয়ার ফিরে গেলেন। ঘুরে বসেও আমরা দেখতে পেয়েছিলাম, দিলওয়ার প্যাভিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছতেই নাইডু ছুটে বেরিয়ে এসে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে 'হিটার' নাইডু কেমন করে তাঁর ব্যাটকে সম্বেত করে দু'ঘণ্টা ধরে মাটি কামড়ে খেলে মাত্র ৩৮ রান করেছিলেন, কেমন করে অসাধারণ কাপ্তেনীর জোরে তিনি সেই প্রায় হেরে যাওয়া খেলাকে ড্র করেছিলেন, তা, সে খেলা যাঁরা না দেখেছেন, তাঁদের বুঝিয়ে বলা অসম্ভব।

সেই বছর জার্ডিনের দল একটি খেলায় হেরেছিল এবং সেও নাইডুর অধিনায়কত্বের বিপক্ষে। বারানসীতে ভিজিয়ানাগ্রাম একাদশের অধিনায়করূপে ছিলেন নাইডু এবং তাঁর দলে অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন দিলওয়ার হোসেন ও মহম্মদ নিসার। দারুণ বল করেছিলেন মহম্মদ-নিসার। দর্শকরা নিসারকে 'বম্বাবা বিশ্বনাথ' বলে চিৎকার করে উৎসাহিত করেছিল আর নিসারও তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বল দিয়েছিলেন। হেরে গিয়ে জার্ডিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এবে দেখছি সব জায়গাতেই নাইডু আর তার দল, যেন নাইডুর সার্কাস।

কালো রং, কিন্তু খেলার মধ্যে লাভরঙের বর্ণচ্ছটা। ঝোলারের ভীতি। দর্শকের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। সি. কে. নাইডু। খেলার মধ্যে কী আত্মপ্রত্যয়, কী অপরিমেয় শক্তির প্রকাশ।

১৯৩৪ সালে জার্ডিন দল নিয়ে ভারতে এসেছেন। ইংলণ্ডের ভারত সফর। প্রতিদিন জার্ডিনের কাছে স্বাগতবার্তা আসছে। সেই বার্তার মধ্যে নাইডুর টেলিগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তিনি জার্ডিনকে বার্তা পাঠালেন—Wait, till I meet you.

প্রথম খেলা পাতিয়ালা সভর্ণরের একাদশের সঙ্গে। সভর্ণর একাদশের অধিনায়ক সি. কে. নাইডু। লাহোরে খেলা। নাইডু এবং জার্ডিনের মধ্যে সাক্ষাৎ হল। হল অনেক প্রীতি সম্ভাষণের বিনিময়। তারপর খেলতে নেমেই নাইডু ১১৮ রান করে তাঁর বার্তাটি জার্ডিনকে যেন স্মরণ করিয়ে দিলেন—Wait, till I meet you.

আরো কয়েক বছর আগেকার কথা। ১৯২৬-২৭ সালে শিলিসানের নেতৃত্বে এম. সি. সি. দল প্রথম ভারত সফরে এসেছে। বোম্বাই-এ হিন্দুদের সঙ্গে খেলা হচ্ছে।

এম. সি. সি. দলের জি. এফ. আরল প্রথম পরাক্রমে হিট করে ৮টি ওভার বাউণ্ডারী এবং ১১টি বাউণ্ডারী মেরে ১৩০ রান করলেন। ৪০০০ দর্শক বললেন, এ খেলার আর জবাব নেই। আমাদের দলের কেউ নেই যে এর প্রত্যুত্তর দিতে পারেন।

কথাটা নাইডুর কানে গিছল। পরদিন তিনি খেলতে নামলেন। প্রথম থেকেই মেজাজ সপ্তমে। ব্যাটও চলল সেই তালে তাল রেখে। ইংলণ্ডের সেই সময়কার তিন দুরন্ত বোলার টেট, গিয়ারি এবং অ্যাসটিল ছাতু হয়ে গেল তাঁর কাছে। ১৮৭ মিনিট ১৪৩ রান করলেন—ওভার বাউণ্ডারীর সংখ্যা ১১, বাউণ্ডারীর সংখ্যা ১৩।

কয়েকটা ওভার বাউণ্ডারী দর্শকদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর এক ইনিংসে ১১টি ওভার বাউণ্ডারী আজও বিস্ময়রেকর্ড হয়ে আছে।

১৯০২ সালে ইংলণ্ড সফরে গিয়ে লর্ডস মাঠে প্রথম আবির্ভাবেই দলের সঙ্কটকালে তাঁর নট আউট ১১৮ রান ক্রিকেট ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় পৃষ্ঠা।

অতুলনীয় ক্রীড়াশৈলীর সঙ্গে মুমহান ব্যক্তিত্ব এবং আদর্শ চরিত্র—এমন সমন্বয় কদাচিৎ দেখা দেখা গেছে। সি. কে. নাইডুর মধ্যে সেই সমন্বয় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

* * *

ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড দুর্ভাগ্যবশত এমন একটি সংস্থা যার কার্যকলাপ বহুদিন ধরেই বহুজনের মনে বিক্ষোভ জাগিয়েছে। নিজেদের ক্ষমতাকে জাহির করার জন্যে তাঁরা অনেক সময়েই অনেক খেলোয়াড়কে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে শাস্তি দিয়েছেন, তাঁদের দাবীকে অগ্রাহ্য করেছেন।

কিন্তু নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা এক কথা, আর অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খেলোয়াড়ের যোগ্যতা অনুসারে তাঁকে মর্যাদা দেওয়া অন্য কথা। ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড এবং তারও আগে ভারতের ক্রিকেট-বিধাতাদের বিরুদ্ধে অনেকেরই অভিযোগ এই যে তাঁরা বরাবর রাজা-মহারাজা-ধনপতিদের প্রভাবে আবদ্ধ থেকেছেন, খেলোয়াড়কে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেন নি। এই মনোবৃত্তির ফলে সি. কে. নাইডু তাঁর খেলোয়াড়জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে সে মর্যাদা পাননি। এবং আধুনিক কালেও অনেক যোগ্য খেলোয়াড়কেও অধিনায়কত্বের সম্মান যেন বঞ্চিত করা হয়েছে।

অতীতে এ অভিযোগ অনেক খেলোয়াড়ের মুখেই শোনা গেছে। অতি-সম্প্রতি আবার শোনা গেল, জনপ্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক আলির লেখা একটি বই-এ। বইটির নাম 'ক্রিকেট ডিসাইটফুল'। সদ্য প্রকাশিত এই বইএ মুস্তাক আলি তাঁর অনেক স্মৃতি ব্যক্ত করেছেন, সেই সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ড সম্বন্ধেও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেক বড় খেলোয়াড়দের জন্য ক্রিকেট বোর্ড বেনিফিট ম্যাচের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু মুস্তাক আলির বেলায় কেন যে তাঁরা তা করলেন না, সে এক রহস্য। অনুরোধ তাঁরা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে অনুরোধ রোধে টেকার মত নয়। শুধু তাই নয়, তাঁকে টেস্ট খেলা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্তের কথাও তিনি ফাঁস করেছেন তাঁর বইএর মধ্যে। ১৯৩৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারত সফরে প্রথম দুটি টেস্ট-এ তাঁকে দলে নেওয়া হল না। অথচ তখন তিনি ভালই খেলছেন। কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট। রব উইল চারিদিকে—নো মুস্তাক, নো টেস্ট। মুস্তাককে যেন অসত্যা দলে নেওয়া হল। আর মুস্তাক নেমে সঙ্গে সঙ্গে আউট দলের মান রাখলেন এবং উদ্ঘাটিত করলেন নির্বাচকমণ্ডলীর নির্বুদ্ধিতা। প্রথম ইনিংসএ ৫৪, দ্বিতীয় ইনিংসএ ১০৬ রান করলেন। চোখ ধাঁধানো সে খেলা ভোলবার নয়।

মুস্তাক আলি বলেছেন, লুঁটে ব্যানার্জি, বট্ ব্যানার্জি—এঁরা দু'জন যখন সেরা বোলারদের ম্যাচের পর ম্যাচে ভাল খেলছেন তখনো নির্বাচকমণ্ডলী ওঁদের দিকে ফিরে তাকাননি। তাছাড়া সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও বিজয় মার্চেন্ট ও নানা অমরনাথের পর মুস্তাককে ভারতীয় দলের নেতৃত্বপদ দেওয়া হয়নি। উল্টে অনেক জুনিয়র খেলোয়াড়ের নেতৃত্বে মুস্তাককে খেলতে হয়েছে। অবশ্য মুস্তাক তাঁর খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে কারুর অধীনে খেলতেই কোনদিন আপত্তি করেননি।

মুস্তাক লিখেছেন, সাংগঠনিক কুশাসনে ভারতীয় ক্রিকেট বহুদিন ধরেই জীর্ণ হচ্ছে। সেই অসুখের অভিশাপে টেস্ট ক্রিকেট শুরু হবার সময় থেকে আজো পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটকে ভুগতে হয়েছে। দলনায়ক নির্বাচনে যোগ্য রাজনীতি চিরদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। সি. কে. নাইডু

থেকে আরম্ভ করে চারু বোসের সময় পর্যন্ত সেই অদ্ভুত কুটচক্রের বিষাক্ত হাওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট হৃদ্‌বাস হয়ে আছে। মুস্তাকের মতে, নাইডুকে কাপ্তেনের আসন থেকে বঞ্চিত রাখবার জন্যে অনেক কাণ্ডই করা হয়েছে। তাঁকে হটিয়ে রাখবার জন্যেই পোরবন্দর, রাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম এবং পাতিয়ালার মহারাজাকে খাড়া করা হয়েছে। বিজয় মার্চেন্টের দাবী উপেক্ষা করার জন্যেই অবসর-প্রাপ্ত পাতাউদির নবাবকে ডেকে আনা হয়েছে, তারপর ডি. কে. গায়কোয়াড়কে দলে নেওয়া হয়েছে। অধুনা চারু বোসের ন্যায্য দাবীকে নস্যাৎ করে পাতাউদির বর্তমান নবাবকে নেতৃত্ব পদ দেওয়া হয়েছে। হতে পারে মনসুর আলি ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু খেলোয়াড় জীবনে অগ্রাধিকারের প্রশ্নকে উপেক্ষা করা কি শোভন, না সঙ্গত ? এই প্রশ্ন করেছেন মুস্তাক আলি তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে। রাজা-মহারাজা হলেই গণতান্ত্রিক ভারতে তাঁদের দাবীই কি সবার আগে ? সাধারণ খেলোয়াড়, তা তিনি যতই ভালই খেলুন বা যত সিনিয়রই হোন,তাঁর দাবী কোন দিনই কি গণতান্ত্রিক ভারতে স্বীকৃত হবে না ?

মুস্তাক আলির এ প্রশ্ন তাঁর একার নয় : বহুজনের মুখেই বারংবার এ প্রশ্ন শোনা গেছে।

• • •

আপনি কি জানেন, ভারতীদের মধ্যে মাত্র একজন ব্যাটসম্যানই একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন ? তাঁর নাম ভি. এস. হাজারে।

আর এই উভয় ইনিংস-এ সেঞ্চুরি যার তার বিরুদ্ধে খেলায় নয়, খাস অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৭-৪৮ সালে, ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরকালে অ্যাডিলেডের মাঠে, চতুর্থ টেস্টে। প্রথম ইনিংসে ১১৬ এবং দ্বিতীয় ইনিংস-এ ১৪৫ রান।

হাজারের এই কৃতিত্ব আরও বিশেষভাবে অসামান্য এই জন্যে যে তিনি উভয় ইনিংসেই ভারতের সঙ্কট মুহূর্তে ব্যাট করতে নেমেছিলেন।

প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া ৩৭৪ রান তোলে। বার্ণস ১১২, ব্র্যাডম্যান ২০১, হার্ভে নট আউট ১১৮।

ভারতের ৪টি উইকেট ১৩০ রানে পড়ে যাবার পর হাজারে ও কাদরকে ছুটি খাঁবলেন। হাজারে করলেন ১১৬, কাদরকে ১২৩। কিন্তু তাহলেও ফলো অন রদ্দ করা গেল না। হাজারে ২য় ইনিংস-এ অধিকারীর সঙ্গে ছুটি বেঁধে অনেক রান তুললেন। নিজে করলেন ১৪৫।

তাঁর খেলা দেখে বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় কিংসলটন লিখেছিলেন—সেরা বিশ্ব-শ্রেণীর খেলোয়াড় আছে ভারতের, তাঁর নাম ভি. এস. হাজারে। অ্যাডিলেড টেস্ট হাজারের টেস্টরূপে চিহ্নিত থাকবে। দলের পতনের মুখে উভয় ইনিংস-এই হাজারে যেভাবে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আর অপূর্ব স্বচ্ছন্দতায় খেলেছেন তার তুলনা নেই। মনে রাখতে হবে তাঁর বিরুদ্ধে ছিল পাঁচজন দুর্ধর্ষ বোলার, যথা—লিন্ডওয়াল, মিলার, টেশাক, জনসন এবং ম্যাকুল।

ব্র্যাডম্যানও তাঁর গ্রন্থে হাজারে সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত মতামত প্রকাশ করেছেন।

হাজারে ৩০টি টেস্ট খেলেছেন, মোট ২১৯২ রান করেছেন। গড় ৪৭-৬৪।

রঞ্জি ট্রফিতে ১০৩টি ইনিংসে খেলেছেন, মোট রান করেছেন ৬৩১২। গড় ৬৯'০৬।

স্বল্পভাষী, নম্রস্বভাব এবং বিনয়ী এই ক্রিশ্চান খেলোয়াড়টিকে হিন্দু মুসলমান পার্শী সকল সম্প্রদায়ের খেলোয়াড়ই শ্রদ্ধা করেছেন, ভালবেসেছেন।

যৌবন সুলভ রূপশ্রী ধরে রাখতে হলে

আভা পাকড়াশী

সৌন্দর্য্যের উৎস হল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য! সেকালে কথা ছিল—'শাঁখা, সিঁদুর, কেশ, তিন-এ নারীর বেশ'। সুখের সুডৌল হাতের অলঙ্কারের জন্য মাত্র এক জোড়া সাদা শাঁখাই যথেষ্ট। আর পিঠ-ভরা কোমর ছাপান চুলের ঢাল, তাতেই তো নারীত্বের বিকাশ। একটি লাবণ্যবতী শ্রীময়ী রমণী মূর্তি ঐ শাঁখা সিঁদুরে সেজে এসে দাঁড়িয়েছে, কল্পনায় এমনি একটি আভাস পাওয়া যায় নাকি!

এখন আবার আমাদের দৃষ্টি বারে-বারে পেছন পানে ফিরে চায়। কি করে তখনকার দিনের মেয়েদের অমন চুলের ঢাল হত! মা ঠাকুমাদের গড়ন অমন সুন্দর হত কি করে। কেমন করে ওঁদের অমন ঝকঝকে চিকণ-চিকণ গায়ের বর্ণ হত! কই ওঁরা তো এত সব প্রসাধনের নামও জানতেন না বা ওঁদের তো এত সময়ও হত না। আর তখন তো এইসব প্রসাধনীর প্রচলনও ছিল না। তবে? এই যে জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে আজ আমাদের মনে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে একেবারে মূল কথায় যেতে হয়। প্রথমেই আসে ওঁরা কী খেতেন। দেহের গড়ন নির্ভর করে খাদ্যের উপর তা থেকেই আসে শ্রী ও সুষমা। সুতরাং প্রথমেই উঁকি দিতে হবে রান্নাঘরে।

তখনকার কালে মহিলারা পুজো পাঠ সেরে সংসার সামলিয়ে তবে জলখাবার খাওয়ার সময় পেতেন। চা খাওয়ার তো বালাই ছিল না। ওঁরা খেতেন চিঁড়ে, ভিজে বা ভাজা। মুড়ি তেল নুন ছোলা ভাজা দিয়ে মেখে, নয়তো দি চিনি আর নারকেল কোরা দিয়ে। নয়তো শুধু মুড়ি কিম্বা দুধ মুড়ি। মুড়ি খই চিঁড়ে এসব ঘরেই ভাজা কোটা হত! শীত গ্রীষ্মে ঋতু অনুযায়ী ঐ একই মুড়ি চিঁড়ের ব্যবহার ভাজা থেকে ভিজেতে পরিবর্তিত হত। এছাড়া মুগের ডাল ভিজে, নারকোলের ভক্তি গুহদিগ্রহের প্রসাদি কল বাতাসা তো ছিলই। আর পূর্ববঙ্গের দিকে গাওয়া ঘি আর আলু ভাতে, ডাল ভাতে দিয়ে কেনাভাত খাওয়ার প্রচলন ছিল। তাতেও ভিটামিন থাকত প্রচুর পরিমাণে।

আবার দুপুরের আহারের সময়েও সকলকে খাইয়ে পরিতুষ্ট করে তবে নিজেরা খেতে বসতেন। তখনকার রীতি অনুযায়ী ভাজা, পোড়া, ঝুরুতো, ঘন্ট, ছেঁচকী, ডাল, মাছ, অম্বল এই সবই ছিল দৈনন্দিন খাদ্য সূচী। এর প্রত্যেকটিই আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রচুর ভিটামিন থাকতো এইসব খাবারে।

আবার গরমের দিনের বিকালে চুল বাঁধা বা খোঁপার পর্ব সারা হলে খাওয়া হত বেলের পানা। তরমুজের সরবত, আতার সরবত, এইসব।

তারপর রাত্রে মাছ, তরকারি, দুধ বা পায়েস, পিঠে। শীতকালে হলে তো কথাই নেই, নিত্যই চলত পিঠের পর্ব! সেইসব পিঠের কত যে নাম, কি সুন্দর স্বাদ, মোহন পিঠে, ঝিনুলি, মুগসাগলী, ভাজাপুলি, ক্ষীর-কদম, তা'ছাড়া দুধের সঙ্গে ক্ষীর-কদমা, কদমাসেদ্ধ আর ক্ষীর সহযোগে তাদের তরল আরও কত কি! এইসব পিঠে তৈরী করতে লাগতো ভালো ঘি, নারকোল, ক্ষীর, ময়দা, চিনি, রাঙা আলু, প্রত্যেকটি জিনিষই তিটাম্বিন ভরপুর।

শুধু খাওয়াই নয়, মাসে মাসে ছেলে পার্বণের দরুণ চলত উপোসের পর উপোস। তারপর ব্রতী অঙ্গনী তো লেগেই থাকত। অশোক ষষ্ঠীতে খেতে হয় অশোক মঞ্জরী। শীতল ষষ্ঠীতে সোনা সিদ্ধ, এর প্রত্যেকটির পিছনে রয়েছে একটি করে মুখা উদ্দেশ্য। অশোক মঞ্জরী স্ত্রীলোকদের ঋতু নিয়মিত করে। সোনা কথাটা, যা মুখ সিদ্ধ বাসি করে খেলে বসন্ত হয় না। এমনি আরও কত কিছু আছে যা আমার নিয়মের আড়াল দিয়ে অবশ্য করণীয়। কিন্তু এতে করে শরীরের কোন না কোন উপকার হত সুনিশ্চিত। এই যে ওঁরা উপবাস করতেন এর দরুণ পাক-যন্ত্র বিশ্রাম পেতো। অযাচিত মেদ বৃদ্ধি পেত না। আর নিত্য সাংসারিক কাজে কর্মে দেহ থাকত নীরোগ অটুট।

বেশীর ভাগ মহিলাই তখন অনেক সন্তানের জননী হতেন, তাঁদের কাছে তখন অধিক সন্তান হওয়াটা ছিল গর্বের, স্বামীর সোহাগের চিহ্ন। কিন্তু কই তবুও তো তাঁরা অবলা বা হতশ্রী হয়ে পড়তেন না! খুব কম মহিলারই তখন অযাচিত মেদ হত। এরও পিছনে রয়েছে তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচী। মেজের বসে তরকারি কোটা, পিঁড়িতে বসে রান্না করা, হেঁট হয়ে পরিবেশন করা বাসন মাজা, ঘর নিকোনো। এতেই তাঁদের গঠন অমন সুন্দর সুনমিত থাকত। কিন্তু তারও আগে অন্তঃপুরে উঁকিঝুঁকি মারলে! আমরা এখনকার আধুনিকাদের মত "পরেন বটে জুতো মোজা, চলেন বটে সোজা সোজা", ডিভলেপ ব্লাউজ পরে, পেট পিঠ অনাবৃত করে, অনায়াসে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন তাঁরা কিন্তু কালিদাসের কালে তো "শুধুমাত্র কুসুমেরই পত্রলেখায় যক্ষ রৈত চাকা।" আর অন্তঃপুরের সুন্দরীদের তো ছিল শুধুমাত্র কঞ্চুলিকা ভরসা। কটি বাসও আছ পর্যন্ত, কিন্তু লীলা কমল হাতে, তরীতামা, শিখরীদশনা, শ্রোণীভার ভন্না ক্ষীণ কটি সুন্দরীর সেই সুবহিম ঠাম!—কেমন করে সম্ভব হয়েছিল! তাঁদেরও তো সমস্ত শরীর প্রায় অনাবৃত থাকত। দেহ সৌন্দর্য না থাকলে অনাবৃত দেহ অতি কদাকার লাগে। সেকালের রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের আর কবি কর্ণপুরের কাব্য গাথায় যে সব রমণীদের বর্ণনা রয়েছে—তাঁরাও নিরাবাসা ছিলেন। যেমন, চলে নীল শাড়ী, নিতাড়ী নিতাড়ী পরান সহিত যোর! তেমন পরিপুষ্ট লাবণ্যময়ী অঙ্গসৌষ্ঠবের অধিকারিণী ছিলেন শ্রীরাধা। তবেই তো তাঁর বিমোহিনীরূপে কাহু পাগল হয়েছিলেন! কেমন করে অমন দেহ সৌষ্ঠব তিনি পেয়েছিলেন? সেও কি জটিলা কুটিলার তাড়নায় সংসারের কাজকর্ম করে? না গাগরীভরে যমুনার জল আনতে আনতে!

হ্যাঁ আগে যা বলছিলাম আবার সেই কথায় ফিরে যাই, ঐ যে খাওয়া, ওরই মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যের বীজ। মুড়ি নারকোল চিবিয়ে চিবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খেতে হয়, তার দরুণ দাঁতী শক্ত হয়, দাঁত ভাল থাকে। হজম শক্তিও বাড়ে। মুড়ি, চিঁড়ে, খইতে শিরার ভাল হয়। দুধে রং পরিষ্কার হয়। আর ছোলাতে পেট পরিষ্কার করে। টোই যাবলে দাঁতের কতটুকু পরিশ্রমই বা হয়।

সেকালে মেয়ের কড়াইতে রান্না হত। তার ফলে প্রচুর আয়রণ মেয়ে পেটে। আমাদের শরীরের পক্ষে লোহা অতি প্রয়োজনীয়, কেননা প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেক মাসে আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে লৌহক্ষয় হয়ে থাকে।

শাকসব্জী মুক্তাতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন। ডেডো আর টক দুটিই আমাদের পরম দেশে পেটের জন্য সমান উপকারী। ডেডোতে পিত্তনাশ করে। টক খেলে রক্তশক্তি বাড়ে। অমরোগ হয় না।

মুগ, অড়হর, কলাই, মুসুর ডাল এর বিভিন্ন রান্না লাউএর ঘন্ট, নানারকম শাকের ঘন্ট বড়ি দিয়ে, ঝিঙে পোস্ত, চাল কুমড়ো, মোচার ঘন্ট, ঝোড় ছেঁচকী, সজনে ফুল ভাজা। সজনে খাড়া চচ্চড়ি! এর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা উপকারিতা আছে, ঋতু বিশেষে খাদ্যের তালিকারও পরিবর্তন হত। আর তার ফলে শরীর তার প্রয়োজনীয় বস্তুও ঠিকমত আহরণ করে নিত। এছাড়া মাছ মাংসে তো উপকারিতা আছেই! তবে মাসে খাওয়া হত কোন বিশেষ দিনে যেমন, জামাই আসছে মাসে হল বা প্রসাদী মাসে এলো তো রান্না হল। মাছই ছিল প্রধান খাদ্য। বাঙালী ঘরের সধবারা একাদশীর দিন মাছ না খেলে খাঁদচুবড়ী বুড়োও জল খেতেন শুনেছি।

মেয়ের পানা আর তরমুজের সরবত শরীর স্নিগ্ধ রাখে। কোষ্ঠও পরিষ্কার করে। আর তার ফলে মুখে কোন রকম ব্রণ বা মেছেতা হয় না। অনেক বয়স পর্যন্ত লাবণ্যটুকু থেকে যায়। উনুনের আঁচ মুখে লাগত বলে মুখে রিঙ্কল্‌স্ পড়ত না। এখন সেই কাজ করতে হয় স্নোপার দিয়ে।

সন্তান সন্ততি বেশী হওয়া সত্ত্বেও যৌবন থাকত অটুট, তার প্রথম কারণ খাদ্য, আর দ্বিতীয় কারণ কয়েকটি নিয়ম। প্রসবের পরে প্রসূতির পেট টিপে শক্ত করে বাঁধা হত, যাতে পেটে বা কোঁচড় নাবে এদিকে লক্ষ্য রাখা হত। তারপর সেঁক, তাপ, মালিশ ইত্যাদিতে দেহ মজবুত হয়ে উঠত। ছোঁয়াছুঁত মানা হত বলে মহিলারা ঐ নিয়মের আড়ালে সম্পূর্ণ বিশ্রাম সুখটি পেতেন। ঐখানেই তো হল মেয়েদের শরীরের আসল ভিত। সুতরাং আঁতুড় উঠে যাবার অনেকখানেক পরে স্নান করে যখন ওঁরা ঘরে উঠতেন তখন ওঁদের শরীরে আর কোন গ্লানিই থাকত না। আর এখন হাসপাতাল থেকে মাত্র তিন দিন পরে ফিরে এসে একেবারে আগের মত কাজে কর্মে লেগে যেতে হয়। আঁতুড়ের কোন বালাইই নেই। এর ফলে তখনই হয়ত কোন ক্ষতি হয়না কিন্তু কিছুদিন পরেই নানারকম অসুখ দেখা দেয়। মাথা ভেঙে পড়ে। মনও ভেঙে যায়। আমাদের যেখানে শরীরের মূল সেটাই যদি অবহেলিত হয় তাহলে খাদ্য খাওয়া বা প্রসেপ অয়েলেপও কিছুই ফল হবে না। আজকের দিনে অবশ্য সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয়েছে একান্নবর্তী পরিবার আর নেই। মেয়েরা আজ শুধু ঘরই নয় বাইরেও সামাল দিচ্ছে। তবেই বুঝে আসছে স্বচ্ছলতা। কিন্তু তার দিকে দৃষ্টি দেবার কে আছে। বাড়ীতে যেটুকু ভাল জিনিষ রান্না হয় সংসারের যশে খেটে খাওয়া স্বামী ছেলের পাতে সে নিজেই হয়ত যেটুকু তুলে দেয়, কিন্তু নিজেও যে সে ঘরে বাইরে পরিশ্রম করছে তারও যে ভিটামিন প্রোটিন এসব চাই সে কথা কি তখন তার মনে থাকে। তখন সে শুধুই মা আর নয়ত স্ত্রী কিম্বা বোন।

সুতরাং মূল কথা হল এই যে আগে ভিত পত্তন তারপর বাড়ী বাঁধা। আগে স্বাস্থ্য ভাল করে তারপর রূপচর্চায় মন দিন। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখুন এখন যেটুকু ওঁদের কাছ থেকে নেওয়া সম্ভব যেটুকু ধার নিয়ে নিজের সংসারের হাল নিজে ধরুন। পরিশ্রম বিমুখ হবেন না। আয়ের পরিশ্রম অনুযায়ী আহার আর বিশ্রামও বেছে নিন। রূপকথার সোনার চাবি কাঠি আছে এখানেই।

চুল আঁচড়াতে সত্যি জানেন ?

সুরঞ্জনা সেন

মেয়েদের সৌন্দর্য লম্বা-কালো চুলে। কিন্তু যারা মোটেই চুলের যত্ন নেয় না তাদের পারিপাট্যহীন চুল শুধু বিশ্রীরকমই সৃষ্টি করে। সুন্দর চুলের অধিকারিণী হতে হলে নিয়মমতো চুলের যত্ন নিন।

মনে রাখবেন মাথের নরম ঘাস আর মাথার চুল একই রকম স্পর্শ-কাতর এবং সুকুমার। বেশি রগড় তাদের সয়না। তাই, প্রথম কথা, তাদের টেনো বা শক্ত খসখসে ব্রাশ দিয়ে কখনো চুল আঁচড়াবেন না।

বারেবারে চুল আঁচড়ালে চুল ভালো থাকে এ-কথা মোটেই ঠিক নয়, বরং দিনের মধ্যে শতেরো বার ক'রে চুল আঁচড়ালে চুলের ক্ষতিই হয়।

চুলের ভিতরে চিরুণী চালাবেন খুব আলগোছে, ধীরে ধীরে। মাথা থেকে স্বাভাবিক ভাবে যে স্নেহজ তৈল নিঃসৃত হচ্ছে-চিরুণী দিয়ে সমস্ত চুলে আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে দিন।

মনে রাখবেন চিরুণী দিয়ে চুলের ময়লা সব দূর করা আদৌ সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার সাবান বা শ্যাম্পুর। সুতরাং চিরুণী দিয়ে সাবানের কাজ করতে যাবেন না।

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য

"কৃত্রিম সভ্যতার শ্বাসরোধকারী আবেষ্টনের বাহিরে, অবন্ত প্রকৃতির শ্যামলসম্ভারের মাঝখানে যে রূপশ্রী প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা চিরকালের স্মরণ-কোঠায় রহিল। তাহার অঙ্গে ছিল না আভরণ, দেহে ছিল না প্রসাধন, চোখে ছিল না কাজল, কপোলে ছিল না কুঙ্কুম; কিন্তু মনে হইল যেন সেই অনাবৃত স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে বিধাতা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জায় সজ্জিত করিয়া ধরায় প্রেরণ করিয়াছেন।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

তাজমহল

বিমল কুমার ঘোষ

হয়তো এমন হয় অনেক সময়, যে—কোন একটি স্থানের নাম কিংবা কোন ব্যক্তির নাম, স্মৃতির তন্ত্রীকে আলোড়িত করে তোলে। মনে হয় পূর্ব পরিচিত মনে হয় এ নামটিকে বিশেষ ভাবে মনে করে রাখার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু হয়নি। ঠিক একটি স্মৃতি আলোড়িত নাম আগভোগরা। বিমান ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল বড় লেভেল ক্রসিং-এর সামনে। দু' পাশে দোকানের সারি। আর আমি এই আগভোগরা স্থানটির নামের পূর্ব সম্পর্ক খুঁজে ফিরছিলাম মনে মনে। নামটির সঙ্গে আমার যে কিসের সম্পর্ক তা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যদি না নরেশ কুণ্ডু তার রাস্তার পাশের হোটেল থেকে দৌড়ে গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াত। নরেশ কুণ্ডুর চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ছিল।

—দাদা, আপনাকে নামতে হবে এখানে। নরেশ কুণ্ডুকে চিনতে পেরেছিলাম। এই আট বছরে নরেশ কুণ্ডুর বেশভূষা আর চেহারার মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে—সেই পরিবর্তন সত্ত্বেও ওকে চিনতে পেরেছিলাম। বস্তুতঃ ওর সেই নিজস্ব হাসিটুকুই দেখে চিনতে পারলাম।

নরেশ কুণ্ডু আমাকে অবাক হওয়ার সুযোগ না দিয়ে বলল—

—সেই আইশেন দাদা, কিন্তু বড় দেরী কইর‍্যা ফালাইছেন।'

আমি ক্ষীণস্বরে একটি প্রতিবাদ জানাতে গেলাম—

—কিন্তু আমি যে হাজিলিঙ যাব নরেশ—

—হ। হে তো যাইবেনই। কিন্তুক্ আজই যদি পাহাড়ে উঠতে যান—তবে শরীল খারাপ অইব নিশ্চয়ই।

আইজকার দিনডা থাইকা কাল সকাল সকাল যাইবেন। এখান থিক্যাই হাজিলিঙ-এর গাড়ী পাওয়া যাইব।

নরেশ আমাকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে আমার স্যুটকেস, বেডিং নামিয়ে ফেলল। অগত্যা আর প্রতিবাদ নিষ্ফল। নেমে পড়লাম।

আগ্রা শহরে দাঁড়িয়ে নরেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যে সময়ই হোক, আমি একবার যাবই নরেশের কাছে। সে আজ আটবছর আগের কথা।

নরেশ বলছিল—দাদা আর বাঁচল না দাদা। সেই বছরই মারা গেল।

রাধা বাঁচবে না তা আমি জানতাম। নরেশও জানত। আর সেই সম্ভাব্য দুঃসংবাদটি শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলেই এতক্ষণ আমি রাধার কথা জিজ্ঞাসা করিনি। বস্তুতঃ আগভোগরায় আসার আমন্ত্রণের আন্তরিকতার মধ্যে রাধার অংশই সবচেয়ে বেশী। রাধা নেই।

আগ্রা সহরে নরেশ কুণ্ডু এবং রাধার সঙ্গে আমার পরিচয়। তাজমহল দেখছিলাম।

সম্রাট শাজাহানের অমর কীর্তি দেখবার জন্য কতদিন ধরে কত দুরাগত দর্শনার্থীর ভীড় হয়েছে আগ্রা সহরে—সেটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। আমি তাজমহলের সঙ্গে সঙ্গে সেই মানুষগুলিকেও দেখছিলাম। দেশীয় ভাগই ইওরোপীয় সওদাগরী। এদেশী বিত্তবান মেয়ে পুরুষেরও অভাব ছিল না সেদিন তাজমহলে। আর এই ভীড়ের মধ্যে আমার চোখে সবচেয়ে কৌতূহল এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল নরেশ কুণ্ডু আর রাধা।

সেদিন একখানা মহলা পুরণো কাপড় পরা ছিল নরেশ কুণ্ডুর। গায়ে সস্তা ছিটের হাফশার্ট। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বাংলাদেশের খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষ নরেশ কুণ্ডু। তাজমহলের অতি উজ্জ্বল মার্বেল পাথরের সমাধি সৌধ সহসা যেন আমার কাছে অত্যন্ত বিবর্ণ মনে হল। স্বাভাবিক কৌতূহল। আর যাই হোক—নরেশ কুণ্ডুকে সেদিন অত্যন্ত বেমানান মনে হচ্ছিল তাজমহলে।

সাথে রাধা। কৃশ অস্থিচর্মসার একটি কুণ্ঠিত যৌবন মেয়ে। এত কৃশ যে, নিজের ভারবারও সামর্থ ছিল না রাধার। নরেশ কুণ্ডুই অতি সন্তর্পণে, হাত ধরে সমস্ত তাজমহল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিল রাধাকে।

অসংখ্য দর্শনার্থীর মধ্যে নরেশ কুণ্ডু বা রাধা আমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে পারছিল না বলেই আমি ওদের পিছু পিছু ছিলাম। এক অসাধারণ এবং দুর্নিবার কৌতূহলকে আমি কিছুতেই ঠেকে রাখতে পারছিলাম না।

রাধা মাঝে মাঝে নরেশ কুণ্ডুকে কিছু বলছিল চরকণ্ঠে। সমস্ত তাজমহল ঘুরে ওরা আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল—যেখানে সম্রাট ও বেগমের কবর রয়েছে। অনেকক্ষণ নির্নিমেষ চোখে রাধা তাকিয়ে রইল কবরের দিকে। তারপর একসময় ফিরে এল।

কতিপয় মসজিদের সামনে ওদের ভাড়া করা টাঙ্গা অপেক্ষা করছিল। ওরা দুজনে গভর্ণমেণ্ট সেলস্ এম্পোরিয়াম থেকে একটা ছুরি পাথরের খেলনা তাজমহল কিনল দেখলাম। তারপর রাধাকে খুব সন্তর্পণে টাঙ্গায় উঠিয়ে দিয়ে রাস্তার পাশেই যখন ফেরীওয়ালার কাছ থেকে নরেশ একছড়া পাথরের মালা কিনতে এল, তখন বললাম—

'শুনুন।

নরেশ ফিরে দাঁড়াল—আমাকে ডাকছেন?

—হ্যাঁ। আপনি কি বাংলা দেশ থেকে এসেছেন?

নরেশ বিনীত হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল করে বলল—আইজ্ঞা হ। শিলিগুড়ি সহরের কাছেই বাগডোগরা থিক্যা আসছি আমরা।

—আপনার সঙ্গে উনি?

—আইজ্ঞা আমার পরিবার। নরেশ সব সময়ই তার মুখে সেই বিগলিত হাসিটুকু টেনে রেখে দিল।

বললাম—এই অসুস্থ অবস্থায়—মানে কিছু মনে করবেন না, আমি লক্ষ্য করেছি উনি খুবই অসুস্থ।

নরেশ একটু ইতস্তঃ করল। আর ঠিক এমনি সময়ে হাতের ইসারায় রাধা আমাকে কাছে ডাকল।

—আমাকে ডাকছেন ?

রাধা বলল—আপনে বাংলা শিক্ষা আসছেন ?

বললুম—হা।

—তয় তো খুব ভালই অইল। রাধার রোগ পাণ্ডুর মুখে খানিকটা খুশির আভাস। বিস্তারে আসিয়া তারী খারাপ লাগতাছে।

টাংগোওয়ালা যাওয়ার তাগিদ দিল।

নরেশ কুণ্ডু টাংগায় উঠতে উঠতে বলল—আইজ আসেন না সন্ধ্যেবেলায়। যা জিগাইলেন, হে বিত্তান্তডা কমু আপনারে। আমরা কইলকাত্তা হোটেলে উঠছি।

রাধাও বলল—আইসেন না দাদা হোটেলে। খুব ভাল লাগতাছে আপনারে দেইখ্যা।

বললুম—যাব।

আগ্রার সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ক্যালকাটা হোটেলে গিয়ে নরেশের সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত এমন একটা কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছিল নরেশ কুণ্ডু এবং রাধাকে ঘিরে যে না গিয়ে পারিনি। বিস্ময়টা এইখানে যে নরেশ এবং তাহার বেনকুয়ার মধ্যে দারিদ্র্য অত্যন্ত নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে এটা কোনমতেই আমার চোখ এড়ায়নি। তাহলে কি ওরা এমনই জীবন রসিক যে সুদূর বাংলাদেশ থেকে তাজমহলের আকর্ষণে ছুটে এসেছে শুধুমাত্র জীবনের তাগিদে ? তাজমহল দর্শন কি ওদের দর্শনীয় বস্তু দেখার লোভে না দার্শনিকতার চাহিদা মেটাতে ? এই প্রশ্নে যখন বিচলিত হয়েছি নিজের মনে তখন নরেশ কুণ্ডুর হোটেলে গিয়ে দেখা না করে পারিনি। রাধা ঘুমিয়ে পড়েছিল। অসুস্থ শরীর নিয়ে তাজমহল ঘোরা খুশির বকল সামলাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সময়টা শীতের প্রথম।

নরেশ আমাকে দেখে উৎফুল্ল হল।

—এই যে দাদা, আপনে আসছেন ?

বললাম—আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার স্ত্রী ঘুমিয়েছেন এখন বিরক্ত করা বা এখানে বসে কথা বলা ঠিক হবে না।

নরেশ বলল—কিছু অইব না, আপনে বসেন দাদা।

বসতে রাজী হলাম না।

নরেশের পীড়াপীড়িতে ওকে নিয়ে হোটেলের ছাদে উঠে গেলাম। নরেশ যাওয়ার সময় মমতার সঙ্গে আস্তে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল রাধাকে। তারপর দরজা টেনে দিয়ে ছাদে উঠে এল।

—আপনে কথাডা জিগাইয়া ভাল করছেন দাদা। এই বিত্তান্ত বিল্লী-এ কেউ কারও মুখের দিকে চাইয়া তাখে না। আপনারে পাইয়া মনে হয় যেন আপন মানুষ পাইলাম।

বললাম—কিন্তু স্ত্রীর এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কি তাজমহলই দেখতে এসেছেন ?

নরেশ বলল—আইজ্ঞা হ দাদা। রাধার এই অবস্থার কেন আসছি জানেন ? ও আর বাঁচব না। অখন যদি না লইয়া আসি তবে সারাডা জেবন বড় আফশোষ থাকিয়া যাইব।

নরেশ বলল—আমরা আজ ছয় বছর ঘর করছি দাদা—কিন্তুক্ রাধা আমার কাছে কিছু চায় নাই। না, এউকসা কাপড়, না একখান গয়না। চাইব কি! ভাল করিয়া প্যাট্ ভইরা খাইতে দিবার পারি নাই এই ছয় বছর।

নরেশ একটু সময় চুপ করল। মুখ নীচু করে ছাদের উপর আঙুল দিয়ে দাগ টানল। তারপর বেদনা জড়ানো গলায় বলল—

—অথচ জানেন দাদা, রাধা কোন্ ঘরের মেয়ে? মানিকগঞ্জের পাটোয়ারীগো মেয়ে রাধা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে অতীতের স্মৃতিকে মনে মনে সাজাবার চেষ্টা করছিল নরেশ হুণ্ডু। তারপর খুব আস্তে বলল,

—বয়স তখন আমার কম। মানিকগঞ্জের সদর রাস্তার পরে আমাগো বেনেতী দোকান আছিল। বাবায় দোকান করত—আর মাঝে মাঝে বাবার এ-গাঁ সে-গাঁ কেরী করতে গেলে পর আমিই দোকানে বসতাম। বেচাকেনা করতাম।

কি আর কমু দাদা! ওই রাস্তা দিয়া মাইয়া পোলাপান্রা ইস্কুলে পড়বার যাইত। মন ধরিয়া আমার কাছ থিক্যা খাতা, কাগজ, পেন্সিল কিনত। অজেন্স বিস্কুট কিনত।

রাধাও যাইত্ মাইয়্যা গো ইস্কুলে। ওই দোকানেই রাধার সঙ্গে পেরথম আলাপ।

নরেশ একটু হাসল—বলল—'আলাপ আর কই ক্যামনে। বরক কই যে ঝগড়া।

—ঝগড়া!

—নরেশ বলল—ঝগড়া কি আর এক দুইদিন! প্রেত্যেক দিন রাধা ঝগড়া করত আমার লগে। কিনত তো মোটে এউকসা পেন্সিল কিংবা এক দিস্তা কাগজ। তা কয় কাগজ তার না হায় বেশী, আমি নাকি মানুষের গলা কাটতে পারি, এই সাত সতের নিয়ে আমার লগে ঝগড়া বাধাত।

তা আমি কইতাম—যে, তোমার না পোষায় আমার দোকান থিক্যা তোমার সওদা করবার দরকার তা কি? আরও দোকান আছে, যেখান থিক্যা ভাল মাল পাও, কি সস্তা মাল পাও, সও গিয়া।

রাধা কয়—'না তোমার দোকান থিক্যাই লমু। ভাল মালও দিতে অইব—নায্য দামও নিতে অইব।

নরেশ বলে চলে—আমি দাদা, লেখাপড়ি শিখি নাই। গরীব ঘরের ছাওয়াল—দিন আনিয়া দিন খাই। শিখুম ক্যামনে। দোকানদারী করি আর রোজ স্কুলের সময় পথ চাইয়া থাকি। রাধা না আইলে পর দিনডা যেন ক্যামন খারাপ লাগে।

রাধা কিন্তু একেবারেই আসা বন্ধ করল ইস্কুলে। শুনি পাটোয়ারীরা আর মাইয়্যারে পড়াবে না। মেলাই পড়ছে, এবার বিয়া দিবে। কথাডা শুইন্যা বুকটার ভেতর কেমন করিয়া ওঠল। তবুও এতখা ভাবি নাই যে রাধার লগে আমার বিয়া হইতে পারে।

নরেশ আবার চুপ করল।

বলল—চা খাবেন দাদা? হোটেলে চায়ের কথা কইয়া আসি।

আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলাম।

—আগে তোমার কথা শেষ কর।

নরেশ তেমনি ভাবে হেসে বলে—এহি আর কথার মত কথা দাদা! এ বয়স কালের পাসপ্তামী।

—বেশ তো তাই বলো!

নরেশ লজ্জিত হয়ে বলল—সে আর শোনার মত না। বাঁয়ের মধ্যে একটা ঝাকুনি গোলমাল হইয়া গেল দাদা। কি—না পাটোয়ারী গো মাইয়া রাধা বাঁকিয়া বসছে বিয়া করব না। আর যদি বিয়া দিতেই হয় তয়, কুটুমো ছাওয়ালের লাগে বিয়া দিতে অইব।

পাটোয়ারীরা রাগিয়া আগুন। রাধার বাপ রাধা আমার ঝাঁকারে তাকিয়া বিয়া পাসায়।

রাধা আসিয়া আমারে কয়—তোর লাইগা পাটোয়ারীরা আমারে হগটা মন্দ কথা শুনাইল। বড় মানুষের মাইয়ার লগে পীরিত করছ—অখন আমি এহ কি করম

বড় দুঃখ অইল দাদা। ভগবান জানে—রাধারে লইয়া ভাল লাগত ঠিকই; কিন্তুক ওরারে বিয়া করবার কথা ভাব নাই কোনদিন। ভাবব ক্যামনে? রাধা কত লেখাপড়ি করছে, চলনে বলনে টাউন বাজারের মাইয়াগো মত হইছে। আমার মত মুখ্যু মানুষের লগে কি আর রাধারে মানায়?

রাধায় গালি দেয়—তুমি। মা উঠতে বসতে ঝগড়া করে। সুখ খুলি না। শুধু ভাবি রাধা এডি করল। এই যদি ওর মনে ছিল—তয় আগে কেন আমারে 'ভা'ক' দেয় নাই।

রাধার লগে দেখা করবার ভান খুঁজি খালি। দেখাও পাইলাম।

রাধা কয়—ওসব কিছু শোনতে চাইনা। পুরুষ মানুষ হও তো লইয়া পালাও। না পারো তো কও, গায়ের জল শুকাইয়া যায় নাই।

অনেক ভাবছি দাদা। অনেক চিন্তা ভাবনা করি কিন্তুক কোন কূল কিনারা পাইনা। উপরে ভগবান সাক্ষী রাধারে কোনদিন মনে মনে চাই নাই। সেই রাধা যদি এমনি করিয়া ডুবিয়া মরতে চায় তয় পুরুষ মানুষ হইয়া ক্যামনে চুপ করিয়া থাকি।

রাধারে লইয়া পলাইয়া আইলাম।

এ ভাগ সে ভাগ করিয়া ভাব পরে এই বাগডোগরায়। ছোট একখান ভাগে ভাড়ার দোকান দিয়া কোনরকমে দুইডা পরাণ বাঁচাইয়া রাখি। সুখ নাই, আহ্লাদ নাই; জেবনে কিছুই দিবার পারি নাই রাধারে। সেই দুঃখডাই বড় বাজে মনে।

রাধা শুনিয়া হাসিয়া ওঠে—কয়—তুমি খালি ওই সব কথা ভাবয়া না বোঝ্না। সুখ ভগমান দিলে অইব, না দিলে অইব না।

রাধা মুখ টিপে হাসে কয় তা তোমার কাছে আমার আর সুখ চাইতে অইব না। আমারে সুখ দিবার মানুষ আইজ্যাছে—

কথাডা শুনিয়া অন্যরডা কাঁপিয়া ওঠে—কই, কও টি? করলা করিয়া কও!

রাধা কয় এহার পোলাপান কাছে চাইব যা চাওয়ার। কি অহেই দাদা। নিজের পো পরান পারি না এর ভেতরে আবার আর একজন। হাসব কি কাঁদব বুঝিনা।

নরেশ চুপ আবার থামল।

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—তয় রাধা কিন্তু আমার কাছে এইকথা জিনিষ চাইছিল। কয় কি—তোমার কাছে কিছুই চাই নাই। কিন্তুক সারা জেবনে এইকথা জিনিষ দেখবার বড় সাধ আছিল।

—'কি ? না—তাজমহল !

তাজমহলের বিরাটত্বটাও রাধা আমারে কইছিল। কথা দিছিলাম—তাজমহল তোমারে দেখামু রাধা। যেমন কইরা পারি তাজমহল দেখামু।

রাধার সোনা বাঁচল না। আট মাসে নষ্ট হইয়া গেল। প্যাট ভরিয়া যে খাবার পায়ে নাই নিজের শরীলের অবস্থা যার ওই রকম সে আরও এইরকম কেমন গড়িয়া তোলতে পারবে কান্ ?

অকালে নষ্ট হইয়া গেল—আর রাধার শরীরও ভাঙিয়া পড়ল। শরীলে একফোঁটা রক্ত নাই। ডাক্তার দেখাইয়া ওষুধ খাওয়াইব, সে খ্যামতাও আমার নাই। বোঝলাম—রাধার দিন ফাঁক হইয়া আস্‌ত্যাছে।

একদিন কইলাম—রাধা, তুমি তাজমহল দেখবার চাইছিল:—যাবা ?

রাধা কয়—যামু। কিন্তুক তুমি পারিয়া ওঠবা ক্যামনে।

—সে আমি পারুম।

রাধারে না জানাইয়া ভ্যালে তাজার দোকানডা বেচিয়া দিলাম। আমার হাতেও কিছু টাকা আছিল—তাই সম্বল করিয়া চলিয়া আস্‌ছি।

নরেশ তার দীর্ঘ কাহিনী শেষ করল। আমি কোন কথা বলিনি। বস্তুতঃ নরেশ কুণ্ডুর এই কাহিনী শোনার পরে কিছু যে বলার থাকতে তা আমার মনে হয়নি।

চলে আসার আগে দেখলাম—রাধা জেগে উঠেছে। আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল—আপনে আসবেন তা জানতাম !

আমি বললাম—কেন আসব না। আগামীকালও আসব। তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব।

ট্রেনে ওঠার আগে রাধা বলল—দাদা আপনে তো খালি ভাগ-বিভাগ বুঝিয়া বেড়ান দার্জিলিঙ-এও নিশ্চয়ই যাইবেন। যাওয়ার পথে বাগডোগরায় নামবেন। সরীর বোনের ঘরে একবার পায়ের ধুলা দিতেই অইব।

আমি কথা দিয়েছিলাম—অবশ্যই যাব।

কিন্তু এই যুগ বড় নিষ্ঠুর। এই যুগ আর এই জীবনযাত্রা মানুষের সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিকে বড় কঠোর হাতে মুছে দেয় মানুষের অন্তর থেকে। হাজার মানুষের ভীড়ে, অসাধ্য কাজের ঝোঁকে রাধা আর নরেশ কুণ্ডুও স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

আজ আর রাধা নেই।

রাধার বর্ণিত সেই সরীর কুঁড়েটাও চোখে পড়ল না—তার পরিবর্তে দেখলাম—হাল ফ্যাসানের একটি হোটেল। আর সেই হোটেলের মধ্যে সুবেশ সুশিক্ষিত নরনারীর ভীড়। একপাশে রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীতের সুর ছড়িয়ে পড়ছে। কাঁচা চামচ, পেয়ালা পিরীচের টুংটাং শব্দে—হোটেল সরগরম।

আর এতক্ষণে নজরে পড়ল—হোটেলের বিরাট সাইন বোর্ডটা। তাজমহল হোটেল। নিখুঁত শিল্পকার্যে সাইন বোর্ডের মাঝখানে তাজমহলের প্রতিকৃতি করা। নীচে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে লেখা প্রোপ্রাইটর শ্রীনরেশচন্দ্র কুণ্ডু।

নরেশের পরিবর্তনও কিছু কম নয়।

বয়স বেড়েছে নরেশের। সেই পাকানো ঘড়ির মত শরীর এখন রীতিমত মেদবহুল। মাথা

কাপড়ের স্যুট, নেকটাই পরেছে নরেশ। আমাকে এমনি ভাবে তাকাতে দেখে নরেশ কি বুঝল জানি না।

তবে তৎক্ষণাৎ সে সেই বিনীত হাসি মুখে এনে বলল—

—কি দেখছেন দাদা? এসব বাইরের খোলস—ব্যবসার অংশ। আগ্রায় যে নরেশ কুণ্ডুকে দেখছিলেন—তাকে দেখবার চান? সেই রাধা আর নরেশ কুণ্ডুকে?

কোন জবাব দিলাম না আমি।

নরেশ বলল—আসেন।

ওর পিছু পিছু না গিয়ে আর উপায় নেই।

কোটেলের লম্বা ঘর পেরিয়ে ও একখানা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে গেল।

দরজা খোলার সংগে সংগে ধূপ ধুনা এবং ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরপুর। যেন পবিত্র পুজোর ঘর। পুজোর ঘরই বটে।

সামনের একখানা সেগুন কাঠের কারুকার্য খচিত সিংহাসনের উপর রাধার একটা আবক্ষ তৈলচিত্র। রোগ পাণ্ডুর—আগ্রায় দেখা রাধা নয়—এ তরা যৌবনবতী বধূ রাধা। সিংহাসনের সামনেই আগ্রা থেকে কেনা সেই চুণাপাথরের তাজমহলের প্রতিকৃতিটি দেখেই চিনতে পারলাম।

নরেশ নির্নিমেষ চোখে তৈলচিত্রের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন চেতনাশূন্য দৃষ্টি। নরেশ কুণ্ডু যেন হারিয়ে গেল এই মুহূর্তে।

আমি ওই চুণাপাথরের তাজমহলটা দেখছিলাম। ওটাতে রাধার স্পর্শ আছে। কিংবা রাধাই লুকিয়ে আছে ওটার মধ্যে।

নিজের কোটে পরাজিত হয়ে এবং মাদ্রাজে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় দেখে কংগ্রেস সভাপতি ভারতের 'শক্ত মানুষ' শ্রীকামরাজ স্বীকার করেছেন যে তিনি হতবুদ্ধি এবং বিমূঢ়! তিনি বলেছেন—"মাদ্রাজে কংগ্রেস তো ভালই কাজ করেছে, তা সত্ত্বেও এই লজ্জাকর ব্যর্থতা কেন ঘটল? তাহলে কি সাধারণ লোক কংগ্রেসরাজ আর বরদাস্ত করল না? ভোটের বহর দেখে তাই তো মনে হয়। লোকে পরিবর্তন চাইছে।"

শ্রীকামরাজের মন্তব্যের উত্তর তো তাঁর উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। অতএব আর টিকা নিষ্প্রয়োজন।

• • •

গত নির্বাচনের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল বহু কংগ্রেসী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অন্যে পরে কা কথা! বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসহায় ন্যূনতম ভোট না পাওয়ায় তাঁর জামানত জব্দ হয়েছে। এতজন মুখ্যমন্ত্রীর জামানত জব্দ বোধ করি এই প্রথম।

দেশজোড়া নির্বাচনী উত্তেজনার মধ্যে একটা খবর চাপা পড়ে গিয়েছিল। খবরটির গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। ভারতের নির্বাচনে মস্কো মাথা গলিয়েছিল। রাশিয়ার কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে বেতারে প্রচার চালানো হয়েছিল। এই বেতার প্রতিদিন বেলা ২'৩০ থেকে ৩'৩০ পর্যন্ত শোনা গিয়েছে। এই বেতারে বেতার-ভাষ্যকার ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (দুই দল) হচ্ছে একমাত্র খাঁটি দল। তারাই দেশের সত্যিকারের পরিত্রাতা। অন্যরা সব ভণ্ড। বিশেষ করে জনসঙ্ঘ এবং অন্য দলকে আমেরিকার তাঁবেদার বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং তাদের অনেক গোপন অপকর্মের নজির খুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে এই দুই দল আমেরিকার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা পেয়েছে। এই প্রচার কার্যের মধ্যে একটি লোককে বিশেষভাবে সমর্থন জানানো হয়েছে তিনি:হচ্ছেন কৃষ্ণ মেনন। শ্রীকৃষ্ণই নাকি ভারতের একমাত্র নির্ভেজাল ডেমক্রাটিক সোসালিষ্ট। পাতিল, মোরারজি, অতুল্য ঘোষ, সঞ্জিব রেড্ডি এবং জগজীবনরামকে প্রায় প্রতিদিনই নানা ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

শুধু নির্বাচনী প্রচারই নয়, দিন কয়েক আগে এই বেতার একটি চমকপ্রদ "গোপন সংবাদ" ফাঁস করে দিয়েছে। খবরটির নানা ভাষ্য অবশ্য এরআগেও প্রকাশ পেয়েছে, আমেরিকা নাকি এক

ষড়যন্ত্রকে রূপ দেবার সকল আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করেছে : "সংযুক্ত বাংলা রাজ্য"—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, নাগাভূমি ও ত্রিপুরা নিয়ে এই রাজ্য গঠিত হবে। এবং চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা এই রাজ্যকে তাদের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করবে।

বেতার ভাষণে আরও বলা হয়েছে এই পরিকল্পিত রাজ্যের মানচিত্র আমেরিকান সরকারের অনুমোদনক্রমে ছাপা হয়েছে এবং মার্কিন ক্যাপ্টেনরা এই ষড়যন্ত্র পাকা করে তুলছে।

মার্কিন পাস্তিদূতের ছদ্মবেশে সেখান থেকে কয়েকজন উচ্চপদের গুপ্তচর নাকি ইতিমধ্যেই ভারতে এসেছে।

সিমলা থেকে এই সংবাদটি এক সংবাদদাতা পরিবেশন করেছেন এবং জোর গলায় বলেছেন, ভারত সরকারও এই রূপ বেতার ভাষণের বিষয় জানেন এবং গোপনে তাঁরা তদন্তও চালাচ্ছেন।

• • •

গত সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের সমর্থক স্বামীস্ত্রীতে বিরোধ বেধেছে, তাইএ ভাইএ লাঠালাঠি হয়েছে, বাপবেটায় ঝগড়া লেগেছে, বন্ধুতে বন্ধুতে ছাড়াছাড়ি হয়েছে! এই প্রসঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভিন্ন মত পোষণের এবং পরমতসহিষ্ণুতার এক চিত্তাকর্ষক নজির উপস্থাপিত করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশের নেতা আচার্য কৃপালনী!

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী কংগ্রেস টিকেট-এ লোকসভার প্রার্থী ছিলেন। এই নিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আচার্য কৃপালনীর যে বাকযুদ্ধ হয়েছিল তার কথাই বলছি। রায়পুরের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আচার্য কৃপালনী তাঁর নির্বাচন অভিযানে এক সভায় কানে বলেন যে কংগ্রেসকে ভোট দিলে জাতীয়তাবিরোধী কাজ করা হবে এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

এই মন্তব্যের উত্তরে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীডি পি মিশ্র টিপ্পনি কেটে বলেন যে আচার্যের স্ত্রী শ্রীমতী কৃপালনী কংগ্রেসের তরফে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন; হিন্দু ধর্ম অনুসারে স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী; সুতরাং আচার্য কৃপালনীর অর্ধাঙ্গ যদি কংগ্রেসী হয় তাহলে আচার্যও জাতীয়তা বিরোধী বিশ্বাসঘাতক।

এর উত্তরে আচার্য কৃপালনী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মিশ্র একটি গবেট। শুধু তাই নয়, তাঁর এই মন্তব্যের দ্বারা তিনি ভারতের সমগ্র নারীজাতী এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীকেও অপমান করেছেন। ভারতের সংবিধান দেশের নর নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে। প্রত্যেক নর নারীর একটি করে ভোট আছে, আবশ্যক করে নয়। এবং সেই একটি ভোট তাঁর নিজের ইচ্ছা এবং বিবেক অনুসারে দেবার অধিকার প্রত্যেকের আছে। এর মধ্যে কোন জোর জবরদস্তি অনুরোধ উপরোধের স্থান নেই।

আচার্য কৃপালনী আরও বলেন, "শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। হেঁসেলে হাড়ি ঠেলবার জন্যে বা সন্তান উৎপাদন করবার জন্যে আমি তাঁকে বিবাহ করিনি। আমি শ্রীমতী ডি পি মিশ্রকে জানিনা, তাঁকে কখনো দেখিনি লোকের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কেউই তাঁকে কোনদিন দেখেনি। বোঝা যাচ্ছে শ্রীমিশ্র তাঁর স্ত্রীকে 'পর্দানশীন' করে রেখেছেন। শ্রীমিশ্র হয়ত মনে করেন, এইযুগে এখনো মনে করেন যে, স্ত্রীদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই, তাদের চাবুক মেরে মেরে বুঝিয়ে দিতে হবে যে স্বামী দেবতাদের পিছনে চলাই তাদের একমাত্র কাজ। আমি আজ সতেরো বছর ধরে কংগ্রেসের বিরোধীপক্ষ। শ্রীমতী কৃপালনী কংগ্রেসের একজন। আমাদের

এই আদর্শগত মতপার্থক্যের জন্যে আমাদের মনে কোন গ্লানির সৃষ্টি হয়নি এবং এই রাজনৈতিক মত পার্থক্য আমাদের দাম্পত্যজীবনে কোনদিন কোন ছায়াপাত করেনি। উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ ও সংস্কৃতি বোধ থাকলে মানুষ সহজেই নিজের রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতবাদকে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের বাইরে অথবা ঊর্ধ্বে রাখতে পারে। সম্ভবত শ্রীমিশ্রের এ বিষয়ে কোন চৈতন্য নেই।"

আচার্য কৃপালনী ভোটযুদ্ধে হেরে গেছেন বটে কিন্তু বাকযুদ্ধে মহাপ্রভেদের মুখমন্ত্রীকে যে ধরাশায়ী করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

• • • •

সাবধান! সাবধান! পথচলার সময় কারুর গায়ে গা লাগাবেন না, কেউ আপনার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করলে সরে যাবেন সড়াক করে। অপরিচিত লোকের হাতের সঙ্গে হাত মেলাবেন না কখনো! কেন বলছি জানেন? তাহলে এক ভদ্রলোকের সাম্প্রতিক এক অভিজ্ঞতার কথা শুনুন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বিকাল ৪'২৫ এর সময় তিনি মোহনলাল স্ট্রীট-এর মোড়ে ৯নং বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় সিল্কের সার্ট এবং পাজামা পরা এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসে জিগেস করলে, রামলালের দোকানটা কোথায়। তিনি জবাব দিলেন যে তিনি জানেন না। সঙ্গে সঙ্গে সেই পাজামা পরা লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর দুহাত ধরে বললে, আপনি রাগ করছেন কেন? লোকটির মুখ দিয়ে একপ্রকার গন্ধ বেরুচ্ছিল, বোধ হয় যেন মদের গন্ধ। কিন্তু যে মুহূর্তে সে ওই ভদ্রলোকের হাত ধরল সেই মুহূর্তেই ভদ্রলোকটির মনে হল যেন তাঁর চেতনা ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে, শুধু তাই নয় তাঁর আরও মনে হল যেন তিনি ওই পাজামা পরা লোকটির সম্পূর্ণ বশীভূত হয়েছেন। লোকটি তাঁকে বলল, পকেটে যা আছে বার করে দিন, হাতের ঘড়িটাও খুলে দিন। ভদ্রলোক বেহুঁসের মতো বিনা প্রতিবাদে সেই আজ্ঞা পালন করলেন। পরক্ষণেই লোকটি তাঁকে আদেশ করলো, সোজা চলে যান, খবরদার পিছন ফিরে তাকাবেন না। অন্তত ১০০ গা চলে যান শুনে শুনে। ভদ্রলোকও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। কিছু দূর যাবার পরই যেন তাঁর হুঁস ফিরে এলো, তিনি সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। কিন্তু কোথায় সেই পাজামা পরা ব্যক্তি! সে ততক্ষণ হাওয়া হয়ে গেছে। সমগ্র ঘটনাটি ঘটতে লেগেছিল ১০ থেকে ১৫ মিনিট। প্রতারিত ভদ্রলোকের নাম, শ্রী এস. পদ্মনাভন, নিবাস দমদম।

• • •

নির্বাচন প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে হল। পাঠকদের স্মরণ আছে বোধ করি, গত সংখ্যায় জানিয়েছিলাম, সেই যে এক হঠযোগী সাধু, কে, এম, রাও, জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে কেলেঙ্কারী করেছিলেন, তিনি হঠাৎ বোম্বাই এর এক কেন্দ্রে থেকে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, দম্ভ করে তিনি বলেছিলেন, একশোর মধ্যে একশোটা ভোট তিনিই পাবেন। তিনি প্রতীক নিয়েছিলেন—সিংহ, এবং বলেছিলেন তাঁর প্রতীক সিংহের গর্জনে ভোটা বলদ মূর্চ্ছা যাবে। অনেক লোকই বোধ করি, তাঁর তেলকি দেখবার অপেক্ষায় ছিল। যাইহোক, নির্বাচনের ফল বেরিয়েছে। মহারাষ্ট্রের বোরিভেলি কেন্দ্র থেকে তিনি নির্দলীয় রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর প্রতিপক্ষ পেয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার

অতীতের এক প্রদোষ সন্ধ্যা। পরম রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে অযোধ্যার রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু···।' বর্ম ও তরবারি নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর লগ্ন পার হবে না।" চিতার আরোহণ করে মৃতের শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুষ্পাসনাকের হলুদনিখে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে মেতে উঠল বাতাস ··· অগ্নিদান হল চিতায় আগুন ···

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই মধ্যের রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক — স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অতুলন আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন কথা ও অনুভূতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ভারতগ্যাস ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

DC-BID A 8586

গল্প-ভারতীর প্রিয় লেখক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কয়েকটি বহুপ্রশংসিত বই

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ)		৩·৭৫
আগুনের পরশমণি (উপন্যাস)	···	৩·০০
পূর্বাপর (গল্প)	··· ···	২·৫০
বিয়োগান্ত (গল্প)	··· ···	২·৫০
হে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প)	···	৩·০০
নব নব রূপে (রম্য কাহিনী)	···	৩·৫০
বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভাস্থ বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার আশ্চর্য কাহিনী)		৩·০০
স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য)	···	২·৫০
তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি (রহস্য)	···	২·০০
মায়াজাল ও মরণাভিসার (,)	···	২·০০
তিন সঙ্গী পিরানদেলো, মলেয়ার, স্ট্রিন্ডবার্গ (নাটক)	···	২·০০
নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের : মায়াবসান (নাটক)		২·৫০
নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ (নাটক)		৩·০০
Carey's Good Old Days (সম্পাদনা)		১৫·০০

: যন্ত্রস্থ :

চিরন্তনিকা (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)

রহস্য পঞ্চক (পাঁচটি রহস্য উপন্যাসের ওম্নিবাস)

নিশি বিসর্প (রহস্য কাহিনী)

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)

Glimpses of the Olden Times (সম্পাদনা)

Echoes from Old Calcutta (,)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে। যে-কোন বাংলা বই-এর জন্য পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা গল্প-ভারতী কার্যালয়ে লিখতে পারেন। আমাদের ক্রী সার্ভিস বিভাগ তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

গল্প-ভারতী কার্যালয় :

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-৬

॥ সর্বকালের স্মরণীয় বই ॥

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার ও যুগান্তর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

অনুপম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

এ শুধু সাধারণ কথা-কাহিনী গুচ্ছ নয়,—
প্রতিটি কাহিনীতে রক্ত-মাংসের
জীবন স্পন্দিত।

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

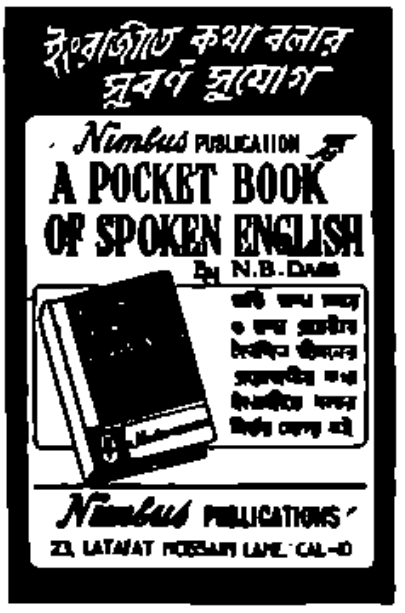

পরিকল্পনার মাধ্যমে

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

দেশ ভাগের পর নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে সার্থক তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। পনর বছরের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ এবং সর্বোপরি খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট।

আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যাপকতম কর্মপ্রচেষ্টা চলেছে।

ঃ শিক্ষা ঃ

	১ম পরিকল্পনা	৩য় পরিকল্পনাকালে (১৯৬৩-৬৪ প্রভিসনাল)
প্রাথমিক, নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি ...	২৩,১৫৬	৩১,৭৪১
উচ্চ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক	৩,২২৭	৪,৬৯২
কারিগরী বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা (পলিটেকনিকসহ) ...	২৯	২৩২
কলেজ (সাধারণ শিক্ষা) ...	২৪	১৪৪
বিশ্ববিদ্যালয় ...	৩	৭

ঃ কৃষি ঃ

	১ম পরিকল্পনার শুরুতে	৩য় পরিকল্পনাকালে
চাল	৩৬ লক্ষ ২১ হাজার টন	৪৭ লক্ষ ৬৫ হাজার টন
আলু	২ লক্ষ ৭০ হাজার টন	৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টন
পাট	৬ লক্ষ ৭৫ হাজার গাঁট	৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার গাঁট

ঃ স্বাস্থ্য ঃ

হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্পেন্সারি ক্লিনিক প্রভৃতি চিকিৎসা সংস্থা ...	১,২০১	২,০৫৬ (১৯০৫)
রোগীশয্যার সংখ্যা ...	১৭,৫৪৯	৩৩,১৬৭ (১৯৬৫)

ঃ বিদ্যুৎ শক্তি ঃ

	১ম পরিকল্পনা	৩য় পরিকল্পনা (১৯৬৫-৬৬)
উৎপাদনহার	৩৬৪ মেগাওয়াট	৮৮৮ মেগাওয়াট

এই পরিকল্পনা

প্রতিটি নাগরিকের জন্যই

এর সুফল পাচ্ছেন প্রতিটি নাগরিক

ডব্লিউ. বি. (আই এ্যাণ্ড পি. আর) এ. ডি.—২১/৬৭

রূপ রচনায়
অপরাজেয়

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর

হিমকল্যাণ

কেশ তৈল

গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ
কলিকাতা

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের সিল্ক শাড়াই

আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো,
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক ঃ
দি ক্যালকাটা কেমিকাল কোং লিঃ
কলিকাতা-৭১

CA-1 65 BEN

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
ফাল্গুন ১৩৭৩, MARCH , 1967
দ্বাদশবর্ষ ৫ম—৯ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীপ্রভাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রঙমারী: গেঞ্জী, টী-শার্ট, টেনিস-শার্ট,
চেন শার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন— শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেযুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং বালীগঞ্জ বিসিসেনি—গড়িয়াহাট অংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; অয়েব স্টোর্স; খ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এস, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ভাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার্ভা সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিমলকুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমাদত্ত, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণধনীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ধাবরমল; ধাতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ রুয়ারাম কেত্রী; অমরুক অরোরা; চন্দালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চাঁদনীবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৩৩-২১৮০

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

কোলে

▲ ভেনিস

▲ অ্যাসর্টেড লজেন্স ও টফি

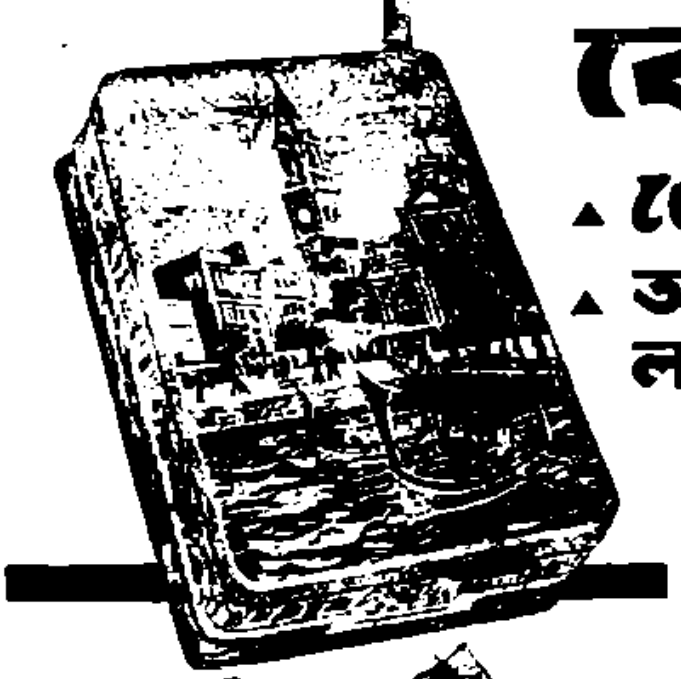

দুধ ও দুধজাতীয় তৈরী উপাদেয়
সন্দেশ ও মিষ্টিতে ভরা সুখ,
ছানায় ও ভরা মেওয়া ক্রিম।
উপহার ও আপ্যায়নে সেরা আকর্ষণ।

কোলে মিল্ক কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

একটি দম্পতির ক'টি সন্তান থাকা উচিত ?

আমরা সকলেই স্বাভাবিক, সুখী জীবন যাপন করতে চাই—কোন হাঙ্গামা বা সমস্যা চাইনা। ● কোন সুখী পরিবারে ক'টি ছেলেমেয়ে থাকে ? বর্তমানে যাঁদের তিনটি ছেলে-মেয়ে রয়েছে তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী দম্পতি আর ছেলেমেয়ে চাননা। ● অনেকগুলি ছেলেমেয়ের বাবা হয়ে গর্ব্ব বা আনন্দ অনুভব করার দিন আর নেই। নানা রকম পদ্ধতিতে পরিবারের আকার "স্বাভাবিক" রাখা যায়।

● হবীবুর, উঃ প্রঃ, বিহার ● বাংলার জনসংখ্যা পর্য্যালোচনা থেকে

পরামর্শ এবং বিনামূল্যে সেবার জন্য

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে যান।

DA 44/497 BEN

আপনার সুন্দর কালো

কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিনের এন্টাই থাকায় চুলের গোড়া মজবুত রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৭১১
ভাববার কথা	৭১২
কন্তা বন্তা (উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭১৩
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)	৭১৮
এক অনন্ত জ্ঞান তাপস—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭২৩
বোয়ার্সন (একটী শ্রদ্ধাস্বীকৃত নাম)—এষা মহাপাত্র	৭২৫
আকাশ, সমুদ্র, অরণ্য—(গল্প)—সমর বসু	৭২৯
শিমুল ফুলের গন্ধ (গল্প)—মানসপুত্র	৭৪০
চলতি দুনিয়া—	৭৪৬
খেলাধুলা—ইন্দ্রজিত	৭৪৯
চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একটী দৃশ্য—বেচারাম মুন্সী	৭৫৬

পোড়া .... কাটা .... গোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

হাতের কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেন্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

OBL

এই সংখ্যায়

নাটমঞ্চ—রত্নাকর ৭৫৯

ছায়া বাণী— ৭৬৯

মেয়ে-মজলিশ

দেহকে লাবণ্যময় করে তুলুন—আভা পাকড়াশি ৭৭৩

ভঙ্গী শুধু ভঙ্গীই নয়—পুতুল রায় ৭৭৫

গুপ্তচর কাহিনী

ষড়যন্ত্র পর্ব—গৌরীশংকর দে ৭৭৭

বড়ো দিনের আলাপ

মূল : রোজ মেরী টিমপারলি ৭৮২

অনুবাদ : সুপর্ণ রায়

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৭৮৫

কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্য্যায়

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

নিখুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই এর পরিচর্য্যা করা উচিৎ। উপযুক্ত উপাদানে প্রস্তুত হিমানী গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাবণ্য ও মসৃণতা বাড়ায়।

হিমানী
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২

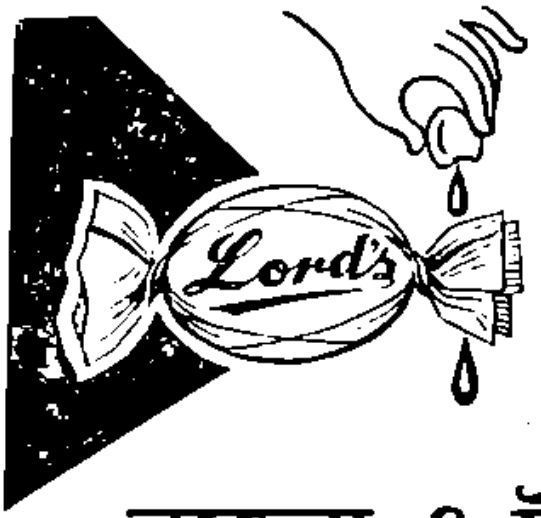

লর্ডের

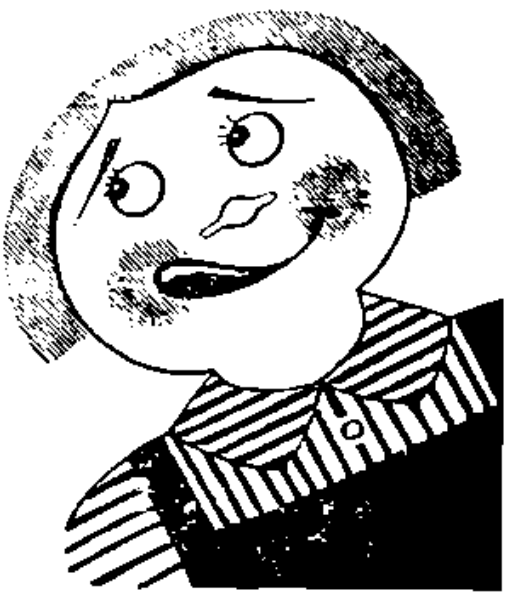

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১

THE HOUSE OF
NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA

NRM

NATIONAL RUBBER
MANUFACTURERS LTD.

Inchek Tyres
Limited

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

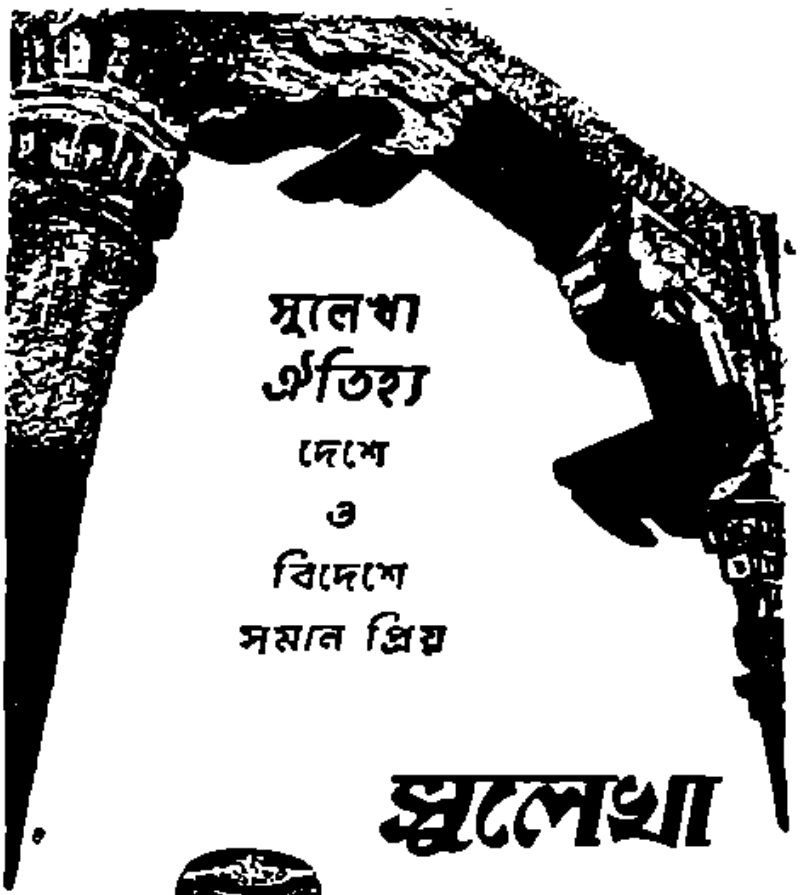

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩৭

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রচুর হাওয়া নিখুঁত স্টাইল

G.E.C. এভারেস্ট

১ ৪টি সাইজের পাওয়া যায়—৩৬", ৪৮", ৫৬" এবং ৬০"
২ ব্লেডগুলি নতুন ধরণে তৈরী।
৩ ব্লেডগুলি একটি খোপে থাকে -ফলে সমান অংশগুলি শক্তভাবে ধরা।
৪ ফুলাবার পর ও ঘুরই মজবুত

G.E.C.
আপনার গ্যারান্টি

GEC/Gill16

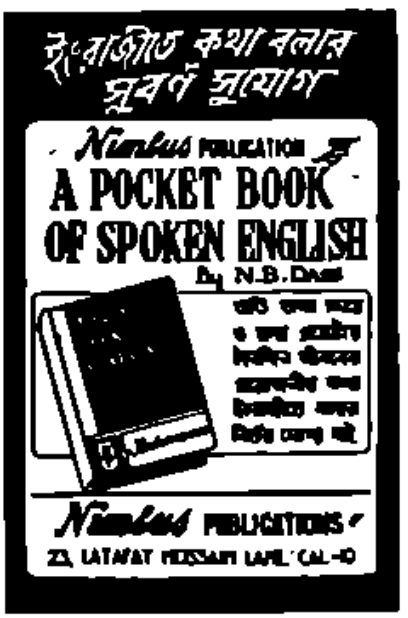

॥ সর্বকালের স্মরণীয় বই ॥

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার ও যুগান্তর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

অনুপম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫

এ শুধু সাধারণ কথা-কাহিনী গুচ্ছ নয়,—
প্রতিটি কাহিনীতে রক্ত-মাংসের
জীবন স্পন্দিত।

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

রূপ সাধনায়
সাধনায়

দুটি অনবদ্য অবদান

সাধনা বিউটি ক্রীম

প্রতিদিন ত্বক চর্যায় একান্ত প্রয়োজন। কুসুম কোমল পেলব তনু ও যৌবন সুলভ লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথ পেষ্ট

দন্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র ও উজ্জ্বল, মাড়ী সুস্থ ও সুদৃঢ় মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, লালবাগ, ঢাকা-৪

অধ্যক্ষ—ডিঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এফ. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সম্পাদকীয়

'সপ্ত-ভারতী' সাহিত্য পত্রিকা। এতে রাজনীতির কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। কিন্তু উপায় নেই। রাজনীতি আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্তকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে তাকে এড়িয়ে চলা কঠিন। তাছাড়া ভারতের চতুর্থ নির্বাচনের কথা যখন বলেছি, সে নির্বাচন শেষও যখন হয়ে গেছে, তখন তার শেষ কথাটি আমাদেরও বলা উচিত।

শেষ কথা—রাজনৈতিক পট পরিবর্তন।

গত উনিশ বছর ধরে যে দলের হাতে রাজ্যের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত ছিল এবার তার পরিবর্তন ঘটেছে।

এতে অবশ্য কোনও আশঙ্কার কারণ নেই। যে নতুন সরকার রাজ্যসমূহের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেছেন, সে সরকার এসেছেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সুতরাং গণতন্ত্রের অমিত শক্তিই তাকে রক্ষা করবে।

এখন চাই পরস্পরের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

পুরাতনের জায়গায় নতুন যাঁরা এলেন তাঁরা যে মুহূর্তের মধ্যে ভোজবাজী করে বসবেন, অতি অল্পদিনের ভেতরেই জনগণের হাতে স্বর্গ তুলে দেবেন—সে কথা যদি ভেবে বসে থাকি তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করবো।

কোনও রাজশক্তিই কখনও তা করতে পারে না।

রাজশক্তি পারে শুধু তার মুষ্টীর মারকতাকে পরিহার করে তার অমিত শক্তিকে জনগণের মঙ্গলের কাজে নিযুক্ত করতে। তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়ে প্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করতে।

সেইখানেই হয় অদৃশ্য মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব। এবং সেই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অর্জন করে তার গৌরবোজ্জ্বল অপরাজেয় মনুষ্যত্ব যেখানে সে প্রত্যক্ষ করে তার সমস্ত স্বার্থজয়ী কল্যাণের মহিমা।

তখন পরিচিত-অপরিচিতের বিভেদ-পার্থক্য ঘুচে যায়, দীনতম মিলিত হয় শ্রেষ্ঠতমের সঙ্গে একই গৌরবের বন্ধনে, সমান অধিকারের সূত্রে সব কিছু হয় আবারিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় এরই নাম ভ্রাতৃসম্মিলন।

বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি তাই যেন হয়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাববার কথা

তাই আজ আমাদের একান্তভাবে বুঝতে হবে আমাদের সমস্ত দুঃখের, সমস্ত কষ্টের সমস্ত ব্যথা ও বেদনার মূলে রয়েছে আমাদের জাতীয় মনের দরিদ্রতা, জাতীয় জীবনের হীনতা, জাতীয় চিন্তার অরাজকতা। কাজেই খুব গভীরভাবে চিন্তা করে বের করতে হবে আমাদের চিন্তার রাজ্যে কোথায় রয়েছে গলদ, আমাদের জাতীয় আদর্শের মধ্যে কোথায় রয়েছে ঘুণ, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোথায় হয়েছে অধঃপতন। কেমন করে এই মহান জাতির জীবন, আদর্শে এসে দেখা দিয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনা বিভ্রান্তি, স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি।

যে জাতির জীবন-আদর্শ ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একদিন সারা পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছিল, যে জাতির আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিল সেই বিরাট ও মহামহীয়ান জাতি আজ কী করে তিলে-তিলে অপমৃত্যুর অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে বহুদূরে বা বহু গভীরে যেতে হবে না। আজ তা এমনি সুস্পষ্ট যে তা জানতে বা বুঝতে কোন ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন নেই। তা হলো আমাদের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন।

কাজেই সর্বাগ্রে আমাদের ফিরে পেতে হবে আমাদের চরিত্র—আমাদের মনুষ্যত্ব।

এইখানেই আমাদের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সাহিত্যের। আজ সাহিত্যকে বলিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করতে হবে দেশের সেবায়, দেশের চিন্তায়। সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই জানেন একদিন সোভিয়েট রাশিয়ায় সাহিত্যিকরা এক নূতন সাহিত্যিক নীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের সমস্ত চিন্তাকে, তাঁদের সমস্ত রচনাকে, তাঁদের সমস্ত জীবন আদর্শকে কি করে রূপ দিয়েছিলেন। নব-জাগ্রত রাশিয়ার প্রাণই ছিলো সেদিন তাদের সেই সাহিত্য। আর আমাদের দেশেও কি তা একদিন হয়নি। সেতো বেশী দিনের কথা নয়। জাতীয় আন্দোলনকে, স্বাধীনতা আন্দোলনকে কি শক্তিই না দিয়েছিল সেদিনের সেই সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের—'বন্দেমাতরম্' থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন' এই জাতির জীবনে কি বৈদ্যুতিক শক্তিই না সঞ্চারিত করেছিল, যার ফলে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ আবার আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন সেই সাহিত্যের যে-সাহিত্য এই মৃত জাতির জীবনে এনে দেবে বিদ্যুত-প্রবাহ—তাকে জীবন মন্ত্রে দীক্ষা দেবে।

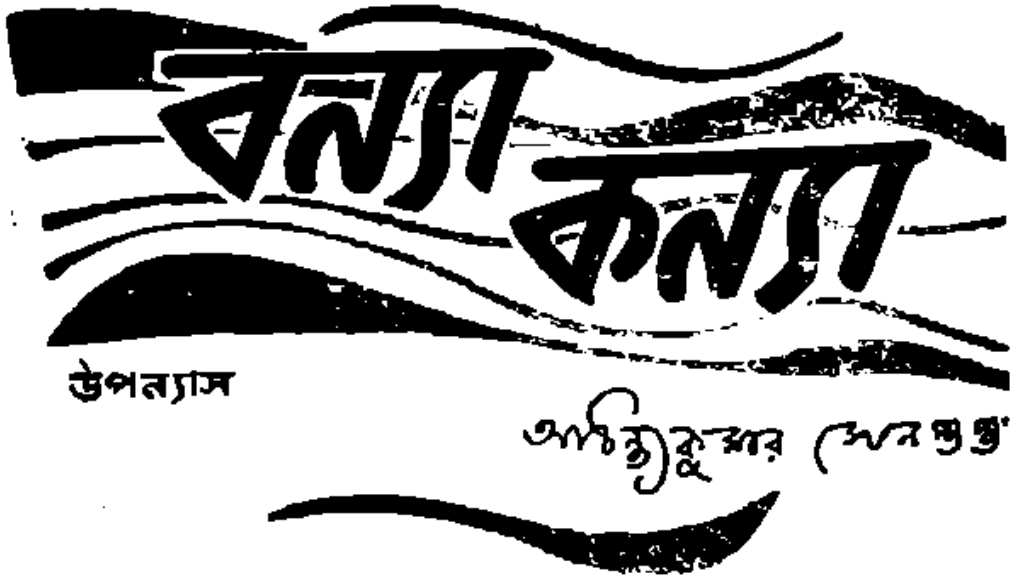

৬

বনছায়া কী করে জানবে কেউ তার জন্যে তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কি না, সে উল্টে আরেক জনের জন্যে বসে আছে।

'আমার একদম খেয়াল ছিল না যে উনি আফিসের পর আবার টিউশানি করতে যান।' বনছায়া কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়াল এক পাশে : 'আমি যদি পারি পরে না হয় আবার আসব।'

'না, না, বোসো।' সন্দীপের মা বনছায়াকে আটকাতে চাইল : 'এখুনিই এসে পড়বে।' সন্দীপের দিদি টিপ্পনী জুড়ল : 'পড়ানোতে ওর বিশেষ মন নেই।'

'মানে পড়ানো ওর ভালো লাগেনা।' মা একটু মোলায়েম করতে চাইলেন।

'ভালো লাগলে আরো দুটো টিউশানি নিতে পারত।' বললে দিদি, 'গরিব সংসারের আর বাড়ত।'

তারপর মা আর দিদিতে মিলে সন্দীপের বিরুদ্ধে নানারকম নালিশ তুললে। সপ্তাহে তিন দিন খালি টিউশানি করে, মোটে পঞ্চাশ টাকা পায়, আর বাকি তিন দিন করলে আরো না কোন পঞ্চাশ টাকা বাড়তি হয়। কিন্তু সেদিকে কোনো স্পৃহা নেই। সকালের দিকেই তো আরো একটা টিউশানি নিতে পারে ইচ্ছে করলে। কিন্তু ঘুম ভাঙতে-ভাঙতেই আটটা।

'আটটা?' দরকার নেই, তবু বনছায়া কথা কয়ে উঠল।

'কেউ যে আগিয়ে দেবার নেই।' দিদি বললে বিরক্ত মুখে, 'দরজা জানলা বন্ধ করে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই।'

'ঘুমের দোষ নেই।' মায়ের গলায় বুঝি একটু সহানুভূতির ছোঁয়া লাগল : 'শুতে শুতে রাত বারোটা একটা।'

'কোনো কোনো দিন তারও চেয়ে বেশি।'

এত রাত জেগে করে কী, জিজ্ঞেস করল না বনছায়া। মা আর দিদি আরেক রাতে নালিশটা নিয়ে গেলেন। কী হচ্ছে রাশ-রাশ ছাই পাঁশ লিখে? শুধু কাগজ আর কালির শ্রাদ্ধ।

তিন-চারটে কী উপন্যাস লিখেছে, কিছু বিক্রি হল না। কেবলই বলছে এ বারেরটা লাংঘাতিক হবে। আবার সেই তেতাল্লো। কিছুতেই কিছু হবার নয়। কলম দিয়ে চাষ করা চলে? যার হবে না তার কিছুতেই হবে না। অদৃষ্ট করে আসিসনি, পাথর-চাপা কপাল হয়েই থাকবে। শুধু পণ্ডশ্রম, পাথরে কোপ মারা।

দিদি আরো বিদুষী। তাও এমন শক্ত করে লেখে। ভাষা ভীষণ কটমট, কেবল যুক্তাক্ষর দিয়ে ভরা। সোজা স্টাইলে লিখবে, জলের মত তরতরে ভাষায়, একটিও শক্ত বানান থাকবে না, ব-কলা য-ফলা থাকবে না, তবেই তো লোকে বুঝবে, কিনবে। তা ছাড়া এমন কোনো ঘটনা থাকে না যা নিয়ে লোকে বলাবলি করবে, কিস ফাস করবে। একটা খুন খারাপি কিছু দে, নয়তো ঘুষ-টুষ, রোমহর্ষক কিছু ব্যাপার—তা নয়, কথায়-কথায় বর্ণনা, কথায়-কথায় তত্ত্বকথা—উপন্যাসের মধ্যে প্রবন্ধ লোকে পড়বে কেন? উপন্যাস যদি কাটাতে চাস হয়ে তেমনি করে লেখ, খুব করে কাম মনসা দে একটা কী হয় কী হয় ভাব রাখ জাগিয়ে—পাড়া শুদ্ধ লোক বই কিনে পড়বে। তা না হলে লোকের জন্যে তো লেখা হবে না, পোকার জন্যে লেখা হবে।

আর লিখেই যখন রোজগার করতে হবে সাহিত্য-লেখাই বা যাই কেন? কত কিছুই তো লেখা যায়, ইস্কুলের বই লেখা যায়, নোট লেখা যায়, অনুবাদ করা যায়—এমন কি হ্যাণ্ডবিলের বিজ্ঞাপন লেখা যায়। এই তো সেদিন একটা অনুবাদের ফরমায়েস এসেছিল, নিলে না। বললে, ওসব কাজ অন্য লোকের-সাহিত্যিকের নয়।

বইলে, বলো, সিনেমার সাধ্যি টাকাটা কেউ ফিরিয়ে দেয়? গল্প বলবার না বলবার তাতে তোর কী? তোর নাম, তোর বইয়ের তো একটা নাম হয়। আসল কথা, একটা মোটা টাকা তো ঘরে ওঠে। এমন হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে বলে শুনেছ? তারা ভালো জানে কিসে তাদের ফিল্ম চলবে, কই, তোর কথাকে বড় বলে মানতে তো তারা রাজি হল না। কাঁচকলা দেখিয়ে চলে গেল।

উঃ, বসে বসে এসব শুনতে হবে—বনছায়া মর্মে-মর্মে দগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। বাইরের সমালোচনা তো আছেই, তারপরে আবার ঘরের বিদ্রূপ। বাইরের নালিশ সন্দীপের গল্প জমাবার ক্ষমতা নেই আর ভিতরের নালিশ লেখাটাকে অর্থোপার্জনের উপযোগী করে তোলবার ক্ষমতা নেই। এহেন লোকের স্থান সাহিত্যেও নেই, সংসারেও নেই।

তবে কি সন্দীপ সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? তার অযোগ্যতাকে চাকরে দেকরা দিয়ে?

এর চেয়ে সন্দীপের বিরিবিলি পড়ার ঘরটিতে গিয়ে বসলে বোধহয় বনছায়া শান্তি পেত।

ঐ একটিই সন্দীপের ঘর—লেখা-পড়া, শোয়া-বসা—সমস্ত। সমস্ত ঘরটিতেই বুঝি একটি সুগন্ধ, আরক্তের সুগন্ধ। কিছুর সমাধা নয়, শুধু চেষ্টায়, শুধু সংকল্পের সুখ। পথের অন্তে কী আছে কে জানে, যা আছে দেখছি শুধু পথের প্রান্তে। লিখে কী হবে কী পাব তা ভাবি না, লিখতে যে পারছি, কলমের মুখে অক্ষরপাতের সঙ্গে-সঙ্গে যে অন্তরে মধুক্ষরণ হচ্ছে এই আনন্দই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

'সন্দীপ বাবুর ঘরটা একটু খুলে দিন না, ঐখানে গিয়ে বসি।' বনছায়া হাসল: 'ওর বই-টই একটু নাড়াচাড়া করি।'

'ওরে বাবাঃ, ওর ঘর তালা বন্ধ করে রেখে চলে যায়।' বোঝা গেল এতে দিদিরই বেশি

আপত্তি : 'আমাদের কাউকে ডুকতে দেয় না। আজেবাজে কত কাগজ-টাগজ আসে, একটু পড়তেও পাই না।'

'ঘরে তাই ক'টপাটও পড়ে না।' মা বললেন, যাই বিরুদ্ধে বলুন, বলার মধ্যে একটু বুঝি মমতার ছোঁয়া লেগে থাকে : 'বউ থাকলে না হয় একটু দেখত-শুনত।'

'বউ ? এর মধ্যে আবার বউ!' তরল পরিহাসের কণ্ঠে হেসে উঠল বনছায়া।

'কেন, বউ খারাপ কী!' দিদিই তেড়ে এল।

'খারাপ নয়, তবে—' কী ভাবে কথাটা বললে অশোভন হবে না একটু ভেবে বনছায়া ঠিক করে নিল : 'এমনি তো টিউশানি করতে হয়, মানে সংসারে টানাটানি আছে, তার উপরে যদি বউ আসে আর বউয়ের সঙ্গে—

একটু কি বেশি বলে ফেলল বনছায়া ? নচেৎ মায়ের মুখ এত গম্ভীর হল কেন ?

'আসুক না। বউ তো লক্ষ্মী। বউ এলেই তো সংসারের উপকার।'

'উপকার ?' বনছায়া প্রায় নির্বোধের মত তাকাল মুখের দিকে।

'বিয়ে করলে তো আর টাকা মেয়ে বিয়ে করবে না, চাকরে মেয়ে বিয়ে করবে আর দুজনের আয় একত্র হলে টানাটানি থাকবে না।' মা আরো বিশদ হলেন : 'ধরো সন্দীপ আশিসে দুশো টাকা পায়, টিউশানিতে পঞ্চাশ—মোট আড়াইশো, এদিক ওদিক আরো কিছু পায় কিনা জানিনা—তার উপর যদি কমপক্ষে একটি তেড়শো টাকা মাইনের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, তা হলে এত কষ্ট বোধহয় থাকে না—'

'আরো উপকার হয়।' দিদি আবার রুক্ষ হল : 'বউ এলে ওকে কড়া হাতে শাসন করতে পারে। অন্তত ওর হাত থেকে বাজে-খেয়াল কমানটা কেড়ে নিতে পারে।'

'কিন্তু বউয়ের যদি খেয়াল থাকে ?' বনছায়া চোখের কোণে হেসে উঠল।

'ধুর! মেয়েরা আবার লিখতে পারে নাকি ?' দিদি আরো কঠিন হল : 'তাদের সাহিত্য, ঘরোয়া ঝগড়া আর দুধের হিসেব আর ধোপার খাতা। শেষ পর্যন্ত টাকার বাজার বেরুতেই হবে। খালি পেটে সাহিত্য হয় না।'

'বউ এলে ওর রোজগার বাড়ত, দায়িত্ব বাড়ত।' কথাটা বলেই মা হঠাৎ বনছায়ার একখানি হাত চেপে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কত পাও, মা ?'

বনছায়া অপ্রস্তুত হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সন্দীপ তার বিষয় গল্প করেছে বাড়িতে। চাকরি করে এটুকু নিশ্চয়ই বলেছে, কিন্তু সেও যে লেখে, লিখতে চেষ্টা করে, সেটুকু বুঝি বলেনি।

এ বাড়িতে আসার তার সম্পর্ক নইলে কী, সন্দীপ কী ব্যাখ্যা দিয়েছে ?

মিষ্টি হেসে বনছায়া বললে, 'আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।'

'ছেড়ে দিচ্ছ ? সে কী ?'

'মা, আমার যে বিয়ে হচ্ছে।'

'বিয়ে হচ্ছে!' বনছায়ার ধরা হাত অজান্তে ছেড়ে দিলেন মা।

'খুব বড়লোকের সঙ্গে বুঝি ?' দিদি সুরটা একটু বাঁকা করল।

'শুনেছি দুহাজার নাকি মাইনে। বাড়ি-গাড়ি ফ্রিজ-ফোন সব আছে।' দিদি তরল-সরল

ঘরে বসলে বনছায়া, 'বড়ো বাড়ি চায় না আড়াই শো টাকার জন্যে বউ আপিসে চাকরি করুক।'

'আড়াই শো!' মা বুঝি মনে-মনে আরেক অঙ্ক করতে চাইলেন। ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে বললেন, 'ঠিকই তো, বড় ঘরে বর পেলে কে আর গরিবের দিকে তাকায়!'

কথা শেষ হতে না হতেই সন্দীপ এসে হাজির।

অপ্রত্যাশিত বনছায়াকে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। বললে 'তুমি এসেছ? যাই ইনস্পিরেশান! আজো তীব্র সুখের আছে।'

মা কঠস্বরে বললেন, 'হাঁ, ওর বিয়ে।'

'বিয়ে?' যেন বিশ্বাস করতে চাইল না এমনি ভাবে সন্দীপ বললে, 'বিয়ে তো একটা দুঃসংবাদ। কী বলো, তাই নয়?'

বনছায়া যেন কিছুই জানেনা এমনি নিরীহ মুখে হাসল।

'তা হলে সুখবরটা কী?' দিদিই খোঁচা দিল।

'সুখবর টিউশানিটা ছেড়ে দিয়েছি।'

যেন ঘরের মধ্যেকার হাওয়াটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মা আর দিদির মুখে কে যেন ছাই মাখিয়ে দিল।

'ছেড়ে দিয়েছি কেন জানো?' শুধু বনছায়ার মুখটাই ছাই হয়নি, তাই তার মুখের দিকে চেয়ে সন্দীপ বললে, 'আমার সেই নতুন উপন্যাসটা 'বিষাণ'-এর সম্পাদক নিয়েছে। আগামী সংখ্যা থেকে বেরুবে।'

'সত্যি?' বনছায়া একেবারে একটা মুকুলন্ত গাছের মত আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল।

এতে আনন্দিত হবার কী আছে মা-দিদি কিছুই ভেবে পেলেন না। মা তো মুখ ফুটে বলেও ফেললেন, 'তা'ই বলে টিউশানিটা কী দোষ করল?'

'সপ্তাহে পনেরো টাকা করে দেবে বলেছে। তার মানে মাসে ষাট টাকা। তা হলে টিউশানির পঞ্চাশ টাকায় আর কী দরকার!'

এ সব হিসেব বনছায়ার বর্তমানের মধ্যে নয়। সন্দীপের উপন্যাস যে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে এই তার বড় হিসেব।

কিন্তু সংসারের কাছে এ অঙ্ক মূল্য পেল না। মা বললেন, 'ষাট পেয়ে পঞ্চাশ ছাড়লি, ষোলো বছরটাকা লাভ হল। কিন্তু ষাটের উপরেও যদি পঞ্চাশ থাকত তা হলে একশো দশ টাকা লাভ হত। সংসারের কত সাশ্রয় হত!'

'দূর সাশ্রয়!' আলায় নয়, শুধু আনন্দিত ঔদাসীন্যে সন্দীপ বললে, 'যা গেছে আর আছে তার মধ্যে আছেই বেশি। আমার তিনটে সন্ধ্যা বাঁচল, একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে নিজে বাঁচলাম সেই আমার প্রকাণ্ড লাভ। আর আমি বাঁচলেই তো সংসার বাঁচবে।' শেষ কথাটা বলতে গিয়ে মার দিকে তাকাল সন্দীপ। তারপর বনছায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই তিনটি সন্ধ্যা পাওয়া মানেই আমার আরেকটা নতুন উপন্যাসের তিনটি অধ্যায় লিখে ফেলা। সময় কম, অক্ষমতা প্রচুর। আমার তো বিদ্যে নেই বুদ্ধি নেই লোকোত্তর প্রতিভা নেই, শুধু পরিশ্রম করার শক্তি আছে, ছাড় দেবার মত ধৈর্য আছে, তাই টিকে থেকে খেটে যাই প্রাণপণ। ঘুনকা লেগে তো মিলবে, না

মেলে তো না মিলবে। আরে, আমি যে বক্তৃতা দিতে সুরু করলাম—' নিজেকে হঠাৎ সংযত করল সন্দীপ, বনছায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এস ঘরে এস।'

কী সুন্দর করে বললে সন্দীপ, কী সুন্দর করে শুনলে বনছায়া, 'এস ঘরে এস।'

দরজা খুলে আলো জেলে জানলাগুলো খুলে দিয়ে ঘরকে তার বন্ধতার থেকে মুক্তি দিল সন্দীপ। যেন সংসার সহসা সাহিত্য হয়ে উঠল।

'বলো তোমার কথা বলো।' নিচেই ফরাসে বসল সন্দীপ।

'আপনি তো আমার ঘরে গেলেন না—'

'তার সময় তো এখনো যায়নি।'

'না, সময় বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। তাই আমিই চলে এসেছি।'

'বেশ করেছ। তুমিই তো আসবে। তুমিই তো আমার প্রেরণা। আচ্ছা, এর চেয়ে আর কোনো ভালো কথা আছে? হাঁ, আছে, তুমি আমার প্রত্যাদেশ। তুমি থাকো। কিছুক্ষণের জন্যে থাকো।'

'কিছুক্ষণের জন্যে?' বনছায়ার দুই চোখ অভিমানে ভরে উঠল: 'আমি যদি বলি, চিরকালের জন্যে থাকব।'

'চিরকালের জন্যে?' প্রগাঢ় বিস্ময়ে বনছায়ার চোখের মধ্যে অন্তরদৃষ্টির সবটুকু জ্যোতি তুলে ধরল সন্দীপ। বললে, 'বনছায়া, তা হলে তুমি আর বনছায়া থাকবে না, তুমি বন হয়ে যাবে। জানো, আমার উপন্যাসের নাম বনছায়া।'

বনছায়া হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। উত্তেজনার কাছে সরে এল। বললে, 'আপনি এখান থেকে চলুন, আর কোনো ঘরে আর কোনো পরিবেশে—আমি আপনার জন্যে আরো অনেক সন্ধ্যা বাঁচিয়ে রেখে। আপনি শুধু লিখবেন আর লিখবেন, আর আমি আপনার সেবা করব, আপনাকে জাগিয়ে রাখব।'

সন্দীপ নড়ল না, হাতের নাগালের মধ্যে এসে পড়লেও সান্ত্বনা দেবার মমতায়ও একটু স্পর্শ করল না বনছায়াকে, একবারও কোনো কথায় বা আচরণে বনছায়াকে অনুমতি দিল না 'তুমি' বলতে, তার 'আপনির' দূরত্বের দুর্গেই সে অব্যাহত রইল। শুধু বললে, 'না, তা হলে তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে। যদি আমাকে জাগিয়ে রাখতে চাও, তা হলে তুমি যেমন দূরে আছ তেমনি দূরেই থাকো।'

'তা হলে উঠি।' বনছায়া উঠে পড়ল।　　[ক্রমশঃ]

অন্তরীক্ষে

ভোটের খবর বেরুবার আগেই.....

নির্বাচনের পর খেদোক্তি।

হায়, শেষে কিনা আপনার হাতে আমার ভরাডুবি !!

নব জীবন লাভ
করুন
কংগ্রেস

বিয়ের দিন স্ত্রী-আচার !
বাসর ঘরে শয্যা তোলার সময় !

ঘেরাও ঃ এদেশে নূতন নয়।

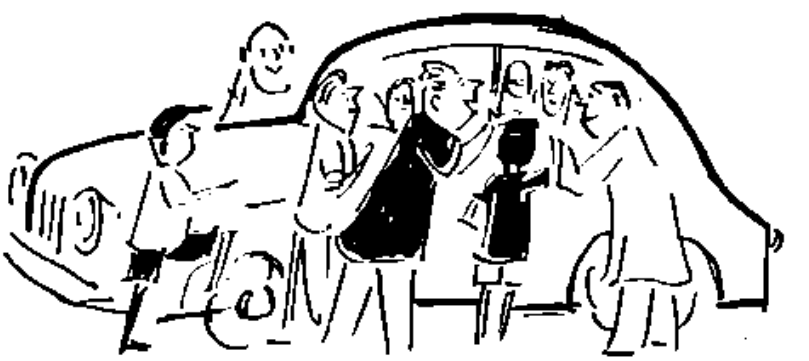

তারপর, রাজকন্যাকে নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে !

"ঘেরাও"

স্কুল, কলেজ, কারখানা, অফিস...

আজ—এর অশুভ ও অনিশ্চিত গতি কোথায় নয়?

এক অনন্য জ্ঞানতাপস

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যৌবনের আরম্ভেই দেশ ছাড়লেন তিনি। দেশের ইতিহাস সব পড়া হয়েছে। তাই আরো ঐতিহ্যের সন্ধানে ঘরছাড়া হলেন সুদূর হাঙ্গেরী দেশের এক তরুণ জ্ঞানভিক্ষু। নিজের দেশের ভাষার উৎপত্তি মধ্য-এশিয়ার কোন্ পুণ্যস্থানে নিহিত তা আবিষ্কার করতে হবে। হুন জাতির বংশ পরিচয়ও তাঁরও জানা চাই। তাঁর বিশ্বাস এই হুন জাতি থেকেই হাঙ্গেরীয়দের উদ্ভব।

অদ্ভুত জ্ঞান পিপাসা, বিচিত্র খেয়াল, সেই সঙ্গে দুস্তর সাধনা আর তেমনি কৃচ্ছ্র সাধনের অপরিসীম ক্ষমতা।

এই তীর্থ-পথিকের নাম আলেকজাণ্ডার কসোমা ডি কোরোস। জন্ম, হাঙ্গেরীর এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৭৮৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

শৈশবেই শুনেছিলেন সারা পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত আছে ভারতবর্ষে। মহা-মানবের সেই লীলাভূমির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন তরুণ বয়সেই।

কুসু উপত্যকায় এসে থামল তাঁর যাত্রা।

সেইখানে বসে তিনি এক মহাপণ্ডিত লামার কাছে তিব্বতী ভাষায় পাঠ নিলেন তিন বছর। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে এই : তিব্বতী শিক্ষার জন্য যে তিনশ কুড়ি খণ্ড গ্রন্থ আছে তা কোনো সংস্কৃতজ্ঞ ভারত সন্তানেরই রচনা।

কিন্তু দিনযাপনের জন্যে কিছু তো সংস্থান চাই। কিছু অর্থ। কিন্তু তা তো তাঁর নেই। অসহনীয় দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জ্ঞান-তপস্বীর দিন বুঝি ফুরিয়ে এল।

তদানীন্তন ভারত সরকার অপার দাক্ষিণ্যে তাঁর জন্যে মাসিক ভাতা মঞ্জুর করলেন—পঞ্চাশ টাকা !!! তাও বিনা সর্তে নয়। সর্ত হল : তিনি তাঁর তথ্যানুসন্ধানের যে ফল পাবেন তা তাঁকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে।

পঞ্চাশ টাকার মধ্যে পঁচিশ টাকা কসোমা দিতেন তাঁর শিক্ষাগুরুকে। বাকি পঁচিশ টাকায় চলত (চলত কি ?) তাঁর সারা মাসের গ্রাসাচ্ছাদন।

১৮৩২ সালের মে মাসে তিনি এলেন কলকাতায়।

এখানকার বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তাঁকে চিনলেন, গ্রহণ করলেন সাদরে। কসোমা একটি ভাল চাকরি পেলেন—এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিক।

মনের মত কাজ। চারিদিকে বই আর বই। আর কি চাই? সেই সঙ্গে আহারও জুটছে দুবেলা। অতএব এই তো স্বর্গ।

তিব্বতী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মনে প্রবল আকর্ষণ। তাই ১৮৩২ সালে কসোমা তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে তাঁর প্রথম কাজ হবে তিব্বতী শিক্ষা প্রণালীকে উন্নত করা। তারপর সেখান থেকে তিনি যাবেন মধ্য এশিয়ায়। সেখানে হুনদের আদি বাসস্থান খুঁজে বার করবেন। সেই সঙ্গে যদি পারেন তো উদ্ধার করবেন হুন জাতির লুপ্ত ঐতিহ্য—তাঁর পূর্বপুরুষদের অতীত গরিমা।

১৮৩৩ সালের ২৪শে মার্চ কসোমা দার্জিলিং পৌঁছলেন। সেখানকার তদানীন্তন পুলিশ অফিসার ডাক্তার ক্যাম্বেল লিখে গেছেন যে কসোমা অনেকগুলি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, যথা, হিব্রু, আরবী, সংস্কৃত, পুস্ত, গ্রীক, লাতিন, রুশ, জার্মান, ইংরেজী, তুর্কী, ফার্সী, ফরাসী, তিব্বতী, হিন্দী, মারাঠী এবং বাংলা।

ডাঃ ক্যাম্বেল যখন দার্জিলিং-এ কসোমার সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এই হাঙ্গেরীয় লামার কাছে রয়েছে চারটে বড় বড় কাঠের বাক্স, বই ঠাসা। ডাঃ ক্যাম্বেল জেনেছিলেন, যে সেইসব বইগুলির মধ্যে আছে একখানি করে প্রত্যেক ভাষার অভিধান।

কিন্তু তপস্বীর সাধনা সম্পূর্ণ হলনা। ভাগ্যদেবতার কি অকরুণ পরিহাস। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দু সপ্তাহ অজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকার পর ১৮৪২ সালের ১১ই এপ্রিল কসোমা লামা দার্জিলিং-এর মাটীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অনাত্মীয়, নির্বান্ধব, মৃত্যুকালে পাশে বসে দুফোঁটা চোখের জল ফেলার লোক ছিল না তাঁর।

একেবারে ছিলনা বলা ভুল হবে, ছিলেন ডাঃ ক্যাম্বেল। শোকে অভিভূত হয়ে ছিলেন তিনি। এই তরুণ বিদেশী পণ্ডিতটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন। খবর পাঠালেন এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে।

সোসাইটি ডাঃ ক্যাম্বেল-কে একশো টাকা পাঠিয়ে লিখলেন, সেই টাকা দিয়ে কসোমা লামার সমাধির উপর একটি স্মারক চিহ্ন তৈরী করা হোক।

ডাঃ ক্যাম্বেল তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। দার্জিলিং-এর এক প্রান্তে সেই স্মৃতি স্তম্ভটি আজো আছে। কিন্তু কে বা তাকে দেখে আর কেইবা সেই মানুষটির খোঁজ করে?

কসোমা লামা তাঁর কীর্তির শীর্ষে পৌঁছবার ঠিক আগের ধাপেই এ সংসার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন—অকীর্তিত, অজানিত, অপূজিত এবং অশ্রুত। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানী পণ্ডিতদের কাছে বিশেষ করে প্রাচ্য ভাষা বিশারদদের কাছে তিনি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

———

বোয়র্নসন

একটি শ্রদ্ধাস্বীকৃত নাম

(১৮৩২—১৯১০)

এষা মহাপাত্র

একশো তিরিশ বছর আগেকার নরওয়ের এক গ্রাম। সেখানকার জীবনযাত্রা পদ্ধতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ তখনো সভ্যযুগের আলোক পায়নি। বোয়র্নসনের বাবা ছিলেন সেই গ্রামের ধর্মযাজক। চাষী-প্রধান গাঁ, মধ্যযুগের তমসায় আবৃত। সেখানে ধর্ম-যাজকের বাস করা খুব নিরাপদ ছিল না। বোয়র্নসনের বাবা পিডর বোয়র্নসনের আগে তিনি সেখানে ধর্মযাজক ছিলেন তিনি তো ধর্মকথা বোঝাতে গিয়ে চাষীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে অবশেষে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। অনেকদিন পর্যন্ত সেই কুখ্যাত ডিখনি গ্রামে কোন যাজক ছিল না।

অবশেষে এলেন পিডর বোয়র্নসন। প্রকাণ্ড চেহারা, দেহে অমিত শক্তি, এবং প্রয়োজন হলেই সেই শক্তি প্রয়োগ করতেও কার্পণ্য নেই,—গ্রামের লোক বুঝলে, এবার বড় শক্ত পাল্লা! পিডর বোয়র্নসন টিকে গেলেন।

একদিনের একটা ঘটনা থেকেই পিডরের মাপটা বোঝা যাবে। কিশোর বোয়র্নসন তাঁদের বাড়ীর সামনে বরফ ঢাকা রাস্তার উপর খেলা করছেন আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনছেন, বাড়ির মধ্যে তাঁর বাবা থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছেন। কাঠের বাড়ি। দোতলা। দোতলার সিঁড়ি নীচে থেকে উপরে উঠে গেছে। হঠাৎ বোয়র্নসন শুনলেন, কাঠের সিঁড়িতে ধপাধপ শব্দ, তারপরেই দেখলেন, একটা লোক গড়াতে গড়াতে সেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে পড়ল এবং উঠে দাঁড়িয়ে গ্রামের ঘুমে। ঝাড়তে ঝাড়তে গলির বাঁকে অদৃশ্য হল।

এই ঘটনায় কিশোর বোয়র্নসন কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হলেন না। এ রকম ধারা ব্যাপার তাঁদের বাড়িতে আর পাড়ায় প্রায় নিত্যই ঘটে থাকে। বেশ্তারেও পিডর বোয়র্নসন ঘুষি চালাতে জানতেন এবং তা চালাতেনও প্রচুর। একজন উদ্ধত গ্রামবাসী ধর্ম সম্বন্ধে যা তা কথা বলে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এসেছিল, তার ফলে বাঁ চোখটা তার ফুলে উঠল এবং সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে তাকে নীচে নামতে হল। নরওয়ের ডিখনি গ্রামের যেমন ঘুনো গুণ, তেমনি ধারা উঁদুল।

পিডর বোয়র্নসনের চাষ-বাসের কাজ ছিল। অল্প বয়সেই ছেলেকে বললেন, লাঙল ধর।

ছেলের সন্ধ্যা তখন অস্ত আকাশে। "এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।" কিন্তু তা কি সম্ভব হবে কোনদিন? দেশের এই গাঢ় অন্ধকার ঘুচে সূর্য্য কি উঠবে কোনদিন কোন নূতন প্রভাতে?

• • •

চারিদিকে আবছা কুয়াশা, সূর্য্যের আলো ঝিমিত, ভুষারাবৃত পথঘাট, হু হু করছে মাঠ জল আর জঙ্গল। শিহনে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা। তাদেরই মাঝখানে ছিল বোর্ডসলনের মাঠকোঠা। আশেপাশের গ্রামবাসীরা যেমন নিরক্ষর তেমনি সভ্যতা বর্জ্জিত। এই আবেষ্টনের মাঝখানে কিশোর কবি বোর্ডসলনের অন্তরাত্মা গুমরে উঠতো থেকে থেকে। তাঁর মনের আকাশে নিত্য যেসব নূতন নূতন রঙের খেলা চলেছে তা কি পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হবে কোনদিন?

অপরাহ্ণ বেলায় মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন বোর্ডসলন। বৃদ্ধ চাষী দিনের কাজ শেষ করে তার কুটীরের দরজায় বসে আছে। বসতেন গিয়ে তার পাশে, বলতেন, দাদু গল্প বল। বৃদ্ধ চাষী সুদূরবাসী বালকের মুখের পানে চেয়ে অবাক কি ভাবতো, তারপর সত্যিই গল্প বলত। এই দেশে ছিল কত বীর, কত যোদ্ধা, কত শিল্পী, কত কবি! আজ তারা কোথায়? দেশের সেইসব প্রাচীন কীর্ত্তিমান মানুষের কাহিনী বলত বৃদ্ধ কৃষক, আর তন্ময় হয়ে শুনতেন বোর্ডসলন। প্রত্যেকটি কথা তাঁর মনে গাঁথা হোয়ে যেতো।

সমসাময়িক জীবনের গ্রাম্যচিত্র, কিংবদন্তী আর প্রাচীন উপাখ্যান,—উত্তরকালে কবি ও নাট্যকার বোর্ডসলনের লেখনী মুখে অপরূপ বর্ণচ্ছটা তারা আর কল্পনার মোহময় বিস্তৃতি নিয়ে ঘিরে রেখেছে। এগারো বছর বয়সে (জন্ম ৮ ডিসেম্বর ১৮০২) তাঁর লেখা কবিতা তাঁদের ইস্কুলের পত্রিকায় ছাপা হয়। সেই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখাই ছিল তাঁর রচনা, কখনো, অন্য নামে, ছদ্ম নামে।

• • •

বাপ দেখলেন, এ ছেলের হাতে লাঙল মানাবে না। সতেরো বছর বয়সে বোর্ডসলন ক্রিশ্চিয়ানিয়ায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার আগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে যে স্কুলে গিয়ে তিনি বসলেন, সেখানে নানা বয়সের ও নানা অবস্থার বিভিন্ন আবহাওয়ার ছাত্রদের বিচিত্র সমাবেশ। ত্রিশ বছরের চাপ দাড়িওয়ালা যুবকের পাশে বসেছে ষোল বছরের কিশোর। ধনী ও বিলাসী বাবু ছাত্রের পাশে বসেছে ছিন্নবাস গরীব চাষীর ছেলে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর সহসা তিনি এক অসমসাহসিক কাজ করলেন, পা বাড়ালেন দুর্গম পথে, সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করলেন। সেই সঙ্গে থিয়েটারে ঢুকে নাটক লেখবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন।

নাট্যসমালোচকরূপে যা উপার্জ্জন করতে লাগলেন, দুবেলা ভাল খাবার জোগাড় করবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়। ছোট মেটে বাড়িতে বাস, অতি সামান্য ধরণের আহার, কিন্তু মাথার মধ্যে দুর্পূর্ণ চিন্তার আনাগোনা। জাতির ও দেশের ঘটনাবহুল ইতিহাস তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, দেশের মাটির রং ধরেছে তাঁর মনের আকাশে, স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির কীর্ত্তি কাহিনী তাঁর লেখনী মুখে প্রকাশের ভাষা খুঁজছে।

কিছুদিন পরে ক্রিশ্চিয়ানিয়ার এক সংবাদ পত্রের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে তিনি সুইডেনে গেলেন। সেখানে প্রকৃতির শোভা তাঁকে মুগ্ধ আচ্ছন্ন করল। লিখলেন—"এখানে চারিদিকে সৌন্দর্য্য, সুখ আর বিরাটত্ব। কোলের কাছে সোনা সোনা ফুল পড়ে আছে, চোখের সামনে বিস্তৃত বিস্তীর্ণ রূপের আভাস, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, আমার কবিত্বশক্তিকে তুমি উদ্বোধিত কর।"

লিখতে লাগলেন অবিরাম। ছোট ছোট সৌরাণিক উপাখ্যান, লোকগাথা, পল্লীচিত্র। পুরাণো ইতিবৃত্তের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন নূতন প্রাণশক্তি। জাতির লুপ্ত ইতিহাসকে নূতন রসে সঞ্জীবিত করলেন।

অতিসূক্ষ্ম সরল ভাষায় লেখা তাঁর কাহিনীগুলি আপামর সাধারণ নরনারী নির্বিশেষে সকলের কাছে সমাদর লাভ করল। হাজারতম চাষী সন্ধ্যার পর মৃদু আলোর নীচে ব'সে দেশের পুরাতন গল্পকথাগুলি নূতনভাবে নূতনতর ভঙ্গীতে যেন আবার নূতন করে শুনলো তাঁর বই পড়ে, বিত্তশালী ও বিদগ্ধজন সমাজ সাহিত্যে এক নূতন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব দেখে পুলকিত বিস্ময়ে চঞ্চল হল। তাঁর রচনায় বাল্যকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার রং মিশে এক অপার্থিব আনন্দলোকের সৃষ্টি হয়েছে যেন, দেশের মাটি, দেশের চাষী আর দেশের আকাশ যেন ধরা দিয়েছে তাঁর রচনায়—সোঁদাগন্ধ, তাজা প্রাণের পরিচয় আর অনির্বচনীয় বর্ণসমারোহ নিয়ে। তাঁর রচনায় যেন অপার আনন্দ আর অফুরন্ত আশার আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে—এমন লেখক যে সহজেই দেশের চিত্ত জয় করবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

১৮৬৭ সালে বেরুলো তাঁর প্রথম বড় গল্প 'সিনোভ সোলবাকেন'। এক দুর্মদ-প্রকৃতি কৃষক কেমন করে একটি সরলা গ্রাম্য তরুণীর প্রেমপ্রার উজ্জীবিত হয়ে অধর্ম থেকে ধর্মের পথে ফিরে এলো, 'সিনোভ সোলবাকেন' সেই ফিরে আসার কাহিনী।

তারপর তাঁর আর তিনখানি বই প্রকাশিত হল, 'আখ', 'সুখী বালক' ও 'ধীবর কন্যা'।

ইতিমধ্যে বোয়র্নসন বার্গেন শহরের একটি ছোট থিয়েটারের কর্মকর্তারূপে তাঁর বহুদিনের সাধ রঙ্গালয়-পরিচালনাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন। ১৮৫৮ সালে এই থিয়েটারেই ক্যারোলাইন রীমার্স নামে একটি সুশ্রী অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং সেই বছরই উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছিল স্নেহ, ছিল বিশ্বাস, ছিল শ্রদ্ধা। উভয়ের দাম্পত্য জীবন তাই ছিল এক অবিচ্ছিন্ন সুখের কাহিনী। স্বামীকে আনন্দ দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্মের সহায়, লেখার নকল করা, প্রকাশিত লেখাগুলির ফাইল সংগ্রহ ক'রে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এবং চিঠিপত্র লেখা—এই সমস্ত কাজের ভার ও দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্যারোলাইন। বোয়র্নসন প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন, ক্যারোলাইন ভিন্ন তিনি অচল।

লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসতো, মনের মধ্যে অকারণে তিক্ততার সৃষ্টি হত, তখন মুহূর্তে ক্যারোলাইন স্বামীর মনের অবস্থাটি বুঝে নিতে পারতেন। হাসি-গল্প আর লাস্যলীলায় তাঁকে নিত্য নূতন আনন্দ পরিবেশন ক'রে আবার তাঁকে লেখার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

কিছুকাল পরে ক্রিশ্চিয়ানিয়ার একটি রঙ্গালয়ের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়ে পরপর অনেকগুলি নাটক রচনা করলেন ঘোষনদন। কিন্তু দু'খানি ভিন্ন কোন নাটকই তেমন জমলনা। হতাশ হয়ে দেশ ভ্রমণে বেরুলেন এবং কিছুদিন জার্মানিতে গিয়ে কাটালেন। সেখানে শান্ত মনে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আবার লিখতে লাগলেন। যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল প্রথম জীবনে, তার পূর্ণতর বিকাশ ঘটতে লাগল। জার্মানিতে ব'সে লিখলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বেদমূলক নাটক—'পিয়ার্ড গেয়ন্ট'। সেই সঙ্গে বহু গল্প ও কবিতা।

* * *

দেশে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর নাম সবার মুখে। তাঁর গল্প এবং নাটক পড়েনি এমন লোক ছিল বিরল।

দেশবাসীর চিত্তে তিনি যে কতখানি শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন ইতিমধ্যে, সে খবর তিনি নিজেও জানতেন না। একদিন এক পরম বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। নিজের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন একদিন সকালে, সামনে রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে এক বিশাল সৈন্য শ্রেণী। তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সৈন্যাধ্যক্ষ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন তাঁকে। চিনতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সৈন্যাধক্ষ টুপী উঠিয়ে অভিবাদন জানালেন দেশের কবি ও নাট্যকারকে। তারপর সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। যেমন করে 'গার্ড অফ অনার' দেওয়া হয় তেমনি ক'রে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত আবেগে সেই প্রকাণ্ড সৈন্যবাহিনী তাঁকে স্যালুট করতে করতে চলে গেল। তারা যে সবাই পড়েছে তাঁর গল্প তারা যে সবাই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে তাঁকে।

শুধু অভিভূত ঘোষনদন মাথা হেলিয়ে প্রত্যভিবাদন জানাতে লাগলেন। জীবনের সেই দিনটিকে সবচেয়ে পুণ্যদিন বলে গণ্য করেছিলেন তিনি।

* * * * *

ইউরোপের জনজীবন দেখিয়া স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, শিক্ষাবলেই আত্মপ্রত্যয় শিক্ষাবলেই উন্নতি। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশে শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিতে অধিকাংশ লোকই আসিবে না। সেই কারণেই তিনি একদল শিক্ষাব্রতী যুবক যুবতী চাহিয়াছিলেন যাহারা গ্রামে গ্রামে, হাটেবাজারে, কৃষকের কুটিরে, শ্রমিকের বস্তিতে গিয়া লৌকিক জ্ঞান প্রচার করিবে। তাহা হইলেই জাতিগঠনের প্রাথমিক বনিয়াদ প্রস্তুত হইবে। বিবেকানন্দ এসকল বিষয় শুধু চিন্তা করেন নাই, এমন পরিকল্পনা তিনি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য কর্মবীরের প্রতীক্ষা করিতেছে। এইসব বিষয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয়সরকার সেইসব পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে জাতির মহাকল্যাণ হইত।

আকাশ, সমুদ্র, অরণ্য

(ছোটগল্প)

সমর বসু

সোমনাথকে সাতদিনের সময় দিয়েছে মণিদীপা। সাতদিন ধরে সোমনাথ ভাববে। ভেবে ভেবে স্থির করবে মণিদীপাকে সে বিয়ে করতে পারে কিনা। শুধু সোমনাথই ভাববে না ; মণিদীপাকেও ভাবতে হবে। কোনও একটি বিশেষ পুরুষের সঙ্গে বাঁধা পড়ে সুখী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা! মণিদীপা জানে,—একটি বিশেষ পুরুষকে খুশী করতে গেলে নিজেকে অনেকখানি খেলো করতে হয়। অনেক পুরুষকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আনন্দ দেওয়া অনেক সহজ ; কিন্তু যে কোনও একটি পুরুষের সহধর্মিনী হলেই সেই বিশেষ পুরুষটির খেয়াল খুশী অনুযায়ী তাকে চলতে হবে। যে কাজ সে আদৌ অপছন্দ করেনা, সেই কাজই তাকে করতে হবে, কিংবা যেটা ভাল লাগে সেটা সে করতে পারবে না। পরের রুচি, কিংবা খেয়াল অনুযায়ী নিজের স্বভাবকে বদলে ফেলার মানেই নিজেকে খেলো করা।

মণিদীপার ধারণা,—ধারণা নয় বিশ্বাস,—যে, সব পুরুষই চায় যে তার স্ত্রী একনিষ্ঠ হোক। এবং সেই এক ও অদ্বিতীয় পুরুষটি হোলেন তিনি স্বয়ং। অর্থাৎ স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সান্নিধ্য লাভ যে কোনও স্ত্রীর পক্ষেই গুরুতর অপরাধ। এবং আইনের চোখেও সে অপরাধ দণ্ডনীয়।

মণিদীপা তাই বিয়ে করতে চায়না।

দেহের দিক থেকে মণিদীপা শুদ্ধ নয়। কুমারীত্ব সে বহুদিন আগেই হারিয়েছে। এবং ঐ জিনিসটা এমনই বস্তু যে একবার হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না। মণিদীপা তাই সচেতন মনেই একটু একটু ক'রে নিজেকে নষ্ট করেছে।

মণিদীপার যারা সখী হ'য়েছিল, তারা কেউই ওর দেহের মালিক ছিল না ব'লে কারোর বিরুদ্ধে কারোর কোনও অভিযোগ ছিলনা। মণিদীপাকেও তাই যার যার ছুটতে হয়নি আইনের দরজায়।

যে সব ছেলেরা ওর যৌবনের সখী ছিল, তারা আজ সবাই ঘর-সংসার করছে। সমাজে মাতব্বর হ'য়েছে।

আর আজ যারা আসে মণিদীপার পাশে, তারাও কেউ বাউন্ডুলে বেনারেমিয়ান নয়। মণিদীপার মনে আছে, অন্যত্র বিয়ে করবার আগে যেসব ছেলেরা ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার সংখ্যা কম ছিল না। এমন কি যার বউ আছে এমন অনেক পুরুষও তাকে বলেছিল,—তোমাকে পেলে ওকে আমি ডিভোর্স করতে পারি।

কিন্তু অনেকদিন হল মণিদীপাকে আর ঐ ধরণের কথা শুনতে হয়নি। অর্থাৎ বর্তমানে যারা ওর তাবৎ কিংবা পূজারী, তার কেউই ওকে আর বিয়ে করতে চায়না।

মণিদীপা ভেবেছিল সোমনাথও ওদেরই দলের। তাই চৌত্রিশ বছর বয়সে সোমনাথের মুখে সেই ধরণের কথা, ভাঙলা লাগা, পুরোণ স্যাঁতসেঁতে কথার পুনরাবৃত্তি যখন শুনলো, তখন মনে মনে চমকে উঠলো মণিদীপা। হাসবার চেষ্টা করেও হাসতে পারলনা। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল,—বহুদিনের অব্যবহারে অতিজীর্ণ হয়ে যাওয়া কথাগুলো তোমার মুখে কিন্তু তারি নতুন বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কথাগুলো যেন কত মূল্যবান। কত নরম, কত delicate—'পরশ মাণিক সম এত সুকুমার।'

পনেরো বছর ধ'রে বিভিন্ন পুরুষের মুখে ঐ একই কথা শুনে শুনে মণিদীপার শুধু মন নয়, কান দুটো পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছল। মণিদীপা ভাবতেই পারেনি, এতদিন পরে তার চেয়ে বয়সে ছোট এমন একটি পুরুষের কাছ থেকে তাকে ঐ একই কথা আবার শুনতে হবে।

তাই যখন শুনলো, তখন তার মনে হ'ল—এতদিনের ধ্যান ধারণার ভিত্তিমূল বুঝি ন'ড়ে উঠল। তবুও সোমনাথকে ভাববার সময় ছিল মণিদীপা। নিজেও বোধহয় সেই সুযোগে নিজের জীবনটাকে নতুন করে দেখতে চাইল।.....

উনিশ বছর বয়সে কলেজ বন্ধু পারিজাতের সঙ্গে মণিদীপা পালিয়ে গিয়েছিল বেনারসে। সেখানে ওদের বিয়ে হয়েছিল।

প্রায় দিন দশেক একসঙ্গে থাকবার পর ওরা ধরা পড়ল। সেই সময় মণিদীপার মনে হয়েছিল অর্থহীন আবেগের বশে পারিজাতের সঙ্গে বেরিয়ে আসা তার অনুচিত হয়েছে। দশদিনের মধ্যেই মণিদীপা বুঝতে পেরেছিল,—শুধুমাত্র দেহের প্রয়োজনেই পারিজাত ওকে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছিল। অথচ মণিদীপা এতদিন ধরে এই পারিজাতকেই ভালবেসে এসেছে। ওর সহজ সুন্দর স্বাধীনতাবোধকে, ওর শুচিশুভ্র রুচিশীল মনকে কত ভালবাসত মণিদীপা।

পারিজাতের পশুটাকে তৃপ্ত করতে করতে মণিদীপার বার বার মনে হ'য়েছিল, একদিন না একদিন খুব স্বাভাবিক কারণেই পারিজাত তাকে আর সহ্য করতে পারবে না। লালসা যার যত বেশি তীব্র ক্লান্তিও তার ততবেশি দুঃসহ। তাই ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল মণিদীপা। যে কাজগুলো ওর সম্পূর্ণ ইচ্ছানুসারে এবং সম্মতি সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে,—সেই সব অপরাধমূলক, নীতি বিগর্হিত কর্মানুষ্ঠানের জন্যে পারিজাতই শুধু শাস্তি পেয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনও চেষ্টাই সে করেনি। মণিদীপার অদ্ভুত আচরণের জন্যে হয়তো সে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে মণিদীপা এতটুকু বিচলিত হয়নি।

বাবার বন্ধু অ্যাডভোকেট সরজিৎ চৌধুরী যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন,—ঠিক সেই

সেই কথাগুলো এমন সাবলীলভাবে আবৃত্তি করেছিল মণিদীপা যে, আদালতের মোটা মোটা খামগুলো পর্যন্ত ঘৃণায় ছিঃ ছিঃ করে উঠেছিল।

পারিজাতের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে মণিদীপার পাতলা বঙ্কিম ঠোঁট দুটো একবারও কাঁপেনি। তালু শুকিয়ে যায়নি। সর্ব অবয়বে উত্তেজনার লেশমাত্র ছিল না। ধীরে ধীরে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে একটি একটি ক'রে পারিজাতের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগ গুলো বিচারকের সামনে উপস্থাপিত ক'রে—মণিদীপা যখন পারিজাতের দিকে ফিরে চাইল, তখন ওর চোখ মুখ থেকে ঠিক আনন্দ ঝরে না পড়লেও, একটি কঠোর কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পেরেছে বলে, নিজেকে খুব পবিত্র ব'লে মনে হ'য়েছিল। মনে হ'য়েছিল, মণিদীপা ছাড়া অন্য যে-কোনও মেয়ে এমন কঠিন কাজ এত সহজে সুসম্পন্ন করতে পারতো না। সেই কারণেই,—মণিদীপা হয়তো মনে মনে খুশী হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এসে, সেই খুশী খুশী ভাবটা নিয়ে কিন্তু বেশিদিন কাটাতে পারেনি মণিদীপা।

মণিদীপার মা ছিল না। বাবা তাই সর্ববিষয়েই নির্বিকার। স্ত্রীকে হারাবার জন্যেই হোক, কিংবা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক মণিদীপার বাবা বেশির ভাগ সময়েই অপ্রকৃতিস্থ থাকতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে, আগের মণিদীপা আর পরের মণিদীপার মধ্যে যে একটা অনেকটা-সন্তর ব্যবধান গ'ড়ে উঠেছে, তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য বাবার জন্যে তেমন কোনও ভাবনা ছিল না। ভাবনা,—দাদা-বৌদিদের জন্যে, দিদি-জামাইবাবুদের জন্যেও।

দাদার শ্বশুর মণিদীপার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। দাদার প্রেস্টিজ ক্ষুণ্ণ। তাই তাঁরা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে চেয়েছিলেন।

আর দিদি তো স্পষ্টই ব'লে দিয়েছিল,—ঐ কালামুখী যদ্দিন বাড়ি থাকবে, ততদিন ওরা ও-মুখো হবে না। পাড়া-পড়শিদের মধ্যে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটুকু কুটুম্বিতার পর্যায়ে উঠে বিশেষ নিবিড় হ'য়েছিল, তারাও মণিদীপাকে সহ্য করতে পারেনি।

সহানুভূতির সুরে অনেক সদুপদেশ তারা দিয়ে গিয়েছিল। বাবাকে বলেছিল,—বিয়ে যখন হ'য়েই গিয়েছিল, তখন মেনে নিলেই হ'তো। এখন ঐ মেয়ে নিয়ে করবে কি! লোক জানাজানি হয়ে গেছে, এরপর বিয়ে দেবে কি ক'রে!

সকলকার অভিযোগই খুব গভীর ভাবে ভেবে দেখেছিল মণিদীপা। অনেক ভেবে ভবেই সে স্থির ক'রে ছিল এইভাবেই যদি চিরকাল কাটিয়ে দেয়, তা'হলে কারোর আর কিছু বলার থাকেনা।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই মণিদীপা বাবার কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে বলেছিল,—এ-ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তোমাদের সংসারে আমার আর থাকা চলবে না। তুমি বরং আমাকে হোষ্টেলে পাঠিয়ে দাও।

বাবা হঠাৎ কোনও জবাব দেননি। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন,—সেই বরং ভাল। হোষ্টেলে গিয়ে থাক। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। তারপর যদি দরকার মনে করিস, একটা চাকরি জোগাড় ক'রে নিয়ে স্বাধীন ভাবে থাকবি। আমার অবর্তমানেও তোর কোনও অসুবিধে হ'বে না।

কিছুদিন পরে ভালভাবেই এম. এ. পাশ ক'রেছিল মণিদীপা। তারপর অ্যাড্‌ভোকেট-

অরবিন্দ চৌধুরীর চেষ্টায় একটা চাকরিও পেয়ে গেল। সুতরাং স্বাধীনভাবে ওর একলা থাকাকে কেউ আর নিন্দা করতে পারল না। আপত্তি করতেও সাহস করল না।

আজ অনেকদিন পরে সে-সব কথা ভাবতে ভাবতে মণিদীপার বার বার শুধু মনে হচ্ছে,—সে সোমনাথের যোগ্য নয়। যদিও সে এম. এ. পাশ ক'রেছে, এবং সোমনাথের চেয়ে অনেক বেশি মাইনে সে পায়। অথচ সে যে কোনওদিন কারোর অযোগ্য হ'তে পারে, এই ধরণের হীনমন্যতা এর আগে তাকে কোনওদিনই আক্রান্ত করেনি।

পারিজাতের মত আরও অনেক ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হ'য়েছিল,—কলেজ জীবনে, চাকরি জীবনেও।

য়ুনিভার্সিটিতে মাদ্রাজী বন্ধু একদিন বলেছিল—তোমার জীবনের লক্ষ্য কি জানতে পারি। অবশ্য প্রশ্নটা নিতান্তই ব্যক্তিগত—কিছু যদি মনে না ক'রো!

ওর হাতটাকে কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে মণিদীপা ব'লেছিল, অনক্ষ্যপানে যেয়ে চলা।

মাদ্রাজী বলেছিল,—এখন একথা অনেককেই বলতে শোনা যায়। কিন্তু কার্যকালে দেখা যাবে, যে আজকের এই চপল হরিণীর মত বহু চিত্তহারিণী মেয়েটি একদিন ঈষৎ ঘোমটা টেনে, একটি ফুটফুটে শিশুকে কোলে ক'রে সন্ধ্যেবেলায় গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে। আর বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তনের আশায়।

—ঘাঃ! বেশ কাব্য ক'রতে পার তো তুমি!—ঠোঁট বেঁকিয়ে মণিদীপা বলেছিল,—কিন্তু সে গৃহস্বামীটি কে!

ছেলেটি বুঝতে পেরেছিল ইঙ্গিতটা। তবুও সাহস ক'রে বলতে পারেনি,—আমিও হ'তে পারি।

মণিদীপার খুব কাছাকাছি যারা আসতো, তারাও ওকে ভয় করতো। মণিদীপাকে কেউ ওরা বুঝতে পারতো না। ওদের ঐ ভয় ভয় ভাবটাকে উপভোগ করতো মণিদীপা। মনে হ'ত ওরা যেন ওর খেলার পুতুল।

অতবড় হোমরা-চোমরা সাহেবী অফিসার, মাথায় মস্ত বড় পাগড়ী, আর দিয়ে বাঁধা ঘন কালো একরাশ দাড়ি। যার সঙ্গে কথা কইতে গেলে বড়বাবুদেরও গলা কাঠ হ'য়ে যেত,—তাকেও যেন কত ছেলেমানুষ বলে মনে হ'ত মণিদীপার।

সেই অফিসারও একদিন নিজের গাড়িতে মণিদীপাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল,—তুমি শুধু নিজেকেই নষ্ট ক'রছ না মিস্ মৈত্র! একটা সুন্দর সুখী পরিবারের সম্ভাবনাকেও নষ্ট করছ। এর জন্যে একদিন তোমাকে আফশোষ করতেই হবে।

মণিদীপা আরও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে আবদারের সুরে জড়ানো গলায় বলেছিল,—কোনও এক অবাস্তব দিনের কথা ভেবে আজকের এই আনন্দ মুখর মুহূর্তগুলোকে তুমি যে নিজে নষ্ট ক'রছ, সে খেয়াল আছে? এতোদিন ধরে আমার সঙ্গে মিশেও কি তুমি বুঝতে পারনি যে, আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। আমাকে ঘরে রাখতে পারে এমন ঘর কি তোমাদের আছে?

পাঞ্জাবী বলেছিল,—Still I should say get married.

মণিদীপা চোখ বুজেই জিজ্ঞেস ক'রেছিল,—But whom do I marry.

পাঞ্জাবী অফিসের চুপ ক'রে রইল।

ওর টাইটা ধ'রে খেলা করতে লাগল মণিদীপা।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ পাঞ্জাবী বলে উঠল,—'Am yet a bechelor.

মণিদীপা তার উত্তরে শুধু হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতে লুটিয়ে প'ড়েছিল পাঞ্জাবীর কোলে।

সতেরো বছর ধরে অনেক রকম পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে মণিদীপা শুধু পুরুষদের অশ্রদ্ধা করতে শিখেছে। মণিদীপা দেখেছে—অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে, আড়ালে যারা ওর নিন্দায় পঞ্চমুখ, তারাই আবার সাক্ষাতে ওর দৃষ্টি প্রসাদ পাবার জন্যে দুর্লক্ষিত ভাবে লালায়িত। মণিদীপা জানে,—তাদের অনেকের ঘরেই বউ-ছেলে আছে,—সেই বউদের প্রতি এইসব পুরুষদের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা মণিদীপাকে পুরুষবিদ্বেষী ক'রে তুলেছে।

প্রথম জীবনেই একটা তীব্র আঘাত পেয়েছিল মণিদীপা। আর সেই আঘাতেই জীবনের মূল্যবোধগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হ'য়ে গিয়েছে। ওর ঐ দেহের খোলসটাকে ফেলে পুরোণ মণিদীপা সেইদিনই পালিয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহটাকে আশ্রয় ক'রে জেগে উঠেছে এক বিচিত্র নারী। স্বভাবে সে বৈরিণী। নারীদের প্রতি তার বিজাতীয় অশ্রদ্ধা, পুরুষদের প্রতি দুর্বিসহ বিদ্বেষ। মণিদীপার এ এক নতুন জন্ম।

অ্যাড্‌ভোকেট অরবিৎ চৌধুরীর চেষ্টাতেই অফিসের কাজটা পেয়ে গেছল মণিদীপা। কিন্তু পরে যেদিন জানতে পারল,—অরবিতের অনুরোধ নয়,—নিজের অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনও নয়, শুধু ওর সুন্দর দেহটাই অফিসারদের বেশি খুশী ক'রেছিল, মণিদীপা বুঝতে পেরেছিল,—ওদের কাছে তার এই দেহটা বহুখানি মূল্যবান, ওর নিজের কাছে সেটা ঠিক ততখানি মূল্যহীন।

ওর ঘন কালো ডাগর ডাগর চোখের দিকে চেয়ে সুস্থ সহজ মানুষকে বিকারগ্রস্ত হ'তে দেখে, নিজের প্রতি মণিদীপার আর এতটুকু শ্রদ্ধা অবশিষ্ট রইল না। এতটুকু মমতা।

এরপর থেকেই মণিদীপা ব্যক্তিচার শব্দটার একটা ভিন্ন অর্থ আবিষ্কার ক'রেছিল। পরাধরকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে যিনি সমাজকে, তথা আমাদের জাতীয় জীবনকে চরম অধঃপতন থেকে রক্ষা করার কর্তব্য সম্বন্ধে আদালত কক্ষে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন,—পিতৃবন্ধু অ্যাড্‌ভোকেট সেই অরবিৎ চৌধুরীও একদিন মণিদীপার শিয়রে ঘুরেছিল। দুবারই সেই প্রস্তাবও ক'রেছিল। মণিদীপা তীব্রতর ভাষায় নিন্দা ক'রে বলেছিল,—কা'কে কি বলছেন আপনি।

অরবিৎ কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয়নি। কাঁচাপাকা গোঁফের আড়াল থেকে উঁচু-উঁচু কয়েকটা দাঁত বেরিয়ে এসেছিল। হাসতে হাসতে ব'লেছিল,—তাতে কি হয়েছে। আইনে ধরা না পড়লেই হ'ল।

আইনের বাধা তো বাইরের বাধা,—তার শক্তি কতটুকু। এমন এইসব কথা খুব সহজেই

ভাবতে পারছে মণিদীপা। কিন্তু তখন পারেনি। আইনকে ফাঁকি দিতে পারলেই ব্যভিচার আর ব্যভিচার থাকে না। তখন দেশের হাকিম-মোক্তার, উকিল-ডাক্তার, মন্ত্রী-প্রেফেসর, সবাই চরিত্রবান। দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ কোথায়।

অথচ ব্যাপারটা যদি ভেতরের দিক থেকে আসতো! তাহলে আইনের কথাই মনে পড়তো না।—'কোড' বই প'ড়ে আর যাই হোক নীতি বোধ জাগানো যায় না।

আদালত না জানলেও মণিদীপা নিজে জানে যে, সে ব্রষ্টা। কিন্তু মনটা তার তখনও নির্মল। এখনও তাই সে বেঁচে আছে।

মেহের লাবণ্যে যে-টুকু গ্লানি, চোখের নিচে যে-ক্লেদের ছায়া,—সে-সবই বয়সের জন্যে, অত্যাচারের জন্যে নয়। অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে মণিদীপার মনে কোনও ক্ষোভ নেই, কোনও অনুশোচনা নেই, এবং সেই সঙ্গে শান্তিও নেই, সুখও নেই।

তবুও মণিদীপা বেঁচে আছে। আর পাঁচজনের থেকে তাই সে পৃথক, সে বিশিষ্ট।

মণিদীপার এই অমর্তা অস্তিত্বটুকুই সোমনাথকে আকর্ষণ ক'রেছে। ঐটুকু আছে ব'লেই মণিদীপা, আজও বরণীয়া। শুধু সোমনাথের কাছে নয়; যে কোনও পুরুষের কাছেই।

দিল্লী অফিস থেকে সবে বদলী হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছে সোমনাথ। মণিদীপার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী সে শুনেছে। কিন্তু বিশ্বাস করেনি কিছুই।

সুন্দরী মেয়েদের,—বিশেষ ক'রে যারা বাইরে মেয়েরা পয়সা রোজগার করতে, তাদের নামটা খারাপ হ'তে বেশি সময় লাগে না। নাগালের বাইরে যারা থাকে, তাদের একটু নিচে নামাতে না পারলে মনের যেন স্বস্তি নেই।···সাহারার মত ধূ ধূ সীঁথি অথচ আনন্দে ডগমগ্ শরীর। যে বুকে দীর্ঘশ্বাস জমে জমে বরফ হ'য়ে যাবার কথা, সেখানে বর্ষার কলকলানি।—খারাপ না হ'লে কি ক'রে তা সম্ভব হ'তে পারে! সুতরাং-ভাবতে যারা কি—যে, ওরা কেউ ভাল নয়।···বয়স হ'লেই মেয়েদের বিয়ে হ'য়ে যাওয়া উচিত, তা' না হ'লে দেহে মনে তারা কেউই সুস্থ থাকতে পারে না; দেহ ক্রমশ নীর্ব হ'বে, মন ভেঙে পড়বে! কিন্তু মণিদীপার দেহও নীর্ব নয়, মনও ভেঙে পড়েনি। প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ দেহটা বর্ষার দীঘির মত আনন্দে টলমল করছে। এত আনন্দ মণিদীপা পায় কোথা থেকে। এত সাজগোজেরই বা ঘটা কেন? গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ, গায়ে এঁটে বসে থাকা খাটো খাটো জামা, লজ্জার লেশ নেই,—একি সুস্থ মেয়ের পক্ষে সম্ভব!

অতএব সোমনাথ তুমি সাবধান হও। ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা ক'রোনা।

সহকর্মীদের সতর্কবাণী সোমনাথকে কিন্তু এতটুকুও বিচলিত করেনি। বরং উল্টোদিক থেকে ওকে আকর্ষণ ক'রেছে।

সে-সময় সোমনাথের মনে হয়েছিল,—সে যেন একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুস্থ শরীরটার ওপর তার ছিল গভীর বিশ্বাস,—সহজ সরল সুস্থ মনটার ওপর অনেক শ্রদ্ধা। মণিদীপা যত খারাপ মেয়েই হোক না কেন,—ওর সঙ্গে মেলামেশা করলে,—সোমনাথের কিছুই ক্ষতি হবে না। সোমনাথের কোনও অনিষ্ট করবার সাধ্যই নেই মণিদীপার। সোমনাথের কাছে তাকে একদিন মাথা নোয়াতেই হবে।

কিন্তু সত্যিই কি তাকেও! এতদিন পরে নিজের মনকে ভালভাবে বোঝবার চেষ্টা করছে সোমনাথ।

মণিদীপার রূপ-সাধনা, ওর অন্য সৌষ্ঠব। কালো কালো বড়ো বড়ো ওর দু'টো চোখ,—কত গভীর আহুতি সে-চোখ দু'টোতে। পাতলা পাতলা লাল লাল ঠোঁট, সেখানে কত গোপন আহ্বানের সুপ্ত অস্থিরতা,—সেসব কিছুই কি সোমনাথকে মুগ্ধ ক'রেনি। ওর সমস্ত অস্তিত্বের ওপর নিশ্চিন্ত নিবিড় অধিকার স্থাপন করবার একটা উগ্র বাসনা তাহলে তাকে আচ্ছন্ন ক'রেছে কেন?

সবাইকে নিয়ে ওর রাত দিনগুলোর থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে এসে, ওর নির্জন নিভৃত অবসরের মুহূর্তগুলোকে একটু একটু করে আস্বাদন করবার জন্যে সোমনাথের মন কি লুব্ধ হ'য়ে ওঠেনি। ও যখন সবার, ও তখন কারোর নয়। সোমনাথেরও নয়।—সোমনাথ কি সেটা সহ্য করতে পারে!

তা যদি পারতো, তা হ'লে সে বিয়ের প্রস্তাব করতে গেল কেন? বিয়ে না ক'রেও তো মণিদীপাকে পাওয়া তার পক্ষে শক্ত ছিল না। অনেককেই তো প্রশ্রয় দিয়েছে মণিদীপা। নির্লজ্জমুখে সে-কথা স্বীকারও ক'রেছে। তারপর জিজ্ঞেস ক'রেছে—এর পরও কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও সোম!

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলেছে,—হ্যাঁ!

—কেন?—ব'লেই নিজের দিকে তাকিয়েছিল মণিদীপা।

সোমনাথ বুঝতে পেরেছিল ওর শরীরটাকেই ও ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ ও বলতে চাইছে —আমার এই দেহটাকে দেখেই তুমি মুগ্ধ হ'য়েছো!

সোমনাথ তাই গম্ভীর হ'য়ে বলল,—না, ওটার ওপর আমার বিশেষ লোভ নেই! আর সেই লোভটাই যদি সব হ'তো, তা' হ'লে বিয়ের প্রস্তাব না ক'রে তোমায় আতিথ্য প্রার্থনা করতাম। আতিথ্য মানে তুমি তো কৃপণ নও। সুতরাং বুঝতে পারছ দীপা, যে, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই অন্য কারণে।

খুব ধীর অথচ স্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলেছিল সোমনাথ। আর মণিদীপা তা' অবাক হ'য়ে শুনেছিল। হয়তো ভাল লেগেছিল, তাই আগ্রহ প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞেস করল,—সে-কারণটা জানতে পারি কি?

—তার আগে তোমায় বলতে হ'বে,—শিক্ষকের মত সোমনাথ বলল,—বিয়ের প্রতি তোমার এত তীব্র বিরাগ কেন?

উত্তরটা কিন্তু ছাত্রীর মত দিল না মণিদীপা। বলল,—তুচ্ছ একটা প্রশ্নের জন্যে গলাটা অত গম্ভীর করলে কেন?

মণিদীপা এবার আড়চোখে সোমনাথকে দেখতে লাগল।…কাঁচামুখ, বয়সে হয়তো অনেক ছোট। চকচকে নির্ভাঁজ কপাল। কোঁকড়ানো একরাশ অগোছাল চুল।… … …

—আমাদের এতখানি অশ্রদ্ধা কর তুমি?—সোমনাথ সোজা ওর চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল,—অথচ বললে বোধ হয় বিশ্বাস করবে না দীপা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। সে-শ্রদ্ধাকে

অনুগ্রহ বলে তুল বুঝো না। প্রশ্ন করি কেন জান?—তুমি আর পাঁচটা মেয়ের মত তন্ময় নও। Failty তোমার অন্য নাম নয়। তবুও যদি একটা কথা বলি।

মণিদীপা মুচকে হাসল,—দোহাই তোমার সোম! অন্ততঃ তুমি আমাকে ভয় ক'রো না।

—ভয় ঠিক নয়, ওটা সৌজন্য।—সে যাক্!—তুমি নিশ্চয়ই এ-কথা বিশ্বাস ক'রো যে, মেয়ে-পুরুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ না গ'ড়ে উঠলে সমাজ নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। আমার তো মনে হয় পুরুষকে অশ্রদ্ধা ক'রে তুমি নিজেকেই অপমান করছ। পুরুষ না থাকলে তোমার জীবন যে একেবারে অপূর্ণ থেকে যাবে, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ?

মণিদীপা লক্ষ্য করল,—সোমনাথের কথাগুলোর বাইরের রঙ মেলানো নেই। আন্তরিকতায় ভরপুর। তবুও মণিদীপা ঠোঁট উল্টে হাসল।

সোমনাথ সহ্য করতে পারল না। বলল,—তোমার ঐ হাসি দেখে মনে হচ্ছে তুমি সুস্থ নও। অর্থাৎ তোমার বিকৃতি ঘটেছে। এ-অবস্থায় বিয়েটাকে অন্ততঃ শুধু হিসেবেও পরীক্ষা ক'রে দেখতে পার। রঙীন কাঁচের মূল্যে তুমি বিকিয়ে যাবে তা' কখনই হ'তে পারে না। বিয়ের পরই তুমি বুঝতে পারবে,—তোমার দিনরাত্রিগুলো কি গভীর অর্থবহ হ'য়ে নতুন ক'রে তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাইছে।

মণিদীপা এবার শব্দ ক'রে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল,—বিশ বছরের পুরোণ মূল্যহীন কথাগুলো অত সিরিয়স্‌লি বলছ কেন? খুব গভীর গলায় বললেই বুঝি ও-গুলো অসামান্য হ'য়ে যাবে। ও-গুলো এখন মিউজিয়মের সামগ্রী। চলতি জীবনে ওর কোনও মূল্যই নেই। ও-সব কথা আর ভাল লাগে না।

সোমনাথ কি যেন বলতে গেল,—কিন্তু মণিদীপা তাকে বাধা দিয়ে বলল,—মা হ'তে পারলেই মেয়েজীবন সার্থক হয়—ইনিয়ে-বিনিয়ে এই কথাই তো তুমি বলতে চাইছিলে। ঐ কথা শুনে শুনে মেয়েজাতির ভেতর একটা দৃঢ়সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছে,—তাদের গর্ব তারা মায়ের জাত। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের মায়ের অত লাঞ্ছনা পায় কেন—বলতো। এ-কথা তুমি তো অস্বীকার করতে পারবে না সোম,—যে, তাদের মা হওয়াটা শুধু অসৌরবের নয়, কলঙ্কেরও। অথচ বিবাহিত মেয়েদের মত মা হওয়ার যতটুকু শারীরিক কষ্ট সবটাই তারা ভোগ করে, উপরন্তু তাদের মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়।—সুতরাং বুঝতেই পারছ,—শুধু মা হ'লেই চলবে না,—মাতৃত্বের সামাজিক স্বীকৃতি চাই। অর্থাৎ মায়ের পাশে পাশে একজন বাবা থাকা চাই; তাহ'লে মা মা ব'লে গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে মরে কি!

যেখানে বাবা না থাকলে মায়ের কোনও সম্মানই মেলে না, সেখানে বাবাকে স্বর্গ বলে, মাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলার অর্থ কি হ'তে পারে বলতো?

সোমনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—কুমারী মায়েরা সমাজে ঘৃণ্য না হ'লে ব্যভিচারে যে সমাজ ছেয়ে যেত। তাই সমাজের কল্যাণ কামনায় বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

—কিন্তু এ-যুক্তি পুরোপুরি সত্য নয় সোম। সমাজের মঙ্গলের চেয়ে সম্পত্তির দিকে পুরুষের নজর ছিল বেশি। উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্যেই এই বিয়ের আয়োজন।

সোমনাথ বলতে পারত—তাই যদি হয়, তাতে কি সমাজের কল্যাণ হয় না।—কিন্তু অত

জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সোমনাথ শুধু জিজ্ঞেস করল,—তাই বুঝি তুমি বিয়ে করতে চাও না, 'মা' হ'তে চাও না।

—হ্যাঁ! খুব দৃঢ়তাবে উত্তর দিয়েছিল মণিদীপা। আরও বলেছিল তোমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মায়ের কোনও সম্মানই নেই। সে শুধু গৃহপালিত পশুর মত দুটো খাওয়া-পরার বিনিময়ে সংসারটাকে রক্ষা ক'রে চলে। বাইরের ঝড় ঝাপ্টায় সেটা যেন নষ্ট না হয়। গরু যেমন গৃহস্বামীকে দুধ দেয়, কুকুর যেমন প্রভুর বিপদের সঙ্কেত পেয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে, গাধা যেমন তার মালিকের বোঝা বয় মায়েদেরও ঠিক তেমনি গৃহস্বামীর জন্যে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, তার সন্তানকে পেটে ধরতে হয়, তার অসুখবিসুখে তাকে সেবা করতে হয়, তার বিপদে হাসিমুখে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়, সে যখন থাকবেনা তখন নিজের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ, কামনা-বাসনা, বিসর্জন পরিত্যাগ ক'রে বিধবা হ'তে হয়। অথচ গরু মরে গেলে গৃহস্বামী অনায়াসে আর একটা গরু পুষতে পারে। গরু, গাধা, কুকুরের তবু স্বাধীনতা আছে মায়েদের ত তাও নেই।

সোমনাথ চমকে উঠল,—ছিঃ ছিঃ, এসব কি বলছ তুমি! অমন ক'রে নিজেকে তুমি অশ্রদ্ধা করোনা। এখনও ফেরবার পথ আছে মণি, এখনও তুমি সহজ হ'তে পার, সুস্থ হতে পার।

জানি, কথাগুলো তোমার ভাল লাগছেনা।—ম্লান হেসে মণিদীপা বলল—এসব কথা এর আগে নিশ্চয় কোথাও শোননি। সংসারে একটা দিকই তোমরা চিরকাল ধরে দেখে আসছ! উল্টোদিকটার দিকে তাকাতেও তোমরা ভয় পাও। আমার মত কত হাজার হাজার মেয়ে বুকে কি দুঃসহ হাহাকার নিয়ে দিন কাটায় তার হিসেব যদি রাখতে তাহলে হয়তো আমার কথা বুঝতে পারতে।

উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল মণিদীপা। একটু দম নিয়ে আবার বলল,—প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিধি নির্দিষ্ট রীতি বলে মেনে নিয়ে সতীলক্ষ্মী হ'য়ে থাকা যে আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা, সেটা বোধহয় তুমি খুব সহজেই অনুমান করতে পার। আমাদের সমাজে দুশ্চরিত্র পুরুষেরা অনায়াসেই বিয়ে করতে পারে। কিন্তু যে মেয়ের চরিত্র নেই তাকে কেউ ঘরে তোলেনা; না তুলে তার ঘরেই রাত্রিবাস করতে যায় সমাজের যত মাতব্বরেরা। এইটাই নাকি প্রথা। এতে নাকি সমাজের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সমাজের কল্যাণ হয়। একবার ভুল করলে যে-সমাজে প্রায়শ্চিত্তের কোনও ব্যবস্থা নেই, সে সমাজ থেকে কিছুই আমি প্রত্যাশা করিনা। তাই আমি নিজেকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে অঙ্গার করেছি, অঙ্গারও ছাই হয়ে গেছে বহুকাল। তুমি এসেছ তাই দিয়ে আগুন জ্বালাতে তুমি ভুল করছ সোম।

সোমনাথ ওর পরিশ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে রইল। হয়তো ওর বলারও কিছু ছিলনা।

ওকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে মণিদীপা বলল—ছাই দেখে তুমি হয়তো অমূল্য রত্নের সন্ধানে এসেছ। বিশ্বাস নেই পেলেও পেতে পার। কিন্তু তার আগে একবার ভেবে দেখতে হবে, ছাইয়ের মধ্যে যদি সত্যিই কোথাও আগুন থেকে থাকে, তাহলে সেটা জ্বলছে না পুড়ছে। আমার জন্যে আরও একটা জীবন বিড়ম্বিত হোক, তাও আমি চাইনা সোম। তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম, তুমি ভেবে দেখো। সাতদিন পরে, অফিসের ছুটির পর আমরা আবার এখানে এসে বসবো। এখানেই আমাদের সব কথা হবে।

মণিদীপার কথা আর বসুন ক'রে ভাববার কিছু নেই। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে একটু ভেবে

দেখতে হ'বে সোমনাথকে। মণিদীপা সম্বন্ধে ওর নিজের যা করণীয় বলে মনে করেছে ও তাই করবে; অর্থাৎ মণিদীপাকে বিয়ে করবে। কিন্তু শুধু বিয়ে করলেই হবেনা ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে। মা-বাপ-দাদা-বৌদি-ভাইবোনেরা সবাই যেন ওকে মেনে নেয়। নইলে মণিদীপা বিয়েটাকে বিয়ে বলেই মনে করবেনা। তাছাড়া সোমনাথ আর একটা পারিজাত। তাই মণিদীপাকে সে জানিয়ে দিতে চায় যে সে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। হয়তো নতুন মানুষ মণিদীপার কাছে।

প্রথমে বৌদিকে কথাটা বলেছিল সোমনাথ। দিল্লী থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই বাড়িতে ওর বিয়ের কথা উঠেছে। বৌদির ইচ্ছে, কে এক ওর দূর সম্পর্কের বোন আছে তার সঙ্গে ওর বিয়ে হোক! বলা বাহুল্য দাদারও তাই মত। সুতরাং দাদা-বৌদি কেউই সোমনাথের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলনা।

মা যখন শুনলেন, গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে কাজ করতে করতে হঠাৎ অন্যমনস্ক-ভাবে বললেন,—তাহ'লে তুই দিল্লী ফিরেই যাবেতো যা।

এরপর বাবার কানে কথাটা তুলতে আর সাহস করলনা সোমনাথ।

সেই সময় তার মনে হল সবদিক ভেবে চিন্তে তবেই প্রস্তাবটা করা উচিত ছিল। এখন কথা ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে যে কাপুরুষতা প্রকাশ পাবে সোমনাথ নিজে যে তত্তখানি কাপুরুষ কিংবা রক্ষণ-শীল নয়, এ-কথা মণিদীপা জানবে কি ক'রে। অথচ বাবা-মা, দাদা-বৌদিদির নিয়ে যে পরিবার, যার সঙ্গে তার আশৈশব পরিচয় তাকে ঘুরে ঠেলে দিয়ে, কেবল মাত্র নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য, চলে যাওয়া নিশ্চয়ই সমীচীন হবে না।

সোমনাথ বুঝতে পারল—মণিদীপাকে বিয়ে করা তার নিজের সমস্যা নয় মণিদীপারও নয়। তার চার পাশের মানুষগুলোর সঙ্গে তার যে সমাজগত সম্বন্ধ, সমস্যাটা তাদের নিয়েই। সমাজকে অস্বীকার করার অর্থ নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। সোমনাথ ভাবল—তার অস্তিত্বটা এত অসহায় কেন?

চারধারে পাথরের পাঁচীল মানুষ মাথা খুঁড়ে মরছে, পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। মানুষ যদি এত একা তবে সমাজ কাদের নিয়ে? সমাজকে স্বীকৃতি না দিয়ে মানুষ কি বাঁচতে পারেনা!—পারে, কিন্তু তখন আর সে মানুষ থাকেনা। কেননা মানুষের সংজ্ঞাই হল যে সে একটা সমাজবদ্ধ জীব। কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সেই যে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস সুরু করেছিল, সেই ধারা আজও ব'য়ে আসছে। সমাজ জীবনে একা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ সমাজের মধ্যে থেকেও সব মানুষই একা। শুধু একা নয়, ভারী অসহায়।

পাঁচদিন ধরে ভেবে ভেবেও কোনও উপায় স্থির করতে পারলনা সোমনাথ।

আজ সকালে লেখার সরঞ্জাম নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। চিঠিলিখতে হবে। মুখে যা বলতে পারা যায়না, চিঠিতে তা অনায়াসে ব্যক্ত করা যায়। সুতরাং লেখা সুরু করল সোমনাথ।

ছোটছোট মুক্তোর মত কালো কালো অক্ষর। অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত। কি হ'লে কি হ'তে পারতো শুধু তারই সঙ্কেত। একেবারে শেষে এসে সোমনাথের মনে পড়ল যে এতখানি চিঠিতে সে আসল কথাই লিখতে ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো চেষ্টা ক'রেও লিখতে পারেনি। অথচ সেই

কথাগুলোই লেখবার জন্যেই আজ সে কলম ধরেছিল। সোমনাথের পক্ষে মণিদীপাকে বিয়ে করা যে সম্ভব নয়, সেই কথাটাই পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়নি।

শেষ কটি চত্রে সেই কথাই ব্যক্ত করল সোমনাথ। অবশ্য স্পষ্টভাবে নয়, খানিকটা ইঙ্গিতে। লিখল—মণি, আমি যতটুকু তোমায় চিনেছি, তাতে আমার মনে হ'য়েছে,—আমার কাছে তুমি যেন অসীম সমুদ্র গহন অরণ্য, কিংবা নিঃসীম আকাশ।

সে-আকাশে অনেক রোদ্দুর, অনেক মেঘ, অনেক আলো আবার অনেক অন্ধকার। সে আকাশে যেমন প্রভাতের হাসি আছে, তেমনি আছে রাতের কান্না। আমার ভেতরের পাখিটা তাই মেলে সে আকাশে উড়তে চেয়েছিল,—তার খেয়াল ছিলনা, দীর্ঘকাল চারিদিকের দেওয়াল ঘেরা পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে থেকে তার ডানা দুটোর এতটুকু জোর নেই! তাই উড়তে গিয়ে মাঝখানে মুখ থুবড়ে প'ড়ে মরে যাওয়ার চেয়ে পাখিটা চার খাঁচার মধ্যে ডানা ঝাপটে ঝাপটে বেঁচে থাকতে।

পাখিটা বেঁচে থাকুক, তাতে তোমার আকাশ ছোট হবে না। আলো আঁধারের খেলা সেখানে ঠিকই চলবে,—। রাতের শিশির হ'য়ে সে আকাশের কান্না ঝরবে, যেমন আজ ঝরছে তেমনি চিরদিন।

মাঝে মাঝে যখন তোমাকে গভীর অরণ্য বলে মনে করি, অন্ধকার অরণ্য; তখন তোমার মধ্যে আরও লীলাটাই প্রকট হ'য়ে ওঠে; আর সেই সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় আমি যে পুরী; পশুকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা আমার নীতি, সম্ভোগকে সংযম দিয়ে শাসন করা আমার সংস্কার।

আর যখন তোমাকে মনে হয় বিশাল সমুদ্র! তখন নিজেকে ভারী দুর্বল বলে মনে হয়। সব সময় ভয় হয় এই বুঝি কূল হারালাম। আমি যে দক্ষ নাবিক নই, সে তো তোমায় জানাবো নয় দীপা।

তাড়াতাড়ি চিঠি শেষ ক'রে খামে মুড়ে ফেলল সোমনাথ। জামাটা গায়ে ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এখনই পোষ্ট করতে হবে। কালই সকালে পৌঁছুনো চাই; সকালেই যেন মণি জানতে পারে, বিকালে অফিসে ছুটির পর মাঠখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই।

ঘর থেকে বেরুতেই দেওয়ালের গায়ে সেটার বন্ধুটার দিকে নজর পড়ল। ভেতরে একখানা চিঠি। হ্যাঁ,—সোমনাথের নামেই লেখা রয়েছে। কাল সন্ধ্যায় এসেছে বোধহয়।

দীপার চিঠি। চিঠিটা খুলতে খুলতে আবার সে ঘরে গিয়ে বসল।

আমি বুঝতে পারি সোম,—যে, তুমি যতখানি সহজ, দুনিয়া তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। মানুষ পৃথিবী সৃষ্টি করেনি এই কোভে বোধহয় মানুষ তাকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলছে। জীবনের পথে আজ অসংখ্য বাঁক। প্রতি বাঁকের মুখেই স্বার্থের হানাহানি। এতদিনে নিশ্চয়ই তুমি জগৎটাকে চিনতে পেরেছ। পেরে নিজেকে ভারী অসহায় বলে মনে হচ্ছে, তাই না সোম।—তা হোক, এতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

তোমার অসহায়তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। জগৎটাকে চিনতে পারলেই, তুমি যে ঘনশ্যাম পেছিয়ে যাবে তা আমি জানতাম। তাই, তোমার পথে দেখা করে তোমাকে আর লজ্জা দিতে চাইনা।

আজ আমার কি মনে হচ্ছে জান,—বহতা নদীর মত অনেক বন্ধুর পথ আমি অতিক্রম করে এসেছি দুরন্ত প্রাণের আবেগে। আমার শরীরে অনেক বোঝরা এসে জমেছিল,—যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসে সে সবই আমি তীরে তীরে ফিরিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে ক'রে নিইনি কিছুই। আমার দেহের লোনাজলে একদিন যারা অবগাহন করেছিল,—মনের দিক থেকে তারা কোনও দিনই পাখি পাবে

না। অথচ আমার মন, অন্ততঃ আমার কাছে এখনও নির্মল। দেহের অনেক উর্দ্ধে আমি আমার মনকে তুলে রেখেছিলাম। সেখানে পৌঁছুবার সাধ্য ছিল না কারোর।

আজ আমার গতিতে সে উচ্ছলতা নেই। জোয়ারের বেলা বোধহয় শেষ হয়ে এল। ক্রমশঃ ধীর, ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছে আমার স্রোত ধারা। মোহানার কাছে এসে পৌঁছে গেছি আমি।

বেলাশেষের শেষ আলোয় যখন সুদূর অতীতের দিকে চোখ ফেরাই তখন মনে হয়,—একমাত্র তাকেই আমি ভালবেসেছিলাম। আমার প্রথম যৌবনে সে আমার সমস্ত মনটুকে বলেছিল, আজও আশ্চর্য হ'য়ে দেখছি সে-ই সেখানে বসে আছে।

পারিজাত আমায় ক্ষমা করবে না তা জানি। আমি তার ক্ষমার প্রার্থীও নই। আমি তার ঘৃণা পেতে চাই। একমাত্র পারিজাতই পারে আমায় ঘৃণা করতে। পারিজাত আমায় ঘৃণা করুক। স্নেহ-প্রীতি ভালবাসা কিছুই চাই না আমি তার কাছ থেকে। কেননা, আমি তার যোগ্য নই।

তোমার মধ্যে যে মানুষটি নিতান্ত অসহায় ভাবে দিন যাপন করছে, সে তার মহত্ব প্রকাশ করুক অন্য ক্ষেত্রে। ছিন্ন-ভিন্ন বাঙলাদেশে হতভাগিনীদের সংখ্যা কম নয়। তোমার সেই অনাগত সকল দিনটিকে আজ আমি দূরের স্বাগত জানাই।···

মহত্ব কথাটা বার বার উচ্চারণ করল সোমনাথ। মনে হ'ল—মণিদীপা তাকে ঠিক চিনতে পারেনি। সোমনাথ মহৎ মানুষ নয়। নিজের রূপ-গৌরব, আর দুরন্ত আসঙ্গ লিপ্সাই সোমনাথকে টেনে নিয়ে গেছিল মণিদীপার কাছে। তার মধ্যে মহত্বের কিছু ছিল না। তবে মুখে সে অনেক আদর্শের কথা বলেছে। একজন স্রষ্টা নারীকে পঙ্কিল জীবনের আবর্ত থেকে উদ্ধার ক'রে নিজস্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্নও সে দেখেছে। মনে মনে কল্পনা করেছে যে, সমাজকে সে জানিয়ে দেবে যে মানুষ যতখানি প্রকৃতি চালিত, ততখানি সে অমানুষ। প্রকৃতিকে স্বীকার করেও প্রাকৃত না হওয়াটা মানুষের মানুষী পরিচয়। যদিও এগুলো ছিল নেহাৎ বাইরের ব্যাপার তবুও এর প্রভাব ছিল তার মনের মধ্যে এবং তার থেকেই বোধহয় জন্ম নিয়েছিল সোমনাথের উচিত অনুচিত বোধ।

খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মণিদীপার সঙ্গে মেলামেশা করেছে সোমনাথ, কিন্তু কোনও দিনই তাকে সে অসম্মান করেনি। অথচ প্রলোভন কম ছিল না; আগ্রহও কিছু ছিল না অপর পক্ষের। তা সত্ত্বেও সোমনাথ অধিকারের বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা করেনি।

সোমনাথের এই পরিচয়টাকেই মণিদীপা মহত্ব বলে মনে করেছে। সোমনাথকে চিনতে ভুল করেছে মণিদীপা।

ভুল করুক, আর যাই করুক, চিঠিটা প'ড়ে সোমনাথ নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হল। তার এই গভীর আত্মসম্ভ্রমবোধ ভেতরের দুর্বল মানুষটাকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন করল। একটা সাহসী নির্ভীক মানুষের অস্তিত্ব যেন নিজের মধ্যে অনুভব করল সোমনাথ। পকেট থেকে নিজের চিঠিখানা বার ক'রে খুটি খুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এখনই তাকে পৌঁছুতে হবে মণিদীপার কাছে। সাতদিন শেষ হ'তে এখনও একদিন বাকী; তা হোক গে, সোমনাথ আর ভাববেনা, ভেবে ভেবে, আর একটা মুহূর্তও সে নষ্ট করতে চায় না।

রাস্তায় নেমেই একটা ট্যাক্সি ডাকল সোমনাথ। তারপর সোজা চলে গেল মণিদীপার বোর্ডিংএ।

গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান সেলাম ঠুকে বলল,—দিদিমণি তো আজ সকালেই দিল্লী চলে গেছেন।···

শিমুল ফুলের গন্ধ

"মানসপুত্র"

জানালার পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে তার তীক্ষ্ণ চোখের উৎসুক দৃষ্টি নীচের দিকে মেলে ধরল মিনু। সারাদেহ তার থর থর করে কাঁপছে তখন। নাকের দু'পাশের লতি ফুলে ফুলে উঠছে কী এক চাপা উন্মাদনায়। ফরসা ধবধবে কপালটায় ঘামেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উন্নত বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে, আঁচলটা পড়েছে খসে।

সামনের সরু গলিটায় তখন আনন্দের সাড়া জেগেছে। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক। এবাড়ি ও বাড়ির মেয়েরা শশব্যস্তে বেরিয়ে আসছে বাইরে, নতুন বরকে দেখার জন্যে রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে তাদের মধ্যে।

পাশের বাড়ির অমরেশ বিয়ে করে ফিরল এইমাত্র। একা নয়, ফিরল মন্ত্রের অধিকারে বরণ নেওয়া সারা জীবনের নির্বাচিতা সঙ্গীকে নিয়ে। পাড়ার পরিচিত বহুলে অপরিচিতা এক নারী এল অতি পরিচয়ের দাবী নিয়ে।

দোতলার উচ্চতা থেকে নতুন বরকে লাল বেনারসীতে মোড়া সীমন্ত একটা পুঁটলীর মত দেখাচ্ছে। সেই দিকেই সবার নজরটা বেশী মনে হচ্ছে, কেউ দেখছে বিস্মিত হয়ে, আবার কেউ বা দেখছে নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে। তবে দেখছে সবাই, অমরেশের নজরও যেন বার বার সেদিকপানেই ঘুরছে। বেশ বুঝতে পারছে মিনু অমরেশের আগ্রহও বড় কম নয়।

আর বেশী দেখতে পারলেনা মিনু। সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে পাল্লাটার গায়ে হেলান দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে সে ঈষৎ খোঁড়া ডান পাটার ওপর ভর না দিয়েই।

কিন্তু পারলে না সে। খোঁড়া পাটা নয়, সুস্থ সবল ডান পাটাই যেন আজ বেশী করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছে। মিনুর আঠেরো বছরের উন্নত যৌবন তার বহন করতে সে যেন এ-কথারই আভাষ।

কোনোরকমে দেহটা টেনে এনে বিছানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মিনু। বন্ধ জানালার শাসন এড়িয়ে নীচের উলুধ্বনির আওয়াজ তখনও এসে ধাক্কা দিচ্ছে মিনুর কানে। বালিসে গোঁজা মুখ না তুলেই বুঝতে পারছে সে নীচের গলিতে নববধূর বরণ-পর্ব শেষ হয়নি এখনো, এখনো চলছে এয়োতিদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জের।

এক সময় সমস্ত হৈ-হট্টগোল মিলিয়ে আসে। নতুন বউকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাড়ীর ভিতরে। যে বাড়ির অতি আপনজন হয়ে এতদিন তাকে দিন কাটাতে হবে। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা। পুরোনো একঘেয়ে জীবন যাত্রার মাঝে নববধূ আজ ক্ষণিকের জন্যেও এনেছে নতুন আনন্দের পরশ, এইটুকুই তো পরম লাভ!

অমরেশ? অমরেশ এখন কী করছে? ভাববার চেষ্টা করে মিনু। মনে মনেই অমরেশের মুখের প্রতিচ্ছবি আঁকার চেষ্টা করে। কিন্তু আশ্চর্য—কিছুতেই মুখখানা পুরোপুরি মনে করতে পারে

না। এর মধ্যেই অমরেশের মুখ মিহুর কাছে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, অনেক দূরে সরে গিয়েছে যেন সে পরিচিত মুখখানা। ঠিক ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া দুরাগত চাঁদের মত।

কান্না পেলেও কাঁদতে পারছে না মিহু। কান্নার যে যন্ত্রনাদায়ক অনুভূতিটা গলার মধ্যে ফলা পাকিয়ে গেছে। কেন এমন হোল? তার আঠারো বছরের স্বপ্নটাকে মিহুর হাতে ভেঙে দিয়ে কতটুকু শান্ত হোল বিধাতার!

একটা আলমারির চেতনার আগুনে পুড়ে পুড়ে শেষে একসময় আপনিই শান্ত হ'ল মিহু। কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল সে। তারপর খোঁড়া পাটা টেনে টেনে আবার এগিয়ে গেল বন্ধ জানালাটার দিকে। নিজের ঔৎসুক্য দমন করতে, ভালো রকমই জানে তার পক্ষে এ ইচ্ছে চেপে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। এতদিনে অমরেশ যে তার কতটা কাছে এগিয়ে এসেছিল সে তো আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মিহু নিজেই বুঝতে পারেনি এতদিন।

হঠাৎ খোঁড়া পায়ের দিকে নজর পড়াতে সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যায় মিহুর। কেমন যেন অসহায় ভঙ্গীতে সেদিকে চেয়ে থাকে সে। জ্ঞান হবার পর থেকেই জীবনের এই অভিশাপের জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে মিহু। অনুভব করেছে জীবিত কালের প্রতিদিনের, মুহূর্তের ইতিহাসে অথচ সে জানে তার বাহ্যিক রূপের পরিমাণ কতটা। বাবাকে সে বলতেও শুনেছে একথা। তার কথাই হচ্ছিল সেদিন। বাবার জন্য চা নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মিহু। ঘরের ভেতরে বাবা তখন বলছিলেন মাকে, নেহাৎ বিধাতা, বিরূপ মুহূর্তে সরলা নইলে দুর্গাপ্রতিমার মত রূপ যে মেয়ের সে কখনো খোঁড়া হয়! অমন মেয়েকে ঘরের বউ করার জন্যে কোথায় লোকে খেচে এসে আমার সাধাসাধি করবে তা নয়, আজ আমারই মাথায় মেয়ের চিন্তা পাথরের বোঝার মত চেপে রয়েছে। আরো কী কী যেন বলেছিলেন বাবা, কিন্তু মিহুর আর দাঁড়িয়ে শোনবার সাহস হয়নি। দুঃসহ, বেদনা আর লজ্জার তাপে তার সমস্ত সত্তা যেন তখন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। ক্ষোভ বেদনা আর অপমানের ঝঞ্ঝাঘাতে জর্জরিতা হয়ে মিহু সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল বাবাকে চা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েই।

শুধু বাবা কেন, অনেকের মুখেই মিহু শুনেছে তাহার চেহারা নাকি সুন্দর, রাজকন্যার মত রূপ নিয়ে জন্মেছে সে। নিজের আঠারো বছর বয়েসের উচ্ছল যৌবনা সুঠাম দেহটার দিকে সে নিজে কতদিন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখেছে; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে তার সৌন্দর্যের সঠিক পরিমাণ।

শুধু ওই এক খুঁত। ওই এক নিষ্ঠুর পরিহাস ভগবানের বা ভাগ্যের, কে বলতে পারে।

খোঁড়া পা টেনে চলতে চলতে মিহু অনেকদিন অনুভব করেছে ঠিক উল্টোটা। তার যেন রূপ নেই, সে কুৎসিত, পোকায় নষ্ট করে দেওয়া সোনাপদ্মের মত।

কতদিন শুতে যাওয়ার আগে মিহু উত্তর কল্পনাকে প্রশ্ন দিয়েছে। ভেবেছে—আচ্ছা এমন যদি হোত রাতারাতি তার খোঁড়া পাটা সেরে গিয়েছে। আর দেহের ভার তার টেনে চলতে হচ্ছে না, সবল সুঠাম গড়নের দু'খানা পা নিয়ে সে আর সবার মতই সহজ ভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কল্পনা, কল্পনাই। স্বপ্ন, স্বপ্নই।

মনে পড়ে মিহুর, ছেলেবেলা থেকেই তার নাচ শেখার ভারী শখ ছিল। এ জীবনে সে বাসনা তার অপূর্ণই রয়ে গেল। সে খোঁড়া মেয়ে, সহজ জীবনযাত্রার পথে তাকে খুড়িয়েই চলতে হবে আজীবন। চেহারা যতই সুন্দর হোক না কেন, কোন দাম নেই তার। পৃথিবীর উৎসব মুখর যৌবনের মেলায় অবাঞ্ছিত সে, এইটাই চরম সত্য।

অমরেশের কথাও মনে পড়ে। কেমন সুন্দর গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে অমরেশ। মিহু নিজেই বা কী রকম বোকা! অমরেশের মন ভোলানো স্তোক বাক্যের ফাঁদে পা বাড়িয়ে এতদিন ধরে আকাশ কুসুম কল্পনা করে এসেছে। এসব আগেই বোঝা উচিত ছিল মিহুর। ওই মেরুদণ্ডহীন নির্লজ্জ লোকটির বাক্যা সে কী এতদিন ধরে অম্লান বদনে সহ্য করে এসেছে তাই ভেবে আজ নিজের ওপরেই প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে।

কে যেন ডাকছে। কান খাড়া করল মিহু, মায়ের গলা। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মিহু। আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে নিল। কাউকেই তার মনের অবস্থা জানতে দেওয়া চলবে না, পাকা অভিনেত্রীর মত অভিনয় করতে হবে। ও বাড়ির আনন্দের জোয়ারে জোর করে ভাসাতে হবে নিজেকে, অমরেশ আর তার বউকে ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে হেসে হেসে চলে পড়তে হবে। আরো অনেক কিছু করতে হবে যাতে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। স্বয়ং অমরেশও না।

একা বৈঠকখানা ঘরে বসে অমরেশ একটার পর একটা সিগারেট ফুকে চলেছে। ভেতর বাড়ির কোলাহলের জের মেটেনি এখনো। কাল বউ-ভাত। বাড়ির ছাতে প্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ভিয়েন বসেছে পেছনদিকের উঠোনে। মিষ্টি তৈরী হচ্ছে আজ থেকেই। বাড়ির ভেতরটা আত্মীয়-স্বজনের ভীড়ে গমগম্ করছে। এই বৈঠকখানার একান্তে বসেও নানা হৈ-হট্টগোলের চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে অবিরত। সব মিলিয়ে উৎসব বাড়ির আনন্দের এই কলতান মোটেই মন্দ লাগছেনা অমরেশের।

তবু কোথায় যেন সুর কেটে যাচ্ছে বার বার। কিসের একটা চিন্তা যেন অমরেশের সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে অকারণেই। ঘুরে ফিরে ভেতর বাড়ি থেকে ডাক আসছে তার। শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে কৌশলে সে আহ্বান এড়িয়ে যাচ্ছে অমরেশ। অথচ সকলের আনন্দের সুরে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যই তার মন এই মুহূর্তে ব্যাকুল। তাই যেন আত্মীয় কুটুম্বের রঙ্গ-রসিকতা উপভোগের সম্পূর্ণ তৃষ্ণা রয়েছে হৃদয়ে, অথচ সাহসে কুলোচ্ছেনা অমরেশের। একটু আগেই নিজের চোখে অমরেশ দেখেছে ও বাড়ির খোঁড়া মেয়েটাকে এবাড়িতে ঢুকতে। ওই মেয়েটাকেই সে যেন আজ কিছুতেই সহ্য করতে পারছেনা। ও আবার এ বাড়িতে কেন?—রীতা নিশ্চয়ই আদিখ্যেতা করে ডেকে এনেছে। মনে মনেই রেগে উঠতে থাকে অমরেশ। রাগটা যে ঠিক কার ওপর, ওই মেয়েটার ওপরে, না রীতার ওপরে, নাকি স্বয়ং নিজের ওপরেই, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না অমরেশ।

নতুন বউয়ের মিষ্টি মুখখানা মনে পড়ে যায় হঠাৎ। ধীরে ধীরে রাগ মিলিয়ে যেতে থাকে, নববধূর চিন্তাটাই সবচেয়ে ভালো লাগছে এখন, তার সেই ভালো লাগা ভাবনাতেই আবার মশগুল

হয়ে যায় অমরেশ। বউয়ের নাম মালবিকা। বেশ কাব্যিক নামটি। মুখখানিও বেশ মিষ্টি, দেখলেই মায়া হয়, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আদর করে ওকে কী নামে ডাকবে এবার তাই-ই ভাবতে থাকে অমরেশ। মা-ল-বি-কা—নামটা কাব্যিক হলেও সবসময় ডাকবার মত নয়। তার চেয়ে…… ভাবতে থাকে সে।

চট্ করে মনে আসে কথাটা। ঠিক হয়েছে। মা-মা—ছোট্ট দুটি শব্দের সুতোয় গাঁথা মালা। আদর করে ওই নামেই বউকে ডাকবে অমরেশ। আশ্চর্য!—নামটা কেন যে এতক্ষণ মনে আসেনি!

আরো মনে পড়ে। কালকের রোমাঞ্চ জাগানো মুহূর্তগুলোর কথা। সমস্ত দিনটা যেন স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল, বিশেষ করে রাতটা। এখনও তার রেশ যেন লেগে রয়েছে মনে। চন্দন কুঙ্কুমে সুসজ্জিতা ব্রীড়াবনতা মালাকে পাশে নিয়ে বাসর ঘরের প্রতিটি মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না, বার বার ভেবেও তৃপ্তি হচ্ছে না।

সেই চিন্তাটা ঘুরে এল আবার। সেটাও ভোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। বার বার চেষ্টা করেও সম্ভব হচ্ছে না, মন থেকে কোন ক্রমেই একেবারে মুছে ফেলা যাচ্ছে না বিরক্তিকর সেই চিন্তাটা। মিহু ওরফে মিনতি নামের খোঁড়া মেয়েটির অস্তিত্ব মানসিক চেতনার স্তর থেকে বিলুপ্ত করা যাচ্ছে না কিছুতেই।

আচ্ছা—গভীর ভাবেই চিন্তা করা যাক্ সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে,—ভাবল অমরেশ। নিজের বিবেককেই প্রশ্ন করে দেখা যাক্। অন্যায় করেছে নাকি সে? তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাসে একদিন যদি কোনো একটি মেয়েকে ভালোবেসেই থাকে,—কিন্তু একে ভালোবাসাই বা বলছে কেন সে! মিহুর সঙ্গে তার কী সত্যিকারের ভালোবাসার লেনদেন হয়েছিল? মোটেই না। এদিক থেকে বিবেকের স্পষ্ট উত্তর শুনতে পাচ্ছে অমরেশ।

ভালোবাসা নয়, এটাকে বরং ভালো লাগা বলা যেতে পারে। ভালোবাসা হচ্ছে মনের আর ভালো লাগা হচ্ছে চোখের নেশা। চোখে লেগে থাকে ভালো লাগে মনের মণিকোঠায় তার স্থান না'ও হতে পারে। মিহুকে কেমন যেন ভালো লেগেছিল তাই একটু-আধটু প্রশ্রয় দিয়েছে অমরেশ।' সত্যি সত্যিই তাকে ভালোবাসেনি কোনোদিন। কাউকে ভালোবাসলে মন তাকে গ্রহণ করতে চায়, তাকে পেতে চায় সারা জীবনের সঙ্গী হিসেবে। তাই খোঁড়া মেয়েটিকে জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে কোনোদিনই কল্পনা করেনি অমরেশ। সুস্থ জীবন যাত্রার পথে খঞ্জের কোন স্থান নেই। তাকে সহানুভূতি জানানো যায়, অনুকম্পা দেখানো চলে, কিন্তু পাশাপাশি চলার প্রেরণা করা যায় না। এদিক থেকেও বিবেকের স্পষ্টোক্তি শুনতে পাচ্ছে অমরেশ।

মিহু হয়তো তাকে ভালোবেসেছিল, এটা সম্ভব এবং স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তার জন্যে অমরেশ দায়ী হতে পারে না, কেউ যদি তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে সে দোষ অমরেশের নয়। প্রেমের উদারতা দেখিয়ে খোঁড়া বউ ঘরে এনে বন্ধু-বান্ধবদের হাসাহাসির পথ সুগম করে দিতে পারে না অমরেশ। তাছাড়া কণিক উদারতা বোধে যদি বা সে মিহুকে বিয়ে করে বসত তাতেই সমস্যার কি এমন সমাধান হত। মিহুকে সে ভালবাসতে পারতনা কোন দিনই ফলে অবহা আরও বেশী মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াত। দৈনন্দিন তাচ্ছিল্য অবহেলায় মিহুর জীবন আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠত। সেই প্রত্যাহের গ্লানি থেকে মিহুকে রক্ষা করে সে বরং ভালোই করেছে।

বিবেকের এ যুক্তিও অমরেশের ভালো লাগল।

আরো ভাবতে থাকে অমরেশ। বিশ্রী এক চিন্তাকে চিন্তার যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করার নেশায় মেতে ওঠে মনটা। মিহুকে সে বিয়ে করবে-ই এমন কোন কথা দিয়েছিল কী? ঠিক মনে পড়ছে না। যদি দিয়েও থাকে তাতেই বা কী হয়েছে। একান্ত নির্জনে প্রেম-কাতরা যুবতির কণ্ঠে অমন দুটো একটা মিথ্যে সবাই বলে থাকে। প্রকৃতির এই-ই নিয়ম। সে মিথ্যা ভাষণের জন্য নিশ্চয়ই অমরেশ দায়ী নয়। সে মিথ্যাকে গ্রহণ করা না করার দায়িত্ব একা মিহুর। ও-ই বা ভুল বুঝবে কেন, লেখাপড়া তো শিখেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েই সময় বিশেষে অল্প স্বল্প মিথ্যে বলে থাকে। প্রেমের ছলনাকে কেন্দ্র করেই তো গড়ে উঠেছে পৃথিবীর যত কাব্য, যত সাহিত্য।

না। সমস্ত বিচার বিবেচনা করে খুঁটিয়ে দেখার পর অমরেশ নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারছেনা। তবে···

আর ভাবতে পারে না অমরেশ। এই 'তবে'টা যে কী তা সে বুঝে উঠতে পারছে না বলেই এত অস্বস্তি, এত চঞ্চলতা।

আবার সব গোলমাল হয়ে যায় অমরেশের। নব-পরিণীতা বধূ মালবিকার মুখখানা মনের মুকুরে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। মিহুর মুখটাও ভেসে ওঠে পাশাপাশি। তার ঈষৎ খুড়িয়ে চলার ভঙ্গীটাও মনে পড়ে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হাতড়ে আর একটা সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অমরেশ।

সন্ধ্যের পর ছাদের কোণে একা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মিহু। কৃষ্ণপক্ষের রাত। রাতের অন্ধকার ইতিমধ্যেই আকাশ আচ্ছন্ন। ইতস্তত: বহু তারা জেগে রয়েছে আকাশের বুকে। অন্ধকার আকাশে এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা নক্ষত্রগুলো যেন কালো ওড়নায় জরির চুমকী।

মিহুর মনটাও ওই আকাশের মতই অন্ধকার, নক্ষত্রের সামান্য আলোটুকুও নেই সেখানে। না, কিছু ভাবছে না মিহু। ভাববার শেষ হয়ে গিয়েছে। কী ভাববে, কাকে নিয়ে ভাববে, ওই অমরেশকে নিয়ে? পাগল! ওতো একটা কাপুরুষ।

খানিক আগে যখন ছাদে উঠে এসে মিহু তখন অমরেশকে যেন একবার দেখেছিল। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আয়েস করে সিগারেট টানছিল অমরেশ, মিহুকে দেখেই চট্ করে সরে গেল। সরে না গিয়ে উপায় কী! মিহু জানে তার জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল না অমরেশ। একজনে থাকত। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু আজ অমরেশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শুধু বউয়ের জন্য, বারান্দার ঠিক পাশের ঘরটাতেই ওর বউ আছে যে!

এত দুঃখেও হাসি পেল কথাটা ভেবে। মনে মনেই হাসল মিহু। একটা ছেলেবেলার কবিতা মনে পড়ে গেল তার—'দেখিতে শিমুল ফুল বড়ই সুন্দর গন্ধ নাই বলে কেহ করে না আদর'—অমরেশকেও তাই মনে হচ্ছে। মিহুর চোখে শিমুল ফুল ছাড়া অমরেশ আর কী হতে পারে।

চলতি দুনিয়া

উঁচু ফ্লাটের জন্য বেশি দাম

দি ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মুখপাত্র 'এশিয়ান লেবার' থেকে এক চাঞ্চল্যকর খবর জানা গেছে। মেক্সিকো শহরের হোটেল ও রেস্তোরাঁর পরিচারিকারা নাকি বেশি বেশি দাম দিয়ে উঁচু ফ্লাট কিনতে চাচ্ছে। তাদের বক্তব্য কিছু যে'ত্তোরা এবং কাকের মালিকদের চাহিদার কথা মনে রেখেই তারা এই ধরণের ফ্লাট কিনতে আগ্রহী। ফ্লাট আরো ছোট হ'লে নাকি ওই মালিকেরা খুশী হন।

সততা ডাকঘর

রাজস্থানে পরীক্ষামূলক কয়েকটি নতুন ডাকঘর খোলা হয়েছে। শিশু ও বয়স্করা তিন মাস ধ'রে সততার পরিচয় দিয়ে এই ডাকঘরগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পরীক্ষামূলক এই ডাকঘরগুলির তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকেরা। এই অভিনব ডাকঘরে খাম পোষ্টকার্ড টেবিলের উপরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রামের লোকেরা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী খাম পোষ্টকার্ড তুলে নিয়ে তার মূল্য একটি বাক্সের ভিতরে ফেলে দিয়ে চ'লে যান। কেউ পয়সা না দিয়ে পোষ্টকার্ড নিয়ে সরে পড়েছেন তিন মাসের মধ্যে এ-রকম ঘটনা সেখানে ঘটেনি।

আরেকটি অভিনব ব্যবস্থা, ওই সব গ্রামেই স্কুলের কাছে কয়েকটি সততা দোকান খোলা হয়েছে। তাতে স্কুলের ছেলে মেয়েদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস রয়েছে। ছেলে মেয়েরা দরকার অনুযায়ী জিনিস তুলে নিয়ে তার দাম বাক্সে ফেলে আসে। ওই দোকানেও অসাধুতার কোনো ঘটনা ঘটেনি।

নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিবাহ

মেরী ল্যাণ্ডের আইনসভা ৩০৬ বৎসর ধরে প্রচলিত ওই দেশের একটি আইনকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। ওই আইন অনুসারে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিলো। আইনটি বাতিল করার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছিলো ৯৭ আর বিপক্ষে ভোট পড়েছিলো ২৫। আগে কোনো

শ্বেতাঙ্গ রমণী নিগ্রো পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করলে তা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের বিবাহে কোনো পুরোহিত আইনত অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। এখন সেই সব আইন ওই অঞ্চলে বাতিল করা হলো।

চুম্বন শিক্ষা!

এ-রকম মনোরম পাঠ আর কী হতে পারে? চুম্বন! এই বিষয়ে যারা পাঠ দিচ্ছেন এবং নিচ্ছেন তারা সকলেই অভিজ্ঞ, চুম্বন-বিদ্যায় পারদর্শী। অভিনেতা সুরাত ডেভিড নিজেন বহু সুন্দরীকেই চুম্বন করেছেন। আর তাকেই কিনা এখন অভিনয় করতে হচ্ছে চুম্বন শিক্ষাথীর ভূমিকায়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন অভিনেত্রী মিস ডেবোরা। আর দুঃসাহসী শিক্ষকের ভূমিকায় আছেন জন হাস্টন। ছবির নাম 'কাসিনো রয়াল'। জেমস বণ্ড চিত্র।

ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল ছুটতে গিয়ে প্রেম

ধনী শিল্প-পতির পুত্র পিটার গ্যাসকয়েন ওয়াটার—স্কী তারকা পাম হর্টনকে পাজাকোলা ক'রে ছুটতে লাগলো।

এদের পরিচয় তিনমাস আগে। ২৩ বছরের মেয়ে পাম যেখানে স্কী শেখায় সেই স্কুলে। একদিন তারা পাশাপাশি ছুটে যাচ্ছিলো ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। তখনই পিটার পামকে বিয়ে করতে চায়। সেই পরিস্থিতে, বেগের আবেগে পাম-এর মন এমন রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছিলো যে ও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলো। তারপর ওরা ঘোষণা করলো বাগদানের কথা।

বিকৃত-মনা যুবকদের কাণ্ড

আমেরিকার দুজন যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এরা দুটি কিশোরকে হত্যা ক'রে তাদের মৃতদেহ গাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিলো। ঘটনাটা ঘটে টেক্সাসে অঞ্চলে। এদের বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুতর অভিযোগও এসেছে। এরা নাকি বারো বছরের একটি মেয়েকেও হত্যা করেছে। তার মৃতদেহ এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের বিশ্বাস এরা প্রথমে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে; পরে শ্বাসরোধ ক'রে তাকে মেরে ফেলে। আজব দেশ আমেরিকা।

সুইডেনের যুবক যুবতী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচড়-কামড় সুইডেনবাসীদের জীবন থেকে একেবারে মুছে গেছে। সুইডেন এখন একটি উন্নত কল্যাণ-রাষ্ট্র। দারিদ্র্য সে দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। বৈষয়িক অভাব তেমন নেই। কিন্তু সুইডেনের যুবক-যুবতীরা কি সুখী? তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কেমন হতাশা বোধ। এক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা তো রীতিমতো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছে।

ও-দেশের একটি সংবাদ পত্রের খবরে প্রকাশ: ১৭ বছরের একটি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফুটপাথের উপরে গাড়ি চালিয়ে সে দুজন স্ত্রীলোককে মেরে ফেলেছে। এর আগে সে

আরো পঁচিশটি অপরাধ করেছে। কিন্তু ধরা পড়েনি। এবার, ধরা পড়ার পর হয়তো তাকে ছ মাস কি এক বছরের জন্য পাঠানো হবে 'যুবক-তত্ত্বাবধান-শিবিরে।'

ইংরেজদের ছেলে মেয়েরা অবাধ যৌন স্বাধীনতা ভোগ করছে। ইচ্ছা হলো তো তারা কাঁধে ফেলে ছেলে মেয়েরা রওনা দিলো কোনো নির্জন অঞ্চলে। একটি তরুণী জানাচ্ছে: "আমরা খুব স্বাধীন; এমন কি আমেরিকার ছেলে মেয়েদের চাইতেও। আমি সপ্তাহে একদিন শুধু বাড়ি থাকি। যখন বাড়ি ফিরি আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মা-বাবা একটি কথাও জিজ্ঞেস করেন না। তারা তো আমার চাইতেও ভালো জানেন। ধন্য মেয়ে আর ধন্য মা-বাবা!

ডিনকে চার

ঘটনাটা ঘটেছে লণ্ডনে। শ'দেড়েক যুবকের এক জনতা লণ্ডনের তিনজন পুলিশকে হত্যা করে। এর পরেও তারা চিৎকার ক'রে বলতে থাকে: 'ডিনকে আমরা চার করবো।" তারা থানা পর্যন্ত আক্রমণ করেছিলো। শেষ-পর্যন্ত পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করলো। আদালতে হাজির করা হলো ছ'জন যুবক এবং ষোলো বছরের একটি মেয়েকে। মেয়েটিও দলে ছিলো। মেয়েটি মাতাল এবং অসংযত অবস্থায় ছেলেগুলির সঙ্গে যোগ দেয়।

দক্ষিণ ভারতের সতীব্রত

দক্ষিণ ভারতের একটি বিশেষ সমাজে এক অভিনব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। সেখানকার বিবাহিতা মহিলারা সতী ও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এই মর্মে প্রতি বছর শপথ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি ঘরোয়া। এবছর এই অনুষ্ঠানের সময় ছিলো ১০ই মার্চ তারিখে, বুধবার, সন্ধ্যা ৬টায়।

অনুষ্ঠানের দিনে গৃহস্ত্রীরা সারাদিন উপবাসী থাকেন। উপবাস ভঙ্গ করেন সন্ধ্যার পর অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পর। চালের গুঁড়ো এবং ভুট্টা থেকে দু-রকম পিঠে তৈরী করা হয়। একটা পিঠাতে দেয়া হয় নুন, আরেকটাতে গুড়। মাথন, কলা পান-সুপারী সহ ওই দু-রকম পিঠা নিবেদন করা হয় দেবী গৌরীর উদ্দেশ্যে। হলুদ গুলে তাতে ভিজিয়ে একখণ্ড হলদে কাপড় গৃহস্ত্রী বাঁধেন গলায় মালার মতো ক'রে, আরেক টুকরো কাপড় বাঁধেন ডান হাতের কবজিতে। ওই কাপড়ের সঙ্গে সাধারণতঃ গাঁথা থাকে দুঁই ফুল। রাখী বন্ধনের ব্যাপারে বিবাহিতা মহিলারা পরস্পরকে সাহায্য ক'রে থাকেন। হলুদ ছোপানো কাপড় অনুষ্ঠানের আগে পুরোহিতকে দিতে হয়। মন্ত্র প'ড়ে পুরোহিত ওই কাপড় অনুষ্ঠানের দিন এয়োতির হাতে দেন। পুরোহিত সামান্য দক্ষিণা পান। দেবী গৌরীর কাছে নিবেদনের পর গৃহস্ত্রী প্রসাদ ভোজন ক'রে উপবাস ভঙ্গ করেন তারপর তিনি দাঁড়িয়ে প্রণাম করেন নিজের স্বামীকে এবং তার হাতে দেবীর প্রসাদ পিঠা দেন। কিছু পিঠে আলাদা করে রেখে দেয়া হয় পরদিন ভোরে গরুকে খেতে দেবার জন্যে।

যমরাজের হাত থেকে একদিন স্বামী সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিলেন আদর্শ সতী নারী সাবিত্রী। তাঁর সেই মহৎ সিদ্ধির কাহিনীটীকে স্মরণ করার জন্যই দক্ষিণ ভারতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

ইঙ্গিত

আজকাল খেলাধুলার প্রচলন বেড়েছে। বাংলা দেশে নানা খেলার নানা সংস্থা গড়ে উঠেছে। আমরা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি,—এসবের ক্লাবগুলির নাম জানি, খেলোয়াড়দের নাম জানি, কিন্তু অন্যান্য খেলার শরীরচর্চা এবং খেলাধুলার সংস্থা প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের কথা বিশেষ প্রচারিত নয়। এই নিবন্ধে বাংলাদেশের ক্রীড়াসংস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এঁদের সম্বন্ধে বিশদ খবর পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থা—পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাব, ময়দান, কলকাতা—১৩) স্থাপিত হয় ১৯২৩ সালে। বর্ধমানের স্বর্গত মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব ছিলেন এই সংস্থার প্রথম সভাপতি। ১৯২৪ সালে এ্যাথলেটিকসের মাধ্যমেই এই সংস্থার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে সাঁতার, কুস্তি, কবাডি, মুষ্টিযুদ্ধ, ভলিবল, সাইকেল চালনা, বাস্কেটবল, ভার উত্তোলন ইত্যাদিও কর্মসূচীর আওতায় আসে। "ভারতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন" সংগঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন খেলাধুলা একক ভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিজেদের "রাজ্য এসোসিয়েশন "গড়ে তোলে এবং "পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থা" থেকে আলাদা হয়ে যায়। সবশেষে আলাদা হয় এ্যাথলেটিকস্ বিভাগ। "পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থা"-সংবিধান অনুযায়ী এই রাজ্য এসোসিয়েশন গুলির পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থাতে সদস্য হতে বাধা নাই। পশ্চিমবঙ্গ অলিম্পিক সংস্থার সদস্য হিসাবে আছে দশটি রাজ্য এসোসিয়েশন এবং তিনটি জেলা এসোসিয়েশন।

অ্যাথলেটিক্স—এই রাজ্যে অ্যাথলেটিকস্ পরিচালিত হয় অ্যামেচার অ্যাথলেটিকস্ ফেডারেশন, (সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব টেন্ট ময়দান,)। এই সংস্থা প্রতি বৎসর রাজ্য প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। যদিও কেবলমাত্র কয়েকটি জেলায় ও কলকাতা শহরে এই সংস্থার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত তবুও এই এই সংস্থা বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেট সৃষ্টি করেছেন।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এই রাজ্যে বেশ কয়েকজন নামকরা পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলেট যোগদান করছেন।

প্রতি বছর এই সংস্থা একটি ক্লিনিক পরিচালনা করে। নিজস্ব কার্যালয়ের অভাব এই প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান অসুবিধা।

সাইকেল চালনা—ওয়েষ্টবেঙ্গল সাইক্লিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন (মার্কেন্টাইল বিল্ডিং সর্বোচ্চ তল, লালবাজার, কলকাতা—১) এই রাজ্যে সাইকেল প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। ইহাদের নিজস্ব কোন অফিস নেই। নির্দিষ্ট মানের উপযুক্ত সাইকেল চালনা ট্রাকের অভাব এই সংস্থার কার্যাবলী প্রসারের প্রধান অন্তরায়।

এই সংস্থার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন সাইকেল চালক ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডন অলিম্পিকে যোগদান করেন।

রাইফেল চালনা—১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলিকাতা রাইফেল ক্লাব এই রাজ্যে রাইফেল চালনার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। এঁদের প্রচেষ্টাতেই ১৯৪৯ সালে ১০টি রাইফেল ক্লাব সমন্বয়ে "পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল এ্যাসোসিয়েশন" (রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়াম, ব্লক নং ৪বি, রুম নং ৫ কলকাতা—২৯) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় রাইফেল এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ সালে।

দক্ষিণ কলকাতা রাইফেল ক্লাব সম্পূর্ণ নিজেদের প্রচেষ্টায় ১৯৫১ সালে ইংলণ্ডে একদল রাইফেল চালক প্রেরণ করে। এর পর থেকেই বাংলার প্রতিযোগিরা অলিম্পিক রাইফেল চালনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার অধিকাংশে গুলিতে ডঃ হরিহর ব্যানার্জী ছিলেন অধিনায়ক। অলিম্পিক রাইফেল প্রতিযোগিতায় শ্রীপরিতোষ গাঙ্গুলী একজন আন্তর্জাতিক বিচারক।

পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল এ্যাসোসিয়েশন ১৯৫২ সাল থেকে নিখিল ভারত রাইফেল চালনা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছেন। সংস্থার অনুমোদিত রাইফেল ক্লাবের বর্তমান সংখ্যা ৩৯টি।

দরকারী জিনিসপত্রের অভাব রাইফেল ক্লাবগুলির কাজকর্মের মুখ্য অন্তরায়। বর্তমান জরুরী অবস্থায় আমাদের আরও বেশী রাইফেল ক্লাব দরকার কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে প্রতিষ্ঠিত ক্লাবগুলিই যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে তাদের কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হচ্ছে।

ভলিবল—ভলিবল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন এই রাজ্যে ভলিবল পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।

কলকাতার ময়দানে এই সংস্থার একটা তাঁবু ও একটা খেলার মাঠ আছে।

প্রতিবছরই এই সংস্থার কাজ বেড়ে চলেছে। কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ক্লিনিক্স্ এই সংস্থার দ্বারা প্রতিবৎসরই পরিচালিত হচ্ছে।

বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশন—বাস্কেটবলের মূল সংস্থা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল এ্যাসোসিয়েশন (১৪, চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলকাতা-১২)। ময়দানে এর নিজস্ব তাঁবু, প্যাভিলিয়ন এবং খেলার মাঠ আছে।

ওয়াই, এম, সি-এর মাধ্যমে প্রবর্তিত এই বাস্কেটবল খেলাটি ইদানীং কয়েক বছরে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সংস্থাটির কাজ মূলতঃ কলকাতায় এবং কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ক্লিনিক্স এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জিমন্যাস্টিক—যদিও অলিম্পিক মানের উপযোগী নয় তবুও জিমন্যাস্টিক এই রাজ্যের একটি পুরানো ক্রীড়াধারা।

১৯৪১ সালের যখন জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে সারা বাংলা শারীরিক শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখনই নিখিলবঙ্গ জিমন্যাস্টিক এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়, পরে ১৯৪৩ সালে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'পশ্চিমবঙ্গ জিমন্যাস্টিক এ্যাসোসিয়েশন'। (২১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলকাতা-২৬) এই সংস্থার কার্যকলাপ কলকাতার ও কাছাকাছি জেলাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংস্থার নিজস্ব কোন ব্যায়ামাগার বা কার্যালয় নেই।

কুস্তি—এই রাজ্যে কুস্তি হচ্ছে একটি প্রাচীন ক্রীড়া। রাজ্যে অসংখ্য আখড়ায় কুস্তির সংগঠক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি ফেডারেশন, (পঞ্চানন ঘোষাল সমিতি, জোড়াবাগান লেন,) এর কার্যকলাপ কেবলমাত্র কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সর্বভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের কুস্তিগীররা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই রাজ্যের শ্রীনির্মল বসু হেলসিঙ্কি বিশ্ব অলিম্পিকে যোগদান করেন এবং রেফেরী পান। এই সংস্থার কয়েকজন সদস্য আন্তর্জাতিক বিচারক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। এই সংস্থার সভ্য শ্রীবি, বি, রায় আন্তর্জাতিক কুস্তি ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সভ্য।

সংস্থার নিজস্ব কোন কুস্তিশালা বা কার্যালয় নেই।

মুষ্টিযুদ্ধ—পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন (১০১, এ, অধিনায়ক শ্রী সেন, কলকাতা-৯)

সাঁতার—গত ২৭ বছর ধরে বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন (৯২, রবীন্দ্র সরণী কলকাতা-৬) এই রাজ্যে সাঁতারের উন্নতি সাধনে ব্রতী আছে। গত এক দশক ধরে বাংলার প্রতিযোগিরা সাঁতারে বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের শীর্ষস্থানে আছে। ভারতবর্ষে সাঁতারে উন্নতির জন্যে আমাদের রাজ্যের সাঁতারুদের অবদান অনস্বীকার্য।

১৯২৮ সালে এই রাজ্যের খ্যাতনামা সাঁতারু স্বর্গতঃ ডি, মুলজী আমষ্টারডামে নবম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৩২ সালে লস্ এঞ্জেলস্ দশম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন আমাদেরই রাজ্যের বিখ্যাত সাঁতারু স্বর্গতঃ নলিন মালিক।

দুর্গাস্ত ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এইরাজ্যের দুজন সাঁতারু ডঃ বিমল চন্দ্র ও শ্রীমতী আরতি (সাহা) গুপ্তা যে অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা ভারতে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। শ্রীমতী সাহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

১৯৬১ সালে দিল্লীতে "এশীয় ক্রীড়ায়" শ্রীশচীন নাগ ভারতের পক্ষে স্বর্ণপদক পান। ১৯৬২ সালে ভারতের অন্যতম প্রথম মহিলা প্রতিযোগী হিসাবে শ্রীমতী আরতি সাহা অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংস্থার নিজস্ব কোন কার্যালয় নেই।

মুর্শিদাবাদ বুইমিং এ্যাসোসিয়েশন দশ কয়েক বছর ধরে সন্তরণে:ৎসুক পাত্রার সাঁতারের আয়োজন করেছেন। এই প্রতিযোগিতা যথেষ্ট উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

নৌচালনা—বঙ্গীয় নৌবাহন সমিতি প্রোতযুক্ত জলে নৌচালনার উন্নতির জন্যে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে আসছেন। এই সংস্থার কয়েকটি অনুমোদিত ক্লাব আছে।

বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব, কলকাতা রোয়িং ক্লাব, লেক রোয়িং ক্লাব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাব ইত্যাদি সংস্থাগুলি নৌচালনার উন্নতি বিষয়ে নিযুক্ত। তাঁদের সভ্য সংখ্যাও মোটামুটি অনেক এবং তাঁদের কার্য্যসূচী সুপরিচালিত।

লাইফ সেভিং—জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির উদ্ধারের কার্য্যসূচী নিয়ে ভারতীয় "লাইফ সেভিং সোসাইটি" (রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা) স্থাপিত হয়। চাকুরিয়া লেকে এই সংস্থার একটি ব্যাডিলিয়ন আছে।

এ রাজ্যের অনেক অধিবাসী লণ্ডনের "রয়্যাল লাইফ সেভিং সোসাইটি"র রৌপ্যপদক লাভের পরীক্ষায় (সিলভার মেডেলিয়ন পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এই সোসাইটির নিযুক্ত-অনেক পরীক্ষক এই রাজ্যে আছেন।

লন টেনিস—বেঙ্গল লনটেনিস এ্যাসোসিয়েশন (২ এ, মনোহর পুকুর সেকেণ্ড লেন কলকাতা-২৯) টেনিস খেলার উন্নতির জন্য সুন্দর ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, শ্রীদিলীপ বসু, শ্রীনরেশ কুমার, শ্রীসুমন্ত মিশ্র, শ্রীআখতার আলি, শ্রীজয়দীপ মুখার্জী, শ্রীপ্রেমজিত লাল প্রভৃতি সদস্যরা প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

ব্যাডমিন্টন—১৯০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিন্টন এ্যাসোসিয়েশন (৪৩ বি, শেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা-১৩) স্থাপিত হয়। রাজ্য প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খেলা ও অন্যান্য অনেক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের ব্যাডমিন্টন খেলার উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের খেলোয়াড়দের জাতীয় মানের উন্নতি করার জন্য কলকাতায় অন্ততঃ একটি আচ্ছাদিত খেলার ঘরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

সংস্থার নিজস্ব কোন কার্য্যালয় নেই।

টেবিল টেনিস—অতীতের 'পিং পং' খেলা বর্ত্তমানে টেবিল টেনিস খেলার সূত্রপাত করে ওয়াই এম. সি, এ। ১৯১১ সাল থেকে ওয়াই, এম, সি, এ, কলেজ শাখায়, টেবিল টেনিস খেলা, চলে আসছে।

১৯৩৪ সালের ১৯শে জুলাই বেঙ্গল টেবিল টেনিস এ্যাসোসিয়েশন (৮৯, কলেজষ্ট্রীট কলকাতা-১২) স্থাপিত হয়, এটাই ভারতে এই ধরণের প্রথম সংস্থা। ১৯২৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত টেবিল টেনিস এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ সালে কায়রোতে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারত প্রথম অংশ গ্রহণ করে। আমাদের রাজ্যের অনেক প্রতিযোগী বিশ্ব

প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সর্বশ্রী আর. ভাণ্ডারী, কে. অরুণ, কে. ঘোষ, দীপক ঘোষ, টমা আয়েঙ্গার তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

পোলো—সম্ভবতঃ মণিপুরই পোলো খেলার প্রধান কেন্দ্র, সেখানে ষোড়শ শতাব্দীতে এ খেলা চলত, মণিপুরের জাতীয় খেলা পোলো তখন 'কাংজাই' নামে পরিচিত ছিল, সে সময় কাছাড়ে খেলার সহকারী ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন রবার্ট স্টুয়ার্ট এই খেলার আধুনিকরূপ করেন। ১৮৫৯ সালে তিনি ভারতে প্রথম ক্লাব শিলচর পোলো ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬১ সালে মিঃ সি. বি. স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে কলিকাতা পোলো ক্লাব স্থাপিত হয়, শিলচরের পোলো ক্লাব ও কলকাতার পোলো ক্লাব পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র আমাদের রাজ্যেই (হাওড়ার বেউলমুরে) পোলো খেলার বল তৈরী হয় আর তা সারা পৃথিবীতে রপ্তানী করা হয়।

আরো উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় পোলো দল বিশ্ব প্রতিযোগিতার প্রথম হয়েছে। কলকাতা পুলিশ সম্প্রতি বিদেশের একটি পোলো টীম গঠন করেছে।

কলকাতার বর্তমান পুলিশ কমিশনার শ্রীপ্রণব সেন একজন কৃতী পোলো খেলোয়াড়।

পর্বতারোহণ—হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র ১৯৫৪ সালে দার্জিলিংএ স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে শ্রীতেনজিন নোরকে কর্তৃক এভারেষ্ট (২৯০২৮ ফুট) বিজয়ই সংস্থা স্থাপনের প্রেরণা। এই শিক্ষা কেন্দ্র ক্রীড়া হিসাবে ভারতে পার্বতারোহণ শিক্ষার সুযোগ এনেছে।

কেবলমাত্র শারীরিক রক্ষতার জন্যই নয় মাতৃভূমির রক্ষার জন্যও পর্বতারোহণ শিক্ষা অপরিহার্য।

পর্বতারোহণের উপযোগী সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে এই সংস্থা সুসজ্জিত। হিমালয়ান এ্যাসোসিয়েশন। (৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭) পর্বত অভিযাত্রী সংঘ (৬, সুতারকিন ষ্ট্রীট) ও ক্যালকাটা ক্লাইম্বার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি হিমালয়ের চতুষ্পার্শ্বের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার জন্য এবং পর্বতারোহণে সাধারণের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য অভিযান চালাচ্ছেন।

লোকনৃত্য—লোকনৃত্যের মধ্য দিয়ে রাজ্যের জনসাধারণের জীবনযাত্রার এক এক দিক দেখানো হয়, ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য লোকনৃত্য প্রদর্শন করে এই রাজ্য গর্বিত, এই নৃত্যকে গৌরব মণ্ডিত করার কৃতিত্ব স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের। ইনি ছিলেন বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে ব্রতচারী সমিতির মাধ্যমে লোকনৃত্য ও লোক সঙ্গীত মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই লোকনৃত্য রাজ্যের মধ্যে আরও প্রসারিত হওয়া দরকার।

বহুবিদ্যা—ওয়েষ্ট বেঙ্গল আরচারী এ্যাসোসিয়েশন (গভর্ণমেণ্ট কলেজ দার্জিলিং) বহুবিদ্যা প্রচলনের একমাত্র সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। এই ক্রীড়া রাজ্যের কয়েকটি বিশেষ অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমেরিকার জাতীয় বহুবিদ্যা সমিতির মত যদি এই ক্রীড়ার প্রচলন ও উন্নতি করা হয়, তবে এটা রাজ্যের ছাত্রবৃন্দ ও ছাত্র সমাজের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দের সৃষ্টি করবে।

দেশীয় খেলাধূলা

কপাটি—কপাটি বা-হু-তু নামেই বিশেষ পরিচিত। নিখিল বঙ্গ কপাটি সংঘের নেতৃত্বাধীনে পূর্বে বহুল পরিমাণে খেলা হোত। তারপর ১৯৪০ সালে পশ্চিমবঙ্গ কপাটি এসোসিয়েশন, (৫৮।এ, রায় কমল ষ্ট্রীট, কলকাতা-২৩) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর কার্য্য বিশেষ প্রসারিত হয়নি। দেশীয় খেলাধূলা বিশেষ করে কপাটির প্রসারের জন্য আরো বেশী উৎসাহ উদ্দীপনার প্রয়োজন, কারণ খেলাটির জন্য বড় মাঠ বা দামী সরঞ্জামের দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে 'হনুমান ব্যায়াম প্রসারক মণ্ডলের' অধীনে একটি কপাটি খেলোয়াড় দল এই খেলাটি দেখানোর জন্য ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে যোগদান করে।

সর্বভারতীয় প্রতিযোগীতায় এই রাজ্যের দল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। কলকাতা ময়দানে সংঘের নিজস্ব একটি শিবির আছে।

খো-খো—ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে এই খেলা বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এই খেলা আমাদের রাজ্যে অল্পদিন প্রচলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ খো, খো ফেডারেশন এই খেলাটির প্রসার করেছেন।

লাঠি—প্রধানতঃ লাঠি, ছোরা, ছুরুৎসু ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মরক্ষার শিক্ষাদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ লাঠি সমিতিই (২৯।১ কালিদাস সিংহী লেন, কলকাতা-৯) এই রাজ্যে একমাত্র সংস্থা। আমাদের দেশে লাঠি খেলার ঐতিহ্য আছে এবং সমিতি এটা রক্ষার জন্য তৎপর। স্বর্গতঃ পুলিন বিহারী দাস ছিলেন এই রাজ্যে লাঠি খেলার পথিকৃৎ, প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় বুব সমাজে লাঠি খেলার প্রবর্তন হয়।

এই ধরণের আত্মরক্ষা মূলক খেলাধূলার ব্যাপকভাবে উন্নতির প্রচুর সুযোগ আছে।

কাবাডি—অন্যান্য রাজ্যে এই খেলা 'আত্যাপাত্যা' নামে সমধিক পরিচিত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ এই খেলা জনপ্রিয় করবার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন। সংঘ কর্তৃক কাবাডি খেলার নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে।

যৌগিক ব্যায়াম—সর্বশ্রী বিষ্ণুচরণ ঘোষ, নীলমণি দাস, নীরোদ সরকার, মনোতোষ রায়, ক্ষীরোদ গোপাল সাহা, শ্যামসুন্দর গোস্বামী এবং অন্যান্য ব্যায়ামবিদ্‌দের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যৌগিক ব্যায়াম আমাদের রাজ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

জাতীয় শরীর চর্চা শিক্ষণ পরিকল্পনায় এবং শারীরিক শিক্ষার স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমে যৌগিক ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চাণক্য। কেন্দ্রীয় পরিষদে তোমার স্থানক যদন বাচাল আমার অধীনস্থ কর্মী। এ ব্যবস্থা সকলকার অভিমত অনুসারেই হয়েছে। কিন্তু সে আমার অবাধ্য হয়ে, প্রতিপদে আমার অপমান করে, আমার কোন আদেশ নির্দেশই সে মানতে চায় না। তাছাড়া আজ কেন্দ্রীয় মহাকরণে সে প্রকাশ্যে আমার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করেছে। এর প্রতিকার চাই। আমি তাকে কর্মচ্যুত করবার আদেশ জারী করেছি। কিন্তু সে আদেশ···

বাচালের প্রবেশ—

বাচাল। সে আদেশ আমি মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে ফেলেছি। তুমি আমার সচিব-পদ থেকে অপসারিত করবে? তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা! তুমি আমার সহজ লোক ঠাওরাও! আমি মহারাজের স্থানক। মহারাজের বাপ আমার বাপের বেয়াই। মহারাজ আমার তল্পীবাহক। মহারাজের ছেলে আমার ভাগনে। আবার ওদিকে মহামাত্য চন্দ্রসেন আমার অভিভাবক।

তুমি আমার সহজ লোক ঠাওরাও!

নন্দ। যাও এখান থেকে। এখানে আমরা ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুনতে আসিনি।

চাণক্য। না, তা শুনবে কেন! ব্রাহ্মণ আজ আর সে ব্রাহ্মণ নেই। তাই এখন ক্ষত্রিয় অনায়াসে তার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। নির্ভয়ে তার পরে চোখ রাঙায়। সে দেখ যদি ব্রাহ্মণের থাকতো তো তাকে তোমার সুমুখে রোষ বহ্নি দেখে তুমি ঐখানে সিংহাসন শুদ্ধ মাটীর নীচে বসে যেতে। কিন্তু সে প্রতাপ একেবারে লুপ্ত হয়নি জেনো।

বাচাল। বেটি ব্রাহ্মণের প্রতাপটা একবার। আর তুমি মহারাজের স্থানকের প্রতাপটা কীরকম দেখ।

চাণক্য। দেখবে। মহারাজ, তুমিও দেখবে। যদি এর প্রতিবিধান না কর।

নন্দ। কী! তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে আমার ওপর চোখ রাঙাবে, ভিক্ষুক, বেরোও এখন থেকে।

চাণক্য। কলির ব্রাহ্মণ! কান পেতে শোন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বলছে "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।" তথাপি ভূমি উঠছে না, অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে না, পৃথিবী কেঁপে উঠছেনা। সব স্থির। কী আশ্চর্য!

নন্দ। ঘাড় ধরে বের করে দাও তো।

চাণক্য। ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা হও! ব্রাহ্মণ, জড়ের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রেখেছ কি! পায়ে তো ওঠো, কলিদের ভেঙে গুলিস বৃষ্টি করে, অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করে দাও। আর তা যদি না পারো, তাহলে ওরে পদদলিত, ওরে মহত্বের কঙ্কাল, আর আলোকে মুখ দেখিও না, রসাতলে যাও।

নন্দ। আমরা কি এখানে এক উন্মাদের প্রলাপ শুনতে এসেছি। বাচাল। একে বার করে দাও।

বাচাল। (চাণক্যের শিখা ধরিয়া টানিয়া) বেরিয়ে যা ভিক্ষুক।

চাণক্য। কী! হাঁ। যাচ্ছি। যাচ্ছি। তবে যাবার আগে বলে যাই মহারাজ নন্দ। তুমি একবার এই কলিযুগেই এই বিশীর্ণ বংশাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখবে। প্রজাপুঞ্জের দুর্দশাকে চরম সীমায় এনেছো তুমি। সেই প্রজাপুঞ্জের তরফে দাঁড়িয়ে তোমার রাজধানীর মধ্যেই আমি তোমাকে রাজত্ব নিয়মানুযায়ী বিধাতৃবৃন্দে পরাস্ত করব। যদি না পারি তাহলে আমি চণকের সন্তান নই।

তোমাকে আর মহামাত্য চন্দ্রসেনকে, আর তোমাদের এই সব ভণ্ড অপদার্থ নীচ চাটুকারদের আমি সবংশে বিতাড়িত করব। তোমাদের কলুষিত কর্মকলাপের অবসান ঘটাবো—এই প্রতিজ্ঞা করে গেলাম, মনে থাকে যেন মহারাজ। আর ভবিষ্যদ্বাণী করে যাই, শীঘ্রই একদিন এই ভিক্ষুকের সামনে এসে করজোড়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে, আত্ম পেতে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। সেদিন দেখবে আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জয় প্রতাপ। (প্রস্থান)

নন্দ। কী হয়েছিল বাচাল?

বাচাল। হবে আবার কী! লোকটাকে কেন্দ্রীয়চক্রের সভাপতিক করা আমাদের ভুল হয়েছিল। ক্রমাগত আমাদের ওপরে আদেশ জারী করে। আমাদের ভুল ধরে। আমাদের ভর্ৎসনা পর্যন্ত করে। এরকম প্রভুত্ব কখনো সহ্য হয়? তাই ওকে আমরা কেন্দ্রীয়চক্র থেকে বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা করেছি। আর সেজন্যেই আজ কেন্দ্রীয় চক্রে ওকে অপমান করে সেখানে থেকে বার করে দিয়েছি। তাই ও আপনার কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল।

নন্দ। কাজটা বোধ হয় ভাল করনি। চাণক্য শক্তিমান। তার অনেক অনুচর আছে।

জয়সেন। কী বলছেন প্রভু! আমাদের কাছে চাণক্য আর তার অনুচর! ফুৎকারে সবাইকে উড়িয়ে দেব।

নন্দ। তোমরা বুঝছো না জয়সেন। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তারা নাকি আমাদের শাসন আর চায় না।

সুজন। কে এসব আজগুবি কথা আপনাকে বলেছে!

বাচাল। মহারাজ! ওসব কথায় কান দেবেন না। ওসব ষড়যন্ত্রের রটনা। আপনাকে আর মহামাত্য চন্দ্রসেনকে পদিচ্যুত করতে পারে, এমন ক্ষমতা বিশকোটী নাগরিকদের মধ্যে কারুর নেই! বিরোধীপক্ষ একটা আছে বটে। কিন্তু তারা নিতান্তই নগণ্য, হেয়, ভিক্ষুকের দল। তাদের চাল নেই, চুলো নেই। তাদের কথা কেউ মানে না।

নন্দ। কিন্তু দেশে তণ্ডুলের দারুন অভাব। সেজন্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জয়সেন। অসন্তোষ ছিল কিন্তু এখন আর নেই।

নন্দ। কী রকম?

জয়সেন। সেদিন আপনি প্রাসাদ অলিন্দ থেকে যে ভাষণ দিলেন, দেখেন নি, কত লোক জমা হয়েছিল সেই ভাষণ শুনতে। সেই চমৎকার ভাষণ শুনে তারা আপনার জয়ধ্বনি করে চলে গেছে। আর তাদের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

সুজন। আপনি আর মহামাত্য দু'জনে নাগরিকদের অন্ন কদলী তক্ষণ করবার যে নির্দেশ দিয়েছেন তাও তারা হাসিমুখে মেনে নিয়েছে।

বাচাল। অতএব মহারাজ, কোন চিন্তা করবেন না। আমাদের এ রাজপাট এখন দীর্ঘদিন চলবে। আজীবন চলবে। কই গো সব নর্তকীরা। নাচগান চলুক। আজ সারারাত আমরা ফুর্তি করব।

ক্রিকেটের মৈত্রী-দূত ফ্র্যাঙ্ক ওভরেল

বড় ক্রিকেটার অনেক জন্মেছেন, কিন্তু ক্রিকেট খেলাকে একটি স্বার্থনিরপেক্ষ ভাবমর্যাদায় উন্নীত করতে, ক্রিকেট খেলার মধ্যে একটি বিশ্বমৈত্রীর রাগিনী সঞ্চারিত করতে, শত্রুর বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে আঘাত হানতে এবং তার আঘাত বুক পেতে নিতে মনের মধ্যে কোন বিদ্বিষ্টভাব না এনে উদার উন্নত মানস ভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে শত্রু-মিত্র সকলের মনে সবিস্ময় সম্রদ্ধ সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে ফ্র্যাঙ্ক ওভরেল ছিলেন এক এবং অনন্য, তুলনা-রহিত।

তাই তো আজ তাঁর অকাল মৃত্যুতে সকল দেশের মানুষ, তাঁর খেলার মাঠের শত্রুরাও, আজ সকাতরে স্বীকার করছেন,—তাঁর মৃত্যুতে ক্রিকেট জগতের অপরি-পূরণীয় ক্ষতি হল।

বোধ করি তিনিই একমাত্র ক্রিকেটার যিনি বিপক্ষদেরও এমন ভাবাবেগে অভিভূত করেছেন।

বিপক্ষের দেশ থেকে খেলা সাঙ্গ করে তিনি যখন বলবল নিয়ে দেশে ফেরবার পথ ধরেছেন তখন সেই পথের দুধারে সেই দেশের অগণিত নরনারী চোখের জলে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছে, উজাড় করে দিয়েছে তাঁর প্রতি তাদের প্রাণের প্রীতি আর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

এভাবে কোন ক্রিকেটারের ভাগ্যেই এমন সম্মান ঘটে নি।

সকল দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ, অপার শুভেচ্ছা! ভারতের ক্রীড়াঙ্গনকে তিনি যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতির আখ্যানে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শুধু বড় ক্রিকেটারই ছিলেন না ফ্র্যাঙ্ক ওভরেল, অন্তরের ঐশ্বর্যে তিনি ছিলেন ক্রিকেটের রাজ অধিরাজ।

ফ্র্যাঙ্ক ওভরেলের সেই পরিচয় তাঁকে অমর করে রাখবে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের একটি দৃশ্য

(ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি)

[কালোপযোগী কিছু অদলবদলের অঙ্গে লেখক ক্ষমাপ্রার্থী এবং এ রচনার স্বত্বাধিকার একা লেখকেরই]

বেচারাম মুদ্‌সী

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মহারাজ নন্দের প্রমোদোদ্যান। কাল—রাত্রি। মহারাজ নন্দ, উত্তর কেন্দ্রের অমাত্য সুজনরুদ্র, দক্ষিণকেন্দ্রের অমাত্য অয়দেন, কেন্দ্রীয় অমাত্য পরাশর পণ্ডিত ও অন্যান্য পারিষদগণ এবং নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু, আমরা তোমায় ভালবাসি,
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তাই তোমার কাছেই ছুটে আসি।
তুমি মোদের থাকো প্রভু, আমরা তোমার দাস দাসী,
তুমি যে হে ব্রজের বঁধু আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাস নাইক যাদ, নই তার অভিলাষী,
আমরা শুধু ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি॥

চাণক্যের প্রবেশ—

চাণক্য। মহারাজ।

১ম পারিষদ। এ আবার কে?

২য় পারিষদ। তুমি কোন্ গগণ থেকে নেমে এলে চাঁদ।

৩য় পারিষদ। নাচতে জানো?

সুজনরুদ্র। আরে থামো তোমরা। চেনো না এঁকে? উনি চাণক্য পণ্ডিত। বসুধাপুরের কেন্দ্রমণি! আর আমাদের কেন্দ্রীয় কর্মশালার সভানায়ক।

১ম পারিষদ। তাই নাকি! তা ইনি এ সময় এখানে কেন?

নন্দ। ঠিক কথা। চাণক্য! তুমি এখানে এ সময়ে কিসের জন্য।

চাণক্য। মহারাজ। তোমার আহ্বানে আমি মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে এসেছিলাম। কিন্তু তোমার তালক আমায় অপমান করেছে।

১ম পারিষদ। তা তো করেই।

২য় পারিষদ। তালক মাত্রেই অপমান করে থাকে।

৩য় পারিষদ। তালকের লাথ খুব খাপ। খেয়ো না বাবা।

চাণক্য। (সগর্জনে) চুপ কর কুক্কুরের দল।

(পারিষদবর্গ ভীত হইয়া স্তব্ধ রহিল।)

নন্দ। অপমান করেছে তা হয়েছে কি ঠাকুর। মগধের মহারাজার তালক। যাই হোক ব্যাপারটা কী?

জীবনী ও স্মৃতিকথা

গর্ডন ক্রেগ

রাশিয়ার যেমন স্তানিস্লাভস্কি, ইংলণ্ডের তেমনি গর্ডন ক্রেগ।

ইংলণ্ডের নাট্য জগতে গর্ডন ক্রেগ এক অবিস্মরণীয় নাম।

ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে গর্ডন ক্রেগ বিপ্লব এনেছেন।

তাঁর মতে নাটকে প্রকাশ পাবে মানুষের আত্মা, তার মনন। সেখানে বহিরঙ্গের মধ্যে কোন বিশেষ আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই।

কিছুদিন আগে এই মহান নাট্যশিল্পীর লোকান্তর ঘটেছে। সম্প্রতি তাঁর মতামত নিয়ে নানা আলোচনা বিলাতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

গর্ডন ক্রেগ এমন কথাও বলতেন যে, মঞ্চে জীবন্ত অভিনেতা অভিনেত্রী আমদানীর প্রয়োজন নেই। পুতুল দিয়েই অভিনয় করানো চলে। দুর্বল অভিনেতা অভিনেত্রীদের তো তিনি সহ্য করতে পারতেনই না, এমন কথাও তাঁকে বলতে শোনা যেতে যে, বহু কৃতী অভিনেতা অভিনেত্রীও নিজেদের মুদ্রাদোষ দিয়ে চরিত্রের বারোটা বাজান। পুতুল দিয়ে অভিনয় করালে আর সে সব মুদ্রাদোষ দেখার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়না। জার্মান এক্সপ্রেসনিষ্টরা গর্ডন ক্রেগের এ চিন্তা অনুসরণ করে প্রায় তাঁর কাছাকাছি গিয়েছিলেন। তাঁরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের বেশী মূল্য দিতেন না। মঞ্চসজ্জা আলো ছায়ার গতি ও অন্যান্য মঞ্চোপকরণের ওপরই গুরুত্ব দিতেন অধিক অর্থাৎ তাঁরা মনে করতেন, মঞ্চে রূপ রঙ শব্দ আলো প্রভৃতিই প্রধান, অভিনেতা অভিনেত্রী অনুসঙ্গ মাত্র।

গর্ডন ক্রেগের শিল্পধারণা সম্পর্কে মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রযোজক নট-পরিচালক স্তানিস্লাভস্কি তাঁর মাই লাইফ ইন্ আর্ট বইয়ে কেটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

ক্রেগ বলতেন যে নিষ্প্রাণ সামগ্রীর দ্বারাই প্রত্যেকটি শিল্প কর্মের নির্মাণ হওয়া উচিত, যেমন পাথর, মর্মর, ব্রোঞ্জ, ক্যানভাস, কাগজ, রঙ ইত্যাদির দ্বারা বস্তু নির্মাণ করে শিল্পোচিত প্রণালীতে সেগুলোকে স্থায়ীভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। তাঁর মতে, অভিনেতার দেহের সজীব উপাদান নিয়ত পরিবর্তনশীল, কখনও তা এক অবস্থায় থাকে না। আর সেই কারণেই তা সৃষ্টির কাজে অনুপযুক্ত। অভিনেতার ব্যক্তিত্বই তিনি সৌন্দর্য বলে মনে করতেন। তাই ব্যক্তিত্বহীন অভিনেতাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

গর্ডন ক্রেগ সম্বন্ধে ইসাডোরা ডানকান-এর ধারণা কতখানি উচ্চ ছিল স্তানিস্লাভস্কির কাছে তাঁর একটি উক্তি থেকেই তা বুঝতে পারা যায়। তিনি বলেছিলেন:

He belongs not only to his country, but to the whole world, and he must live where his genius will have the best chance to display itself, where working conditions and the general atmosphere will be suited to his needs. His place is in your "Art Theatre."

থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অধিকারী গর্ডন ক্রেগের জন্ম ১৮৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারী। জীবন সুরু করেন অভিনেতারূপে। লণ্ডনের লাইসিয়াম থিয়েটারে স্যার হেনরি আরভিঙ-এর

পরিচালনাধীনে ১৮৮৯ সালে তাঁর প্রথম রঙ্গাবতরণ। তাঁর মা ও ছিলেন নামকরা অভিনেত্রী—নাম, এলেন টেরি।

যৌবনেই রঙ্গলোককে চেলে সাজবার দিকে ঝোঁক দেখা যায় ক্রেগের। পার্সেলএর অপেরা, ডিডো এণ্ড এনিয়াস, বেথেলহাম, ইবসেনের দি ভিকিংস, শেকস্‌পীয়রের মচ এডো অ্যাবাউট নাথিং প্রভৃতি কতগুলো নাটক প্রযোজনায় এমন মঞ্চ পরিকল্পনা করেন যার সঙ্গে তখনকার দিনের মঞ্চ কলারীতির কোনো মিলই ছিল না। শেকস্‌পীয়রের নাটকটিতে তাঁর মা-ও অভিনয় করেছিলেন।

গর্ডন ক্রেগ দেখলেন, তিনি যে ধরণের মঞ্চকলার পক্ষপাতী তার পূর্ণ পরীক্ষা করা লণ্ডনের থিয়েটারে চলবে না। তাই ওয়েষ্ট এণ্ডএর পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে খুললেন তিনি নিজের মঞ্চকলা বিদ্যালয়। তার আগেই ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই "অন দি আর্ট অব্ দি থিয়েটার।" ১৯০৮ সালে বার করেন বিখ্যাত মঞ্চ বিষয়ক পত্রিকা "দি মাস্ক"।

পুরোনো কথা

পৌরাণিক নাটক

নাটক লিখিতে হইলে কতকগুলি চরিত্র লইয়া নাটক লিখিতে হয়। ঐতিহাসিক নাটক ৪ই একখানি হইয়াছে। কৃতবিদ্য অনেক লোক তাহার প্রশংসাও করিয়াছেন। কিন্তু সমালোচকেরা সেস্থানে নিস্তব্ধ। তাঁহারা নিরীহ, ইতিহাস বলিয়া একটা কথা আছে জানেন, তাহার ত কোনো ধার ধারেন না; সুতরাং নিস্তব্ধ ছিলেন। ইতিহাসবিদ কয়েকজন ঐতিহাসিক নাটকের সকল মর্ম্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের বাবসা চলিবে না।

তারপর সামাজিক। দোষগুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ ঘুরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর, বড় জোর নায়কটিকে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কোনসুন্দরীর জেরাতে হটে নাই, গৃহে অন্নহীন দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া তাকাইতি করিয়াছে, এই মাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ,—দুই একটা রেণ্ডা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলাঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে। কেহ বা পত্নীর কুলাঙ্গনা বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে। গুণের কথা: বড় জোর কেহ পিতৃশ্রাদ্ধে কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছে; রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য টাইটেল-আশে রাজাকে চাঁদা দিয়াছে। পৌরাণিক চরিত্র ত্যাগে এই সকল চরিত্র লইয়া অনেকে নাটক লিখিতে বসেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় বড় বড় চরিত্র তাঁহারা 'পলিসিবাজ'। স্বয়ং গোপনে থাকিয়া একজন ১৫৲ টাকা মাহিয়ানার প্রিন্টারকে খাড়া করিয়া, মানহানির কয়েদ-খাটা তাহার উপর দিয়া, কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেটের অত্যাচার বর্ণনা পূর্ব্বক প্রবন্ধ লেখেন। এই সকল উচ্চ চরিত্র অদ্যাবধি রাজদ্বারে সত্য কথা বলিতে কেহ সক্ষম হন নাই।

রত্নাকর

নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য-গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্য, সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্য-শালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

The stage is the mirror of society—রঙ্গমঞ্চ সমাজের দর্পণস্বরূপ, এই প্রবচনকে যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া হয়, তা হ'লে এর নিরিখে আজকের বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একটা মোটামুটি বিচার করলে মন্দ হয় না। বর্তমানে স্টারে অভিনীত হচ্ছে 'সাবী'; মিনার্ভায় 'কল্লোল'; রঙমহলে 'অতএব' এবং বিশ্বরূপায় 'আগো'। যাঁরা এই চারখানি নাটকেরই অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এই চারখানি নাটকেই কোনো-না-কোনো ভাবে প্রতিফলিত। ধনীর ছেলের এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের মধ্যে রেজিস্টার্ড বিবাহের ফলে নাটকীয় সমস্যার উদ্ভব (সাবী) যেমন এক যুগ আগেও দর্শক সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করবার কথা কোনো সাধারণ মঞ্চের মালিক কল্পনাও করতে পারতেন না, তেমনই উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে বিষয়পরায়ণ করবার জন্যে গুণ্ডামুখোশী বাবাকে দিয়ে যে-সব উপায় অবলম্বন করানো হয়েছে (অতএব), তাও আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার দর্শক বিনা প্রতিবাদে শান্তভাবে উপভোগ করতেন ব'লে মনে হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে বাঙালীর জীবনযাত্রার যৌনিক পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে; তার পুরাতন সমাজের

আদর্শ আজ বিলুপ্তপ্রায়। আজ ইব্‌সেনের সমাজের প্রত্যেক প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে তার সমাজের বিভিন্ন স্তরে। প্রথমে প্রেম, পরে বিবাহ তার সমাজে যেমন বিচ্ছেদাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, নরওয়েবাসী আধুনিক ধনীসমাজে বিবাহ বিচ্ছেদও তেমনই অঘটন ব'লে বিবেচিত হচ্ছে না। আজ নরওয়েবাসী দর্শকের সংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সচেতনতাই দায়ী এবং অতএব নাটককে সফল করা সম্ভব হয়েছে।

স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে অনুমান ক'রে স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধার কাহিনী কল্লোল নাটককে আধুনিকত্ব দেয়নি; যা একে মূল্যবান ক'রে তুলেছে, সে হচ্ছে এর মাধ্যমে উচ্চারিত রাজনৈতিক মতবাদ। হ'তে পারে, এটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল বা শ্রেণীর মতবাদ, কিন্তু এই মতবাদ এই বিশেষ যুগেরই মতবাদ এবং এক যুগ আগেও নাটকের মাধ্যমে এই বিশেষ মতবাদ প্রচার করার কথা সম্ভবতঃ কল্পনাতেও করা যেত না। সত্য বটে, বনফুলের 'ত্রিবর্ণ' উপন্যাস থেকে 'আগো' নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু বনফুল যেখানে পূর্ববঙ্গাগত বাঙালীর ছন্নছাড়া জীবন ও পুনর্বাসন সমস্যাকেই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য ক'রে তুলেছেন, 'আগো' নাটক তার বক্তব্যকে এক অতিক্রম ক'রে আরও বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। রাজনৈতিক দাবাখেলায় কুট ইংরাজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়ে ভারতবিভাগ মেনে নেবার পরে শাসকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে কংগ্রেসী সরকার সমাজতান্ত্রিক রেশগঠনের বুলি আউড়ে যে-ভাবে ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করবার পথে এগিয়ে চলেছেন, ঔষধ ও খাদ্যে ভেজাল, চোরাকারবারী, কালোবাজারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে জনমতকে একতাবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছে 'আগো' নাটক এবং বলেছে, সরকার যদি সময় থাকতে সতর্ক না হন, তাহ'লে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট, বিদেশীকৃত জনমতের সমগ্র মানসিকতায় এমন সোচ্চার প্রতিফলন আর কোনো বাঙলা নাটকে ইতিপূর্বে ঘটেছে ব'লে আমাদের জানা নেই। আজ থেকে ত্রিশাধিক বছর আগে নীলচাষীদের দুঃখদুর্দশাকে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর "নীলদর্পণ" নাটকে তুলে ধরেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে বিদ্রোহের ইঙ্গিতমাত্র ছিল না; তা ছাড়া ১৮৭২ সালে জনসাধারণের সামনে সে-নাটক যখন অভিনীত হয়, তখন নীলসমস্যা প্রায় তিরোহিত।

বর্তমানে বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়জীবনে বহুবিধ সমস্যা। নিঃশব্দ বিপ্লবের দ্বারা বাঙলার জনসাধারণ আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার তুলে দিয়েছে যুক্তফ্রন্টের হাতে। বাঙলার জীবনযাত্রার সমস্যা কণ্টকিত সুখদুঃখের ছবিটি এখন আরও সার্থকভাবে প্রতিফলিত দেখতে চাই আমাদের বাঙলা নাটকে।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

যাহা কাগজে লিখিয়াছেন, তাহার খুঁত ধরিয়া মার্জ্জনা চাহিয়া মত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সামাজিক নাটকে ত এই সকল চরিত্র উঠিবে?

যাঁহারা পৌরাণিক নাটকের বিরোধী তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পৌরাণিক চরিত্র কিছুই তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই। যদি দেখিতেন ও বুঝিতে পারিতেন,—যাস্ যাস্কীকি রচিত উচ্চ বা নীচ চরিত্রের বাঙ্গালায় অন্তাবধি তুলনা হইবার সম্ভাবনা নাই, অপর কোন দেশে হইলেও হইতে পারে;—তিনি এই সকল চরিত্র নাটকে লিখিতে বলিবার আর প্রয়াস করিবেন না।

তারপর থিয়েটারে গান হয়। মাইকেল মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী-তে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, বালক দ্বারা স্ত্রী চরিত্র অভিনয় হয়, বালকের গায়ক হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য কৃষ্ণকুমারীর গান সব নেপথ্যে। ভিন্ন ভিন্ন নাটক অনেক তিনি দেখিয়াছিলেন। অনেক ভাষাই তিনি জানিতেন। তথাপি তিনি বাঙ্গালা ভাষার মধুরতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং গানে একান্ত অনুরক্ত। প্রকাশে 'কৃষ্ণকুমারী'তে সে কথা বলিয়াছেন।

বিদেশীয়েরা অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছে; তথাপি,কঠোর বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁর বক্তৃতা যিনি শুনিয়াছেন, তিনি শিখিয়াছেন যে, হিন্দুসঙ্গীতে যেরূপ মাধুরী আছে তাহা আর কুত্রাপি নাই। ফাদার লাফোঁ বোধ করেন যে, হিন্দুসঙ্গীতে বড়ই মাধুরী, খাদি মিষ্টি, একটু নিরুকি নাই। ফাদার লাফোঁ চারি সঙ্গীতবিদের ঐক্যতানিক ধ্রুপদ সঙ্গীত শুনেন নাই। সেই নিমিত্তই তাঁহার এইরূপ ধারণা। ধ্রুপদ গান অনেকেরই পক্ষে শুনা হয় নাই। অস্থায়ী, অন্তরা, আভঙ ও সঞ্চার চারিজনে গীত হইলে তবে ধ্রুপদ গান হয়। তাহার কারণ এই, যে গলায় অস্থায়ী গীত হইবে, সে গলায় অন্তরা ঠিক গীত হইবে না। যেমন গ্রেরিওনেটে যে স্বর বহির্গত হয়, বেহালায় সেরূপ হয় না, তেমনি অস্থায়ী গাওনার গলায় অন্তরা হয়না। আভঙ, সঞ্চারও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গলায় গীত হওয়া উচিত। যিনি এই চারি গলায় অস্থায়ী, অন্তরা, আভঙ, সঞ্চার যেমনি সকিতে ধ্রুপদ সঙ্গীত ধ্রুপদ শুনিয়াছেন তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পক্ষপাতী হইলেও বুঝিবেন যে, ধ্রুপদ (vocal concert) এর মিলিত গলায় গানের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। মিলিত গলায় গানের অর্থাৎ (vocal concert) এর গানের নমুনা সকলেই শুনিয়াছেন। বাড়ীতে ভিক্ষুক আসিয়া গান করে, কতকটা একজন বালক গায়, কতকটা আরী গলায় গীত হয়, কতকটা মিলিত গলায়—গান হইয়া থাকে। আমরা একবার বৈষ্ণব ভিখারীর গান শুনিয়াছিলাম, "কোথা তোর নবীনবা, সেই বিশাখা, কোথায় রে তোর রাইকিশোরী"—বালক গাহিল, বেহালা বাজাইতে বাজাইতে বয়স্ক ভিখারী গাহিল, "কোথা তোর শিখিপুচ্ছ শুভমালা, কোথায় রে হাতের বাঁশরী।" দু'জনে গাহিল, "কার ভাবে ভোরের এসে কাজল বেশে ভোর হ'য়ে বসছ ধরি।" আমরা এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম। যদি কেহ শুনিয়া থাকেন, তিনি আমাদের সহানুভূতি করিবেন।

আমাদের সমালোচকেরা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন, বোঝেন না—অপর ভাষায় গানের নাটকে উপযোগী হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত যে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু সুর রচয়িতার কতদূর হৃদয়হারিণী প্রভাব। ইতালীর আবহাওয়া কতকটা ভারতবর্ষের মত। উচ্চ শিল্পের তথায় যত উন্নতি, বিশেষত সঙ্গীতে—সেরূপ অন্য কোন সভ্য প্রদেশে নাই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের অভিনয়

নব নাট্য গোষ্ঠী

সুশীল মুখোপাধ্যায়
রচিত অগ্নিস্রাক্ষর

নাটকে সাধারণত একটি বক্তব্য থাকে। সে বক্তব্য সামাজিক সমস্যা সম্পর্কেই হোক, বা কোন সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ সংকট অথবা তাৎপর্যযুক্ত ঘটনা সম্পর্কেই হোক। ঘটনা সংস্থাপন এবং চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে দর্শকের সামনে পেশ করেন। নাটক তখনই সার্থক হয় যখন সেই বক্তব্যটি উৎকর্ষ-সম্পন্ন বিন্যাস ও অভিনয়ের দ্বারা দর্শককে প্রভাবিত করে।

অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরে নাটক রচনায় ব্যাপৃত আছেন। অধ্যাপনা ছাড়া নাট্য রচনা তাঁর অন্যতম সাধনা। সেই সাধনায় তাঁর আন্তরিক ও গভীর নিষ্ঠা আমরা অবগত আছি।

বাংলাদেশে যেসব অপেশাদার নাট্যসংস্থা আছে তাদের মধ্যে স্কটিশ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ বিশেষ উল্লেখ এবং স্বীকৃতির দাবী অর্জন করেছে। প্রতি বছর এঁরা একটি করে নতুন নাটকের অভিনয় করেন এবং প্রতি বারই এঁদের অভিনয় উচ্চমানের পর্যায়ে পৌঁছয়। মনে রাখতে হবে, এই পরিষদের অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই স্কটিশ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী (বাইরে থেকে ভাড়াটে নেওয়া হয় না) এবং তাঁরা বছরে ঐ একবারই অভিনয় করেন। নিতান্তই সখের অভিনয়। নাট্যাভিনয় ও নাট্যচর্চায় তাঁদের এই যে অনুরাগ, তাও সবিশেষ অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায় এঁদের অভিনয়ের জন্যেই নাটক রচনা করেন। তাঁর প্রথম নাটক "কাংশন" অভিনীত হয় ১৯৫৮ সালে, তারপর 'নেপথ্যে', 'অনর্থ', 'বাঁধ', 'উদবাস্তিকী', 'তোমার হল শুরু', 'অকস্মাৎ', 'তিন অঙ্ক' এবং 'অব্যর্থ'—এই নাটকগুলি পরবর্তী বছরগুলিতে অভিনীত হয়েছে।

সুশীল মুখোপাধ্যায়ের এ বছরের নাটক 'অগ্নিস্রাক্ষর'। স্কটিশ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ গত ৭ই মার্চ রঙমহলে এই নাটকটি অভিনয় করলেন।

লক্ষ্য করেছি, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের প্রতি নাটকেই একটি বিশেষ বক্তব্য থাকে, তা সে গভীর বিয়োগান্ত রসের নাটকই হোক অথবা হাস্যরসের নাটকই হোক। এক্ষেত্রে জানানো যেতে পারে যে নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায় গভীর রস এবং হাস্যরস দুইজাতের নাটক রচনাতেই তাঁর অসামান্য ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

'অগ্নিস্রাক্ষর' নাটকেও একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। সে বক্তব্যটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এবং যুক্তিতর্ক ও ঘটনাবিন্যাসের মাধ্যমে অতি নিপুণতার সঙ্গে নাট্যকার সেই বক্তব্যকে পেশ করেছেন।

সংক্ষেপে নাটকের কাহিনীটি জানাই। তারই মধ্যে পাঠক বক্তব্যটির সন্ধান পাবেন।

শশাঙ্কশেখর স্কুলের শিক্ষক। আদর্শবাদী কায়নিষ্ঠ এবং যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনের ঘোর বিরোধী। পত্নী উমা স্বামীর আদর্শে নিজের জীবনকে চালিত করেন। ছেলে হাসল কিন্তু বাপের আদর্শের ধার ধারে না। এম এ পরীক্ষায় ফেল হয়ে সে টাকা রোজগারের জন্যে এক বড় ব্যবসায়ীর

সঙ্গে যোগ দিলে। পিতা পুত্রে বিরোধ বাধলো। ছেলে বললে, টাকা ছাড়া দুনিয়ায় বাঁচবার আর কোন রাস্তা নেই। টাকা থাকলেই সব পাওয়া যায়। তার পিতা স্কুল মাস্টার হয়ে সারাজীবন দুঃখ করেই কাটালেন। আদর্শবাদ আজ মূল্যহীন। চাই টাকা। পিতা বললেন, দেশ থেকে জীবনের আদর্শ চলে যাবে, সৎ অসৎ মূল্যবোধ চলে যাবে, দেশে থাকবে শুধু 'বিজনেসম্যান' এ অবস্থা তিনি স্বীকার করে নিতে রাজী নন। মানস চলে গেল বাপের আশ্রয় ছেড়ে। অশ্বিনী ঘোষ কোটীপতি ব্যবসায়ী। তাঁর সুন্দরে পড়ে মানস তাঁর প্রধান সহকারী হয়ে দাঁড়াল। অশ্বিনী নিজের একমাত্র সন্তান কন্যা রমলার সঙ্গে মানসের বিয়ে দিলেন। কিন্তু এ বিবাহ সুখের হল না। মানস ডুবে রইল তার ব্যবসা নিয়ে, টাকা রোজগার করবার নানা ফন্দী ফিকির, ক্লাব আর পার্টি নিয়ে। অশ্বিনী মারা গেলেন। চার বছর কাটল। রমলার একটি ছেলে হয়েছে ইতিমধ্যে। সেই ছেলে কী করে মানুষ হবে সেই চিন্তায় রমলা ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরের কাছে এলো। শ্বশুরের কাছে আবেদন জানালো, তার ছেলেকে মানুষ করতে হবে। শশাঙ্কশেখর নাতিকে কোলে তুলে নিলেন। মানসের এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ আর নাতিকে তিনি গ্রহণ করলেন আর সাদরে বললেন, হ্যাঁ নাতিকে তিনি মানুষের মত মানুষ করবেন। ছেলে মানুষ করাই তো তাঁর আজীবনের ব্রত।

একটি তাৎপর্যময় আবেগপ্রবণ এবং লোভার আদর্শ-ধ্বনির মধ্যে নাটকের যবনিকা নামল।

আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষার বিকৃতি এবং সেই সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে তরুণ মনের আদর্শচ্যুত ধ্যান ধারণা, অভিভাবকের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তি এবং নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে বীতরাগ—অমিতাক্ষর নাটকের প্রধান উপজীব্য। নাট্যকার এর মধ্যে একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এবং তাঁর নাট্য প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলা যেতে পারে। কারণ নাটকটি কোথাও তার নাটকত্ব হারায় নি। অত্যন্ত ঝোরালো সংলাপ এবং সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নাটক অগ্রসর হয়েছে। কুশলী নাট্যকার প্রায় প্রতি দৃশ্যের শেষ মুহূর্তে নাট্যচমকের সৃষ্টি ক'রে দর্শকের আগ্রহকে জাগিয়ে রেখেছেন।

দর্শকবৃন্দকে আকৃষ্ট করবার জন্য চরিত্রগুলির যথাযথ অভিনয়ের যে দর্ত, তা অভিনয়-শিল্পীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং পারদর্শিতার সঙ্গে পূরণ করেছেন। এই সব অভিনেতৃরা নিয়মিত অভিনয় করেন না। বছরে একবারই অভিনয় করবার সুযোগ তাঁদের অধিকাংশেরই। কিন্তু প্রতি বছরই দেখছি এবং এবারও দেখলাম, তাঁদের অভিনয়ের উচ্চমান সমভাবে বজায় রয়েছে।

আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতীরূপে নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায় অনবদ্য প্রাণচালা অভিনয় ক'রে দর্শকদের অভিভূত করেছেন, বিশেষ করে নাটকের উপসংহারে তাঁর অভিব্যক্তি অতুলনীয় বলতেও দ্বিধা নেই। তাঁর সমাহিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি যে বলিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন তা সকলেরই মনে রেখাপাত করেছে।

বিপরীত আদর্শে অনুপ্রাণিত মানসের অভিনয়ে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন। শেষের দিকে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বটিও তাঁর অভিনয়ে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত।

ধনপতি ব্যবসায়ী অশ্বিনী ঘোষের ভূমিকায় রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় নাট্যকারের চরিত্র সৃষ্টির প্রতি যথোচিত সুবিচার করেছেন।

খলচরিত্র বিকাশের অভিনয়ে প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে চরিত্রটিকে উদ্ঘাটিত করেছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় দেবেশ রূপে বিমল গুপ্ত, রবিনরূপে অমর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশরূপে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, হরেশরূপে রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হোটেলওলা রূপে মলিনী ঘোষাল এবং সেই সঙ্গে বীরেন বসু ছুটি ছোট ভূমিকায় সুঅভিনয়ের দ্বারা সমগ্র নাটকটিকে হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য করে তুলেছেন।

স্ত্রীভূমিকায় সবচেয়ে দর্শকচিত্তকে স্পর্শ করেছেন মানসের মা ও শশাঙ্কশেখরের স্ত্রীরূপে ভূষারিকা চক্রবর্তী। উমার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় মনে রাখার মত।

অমিনীর কন্যা রমলার ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তী এবং শশাঙ্কর বন্ধুকন্যা মীরার ভূমিকায় আশা দাস তাঁদের সংবেদনশীল অভিনয়ের দ্বারা নাটকটির মধ্যে প্রাণের স্পর্শ রেখেছেন।

সুমিত্রা ঘোষ ও মীরা নিজের কণ্ঠে রেখেছে রবীন্দ্র সংগীত ছুটি সুশ্রাব্য।

পরিচালনার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং নাট্যকারের। যে দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন।

অমিতাক্ষর নাটক, তার অভিনয় ও পরিচালনা—এই ত্রিবিধ কর্মকৃতির জন্য সুশীল মুখোপাধ্যায় অকুণ্ঠ অভিনন্দন পাবার যোগ্য!

• • •

"নাটকের প্রাণ পরিস্ফুট হয় তার অভিনয়ে। এবং সেই অভিনয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সুতরাং অভিনয় শিল্পীদের দায়িত্ব সহজ নয়।"

গত মাসের নানা অভিনয়

অনামী নাট্যসংস্থা গত ১০ই মার্চ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নীলোৎপল দে রচিত ও পরিচালিত 'পিপাসা' নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন। সমাজ জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার কাহিনী থেকে উপাদান আহরণ করে নাটকখানি গড়ে তোলা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই নাট্যসৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে।

অনামীর শিল্পীবৃন্দের সংযত অভিনয়ে নাটকটি দর্শক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। বিশু চট্টোপাধ্যায় সুরজিৎ, সিপ্রা সাহা রমানী ও সন্ধ্যা গোস্বামী পাগলা মামার চরিত্র রূপায়ণে সাফল্য লাভ করেছেন। ডাঃ বিমল ঘোষালের মত একটি প্রধান চরিত্র রূপায়ণে পরিচালক নীলোৎপল দের শিল্পনৈপুণ্য সকলের প্রশংসা লাভ করে। রেবতী রায়, রতন নারায়ণ ঘটক, শ্যামু রায়, ও আশীষ মিত্রের অভিনয় চরিত্রানুগ হয়েছে। দুটি কৌতুক চরিত্রের অভিনয়ে সুধাংশু চক্রবর্তী ও জীবনবন্ধু সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মন্টু গোস্বামী, দুলাল ঘটক, অরুন মুখোপাধ্যায় ও সেবাশীষ প্রামানিকের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। মঞ্চ ও আলোকসজ্জা উল্লেখযোগ্য।

প্রতিভার ছদ্মরাগ

নাটকটি রচনা করেছেন দেবব্রত রেজ এবং পরিচালনায় ছিলেন বিমল রায়।

নাটকের বক্তব্যে নতুনত্বের স্বাদ আছে। সমিতির গবেষক অতুলবাবুর স্ত্রী বিয়োগের পর ছাত্রী চন্দ্রা মাষ্টার মশাইয়ের ভেঙে পড়া জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করে। কিন্তু অতুলবাবুর ছেলে দেবেশ ছিল চন্দ্রার সমপাঠী এবং উভয়ের মধ্যে ছিল না-বলা প্রেম। সংবাদ অবশ্যম্ভাবী। মানসিক অশান্তিতে সবাই বিপর্যস্ত। ইতিমধ্যে দেবেশ চন্দ্রাকে গ্রহণ করতে চাইলো অন্য এক সম্পর্কে। আহত চন্দ্রা নতুন জীবনের সন্ধানে পাড়ি জমায়। এখানেই যবনিকা। কাহিনী বিন্যাসের দুর্বলতায় কিন্তু নাট্যকারের সব প্রচেষ্টা ভেস্তে গেছে। মাঝে মাঝেই নাটকের বক্তব্য অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কয়েকটি চরিত্র অহেতুক।

তবু এই নাট্য প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। পরিচালনায় বিমল রায়ের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

অভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায়, বংশীপ্রসাদ বসু, নগেন হালদার, দেবকুমার চক্রবর্তী ও জ্যোৎস্না ঘোষ।

আমরা সবাই

'আমরা সবাই' কর্তৃক নীরেন সেন রচিত 'আজব শহর কলকাতা' নামে একাঙ্ক নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীদিলীপ কুমার ঠাকুরতা। অভিনয়ে সকলেই নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

নানা প্রসঙ্গ

শিল্পীদলের সাফল্য

শিল্পীদলের মুক্তধারা অভিনয় সম্পর্কে গত সংখ্যায় আলোচনা হয়েছে। পাঠকবর্গ শুনে আনন্দিত হবেন ওঁদের অভিনয় স্বীকৃতিলাভ করেছে। বিরেটার সেন্টার আয়োজিত সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায় অভিনীত শিল্পীদল-এর প্রচেষ্টা প্রতিযোগিতার বিচারকদের মতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি বলে বিবেচিত

হয়েছে এবং শিল্পীদল এই স্বীকৃতির স্মারক হিসাবে নগদ পাঁচশো টাকা এবং প্রশংসাপত্র লাভ করেছেন। স্বনামধন্য সুরকার শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের ৭০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য থিয়েটার সেন্টার হিন্দী হাইস্কুলে সম্প্রতি যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেই সভায় উক্ত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় কুড়িটি নাট্যসংস্থা ২৫০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার লাভ করেন। যেসব নাটক পুরস্কৃত হয় তাদের নাম: মুক্তধারা, কেদার রায়, আনন্দ মঠ, পথের দাবী, রাণাপ্রতাপ, সৈনিক পতাকা ও সৈনিক। শেষোক্ত নাটকটি অভিনয়ের জন্যে কম পক্ষে দশ বারোটি সংস্থা পুরস্কার পেয়েছেন।

গিরিশ জন্মোৎসব

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বলরাম মন্দিরে গিরিশ সংসদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় সভাপতি এবং নট ও নাট্যকার শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উত্তর কলিকাতায় গিরিশ নাট্য সংসদ মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি যথাযথভাবে রক্ষার জন্য অব্যাহত ভাবে নাট্য চর্চা ও নাটকের প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করছেন, এই কথা উল্লেখ করে সংসদের সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি আরও বলেন যে বাগবাজারে মহাকবির বাসভবনটি বর্ধিত কলিকাতা পৌরসভার পরিচালনাধীনে রয়েছে তবুও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বৎসরে একদিন স্মৃতি সভা ছাড়া অন্য আর কিছুই হয় না। যদি পৌরসভা সংসদের উপর ভবনের নীচের কক্ষগুলি ছেড়ে দেন তবে সারা বৎসর ব্যাপী গিরিশ সাহিত্য আলোচনা, নাট্যচর্চা ও গিরিশ নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রধান অতিথি শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত গিরিশ চন্দ্রের সম্বন্ধে স্বরচিত একটি কাল্পনিক কাহিনী পাঠ করেন। মহাকবি গিরিশচন্দ্র যদি এ যুগে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তিনি বর্তমান রঙ্গশালাগুলি ও অভিনয় দেখে কি ভাবতেন তারই একটি সুন্দর চিত্র তিনি এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন। পরে অন্য নাটকের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীমন্মথ রায় বলেন যে আজ সর্বদিকে নানা সঙ্কট দেখা দিয়েছে, নাট্যকার শিল্পী পরিচালক ও রঙ্গশালা সকলেই সঙ্কটের সম্মুখীন, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই সঙ্কটের যুগে মহাকবির মত অনন্যসাধারণ প্রতিভাধরের আশীর্বাদ অবশ্যই প্রয়োজন। মহাকবির জীবনব্যাপী নাট্য সাধনার কথা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত করে তিনি প্রার্থনা করেন যে দেশবাসী যেন আবার গিরিশচন্দ্রের রচনা পাঠে উদ্দীপ্ত ও অভিনয়ে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

শ্রীমতী অমিয়া দত্ত, শ্রীঅমীর ঘোষাল, শ্রীচিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীসরজিৎ গোস্বামী গিরিশ চন্দ্রের সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং শ্রীবীরেন চক্রবর্তী ও শ্রীমতী সুজাতা পাঠক পাণ্ডব গৌরব নাটকের একটি দৃশ্য আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আশ্রমাচার্য শ্রীনীরদবরণ।

অভিনেত্রীর জীবন

শার্লি ম্যাকলেইন

হলিউডের রূপসী অভিনেত্রী শার্লি ম্যাকলেইনের জীবন যেন এক রূপকথা। কোরাস দলের সামান্য গায়িকা রূপে জীবন শুরু ক'রে আজ তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত অভিনেত্রী। শার্লির বয়েস এখন মাত্র ৩২, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি যে খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও অর্থ উপার্জন করেছেন তা যে কোনো দেশের যে কোনো প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীরই ঈর্ষার উদ্রেক করবে। "গায়বিট" ছায়াছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছেন ৮০০,০০০ ডলার। এ-ছাড়া, প্রেক্ষাগৃহে যতগুলি টিকিট বিক্রি হয়েছে তা থেকেও অতিরিক্ত অর্থ পেয়েছেন। তাঁর পরবর্তী ছবি "সুয়ার্ট লার্ড" থেকে তিনি আগের ছবির পরিশ্রমিকেরও দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পাবেন।

তবু শার্লি প্রায়ই ব'লে থাকেন যে তিনি অভিনয় করেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করেন বিমানের টিকিট কেনার অর্থ সংগ্রহের জন্য। জগৎটাকে দেখতে চান দু চোখ ভ'রে। নিয়মমাফিক স্টুডিয়োতে গিয়ে রোজ রোজ কাজ করা তাঁর পক্ষে অসহ্য। একঘেয়ে, বাঁধিক জীবন শার্লি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেন না। চাই নতুন দৃশ্য, নতুন দিগন্ত।

শার্লি ম্যাকলেইন বিবাহিতা। তাঁর কন্যা এখন কিশোরী। কিন্তু স্বামী স্টেভ পার্কার মেয়েকে নিয়ে থাকেন শার্লির কাছ থেকে ৮০০০ মাইল দূরে। টোকিয়োতে। প্রতি সপ্তাহে একবার তিনি ওই দূরত্ব অতিক্রম ক'রে বিমানে যান স্বামী ও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। একবার একটা বিপর্যয়

ঘটেছিলো। একবার জাপানে পৌঁছে দেখলেন একটু আগে স্বামী টোকিয়ো থেকে চ'লে গেছেন। আবার চাপলেন বিমানে। সেবার এতক্ষণ বিমানে ছিলেন যে বারটি শুক্র কি শনি তা-ও ভুলে গিয়েছিলেন।

শুধু রূপ কিংবা অভিনয় ক্ষমতাই শার্লির জনপ্রিয়তার কারণ নয়। পারিবারিক জীবন, কিংবা নিজের সত্তার প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ মনোভাবই তাঁকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে।

শার্লির চরিত্রে এক অসাধারণ দুঃসাহসিকতা সচরাচর যা মেয়েদের চরিত্রে দেখা যায় না। ভূটানের বিদ্রোহীরা তাঁর প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিলো। দক্ষিণ আমেরিকার উগ্র জাতি বিদ্বেষে অন্ধ খেতাঙ্গরা তাঁর জীবন বিপন্ন ক'রে তুলেছিলো। পুলিশ তাঁকে বিতাড়িত করে। মার্কিনী গোয়েন্দারা বহুদিন তাঁর উপরে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। শার্লির অভিজ্ঞতার পরিধি ব্যাপ্ত, এমন কি অনেক পুরুষের চাইতেও বেশি। আফ্রিকার বুনো জাতি মাসাইদের দলে মিশে তিনি পশু শিকার করেছেন। আবার কেনসিংটন প্রাসাদে গিয়ে লর্ড স্নোডন-এর সঙ্গে চড়েছেন গাছে।

শার্লি ম্যাকলেইনের আরেকটি বড়োগুণ আছে, যা খুব কম অভিনেত্রীর চরিত্রেই দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী। অহংকারের ধার ধরেন না। তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন না যে অভিনেতা অভিনেত্রী মানেই স্বর্গের দেব-দেবী।

শার্লি ম্যাকলেইনের জন্ম আমেরিয়ার রিচমণ্ড-এ। মানে তিনি দক্ষিণী। মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল পিতার কন্যা তিনি। বাড়িতে নিগ্রো ভৃত্য ছিলো। কিন্তু বড়ো হয়ে শার্লি নিগ্রোদের অধিকারের স্বপক্ষে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই জন্য তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর নিগ্রো-বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতেন ব'লে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইতে হয়েছে তাঁর তো ইয়ত্তাই নেই।

শার্লি ম্যাকলেইনের চিন্তা কর্ম কেবলমাত্র রুপালি পর্দায় সীমিত থাকে নি, তাঁর জীবন শুধু অভিনয়েই নিঃশেষিত হয় নি, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি আন্তরিক শরিক। তাই তিনি শ্রদ্ধেয়া। নিছক অভিনেত্রী হ'লে এত মর্যাদা তিনি হয়তো পেতেন না। শার্লি ম্যাকলেইনের জীবন মহত্ত্বের দ্বারা চিহ্নিত, আর তাই অসাধারণ।

ছায়া চিত্রের কাহিনী

রাজ

পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবির এক বিশাল প্রাসাদ। হঠাৎ এক আর্ত চিৎকার তার স্তব্ধতা ভঙ্গ করলো। চিৎকার ক'রে উঠেছে ওই প্রাসাদেরই মালিক কুমার। কুমার বয়সে তরুণ। সে ভারতীয়। প্রতি রাতেই তার ঘুম ভেঙে যায় তিনটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। বেদনার্ত এক রূপসী তরুণী করুণ সুরে গান করে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক জনমানবহীন রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের নাম পর্যন্ত পড়া যায়। স্টেশনটার নাম বীরান নগর। আর দেখা যায় শাদা মার্বেল পাথরের বেদীর উপরে শায়িত অবস্থায় কুমারেরই নিজের মৃতদেহ। কুমার আর্তনাদ ক'রে ওঠে। তার ঘুম ভেঙে যায়।

বীরান নগরে কখনো বাস করা তো দূরের কথা, কুমার কখনো তারতবর্ষেই আজ পর্যন্ত যায়নি। কিন্তু রাতের পর রাত ওই একই স্বপ্ন দেখে শেষ পর্যন্ত সে স্থির ক'রে ফেলে স্বপ্ন রহস্যের সমাধান সে করবেই করবে। সে ভারতবর্ষে যাবে, যাবে বীরান নগরে। এই অতিপ্রাকৃত স্বপ্নের মানে সে খুঁজে বার করবেই। তার জন্য যদি প্রাণ যায় তো যাক। অন্তরঙ্গ বন্ধু রফীকে নিয়ে এক রাতে কুমার এসে পৌঁছালো বীরান নগরে।

ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমেই তো কুমার অবাক। হুবহু এই স্টেশনটাই তো সে দেখেছে স্বপ্নের ভিতরে। রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে উঠলো যখন সে দেখলো বীরান নগরের বাসিন্দারা সকলেই তাকে চেনে এবং সে ফিরে আসাতে তারা কেউ সন্তুষ্ট নয়। তার ফিরে আসাতে আনন্দিত হয়েছে শুধু ওই অঞ্চলের অধিকার কন্যা স্বপ্না। রাজা সরকার নাম তখন অনুপস্থিত। কয়েক দিনের জন্য তিনি গ্রামের বাইরে গেছেন। যাকে সে রাতের পর রাত স্বপ্নে দেখেছে কুমার সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে স্বপ্না সেই রূপসী তরুণী। যে গানের মধ্য দিয়ে সে কুমারকে স্বাগতম জানালো এই করুণ গান শুনেই তো সে জেগে রয়েছে রাতের পর রাত।

একদিন একজন লোক কুমারকে নিয়ে গেল সমাধির কাছে। বললো কুমারের মৃতদেহ এখানেই একদিন সমাহিত করা হয়েছিলো। শুনে কুমার তো স্তম্ভিত। কাহিনীর শেষ অংশ দেখা যাবে রূপালী পর্দায়।

নট-নটী

রূপালি পর্দায় আশা পারেখের আবির্ভাব নর্তকী রূপে। ছবির নাম 'আশা'। ওই ছবির পরিচালক তাঁর অভিনয়ে মোটেই সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাঁকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মবিশ্বাস ছিলো আশার। ঘরে না গিয়ে সে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করলো 'দিল দেকে দেখো' ছবিতে। সত্যি সে দিল দিয়ে অভিনয় করেছিলো এই ছায়াছবিটিতে। তার জীবনের মোড় ঘুরে গেলো। এখন তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা।

রোমান্টিক কাহিনীর নায়িকা রূপে আশাকে দেখতেই দর্শকেরা অভ্যস্ত। কিন্তু আশা মনে করে ট্রাজেডীর নায়িকা রূপে অভিনয় করলেও সে সমান সাফল্য অর্জন করতে পারবে। 'সুইট হার্ট' নামে নতুন একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য আশা চুক্তিবদ্ধ। রূপালি পর্দায় অভিনয় ক'রে খ্যাতি অর্জন করলেও মঞ্চে অভিনয় ক'রেই আশা বেশি আনন্দ পায়; কারণ সেখানে দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রত্যক্ষ: তাদের চোখের সামনেই অভিনয় করতে হয়। আশা স্থির করেছে বিয়ের পর আর সে অভিনয় করবে না, কারণ তাতে সাংসারিক জীবনের শান্তি ভঙ্গ হতে পারে।

• • •

বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ কাপুরের ছেলে শশী কাপুর। বিখ্যাত পিতার পুত্র হওয়ার যাতনা যে কী তা শশী হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলো। স্কুলে পড়ার সময় অন্য ছেলেরা তার সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে চাইতো না। পৃথ্বী থিয়েটারে যখন সে অভিনয় জীবন শুরু করে তখন ওর বাবা ছিলেন ওই থিয়েটারের কর্তা। অন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের চাইতে তাকে বেশি পরিশ্রম করতে হতো। তখন ওর মাসিক

বেতন ছিলো মাত্র পঁচিশ টাকা। এমন কি ১৯৬০ সালেও ওর মাসিক বেতন ছিলো ২৫০ টাকা। বাবা যে অত অভিনেতাদের থেকে ওকে বতন্ত্র করে দেখেননি তাতে ওর ভালোই হয়েছে। শশী নিজে তা মনে করে। তখন অনেক রাতে মঞ্চের উপরেই তাকে ঘুমুতে হতো। আর প্রায় সমস্ত তারত ঘুরেছে লরীতে চ'ড়ে। যাই হোক, আজ আর তার পরিচয় শুধু পৃথ্বীরাজ কাপুরের ছেলে কিংবা রাজ বা শাম্মী কাপুরের ভাই হিসেবে নয়। শশী কাপুর আজ নিজেই একটি নাম।

• • •

ছায়াবাণী সংবাদ

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' অবলম্বনে ছবি তৈরী ক'রে রাতারাতি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। শ্রীরায় আবার বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসকে চিত্ররূপ দেবেন ব'লে স্থির করেছেন। এই উপন্যাসটির নাম 'অশনি সংকেত।' শক্তিমান ঔপন্যাসিকের এক অসাধারণ রচনা। কাহিনীর পটভূমি দুর্ভিক্ষ। শিশুদের জন্য শ্রীরায় বর্তমানে একটি ছবি তুলছেন: সোণী গায়েন বাঘা বায়েন। তাঁর একটি ছবি প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। ছবির নাম 'চিড়িয়াখানা'। ছবিটিতে উত্তম কুমার অভিনয় করেছেন।

• • •

বি. এম. ডি. মুভীর প্রথম নিবেদন: 'জীবন মৃত্যু।' প্রেমঘন রহস্য চিত্র। ডাক্তার বিশ্বনাথ রাও রচিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ছবিতে অভিনয় করেছেন উত্তম কুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন কমল মিত্র, তরুণ কুমার, সুব্রত চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, দীপক মুখার্জি, অমর মল্লিক, মিহির ভট্টাচার্য, প্রশান্ত কুমার, মন্টু ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ধ্রুপদী ছায়াচিত্র

ফল অব ব্যাবিলন (৩ রিল)।

ছায়াচিত্রটি নির্মিত হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। আজ পর্যন্ত এত দীর্ঘ ও বৃহত্তম ছায়াছবি মার্কিন মুলুকে আর তৈরী হয়নি। প্রাচীন ব্যাবিলনের বিচিত্র দৃশ্য, আশ্চর্য সব যুদ্ধের দৃশ্য, প্রাচীন কালের নর-নারীর জীবনযাত্রা ও আচার ব্যবহারের নানা বাস্তব চিত্রের সমন্বয়ে 'ফল অব ব্যাবিলন' আমেরিকার ছায়াছবির ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কনস্টান্স টালমেজ, সীনা ওয়েন, এলমো লিঙ্কন, আলফ্রেড পাসেট, এলমের ক্রিফটন এবং ওয়ালেস রেইড।

অরফ্যান্স অব দি স্টর্ম (৩ রিল)।

এই ছায়াছবিটি নির্মিত হয় ১৯২২ সালে। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত। রহস্য রোমাঞ্চ প্রেম ও করুণ রসের সমন্বয় ঘটেছে এর কাহিনীতে। ওই বছরের বৃহত্তম ছায়াছবি। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন লিলিয়ান ও ডরোথী গিশ, মর্টে ব্লে এবং জোসেফ চিলডক্রট। ছবিটির পরিচালক ছিলেন ডি. ডব্লু. গ্রিফিথ। ছবিতে অভিনয় করেই অভিনেত্রী লিলিয়ান অনমানস অর্জন করেছিলেন।

দেহকে লাবণ্যময় করে তুলুন

আভা পাকড়াশী

বাড়ী তৈরী করতে গেলে যেমন ভিত পত্তনের প্রয়োজন শরীর সুস্থ আর যৌবনশ্রী অটুট রাখতে গেলে আমাদের দেহেও ঠিক তেমনি মজবুত ভিত গঠনে সচেষ্ট হতে হবে।

গত সংখ্যার আলোচনায় মোটামুটি দেখা গেল যে সেকালের মহিলাদের স্বাস্থ্য একালের চেয়ে কেন ভাল থাকত। অবশ্য এর প্রথম উত্তরই হবে ভাল খাও। কিন্তু ভালো খাও বললেই তো হল না! এই অগ্নিমূল্যের দিনে ভাল খাবার কিনব কোথা থেকে? আর ভালো খাবার পাবো কোথায়? সব জিনিসেই তো ভেজাল। তবে? এই তবের উত্তরে বলব যা পাওয়া যায় তাই বা আমরা খাই কোথায়। আমরা কজন গৃহিনী জানি যে কিসে কি পরিমাণ ক্যালরী রয়েছে? অথচ আমরা ওদেশী ধাঁচের আধুনিকা, মিয়া বিবিতে থাকি, দুজনে মিলে অফিসে যাই, কবির কথায় 'দুলিয়ে বেণী চলেন যিনি'।

এই আধুনিক বিনোদিনী কিন্তু আমাদের অবস্থা হল ঘরেও নহে পরেও নহে, সেকালের ওঁরা যা জানতেন তাও আমরা জানি না, আর জানলেও সনাতনী বলে সরিয়ে রাখি আর ওদেশের এঁরা যা জানেন তাও আমরা শেখবার চেষ্টা করি না। কিন্তু ওদেশ এদেশ মিলিয়ে যদি শরীর চর্চা আর খাদ্য খাওয়ার একটা নিয়ম করে ফেলা যায় তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। প্রথমতঃ সুস্থ থাকতে হবে তাহলেই সৌন্দর্য আপনি বজায় থাকবে। কেননা স্বাস্থ্যই হল সৌন্দর্য। যারা রোগা তাঁদের জন্য খাবার ও ব্যায়ামের চার্ট :—সকালে খালি পেটে দুটি বাদাম বেটে চায়ে চামচ চিনি মিশে সরবৎ করে খান। তারপর খোলা হাওয়ায় বেড়ান। সম্ভব হলে বেশ কিছুটা হেঁটে বেড়িয়ে আসুন। তাও যদি না করে উঠতে পারেন তাহলে (১) জানলা বা দরজার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ান। পা জোড়া থাকবে। দুই হাত কোমরে দিন। এবার বড় করে নিঃশ্বাস নিন সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালি উঁচু করে শুধু পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়ান আবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পুরো পা ফেলুন। দশবার করে এটি করুন। এতে নির্মল বায়ু ভেতরে গিয়ে সমস্ত দূষিত বায়ু ফুসফুস থেকে বার করে

দেবে আর দেহ কোষ ভরে উঠে বুকের গঠন ভাল করবে। শুধু সন্তানের খাদ্যই নয়, দুধই শুনে নারীত্বেরও বিকাশ হয়। যে কোন দেবী মূর্তির দিকে তাকালেই সেই কবি কালিদাসের ক্ষীণ কটি শ্রোণীভারনতার উপমা চোখে পড়ে নাকি?

(২) এবার দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ান দুই হাত সোজা উপরে তুলুন ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসের তালে তালে হাত নামান আর ওঠান এতে হাত দুটি নিটোল হবে। দশবার করুন।

(৩) পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ পায়চারী করুন নিতম্ব ভরে উঠবে।

এবার দৈনন্দিন নিত্য কর্ম শুরু করুন।

জলখাবার—গম ভুটিয়ে দালিয়া তৈরী করে রাখুন। গম আগেই শুকনো খোলায় ভেজে নেবেন। এবার দালিয়া সেদ্ধ করে দুধ চিনি দিয়ে খান। সহজ না হলে দালিয়ার সোনতা মিচুড়ি করুন। নয়তো পরিজ খান। আলে সেদ্ধ করে আগেই দুধ দিয়ে খাবেন। সঙ্গে চা বা সম্ভব হলে ডিম খাবেন। নাহলে গরম রুটিতে ঘি মাখিয়ে আলু বা ছাতা আলুর তরকারি দিয়ে খান। একটু বেলায় একবার ঘি দিয়ে একটু ভাত আর আলুভাতে খান। নয়তো একটু ফল। কিম্বা মুগের ডাল ভিজে আর মিছরি।

দুপুরে ছোলা বা মুসুর ডাল। আলু, বাঁধাকপি, কুমড়ো এই সবের তরকারি, শাক ভাত। মাছ, মাংস, কিম্বা ডিম। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ অবশ্য ঘুমোবেন। ঘুম থেকে উঠে জল খান। প্রচুর জল খাবেন। শরীরের ভেতর ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবার বিকেলে পারেন তো বেড়িয়ে আসুন। যারা বিশেষ রোগা তাঁরা হয়তো ভাবেন একেই আমি রোগা আবার এর ওপর হাঁটলে তো আরোই রোগা হয়ে যাব। কিন্তু এই ধারণা ভুল। ব্যায়াম প্রত্যেকের জন্যই প্রয়োজনীয়। হাঁটলে খিদে হবে। যেটুকু খাবেন তাতেই পুষ্টি হবে।

রাত্রে ভাত বা রুটি একটু মাখন বা ঘি একটু তরকারি, সম্ভব হলে মাছ মাংস খাবেন নাহলে দুধ দিয়ে রুটি বা ভাত খান একটি কলা খান এসঙ্গে। খেতেও ভাল লাগবে কোষ্ঠও পরিষ্কার থাকবে। চাপা অম্বলেও অপুষ্টি আসে। সুতরাং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। রাত্রের খাবার একটু তাড়াতাড়ি খাবেন। খেয়েই শুয়ে পড়বেন না।

যেসব মহিলারা বাইরে কাজে যান তাঁরাও এই নিয়ম অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া করুন। তবে এঁরা দুপুরে যেমন হাল্কা খাবারে টিফিন সারবেন তেমনি রাত্রে পেট ভরে খাবেন। আর ভাল করে ঘুমোবেন। সর্ব রোগ হরে নিদ্রা। সুনিদ্রা সমস্ত রোগের ঔষধ। ভাল ঘুম হলেই শরীরে পুষ্টি আসবে দেখবেন। তখন আর নিজের হাড় বের করা রোগা চেহারা দেখে বিষন্ন হবার প্রয়োজন হবে না।

আরও দুটি প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখি, তেল ঘি বা মাখন খেলেই যে গায়ে তাড়াতাড়ি গদি লাগে তা নয় বেশ ভাল করে জলে জলে তেল মাখলেও শরীর ভরে ওঠে। এইভাবে তেল মাখার ফলে প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নাড়া পড়ে, তারা সক্রিয় হয় আর তার সঙ্গে আপনার দেহটিকেও পরিপুষ্ট মাংসল সাবণ্যের আধার করে তুলবে। নিজের শরীরের পরিবর্তনে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাবেন। চিলে পোষাক পরে ব্যায়াম করা উচিত। সবচেয়ে ভাল লেজালিনীর সেমিজ পরুন। আর সকালে যদি অফিস যাবার তাড়ায় ব্যায়াম করার সময় না থাকে আপনার সুবিধে মত সময় বেছে নেবেন। স্নানের আগে ব্যায়াম করুন। তবে খালি পেট থাকা চাই।

আহারের ব্যাপারেও খুব অত্যাচারী হবেন। সহজে হুপাচ্য খাবার খাবেন। অতিরিক্ত ঝাল মশলা খাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। সুস্থ থাকলেই যে হুপাচ্য হয় তাতো নয়। নৈমিত্তিক খাবারের সঙ্গে কিছুটা কাঁচা সবজি খান। একেবারে সাহেবী কেতায় স্যালাড্ নাই বা হল, মূলা, শেয়াজ, সাদা টম্যাটো যখন যা পাওয়া যাবে কেটে নিন। আর সবুজ শাক। যে কোন শাক হোক নিশ্চয়ই খাবেন। একেবারে পেটভরে না খেয়ে বারে বারে খাবেন।

সংসার যেমন আপনার মুখাপেক্ষী তেমনি আপনার দেহও আপনার মুখাপেক্ষী। নিজে সুস্থ সুন্দর থাকলে যেমন নিজের আনন্দ তেমনি অন্যেও আপনার সংস্পর্শে এসে আনন্দিত হবে। স্বাস্থ্য ভাল রাখার আর একটি মূল্য সোপান হল মন। অযথা রাগ করা বা উত্তেজিত হওয়া, সামান্য কারণে অনেকক্ষণ মন খারাপ করে থাকা এতেও যৌবন শ্রী নষ্ট হয়। প্রত্যেক সংসারেই একটা না একটা অশান্তি থাকেই। তা ছাড়া অভাব অনটন তো আছেই। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য মানুষের কর্ম নেই। আপনি মনশক্ত করে চেষ্টা করে যাবেন। দুশ্চিন্তার শেকড় মনের মধ্যে বসতে দেবেন না। দেখবেন কাজে উৎসাহ পাবেন, উদ্যম হারাবেন না। নিজেও বিরক্ত থাকবেন না অন্যকেও তিক্তকরে তুলবেন না। অল্পে সন্তুষ্ট আর প্রফুল্ল থাকলে অপরের মুখেও ত প্রশান্তির ছবি ফুটে উঠে মুখখানি লাবণ্যময় করে রাখবে। হাসি হাসি মুখটি রোগা না কালো সেটি বিচারের আগে আপনার নির্মল হাসি দিয়েই আপনি অন্যের মনকে জয় করে নেবেন। এইভাবে সৌন্দর্যকে স্থায়ী করুন। এর পরে যাঁরা মোটা তাঁদের জন্য কিছু নির্দেশ দেবার ইচ্ছে রইল।

ভঙ্গী শুধু ভঙ্গীই নয়

পুতুল রায়

মেয়েদের শুধু ভঙ্গীমা—এ নিয়ে কত কাব্য, কত কবিতা! দর্শনভঙ্গির সৌন্দর্য বা মেয়েলি-কথায় আল্‌না-শ্রী মেয়েদের রূপ-চর্চার একটা প্রধান অঙ্গ। প্রসাধন এই সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস আজকাল মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

কিন্তু শুধু প্রসাধনে কেন,—ভঙ্গীর গুণেও সাধারণ একটি মেয়েকে অনেক সুন্দর দেখায়।

দেহের গঠনে এমন অনেক মেয়ে চোখে পড়ে—যারা দেখতে শুনতে মোটেই মন্দ নয়, অথচ তাদের এমন কতকগুলি ভঙ্গীর অভাব বা কদর্য-ভঙ্গী আছে যার জন্যে তাদের কুৎসিত দেখায়।

হাত, পা, মুখ, চোখ খুব সুন্দর না হয় সকলের না হলো, মোটামুটি যেগুলি সাধারণ মেয়েদের অসুন্দর নয় সর্বক্ষেত্রে;—কিন্তু তবু কেন অনেককে অসুন্দর দেখায়?

তার কারণ, আমাদের বিশেষ করে মেয়েদের অনেকেরই দেহ-ভঙ্গী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই। দেহ-ভঙ্গীর ওপরই দেহের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

দেহের ভঙ্গীতে শুধু আপনাকে দেখায় ভালো, তাই নয়। দেহের ভঙ্গী স্বাস্থ্যেরও অপরিহার্য অঙ্গ। দেহের ভঙ্গী থেকে মানসিক বিকাশও বাড়ে। তাই আপনার আমার,—আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই দেহের ভঙ্গী যাতে সুষ্ঠু ও সুঠাম হয়,—সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

দেহের ভঙ্গী সম্পর্কে আমাদের কিছু সাধারণ জ্ঞান থাকলে আমাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য

বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। বিশেষ করে মায়েদের এ-গুলি জানা উচিত যাতে তাঁরা সন্তান প্রতিপালনে গোড়া থেকেই এদিকে সযত্ন দৃষ্টি দিতে পারেন।

ধরুন না কেন, শিশুকাল থেকেই অনেকের অভ্যাস কোমর বেঁকিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো, শোবার সময় হাত-পা গুটিয়ে মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা। এ-গুলি শিশুকাল থেকে বয়োবৃদ্ধির কাল পর্যন্ত আমাদের সংস্কার বা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আর এইসব দুষ্ট অঙ্গ ভঙ্গীর ফলে আমরা যে শুধু দর্শনেই কুৎসিত হই, তা নয়, স্বাস্থ্যের দিক থেকেও এর জন্যে অনেক রকম বিপর্যয় ঘটে। এতে আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধা পায় এবং গুহ্যাভ্যন্তরস্থিত অংশ-বিশেষগুলি কতকটা স্থানভ্রষ্ট ও ক্রমশঃ বিকল হয়ে যেতে পারে।

সুষ্ঠু দেহ ভঙ্গী আয়ত্ত করতে হলে প্রথমেই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার হৃদয়-শক্তিকে বাড়ানো। তাই কঠিন পরিশ্রম আর সহজ সরল ব্যায়ামে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করুন। আর ব্যক্ত-উপাদান দ্বারা পেশীগুলির গঠন ও চলাচল পরিচালনার অভ্যাস আয়ত্ত করুন। কেননা, চলাফেরা প্রভৃতি জীবনের অপরিহার্য কাজগুলি নির্ভুল পেশী-চালনার অভ্যাসের ওপরই নির্ভর করে।

ছেলেবেলা থেকেই এই অভ্যাসগুলি আমাদের আয়ত্ত করা দরকার। মায়েদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত যাতে শিশু সন্তানেরা এই বদ-অভ্যাসের দাস না হয়ে পড়ে।

মাথাকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চলাফেরা করায় বদ-অভ্যাস অনেকের মধ্যেই সংক্রামিত। মাথা সামনের দিকে বাড়িয়ে বা বুক সংকুচিত করার ফলে পেশী ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায় আর পেশীর নমনীয়তাও লোপ পায়।

তাতে শুধু যে দাঁড়ানোর ভঙ্গীই কদর্য হয়, তা নয়, দেহের পরিপুষ্টি বিশেষ করে মেয়েদের বুকের শোভাও ব্যাহত হতে থাকে।

সুষ্ঠু ভঙ্গী আয়ত্ত করতে হলে অস্থি-সন্ধি (joints) বা গ্রন্থিগুলি যাতে নমনীয় থাকে তার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নমনীয়তা সুঠাম দেহের একটা প্রধান লক্ষণ। হাঁটু সোজা রেখে দুইহাতের দ্বারা পায়ের বুড়োআঙুল ছোঁওয়ার সহজ সরল ব্যায়াম নিয়মিতভাবে চর্চা করা প্রত্যেক দেহের পক্ষেই ভালো। এতে সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে অঙ্গদেশের পেশীগুলি নমনীয় হয়। তাতে চলাফেরা, দৌড়ানো প্রভৃতি কাজগুলিকে আরও হাল্কা, সহজ এবং স্বাভাবিক করে আনা যায়।

সামান্য শারীরিক ব্যায়াম দেহের দৃষ্টিভঙ্গীগুলি দূর করে। দেহের নমনীয়তা বাড়ায়। সন্ধি-বিধিকে সরেস ও স্বাচ্ছন্দময় করে তোলে। এতে দেহের সমতা দেখা দেয় আর চলাফেরা ইত্যাদিতে ছন্দশ্রীকে ফুটিয়ে তোলে। আপনার ব্যক্তিত্ব এবং আত্ম বিশ্বাসও দৃঢ়তর হয়।

দেহভঙ্গী আপনাকে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে এবং স্বাস্থ্যে নিশ্চয়ই কমনীয় করে তুলতে সাহায্য করতে সক্ষম।

বসা, দাঁড়ানো, চলা-ফেরা করা, এমন কি ঘাড়-বেঁকানোর মধ্যেও আপনার সৌন্দর্য সুষমা বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই, ভঙ্গী শুধু ভঙ্গীই নয় তা সৌন্দর্য, শ্রী, এবং মাধুর্যের প্রতীক।

ষড়যন্ত্র পণ্ড

গৌরীশংকর দে

১৮৬০ সাল। এব্রাহাম লিঙ্কন সবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে তাঁর জয়লাভের খবর পেয়ে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি তো রেগে আগুন।

মেরীল্যাণ্ডের বালটিমোর শহরের একটা হোটেল। দু'জন লোক উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিলো। ঘরে আরো অনেকে উপস্থিত। প্রত্যেকেরই হাতে ছুরা।

প্রথম ব্যক্তি বলছিলো: "লিঙ্কনের দল তো উত্তর অঞ্চলের স্বার্থ-রক্ষাতেই ব্যস্ত। দক্ষিণ অঞ্চল যদি ইউনিয়নে থাকে তবে এই অঞ্চলের আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো: "এর উচিত জবাব ইউনিয়ন ত্যাগ করা। কিন্তু তাতে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা।"

—"যাক করবেন, মার্চ মাসে লিঙ্কন যদি শপথ গ্রহণের সুযোগই না পেতেন, তবে আমেরিকার ইতিহাসই পাল্টে যেতো।"

—"আপনার কথার মানে বুঝতে পারছিনা!"

—"মানে খুবই স্পষ্ট। আমাকে যদিস্থ দেওয়া হলে লিঙ্কনকে খুন করতুম আর মেরীল্যাণ্ডের রেলপথগুলি উড়িয়ে দিতুম। তাহলে ইয়াঙ্কিগুলির কোনো প্রেসিডেন্টও থাকতো না, ওদের রাজধানী থেকে মেরীল্যাণ্ডে পৌঁছাবার রেলপথও থাকতো না। তখন আমরা ওদের পেতুম একেবারে হাতের মুঠোয়। আর এর জন্য মাত্র একজন লোকের, মানে লিঙ্কনের, রক্তপাতই যথেষ্ট ছিলো।"

প্রথম বক্তা চ'লে যাওয়ার পর আরেকজন লোক দ্বিতীয় বক্তার কাছে এসে বললো:

"লোকটা একটু রসচটা বটে কিন্তু যা বললো তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লোকটি কে বলুন তো?"

—"এই হোটেলের মালিক। নাম কেরানডিনা। বালেটিমোরের লোকের সমর্থন পেলে সে বোধহয় মুখে যা বলেছে তা করে ছাড়তো না।"

কয়েক সপ্তাহ পরে। এক ভদ্রলোক এলেন কেরানডিনার সেলুনে চুল কাটাতে। বিরাট ধনী। তার খামারে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস খাটে। কেরানডিনা তার চুল কাটছিলো। হঠাৎ ধনী লোকটি ব'লে উঠলো: "আজ রাত নটার সময় আমার বাড়িতে একবার আসবে? নিজন বিষয়ে যারা তোমার মতই পোষণ করেন এমন জন কয়েক বিশিষ্ট নাগরিক ওই সময়ে আমার বাড়িতে থাকবেন।"

কেরানডিনা বললো: "নিশ্চয়ই যাবো। এতো খুবই আনন্দের কথা।"

রাত নটা বেজে কয়েক মিনিট। ধনী ভদ্রলোকের ড্রয়িং রুমে একটা বড়ো গোল টেবিল ঘিরে বিশিষ্ট নাগরিকেরা বসে আছেন। একটা চেয়ারে কেরানডিনা।

নাগরিকদের পক্ষ থেকে এক ভদ্রলোক ব'লে ওঠলেন: "মিষ্টার কেরানডিনা, আমাদের তো সরাসরি কাজে নামবার উপায় নেই। তাই আপনার উপরে আমরা নির্ভর করছি। আপনার পেছনে আমাদের নৈতিক সমর্থন তো রইলোই, তা ছাড়া যত অর্থ আপনার লাগে তা আমরা দেবো।"

উত্তরে কেরানডিনা বললো: 'আপনারা আমার উপরে এই গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেছেন। আমি সাধ্যমতো এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবো।'

১৮৬১ সালের জানুয়ারী। কেরানডিনা দল গঠনে ব্যস্ত। প্রথমে সে তাদের নিজন হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা ঘুণাক্ষরেও জানালো না। মেরীল্যাণ্ডের রেলপথ উড়িয়ে দিলেই কাজ হতে এ কথাই ওরা জানতে পেলো। ওরা বললো: "কয়েক মাইল রেলপথ নষ্ট করলে আর গোটা কয়েক লোহ সেতু পোড়ালেই যদি উত্তর অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চলের দাবী মেনে নেয় তাহলে আমরা আপনার সঙ্গে আছি।"

রেলপথের একজন কর্মী ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে খবর দিলো রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে।

রেলের একজন বড় কর্তা খবরটা শুনে বড়ো ভাবনায় প'ড়ে গেলেন: "তাই তো, রেলপথ বাঁচাবার জন্য কী করা যায়?"

কর্মচারীটি বললো: "এক কাজ করুন না? শিকাগো শহরে অ্যাবান লিঙ্কারটন এর কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠান। তাঁকে আসতে বলুন। উনি এখন এ দেশের সব চাইতে বড়ো গোয়েন্দা।"

লিঙ্কারটন স্কটল্যাণ্ডের লোক। ১৮৫০ সালে আমেরিকাতে একটি গোয়েন্দা-সংস্থা স্থাপন করেছেন। এই ধরণের সংস্থা ও দেশে তখন একটি কি দু'টি হয়েছে।

রেলের কর্তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র তাঁর প্রধান গোয়েন্দাদের নিয়ে লিঙ্কারটন রওনা দিলেন বালটিমোরের দিকে।

বালটিমোরে গিয়ে ভাড়া করলেন একটা বাড়ি ওটাই হবে তাঁর সদর দপ্তর। ই. জে. অ্যালেন নামে নিজের পরিচয় দিলেন।

অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা ডেভিসকে ডেকে পিঙ্কারটন বললেন: 'ডেভিস, দক্ষিণ অঞ্চলে তুমি তো বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছো। তাহলে ক'রেই জানো এই এলাকার লোকেরা কী রকম ইউনিয়ন বিরোধী। নিশ্চয়ই তাদের সংগঠনও রয়েছে। আমি চাই ওরকম একটা সংগঠনের ভিতরে ঢুকে প'ড়ে তুমি গোয়েন্দাগিরি করো।'

—'তাই করবো। এখন থেকে আমার নাম হবে জো হোয়ার্ড। কেউ জিগেস করলে বলবো লুইসিয়ানা থেকে এসেছি।'

—'চমৎকার হবে। বাল্টিমোর হোটেলের বার-এ নাকি এখানকার মাতব্বর ব্যক্তিরা রোজই ভিড় করেন। ওখানেই আগে ভিড়ে যাও।'

পিঙ্কারটনের অন্য গোয়েন্দারা মিশে গেলো ফিলাডেলফিয়া, উইলমিংটন এবং বাল্টিমোরের রেল-শ্রমিকদের ভিতরে। যারা এখনো ইউনিয়নের সমর্থক তাদের খুঁজে-বার করতে হবে।

একজন কর্মী জানালো: 'কেরানস্কিনা নামে একজন লোক আমাকে জিগেস করেছে যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সেতু গোড়াতে রাজী ছিলো। আমি জবাবে বলেছি পৃথিবীর সমস্ত অর্থ যদি আমার হাতে তুলে দে'য়া হয় তবু আমি রাজী নই।'

ডেভিস ছদ্ম নামে নিজের পরিচয় দিয়ে বাল্টিমোর হোটেলের বার-এ রোজ কয়েক ঘন্টা ক'রে কাটাতে লাগলো। একদিন একজন লোক এসে বললো: 'আমার নাম হিল। আপনি তো বাল্টিমোর শহরে নতুন এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি এখানে অনকোয়া নতুন। আমার নাম জো হোয়ার্ড। এসেছি লুইসিয়ানা থেকে।'

—'লুইসিয়ানা! ব্যাটন রুজ-এর ফ্রেড হোয়ার্ড পরিবারের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

—'দেখা-সাক্ষাৎ কখনো হয় না, তবে ওরা নিশ্চয়ই আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হবে। ওখানকার হোয়ার্ড উপাধিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো না কোনো আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে।'

হিল-এর সঙ্গে ডেভিসের বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠলো। কয়েকদিন পরে দেখা হতেই হিল ব'লে ওঠলো: 'ওহো, জো, গত সোমবার তোমাকে একটা কথা জিগেস করতে ভুলে গেছি। তোমার সমর্থন কার দিকে, উত্তর না দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে?'

হিল-এর প্রশ্নোত্তরে ডেভিস কপট ক্রোধের ভাণ করলো: 'উত্তর? আমি জন্মেছি, মানুষ হয়েছি দক্ষিণে। মৃত্যু পর্যন্ত দক্ষিণেরই লোক থাকবো।'

হিল একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো: 'অপরাধ নিয়োনা জো। তুমি যে আমারই মতো ভাবো তা অনুমান করেছিলুম বলেই ও-কথা জিগেস করেছি। এসো ওই টেবিলটাতে বসি। তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা আছে।'

ফিলাডেলফিয়া, উইলমিংটন এবং বাল্টিমোর-এর রেলপথ ধ্বংসের পরিকল্পনাটি হিল ডেভিসকে বিস্তারিত ভাবে খুলে বললো। বললো: 'আমাদের নেতা এই হোটেলের মালিক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হবেন আমাদের সকলের পূজনীয় বীর। আমি তাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে চাই।'

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে হিল ডেভিসকে আরো অনেক গোপন সংবাদ জানালো।

'গত রাতে আমাদের একটা বৈঠক বসেছিলো। এই মাসে লিঙ্কন বাল্টিমোরে আসবেন, বক্তৃতা দেবেন। কেরানডিনার ইচ্ছা সেই সময়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার।'

ডেভিসের কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পিঙ্কারটন এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেলেন। পিঙ্কারটনের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। বললেন: 'পুলিশের কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য পাবার আশা নেই। এখানকার মার্শাল নিজেই উত্তর অঞ্চলকে ঘৃণা করেন। ডেভিস, আর একটুও দেরী না করে তোমাকে ভিড়ে যেতে হবে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে।'

ডেভিস হিলকে জানালো সেও ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চায়। হিল আবার তাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলো কেরানডিনার সঙ্গে। কেরানডিনা বললো: "মিঃ হিল-এর কাছ থেকে আপনার কথা আমি আগেই শুনেছি। দক্ষিণ অঞ্চলের মর্যাদা রক্ষার জন্য আপনার মতো নির্ভীক লোকেরই আমাদের প্রয়োজন।'

ডেভিস বললো: 'মিস্টার কেরানডিনা, আমাকে যে কাজের ভার দেবেন তা-ই হাসি মুখে পালন করবো।'

কয়েকদিন পরে এক সভায় ডেভিস ষড়যন্ত্রকারীদের এক সভায় উপস্থিত হলো। কেরানডিনা ঘোষণা করলো: 'আজ রাতে আমরা স্থির করবো প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকে কে হত্যা করবে।'

কেরানডিনা ছোট একটা বাক্স হাতে তুলে নিয়ে বললো: 'এই বাক্সে উনত্রিশটি ছোট শাদা বল আর একটি লাল বল আছে। বাক্স থেকে আমরা প্রত্যেকে একটা ক'রে বল তুলে নেবো। কারো হাতে লাল বল উঠে এলে কাউকে তা জানাবেন না, কারণ তার উপরেই পড়েছে লিঙ্কন হত্যার ভার।'

ডেভিসের কানের কাছে মুখ এনে হিল বললো: 'বাক্সে একটা নয়, আটটা লাল বল আছে। হত্যার পরিকল্পনা যাতে কোনোরকমে ব্যর্থ না হয় তার জন্যই কেরানডিনার এই ব্যবস্থা।'

ঘরের আলো স্তিমিত করা হলো। বাক্স থেকে প্রত্যেকে তুলে নিলো একটা ক'রে বল। ডেভিস দেখলো সে যে বলটা পেয়েছে তা শাদা। দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লিঙ্কন এসে পৌঁছালেন ফিলাডেলফিয়াতে। বাল্টিমোর থেকে ফিলাডেলফিয়ার দূরত্ব এক শ মাইলেরও কম। পিঙ্কারটন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর প্রাণনাশের যে চক্রান্ত চলেছে সে কথা জানালেন। শুনে লিঙ্কন বললেন: 'মিস্টার পিঙ্কারটন, আপনি যে সব নথিপত্র সংগ্রহ করেছেন তার প্রমাণ অকাট্য। আমি নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবো।'

লিঙ্কনের ট্রেন যে সেতুর উপর দিয়ে যাবার কথা তুলকায় ক'রে তা আগাগোড়া শাদা ক'রে রাখলো রেল-শ্রমিকেরা। পিঙ্কারটনের গোয়েন্দাদের তত্ত্বাবধানে ষড়যন্ত্রকারীরা আগুন লাগালেও সেতুটা আর পুড়ে যাবে না।

২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা। পেনসিলভানিয়ার হ্যারিসবার্গে লিঙ্কন গেছেন বক্তৃতা করতে। কিন্তু তিনি কয়েক মিনিট পরেই জানালেন তাঁর ভীষণ মাথা ধরেছে। সভা শুরু হওয়ার একটু পরেই লিঙ্কন বিদায় নিলেন। রওনা দিলেন ফিলাডেলফিয়ার দিকে। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো ওয়াশিংটন এক্সপ্রেস।

হ্যারিসবার্গ এবং বাল্টিমোরের মধ্যেকার টেলিগ্রাফের তার পিঙ্কারটন কেটে দিয়েছিলেন। তাই লিঙ্কনের গতিবিধি সম্পর্কে কোনো খবর পাঠাবার উপায় ষড়যন্ত্রকারীদের রইলো না।

ফিলাডেলফিয়াতে পৌঁছে লিঙ্কন উঠলেন ওয়াশিংটন এক্সপ্রেসের শেষ স্লিপিং কার-এ। তার সঙ্গে উঠলেন মিলেস কেট ওয়ার্ন নামে একজন নার্স। আসলে সে পিঙ্কারটনেরই নিযুক্ত একজন গুপ্তচর। ফিলাডেলফিয়া স্টেশনে পিঙ্কারটন নিজে উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ভোরে লিঙ্কন নিরাপদে পৌঁছলেন ওয়াশিংটন স্টেশনে।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াতে ষড়যন্ত্রকারীরা মেরীল্যাণ্ড ছাড়ে ক'রে চ'লে গেলো। যাবার সময় একজন জিগেস করলো: 'আচ্ছা, সেই যে লুইসিয়ানা থেকে এসেছিলো সেই জো হোয়ার্ড-এর খবর কি?'

দ্বিতীয় ষোড়সওয়ার জবাব দিলো: 'আজ দুপুর বেলায়ওতো তাকে দেখেছি। সে বলেছে জার্সিয়াতে গিয়ে আবার সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।'

জো হোয়ার্ড—মানে হ্যারী ডেভিস—কিন্তু তার কথা রাখেনি। তবে ষড়যন্ত্রকারীদেরও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। সময়টা যে ছিলো গোলমেলে।

বড়োদিনের আলাপ

মূল : রোজমেরী টিমপারলি

অনুবাদ : সুপর্ণ রায়

এর আগে কখনো বড়োদিন একা কাটাইনি। আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে একা বসে থাকলেই আমার গা ছমছম করে। মগজে ভিড় করে যত রাজ্যের ভূত-প্রেত। ঘর ভরে যেন অতীতের কণ্ঠস্বর। স্মৃতির অতলে ডুবে যেতে হয় আচমকা। দ্রুত গতিতে কাছে ছুটে আসে অতীতের সবগুলি উৎসব মুখর বড়োদিন। মনে আসে ছেলেবেলার বড়োদিন : বাড়ি সরগরম করছে আত্মীয়-স্বজনদের ভিড়ে, জানালায় ঝলমল করছে পাইন গাছ। মনে পড়ে কিশোরী জীবনের বড়োদিন : মা-বাবা, মহাযুদ্ধ, প্রচণ্ড শীত, যুদ্ধক্ষেত্রের চিঠি। যৌবন কালের বড়োদিন—তখন প্রেম এসেছে জীবনে—ভরছে ডুবার, সমস্ত পৃথিবী যুঁড়ি কুহকের দীপ, রক্তিম সুরা আর রক্ত ওষ্ঠের চুম্বন, গভীর রাতে অন্ধকারে পায়চারী, মাঠ-ঘাট ঢাকা পড়েছে তুষারের শ্বেত আবরণে কালো আকাশে হিরের টুকরোর মতো ঝিকমিক করছে তারা—এক সাথে মিছিল ক'রে আসছে এমনি কত বড়োদিনের উৎসব।

কিন্তু এ বছর বড়োদিন যাপন করছি একাকী।

কিন্তু সত্যি কি একেবারে একা? অতীত ও বর্তমানের যে-সব হাজার হাজার মানুষ বড়োদিন একা কাটাচ্ছে আমি কি তাদের একজন নই? চোখ বুজলেই তো অতীত আর ভবিষ্যৎ সব হয়ে যাবে একাকার রইবে শুধু অন্তহীন বর্তমান যার অন্য নাম সময়। আমাদের হাতে তো তা-ই আছে।

তবু, যতই নাস্তিক হওয়া যাক না কেন, বড়োদিন একা কাটানো সত্যি অস্বস্তিকর।

কাজেই, যুবকটি যখন ঘরে এসে ঢুকলো স্মৃতির নিঃশ্বাস ফেললুম। রোম্যান্টিক ব্যাপার ট্যাপার কিছু নয়। আমি পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়া। খুলের কুমারী শিক্ষিকা। চুল আমার কালো। চোখ এক সময়ে সুন্দরই ছিলো! সেই সৌন্দর্য এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগন্তুক যুবকের বয়েস হবে কুড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ একটু নিরস ছাড়া। ওয়াইন কালার টাই। গায়ে কালো ভেলভেটের জ্যাকেট। মাথার অতিরিক্ত লম্বা বাদামী চুল নাপিতের কাঁচির জন্য হাহাকার করছে। মুখে কিন্তু অন্তর্ভেদী চোখ। নাক এবং চিবুক উন্নত। দেখে মনে হয় না দেহে শক্তি আছে। গায়ের রং অতিরিক্ত সাদা।

দরজায় কোনো টোকা না দিয়েই যুবক ঢুকে পড়েছে ঘরে। ঢুকে পড়েই কিন্তু বললো : "দুঃখিত। ভেবেছিলুম এটা আমার ঘর।" যুবকটি বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু থেমে গিয়ে বললো : "আপনি কি একা?"

'হ্যাঁ।'

"বড়োদিন একা কাটাতে ভীষণ অস্বস্তি লাগে, তা'ই না? আমি একটু বসতে পারি? আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি?"

"এতো খুবই আনন্দের কথা।" মুখ ফিরে বসলো আগুনের দিকে।

যুবকটি বোঝাবার চেষ্টা করলো: "আমি কোনো মতলব নিয়ে এখানে আসিনি। ভেবেছিলুম এটা আমার ঘর।"

"খুব ক'রে ভালোই করেছেন। কিন্তু আপনার তরুণ বয়স, এ-বয়সে তো কেউ একা বড়োদিন কাটায় না।"

"আমার পরিবারের লোকেরা থাকে গ্রামে। কাজের ক্ষতি হবে এই ভয়ে তাদের কাছে যাইনি। আমি একজন সাহিত্যিক।"

"ও"। যুবকের কথা শুনে মনে মনে একটু হাসলুম। এই জন্যই এ-রকম অদ্ভুত পোষাক। ছেলেটা বড্ড বেশি সিরিয়াস।

বললুম: "তাই তো! সাহিত্য রচনার অমূল্য সময় নষ্ট করা আপনার পক্ষে তো একেবারেই উচিত হবে না।"

"এক মুহূর্তও নষ্ট করা ঠিক নয়। আমার বাড়ির লোকেরা এ-কথাটা একেবারেই বুঝতে চায় না। আমার সময় যে কত দামী তা তারা একেবারেই বোঝে না।"

কোন শিল্পীর বাড়ির লোকেরাই বা কবে ওঁর কদর দিয়েছে?"

যুবক গম্ভীর মুখে সায় দিয়ে বললো: "ঠিক কথা।"

"আপনি কী লিখছেন?"

"কাব্য ও ডায়েরীর একটা মিশ্রণ বলতে পারেন। নাম দিয়েছি 'আমার কাব্য এবং আমি', লেখক জ্যালেস রাওেল। ওই নামটা আমার। আমার বাড়ির লোকেরা বলে লেখা-টেকা সব বাজে ব্যাপার। আমার যে অল্প বয়স তাতে না কি ভালো লেখা সম্ভব নয়। আমার কিন্তু নিজেকে মোটেই যুবক মনে হয় না। মাঝে-মাঝে মনে হয় আমি বুড়ো হয়ে গেছি। মনে হয় খুব শীগগিরই ম'রে যাবো, তার আগে তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করতে হবে।"

"তার মানে আরো বেশি ক'রে লেখা তো।"

"হ্যাঁ! ঠিক বলেছেন! আপনার বেশ বোধ আছে। একদিন আমার লেখা আপনি নিশ্চয়ই পড়বেন। মন্ত্র ক'রে আমার লেখা পড়বেন। পড়বেন তো!" যুবকের গলার স্বরে ফুটে উঠলো ব্যগ্রতা, দু'চোখে ভয়।

"আজ উৎসবের দিন, তবু আমরা দুজনেই বড্ড বেশি সিরিয়াস হয়ে পড়েছি। বসুন কফি বানিয়ে আনি। ঘরে কেকও আছে।"

টুং টাং শব্দে ঘর ভরিয়ে, কফির জল চাপিয়ে এসে দেখি ছেলেটি চ'লে গেছে। আমার কথায় হয়তো অসন্তুষ্ট হয়েছিলো। মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

তবু কফি তৈরী করলুম। তারপর তাকালুম ঘরের বুক-শেলফটার দিকে। বহু বই সেখানে তুপাকার ক'রে রাখা। বাড়ি-ওয়ালী তার জন্য একদিন দুঃখ ক'রে ব'লে গেছেন: "এই ঘরে যই-

গুলো বেচেছি ব'লে কিছু মনে করছেন না তো? আমার স্বামী কিছুতেই এই বইগুলি নষ্ট করতে রাজী নন। অথচ এই ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যে রাখবো এমন জায়গাও নেই। সেই জন্যই তো খানিকটা কম ভাড়ায় আপনাকে ঘরখানা দিয়েছি।"

বলেছিলুম: "ঠিক আছে। বই তো বন্ধু।"

বইগুলোর চেহারা দেখে কিন্তু আদৌ বন্ধু ব'লে মনে হয় না। হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলে নিলুম। বোধ হয় কোনো অদৃশ্য নির্দেশ কাজ করেছিলো।

কফির কাপে চুমুক দিতে-দিতে, সিগ্রেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ছোট সাইজের ছেঁড়া একখানা বই খুলে দেখি তার প্রকাশনার কাল ১৮৫২। কাব্য ও ডায়েরীর মিশ্রণ। অপরিণত বয়সের রচনা, তবে বেশ সজীব।

দেখলুম বই খানির এক জায়গায় পেন্সে লেখা রয়েছে: "বড়োদিন একা কাটাচ্ছি। অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হলো। খানিকক্ষণ পায়চারী করার পর ফিরে এসে দেখি আমার ঘরে এক মধ্য-বয়সী ভদ্রমহিলা। প্রথমে ভাবলুম ভুল ক'রে অন্য কারো ঘরে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু দেখলুম তা নয়। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ বেশ জমে উঠেছিলো—হঠাৎ দেখি তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। ভদ্রমহিলা বোধহয় ভূত। আমি কিন্তু ভয় পাইনি। ওঁকে আমার ভালো লেগেছিলো। কিন্তু আজ রাতটা কীরকম অস্বস্তিকর লাগছে। ভালো লাগছে না। বড়োদিনের সময় আর কখনো নিজেকে এ-রকম অসুখ লাগেনি।"

লেখাটা যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই রয়েছে প্রকাশকের মন্তব্য: ১৮৫১ সালের বড়োদিনের রাত্রিবেলা ফ্রান্সিস রাওল হঠাৎ জ্বর-রোগে মারা গেছেন। ডায়েরীতে যে ভদ্রমহিলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তিনিই ফ্রান্সিসকে শেষের জীবিতাবস্থায় দেখেছেন। ফ্রান্সিস মহিলাটিকে বারবার কাছে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মহিলা এগিয়ে যান নি। মহিলা যে কে আজো তা জানা যায় নি।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

গুজবের ব্যাপার কতই চলছে পৃথিবীময়। তার মধ্যে একটি বিশেষ খবর হচ্ছে ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সম্পর্কে! তিনি কবেই মরে সোপাট হয়ে গেছেন। লোকে তাঁকে প্রায় ভুলেই গেছে, কিন্তু লেখকরা তাঁকে ভোলেন নি। এখনো তাঁর হাঁড়ির খবর টেনে বার করছেন। মানুষের মরেও শান্তি নেই!

আর্থার মার্ব নামে এক ইংরেজ লেখক সম্প্রতি ভিক্টোরিয়ার জীবন সম্বন্ধে এক বই লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন, মহারাণীর একজন প্রেমিক ছিলেন, যার কথা জনসাধারণ কোনদিন জানতে পারেনি। এই প্রেমিকের নাম জন ব্রাউন। তিনি ছিলেন, মহারাণীর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসীর পশুপালক।

স্বামীর মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়া প্রায়ই তাঁর স্কটল্যাণ্ডের প্রাসাদ ব্যালমোরাল দুর্গে গিয়ে মাসের পর মাস অতিবাহিত করতেন এবং সেইখানে তাঁর সর্ব সময়ের সঙ্গী ছিলেন এই জন ব্রাউন। উভয়ের মধ্যে নাকি প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হয়।

বুঝুন এখন! ভাবছি, রাণী এলিজাবেথ তাঁর অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহীর জীবনের এই নতুন কেচ্ছা শুনে কি মনে করছেন।

• • •

বিয়ে হয়। বরকনে একসঙ্গে অনেকদিন ঘর করলাও করে। কিন্তু বিয়ে হবার দিন থেকে একশো বছর পরে তারা দু'জনে বেঁচে থেকে দিব্যি বহাল তবিয়তে তাদের শততম বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে—এমন ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটেছে বলে জানা ছিল না।

কিন্তু সত্যি ঘটনা। রাশিয়ার অন্তর্গত আজার বাইজানের এক দম্পতি সম্প্রতি তাঁদের শততম বিবাহ-বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। খবর জানাচ্ছেন তাস্ খবরওলা।

বরের নাম বাদাকিদি গুরুভেডি, বয়স বর্তমানে ১৩০। কনের নাম আদিনা, বয়স বর্তমানে ১১৯।

• • •

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী অবশ্যই লেখক। সাধারণতঃ লোকে যা ভাল বলে, ভাল মনে করে, তিনি তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে তাদের নস্যাৎ করে দেন, প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়েন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি বই লিখলেন—"কুহকিনীর দেশ"! সেই বই-এ তিনি ভারতবর্ষের কেচ্ছা গাইলেন, আর বলা বাহুল্য, সেই বই পড়ে পশ্চিমের লোকেরা তাঁকে খুবই বাহবা দিলে।

এবার তিনি এক বাংলা সাপ্তাহিকে চীন যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখেছেন। এবং সেই কারণ-বিশ্লেষণে তিনি ভারতীয় নেতা আর সমরনায়কদের মুণ্ডপাত করেছেন। তা করেছেন করুন, কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ তিনি জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীকে টেনে এনে তাঁর সম্বন্ধে যা-তা সব মন্তব্য করলেন। জেনারেল চৌধুরী কর্মে নিযুক্ত থাকবার সময় স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতারূপে লিখে যোরতর অন্যায় করেছিলেন, সরকারের অজ্ঞাতে ছদ্মনামে অনেকদিন ধরে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর এভাবে লেখা দেশদ্রোহিতার সামিল, জেনারেল কল (আনটোল্ড স্টোরির সুখ্যাত লেখক) যা মন্তব্য করেছেন তা খুবই যথার্থ, কারণ জেনারেল চৌধুরী তাঁর কোন উত্তর দিতে পারেন নি, সরকারকে না জানিয়ে বা সরকারের অনুমতি না নিয়ে তাঁর এভাবে ওই সব সামরিক প্রবন্ধ সম্বলিত বই বার করা অত্যন্ত রীতিবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নীরদ চৌধুরী মশায়ের অনুরাগী পাঠকরা বললে, দেখ একবার নীরদ চৌধুরীর কলমের জোর, হুঁ, হুঁ, জেনারেল চৌধুরী কাৎ!

আশ্চর্য কিন্তু জেনারেল চৌধুরীর ব্যবহার আর সংযম। জেনারেল কলের বইএ তাঁর প্রতি কটাক্ষ সম্পর্কে অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করলে। জবাবে তিনি শুধু বললেন, তাই নাকি। বইটা আমি পড়িনি, পড়ার ইচ্ছেও নেই। তা, কেউ যদি লেখে, আমি তো তার কলম কেড়ে নিতে পারি না।

নীরদ চৌধুরী যখন তাঁকে আক্রমণ করে লিখলেন, তখনো তিনি তেমনি নির্বিকার।

তার পরেই হঠাৎ দেখা গেল, নীরদ চৌধুরী নাকখৎ দিচ্ছেন অর্থাৎ লেখার মাধ্যমে নিজের উগরেদেলা কথা নিজেই আবার গিলে ফেলছেন। কেমন করে যে এহেন প্রগুণ লেখককে এতখানি অপ্রস্তুত হতে হল সে গুহ্য তথ্য আমরা জানি না। আমরা শুধু তাঁর কবলমুক্তিটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তা থেকে পাঠকরা বাকিটুকু অনুমান করে নিতে পারবেন। যে সাপ্তাহিকে তাঁর রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল সেই পত্রিকাতেই তাঁর নিম্নলিখিত কানমলা খাওয়া লেখাটি বেরিয়েছে :—

"আমি চীন যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম কিস্তিতে জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। তাহাতে খানিকটা নিন্দার ভাব ছিল। আমি পরে সংবাদ লইয়া জানিয়াছি যে জেনারেল চৌধুরী কোন অবস্থাতেই রীতি বিরুদ্ধ কাজ করেন নাই।

প্রথমত, তিনি স্টেটস্‌ম্যানের সামরিক সংবাদদাতা হইবার সময় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়াছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কিছু জানিতেন না, আমার একথা অমূলক। দ্বিতীয়ত তিনি তাঁহার বইও লিখিত অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তৃতীয়ত, তিনি জেনারেল কলের বই সম্পর্কে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের রাজপুরুষ হইয়া কিছু বলিতে পারেন না।

সুতরাং আমার নিন্দাসূচক ইঙ্গিত সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিতেছি।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী।"

হায়! হায়! এযে একেবারে বিটার সোমরে একাকার হয়ে গেলেন নীরদ চন্দ্র চৌধুরী।

• • •

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ সহায় বিভিন্ন বিরোধী দলগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন, তাঁদের অবস্থা সাড়ে বারো ভাজার মত, তাঁরা এক হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাড়ে বারো ভাজাই থেকে যাবেন।

আমরা বলি, সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তা, সাড়ে বারোই হোক বা সাড়ে বত্রিশই হোক, সেই ভাজা কিন্তু কম মুখরোচক নয়। তারা যখন এক হোয়ে মিশে মশলা সংযোগে ঠোঙা থেকে খরিদ্দারের হাতে পড়ে, তখন খরিদ্দারেরা খুশীই হয়। সুতরাং সেই সাড়ে বত্রিশ ভাজা তার কাজ হাসিল করে। অর্থাৎ মানুষকে আনন্দ দেয়।

অতএব আমাদের দেশের বিরোধী দলগুলি যদি তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে জনসাধারণকে খুশী করতে পারেন তাঁদের কাজের ধারায়, তার চেয়ে আর কি সার্থকতা থাকতে পারে। তাহলে জনসাধারণ সেই সাড়ে বারো বা সাড়ে বত্রিশকেই মাথায় করে রাখবে; হে গোবিন্দ, আপনি আমাদের সহায় হোন বলে তাদের আর অরণ্যে রোদন করতে হবে না।

• • •

তিনি আছেন টেলিফোনযোগে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। সত্যি-সত্যিই বলছে। বলছে ড্যানকুভার শহরে। দু' জায়গায় দুটি অপারেটর। একটি ড্যানকুভারে, অন্যটি সিয়াটোলে। ড্যানকুভারে আছে একটি রাঙ্গুসে তিমি। সিয়াটোলে দুটি। ড্যানকুভার অকুয়ারিয়ামের মালিক টেড গ্রিফিন সম্প্রতি তিমিদের মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা করেন। ড্যানকুভারের তিমিটির নাম ওয়ালটার। টেলিফোনটি মুখে লাগিয়ে দেওয়ামাত্র ওয়ালটার চিঁচি করতে সুরু করে। অপরদিকের তিমি দুটি কিন্তু চিঁচিঁর জবাবে মহা হাঁক ডাক সুরু করে দেয়। খানিক পরে তারা ধাতস্থ হয়। তারপর দুই তরফে অনর্গল বাৎচিৎ শুরু হয়ে যায়। সেই সব আলাপ টেপরেকর্ড করা হয়েছে। গবেষণা করে বার করা হবে তারা কি বলেছে।

কি বলেছে তা আমরা জানি! পৃথিবীর মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে তারা নানা অশ্রাব্য উক্তি করেছে, এমন সব উক্তি যা কোনদিন প্রকাশ করা যাবেনা।

• • •

হায়দরাবাদে অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রথম অধিবেশনে সভ্যদের শপথ গ্রহণকালে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।

একে একে সভ্যরা গিয়ে শপথ নিচ্ছেন। হঠাৎ দেখা গেল, পর পর সভ্য চলেছেন, তাঁদের সকলেরই মাথা মোড়ানো। এক আধ জন নয়? অন্তত তিরিশ জন। তাঁদের মুণ্ডিত মস্তক।

ব্যাপার কি? হঠাৎ এতগুলি সভ্যের একসঙ্গে কেশহানি ঘটল নাকি?

অনুসন্ধানে জানা গেল, পাচু ঠাকুরের দোর ধরার ব্যাপার।

ঐ সব সভ্যরা নির্বাচনে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে স্থানীয় দেবতা বাবা ভেংকটেশ্বরের কাছে মানৎ করেছিলেন। ভোটযুদ্ধে জিতলে বাবার পায়ে নিজেদের মাথার চুল নিবেদন করবেন।

অতএব তাঁদের মাথা মুড়তেই হয়েছে এবং সেই অবস্থাতেই শপথ নিতেও যেতে হয়েছে।

• • •

পাত্রপক্ষের তরফে কনে দেখতে গিয়ে আমরা কি করি? কনে সামনে এলে আমরা তার

মুখখানিই বেশি করে দেখি কারণ মুখশ্রীই কবের প্রধান গুণ! তারপর দেখি তার গড়ন এবং হয়ত চুল কেমন তাও দেখি।

কিন্তু কবলের সেরতলাই নগরে কনে দেখতে গিয়ে বরকর্তা প্রথমেই দেখেন কনের পা। তার পর তার হাঁটা। এইটি যদি মনোমত হয়—বাকিটা গৌণ।

ব্যাপারটা কি? ব্যাপার হচ্ছে এই: সেরতলাই অঞ্চলে ভয়ানক ফাইলেরিয়ার প্রকোপ। সেখানকার প্রায় লোকের পায়েই বাকি গোদ।

তা, গোদ-ওলা কনে কেই বা চায়, বলুন।

কেরলের বিধানসভায় এই প্রসঙ্গ উঠলে, হাসির রোল পড়ে যায় এবং অনেকেই ওই সভার অন্যতম সদস্য শ্রীমতী গৌরী টমাসের দিকে তাকাতে থাকেন। কারণ শ্রীমতী টমাসের বাড়ি সেরতলাই নগরে।

অতঃপর, সভ্যা শ্রীমতী টমাসের পদযুগলের শোভা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি!

• • •

অনেকেরই ধারণা মার্কিন দেশটা হচ্ছে স্বর্গভূমি। সেখানকার অধিবাসীরা সর্ববিষয়েই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করে, সেখানকার নাগরিকদের সর্ববিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা, তাদের ব্যক্তিগত জীবন সর্ব-রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত।

কিন্তু সেখানকার সরকারী কর্মচারিদের সম্পর্কে সম্প্রতি যে সংবাদ বেরিয়েছে তা পড়ে তো আমাদের আক্কেল গুড়ুম। কী তাগ্যি যে, মার্কিনীদের অনুকরণে আমাদের দেশেও সেরকম ব্যবস্থা এখনো চালু হয়নি।

ব্যাপারটা হচ্ছে, মার্কিন গভর্নমেন্ট কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এমন কতকগুলি প্রশ্ন করা হয় যেগুলি অত্যন্ত বিদঘুটে ও আপত্তিকর। তাই সেখানকার সেনেটর স্যাম আরভিন একটি বিল আনছেন। বিলটির উদ্দেশ্য, মার্কিন সরকারী কর্মচারীদের একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নাবলী থেকে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার সাংবিধানিক অধিকারের স্বার্থে সেনেটর আরভিন বিলটি তুলতে চান।

সম্প্রতি সেখানকার 'নেশন' পত্রিকা এই ধরনের কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা তুলে বলেছেন এইসব ব্যক্তিগত ও অকারণ প্রশ্নের হাত থেকে সরকারী কর্মচারীদের বাঁচানো দরকার।

এই ধরণের কয়েকটি অসংগত প্রশ্নের নমুনা: "আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম যৌন সংগম কবে করেন? বিবাহের পূর্বে কতবার?" "আপনার বাবা ও মধ্যস্থী বন্ধু আছে কিনা, থাকলে কতজন?" "আপনি নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত কোন আন্দোলনে কখনো যোগ দিয়েছিলেন কি না?" ইত্যাদি।

ব্যক্তি স্বাধীনতার পীঠস্থান বলে প্রচারিত মার্কিন দেশের এই প্রথাটি পাঠকদের কাছে কেমন লাগল তা জানতে ইচ্ছে করে।

• • •

উড়িষ্যার পূর্ত বিভাগে কাজ করেন ধরানিধি নায়ক। তাঁর কাজ কুলিদের সর্দারি করা। আগে তিনি কুলি ছিলেন। প্রমোশন পেয়ে হয়েছেন সর্দার।

ধরাদিধি নায়ক উচ্চাভিলাষী, বুদ্ধিমান এবং সুযোগ সন্ধানী। এই সব গুণের জোরে তিনি ক্রমে রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন।

আজ তিনি কোথায় জানেন?

আজ তিনি উড়িষ্যার পূর্ত মন্ত্রী!

From Log Cabin To White House—আমেরিকায় যা ঘটেছিল অনেক বছর আগে, ভারতবর্ষে তারই অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

• • •

মানুষের বর্তমান অভিজিৎকর অবস্থাটা তার জীবনের শেষ কথা নয়। উদ্যম উৎসাহ এবং ভাগ্যের আনুকূল্য থাকলে মানুষ যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, নিজের বর্তমান সামান্য অবস্থা থেকে অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন পদে উন্নীত হতে পারে, যাদের আমরা নীচুতলার মানুষ বলে হেয়জ্ঞান করি, তারা যে সহজে তলায় পৌঁছতে পারে—ওদেশে তার বহু নজীর আছে। দেখে আনন্দ বোধ হচ্ছে যে আমাদের দেশেও অধুনা তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। উপরে উড়িষ্যার কৃতপূর্ব কুলির সর্দারের মন্ত্রীত্ব লাভের কথা জানিয়েছি।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটেছে বিহার মন্ত্রীসভায়। সেখানে পুলিশ মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হয়েছেন রামানন্দ তেওয়ারী, যিনি একসময় ছিলেন সামান্য একজন পুলিশ কনস্টেবল। তিনি যখন দিনের পর দিন রোদ জল ঝড়ের মধ্যে রাস্তায় ডিউটি দিতেন তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে এই ব্যক্তি একদিন এই পুলিশ বিভাগেই মন্ত্রীর আসনলাভ করবেন।

এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেশের সাধারণ নিম্নবিত্ত সহায়সম্বলহীন মানুষকে যে অনুপ্রাণিত করবে তাতে সন্দেহ নেই।

• • •

চুম্বন সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছেন ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ। সম্প্রতি এক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। অনেক রকম চুমু আছে, তাদের মধ্যে কতকগুলি নির্দোষ, নির্মল। আবার কতকগুলি তেমন সুবিধার নয়। এই শেষোক্ত চুমুদের ছবির পর্দায় অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে শ্রী শাহ গভীর চিন্তা করছেন।

বিদেশী ছবিতে তো তাদের ছড়াছড়ি, কিন্তু ভারতীয় ছবিতে কী তাদের চালু করা সঙ্গত বা শোভন হবে।

মন্ত্রীমশাই পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন ভারতীয় ছবিতে অবাধ চুমু চালু করে দেখুন না, দেশে কীরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ওদেশ থেকে তো প্রায় সবই এসে গেছে। ওটা আর বাকী থাকে কেন!

সার্থক পাঠ

ব্রাহ্মণ দিনরাত গীতা পড়ে। আর তার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে।

লোকে বিমুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে আসে। বলে আমাদের একটু গীতা ব্যাখ্যা করে শোনান।

ব্রাহ্মণ চুপ করে থাকে। কোন জবাবই দেয় না। লোকে তাকে অনুরোধ করতেই থাকে।

তখন ব্রাহ্মণ বলে, আমি গীতার একটি শ্লোকেরও মানে জানি না। ব্যাখ্যা করে কি আপনাদের শোনাব বলুন!

লোকে বিরক্ত হয়ে চলে যায়। তবু বলে উপহাস করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে কান দেয় না। তেমনি দিনরাত গীতা পড়ে চলে আর তেমনি দু'নয়ন থেকে ধারা গড়াতে থাকে।

একদিন চৈতন্যদেবের কানে গিয়ে পৌঁছাল এই গীতা পড়িয়ে ব্রাহ্মণের কথা। তিনি নিজে এলেন ব্রাহ্মণকে দেখতে।

এসে বল্লেন, ব্রাহ্মণ শুনেছি তুমি সংস্কৃত জাননা। অথচ দেখছি তুমি অষ্টপ্রহর গীতা পড়ে যাচ্ছো, আর তোমার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কি ব্যাপার বলতো? ব্রাহ্মণ বলে, প্রভু, গীতা পড়ার সময়ে অসীম আনন্দ পাই আমার অশ্রু হলো সেই আনন্দেরই অশ্রু।

শ্রীচৈতন্য বলেন, কিন্তু গীতার মানে তুমি বোঝনা অথচ গীতা পড়ে তুমি কি করে আনন্দ পাও?

ব্রাহ্মণ বলে, আমার গুরু আমাকে গীতা পড়তে বলেছিলেন। আর তাঁর মুখ থেকেই শুনেছিলেম স্বয়ং ভগবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের সারথী হয়ে অর্জুনকে এই গীতা বলেছিলেন।

গীতা পড়লেই আমি চখের সামনে দেখি, সেই আমার ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, সেই ইষ্টমূর্তি দর্শনে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে যাই।

শ্রীচৈতন্য বল্লেন, ব্রাহ্মণ তোমারই গীতা পড়া সার্থক হয়েছে।

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের সিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অঙ্গাভরণ।

আমাদের কুশলী শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
ছাওলার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

দ্বিবিধ উপকারী
কেশ তৈল

- মাথা ঠাণ্ডা রাখে
- স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য করে

জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিতে আজ নরনারী নির্বিশেষে সকলকেই মাথা ঘামাতে হয়। তাই ওঁদের পক্ষে এমন কেশ তৈলই বিশেষ উপযোগী যা একাধারে ওঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবে এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কেশবর্ধনে সাহায্য করবে। আয়ুর্বেদীয় মতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত ভৃঙ্গরাজ লতা ও অন্যান্য গাছগাছড়ার স্নেহময় গুণসম্পন্ন সেই অতুলনীয় কেশ তৈল হল—

ক্যালকেমিকোর

ভৃঙ্গল

সুরভিত

মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

ক্যালকাটা কেমিকেল কর্তৃক প্রস্তুত

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
চৈত্র ১৩৭৩, APRIL . 1967
ষাবিংশতি বর্ষ—১০ম সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস'প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা চাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ লইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় সন্দেহ নাই। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
(রকমারী গেঞ্জী, টী-শার্ট, টেনিস-শার্ট,
চেস শার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্)।
সেই সঙ্গে মেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

ভারতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড লাইফ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম সাক্ষাৎকার হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, খোডনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট অঞ্চল।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহেশ্বর মল্লিকমিল—১০৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৪/, নিউ মার্কেট; দেশবানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; অমরদেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; জগদম্বা ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং ষডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আসরওয়ালা; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল জাবরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ মহারাম কেন্দ্রী; মহাবীর অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

টালাবাজার—দে ব্রাদার্স, পরশুরাম দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৩০

কোলে

▲ ভেনিস

▲ অ্যাসর্টেড
লজেন্স ও টফি

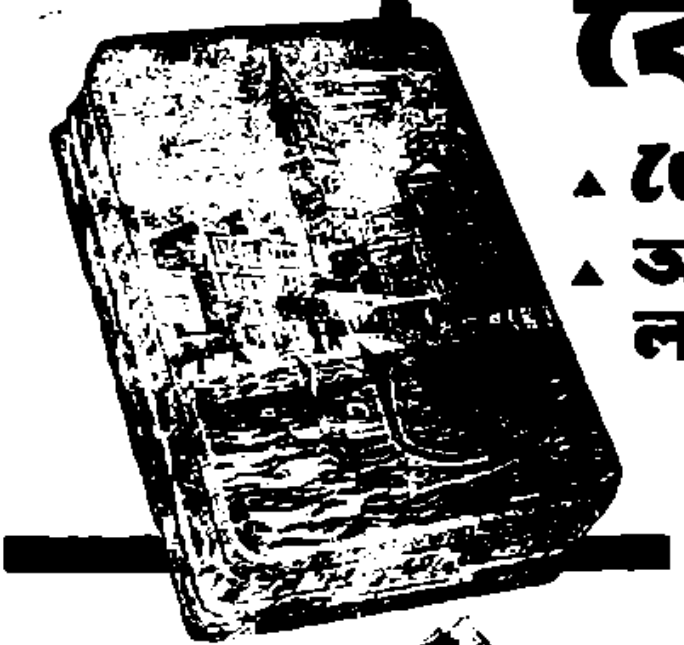

কোলে বিস্কুট কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১০

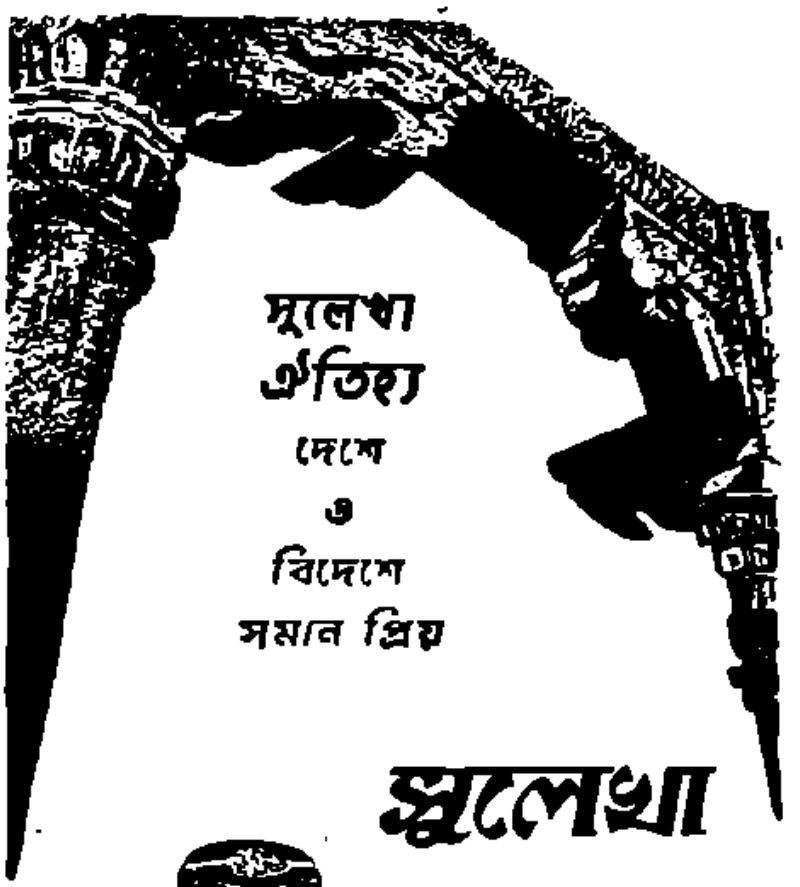

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • তাম্রাভোট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive 1W-318

আপনার সুন্দর কালো

কেশের জন্য...

বেঙ্গল কেমিক্যালের

ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েল ব্যবহারে চুল বাড়ায়—চুল উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। এই কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিনের এমটাই থাকায় চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখে ও চুল উঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৭৯১
ভাববার কথা	৭৯৭
অন্তরীক্ষে (কার্টুন)	
কল্লা বল্লা (উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৯৭
বাংলা সাহিত্যে অতুল প্রসাদের অবদান—নির্মল চট্টোপাধ্যায়	৮০২
নাটমঞ্চ—রত্নাকর	৮০৭
নটকুল চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর—নলিনীরঞ্জন মিত্র	৮১৩
ছায়া বাণী—চিত্র মিত্র	৮১৬
খেলাধুলা—	
ইংল্যাণ্ড বনাম ভারত—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২১
স্বপনচারিনী (গল্প)—আর্য্যভট্ট	৮২৪

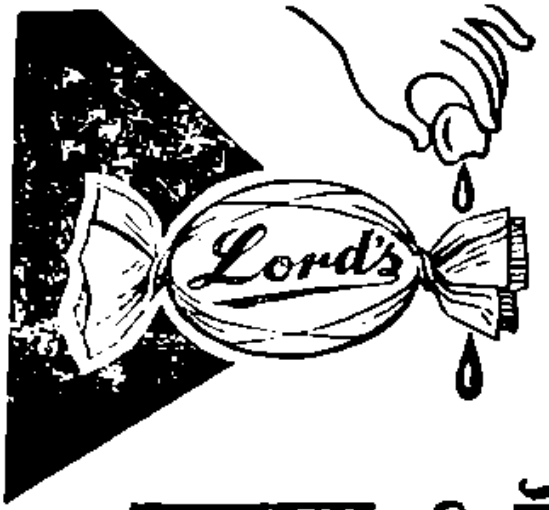

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১

NRM

NATIONAL ROBBER MANUFACTURERS LTD.

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

Inchek Tyres Limited

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

এই সংখ্যায়

ঘেরাও : এক নতুন বুমেরাং (নকশা)—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৪৩

সাহিত্যিকার স্বামী (গল্প)—ডঃ মতিলাল দাস ৮৪৭

কুড়িয়ে পাওয়া (গল্প)—গোপাল ঘোষ ৮৫১

চলতি দুনিয়া— ৮৫৬

মেয়ে-মজলিশ

গৃহসজ্জায় দেয়াল প্রসাধন—বেলা দে ৮৫৮

হাতের একটুখানি রূপচর্চা—নীলিমা রায়চৌধুরী ৮৬০

সৌন্দর্যের স্বাভাবিক উপকরণ—নীলিনা দে ৮৬১

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৮৬৩

কোমল ত্বকের নিত্য পরিচর্য্যায়

হিমানী গ্লিসারিন সাবান

নিখুঁত ও মসৃণ ত্বক সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি। বছরের প্রতিটি দিনেই এর পরিচর্য্যা করা উচিৎ। উপযুক্ত উপাদানে প্রস্তুত হিমানী গ্লিসারিন সাবান ত্বকের লাবণ্য ও মসৃণতা বাড়ায়।

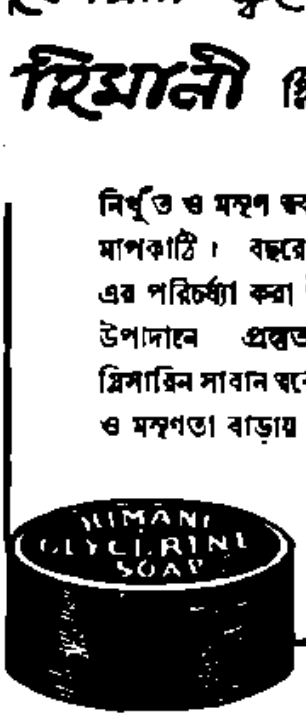

হিমানী
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২

গল্প-ভারতীর প্রিয় লেখক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কয়েকটি বহুপ্রশংসিত বই

যাত্রা হ'ল শুরু (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩·৭৫

আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ··· ৩·০০

পূর্বাপর (গল্প) ··· ··· ২·৫০

বিয়োগান্ত (গল্প) ··· ··· ২·৫০

হে মহাজীবন (মনীষীদের গল্প) ··· ৩·০০

নব নব রূপে (রম্য কাহিনী) ··· ৩·৫০

বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভারত্ন বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার আশ্চর্য কাহিনী) ৩·০০

স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য) ··· ২·৫০

ভারতের মৃত্যু ও কালরাত্রি (রহস্য) ··· ২·০০

মায়াজাল ও মরণাভিসার (.) ··· ২·০০

ভিন্ন স্বর্গ পিয়ানোলো, মলেয়ার, স্ট্রিন্ডবার্গ (নাটক) ··· ২·০০

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের : মায়াবসান (নাটক) ২·৫০

নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ (নাটক) ৩·০০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫·০০

: যন্ত্রস্থ :

চিরন্তনাকির (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)

রহস্য পঞ্চক (পাঁচটি রহস্য উপন্যাসের ওমনিবাস)

মিশি বিসর্প (রহস্য কাহিনী)

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)

Glimpses of the Olden Times (সম্পাদনা)

Echoes from Old Calcutta (.)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে। যে-কোন বাংলা বই-এর জন্য পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা গল্প-ভারতী কার্যালয়ে লিখতে পারেন। আমাদের ক্রী সার্ভিস বিভাগ তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

গল্প-ভারতী কার্যালয় :

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-৬

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এক অসাধারণ উপন্যাস

ঈস্ট বাকুল্যাণ্ড রোড ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী উপন্যাস

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস

মৃগমদ ৮॥

বিমল মিত্রের

সখা সমাচার ৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

সুবর্ণলতা ১৩৲

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

এক আকাশে অনেক তারা ৬৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

অমৃতসমান ৪॥০

অজিতকৃষ্ণ বসুর নূতন উপন্যাস

ম্যারিনা ক্যান্টিন ১০৲

সজনীকান্ত দাসের সুবৃহৎ নূতন উপন্যাস

একদা কী করিয়া ১৩৲

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

পোড়া .... কাটা .... গোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ
দাগ লাগে না

হাতের কাছে
রাখুন

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

O&D

গরমে চলুন হালকা পায়ে

পা খুলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, নিশ্বেষেই বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী। কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কী মসৃণ চামড়া। এমন হাওয়া-খেলানো মডেল, নির্ভাঁজ শৈলী আর যৌক্তিক নকশায় সমবেশ দুর্লভ বলা চলে পারে। স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও চপ্পলের নতুন সংগ্রহ আপনার।

মূল্য ৭.৯৫

Bata

মূল্য ৮.৯৫

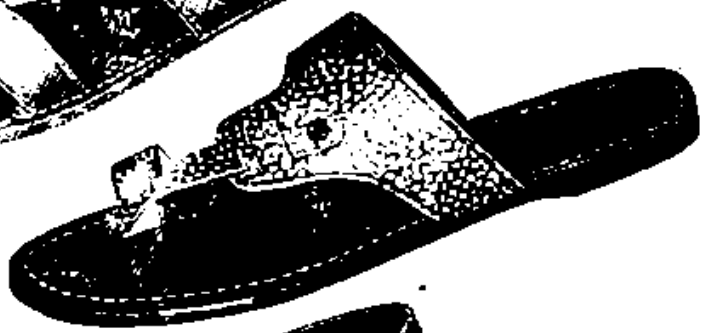

মূল্য ৭.৯৫

মূল্য ১৬.৯৫

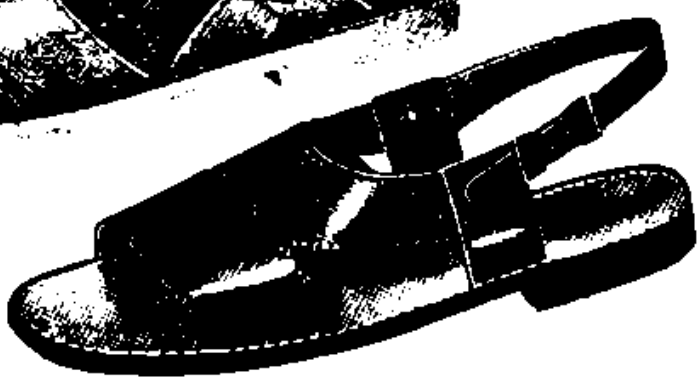

মূল্য ১৮.৯৫

সম্পাদকীয়

অনিলবাবু আমার প্রতিবেশী।

সেদিন তিনি হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলেন। বললেন, কোনও উন্মাদ-আশ্রমের খবর আপনার জানা আছে?

বললাম, খবর জানি। কিন্তু উন্মাদ হবার সৌভাগ্য আমার কখনও হয়নি। কাজেই পরিচয় নেই কারও সঙ্গে।

হতাশ হয়ে পড়লেন অনিলবাবু।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলুন তো? সকাল বেলা উন্মাদ-আশ্রমের সন্ধান করছেন কেন? কে উন্মাদ হলো?

অনিলবাবু বললেন, আমার ছোট শালা।

—কোথায় সে?

অনিলবাবু বললেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তার দাদা। লিখেছে, কোনও উন্মাদ-আশ্রমে ওকে কিছুদিনের জন্য রেখে দিতে পারলে ভাল হয়। আজ আমি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবো।

সর্বনাশ!

পাগলেরা অনেক কাণ্ড করে থাকে। বললাম, মেরে-টেরে বসবে না তো?

অনিলবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন, না না সে ভয় নেই। সেরকম পাগল নয়।

সেইদিনই সন্ধ্যায় কিছু আগে অনিলবাবু তাকে নিয়ে এলেন আমার বাড়ীতে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের প্রিয়দর্শন যুবক। নাম—মলয়। মলয় মুখোপাধ্যায়।

মলয়কে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন অনিলবাবু। যাবার সময় বলে গেলেন, কথাবার্তা বলুন, আমি আসছি।

আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম মলয়কে। পাগলের সঙ্গে কথা বলতে ভরসা হচ্ছিল না।

খানিক পরে সে নিজেই কথা বললে। জিজ্ঞাসা করলে, আপনার ছেলেমেয়ে আছে?

বললাম, আছে। একটি ছেলে একটি মেয়ে।

—তারা ভগবান বিশ্বাস করে?

বললাম, তা আমি কেমন করে জানবো বল?

মলয় ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলো। বললে, উঁহুঁ উঁহুঁ, জানতে হবে। এইটিই আপনার আসল কাজ। তাদের যদি মানুষ করে তুলতে চান তো এই ভগবানের শক্ত খুঁটিটা তাদের এখন থেকে সরিয়ে দিন।

পাগলের সঙ্গে বেশি কথা বলে লাভ নেই। তাই সংক্ষেপে জবাব দিলাম। বললাম, দেবো।

মলয় হো হো করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে, কেমন করে দেবেন? আপনি নিজে তার সন্ধান রাখেন? সেই ঈশ্বরের? সেই ভগবানের?

এই সেরেছে!

বললাম, ভগবান-টগবান রাখো। অন্য কথা বল।

মলয় বললে, অন্য কথা আমি জানি না।

আমিও বললাম, ভগবানের কথাও আমি জানি না। না জানলেই বা ক্ষতি কি? সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। ইওরোপকে দ্যাখো আমাদের মত তারা ভগবান-ভগবান করে না। কিন্তু তাই বলে তারা কারও চেয়ে ছোট নয়। তারা সবার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। মনে মনে বিশ্বাস বুদ্ধিতে—

কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলে না মলয়। বললে, হ্যাঁ এইটিই তারা সারা জীবন ধরে চেয়েছে। তারা সোনা চেয়েছে, মাটি চেয়েছে, রাজ্য চেয়েছে, মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করে নিষ্ঠুরভাবে এবং নির্বিচারে হত্যা করে ছলে বলে কৌশলে মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। এইটিই তাদের চরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য কী তাদের আপ্রাণ সাধনা! বাল্যকাল থেকে সেই পথ তারা প্রস্তুত করছে। ছেলেদের বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠে—সমাজ-ব্যবস্থায়, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই লক্ষ্যসিদ্ধির প্রতিযোগিতা, তপস্যার চর্চা। তাই আজ সেই মরমন্ত সর্বোন্নত ইউরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশে পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হয়ে উঠেছে।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনলাম।

মনে হলো এ তো পাগল নয়।

শুধু বললাম, আর আমাদের এই ভারতবর্ষ বুঝি ভগবান ভগবান করে খুব সুখে আছে? শান্তিতে আছে?

মলয় বললে, মোটেই না। ভগবানকে আমরা ঘুরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপকে অনুকরণ করতে গিয়ে তাদেরও অনুকরণ করতে পারিনি, নিজের যা ছিল তাও হারিয়েছি। নিরর্থক নিয়ম সংযমের বাঁধাবাঁধি আর অনাবশ্যক আচার বিচারটাই এখনও বড় হয়ে আছে। একদা যা ছিল সরোবর, এখন সেই সরোবরের জল সেছে শুকিয়ে, তার সেই প্রকাণ্ড শুষ্ক গর্তটা হাঁ করে যেন আমাদের গিলতে আসছে।

এই বলে মলয় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, শুনুন তাহ'লে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন। তিনি বলেছেন—ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল—একনিষ্ঠতার পথ। ভগবানের মধ্যে তার ধর্ম, কর্ম, তার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করে জগতের, সমাজের জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্জন সহজ মীমাংসা করেছিল। ভারতবর্ষের পথ একের পথ। বাধা বিবর্জিত ভগবানের পথ। আমাদের মুক্ত

পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হব না। জগতের মধ্যে আজ দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে—চারিদিকে মদমত্ত উদ্ধত জাতির রণভেরী বেজে উঠেছে, বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলোর সঙ্গে দলন করে দর্পের সঙ্গে চারিদিকে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরছে, হে বিধাতা, পৃথিবীর লোক ভেবেছে তোমার সিংহাসন শূন্য, ধর্মকে শুধু অভ্যাসের সংস্কার মনে করে নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছার সুরু করেছে।

হে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্, এই ঘরগড়ার্তে আমরা ক্ষুব্ধ হব না, শুষ্ক ধূসর পত্ররাশির মত এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধূলিসভা তুলে দিগ্বিদিকে প্রাধ্যমাণ হব না—পৃথিবীব্যাপী এই প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে আমরা একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকি যে—

অধর্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাততঃ মঙ্গল দেখা যায়, আপাততঃ শত্রুরা পরাজিত হতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সমূলে বিনাশ পেতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হবে। তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুষ্টেষ্টা যখন প্রবলতম, মেঘান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং রণমত্ত ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করে ফিরছিল, তখনও ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নি, বিশ্বাস ত্যাগ করেনি, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রেখেছিল—সকলের উর্ধ্বে ভগবানের সত্তাকে প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছিল, এবং সমস্ত আলোড়ন গর্জনের মধ্যে মাঝে মাঝে মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেছিল—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন—

—ব্রহ্মের আনন্দ অর্থাৎ ভগবানের আনন্দ যিনি জেনেছেন, তিনি কিছুতেই ভয় পান না। এই যদি সত্যপর হয়, তবে আমাদের এই ভারতবর্ষের নানা দুঃখ ও অবমাননা সমস্তই সার্থক হবে। ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হবে, ভগবানের দ্বারা সার্থক হবে, দম্ভের দ্বারা নয়, প্রতাপের দ্বারা নয়, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নয়।

এই পর্যন্ত বড় বড় করে বলে গেল মনে। বলেই সে চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলো।

আমারও চিন্তায় জগতে তখন তোলপাড় সুরু হয়েছে।

কে একে পাগল বলে?

অনিলবাবু এলেন।—কি রকম দেখলেন?

বললাম, এর জন্যে উন্মাদ-আশ্রম খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

অনিলবাবু বললেন, হ্যাঁ। সেইরকম তো লিখেছে ওর দাদা।

—তিনিও তো আপনার শালা হ'ন?

অনিলবাবু বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, তাহ'লে তাঁকেই পাগলা-গারদে পুরে দিন। মনের বাইরে যাব।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাববার কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ সহর আলোকমালায় ঝলমল করছে। যুদ্ধের কর্মব্যস্ততায় সহরটি সব সময়ই সরগরম ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে সাইরেন বাজছে। হঠাৎ সব আলো নিভে গেলো ও সমস্ত সহর সুচিভেদ্য অন্ধকারে ভয়ংকর আকার ধারণ করল। জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হল। তড়িৎতত্ত্ববিদ্‌দের ও সৈন্যবিভাগের বিশেষজ্ঞদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও কোন কূল কিনারা করা গেল না। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আতঙ্কে ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে গেল। এমন সময় দেখা গেল পাওয়ার হাউস (Power House)-এর একটি কোনে একটি অতিক্ষুদ্র সুইচ খুলে গেছে। সুইচ যথাস্থানে লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার সমস্ত সহর আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জীবন স্পন্দন ফেরা দিল ও আবার সমস্ত সহর প্রাণবন্ত হল ও ঝলমল করতে লাগলো।

আমাদের দেশও একদিন এমনি আলোকোজ্জ্বল ছিলো। সেই আলোক বহু মনীষিদের প্রতিভা থেকে উৎসারিত হত। কিন্তু আজ আমরা নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আমাদের দুঃখ কষ্টের অন্ত নেই লাঞ্ছনার ও হীনতার শেষ নেই। অভাব অনটন লেগেই আছে। শুধু নেই, আর নেই। সমস্যার পর সমস্যা আমাদের ভ্রূকুটি দেখাচ্ছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পরাজয়ের গ্লানি ও বিপর্যয়ের অভিশাপে ন্যুব্জ। আমাদের এই শোচনীয় দুর্গতির কারণ আমরা নিজেরা জানিনা। জানবার আন্তরিক চেষ্টাও আমরা কখনও করিনি। কেবল অন্ধের মতো হাতড়িয়ে মরছি। আমাদের এই দুরবস্থার জন্য আমরা একজন আর একজনকে দোষারোপ করছি, একদল আর একদলকে দায়ী করছি। আর দ্রুত অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ভালভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের এই মর্মান্তিক দুর্দশার ও অধঃপতনের কারণ অতি স্পষ্ট এবং তার জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের নিজেদের হীনতম অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ।

কথাউপনিষদে একটা কথা আছে কথাটি হল শ্রদ্ধা। কথাটি অতি ছোট কিন্তু এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা পৃথিবীতে অন্য কিছু নেই। এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষের চরিত্রের মুকুটমণি। এই 'শ্রদ্ধা' হারিয়ে আজ আমরা সর্বহারা হয়েছি।

আমরা আমাদের নীতি বা ধর্মকে শ্রদ্ধা করি না। কোন শিক্ষাদীক্ষাকে শ্রদ্ধা করি না। আমাদের গৌরবময় অতীতকে, ঐতিহ্যকে ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি না। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিনা। অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অন্নদাতা কাউকেই শ্রদ্ধা করি না। বিদ্যালয়-এর কোন আইন কানুন মেনে চলি না। সমাজের কোন নীতির ধার আমরা ধারিনা। কোন শাসন ব্যবস্থা বা অনুশাসনকে আমরা মানি না। আমরা শুধু স্বাধীন আর স্বাধীন! কোন কিছুকেই শ্রদ্ধা করার বালাই আমাদের নেই। স্বাধীনতা পাবার পর এদেশের অধিকাংশ লোকের চরিত্রে এই ভয়াবহ অধঃপতন দেখা দিয়েছে। সর্বত্রই অশ্রদ্ধা ও অরাজকতা। তার ফলেই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ঘটেছে।

আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই শ্রদ্ধাকে ফিরে পেতে হবে। তার জন্য সারা দেশে এক প্রচণ্ড আন্দোলন ও আত্মোদ্যম শুরু করতে হবে। অন্য সব পরিকল্পনাকে সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখে জাতির চরিত্রকে ফিরিয়ে পাবার এই পরিকল্পনাকে সর্বাগ্রে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। এবং তার জন্য সর্বস্ব পণ ও অনেক কৃচ্ছ্র সাধন ও ত্যাগ স্বীকার একান্ত প্রয়োজন।

জাতীয় সরকার ও জনসাধারণকে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই সূত্রে আবদ্ধ হয়ে জাতির এই শ্রেষ্ঠতম ও প্রধানতম পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে এবং তার জন্য আমাদের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করতে হবে সানন্দে। তা যদি আমরা না করি তা হলে আমাদের সামগ্রিক বিপর্যয় সুনিশ্চিত। অপমৃত্যুর হাত থেকে আমাদের আর আজ কেউ রক্ষা করতে পারবেনা, স্বয়ং ভগবানও না।

অন্তরীক্ষে

BOMBAY, APRIL 29.—Dr. S Chandrashekhar, Union Minister for Health and Family Planning, announced today that a Bill to legalise abortion as a means of family planning would be introduced in the coming session of Parliament, says P. T. I.

Dr. Chandrashekhar, who was inaugurating the Bombay Family Planning Year 1967-1968, said under this a doctor would be permitted to carry out the operation with the consent of husband and wife. Presently abortion was permitted only in cases where the life of an expectant mother was in danger or in cases of rape.

উপরের সংবাদটি পড়ুন।

বিদেশী শাসকের আমলে

সেদিন···

আর আজ

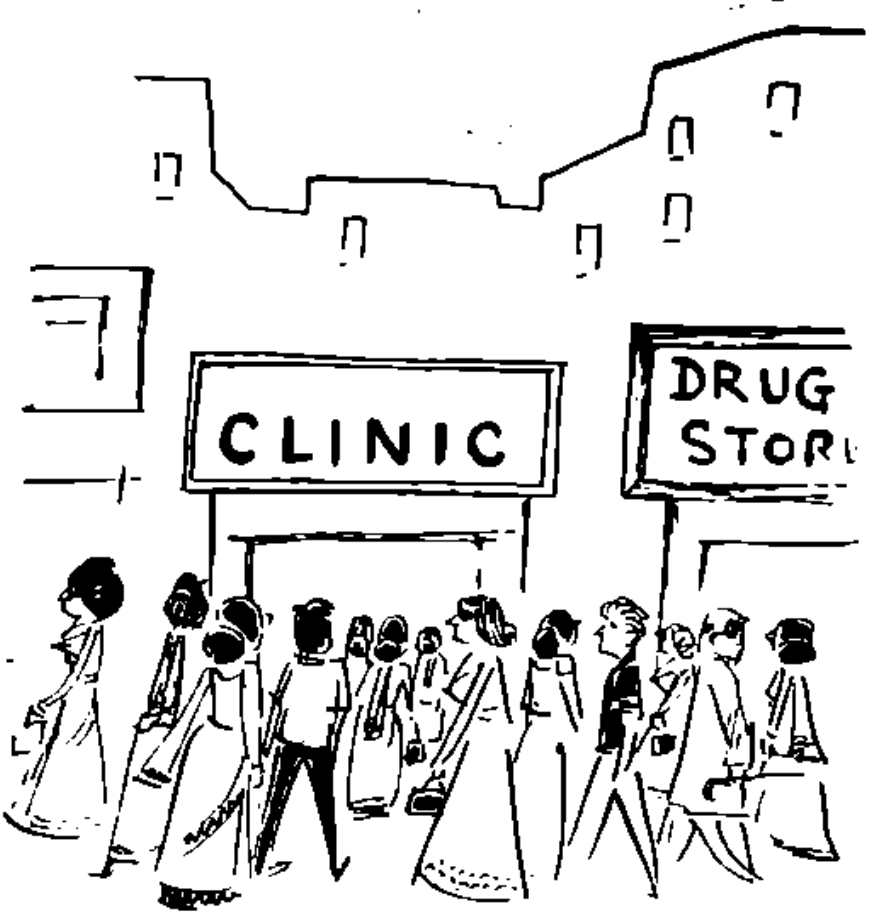

আজ যা ঘটছে

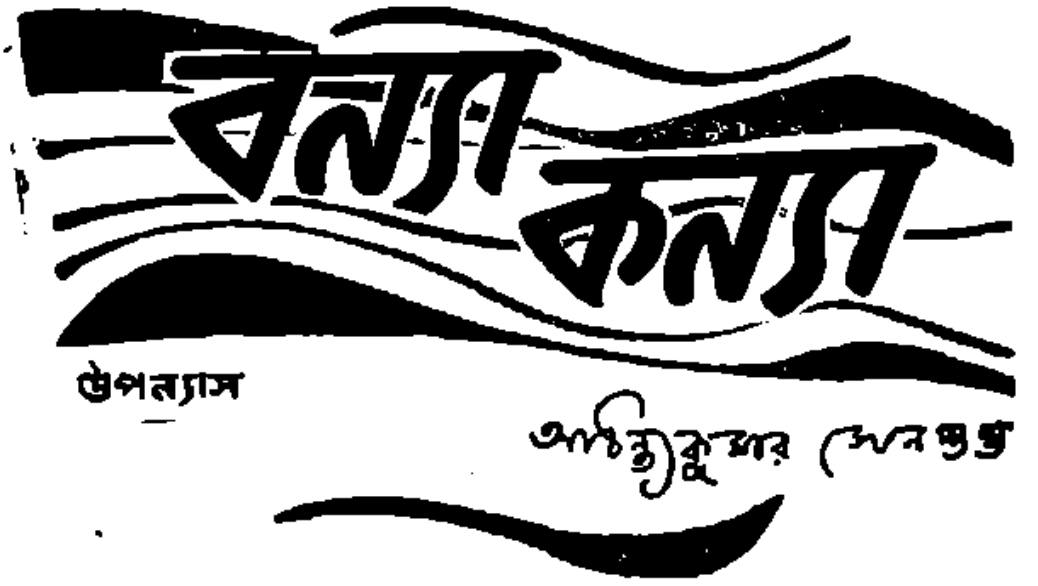

৭

'উঠলে? না না বোসো।'

'বসে কী হবে?' অভিমান ভরা চোখে বনছায়া বললে, 'আপনি তো আর আমাকে ভালোবাসেন না।'

আশ্চর্য, সন্দীপের কাছে বনছায়া কেমন বালিকা হয়ে যায়। কেমন একটা প্রগল্ভতার ভাব চলে আসে! ঠিক ভদ্রতায় সমস্তদিন নিয়ে আসতে পারে না।

'যদি ভালোবাসতাম, তাহলে বসলে কী হত?' সরলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সন্দীপ।

কী রকম যেন ধরা পড়ে গেল বনছায়া। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'কী আবার হত! বলতাম!'

হ্যাঁ, আরো একটু বসে যেত। কোথাও বাইরে যেকবার কথা বললে বেরুত না সন্দীপ। এ ঘরই তার স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। এইখানেই, না হয় পাতালেরই এককোণে অন্ধকারে বসে যেত। লুব্ধ বিশ্বাসে থাকত প্রতীক্ষা করে। যদি শুভ্রতার ঘন হতে ঘনতর হয়ে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাকে টেনে নেয় বাহুর মধ্যে। ঐ দুই বাহুর বিস্তারের মধ্যে যা আছে কত বলিষ্ঠ শান্তি। কিন্তু এতটুকু নড়ে না সন্দীপ।

মনের গোপন কথা প্রাণকে আজ এতদিনে জানিয়ে ক্ষতি নেই, সে সন্দীপকেও ভালোবাসে। ভালোবাসে তার অনীহাকে, বৈরাগ্যকে, নিস্পৃহ কাঠিন্যকে। অথচ তার এমন শক্তি নেই যে সে নিজের থেকে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্তত 'তুমি' বলে ডাকে।

তার অনুরাগের মধ্যে সেবা আর শ্রদ্ধা মিশেছে বলে এর আবার একটা নতুন স্বাদ।

'ভালোবাসা কাকে বলে জানো?' সন্দীপও উঠে পড়ল।

'কাকে?' যেন একটু ভয় পেল বনছায়া। আশ্চর্য, তার মনে হল এ ভয়টুকুও কী সুন্দর।

সন্দীপ খুব একটা নতুন কথা বললে। বললে, 'যার ভালোকে বাসা তার নামই ভালোবাসা। আমি যখন তোমাকে ভালোবাসি তখন আমি শুধু তোমার ভালো, তোমার মঙ্গলেই বসবাস করব। অর্থাৎ তোমার শুধু মঙ্গল দেখব।'

'কত মঙ্গল দেখবেন! আমাকে তো পারলেন না উদ্ধার করতে!'

'উদ্ধার? কেন, কী হয়েছে?'

'কই কিছু অনুমানও তো করতে পারছেন না।'

'আমি তো দেখছি কিছুই হয়নি। আর যদি কিছু হয়েও থাকে, তুমি তোমার নিজের মধ্যেই এত শক্তি ধরো যে তুমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে। আসলে আমাদের উদ্ধারকর্তা আমরা নিজেই। বোসো না, বলো, তুমি কী হয়েছে?'

সন্দীপ কের বসে পড়ল।

আর কী আকর্ষণে ঘাস-ঘাস করে বনছায়াও বসে পড়ল। কিন্তু এবার বসল একটু দূরে সরে।

'যত দূরেই সরে বলো না কেন তুমি জানো তুমি আমার কাছেই আছ।' একটু কাছাকাছি হতে চেয়েই সন্দীপ আবার দূরত্ব হল: 'এখন বলো তোমার কী বিপদ, কিসের থেকে উদ্ধার চাও?'

'আমাকে আমার বাড়ি ছেড়ে দিতে হচ্ছে।' বনছায়ার কণ্ঠে বিষাদের সুর লাগল।

'ছেড়ে দিতে হচ্ছে? কেন, এমন সুন্দর বাড়ি, এ কি কেউ ছাড়ে?'

'কিন্তু এ তো আমার নিজের বাড়ি নয়।'

'নিজের বলে ভাবলেই নিজের বাড়ি।' হেসে উঠল সন্দীপ: 'এ পৃথিবীটাই কি কারু নিজের সম্পত্তি বাকি? নিজের বলে ভাবলেই নিজের। কেন, ব্যাপার কী?'

'বাবা আমার জন্যে এক পাত্র ঠিক করেছেন। তাকে বিয়ে করে তাঁর বাড়ি থেকে সরে পড়তে বলছেন।'

'বিয়ে? তুমি বিয়ে করবে কী!'

'বা, আমি বিয়ে করব না?'

'না, তুমি কেন বিয়ে করবে? তুমি সাহিত্যিক, তুমি আর্টিস্ট, তুমি কেন বিয়ে করতে যাবে? বিয়ে মানে বাঙালি-মেয়েলি-বিয়ে, ঐ যে আবড়া-জোবড়া ব্যাপার—'

'তাহলে কি প্রেমের বিয়ের কথা বলছেন? তেমনটি পাই কই?'

'না, না, ও সব একই চেহারা। আমি বলছি একেবারেই বিয়ে করবে না। বড় হবে। সাহিত্যিক হবে। একটা বৃহৎ একাত্মীয়কে বিয়ে বড় সাহিত্যিক হবে। আর বিয়ে করলেও এমনি কী—এরই মধ্যে কী! তোমার বয়েস কত? এরই মধ্যে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ?'

'যদি বলি, পড়েছি—'

'আমি বলব, মিথ্যে কথা। তুমি এখানে আত্মসমর্পণ করতে আসনি, সংগ্রাম করতে এসেছ। যে সংগ্রামী সে কখনো ক্লান্ত নয়।'

'আমি তাহলে কী করব? বাবাকে বলব তোমার মনোনীত পাত্রকে আমি বিয়ে করব না?'

'না, বলবে আমি বিয়েই করব না।'

'সে বলাটা তো সত্য হবে না।' মধুর করে হাসল বনছায়া: 'বিয়েতে আমার অসাধ নেই। আর যাকে আপনি বড় বলেন বড় সাহিত্যিক বলেন, সে তো বিবাহিতরাই হয়েছে। বড় সাহিত্যিক হওয়া কি সন্ন্যাসীদের ধর্ম?'

'তাহলে বলো আমি এখন বিয়ে করব না। আমি এখনো প্রস্তুত নই।'

'বাবা বলবেন এমনি তৈরি পাত্র কুড়াতে আর পাওয়া যাবে না। যদি আমার কথা না শোনো, তবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

'বাবা বিরক্ত হবেন, কিন্তু অমন কথা মুখ ফুটে বলবেন না কখনো।'

'বাবা না বলেন, মায়েরা বলবেন।'

'মায়েদের বলবার অধিকার কোথায়? বাড়ি বাপেদের নয়।'

'বৌদিদিদের সঙ্গে ঝগড়া হবে।'

'ঝগড়া করবে না।'

'তবু, আপনি জানেন না, নানারকম অশান্তি লেগেই থাকবে।'

'আমি জানি না? আমার ঐ ঘরভাঙা বাইরে কী কঠিন অশান্তি! তবুও তুমি শান্ত মনে নিজের কাজ করে যাবে। সমস্ত সংসার আমাকে সাহিত্য ছেড়ে দিতে বলছে, সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে টাইপানি ধরতে বলছে, তবু আমি ওসব কোলাহল কানে তুলছি না, যে যাই বলুক, আমি আমার সাহিত্যে লেগে আছি—এক্‌নি এক্‌নি ফল না ফলুক, আশা করে আছি একদিন সুদিন আসবে। যদি আমি আমার নিষ্ঠা ছেড়ে দি তবে ঐ আশাও যে আমাকে ছেড়ে যাবে। তুমিও তেমনি লেগে থাকো, ধরে থাকো, কিছুতেই ছেড়ে দিও না।'

'কী ধরে থাকব? কাকে ছেড়ে দেব না?'

'তোমার কাজ। তোমার আদর্শ।'

'আমার কোন কাজ?'

'কাজ তো একটাই। আর সেটাই সাহিত্য। সেই সাহিত্যই তোমার বাড়ি, তোমার ঘর-দোর। সেই বাড়ির যত ঘরটাতে ঘোর এঁটে বসে থাকো, কাজ সাধা নেই তোমাকে উচ্ছেদ করে।'

'কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে আমার যে সংসারেও লোভ!' বনছায়ার চোখে সেই সনাতন কটাক্ষ ফুটল।

'তাহলে বাবাকে বলো, আমি যাকে নিয়ে সংসারী হব সে এখনো প্রস্তুত নয়।'

'তা বুঝি বলা যায়?'

'হয়তো যায় না, ওভাবে বলা যায় না। বললে বলবে যে প্রস্তুত নয় তার জন্য প্রতীক্ষা করা কেন? কোন্‌দিনই যে সে প্রস্তুত হতে পারবে তার ঠিক কী। তাই বিনয় করে বুঝিয়ে বলতে হয়, আমি বিয়ে করব না, আমি এখন প্রস্তুত নই। তুমি তেমনি করেই বলবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো কার শক্তি নেই তোমাকে হটায়।'

'কিন্তু আমি যাকে নিয়ে সংসারী হতে চেয়েছিলাম সে প্রস্তুতই ছিল,' বিষণ্ণ চোখে তাকাল বনছায়া: 'শুধু তার সাহস নেই।'

লক্ষ্মীপদর বুকের মধ্যে চমক লাগল, কিন্তু সে তপ্ত বা তিক্ত কিছুই বলল না, শান্ত ঘরেই বলল, 'বলো দুঃসাহসিকা নেই। না, না, তোমার কথাটাই থাকুক, সে একই কথা, বলো সে সাহসে প্রস্তুত নয়। আর তোমার মতে সাহস মানে তো স্বার্থপরতা।'

'মোটেই না।' একটু বুঝি কলহের সুর আনল বনছায়া : 'আমার মতে সাহস মানে সর্বস্বত্যাগ।'

'তার মানে তুমি চাইছ আমি আমার আশ্রিত মানুষগুলোকে ত্যাগ করে একা তোমাকে নিয়ে বনে গিয়ে বাস করি। তা হয়না।'

'তবে আপনি চায়া নিয়েই থাকুন, আমি চললাম।' বনছায়া কটকা মেরে দাঁড়িয়ে উঠল।

'যদি যেতে পারো তো যাবে, আমি বাধা দেবনা।' সন্দীপও উঠে দাঁড়াল : 'কিন্তু যেখানেই যাও, পাবেই যাও আর অপাত্রেই যাও, আমি ঠিক থাকব। বন একদিন ছায়াময় হয়ে যাবে কিন্তু ছায়া কিছুতেই হারিয়ে যাবে না। যদিন পারি এই ছায়াতে বসেই জীবনের দেখাটুকু লিখে যাই।'

দরজার কাছে এসে এক নিশ্বাস থামল বনছায়া। দরকার নেই, তবু আরেকবার বললে। 'আচ্ছা যাচ্ছি।'

'এসো।' সন্দীপ বুঝি অন্ধকারে আরো এক পা এগিয়ে এল।

কিন্তু কই বনছায়ারও তো সাহস নেই। সেও তো পারল না পারের নৌকায় লাফিয়ে উঠতে। কাঁপিয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরতে প্রাণপণে। বন কি শুধু অসার কাঠের বোঝা, তার মধ্যে আগুন নেই, ফুলের নেই, হিংস্র জীবজন্তু নেই?

ধীরপায়ে চলে গেল বনছায়া।

তাবল এও তাকে তাড়িয়ে দেওয়াই হল।

সমুদ্র অস্বীকার করেছে, পাহাড়ও তাকে অস্বীকার করল। আজ মনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতে বনছায়ার এতটুকুও বাধল না, সে সমুদ্র আর পাহাড় দুজনকেই ভালোবেসেছিল। সুধীর সমুদ্র আর সন্দীপ পাহাড়। দুজনের মধ্যে সৌন্দর্যের দুই রূপ, একজন উত্তাল আর একজন নিশ্চল। একজন কেবল আরেকজন কঠিন। হ্যাঁ, দুজনকেই সে ভালোবেসেছিল—একসঙ্গে দুজনকে বুঝি অনায়াসে ভালোবাসা যায়, পাহাড়কে আর সমুদ্রকে—কেননা দুজনের মধ্যে একই মহান আকর্ষণ বিদ্যমান। দুজনেই স্রষ্টা, বাক্যের বিধাতা। সন্দীপ গল্প-উপন্যাস লেখে, আর সুধীর কবিতা। সে রচনার তলয় যাই থাক, বাজার-দর যাই হোক, বনছায়ার অনুভবের রাজ্যে দুজনই অভিনব, দুজনই কৃতকীর্তি। দুজনকেই সে চায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে। সম্মানে অর্থে জনপ্রিয়তায়, চাই কি রসগ্রাহীর গৌরবে। কেননা তার কাছে সাহিত্য যে প্রেমের মতই প্রিয়তম।

কিন্তু দুজনের কেউই তাকে স্থান দিলনা। পাহাড়ের চূড়া হলনা এতটুকু, সমুদ্রও তার তীররেখা অতিক্রম করল না। নিজের মন দু'জায়গায় দু টুকরো করে কেটে রেখে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল বনছায়া।

কিন্তু মন ছাড়া কি শরীর চলে? এখন শরীরে যে মন জেগেছে সে বড়লোকের মেয়ের মন, যার চলাফেরা মোড় আর লাভের সদর রাস্তায়, যে রাস্তার ইলেকট্রিক ল্যাম্পপোস্টগুলিতে জ্বলছে স্বাচ্ছন্দ্য আর সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য আর সৌভাগ্য। আর যে রাস্তা শেষপর্যন্ত পৌঁছেছে গিয়ে একটা অলস স্থবির পেনসনে।

না, আর সাহিত্য করে না। কাঁকের কই কাঁকে গিয়ে মেশ। একটা বড়লোকের বউ হয়ে যাও।

কিন্তু এ কে? গেটের কাছে রাস্তার নিরালায় দাঁড়িয়ে আছে একধারে।

'এই! তুমি!' আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল বনছায়া: 'তুমি এখানে?'

'তোমার জন্যে এসেছি। দাঁড়িয়ে আছি।'

'সত্যি? এস এস আমার ঘরে এস।'

'না, তুমি আমার ঘরে চলো।' সুবীর উত্তেজকণ্ঠে বললে, 'তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'My ocean! আমার সমুদ্র! আমার মহাসমুদ্র! আমি যাব। কী বলো, এখুনি, আজ রাত্রে।'

'এখুনি! আমি প্রস্তুত।'

'মানে এখন থেকেই প্রস্তুত।'

'হ্যাঁ, এখন থেকে সর্বক্ষণ।'

'খুব ভালো। আর তবে কী চাই! পাহাড় অতিক্রম করা কঠিন কিন্তু সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া সোজা। চলো কোথাও গিয়ে একটু বসি।'

'চলো।'

একটা মঠ খুঁজে পেতে দেরি হল না আর দুটিতে মিলে মিশিমিশি বলা একটা কিছু অঘটন নয় যে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে।

তাই শান্তিতেই বসে যেতে পারল তারা। কখনো মুখোমুখি, কখনো পাশাপাশি।

'তোমার জন্যে একটা নতুন চাকরি জোগাড় করবার চেষ্টা করছি।' বললে বনছায়া।

'সত্যি?'

'মাথার মধ্যে একটা প্ল্যান আছে, এখন বলছিনা—হলেও হতে পারে, যদি হয়ে যায় তো বেশ হয়।'

'না হলেও কিছু এসে যাবে না। কেননা নতুন যে চাকরি পেয়েছি তাই আমার আশাতীত।'

'নতুন আবার কী পেলে?'

'এই তোমার পা দুখানি।' সুবীর বনছায়ার দুই পা দুই মুঠোতে চেপে ধরল।

'সর্বাঙ্গের যে রাজা সে অত ছোট চাকরিতে তুষ্ট হয় কী করে?' বনছায়া উঠে পড়ল।

সুবীরও উঠল। চলল পাশাপাশি। বললে, 'পা ছাড়া গতি নেই। যে চাকরিই পাই পদ-প্রাপ্তিই ঘটবে। আর তুমি হেন যে পদ্ম সেও পায়ের উপর সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে। কবে বলো তো দাঁড়াবে সম্পূর্ণ হয়ে?'

'দাঁড়াও, তিন দিন—বড়জোর সাতদিন সময় দাও।' বনছায়াও উল্লাস হতে জানে 'তারপর তোমার ঘরে আমিই যাব সমুদ্র হয়ে।'

তিন দিনের মধ্যেই সরসিজ বাড়িতে টি-পার্টির আয়োজন করলেন। হিমাংশু রায় নিমন্ত্রিত হয়ে এল। তারপর বড়বড় করে সবাই যখন একে-একে উঠে গেল হিমাংশু আর বনছায়াকে একলা রেখে, তখনই বনছায়া বললে, 'আপনাকে একটা ছোট্ট অনুরোধ করব, রাখবেন?'

'কী বলো?' এতক্ষণ আপনি বলছিল এখন হঠাৎ তুমি বলল হিমাংশু।

বনছায়া খুশি হল, ভাবল, অনুরোধটা বোধহয় মাঠে মারা যাবে না।

'আমার একজন পরিচয় চেনাশোনা ছেলে আছে, তাকে যদি আপনার কার্যে একটা চাকরি করে দেন।'

'বেশ তো, তাকে দরখাস্ত করতে বলবেন, দেখব কী করতে পারি।'

'একটা মাড়োয়ারি কার্যে ও থেকেও টাকায় আছে— যদি একটু তাদের মাইনেতে পায়ের ঢুকিয়ে দিতে—একটা ক্লেরিক্যাল পোস্ট হলেই চলে যাবে।'

'তুমি যখন এত করে বলছ তখন নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তুমি ওকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।' হিমাংশু আরো একটু পরিহিত হল : 'বেন তোমার নাম করে দেখা করে।'

'কবে করবে বলুন ?'

'যত শিগগির হয়। শিগগির হওয়া তো আমার ইন্টারেস্ট।' সরল চোখে হাসল হিমাংশু।

[ক্রমশঃ]

বাংলা সাহিত্যে অতুলপ্রসাদের অবদান

—নির্মল চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে যে কয়জন সাহিত্যসাধকের সাধনায় ফল সঞ্চিত হয়েছে কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কবির জীবিতকালেই তাঁর গীতি-সংকলন "কয়েকটি গান" নামে প্রকাশ পায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেই সংকলন গ্রন্থটি কবি স্বয়ং পরিবর্ধিত "গীতিগুচ্ছ" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। অতুলপ্রসাদের তিরোভাবের পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে "গীতিগুচ্ছ" পুনর্মুদ্রিত হয়।

কবির প্রকাশিত রচনাসম্ভার সংখ্যায় খুবই অল্প। সর্বাধুনিক সংস্করণ গীতিগুচ্ছে মোট দুশছটি কবিতা বা গীতি স্থান পেয়েছে। এত অল্প লিখেও কবি কালোত্তরখ্যাতি অর্জন করে গিয়েছেন। বঙ্গসাহিত্যের গগন যখন রবীন্দ্র প্রভায় ভাস্বর অতুলপ্রসাদ সেন সেই সময়ের কবি। অসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী না হলে সেই রবীন্দ্র প্রভাবদীপ্ত যুগে অতুলপ্রসাদের পক্ষে কাব্যরসিকদের দরবারে স্থায়ী আসনলাভ করা অসম্ভব হত। অবশ্য উত্তরকালীন জনচিত্তে অতুলপ্রসাদের স্থান পাওয়ার আরও একটা বিশিষ্ট কারণ এই যে তাঁর কবিতাগুলি লোকে কবিতা হিসাবে যত না পড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি শুনেছে বা গেয়েছে গান হিসাবে, আর এইভাবে সঙ্গীত-মাধ্যমেই কবির খ্যাতি প্রসারিত হয়েছে জন থেকে জনান্তরে।

প্রাথমিক স্তরে কবিতা নিয়েই শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্য। শুরু থেকে বিহারীলালের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত কবিদের রচনাসম্ভারকে কাহিনী ও গীতি এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কবিগান, পাঁচালী, হাফ—আখড়াই প্রভৃতি গীতিমূলক কবিতার ধারা বয়ে চলেছিল। বিহারীলালের রচনাকাল থেকে কাব্যের স্রোত স্পষ্টতঃ দুই ধারায় ভাগ হয়ে গেল—একটি কাব্যের অন্তর্মুখী গতি অপরটি বহির্মুখী। কবি মুকুন্দরাম প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যানের উপর কাব্য রচনা করেছেন। মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ কবিগণ উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবি বিহারীলাল পূর্বসূরিদের কাউকেই অনুসরণ না করে এক নতুন পথে পা বাড়ালেন। তাঁর কবিতাধারায় মধ্য দিয়ে তিনি যেন আপন মনের সুরটিকে বাজিয়ে গেলেন। কাব্যের বহির্মুখী গতিতে কবিরা নিজেকে বাদ দিয়ে অপরের কথা বলেছেন। কিন্তু অপর ধারার কবিদের কবিতা পড়লেই মনে হয় কবি যা বলছেন তার সঙ্গে নিজের অনুভূতিকেও যেন যুক্ত করেছেন। এই আত্মনির্ভরতা গীতি কবিতার বিশেষ লক্ষণ। বিহারীলাল এই ধারার প্রবর্তক এবং অতুলপ্রসাদ এই ধারার একজন সার্থক উত্তরসাধক।

রাখীন্দ্রিক ভাষায় বলতে গেলে, সাহিত্যকুঞ্জের বহু পাখীর বিচিত্র কলগীতের মধ্যে অতুল-প্রসাদের "গীতিগুঞ্জের" গানগুলিও তোরের পাখীর মিষ্টি গানের মত, কবি যেন নিজের মনের গীতিপ্রবণতাকে ভাষা আর সুর দিয়ে মূর্ত্ত করে সুন্দরের পূজার নৈবেদ্য সাজিয়েছেন।

"গীতিগুঞ্জের" গানগুলি মোট ছয়ভাগে ভাগ করা :—দেবতা, প্রকৃতি, স্বদেশ, মানব, বিবিধ ও পরিশিষ্ট।

দেবতা বিভাগে মোট চুয়ান্নটি গান আছে। প্রথম গানেই কবি জীবন দেবতার কাছে তাঁর অন্তরের বাসনা জানিয়েছেন,

"আমারে ভেঙে ভেঙে
করবে তোমার তরী
যাতে হয় মনোমত
তেমনি করে লও হে গড়ি।'

প্রকৃতি বিভাগে গীতি আছে সতেরটি। বিশ্বপ্রকৃতিকে অতুলপ্রসাদ একান্ত আপনজন বলে মনে করতেন। প্রকৃতির কাছে নিজের মনের ইচ্ছা জানাতেন,

"প্রকৃতি খোলটাখানি খোল লো বঁধু
খোলটাখানি খোল,
আছি আজ পরাণ মেলি দেখব বলি—
তোর নয়ন দুনিটোল, লো বঁধু
নয়ন দুনিটোল।"

প্রকৃতির রাজ্যে ঋতুর পরে ঋতু আসে। কবি তাদের প্রিয়জনের মত স্বাগত জানিয়েছেন। যখন ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে কবির মন তখন আনন্দে নেচে উঠে বলেছে,

"আইল আজি বসন্ত ধরি ধরি
কুসুমে রঞ্জিত কুঞ্জমঞ্জরী।"

অতুলপ্রসাদ স্বদেশ বিষয়ক গান লিখেছেন মোট তেরটি। চারণ কবিদের মত তিনি দেশবাসীকে দেশমাতৃকার বন্দনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

"বল বলবেদ নবে শত-বীণা-বেণু-রবে
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান হবে কর্ম্মে মহান হবে;
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।"

পৃথিবীর যে আটটি প্রধান ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পাওয়া যায় বাংলাভাষা তাদের মধ্যে একটি। কবির নিজের কথায় বলা যায় যে, এই ভাষাতেই গৌরা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, এই ভাষার বীণা বাজিয়েই রবীন্দ্রনাথ জগদ্বিখ্যাত "নোবেল" পুরস্কার এনেছিলেন। এমন যে বাংলা-ভাষা সেই ভাষা তাঁরও মাতৃভাষা। তাই দেশপ্রেমিক কবির এই ভাষা নিয়ে গর্ব্বের আর অন্ত ছিল না—

"যেদের গরব যোদের আশা
আমার বাংলা ভাষা।"

যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিকদের প্রভাব পড়ে সমকালীন সাহিত্যের ওপর। বাংলা সাহিত্যে এই রকম যুগপ্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। অতুল প্রসাদকে যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিকদের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। তবে তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তো অতুল প্রসাদের বন্ধু ছিলেন এবং কবির মৃত্যুর পর কবির উদ্দেশ্যে একটি শোকগাথাও রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ সমকালের কবি, সকলের মধ্যে বয়সের তফাৎ দু-পাঁচ বছর মাত্র। সকলে এঁদের অনুজ। উল্লিখিত পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল হল এঁরা সকলেই গীতিকার কবি। আবার সরমিলও আছে। অতুলপ্রসাদ একান্তভাবে গীতিকার কিন্তু অপর চারজন গান ছাড়া অন্য শিল্প সৃজনেও উৎসাহী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহুসাহিত্যের সর্ব ক্ষেত্রেই বিচরণ করে গিয়েছেন এবং তাঁর কবিখ্যাতি জগদ্বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল সুখ্যাত নাট্যকার ও কবি রজনীকান্ত এবং নজরুল দুজনেই এঁরা কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ তাঁর সমস্ত কবিতাকেই গান বলে মনে করতেন। তাঁর কাব্য সংকলন প্রথম ও পরিবর্ধিত সংস্করণের নামকরণের মধ্যেই এই উক্তির প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

অপর চারজনের থেকে অতুল প্রসাদের বিশিষ্টতা অন্যভাবেও প্রকাশ করা চলে। ভাষা যেখানে সুরারোপের জন্য আবশ্যিক সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অনুপম ছন্দে বদ্ধ। অন্তত: অতুল প্রসাদের কালে তাই ছিল। অবশ্য গদ্যেও ছন্দ আছে, সুর আছে। আছে বলেই সার্থক গদ্য-সাহিত্য কানের ভিতর দিয়ে মনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায়। রসিকজনেরা এই জন্যেই "নীরস তরুবর: পুরতো ভাসে" আর "শুষ্ক কাঠং বিষ্ঠিতাগ্রে"র মধ্যে প্রভেদ করতে পারেন। কবিতা যেখানে পাঠের জন্য কিম্বা আবৃত্তির জন্য সেখানে কবি সন্তোষ ছন্দের মত নানারকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা চলে কিন্তু কবিতা যেখানে সুর প্রকাশের সহায় সেখানে তা ছন্দমিল এবং প্রয়োজনীয় শব্দ-ঝঙ্কারে সমন্বিত হলেই সুবিধা হয়। বাংলাভাষায় গান মাত্রেই কবিতা, কবিতা মাত্রেই সাধারণভাবে গান বোঝায় না। অতুলপ্রসাদ গীত রচনা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাই সহজ সরল ছন্দবদ্ধ অন্ত্যমিল কবিতা রচনা করেছিলেন। অপর কবিদের সম্বন্ধে কিন্তু ঠিক এ মন্তব্য করা চলে না, গীতি ছাড়াও তাঁদের লেখনী থেকে বহুল পরিমাণে কবিতা প্রসূত হয়েছিল।

অনন্তর কাব্যের শোভা বর্ধন করে। আবার ঈশ্বরগুপ্তের মত কবিতায় অপরিমিত অলঙ্কারের ব্যবহারও কাব্যরসিকদের রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই অনভিজ্ঞ কবিদের কবিতাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অলঙ্কারের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট সতর্ক ও পরিমিত। কিন্তু অতুলপ্রসাদের কাব্যবিচার করলে কবি যে তাঁর কবিতায় অলঙ্কারের প্রয়োগ সম্বন্ধে কখনও সচেতন ছিলেন তা মনে হয় না। তাঁর কবিতায় যেখানেই অলঙ্কার আছে সেখানেই মনে হয়েছে যে অলঙ্কার যেন আপনা থেকেই পথ চলতি বন্ধুর মত ঠিক জায়গা মাফিক এসে জুটে গিয়েছে। কাব্যের অলঙ্কারের চেয়ে কবি বরং তাঁর কবিতায় আরোপিত রাগরাগিনী সম্বন্ধে অনেক বেশি মনোযোগী ছিলেন। এর প্রমাণ, "গীতিগুচ্ছে"র প্রত্যেক গানের নীচে গানটি কোন সুরে গাইতে হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ।

রাগরাগিনীর প্রতি এই মনোযোগ এবং আকর্ষণই প্রমাণ করে যে অতুলপ্রসাদের মনোবাসনা ছিল সুরসাধক হওয়ার, সাহিত্যিক হওয়ার নয়। "গীতিগুচ্ছে"র কবিতাগুলির মধ্যে যে অসামান্য কবি হওয়ার প্রকাশ হয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে কবি হওয়ার বাসনা থাকলে তিনি একজন যশস্বী কবি হতে পারতেন। আরও একটা কথা ভাববার আছে। সাহিত্যিক হতে চাইলে তাঁর লেখনী থেকে বিচিত্রতর শিল্পকর্ম প্রসূত হত। কিন্তু তা হয়নি। অর্থাৎ যিনি বিখ্যাত কবি হতে পারতেন তিনি আমাদের কাছে দেখা দিলেন সুরস্রষ্টা গীতিকার রূপে তাতে অবশ্য আমাদের লোকসান হয়নি কিছু। অতুলপ্রসাদী গানে সুর ছাড়াও আমরা কাব্যের আস্বাদটুকু পেয়েছি বাড়তি হিসাবে। শুধু কবি বলে আমরা হয়ত অতুলপ্রসাদের লেখনী থেকে আরও কিছু কবিতা উপহার পেতাম কিন্তু তাঁর কবিতা স্থান হয়ে লোকের মুখে মুখে ফিরত না। ফল হত এই যে নিজের জীবিত কালেই পাঠকদের মন থেকে আরও অনেক কবির মত তাঁর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। ঈশ্বর আমাদের এই দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছেন। তার ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুল প্রসাদের স্থান যদিও সীমিত হয়েছে তবু মূল্যায়ন করলে তার স্থান অনেক খ্যাতনামা কবির থেকে কম হবে না। বাংলা-সাহিত্যে এইটাই কবি অতুলপ্রসাদ সেনের অভিনব অবদান।

রত্নাকর

অভিনয় জিনিষটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশী ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে ..... যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মত বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ

পুরোনো কথা

বহুরূপে বহুভাবে

গত যুগের বিখ্যাত নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর এই অপ্রচলিত দুষ্প্রাপ্য রচনাটি আশা করি আজকের দিনের নাট্যানুরাগী সুধী, নাট্যকার ও অভিনেতা সকলের কাছেই গ্রহণীয় হবে। এই আত্মনিমগ্ন প্রচার-বিমুখ নাট্যসাধক তাঁর সময়কালে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

"শাস্ত্রে আছে, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল, নিরুপাধি পরম পুরুষের মনে হঠাৎ একদিন সখ জাগল "একোঽহং বহুস্যাম"—আমি এক আছি, বহু হব। সেইদিন থেকে তিনি হলেন স্রষ্টা কবি। উৎসব ক্ষেত্রে আলোক মালার মত অনন্ত নভোমণ্ডলে ফুটে উঠল গ্রহ, তারা, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী। এই সৃষ্টি স্রষ্টার খেয়াল—বহুরূপে বহুরসে, বহুভাবের অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি আপনাকেই পুনঃপুনঃ আস্বাদন করেন এই তাঁর লীলা। তিনি আপন আনন্দে সৃষ্টি করেন—আপন আনন্দে ধ্বংস করেন। এই যে নিজেকে বহুরূপে বহুভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা ইহাই নাটনাথের নাট্যলীলা।

আমাদের রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের মূল কথাও এই; আমি বহু হব, বহু মানবের মনোভাব আমি আমার মধ্যে অনুভব করবো এবং প্রকাশ করবো। নটের এই শ্রেষ্ঠ কামনা। আমার মনে

হয়, নট প্রবৃত্তি মানুষের একটী সহজাত বৃত্তি। ছোট ছেলে মেয়েরা অল্প কোন রকম খেলা খেলবার আগে খেলাঘরে যে পুতুল খেলা করে—কত আয়োজনে শিশু তার খেলাঘর গড়ে তোলে, তারপর কত তুচ্ছ কারণে তাকে ভেঙে ফেলে আবার নূতন খেলা আরম্ভ হয়—ছোট ছেলে-মেয়ের এই খেলাঘরের ভাঙা গড়ার মধ্যে যে নাট্যলীলা—বৃহৎ সংসারের খেলাঘরেও তাই।

যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে মানুষের জাগতিক জীবন, সেই আশা আকাঙ্খা নিয়েই তার নাট্য-লীলা। আবার দেশ ও কাল ভেদে মানুষের জীবনের আদর্শ যেমন পরিবর্ত্তন হয়, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শও ঠিক তেমনি রূপান্তর গ্রহণ করে। জাতির আত্মার সঙ্গে সেই জাতির নাটকের যেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এমন আর কোন সাহিত্যের সঙ্গেই নয়। প্রতি জাতির নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। তবে মানব আত্মা যখন দেশকালের বৈশিষ্ট অতিক্রম করে—যখন সে নীল আকাশের পানীর মত বাধ বন্ধ হারা—তখনই কেবল তার জাতিভেদ থাকে না—সর্ব্ব দেশেরই মানুষ তখন যে ভাষায় কথা কয়—তার সুর ও তন্ত্রী—সর্ব্বত্রই এক।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বোধকরি সকল জাতির ভিতরই কোন না কোন আকারে নাট্যাভিনয়ের চলন আছে। আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেই নাট্যাভিনয় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে—তার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নাটকাবলী। নাটকগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়লেই বোঝা যায় এগুলি শুধু পাঠ্যপুস্তক নয়। তা'ছাড়া সেকালের অনেক আখ্যায়িকায় অতি স্পষ্টভাবে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। আমাদের বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যাভিনয় কিন্তু সেই প্রাচীন কালের নাট্যাভিনয়ের পরিণতি নয়। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে পরিমাণে পৃথক, বাংলার নাট্যাভিনয়ও ঠিক সেই পরিমাণেই অন্যরকম! প্রাচীন যুগে (পাটলীপুত্র, কুসুমপুর প্রভৃতি রাজধানীতে) সংস্কৃত আদর্শের নাট্যাভিনয় সেকালে অনুষ্ঠান হ'ত সন্দেহ নেই—কিন্তু খাঁটী বাংলা ভাষায় ব'ঙালী জনসাধারণের জন্য যে নাট্যাভিনয় হ'ল তার রূপ পৃথক, প্রকৃত সংস্কৃত নাটক হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠাতা ও আচার্য্য স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব। পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেমের কাহিনী সংস্কৃতনাট্যাভিনয়ের বিষয়বস্তু, কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের যাত্রার বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত। এবং আজ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলাই বাঙালী জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যবস্তু। ইহার অনুভূত রসধারা বাঙালী হৃদয়কে চিরদিন উন্মত্ত করে। কৃষ্ণযাত্রার গানে বাঙালী এমন পাগল যে অন্য গানকে সে মানতেই চায় না, বলে—"কানু বৈ আর গীত নেই।" কানুর গান তার কাছে পুরোনো হয় না। শ্রেষ্ঠ মহাজন বৈষ্ণব কবি থেকে আরম্ভ ক'রে, যদু অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণকমল, দাশরথী, রসিক চক্রবর্ত্তী—সকলের গান সে শুনেছে—এখনও শুনতে চায়। কৃষ্ণযাত্রাই আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যাভিনয়।

তারপর এল ইংরাজী শিক্ষার যুগ। কয়েক বছরের ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাংলার সাহিত্য ও চিন্তার ধারায় যে রূপান্তর ঘটল তা ইতিপূর্বে আর কোন দেশে ঘটেছে কিনা জানিনা।

বাঙালীর জাতীয় জীবনের ভাবের ধারায় উজান বান ডাকল। তখন থেকেই বাঙালীর ভিতর একটি বৃহত্তর জাতিভেদ দেখা দিল। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী—আর শুধু বাঙালী। এই দুই সম্প্রদায় যেন দু'টি পৃথক জাতি। তখনকার দিনের সেই তথাকথিত ইংরাজী-শিক্ষিতের অনেকে রঙ্গমঞ্চ গড়া হ'য়েছিল। সেজন্যই ত' এখানকার সাহেবদের কাছে তার অভিনয় দেখে তাঁদের

কৃষ্ণযাত্রা'র আর গতি রইল না। সবারই মনে হ'ল—"এই রকম রাজপোষাক পরে, আলো জ্বালিয়ে, তলোয়ার নিয়ে যদি অভিনয় না হ'ল তো কিসের অভিনয়। রাধাকৃষ্ণের গ্যালস্যানারি, শুক সারীর কলহ—ওতে উচ্চ সাধারণের রসের পিপাসা হয়তো মিটতে পারে কিন্তু যেহেতু আমরা শেক্সপীয়র প'ড়েছি, মিলটন প'ড়েছি, ওসব আমাদের ভাল লাগবে না।"

তারপর রঙ্গালয় গড়া হ'ল। পাশ্চাত্যের অনুকরণে কত ভাঙাগড়া—কত রকমের অভিনয়-ভঙ্গিমা, স্যারিক, আরভিন্, বীরকুমারী কত নাম, কত ঢঙ, কত আলো-, কত তলোয়ার, কত পাঁচ, ষ্টেজের উপর অট্টালিকা, গাড়ী, ঘোড়া, নদী, পাহাড়, কত কাণ্ড হ'ল—কিন্তু সেই যে মধুসূদনের রাবণের রুদ্রকে যেমন মেয়ে বৃন্দা তিরস্কার করেছিলেন—(সে আসরে বৃন্দার কণ্ঠের সুর ছাড়া আর কিছু ছিলনা) সে রকম মর্মস্পর্শী গান আর কেউ গাইল না।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

আলোচনা

নবনাট্য আন্দোলনে একাঙ্ক নাটকের ভূমিকা

নবনাট্য আন্দোলনের আরম্ভ কালে একাঙ্ক নাটকগুলি বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এই ধরণের নাটকের প্রথম প্রকাশ হয়। আমেরিকা ইংল্যাণ্ড, এবং বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্যে একাঙ্কিকা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংলণ্ডে বার্ণার্ড শ, বেরী এবং গলসওয়ার্দী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের আশীর্বাদে একাঙ্কিকা বঞ্চিত হয়নি। Curtain-raiser রূপে একাঙ্ক নাটক তখন প্রায় উপন্যাসের মত ছিল। সিনজ, ইয়েট্স এবং লেডরী প্রভৃতি আইরিশ লেখক ও লেখিকাবৃন্দ ও তাঁদের আইরিশ 'লিটেরারী থিয়েটার' এবং তারপর 'আবে থিয়েটার' এবং পরবর্তীকালে ম্যাঞ্চেষ্টারে মিস হর্নিম্যানের 'মেনেচী থিয়েটার' ও গ্লাসগো রিপারেটরী থিয়েটর ইংলণ্ডে একাঙ্ক নাটকের প্রসারের পথে গভীর সহায়তা করে। এইভাবে বিশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একাঙ্কিকা সাহিত্য সমাজে তার পূর্ণ আসন লাভ করেছে। উপরিউক্ত ইংলণ্ডে P. D. L. অর্থাৎ বৃটিশ ড্রামা লীগ এবং S. C. D. A বৃটিশ কম্যুনিটি ড্রামা এসোসিয়েশনের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা এবং নানারূপ প্রচেষ্টা একাঙ্কিকাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে। আমেরিকা এই নাট্যসাহিত্যের উজ্জীবনের পথে আজ শ্রেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে।

যখন ইবসিয়ান ও গ্লাসগোর রিপারেটরী থিয়েটারের হাতে এই একাঙ্কিকা সাহিত্যের নব নবরূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল, ঠিক সেই সময় বাংলা সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে শ্রীমন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' এই পথের প্রথম পথিকৃৎ। ইতিপূর্বে একাঙ্ক নাটিকা যে আদৌ লেখা হয়নি তা নয়; যে দুটিয়ের কয়েকখানি লিখিত হয়েছিল তা farce নামে আখ্যাত হতে পারে; তদুপরি আকার সেইগুলি বহু দৃশ্যে সমৃদ্ধ থাকায় বিষয়বস্তুর একাঙ্কিকা হয়নি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে শক্তির যে বিদ্যুৎ আলোড়ন দেখা দেয় তার অভাব এই জাতীয় নাটিকায় অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা যায়। শ্রীমন্মথ

রায়ের 'মুক্তির ডাক' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। এই নাটিকা পাঠ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "মুক্তির ডাক আমার খুব ভাল লেগেছে—এখানি যথার্থই একখানি ড্রামা। বাংলা সাহিত্যে ওই জিনিষ একান্ত দুর্লভ।" বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম লিখেছিলেন, "এক বুক কান্না ভেঙে পথ চলে এক দিষি পদ্ম দেখলে দুচোখে আনন্দ যেমন ধরে না তেমনি আনন্দ দুচোখ পুরে পান করেছি আপনার লেখার।"

উপন্যাস থেকে ছোটগল্প যেমন সম্পূর্ণ পৃথক, তেমন পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে একাঙ্ক নাটক সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু যে দৈর্ঘ্যে এই পার্থক্য তা নয়, আকৃতি ও প্রকৃতিতেও দুটটি পরস্পরের বিপরীত। একাঙ্কিকা মাত্র একটি প্রধান নাটকীয় ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করে। নাটিকার প্রধান উদ্দেশ্যও হয় মাত্র একটি ফলাফল সৃজন করা, তা বিয়োগান্ত হোক বা মিলনান্ত হোক। আর, এজাতে নাটিকার অভিনয় যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হয় তখন তাকে সার্থক করে তুলতে হলে নাটকের গঠনবৈপুণ্যে দীর্ঘসূত্রতা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। স্থান কাল পাত্র সমন্বয়েও সূক্ষ্মতা দেখতে হয়। সেখানেই শিল্পীর শিল্প সৃজনের বিরাট নৈপুণ্য। প্রথম দৃশ্যপটের উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের চিত্ত জয় করে ফেলতে হবে এবং সেই অবস্থায় নাটিকার শেষতম পর্যায় তাঁদের মনকে আকৃষ্ট করে রেখে দিতে হবে। নতুবা সব ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। দুর্বল ঘটনা বিন্যাস বা বিশ্লেষণ করার সেখানে সময় নেই, অবসরও নেই; একটি প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যপ্রকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সুবিধাও নেই। পাঠনিক ও বাচনিক সৌকর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গেলে শিল্পীকে অতি সতর্ক ভাবে চলতে হবে, তবেই সার্থকতা। এটা সম্ভবপর করে তুলতে পারলে সেখানেই হবে একাঙ্কিকার বিরাট শিল্প সম্ভাবনা।

আবার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মাঝে থাকবে জোরালো বাচন ভঙ্গিমা এবং অল্পক্ষণ চরিত্র বিশ্লেষণ। এই বাচনিকগুণ ও চরিত্রের বৈশিষ্ট একাঙ্কিকার প্রাণমূলে প্রাচুর্য্য বহন করে। তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নাটকীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘাত-সংঘাতে।

অহীন্দ্র চৌধুরী

নব নাট্য গোষ্ঠী

গতমাসের নানা অভিনয়

সংস্কৃতি সংহতি। রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যসংস্থা সম্প্রতি তাঁদের দু'দিন ব্যাপী নাট্য-উৎসবে প্রথম দিন রবিদাস সাহারায়ের শিশুনাটক 'ঝংলী-ঝংলী' এবং দ্বিতীয় দিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'আগন্তুক' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। শিশু শিল্পীদের অভিনয় সকলকে অশেষ আনন্দ দান করেছিল। আগন্তুক নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গুহ, রবি দে, অমিতাভ দাহা ও লক্ষ্মী দেবী সুঅভিনয় করেন।

আগামী গোষ্ঠী। এঁরা কয়েকদিন আগে সাফল্যের সঙ্গে তারু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকটির অভিনয় করেছেন। পরিচালনায় কানু দত্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অভিনয়ে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, রবিন মৈত্র, অনল চক্রবর্তী, মহুয়া আইচ, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

সুর ও বাণী। এই সংস্থার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অভিনীত হয় শৈলেন ওঝা বিয়োগীর "স্বর্গ"। চরিত্রচিত্রণে অনেকের অভিনয় যথোপযুক্ত না হলেও পঙ্কজ ঘোষ, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন ঘোষ ও অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়ের সুঅভিনয় দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। পরিচালনায় ছিলেন পঙ্কজ ঘোষ।

অগ্রণী। আরামবাগের এই প্রগতীশীল নাট্যসংস্থার তৃতীয় বার্ষিক নাট্যোৎসবে সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' অভিনীত হয়। প্রথম দিনের অভিনয়ে (ডাউন ট্রেন) বিভাই দে ও জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। সাজাহান নাটকের নাম ভূমিকায় পরিচালক মধু মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

নানা প্রসঙ্গ

থিয়েটার সেন্টারের পরবর্তী নাটক

এই শেষুরায় নাট্য সংস্থার অধিনায়ক তরুণ রায় এরমধ্যে নাটক লেখেন বা অন্যের নাটক নির্বাচিত করেন যাতে তাঁর এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী লীলাবিতা রায়ের সমান ভূমিকা থাকে।

"বিদেহীর" পর তরুণ রায় মঞ্চস্থ করবেন—শরৎচন্দ্রের ষোড়শী। বলা বাহুল্য তরুণ রায় জীবানন্দ এবং শ্রীমতী রায় ষোড়শীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

শিশিরকুমার যখন ষোড়শী নাটকটিকে নিজের ধ্যান ধারণা দিয়ে তৈরী করেন তখন তা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয় এবং শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে মেনে নিতে হয় যে ষোড়শী-কে বিয়োগান্ত নায়িকারূপেই উপস্থিত করতে হবে অন্যথায় তার অভিনয় কখনই সফলসার্থক হবে না।

যাই হোক, সেই নাটক মঞ্চস্থ হবার পর স্বয়ং শরৎচন্দ্র অভিভূত হয়ে শিশিরকুমারকে বলেছিলেন—শিশির, মনে হচ্ছে যেন তোমার কাছেই আমি জীবানন্দ নামে একটি চরিত্র এঁকেছিলাম।

আমরা ত্রিশ দশকে বার আটেক ষোড়শীর অভিনয় দেখেছি এবং প্রতি বারই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, শিশিরকুমারের অভিনয়ের মধ্যে নতুন নতুন সুক্ষ্মকাজ, যেগুলি সাধারণ দর্শকদের হয়ত বোধগম্য হতনা। যাঁরা ঐ নাটক নিয়ে মঞ্চ হয়ে আলোচনা করেছেন, অভিনয় জিনিষটাকে যাঁরা বোধের মধ্যে আয়ত্ত করেছেন—তাঁরা বুঝতে পারতেন তাঁর সেই সব অনির্বচনীয় ভাবপ্রকাশ।

তাঁর জীবানন্দ দেখবার সময় মনে হত না যে তিনি অভিনয় করছেন। মনে হত যেন জীবন্ত জীবানন্দ তাঁর জীবনের ইতিহাস নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আর তাঁর সঙ্গে সমানভাবে অনবদ্য অভিনয় করতেন ষোড়শীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা।

দুজনে তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে প্রেক্ষাগারে যে শিহরিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করতেন, বাংলা রঙ্গমঞ্চে তা বোধ করি তুলনা-রহিত।

আমরা আশা করি, রায় দম্পতী তাঁদের অভিনয়ে চরিত্র দুটির মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন।

থিয়েটার সেন্টারের ষোড়শী প্রথম মঞ্চস্থ হবে—রবীন্দ্র সদনে।

এটনী কবিয়ালের সম্মান

বিশ্বনাথ মঞ্চে অভিনীত বিষায়কের এটনী কবিয়াল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। নাটকটি এবং তার অভিনয় দুইই সত্যিই ভাল এবং সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনাও করেছি এই বিভাগে।

জেনে আনন্দ হল, সম্প্রতি রাজধানী দিল্লী থেকে এই নাটকটির অভিনয়ের জন্যে শিল্পীরা আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে গত মাসে অভিনয় করতে গিয়ে ছিলেন এবং তাঁদের অভিনয় দেখে বাঙালী ও অবাঙালী দর্শকরা একযোগে তাঁদের অভিনন্দন দিয়েছেন।

প্রবাসীর (কুলটি) প্রচেষ্টা

কুলটির নাট্যসংস্থা প্রবাসী ইতিপূর্বে অনেকগুলি নাটক অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা পুনরায় (তৃতীয়বার) কলকাতায় আসছেন আগামী মাসে। এবার তাঁরা যে নতুন নাটকটি নিয়ে কলকাতার দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন তার নাম—'সাগর তুফান'। নাট্যকার তপন রায়ের এক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটি পরিচালনা করবেন। অভিনয়াংশে আছেন, ইলা ঘোষ, রবি রায়, শ্যামাপদ রাজগুরু, মতি মুখোপাধ্যায় ও বরুণ চট্টোপাধ্যায়। আশা করি, তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে।

বিশ্বনাট্য দিবস

কলকাতার কয়েকটি নাট্য সম্প্রদায় থিয়েটার সেন্টার হলে বিশ্বনাট্য দিবস পালন করেন। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন অধ্যাপিকা শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রধান অতিথি।

প্রধান অতিথি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বাক্তিগত ভাষণে এদেশের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে গুজরাটী সাহিত্য সংসদ মঞ্চস্থ করেন বৈরাগীর 'রজনীগন্ধা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

নটকুল চূড়ামনি অর্দ্ধেন্দুশেখর

মলিনীরঞ্জন মিত্র

বাগবাজারের মুস্তাফী পরিবারে ১৮৫০ খৃঃ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট অর্দ্ধেন্দুশেখরের জন্ম হয়। শৈশবাবস্থাতেই তিনি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিদ্যালয়ে পাঠকালীন তিনি নানাজনের নানা ভাবভঙ্গী ও কথা অনুকরণ করে সহপাঠীদের অভিনয়িক কৌশলে মুগ্ধ করতেন। এজন্যে বন্ধু মহলে তাঁর বিশেষ সমাদর ছিল। এই সময়েই তিনি দু-একখানা নাটকে বিশেষ অভিনয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধু তাঁকে বাগবাজারে গিরিশচন্দ্রের দলে নিয়ে আসেন। গিরিশচন্দ্র তখন 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের আয়োজন করছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরকে ঐ নাটকে জীবন চন্দ্রের ভূমিকা দেওয়া হয়। তাঁর অভিনয় সবাইকে বিশেষ প্রীত করে। দীনবন্ধু মিত্র নিজে বলেছিলেন, "আপনি অটলকে যে নাড়ি মেরে চলে গেলেন এটা improvement on the author"। এরপর নীলাবতী নাটকে তাঁকে হরবিলাসের ভূমিকা দেওয়া হয়। ঐ ভূমিকাতেও তিনি সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

তারপর তাঁরই নেতৃত্বে নীলদর্পণ অভিনয়ের রিহার্সাল সুরু হয়। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে এক বাড়ীতে মহলা চলতে থাকে। এখানেই তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু বিখ্যাত নট ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলালকে অভিনেতারূপে আবিষ্কার করেন এবং তাকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা দেন। নীলদর্পণ রিহার্সাল চলছে, দলের নাম National Theatre—টিকিট বেচবার প্রস্তাব হ'ল কিন্তু গিরিশচন্দ্র অমত করলেন। তিনি বললেন এখনও টিকিট বেচবার সময় হয়নি। কিন্তু দলের সকলেই একমত। অগত্যা গিরিশচন্দ্র দল ছাড়লেন। নীলদর্পণ অভিনয় হয় ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। কলকাতায় Public Stage প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। সেই সঙ্গে স্মরণীয় Public Theatre-এর জনক বিখ্যাত নট অর্দ্ধেন্দুশেখর।

মানুষ হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে কত বড় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই প্রসঙ্গে। গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে এক শ্লেষাত্মক গান রচনা করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর এই গানের উল্লেখ করে বলেছিলেন……"কবিত্বশক্তি ও শব্দযোজনার ক্ষমতায় প্রশংসা না করে থাকা যায়না।" তিনি এই সময়ে যে সংযত ব্যবহার করেছিলেন তাতেই তাঁর মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

গিরিশ যুগের শ্রেষ্ঠ নট অর্দ্ধেন্দুশেখর অভিনয় কলায় অভূতপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। নীলদর্পণ নাটকে তিনি সোমচরবাবু, উডসাহেব, একজন রায়ত ও সাবিত্রীরূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রত্যেক ভূমিকাতেই তিনি বিস্ময়কর অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। "নবীন তপস্বিনীর" অভিনয়ের

অভিনয় অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। তাঁর অভিনয় দক্ষতার উল্লেখ করে গিরিশচন্দ্র বলছেন "অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই; অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্দ্ধেন্দু বাবু আসিয়াছেন, এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একজন, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে, বৃত্তপট, অভিনেতা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়না। অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দুবাবু চমৎকার—এই কথা।" কিন্তু গিরিশবাবুর এই উক্তি প্রশংসা না প্রশংসার ছলে নিন্দা বলা কঠিন। আত্মগোপন অভিনেতার একটি বিশেষ ক্ষমতা এবং সে ক্ষমতা অর্দ্ধেন্দু শেখরের ছিল। তাই সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত অভিনেতা অপরেশচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। তিনি বলছেন—"যে ভূমিকা লইয়াই অর্দ্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন তাহাতেই দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু নহে, অর্দ্ধেন্দুর বিশেষত্ব, অর্দ্ধেন্দুর কৃতিত্ব, অর্দ্ধেন্দুর মৌলিকত্ব। অর্দ্ধেন্দুবাবুর অভিনয় দেখিয়া আমাদের মনে হয় তিনি যে চরিত্র সাজিয়াছেন হুবহু তা যেন সেই চরিত্রের অনুযায়ীই হইয়াছে।"

গিরিশযুগে হাস্যরসাত্মক ভূমিকাতে অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অনায় বিন্দুবক ও আবু হোসেনে আবু হোসেনের ভূমিকায় তিনি অপূর্ব অভিনয় ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন এমনকি গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত ঐ ভূমিকাতে তাঁর মত সাফল্যলাভ করতে পারেননি। রূপসনাতন ভূমিকাতেও তিনি কিছু কম ছিলেন না। বলিদান নাটকে রূপনারায়ণের ভূমিকাতে তাঁর কৃতিত্ব গিরিশচন্দ্রের পরই। যোগেশের ভূমিকাতেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহেবের ভূমিকাভিনয়ে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নীলদর্পণের উড সাহেব তার অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। রঙ্গজগতে তাই তিনি 'সাহেব' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর আর একটি ক্ষমতা ছিল অভিনয়কালে নাটকের কথায় তিনি কিছু নিজের কথা যোগ করে দিতে পারতেন। উপস্থিত হাবভাব পরিবর্তন করার কলাবিদ্যায় তিনি অদ্ভুত পারদর্শী ছিলেন। ইউরোপের ন্যায় এ দেশেও যদি Variety Theatre-এর প্রচলন থাকতো তাহলে অর্দ্ধেন্দু বাবু প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কণ্ঠস্বরের উপরও তাঁর অদ্ভুত অধিকার ছিল। মুহূর্তমধ্যে আশ্চর্য্য যোগন করে বিভিন্ন স্বরে তিনি কথা বলতে পারতেন।

বহু ভূমিকার প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিলনা, প্রায় প্রত্যেক নাটকেই তিনি দুতিনটি ছোট ভূমিকা বেছে নিতেন। এই ছোট ভূমিকার মাধ্যমেই তিনি তাঁর অভিনয় প্রতিভায় স্বাক্ষর রাখতেন। অভিনয় শিক্ষকতায় অর্দ্ধেন্দুশেখর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলেছেন যে সধবার একাদশীতে হারোয়ানরূপে তিনি যেভাবে শিখিয়েছিলেন তার তুলনা নাই। উচ্চারণের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই উচ্চারণ দুরস্ত করবার জন্য তিনি প্রথম শিক্ষার্থীকে সংস্কৃত স্তবস্তোত্র পাঠ করতে বলতেন। তিনি বলতেন এতে জীবের আত্ম জাগে এবং রস বাড়ে। তিনি সুর বর্জিত আবৃত্তির পক্ষপাতী ছিলেন। Expression-এর প্রতিও তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

অর্দ্ধেন্দুশেখর মূলত অভিনেতা ছিলেন, বিষয়ী ছিলেন না। তাই যদিও তিনি এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হননি। অসীম ধৈর্য্য ছিল অর্দ্ধেন্দু শেখরের। পরপর সাতদিন ধরে বই পড়েও তাঁর ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটতো না। যদি কোন উঠতি নাট্যকার তাঁকে নাটক শোনাতে আসতো তিনি একটুও বিরক্ত না হয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনতেন। রিহার্সাল রুমে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করতেন না।

রিহার্সালের পর সবাই তার বন্ধু। তাঁর যশ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানেই দশজন বাঙালী বসে নাটকের কথা আলোচনা করতেন সেখানেই অর্দ্ধেন্দু বাবুর নাম প্রচার হত।

রঙ্গালয়কে তিনি ভালবেসেছিলেন অসুবিধাও তাকে কম ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু সব কিছুই তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। রঙ্গালয় অর্দ্ধেন্দু বাবুর জীবন ছিল। তাই তিনি গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারতেন—

তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এপদে পদ করেছি অর্পন
রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশায় সেথায় করি জীবন যাপন।

নাটক রচনাতেও অর্দ্ধেন্দুশেখর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তার প্রথম প্রহসন 'তপস্বানকুত' মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করা হয়। এর পূর্বে তিনি 'দুর্গাপূজার সকবং' নামে একখানা নাটক লেখেন। এই নাটকখানি Emurld থিয়েটারে অভিনয় করা হয়। অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্বরেশাস্ত্রুরাগের পরিচয়ও পাওয়া যায়। National Theatre 'ভারত মাতা' অভিনয় করে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে রঙ্গমঞ্চ রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রচারের অন্যতম platform.

সেযুগে গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু মতভেদ রঙ্গজগতে আলোচনার একটি দুঃখরোচক বিষয় ছিল। অর্দ্ধেন্দুশেখর এই মতভেদের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। আর গিরিশচন্দ্র এবিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন যে National Theatre স্থাপনা নিয়ে মতান্তর হয়নি। প্রকৃত মতভেদ হয় যখন National Theatre জোড়াসাকোর সান্যাল বাড়ীর প্রাঙ্গন থেকে তুলে নেওয়া হয়। প্রশ্নহিল অর্জিত অর্থকোষ কোথায় থাকবে। আর যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলতেন তাদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নই উঠেনা, কারণ প্রায় প্রতি নাটকেই তিনি নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন আর অর্দ্ধেন্দুবাবু হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকায় অভিনয় করতেন। ভিন্ন রসের অভিনয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না।

গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় অর্দ্ধেন্দুশেখরের মৃত্যু হয়। সমস্ত রঙ্গজগৎ সেদিন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। এ ক্ষতি সেযুগের রঙ্গালয়ের পক্ষে অপূরণীয় ছিল সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে এক শোক-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রই ছিলেন প্রধান বক্তা। তিনি যে ভাষায় এই নটসম্রাটের জীবনকথা বর্ণনা করেছিলেন তার থেকে বেশী আর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

"রঙ্গালয় তাঁর জীবন ছিল, রঙ্গালয়ের কথা তাঁহার কথা ছিল, রঙ্গালয়ে দীক্ষাদান তাঁহার কার্য্য ছিল, রঙ্গালয় তাঁহার আবাস ছিল, নাট্যামোদী ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার অন্য আত্মীয় ছিল না।"

চিত্রাঙ্কিত

অভিনেত্রীর জীবন

ক্লেয়ার ব্লুম

অভিনেত্রী ক্লেয়ার ব্লুমের জন্ম লণ্ডনে, ১৯৩১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তাঁর বাবা এডওয়ার্ড ব্লুম ছিলেন কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ১৯৫৩ সালে এডওয়ার্ড মারা যান। ক্লেয়ার ব্লুম অভিনয় প্রবণতা পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে।

ক্লেয়ার ব্লুম খুব যে সুন্দরী ছিলেন তা নয়। তার উপরে ছিলেন লাজুক। তিনি জীবনে প্রথম যে ছায়াছবিটি দেখেন সেটি হলো 'রোমিয়ো অ্যাণ্ড জুলিয়েট'। একই বছর তিনি দেখলেন ওয়াল্ট ডিজনের 'দো হোয়াইট অ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফস'। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মঞ্চে প্রথম নাটক দেখেন 'হোয়্যার দি রেইনবো এণ্ডস'। এই সময়ে তাঁর বয়েস মাত্র সাত।

আমেরিকা যাবার পথে মা তো ব্লুমকে হ্যামলেট প'ড়ে শোনালেন। ফল হলো সাংঘাতিক। ভূতের ভয়ে ব্লুমের আর ঘুম আসে না। সারারাত আলো জেলে রাখতে হলো। আটবছর বয়স ব্লুমের প্রিয় নাটক ছিলো 'জুলিয়াস সীজার'।

কনকেসল অব অ্যান ইংলিশ গভর্নেস ইটার, দি হোয়াইট ডেভিল, দি উইন্টারস টেল, কিং জন, হ্যামলেট, দি ডাচেস অব ফক, দি সেভি'স নট ফর বার্নি, রিং রাউণ্ড দি মুন, রোমিয়ো অ্যাণ্ড

ফুলিয়েট, দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস ইত্যাদি বহু বিখ্যাত নাটকে অভিনয় ক'রে ফ্রেয়ার ব্রুস মঞ্চ-অভিনেত্রী রূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

রুপালী পর্দায় তাঁর প্রথম আত্ম-প্রকাশ 'দি ম্যান বিটুইন' ছায়াছবিতে। ওই ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেন বিখ্যাত অভিনেতা জেমস মেসন। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এবং তৃতীয় রিচার্ড ছায়াচিত্রেও ব্রুস অভিনয় করেন। তৃতীয় রিচার্ড ছবিতে তিনি অভিনয় করেন সুবিখ্যাত অভিনেতা লরেন্স অলিভিয়ার-এর সঙ্গে। লুক দ্যাট ইউ অ্যাভ'রে ও ডুয়েল অব আরেনস ছবি দুটিতে ব্রুস অভিনয় করেন। এই দুটি ছবিতে তাঁর সহ অভিনেতা ছিলেন ভিভিয়েন লী। লুক দ্যাট ইউ অ্যাভার ছবিতে তিনি অভিনয় করেন প্রণয়িনীর ভূমিকায়। ওই ভূমিকায় অভিনয় করতে প্রথমে তাঁর আপত্তি ছিলো।

দি ব্রাদার্স ক্যারামাজভ অবলম্বনে রচিত ছায়াছবিতে অভিনয় কালে ডস্টয়েভস্কীর ওই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস তিনি বহুবার প'ড়ে ফেলেন। পরিচালক রিচার্ড ব্রুকের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র ও বিষয় বস্তুটি নিয়ে অনেক আলোচনা ও তিনি তখন করেন।

ফ্রেয়ার ব্রুস চিত্র-তারকা রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন সত্যি কিন্তু তাঁর মনের টান বোধহয় মঞ্চের দিকে। বিশেষ ক'রে শেক্সপীয়রের নাটকের কথা মনে হলেই মনে পড়ে ফ্রেয়ার ব্রুসের নাম। তিনি যে শেক্সপীয়রের বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। কখনো হ্যামলেট, কখনো ভায়োলা কখনো ওফেলিয়া, আবার কখনো মিরাণ্ডা। মঞ্চ ও পর্দা এই দুয়ের সমঝদারদের কাছেই ফ্রেয়ার ব্রুস একটি অতি পরিচিত ও প্রিয় নাম।

ছায়া ছবির কাহিনী

মিতুয়া (ভোজপুরী ছায়াছবি)

ঠাকুর গজরাজ সিং গাঁয়ের মোড়ল। অত্যন্ত রক্ষণশীল। সনাতন রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানে তাঁর অন্ধ বিশ্বাস। সামাজিক অনুশাসন যাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তার দিকে সর্বদাই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

ওই গ্রামেরই এক বিধবা যুবতী শ্যামলী। সে চায় নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে। জীবনের দোসরও সে খুঁজে পেয়েছে। তার মনের মানুষের নাম প্রেমী। সে স্বপ্ন দেখে প্রেমীর সঙ্গে ঘর বাঁধবার। নারী-জন্মকে সে চায় সার্থক ক'রে তুলতে। হয়তো ওদের স্বপ্ন সত্যি হতো। কিন্তু পর্বত-প্রমাণ বাধা নিয়ে হাজির হলেন গজরাজ। শ্যামলীকে গ্রাম ত্যাগ করতে হলো। আর প্রেমীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিলো।

ওই গ্রামে একদিন এসে হাজির হলেন ডাক্তার রায়। গজরাজের মেয়ে যমুনা এবং তার সখী শান্তির প্রথমে ডাক্তার রায়কে ভালো লাগে নি। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ডাক্তার রায় যমুনার প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

কিন্তু আগেকার প্রস্তাব অনুসারে ভানুপ্রতাপের ছেলের সঙ্গে যমুনার বিয়ে ঠিক হলো। উৎসবের দিন সবাই অবাক হয়ে দেখলো যে, যে বরটী উৎসব উপলক্ষ্যে এসেছে সে হলো শ্যামলী।

লজ্জায় সকলের মুখ চুণ। অলঙ্কারের মৌসুমে আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে বাড়িতে রাত্রিবেলা ডাকাত পড়লো। ভানুপ্রতাপের ছেলে মারা গেলো। শাশুড়ীর গঞ্জনায় ও তিরস্কারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো যমুনার। শেষ-পর্যন্ত গজরাজ এসে মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

যমুনা চেষ্টা করে সংযত থাকার। কারণ তার বিন্দুমাত্র খুঁত দেখতে পেলে গ্রামের লোক কিছু বলতে বাকি রাখবে না। তার বাবা গজরাজ যে সমাজের শৃঙ্খলা-বিধানের কর্তা। কিন্তু যমুনার জীবন-যৌবন অনাঘ্রাত কুসুমের মতো দিন-দিন করে যাচ্ছে দেখে ডাক্তার রাম দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তার মনে সঞ্চিত হয় প্রতিবাদ। এখনো তার মনে যে যমুনার প্রতি আকর্ষণ। গ্রাম ছোট, তাই চেষ্টা ক'রেও পরস্পরকে এড়ানো যায় না। হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। ডাক্তার রাম চেষ্টা করেন যমুনার কাছে মনের কথা খুলে বলতে। কিন্তু যমুনা তাকে সে সুযোগ দেয় না। ভাগ্যলীর ভাগ্যে কী ঘটেছে তা তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। তাছাড়া বিধবাদের মনের বেদনা উপলব্ধির ক্ষমতা তার বাবা গজরাজ সিংহের নেই। ডাক্তার রাম একদিন স্পষ্ট ভাষায় যমুনাকে জানালেন তিনি ওকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু যমুনা রাজী হলো না। এই বিয়ে হলে সমাজে যে নিন্দার ঝড় উঠবে তার মুখোমুখী হবার সাহস ওর নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই যমুনার জীবনে দেখা দিলো এক নতুন বিপদ। গ্রামের কুখ্যাত লম্পট কুন্দন যমুনার জীবন অসহ্য ক'রে তুললো। একদিন তো সে যমুনার সতীত্ব নষ্ট করবারই উপক্রম করেছিলো। হঠাৎ প্রেমী এসে পড়ায় তার সম্মান রক্ষা পায়। এই ঘটনার পরে যমুনা সাহসী হয়ে ওঠে। নিজেই গিয়ে ডাক্তার রামকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

গোপনে বিয়ের আয়োজন করা হয়। কিন্তু বিয়ের আসরে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে গজরাজ সব ভণ্ডুল ক'রে দেন। তিনি আগে থেকেই খবর পেয়েছিলেন। গজরাজ কঠোর ভাষায় জানিয়ে দিলেন ডাক্তার রাম যদি অবিলম্বে অন্য পাত্রীকে বিয়ে না করেন তবে গজরাজ তার নিজের মেয়ে যমুনাকে খুন ক'রেই ফেলবেন।

ভানুপ্রতাপের মেয়ের সাথে ডাক্তার রামের বিয়ে স্থির করলেন গজরাজ। ভাগ্যলী ভানু-প্রতাপকে সময় মতো খবর দেয়ার আর বিয়ে হতে পারলো না। ভানুপ্রতাপ প্রশ্ন তুলে ধরলেন: "ভারতবর্ষ যদি সতীদাহ প্রথা লোপ ক'রে থাকে তবে বিধবার পছন্দ মতো পাত্রকে বিয়ের অধিকারই বা কেন দেবে না?"

কী ক'রে গজরাজের দর্প চূর্ণ হলো, গ্রামের সামাজিক অচলায়তন ভেঙে পড়লো তা প্রত্যক্ষ করা যাবে রূপালী পর্দায়।

নট-নটী

১৯৬৮ সালের অস্কার পুরস্কার

১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে অস্কার পুরস্কার লাভ করেছেন লিজ টেলর। জন্মসূত্রে তিনি ব্রিটিশ। 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ' ছায়াছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করলেন।

আর 'এ ম্যান ফর অল সীজন্স' ছবিতে অভিনয় ক'রে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে অস্কার পুরস্কার অর্জন করেছেন পল স্কোফিল্ড।

রতন বাই লোকান্তরিত

চল্লিশের যুগের চিত্র-তারকা রতন বাই গত ৪ঠা মার্চ বোম্বাইতে পরলোকে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিলো ৫৬।

যৌবনকালে তিনি রূপসী অভিনেত্রীরূপে বিখ্যাত ছিলেন। 'ইয়াহুদি কি লেড়কী', 'ভারত কি বেটি' ইত্যাদি বহু ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। তিনখানি ছবির প্রযোজকও তিনি ছিলেন। তাঁর শেষ ছবি 'বন্দে'। ছবিটি নির্মোদিত হয় ১৯৪৬ সালে। রতন বাইয়ের দুটি ছেলে আছে।

রাজশ্রী-গ্রেগরী সাক্ষাৎকার

অভিনেত্রী রাজশ্রীর কর্মসূচীতে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। আগে স্থির ছিলো যে তার প্রেমিক গ্রেগরী চ্যাপম্যান এ-বছরের আগষ্ট মাসে রাজশ্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভারতে আসবেন। কিন্তু এখন স্থির হয়েছে রাজশ্রীই গ্রেগরীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভারতের বাইরে যাবে। তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণ এখনো জানা যায়নি। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের চিত্র-জগতে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। সম্ভবত একটা এস্পার ওস্পার করার জন্যই সে যাচ্ছে।

জেমস মেসন-এর জনপ্রিয়তা

য়ুরোপের চিত্র-জগতে খ্যাতনামা অভিনেতা জেমস মেসন আরো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অবশ্য এবারো তিনি বছরে তিনবার হলিউডে যান। যান ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। স্পেনে বহু অর্থব্যয়ে তিনি চমৎকার একটি বাড়ি কিনেছিলেন। তখন তিনি 'ফল অব দি রোমান এম্পায়ার' ছবিতে অভিনয়ে ব্যস্ত। স্পেনেই সারাজীবন কাটাবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু এখন মত পরিবর্তন করেছেন। এখন তিনি আছেন লণ্ডনে।

ছায়াবাণী সংবাদ

সিডনীর চলচ্চিত্র উৎসব

১৯৬৭ সালের ৩০শে মে থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত যে চলচ্চিত্র উৎসব সিডনীতে অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভারতের তরফ থেকে উপস্থিত করা হবে তিনটি ফীচার চিত্র ও দু'টি তথ্য চিত্র। তিনটি ফীচার ফিল্ম যথাক্রমে: 'নায়ক', 'অতিথি' ও 'অনথামুনু'। শেষোক্ত ছবিটির সংলাপ তেলেগু ভাষায়। দুটি তথ্যচিত্র হাজির করা হবে: 'দর্পণাক্ষী লবাকুকন' ও 'ফ্রিডম অব মৌজি রাম।' দুটি ছবিই ভারত সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত।

আনসারীর পরবর্তী অপরাধ চিত্র

অভিজ্ঞ চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা এম. এ. আনসারী একখানি অপরাধমূলক ছায়াছবি তৈরী করবেন ব'লে স্থির করেছেন। ছবিটির নাম হবে 'মিঃ মার্ডার।' ইউন্যানকালারে

ছবিটি রচিত হবে। ছবির বেশির ভাগ দৃশ্য গৃহীত হবে বৈয়ারিট, ত্রিপলী ও আলজিয়ার্স-এ। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনা—দুয়েরই দায়িত্ব নিয়েছেন মিস্টার আবদারী।

মস্কোর চলচ্চিত্র উৎসব

মস্কোর পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আসন্ন। এই প্রতীক্ষিত উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এই জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত। আধুনিক চলচ্চিত্রের প্রতিনিধিত্ব মূলক ও সব চাইতে ব্যাপক মিলন-মঞ্চ মস্কোর এই অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের সিনেমা কর্মীদের মধ্যে ও বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ব্যবধান দূর ক'রে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রুশ সরকার এই উৎসবের আয়োজন ক'রে থাকেন। এই উৎসব প্রাঙ্গনের দ্বার পৃথিবীর সব দেশের কাছেই উন্মুক্ত। যে কোনো দেশ রুশ চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি পাঠাতে পারে।

পরিচালকের সন্ধানে

'দি পাবলিক আই' ছবিটি পরিচালনা করার জন্য একজন উপযুক্ত পরিচালকের সন্ধান করছেন রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর। দক্ষিণ ফ্রান্সে 'দি কমেডিয়ানস' ছবিটি তাঁরা তুলেছেন মাত্র ছ সপ্তাহে। কিছুদিনের জন্য তাঁরা দুজনেই সাময়িক ভাবে অবকাশ যাপন করছেন ব'লে স্থির করেছেন।

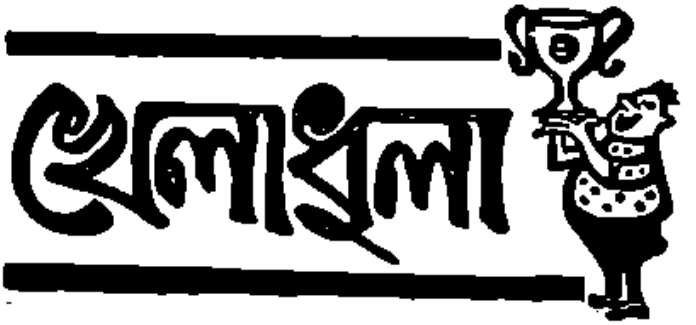

ইংল্যাণ্ড বনাম ভারত

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছে এবং দুই দলের মধ্যে যথাযথ পর্যায়ে তিনটি টেস্ট খেলার আয়োজন হয়েছে। যে ষোলো জন খেলোয়াড় সফরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাতে দেখা গেছে যে নির্বাচক সমিতি জোর দিয়েছেন তারুণ্যের উপর—এবং নির্বাচিতদের মধ্যে তিনজনে কোনো টেস্টই খেলেননি। অভিজ্ঞদের মধ্যে আছেন কেবল বোম্বে, যিনি দলের সহযোগী অধিনায়ক—এবং পতৌদিরও ইংল্যাণ্ডে খেলার অভিজ্ঞতা আছে! আর কারুরই ইংল্যাণ্ডে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। এখানে ইংল্যাণ্ডের পূর্ববর্তী টেস্ট যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ফলাফল, নামাবিধ চিত্তাকর্ষক পরিসংখ্যান ও বিশেষ দরকারী কিছু তথ্য পরিবেশিত হ'লো।]

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম সিরিজ : ১৯৩২

একমাত্র টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২৫, ২৭ ও ২৮/১৯৩২

অধিনায়ক : ডগলাস জারডিন ও সি. কে. নাইডু

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ ইংল্যাণ্ড ১৫৮ রানে বিজয়ী।

ইংল্যাণ্ড ২৫৯ (ওয়ালটার হ্যামণ্ড ৫৫, ডগলাস জারডিন ৭৯, মেসলি এমস ৬১ ; মহম্মদ নিসার ৯৩ রানে ৫ উইকেট) ও ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২৭৪ (ডগলাস জারডিন ৮৫, এডি পেইণ্টার ৫৪ ; জাহাঙ্গীর খাঁন ৬০ রানে ৪ উইকেট)।

ভারত ১৮৯ (সি. কে. নাইডু ৪০ ; বিল ব্রাউনের ৪৯ রানে ৪ ও বিল ভোস ২৩ রানে ৩ উইকেট) ও ১৮৭ (অমর সিং ৫১, ওয়াজির আলি ৩৯ ; ওয়ালটার হ্যামণ্ড ৯ রানে ৩ উইকেট)।

দ্বিতীয় সিরিজ : ১৯৩৩-৩৪

প্রথম টেস্ট : বোম্বাই ; ডিসেম্বর ১৫, ১৬, ১৭, ১৮/১৯৩৩

অধিনায়ক : সি. কে. নাইডু ও ডগলাস জারডিন

টস : ভারত ॥ ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী

ভারত ২১৯ (ওয়াজির আলি ৩৬, লালা অমরনাথ ৩৮ ; এম. এস. নিকলস ৫৩ রানে ৩, হেডলি ভেরিটি ৪৪ রানে ৩, জেমস ল্যাডরিঞ্জ ৪২ রানে ৩ উইকেট) ও ২৪৮ (লালা অমরনাথ ১১৮, সি. কে. নাইডু ৬৭ ; নিকলস ৫৫ রানে ৫ ও ই. ডাবলিউ ক্লার্ক ৬৯ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৪৩৮ (সি. এফ. ওয়ালটার্স ৭৮, ডগলাস জারডিন ৮০, বি. এচ. ভ্যালেনটাইন ১০৩, এচ, এমিঅট ৩৬ ; মহম্মদ নিসার ৯০ রানে ৫ ও আর জে. আমেদজি ১৩১ রানে ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় টেস্ট : কলকাতা ; জানুআরি ৫, ৬, ৭, ৮/১৯৩৪

অধিনায়ক : সি. কে. নাইডু ও ডাগলাস জারডিন

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ খেলা অমীমাংসিত

ইংল্যাণ্ড ৪০৩ (জেমস ল্যাডরিঞ্জ ৭০, ডগলাস জারডিন ৭০, বি. এচ. ভ্যালেনটাইন ৬০, এল এফ. টাউনসেণ্ড ৬০, হেডলি ভেরিটি ৫৫ ; অমর সিং ১০৬ রানে ৪ ও সি. কে. নাইডু ৪০ রানে ৩ উইকেট) ও ২ উইকেটে ৭।

ভারত ২৪৭ (দিলাওয়ার হুসেন ৫৯, বিজয় মার্চেণ্ট ৫৪, ওয়াজির আলি ৩৯, সি. এস. নাইডু ৩৯ ; ক্লার্ক ৩২ রানে ৩, নিকলস ৭৮ রানে ৩ ও ভেরিটি ৬৪ রানে ৪ উইকেট) ও ১৩৭ (জে. নাওমল ৪০, দিলাওয়ার হুসেন ৫৭, সি. কে নাইডু ৩৮ ; ক্লার্ক ৫০ রানে ৩ ও ভেরিটি ৭৬ রানে ৪ উইকেট)।

তৃতীয় টেস্ট : মাদ্রাজ ; ফেব্রুআরী ১০, ১১, ১২, ১৩/১৯৩৪

অধিনায়ক : সি. কে. নাইডু ও ডগলাস জারডিন

টস : ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড ২০২ রানে জয়ী

ইংল্যাণ্ড ৩১৫ (এ. এচ. বেকওয়েল ৮৫, সি. এফ. ওয়ালটার্স ৫২, ডগলাস জারডিন ৬৫, হেডলি ভেরিটি ৪২ ; অমর সিং ৮৬ রানে ৭ উইকেট) ও ৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২৬১ (সি. এফ. ওয়ালটার্স ১০২, জেমস ল্যাডরিঞ্জ ৪৬, ডগলাস জারডিন ৫৫ ; নাজির আলি ৮০ রানে ৪ উইকেট)।

ভারত ১৪৫ (ভেরিটি ৪৯ রানে ৭ উইকেট) ও ২৪৯ (দিলাওয়ার হুসেন ৩৬, পাতিয়ালার যুবরাজ ৬০, অমর সিং ৪৮ ; ভেরিটি ১০৪ রানে ৪ ও ল্যাডরিঞ্জ ৬০ রানে ৪ উইকেট)।

তৃতীয় সিরিজ : ১৯৩৬

প্রথম টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২৭, ২৯, ৩০/১৯৩৬

অধিনায়ক : গাবি অ্যালেন ও বিজয়নগরের মহারাজকুমার

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী

ভারত ১৮৬ (বিজয় মার্চেণ্ট ৩৪ ; গাবি অ্যালেন ৩৫ রানে ৫ ও ওয়ালটার রবিনস ৫০ রানে ৩ উইকেট) ও ৯৩ (গাবি অ্যালেন ৪০ রানে ৫ ও ভেরিটি ১৭ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ১০৪ (মরিস লেল্যাণ্ড ৬০ ; মহম্মদ নিসার ৩৯ রানে ৩ ও অমর সিং ৩৫ রানে ৬ উইকেট) ও ১ উইকেটে ১০৮ (এচ. গিমলেট ৩৭, এম. জে. টার্নবুল ৩৭)।

দ্বিতীয় টেস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার ; জুলাই ২৫, ২৭, ২৮/১৯৩৬

অধিনায়ক : গাবি অ্যালেন ও বিজয়নগরের মহারাজকুমার

টস : ভারত ॥ খেলা অমীমাংসিত

ভারত ২০৩ (ওয়াজির আলি ৪২, সি. রামস্বামী ৪০ ; ভেরিটি ৬১ রানে ৪ উইকেট) ও ৫ উইকেটে ৩৯০ (বিজয় মার্চেন্ট ১১৪, মুস্তাক আলি ১১২, অমর সিং ৬৮, সি. রামস্বামী ৬০ ; ওয়ালটার রবিন্স ১০৩ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫৭১ (এ. ই. ক্যাগ ৩৯, ওয়ালটার হ্যামণ্ড ১৬১, টি. এস. ওয়াদিংটন ৮৭, জো হার্ডস্টাফ ৯৪, ওয়ালটার রবিনস ৭৬, হেডলি ভেরিটি ৬৬*)।

তৃতীয় টেস্ট : ওভাল ; আগস্ট ১৫, ১৭, ১৮/১৯৩৬

অধিনায়ক : গাবি অ্যালেন ও বিজয়নগরের মহারাজকুমার

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী

ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৪৭১ (চার্লি বারনেট ৪৩, ওয়ালটার হ্যামণ্ড ২১৭, টি. এস. ওয়াদিংটন ১২৮ ; মহম্মদ নিসার ১২০ রানে ৫ উইকেট) ও ১ উইকেটে ৩৪।

ভারত ২২২ (বিজয় মার্চেন্ট ৪২, মুস্তাক আলি ৪২, নিসাওয়ার হুসেন ৩৫ ; জে. সিমস ৭৩ রানে ৫ ও হেডলি ভেরিটি ৩০ রানে ৩ উইকেট) ও ৩১২ (সি. কে. নাইডু ৮১, নিসাওয়ার হুসেন ৫৪, বিজয় মার্চেন্ট ৪৮, অমর সিং ৪৩, সি. রামস্বামী ৩১* ; গাবি অ্যালেন ৮০ রানে ৭ উইকেট)।

চতুর্থ সিরিজ : ১৯৪৬

প্রথম টেস্ট : লর্ডস ; জুন ২২, ২৪, ২৫।১৯৪৬

অধিনায়ক : ওয়ালটার হ্যামণ্ড ও পাতৌদির নবাব (বড়ো)

টস : ভারত ॥ ইংল্যাণ্ড ১০ উইকেটে জয়ী

ভারত ২০০ (ফজল মোদি ৫৭, আবদুল হাফিজ কারদার ৪৩ ; আলেক বেডসার ৫৯ রানে ৭ উইকেট) ও ২৭৪ (বিজু মানকড় ৬৩, লালা অমরনাথ ৫০ ; আলেক বেডসার ৯৬ রানে ৪ ও টি. এফ. স্মাইলদ ৪৪ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ৪২৮ (জো হার্ডস্টাফ ২০৫, পি. এ. গিব ৬০, লালা অমরনাথ ১১৮ রানে ৪ উইকেট) ও বিনা উইকেটে ৪৮।

দ্বিতীয় টেস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার ; জুলাই ২০, ২২, ২৩।১৯৪৬

অধিনায়ক : ওয়ালটার হ্যামণ্ড ও পাতৌদির নবাব (বড়ো)

টস : ভারত ॥ খেলা অমীমাংসিত

ইংল্যাণ্ড ২৯৪ (লেন হাটন ৬১, সিরিল ওয়াশব্রুক ৫২, ডেনিস কমটন ৫১, ওয়ালটার হ্যামণ্ড ৩৯ ; লালা অমরনাথ ৯৬ রানে ৫ ও বিজু মানকড় ১০১ রানে ৫ উইকেট) ও ৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ১৫৩ (ডেনিস কমটন ৭১ ; লালা অমরনাথ ৭১ রানে ৩ উইকেট)।

ভারত ১১০ (বিজয় মার্চেন্ট ৭৮, মুস্তাক আলি ৪৩ ; আলেক বেডসার ৪১ রানে ৪ ও আর গলার্ড ২৪ রানে ৪ উইকেট) ও ৯ উইকেটে ১৫২ (আবদুল হাফিজ কারকার ৩৫, বিজয় ভাম্বুরেল হাজারে ৪৪ ; আলেক বেডসার ৫২ রানে ৭ উইকেট)।

তৃতীয় টেস্ট : ওভাল ; আগস্ট ১৭, ১৯, ২০।১৯৪৬

অধিনায়ক : ওয়ালটার হ্যামণ্ড ও পাতৌদির নবাব (ষষ্ঠ)

টস : ভারত। খেলা অমীমাংসিত

ভারত ৩৩১ (বিজয় মার্চেন্ট ১২৮, মুস্তাক আলি ৫৯, বিঠু মানকড় ৪২ ; বিল এডরিচ ৬৮ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ২ উইকেটে ৯৫।

পঞ্চম সিরিজ : ১৯৫১-৫২

প্রথম টেস্ট : দিল্লী ; নভেম্বর ২, ৩, ৪, ৬, ৭।১৯৫১

অধিনায়ক : বিজয় হাজারে ও নাইজেল হাওয়ার্ড

টস : ইংল্যাণ্ড। খেলা অমীমাংসিত

ইংল্যাণ্ড ২০৩ (জে. ডি. রবার্টসন ৫০, ডন কেনিয়ন ৩৫, এ. জে. ওয়াটকিন্সন ৪০ ; বিঠু মানকড় ৫৩ রানে ৩ ও এস. পি. গিল্বে ৯১ রানে ৬ উইকেট) ও ৬ উইকেটে ৫৯৮ (এফ. এ. লাওসন ৬৮, ডনাল্ড কার ৭৮, অ্যালান ওয়াটকিনস ১৩৮ ; বিঠু মানকড় ৫৮ রানে ৪ উইকেট)।

ভারত ৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৪১৮ (বিজয় মার্চেন্ট ১৫৪, বিজয় হাজারে ১৬৪, হেমু অধিকারী ৩৮)।

দ্বিতীয় টেস্ট : বোম্বাই ; ডিসেম্বর ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯।১৯৫১

অধিনায়ক : বিজয় হাজারে ও নাইজেল হাওয়ার্ড

টস : ভারত। খেলা অমীমাংসিত

ভারত ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৪৮৪ (পঙ্কজ রায় ১৪০, বিজয় হাজারে ১৫৫, সি. ডি. গোপীনাথ ৫০, এম. কে. মন্ত্রী ৩৯ ; ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৯৬ রানে ৪ ও রয় ট্যাটারসাল ১১২ রানে ৩ উইকেট) ও ২০৮ (সি. ডি. গোপীনাথ ৪২, বিঠু মানকড় ৪১, পলি উমরিগড় ৩৮ ; অ্যালান ওয়াটকিনস ২০ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৪৪৬ (রবার্টসন ৪৪, টম গ্রেভনি ১১৫, সুনার ৪৬, ওয়াটকিনস ৮০ ; নাসা অমরনাথ ৬১ রানে ৩ উইকেট ও বিঠু মানকড় ৯১ রানে ৪ উইকেট) ও ২ উইকেটে ৫৫।

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ; ডিসেম্বর ৩০, ৩১।৫১ ও জানুয়ারি ১, ৩, ৪।৫২

অধিনায়ক : বিজয় হাজারে ও নাইজেল হাওয়ার্ড

টস : ইংল্যাণ্ড। খেলা অমীমাংসিত

ইংল্যাণ্ড ৩৪২ (স্নুবার ৭১, ওয়াটকিনস ৬৮, সি. জে. পুল ১৫, ই. নীডহীটার ৩৮ ; বাস্তু কাদকার ৮৯ রানে ৩ ও বিষু মানকড় ৮৯ রানে ৪ উইকেট) ও ৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২১২ (স্নুবার ১২, পুল ৬৯)।

ভারত ৩৪৪ (পঙ্কজ রায় ৭২, বিষু মানকড় ৪৯, বাস্তু কাদকার ১১৫, বিজয় মনজরেকার ৬৮ ; এফ. বিজওয়ে ৮৩ রানে ৪ ও রয় ট্যাটারসল ১০৪ রানে ৪ উইকেট ও বিনা উইকেটে ১০৩ (বিষু মানকড় ৭১০)।

চতুর্থ টেস্ট : কানপুর : জানুয়ারী ১২, ১৩, ১৪।১৯৬২

অধিনায়ক : বিজয় হাজারে ও মাইকেল স্মিথ

টস : ভারত। ইংল্যাণ্ড তিন দিনেই ৮ উইকেটে জয়ী

ভারত ১২১ (পঙ্কজ রায় ৩৭ ; এফ. জে. টিলটন ৩২ রানে ৬ উইকেট) ও ১৪৭ (পলি উমরিগড় ৩৩, লেমু অধিকারী ৬০ ; টিলটন ৬১ রানে ৫ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ২০৩ (ওয়াটকিনস ৬৮ ; গুলাম আমেদ ৭০ রানে ৫ ও বিষু মানকড় ৫৪ রানে ৪ উইকেট) ও ২ উইকেটে ১৬ (টম গ্রেভনি ৪৮)।

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ : ফেব্রুয়ারি ৬, ৮, ৯, ১০।১৯৬২

অধিনায়ক : বিজয় হাজারে ও ডনাল্ড কার

টস : ইংল্যাণ্ড। ভারত ৪ দিনেই ইনিংস ও ৮ রানে জয়ী

ইংল্যাণ্ড ২৯৬ (স্নুবার ৬৬, টম গ্রেভনি ৩৯, বয়ার্টসন ৭১, ডনাল্ড কার ৪০ ; বিষু মানকড় ৫৫ রানে ৮ উইকেট) ও ১৮৩ (বয়ার্টসন ৫৬, ওয়াটকিনস ৪৮ ; গুলাম আমেদ ৭৭ রানে ৫ উইকেট ও বিষু মানকড় ৪৩ রানে ৪ উইকেট)।

ভারত ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৪৭৭ (পঙ্কজ রায় ১১১, পলি উমরিগড় ১৩০, বাস্তু কাদকার ৬১, সি. ডি. গোপিনাথ ৩৫)।

ষষ্ঠ সিরিজ : ১৯৬২

প্রথম টেস্ট : লিডস ; জুন ৫, ৬, ৭, ৯।১৯৬২

অধিনায়ক : মেল হাটন ও বিজয় হাজারে

টস : ভারত। ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে জয়ী

ভারত ২৯৫ (বিজয় মনজরেকার ১০৩, বিজয় হাজারে ৮৯ ; ফ্রেডি ট্রুম্যান ৮৯ রানে ৩ ও জিম লেকার ৩৯ রানে ৪ উইকেট) ও ১৮৫ (বাস্তু কাদকার ৬৪, বিজয় হাজারে ৫৩ ; ট্রুম্যান ২৭ রানে ৪ উইকেট ও আর. ও. জেনকিন্স ৫০ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৩৩৪ (টম গ্রেভনি ৭১, ইয়ান বথ, ওয়াটকিন্স ৪৮, জেনকিন্স ৩৮ ; গুলাম আমেদ ১০০ রানে ৫ উইকেট) ও ৩ উইকেটে ১২৮ (জেফিস কমটন ৩৪, কেথ মিলটন ৪১)।

দ্বিতীয় টেস্ট : লর্ডস ; জুন ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪।১৯৪২

অধিনায়ক : লেন হাটন ও বিজয় হাজারে

টস : ভারত ॥ ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী

ভারত ২৫৫ (বিঠু মানকড় ৭২, বিজয় হাজারে ৬৯, পঙ্কজ রায় ৩৯ ; ট্রুম্যান ৭২ রানে ৪ ও ওয়টকিন্স ৫৭ রানে ৩ উইকেট) ও ৩৭৮ (বিঠু মানকড় ১৮৪, বিজয় হাজারে ৪৯, ডি. এস. বাগচাস ৪২ ; ট্রুম্যান ১১০ রানে ৪ ও জিম লেকার ১০২ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৪৩৭ (লেন হাটন ১৪০, বেসি লিমসন ৪৩ পিটার মে ৭৪, টম গ্রেভনি ৭৩, গডফ্রে ইভান্স ১০৪ ; মানকড় ১৫৬ রানে ৫ ও ওলাম আমেদ ১০৬ রানে ৩ উইকেট) ও ২ উইকেটে ৭৩ (লেন হাটন ৩৯)।

তৃতীয় টেস্ট : ম্যাঞ্চেস্টার ; জুলাই ১৭, ১৮, ১৯।১৯৪২

অধিনায়ক : লেন হাটন ও বিজয় হাজারে

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ তিন দিনেই ইনিংসে ও ২০৭ রানে জয়ী ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৩৪৭ (লেন হাটন ১০৪, পিটার মে ৬৯, গডফ্রে ইভান্স ৭১ ;

ভারত ৪৮ (ফ্রেডি ট্রুম্যান ৩১ রানে ৮ উইকেট) ও ৮২ (আলেক বেডসার ২৭ রানে ৫ ও টনি লক ৩৬ রানে ৫ উইকেট)।

চতুর্থ টেস্ট : ওভাল ; আগষ্ট ১৫, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯।১৯৪২

অধিনায়ক : লেন হাটন ও বিজয় হাজারে

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ খেলা অমীমাংসিত ; তৃতীয় ও শেষ দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি ইংল্যাণ্ড ৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৩২৬ (রেভারেণ্ড ডেভিড শেপার্ড ১১৯, লেন হাটন ৮৬, জে. টি. পাইক্রিন ৫৩)।

ভারত ৯৮ (বিজয় হাজারে ৩৮ ; আলেক বেডসার ৪১ রানে ৫ ও ফ্রেডি ট্রুম্যান ৪৮ রানে ৫ উইকেট)।

সপ্তম সিরিজ : ১৯৪৯

প্রথম টেস্ট নটিংহাম ; জুন ৪, ৫, ৬, ৮।১৯৪৯

অধিনায়ক : পিটার মে ও ডি. কে. গায়কোয়াড়

টস : ইংল্যাণ্ড ॥ ইংল্যাণ্ড ৪র্থ দিনে ইনিংসে ও ৫৯ রানে জয়ী ইংল্যাণ্ড ৪২১ (পিটার মে ১০৬, কেন ব্যারিংটেন ৫৬, মাইক হটন ৫৮, গডফ্রে ইভান্স ৭৩, সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৪ উইকেট)।

ভারত ২০৬ (পঙ্কজ রায় ৫৪ ; ফ্রেডি ট্রুম্যান ৫৫ রানে ৪ উইকেট) ও ১৫৭ (পঙ্কজ রায় ৪৯, বিজয় মনজরেকার ৪৪ ; ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৩১ রানে ৫ উইকেট)।

দ্বিতীয় টেস্ট : লর্ডস ; জুন ১৮, ১৯, ২০।১৯৪৯

অধিনায়ক : পিটার মে ও পঙ্কজ রায়

টস : ভারত ॥ ইংল্যাণ্ড তৃতীয় দিনেই ৮ উইকেটে জয়ী

ভারত ১৮৮ (নরী কনট্র্যাক্টর ৭১, কে. এস. বোরদাড়ে ৪১ ; ব্রীনরাজ ৩৪ রানে ৬ উইকেট) ও ১৬৪ (বিজয় মঞ্জরেকার ৬১, কপাল সিং ৪১ ; স্টাথাম ৪৪ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ২২৬ (কেন ব্যারিংটন ৮০, ব্রায়ান স্টাথাম ৩৮ ; রমাকান্ত দেশাই ৮৯ রানে ৫ ও সুরেন্দ্রনাথ ৪৬ রানে ৩ উইকেট) ও ২ উইকেটে ১০৮ (কলিন কাউড্রে ৬৩)।

তৃতীয় টেস্ট : লীডস ; জুলাই ২, ৩, ৪।১৯৫৯

অধিনায়ক : পিটার মে ও ডি. কে. গায়কোয়াড়

টস : ভারত। তৃতীয় দিনেই ইংল্যাণ্ড ইনিংস ও ১৭৩ রানে জয়ী

ভারত ১৬১ (টুম্যান ৩০ রানে ৩ ও এচ. কে. ফোডস ৫০ রানে ৪ উইকেট) ও ১৪৯ (চাদু বোরদে ৪১, পলি উমরিগড় ৩৩ ; জন মর্টিমোর ৩৬ রানে ৩ ও ব্রায়ান ক্লোজ ৩৫ রানে ৪ উইকেট)।

চতুর্থ টেস্ট : ম্যান্চেস্টার ; জুলাই ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮।১৯৫৯

অধিনায়ক : কলিন কাউড্রে ও ডি. কে. গায়কোয়াড়

টস : ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড ১৭১ রানে জয়ী

ইংল্যাণ্ড ৪৯০ (জিওফ পুলার ১৩১, কলিন কাউড্রে ৬১, মাইক স্মিথ ১০০, কেন ব্যারিংটন ৮৭ ; সুরেন্দ্রনাথ ১১৫ রানে ৪ উইকেট) ও ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২৮৫ (পার্কহাউস ৪৯ ; ব্যারিংটন ৪৩, টেড ডেক্সটার ৪৫, রয় ইলিঙওয়ার্থ ৪৭ ; সুভাষ গুপ্তে ৭৬ রানে ৪ উইকেট)।

ভারত ২০৮ (চাদু বোরদে ৭৪ ; ফোডস ৭৪ রানে ৩ ও ব্যারিংটন ৩৬ রানে ৩) ও ৩৭৬ (নরী কনট্র্যাক্টর ৫৬, আব্বাস আলি বেগ ১১২, পলি উমরিগড় ১১৮)।

পঞ্চম টেস্ট : ওভাল ; আগস্ট ২০, ২১, ২২, ২৪।১৯৫৯

অধিনায়ক : কলিন কাউড্রে ও ডি. কে. গায়কোয়াড়

টস : ভারত। ইংল্যাণ্ড ইনিংস ও ২১ রানে জয়ী

ভারত ১৪০ (টুম্যান ২৪ রানে ৪ উইকেট) ও ১২৪ (বাপু নাদকার্ণি ৭৬ ; টুম্যান ৩০ রানে ৩ ও স্টাথাম ৫০ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৩৮১ (রমন সুব্বারাও ৯৪, মাইক স্মিথ ৯৮, রয় ইলিঙওয়ার্থ ৫০, রয় সোবেটম্যান ৬৫ ; সুরেন্দ্রনাথ ৭৫ রানে ৫ উইকেট)।

অষ্টম সিরিজ : ১৯৬১-৬২

প্রথম টেস্ট : বোম্বাই ; নভেম্বর ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬।১৯৬১

অধিনায়ক : নরী কনট্র্যাক্টর ও টেড ডেক্সটার

টস : ইংল্যাণ্ড। খেলা অমীমাংসিত

ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫০০ (পিটার রিচার্ডসন ১১, জিওফ পুলার ৮০, কেন ব্যারিংটন ১৪১ মাইক স্মিথ ৩৮, টেড ডেক্সটার ৮৫ ; বলন্ত রঙ্গানে ৭৬ রানে ৪ ও চাদু বোরদে ৯০ রানে ৩ উইকেট) ও ৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ১৮৩ (রিচার্ডসন ৪৩, ব্যারিংটন ৫২*)।

ভারত ৩৯০ (জয়সীমা ৫৬, মনুরেকার ৬৮, চাঁদু বোরদে ৬৯, সেলিম দুরানি ৭১, কৃপাল সিং ৩-৩ ; টনি লক ৭৪ রানে ৪ ও ডেভিড অ্যালেন ৫৪ রানে ৩ উইকেট) ও ৪ উইকেটে ১৮০ (জয়সীমা ৫১, মনুরেকার ৮৪)।

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর : ডিসেম্বর ১, ২, ৩, ৫, ৬।১৯৬১

অধিনায়ক : নরী কনট্র্যাকটার ও টেড ডেক্সটার

টস : ভারত। খেলা অমীমাংসিত

তৃতীয় টেস্ট : নয়া দিল্লী ; ডিসেম্বর ১৩, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮।১৯৬১

অধিনায়ক : নরী কনট্র্যাকটার ও টেড ডেক্সটার

টস : ভারত। খেলা অমীমাংসিত

ভারত ৪৬৬ (এম. এল. জয়সীমা ১২১, বিজয় মনুরেকার ১৮৯, বোরদে ৪৫, কনট্র্যাকটার ৩৯ ; ডেভিড অ্যালেন ৮৭ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৩ উইকেটে ২১৬ (পুলার ৮৯, র‍্যারিংটন ১১৩, ডেক্সটার ৪৫)।

চতুর্থ টেস্ট : ডিসেম্বর ৩০, ৩১।৬১ ও জানুয়ারি ১, ৩, ৪।১৯৬২

অধিনায়ক : নরী কনট্র্যাকটার ও টেড ডেক্সটার

টস : ভারত। ভারত ১৮৭ রানে বিজয়ী

ভারত ৩৮০ (বিজয় মেরো ৬২, পাতৌদির নবাব (ছোটো) ৬৪, পলি উমরিগড় ৩৬, এম. এল. জয়সীমা ৩১, চাঁদু বোরদে ৬৮, সেলিম দুরানি ৪৩ ; ডেভিড অ্যালেন ৬৭ রানে ৫ উইকেট) ও ২৫২ (উমরিগড় ৩৬, জয়সীমা ৬৬, বোরদে ৬১ ; ডেভিড অ্যালেন ৯৫ রানে ৪ ও টনি লক ১১১ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ২১২ পিটার রিচার্ডসন ৬১, টেড ডেক্সটার ৫৭ ; সেলিম দুরানি ৪৭ রানে ৫ ও চাঁদু বোরদে ৬৫ রানে ৪ উইকেট) ও ২৩৩ (পিটার রিচার্ডসন ৪২, পিটার পারফিট ৪৬, টেড ডেক্সটার ৬২, র‍্যারি বাইট ৩৯ ; সেলিম দুরানি ৬৬ রানে ৩ উইকেট)।

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ ; জানুয়ারি ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫।১৯৬২

অধিনায়ক : নরী কনট্র্যাকটার ও টেড ডেক্সটার

টস : ভারত। ভারত ১২৮ রানে বিজয়ী

ভারত ৪২৮ (পাতৌদির নবাব (ছোটো) ১০০, নরী কনট্র্যাকটার ৮৬, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৬৫, বাপু নাদকার্নি ৬০ ; ডেভিড অ্যালেন ১১৬ রানে ৩ উইকেট) ও ১৯০ (বিজয় মনুরেকার ৮৫ ; টনি লক ৬৫ রানে ৬ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ২৮১ (মাইক স্মিথ ৭৩ ; সেলিম দুরানি ১০৫ রানে ৬ উইকেট) ও ২০৯ (কেন র‍্যারিংটন ৪৮ ; সেলিম দুরানি ৭২ রানে ৪ ও চাঁদু বোরদে ৫৯ রানে ৩ উইকেট)।

নবম সিরিজ : ১৯৬৪

প্রথম টেস্ট : মাদ্রাজ জানুয়ারী ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫।১৯৬৪

অধিনায়ক : পাতৌদির নবাব (ছোটো) ও মাইক স্মিথ

টস : ভারত। অমীমাংসিত

ভারত ৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫৭৭ (বুধি কুন্দেরান ১২২, বিজয় মঞ্জরেকার ১০৮, দিলীপ সারদেশাই ৯৪, এম. এল. জয়সীমা ৫১ ; ক্রেড টিটমাস ১১৬ রানে ৫ উইকেট) ও ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ১৫২ (বুধি কুন্দেরান ৩৮, এম. এল. জয়সীমা ৩৫ ; ক্রেড টিটমাস ৪৬ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ৩১৭ (ব্রায়ান বোলাস ৮৮, জন উইলসন ৪১, কেন ব্যারিংটন ৮০ ; চাঁদু বোরদে ৮৮ রানে ৫ ও সেলিম দুরানি ৯১ রানে ৩ উইকেট) ও ৫ উইকেটে ২৪১ (মাইক স্মিথ ৫১, অলি মাটিমোর ৭৩*)।

দ্বিতীয় টেস্ট : বোম্বাই ; জানুয়ারি ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬।১৯৬৪

অধিনায়ক : পাতৌদির নবাব (ছোটো) ও মাইক স্মিথ

টস : ভারত। অমীমাংসিত

ভারত ৩০০ (সেলিম দুরানি ৯০, চাঁদু বোরদে ৮৪ ; জন প্রাইস ৬৬ রানে ৩ উইকেট) ও ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২৪৯ (বিজয় মেহরা ৫৪, দিলীপ সারদেশাই ৬৮, এম. এল. জয়সীমা ৬৬, বিজয় মঞ্জরেকার ৪৩* ; ক্রেড টিটমাস ৭৯ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ২৩৩ (মাইক স্মিথ ৬৬, ক্রেড টিটমাস ৮৪ ; বি. এস. চন্দ্রশেখর ৬৭ রানে ৪ ও সেলিম দুরানি ৫৯ রানে ৩ উইকেট) ও ৩ উইকেটে ২০৪ (ব্রায়ান বোলাস ৫৭, ডে. জি. বিন্স ৫৫, জিম পার্কস ৪০)।

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা , জানুয়ারি ২৯, ৩০, ফেব্রুয়ারি ১, ২, ৩। ১৯৬৪

অধিনায়ক : পাতৌদির নবাব (ছোটো) ও মাইক স্মিথ।

টস : ভারত। অমীমাংসিত।

ভারত ২৪১ (দিলীপ সারদেশাই ৫৪, বাপু নাদকার্নি ৪০, জন প্রাইস ৭০ রানে ৫ উইকেট) ও ৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৩০০ (এম. এল. জয়সীমা ১২৯, দিলীপ সারদেশাই ৩৬)।

ইংল্যাণ্ড ২৬৭ (কলিন কাউড্রে ১০৭, ব্রায়ান বোলস ৩৯ ; রমাকান্ত দেশাই ৬২ রানে ৪ উইকেট) ও ২ উইকেটে ১৪৫ (মাইক স্মিথ ৭৫*, ব্রায়ান বোলস ৩৪)।

চতুর্থ টেস্ট : নয়া দিল্লী ; ফেব্রুয়ারি ১, ৯, ১১ ১২, ১৩।১৯৬৪

অধিনায়ক : পাতৌদির নবাব (ছোটো) ও মাইক স্মিথ

টস : ভারত। অমীমাংসিত।

ভারত ৩৪৪ (এম. এল জয়সীমা ৭১, বুধি কুন্দেরান ৪০, দিলীপ সারদেশাই ৪৪, বলুমল সিং ১০৪ ; ক্রেড টিটমাস ১০০ রানে ৩ জন মাটিমোর ১৪ রানে ৩ উইকেট) ও ৪ উইকেটে ৪৬৩ (পাতৌদির নবাব (ছোটো) ২০০, চাঁদুবোরদে ৬৭, এম. এল. জয়সীমা ৫০)।

ইংল্যাণ্ড ৪৫১ (কলিন কাউড্রে ১৫১, পিটার পারফিট ৬৭, ব্রায়ান বোলস ১৮, জন এডরিচ ৪১, মাইক স্মিথ ৩৭ ; চন্দ্রশেখর ৭১ রানে ৩, কপাল সিংহ ৯০ রানে ৩ ও বাপু নাদকার্নি ৯১ রানে ৩ উইকেট)।

পঞ্চম টেস্ট : কানপুর ; ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০।১৯৬৪

অধিনায়ক : পাতৌদির নবাব (ছোটো) ও মাইক স্মিথ

টস : ভারত। অমীমাংসিত।

ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫৫৯ (ব্যারি নাইট ১২৭, পিটার পারফিট ১২১, ব্রায়ান বোলস ৬৭, জিম পার্কস ৫১, কলিন কাউড্রে ৬৮, মাইক স্মিথ ৬৮, জন এডরিচ ৩৪)।

ভারত ২৬৬ (দিলীপ সারদেশাই ৭৯, বাপু নাদকার্নি ৫২ ; ফ্রেড টিটমাস ৭৩ রানে ৬ উইকেট) ও ৩ উইকেটে ৩৪৭ (বাপু নাদকার্নি ১২২, সেলিম দুরানি ৬১, সারদেশাই ৮৭, কুন্দেরান ৫৫)।

সেঞ্চুরির তালিকা

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের ৯-টি পর্যায়ের টেস্ট খেলার মোট ৩৪টি টেস্টে দু-পক্ষের খেলোয়াড়েরা সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ৪০টি। তার মধ্যে ভারত ২৬টি ও ইংল্যাণ্ডে ২৪টি। ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ রান করেছেন পাতৌদির নবাব (ছোটো) ২০৩ অপরাজিত ও ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এই সম্মানের অধিকারী ওয়ালটার হ্যামণ্ড ২১৭। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে-ক'জন ভারতীয় ক্রিকেটার প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছেন, তাঁরা হলেন লালা অমরনাথ, আব্বাস আলি বেগ, ও হনুমন্ত সিং। এঁদের এগুলো ছিলো জীবনের প্রথম টেস্ট। তেমনিভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যাঁরা প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা হলেন বি, এচ, ভ্যালেন্টাইন, অ্যালান ওয়াটকিনস, টম গ্রেভনি ও মাইক স্মিথ। বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় মঞ্জরেকার, পলি উমরিগড়—এই তিন জনে প্রত্যেকে করেছেন তিনটি ক'রে সেঞ্চুরি, এর মধ্যে মার্চেন্ট করেছেন জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে একটি সেঞ্চুরি ; দুটি ক'রে সেঞ্চুরি যাঁদের তাঁরা হলেন বিজয় হাজারে, পঙ্কজ রায়, এম. এল. জয়সীমা, বুধি কুন্দেরান, পাতৌদির নবাব (ছোটো)। পক্ষান্তরে ভারতের বিরুদ্ধে একাধিক সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অর্জন করেছেন : কলিন কাউড্রে (৩), কেন ব্যারিংটন (৩), ওয়ালটার হ্যামণ্ড (২), কেন হাটন (২), জিওফ পুলার (২)।

ভারতের পক্ষে

২০৩* পাতৌদির নবাব (ছোটো) ; দিল্লী, ৪র্থ টেস্ট, ১৬৩

১২২ বুধি কুন্দেরান ; মাদ্রাজ, ১ম টেস্ট ১৯৬৪

১৮৯* বিজয় মঞ্জরেকার ; দিল্লী, ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২

১৮৩ বিজয় মানকড় ; লর্ডস, ২য় টেস্ট, ১৯৫২

১৬৬	বিজয় হাজারে	নয়া দিল্লী, ১ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৬৫	বিজয় হাজারে	বোম্বাই, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৬৪	বিজয় মার্চেন্ট	নয়া দিল্লী, ১ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৬৩	পলি উমরিগড়	কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৬০	পঙ্কজ রায়	বোম্বাই, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৩৩	বিজয় মঞ্জরেকার	লীডস্, ১ম টেস্ট, ১৯৫২
১৩০	পলি উমরিগড়	মাদ্রাজ, ৫ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১২৯	এম. এল. জয়সীমা	কলকাতা, ৩য় টেস্ট, ১৯৬৪
১২৮	বিজয় মার্চেন্ট	ওভাল, ৩য় টেস্ট, ১৯৩৬
১২৭	এম, এল, জয়সীমা	নয়া দিল্লী, ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১২৬	বাপু নাদকার্নি	কানপুর, ৫ম টেস্ট, ১৯৬৪
১১৮	লালা অমরনাথ	বোম্বাই, ১ম টেস্ট, ১৯৩৩-৩৪
১১৮	পলি উমরিগড়	ম্যান্‌চেস্টার, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৫৯
১১৫	দাত্তু ফাদকার	কলকাতা, ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১১৪	বিজয় মার্চেন্ট	ম্যান্‌চেস্টার, ২য় টেস্ট,১৯৩৬
১১২	মুস্তাক আলি	ম্যান্‌চেস্টার, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৫৯
১১২	আব্বাস আলি বেগ	ম্যান্‌চেস্টার, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৫৯
১১১	পঙ্কজ রায়	মাদ্রাজ, ৫ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১০৮	বিজয় মঞ্জরেকার	মাদ্রাজ, ১ম টেস্ট, ১৯৬৪
১০৫	হনুমন্ত সিং	নয়া দিল্লী, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৪
১০৩	পাতৌদির নবাব (ছোটো)	মাদ্রাজ, ৫ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১০০	বুধি কুন্দেরান	নয়া দিল্লী, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৪

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে

২১৭	ওয়ালটার হ্যামণ্ড	ওভাল, ৩য় টেস্ট, ১৯৩৬
২০৫	জো হার্স্টাফ	লর্ডস, ২য় টেস্ট, ১৯৪৬
১৭৫	টম গ্রেভনি	বোম্বাই, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৭২	কেন ব্যারিংটন	কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২
১৬৭	ওয়ালটার হ্যামণ্ড	ম্যান্‌চেস্টার, ২য় টেস্ট, ১৯৩৬
১৬০	কলিন কাউড্রে	লীডস, ৩য় টেস্ট, ১৯৫৯
১৫২	কলিন কাউড্রে	নয়াদিল্লী, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৪
১৪১	কেন ব্যারিংটন	বোম্বাই, ১ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২

১০০ কেন ফাটন ; লর্ডস, ২য় টেস্ট, ১৯৫২

১০৮ অ্যালান ওয়াটকিন্স, নয়াদিল্লী, ১ম টেস্ট, ১৯৬১-৬২

১০৬ বি. এচ. ভ্যালেন্টাইন ; ১ম টেস্ট, ১৯৩২-৩৩

১০১ জিওফ পুলার ; ম্যান্‌চেস্টার, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৬৯

১২৮ টি. এস. ওয়াশিংটন ; ওভাল, ৩য় টেস্ট, ১৯০৬

১২৭ হ্যারি নাইট ; কানপুর, ৫ম টেস্ট, ১৯৬৪

১২৬ টেড ডেক্সটার ; কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২

১২১ পিটার পারফিট ; কানপুর, ৫ম টেস্ট, ১৯৬৪

১১৯ রেভারেণ্ড ডেভিড শেপার্ড , ওভাল, ৩য় টেস্ট, ১৯৫২

১১৯ জিওফপুলার ; কানপুর, ২য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২

১১৩ কেন ব্যারিংটন ; নয়াদিল্লী, ৩য় টেস্ট, ১৯৬১-৬২

১০৭ কলিন কাউড্রে ; কলকাতা, ৩য় টেস্ট, ১৯৬৪

১০৬ পিটার মে ; নটিংহাম, ১ম টেস্ট, ১৯৫৯

১০৪ গডফ্রে ইভান্স ; লর্ডস, ২য় টেস্ট, ১৯৫২

১০৪ কেন ফাটন ; ম্যানচেস্টার, ৩য় টেস্ট, ১৯৫২

১০২ সি. এফ. ওয়াল্টার্স : মাদ্রাজ, ৩য় টেস্ট, ১৯৩৩-৩৪

১০০ মাইক স্মিথ ; ম্যান্‌চেস্টার, ৪র্থ টেস্ট, ১৯৫৯

ইনিংসে সর্বোচ্চ রান

ভারত : ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৬৮৪, দ্বিতীয় টেস্ট, বোম্বাই, ১৯৬১-৬২

ইংল্যাণ্ড : ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ৫৫৯, পঞ্চম টেস্ট, কানপুর, ১৯৬৪

ইনিংসে সর্ব নিম্ন রান

ভারত : ৪৮, তৃতীয় টেস্ট, ম্যান্‌চেস্টার, ১৯৫২

ইংল্যাণ্ড : ১০৪, প্রথম টেস্ট, লর্ডস, ১৯৩৬

সিরিজে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান

ভারতের পক্ষে : ৫৮৩, গড় ৮৩'২১ : বিজয় মঞ্জরেকার, ১৯৬১-৬২ ; ভারতে

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ৫৯৪, গড় ৯৯'০০ : কেন ব্যারিংটন, ১৯৬১-৬২ ; ভারতে

সিরিজে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট

ভারতের পক্ষে : ১৬'১৯ রানে একটি ক'রে পাঁচটি টেস্টের ছয়টি ইনিংসে ৩৪টি উইকেট পেয়েছিলেন বিষ্ণু মানকড় ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে।

২৭'০৪ রানে একটি ক'রে পাঁচটি টেস্টের ন'টি ইনিংসে ২৩টি উইকেট পেয়েছিলেন লেলিয় হুরানি ১৯৬১-৬২ সালে ভারতে।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৩'৩১ রানে একটি ক'রে চারটি টেস্টের আটটি ইনিংসে ২৯টি উইকেট পেয়েছিলেন ফ্রেডি ট্রুম্যান—১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডে।

১২'৪১ রানে একটি ক'রে তিনটি টেস্টের পাঁচটি ইনিংসে ২৪টি উইকেট পেয়েছিলেন আলেক বেডসার ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডে।

ইনিংসে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট

ভারতের পক্ষে বিনু মানকড় ১৯৫১-৫২ সালে মাদ্রাজে ৫ম টেস্টে ৫৬ রানে ৮টি উইকেট পেয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে: ফ্রেডি ট্রুম্যান ১৯৫২ সালে ম্যানচেস্টারে ৪১ রানে ৮টি উইকেট পেয়েছিলেন।

কোনো একটি টেস্টে সর্বাধিক সংখ্যক উইকেট

ভারতের পক্ষে: পেয়েছিলেন বিনু মানকড়, মাদ্রাজে, ১৯৫১-৫২ সালের ৫ম টেস্টে—১০৮ রানে ১২টি উইকেটে।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে: পেয়েছিলেন হেডলি ভেরিটি, মাদ্রাজে, ১৯৩৩-৩৪ সালের ৩য় টেস্টে ১৪৩ রানে ১১টি উইকেট।

পেয়েছিলেন আলেক বেডসারও, ১৯৪৬ সালের ১ম টেস্টে, লর্ডসে, ১৪৫ রানে ১১টি উইকেট, শুধু তা-ই নয়, বেডসার, ওই সিরিজের ২য় টেস্টে, ম্যানচেস্টারে, আবার ১১টি উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ৯০ রানের বিনিময়ে।

কোনো টেস্টে সব দিকেই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব

দেখিয়েছিলেন ভারতের বিনু মানকড় ১৯৫২ সালে লর্ডসের ২য় টেস্টে, যখন দুই ইনিংসে তিনি রান করেছিলেন ৭২ ও ১৮*, এবং মধ্যে ৭৫ ওভার বল ক'রে ১৯৬ রানে পেয়েছিলেন বিপক্ষের পাঁচটি উইকেট—এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও বল করেছিলেন আরো ৪২ ওভার।

বিশেষ স্মরণীয়

১৯৩৩-৩৪ সালে বোম্বাইতে লালা অমরনাথের ১১৮ রান কেবল টেস্টে যে তাঁরই প্রথম সেঞ্চুরি, তা নয়—ভারতের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি অর্জন করার কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর আগে ভারতের বিরুদ্ধেও যেমন টেস্টে কেউ সেঞ্চুরি করেননি, তেমনি ভারতের পক্ষেও কেউ নয়।

* * *

এটা আশ্চর্য যে যে-সব ভারতীয় ক্রিকেটার টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছেন, তাঁরা আর কোনো দিনই টেস্টে সেঞ্চুরি করেন নি। লালা অমরনাথ, কৃপাল সিং, দীপক সোধন, আব্বাস আলি বেগ, হনুমন্ত সিং-এরা কেউই টেস্টে আর সেঞ্চুরি করেননি—অবশ্য এঁদের মধ্যে হনুমন্ত সিং একাধিকবার বড়ো রান করেছেন—অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৬৩ সালে মাদ্রাজে ৯৪, নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে '৬৪ সালে অপরাজিত ৭৫ ও ৮২ রান এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বপনচারিণী

(ছোট গল্প)

আর্যভট্ট

বাড়ীটা শহরের একরকম প্রায় উপকণ্ঠে বললেই চলে। ঠিক যাত্রীবাহী একটা আহাজ প্যাটার্নের। একতলা···দোতলা··তিনতলা···চারতলা···ব্যস্! এই পর্যন্ত মাথা তুলেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাড়ীটা, বোধ হয় অগ্নি-বৈশাখের ভয়ে। অনেকগুলো ফ্ল্যাট, সব ফ্ল্যাটেই বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বর্ণের লোক বাস করে স্ত্রী-পুত্র আর পরিবারবর্গ নিয়ে। একমাত্র আমার বেলাতেই এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আমি পরিবারবর্গহীন। থাকি এই বাড়ীরই একতলার একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে একেবারে সম্পূর্ণ একা। কারো সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই আমার। আমি কারো খবরাখবর নিই না, আর আমার খবরাখবর নেবারও কেউ ধার ধারে না। যাই হোক, এত বড় একটা বাড়ীর এতগুলো লোকের মধ্যে বাস করেও কেমন যেন নির্জন একটা আরণ্যক, আশ্রমবাসীর জীবনের আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ ক'রে দিন কেটে চলেছে আমার। ভালো কথা: দিন ত কাটবেই। এই জীবজগতে যখন এসেছি তখন অন্যান্য জীবের মত আমার দিনও যে কাটবে তাতে আর সন্দেহ কি? তবে কথা হোলো আমি মানুষ, জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আমি বিবেকী, আমি যুক্তিবাদী আর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। কাজেই অন্যান্য জীবের দিন কাটার সঙ্গে আমার দিনাতিপাতের পরিষ্কার আকাশ পাতাল পার্থক্য।

মানুষ মাত্রেই জীবনোপায় কিম্বা জীবিকা নির্ব্বাহের একটা পেশা চাই। আমারও আছে। সেটা হোলো একেবারে রসলুব্ধ ইতিহাসের অধ্যাপনা। যদিও এটা আমার পেশা তবু ক্রমশঃ পেশা থেকে একেবারে নেশায় পর্যবসিত হ'য়ে গেছে আমার এই অধ্যাপনা আর তার সঙ্গে অধ্যয়ন আর অনুশীলন। যত টাকা উপায় করি তার প্রায় অর্দ্ধাংশেই ব্যয় হয় আমার অমূল্য আর কিছু কিছু দুর্লভ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ক্রয়ের ব্যাপারে। এই সব বই নিয়েই বিনিদ্র রজনী ক'রে চলে আমার ঐকান্তিক গবেষণা। তবে দু'বেলা দু'মুটো আহার ত করতেই হবে আর তা নির্ভর করতে হয় আমাকে অতি অকাতরচিত্ত একজন ভৃত্যের উপর। এই আমার আহোরিক জীবন-যাত্রা।

সেদিন রাত তখন কটা জানিনা, হঠাৎ আমার ফ্ল্যাটের অবরুদ্ধ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালাম। দেখি আমার সামনে এক সশরীরী নারীমূর্ত্তি।

অদ্ভুত দেহ-সৌষ্ঠব। পদ নখ থেকে অলক পর্য্যন্ত সারা অঙ্গ যেন নিখুঁত সৌন্দর্য্য আর লাবণ্যের লীলানিকেতন। এ যুগের নারী, প্রকৃতি, পোশাক আর দেহের গঠন ভঙ্গিমার সঙ্গে কোন মিল নেই।

কবরী বেশ থেকে নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে মণিহারা ফণীর মত এক অপূর্ব্ব বেণী। মাথায় ওড়না। তার সারা গায়ে সোনালী জরীর অসংখ্য মনমোহিনী কারুকার্য্য। কটিতট থেকে পা পর্য্যন্ত ঘাগ্‌রা। ঘাগ্‌রা যেমন তরঙ্গায়িত একটা আপনভাবে দুলতে দুলতে উঠতে থাকে উপরের দিকে, মনে হোলো ঠিক সেই একই ভাবে মণিমুক্তাখচিত একটি অপূর্ব্ব মিহি মস্‌লিন্ শাড়ী ঘাগ্‌রাটাকে পাদদেশ থেকে এক মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিমায় দুলতে দুলতে উপরের দিকে উঠে এই নারীর উরসের অগ্নিগিরিদ্বয়কে ঈষৎ আবৃত করে গ্রীবাদেশ ছুঁয়ে ঝুলে পড়েছে পিঠের উপর রৌদ্রকিরণস্নাতা এক নির্ঝরিণী প্রায়।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিমুগ্ধ নয়ন মুগ্ধ যেমন আহ্লাদে লেহন করতে থাকে আমার বিশাল দৃষ্টিও সেইক্ষণে ঠিক সেই মৃগেরই অনুসরণ করল।

দেখলাম ইন্দ্রিয় লালসার এক অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি এই নারী। অগাধ লালসা-লোল। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় ওর দৃষ্টি-রশ্মি যেন শর বৎ মর্ম্মে বিঁধছে। ওষ্ঠাধর আরক্তিম। প্রথম উষার প্রস্ফুটিত প্রায় পুষ্পের মত এক টুকরো হাসি লেগেই আছে সেখানে। তবে সেই হাসিটা মনে হয় যেন বিদ্রূপাত্মক। সেই মুহূর্ত্তে আমি সম্পূর্ণ সচেতন আছি বটে, কিন্তু তবু মনে হোলো যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছি। পলকের মধ্যে এই নারী নিয়ে গেল আমাকে সুদূর অতীতের চারুকলা সৌন্দর্য্যের এক ঐশ্বর্য্যময় রাজত্বে।

তনুলতা ঈষৎ পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে রাজহংসীর মত এক অপূর্ব্ব গ্রীবাভঙ্গিমা ক'রে আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল স্মিতহাস্যে,—"আসতে পারি?"

দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম ঠিক যন্ত্রমুগ্ধের মত। অলস প্রোগীতায় নিয়ে মরালীর মত ধীর মন্থর গতিতে আমার সামনা দিয়ে পথ করে নিয়ে ব'সল গিয়ে খাটের পাশেই আমার শিয়রের দিকের কাউচটায় ঠিক সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিমায়।

সে মুহূর্ত্তে মনে হোলো আমি যেন ওর রাজত্বে ওরই রূপের চন্দ্রাতপিনী বহ্নিশিখার মত কোন এক প্রেমিক পতঙ্গ। খুব সন্তর্পণে আত্মগোপন করে ঠিক চোরের মত এসে হাজির হয়েছি ওর কাছে কৃপাভিক্ষা চাইতে। দরজার কাছ থেকে সরে এসে ওর দিকে মুখ ক'রে খাটের উপর বসতে বসতে হঠাৎ বলে উঠলাম আমি,—"দেখ, একটা কথা বলি, রাগ কোরোনা। আমি যেন তোমাকে চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছি! অনেক দিন অনেক মেলামেশা করেছি তোমার সঙ্গে, তবে কোথায় কিভাবে তা আমি এখন ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। তোমার নামটা যেন কি···পেটে আসছে কিন্তু ঠিক মুখে আসছে না।"

"তুমি যদি আমায় একান্ত দেখেই থাক তাহ'লে স্বপ্নে দেখেছ, বহুদিন বহুবার···বহুরাত।" অন্তর্ভঙ্গিমায় ঠিক সম্রাজ্ঞীর মর্য্যাদা ফুটিয়ে আর আরক্তিম অধরোষ্ঠে সেই স্মিত হাসি নিয়ে বলল নিতান্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে আবির্ভূতা এই নারী।

"স্বপ্নে? না না···স্বপ্নে কেন হবে···।"

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আবার বলে উঠল, "হাঁ। স্বপ্নে-স্বপ্নে· বহুদিন স্বপ্নে ধরা দিয়েছি আমি তোমাকে। বাস্তবে তুমি আমার ছায়াও দেখতে পাওনি আজ পর্য্যন্ত। আর আমার নাম মনে করতে পারছ না তুমি? আমার নাম নারী।"

"নারী? এত বড় অদ্ভুত নাম। এই নামের কোন মেয়েছেলেকে আমি চিন্‌তাম বা চিনি বলে ত মনে হচ্ছে না।" বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বললাম আমি।

নারী বলল "হাঁ। চেনো, নিশ্চয়ই চেনো, নিশ্চয়ই চেনো, তবে প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষভাবে।"

"কি রকম?" প্রশ্ন করলাম আমি।

নারী বলল, "কি রকম? তুমি ত ইতিহাসের অধ্যাপক? গোটা পৃথিবীটার ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়েছ? কিন্তু ইতিহাসের অধ্যাপক এত বোকা হয় তা আমার জানা ছিল না।"

লজ্জায় আর ক্রোধে আমার কানের পাশ দুটো বরফাবের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। নিজেকে সংযত করে বললাম, "তাহ'লে কি তুমি আমায় বোকা ঠাওরেছ?"

"তা ছাড়া কি! ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কর অথচ আমার নাম তুমি কোনদিন শোননি। বোকা ছাড়া তোমাকে আর কি বলব? আচ্ছা! ঠিক আছে শোন, আজ থেকে দু'হাজার বছর পেছনে চলে যাও।"

"দু হাজার···বছর···?"

"হাঁ। দু'হাজার বছর!"

আঁখি পল্লব মুদ্রিত করে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অকস্মাৎ বলে উঠলাম, "গেছি, দু'হাজার কেন তারও বেশী পেছনে গেছি, এবার কি বলতে চাও বল।"

"গেছ? বেশ! ক্রিওপেত্রার নাম শুনেছ?

"শুনেছি।"

"কে সে?"

"পুরাতন মিশরেশ্বরী।"

"ঠিক! এই ক্রিওপেত্রার একটি কটাক্ষে একদিন পৃথিবীর অর্ধেক তোলপাড় হয়ে যেত; তা তোমার জানা আছে আশা করি। তোমার পড়েছ নিশ্চয়ই, তা হলে হেলেনকেও চিনবে। এই হেলেনের রূপানলে গোটা ট্রয় শহরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমি সেই ক্রিওপেত্রা আর হেলেনেরই বংশধর। অন্তত জান? জান ইলোরা?

"ইতিহাসে পড়েছি, চোখে দেখিনি।"

"ও! চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি? বেশ, তা হলে বলি শোন। তুমি যে ইতিহাস নিয়ে গবেষনা কর আমিই সেই ইতিহাস।"

"অজন্তায় যাও, ইলোরায় যাও দেখবে শৈলে শৈলে গুহাগাত্রে মন্দিরে মন্দিরে খোদাই করা রয়েছে আমারই প্রতিরূপ নানা রূপে নানা ভঙ্গিমায়। যত মূর্তি সেখানে আজো বিরাজ করছে তাঁরা কেউ আলাদা নয়। সবার মধ্যেই রয়েছি আমি। শুধু ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর ভিন্ন ভিন্ন দৈহিক গঠন ভঙ্গিমাই আমাকে পৃথক করে রেখেছে এক থেকে অন্যে। আসলে আমি সেই একই নারী।" এই পর্যন্ত বলেই নারী থেমে গেল। বিহ্বলদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি ওর দিকে।

পরমুহূর্তেই দেহ-লতাকে কাউচের আর এক দিকে হেলিয়ে দিয়ে আবার বলতে শুরু করল "ভুলে যাও অজন্তা আর ইলোরার কথা। এবার ফিরে চলো বোধিসত্ত্ব আর অশোকের যুগে। মনে কর শুঙ্গ-যুগী রাণোবরাকে। মনে কর মহিরাক্ষী বলত সেনাকে। ভেবে দেখ বাসবদত্তার কথা। তার নাট-দেউলের বন্দীনি নটীদের কথা। যাদের শুরু উরুতটের নৃত্য-ছন্দে আর অলকের মণির ঝলকানি ও পাষাণ দেবতারা নীরব হয়ে থাকত দিনের পর দিন। দেবদাসীর নৃত্যই শুধু দেখে গেছে দেবতা

কিন্তু তাঁর বুকের স্পন্দন ধ্বনি শুনতে পায়নি কোনদিন। আমি যুগে যুগে সেই একই নারী শুধু বিভিন্ন নাম আর বিভিন্ন রূপ।" এই পর্যন্ত বলেই সম্রাজ্ঞীর মত অটুট ভঙ্গিমায় আরক্তিম অধরোষ্ঠে সেই স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে আর বন্ধুকের মত বঙ্কিম ভুরু যুগলে একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটিয়ে তুলে নারী তাঁর অপলক দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে একটা কিছু উত্তরের আশায়। কিন্তু আমি নীরব। শুধু বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলাম নারীর দিকে। আমাকে নীরব দেখে নারী আবার বলতে সুরু করল, "ঠিক আছে! ছেড়ে দাও বোধিসত্ত্বের যুগের কথা। সোজা চলে এসো একেবারে মুঘল হারেমে। মিশে যাও সম্রাজ্ঞীর অনুধ্যানস্থা বিদগ্ধা অন্তঃপুরবাসীনিদের সঙ্গে। ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে যেতে পারছনা সেখানে?"

"হ্যাঁ গেছি।"

"ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ জেবুন্নিসাকে? দেখতে পাচ্ছ আনারকলি, নুরজাহান, সাজাহান'এর প্রেমময়ী মমতাজ আর মুচকুন্দা উদীপুরীকে?"

"পাচ্ছি, আমার কল্পনায় কিন্তু ওদের কেউই ত এখন আর বেঁচে নেই, ওরা ত সব কবরে। কবরে ও নিশ্চয়ই এখন নেই, একেবারে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে।"

"না···যায়নি। এখনো আছে। আমার মধ্যেই বেঁচে আছে ওরা। ওদের সবাইকে নিয়ে আমি এক। তাই আমার নাম নারী।" এই পর্যন্ত বলেই অধরের হাসিকে আরো প্রশান্ত ভাবে বিস্তার করে দিয়ে নারী তাকালো ঠিক একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের মত আমার দিকে।

এই হাসিতে মানুষিয়ার প্রথম উত্তেজনা আসা উচিত কিন্তু তা না হয়ে আমার সারা গায়ে একটা ভীতি-বিহ্বল কম্পন জেগে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, স্বপ্ন দেখছি না কি? চোখ দুটোকে দুহাত দিয়ে ভালো করে রগড়ে নিয়ে আবার তাকালাম নারীর দিকে দেখলাম নারী সত্য সত্যই ঠিক সম্রাজ্ঞীর মত সম্পূর্ণ মর্যাদার ভার নিয়ে সশরীরী হয়ে আছে আমার সামনে। আরক্তিম অধরোষ্ঠে সেই প্রশান্ত হাসি কিন্তু সেই হাসিতে যেন মর্মান্তিক একটা বিদ্রূপের সঙ্কেত।

হতবুদ্ধি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

"কি অবাক হয়ে যাচ্ছ আমায় দেখে, আমার কথা শুনে?" বলে উঠল নারী আমার অবস্থা দেখে।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তুমি আমায় অবাক করেছ নারী তা অস্বীকার করছিনা কিন্তু···"

"কিন্তু কি?" আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রশ্ন করল নারী।

বললাম, "কিন্তু মানে···তুমি কোথা থেকে এলে, তোমার থাক কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিনা।"

"ও এই কথা? আমার ঠিকানা জানতে চেয়োনা। শুধু এইটুকুই জেনে রাখ আমি নারী। আমি নিখিল অভিসারিকা। প্রতিদিন গভীর রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ঘুরে বেড়াই তোমাদের শহরে শহরে। দেখা করি কথা বলি একের পর এক বহুজনার সঙ্গে। কিন্তু কেউ আমার কথার জবাব দিতে পারে না। কেউ আমায় খুশী করতে পারে না। মনে পড়ে গেল তোমার কথা। ভাবলাম, তুমি ত ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কর হয়ত আমি যা জানতে চাই, আমি যা বুঝতে চাই, তুমি আমায় তা বুঝিয়ে দিয়ে খুশী করতে পারবে। আচ্ছা একটা কথা। আজকাল মানুষগুলো যেন সব অন্ধবুদ্ধিগ্রস্ত

হয়ে পড়েছে। ওদের সঙ্গে বলতে যেন কিছু নেই। আমার জীবনটাই যেন দুঃখের একটা বিরাট বোঝা। কেন বলত? এরকম হল কেন? এছাড়া আর একটা জিনিস যা আমাকে সবচেয়ে বেশী অবাক করছে, সেটা হোলো যুগে যুগে প্রত্যেক পরিবেশে সেই একই জিনিসের পুনরাবিষ্কার, শুধু ধরণটাই আলাদা। দুচারজ মৌলিক কিছু ত দেখতে পাচ্ছিনা তোমাদের যুগে? বিংশ শতাব্দীর মানুষ তোমরা গর্বে বুক ফুলিয়ে বেড়াও কিন্তু কি করেছ? পৃথিবীর কোন উন্নতিই করতে পেরেছ তোমরা কিছুই পারনি।" এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল নারী।

আমি বললাম, "এ তুমি কি বলছ নারী? পৃথিবীর কত পরিবর্তন ঘটেছে। কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছি আমরা তুমি কি তার কোন খবরই রাখনা?"

"সব রাখি; আচ্ছা, আমার গায়ে এ পোশাক দেখছ এরকম মিহি মসলিন্ আর কারুকার্য করা পোশাক তোমাদের যুগে কেউ তৈরীও করতে পারবে না। আমার ধারণা ছিল, তোমরা সূর্য্যের চেয়েও উজ্জ্বল চাঁদের চেয়েও মসৃণ এবং কোমল অথচ অসংখ্য তারকাখচিত কোন জ্যোৎস্না-বারাণসী কিম্বা স্বর্গ-নর্ত্তকী উর্বশীর গায়ের চামড়ার চেয়েও আরো মোলায়েম কিছু আবিষ্কার করেছ। পারবে কি করে, তোমরা যে রাবার প্লাষ্টিক্‌কে ভালোবাসতে শিখেছ, উঃ! কি কর্কশ, কি কঠিন লাগে এগুলো আমার কাছে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ্ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করল নারী, "অলঙ্কার হিসেবে সোনা আর রূপো এই দুটো মূল্যবান ধাতুকেই ব্যবহার করে আসছে মানুষ যুগ যুগ ধরে। এ ছাড়া, মুক্তো, মরকতমণি হীরা চুণি পান্না, ইন্দ্রনীল, মুনস্টোন এসবও ব্যবহার করেছে মানুষ। এখন বল বিংশ শতাব্দীর লোক তোমরা এই সব মণিমাণিক্য ছাড়া আর একটাও কোন কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছ? দেখাও ত আমি ব্যবহার করিনি এমন কোন জুয়েল? পারবেনা।" ধীরে ধীরে উত্তেজনার শিখরে উঠে শেষ পর্যন্ত একটা তিরস্কার সূচক কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে অবসান ঘটালো নারীর এই কথাগুলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যেও একটু উত্তেজনা দেখা দিল। দুচোখের নির্ভীক দৃষ্টি মেলে ব'লে উঠলাম, "কেন প্লাটিনাম?"

"প্লাটিনাম? ছোঃ! মূল্যবান হতে পারে কিন্তু হীরা জহরতের কাছে নস্যাৎ হয়ে যায়।" বলল নারী অবজ্ঞার কণ্ঠে। আমি বললাম, "দেখ নারী তুমি ভুল করছ। সোনা রূপো আর মণিমাণিক্যের উপর তুমি খুব জোর দিয়ে কথা বলছ বটে, অবশ্য তোমার দোষ নেই, তার কারণ এই নারীজাতটা এমনই এমই একটা জাত যে তারা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসে এই সব জড় পদার্থ গুলোকে, যাদের প্রাণ বলে, অনুভূতি বলে কোন কিছুই নেই। কিন্তু একটা কথা কি জান নারী? কথাটা হোলো এই যে হাজার হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে দেখা যায়নি যে, কোন সূচী-শিল্পী কোন ফরাসী কিম্বা কোন জুয়েলারই আজ পর্যন্ত কোন নারীকে তার ঈশ্বরদত্ত সৌন্দর্য্যের চেয়ে আরো অনেক বেশী সৌন্দর্য্যময়ী করে তুলতে পেরেছে তাঁদের কেরামতি দিয়ে? নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য আর স্বপ্নাবেশ্য কখন ফুটে ওঠে জান? যখন সে সৌন্দর্য্যের সব আবরণপরে, তা ছাড়া আর কোন সময়ই না।"

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কাউচে সোজা হ'য়ে উঠে বসল নারী। আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নারী বলে উঠল, "তোমাকে ভয়ানক হাস্যকর মনে হচ্ছে। তুমি যা বলছ সে কথা কি ঠিক? নারীর বস্ত্র আবরণই কি তার প্রকৃত সৌন্দর্য?"

আমি কোন অবাধ দিতে পারলামনা এই প্রশ্নের। ওর চোখের তারা দুটোর আলো আমার চোখে পড়ামাত্রই আঁখি-পল্লব-যুগল নিমিলীত হয়ে এলো ধীরে ধীরে। মন্ত্র মুগ্ধের মত নির্বাক হয়ে ব'সে রইলাম কিছুক্ষণ।

জাগর অবস্থায় চোখ বুজে থাকলেই মন কিছুনা কিছু কাজ করতে আরম্ভ করে। আমার মনও তাই ভাবতে আরম্ভ করল, ভূত প্রেত কিম্বা অবচ্ছায়ার কথা ত অনেক শুনেছি। কিন্তু তাঁরা ত সব অলৌকিক। তবে কোন কোন সময় নাকি কোন গুরুত্বপূর্ণ রহস্যময় প্রাকৃতিক নিয়মে ওরাই আবার সশরীরী হ'য়ে মানুষের কাছে এসে হাজির হয়, এমন ভাবে যে, কোন ভীষণ সন্দিগ্ধচিত্ত এবং বাস্তিকাবাদী লোকের মনেও সন্দেহ জাগবেনা এতটুকু। ভাবলাম নারীও কি তা হলে ঠিক তাই? আবার ভাবলাম, এমন লজ্জাহীন বা অশ্লীল মনোবৃত্তিসম্পন্না নারীকে হতে পারে যে, অনুরোধ বা আমন্ত্রণ ছাড়া সত্বেও আমার মত একজন পরিবারবর্গহীন একান্ত একাকী অথচ ভেতরের লোকের ঘরে এত রাত্রে আসবার ধৃষ্টতা ধরে!

এই সব পাঁচ পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমার দু'চোখের পাতা নিজের অনিচ্ছাসত্বেও নিমিলীত হয়ে গেল। দৃষ্টি পড়ল নারীর দিকে। দেখলাম, নারী সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ প'রে বসে আছে কাউচের উপর। এই অল্প সময়ের মধ্যে নারী যে কখন কি ভাবে অলঙ্কার এবং সাজপোষাক খুলে অতি আস্তে অথচ অপারদর্শিতা উভের মত নিজেকে বসিয়ে রেখেছে কাউচে তা আমার কল্পনায় আসেনা। ওকে দেখা মাত্রই মনে হোলো ও এ যুগের নয়। ও যেন সুদূর অতীতের কোন সুদক্ষ ভাস্করের হাতের তৈরী এক অপূর্ব নারী মূর্তি। কালের নিষ্ঠুর আঘাতে হারিয়ে গিয়েছিল ধরিত্রীর অতল গর্ভে। পাষাণী অহল্যা যেমন শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছিল, ঠিক সেই রকম নারীও যেন কোন এক অদৃশ্য বিরহ প্রেমিকের স্পর্শ পেয়ে আজ প্রস্তর থেকে জীবন্ত মূর্তি হ'য়ে উপস্থিত হয়েছে আমার সামনে। নারীরূপের এক নতুন মহিমা ধরা দিল আজ আমার চোখে। আবক্ষিম অধরে মদিরা, নয়নে নীলাকাশ, ললাটে বালার্ক ভাতি। এক অপূর্ব ভোগবতী মরম-পরশী রসধারা। বাহু ও ম্যাডোনা একাকারা হ'য়ে গেল আমার কাছে। দীর্ঘ গুরু দেহ। কণ্ঠদেশ থেকে কটিতট পর্যন্ত শ্রীঅঙ্গের সৌষ্ঠব বর্ণনা বলনে অত্যুক্তি হয়না। উরু-ভট বেশ গুরু। এক কথায় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল্পনাতীত মনোহারিত্বে ভরা। অথচ মনে হয় আঙুল দিয়ে টোকা মারলে বুঝি এই মুহূর্তে সব ভেঙ্গে পড়ে যাবে। আমি বিমুগ্ধ, আমি মন্ত্রমুগ্ধ, আমি মূক, আমি বধির···আমি নিথর—আমি নিস্পন্দ সেই দণ্ডে। আমি নারীর কাছ থেকে একটু দূরেই বসেছিলাম। হঠাৎ কাউচটা আমার ধরা ছোঁয়ার গণ্ডীর মধ্যে এগিয়ে নিয়ে এসে তার উপর আসীনা থেকেই বলে উঠল নারী, "আমার দিকে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখ। তোমার কথামতই আমি সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ পরে বসে আছি। দেখত, আমার মধ্যে কোন ত্রুটী আছে কিনা। মনে হয় নেই, হয়ত বা তিল কণিকার মত একআধটুকু থাকতেও পারে। যাই হোক, তোমরা আর যাই করতে না পেরে থাক অন্ততঃ এই নারী দেহকে ত একেবারে নিখুঁত সর্বাবয়ব সম্পন্ন করতে পারতে! তাও পারনি। সোনাদানাকে কি করে আরো বড় আরো সুন্দর করা যায় তার গবেষনা কর তোমরা, কিন্তু নারীর সৌন্দর্য্যকে কি করে আরো মহিমান্বিত করে তোলা যায় তা একবারও ভেবে দেখনা, অথচ শক্তির মূলেই রয়েছে এই নারী। এই নারী জাতির জন্ম-রাজধানী থেকে সৌর্য্যে আর বীর্য্যে এমন একটা মানবজাতি

যদি সৃষ্টি করতে পারতে যে আমি তেত্রিশকোটি দেবতাকেও হার মানায়, তাহলে তোমাদের শক্তির কাছে মাথা নত করতাম। কিন্তু তা পারনি। উঃ! কি দুঃসাহসী দুর্বল যুগ তোমাদের। এই বিংশ শতাব্দীর অতি বুদ্ধিমান মানুষ তোমরা নিশ্চয়ই পুরুষ আর নারীর মধ্যে ভালোবাসা বিনিময়ের একটা নতুন পন্থা আবিষ্কার করেছ? রতি আরতি আর প্রেমানুরাগের এমন একটা মন-মোহনিয়া পথ দেখাতে পার যে পথে অতীত যুগের নরনারীরা পদচারনা করেনি? পারনা। তবে কি করেছ ছাই?"

নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত নারীর কথাগুলো শুনে গেলাম। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে রইলাম। মনে হোলো আমি যেন আমার ইন্দ্রিয়লালসা দৃষ্টির দ্বারা এতক্ষণ একটা অকৃত্রিম পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করছিলাম। নরলোকের নারী-সৌন্দর্য্যকে যে চোখে দেখা চলে ওকে সেই চোখে দেখলে যেন পাপ হবে।

নারীর এই ধরণের ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথায় আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তবু নিজের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে যথাসম্ভব সবল করে বললাম, তোমার বুদ্ধি আর বিদ্যে দেখছি আমার চেয়ে অনেক বেশী নারী। তবে এ কথাও ঠিক যে তুমি আমাদের যুগটাকে যতখানি অন্ধ মনে করছ ঠিক ততটা নয়।"

"নিশ্চয়ই তাই। তোমার আত্মতৃপ্তিতে আমি ভুলবনা। তোমরা সত্যিকারের ভাবুক নও আর তোমরা স্রষ্টাও নও। তবে তোমরা খুব চালাক একথা স্বীকার করব। অতীতের সব কিছুরই একটা রূপান্তর করে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরছ তোমরা আসলে তোমাদের পুরো অস্তিত্বটাই অতীতের ছায়া-চক্রে ঘোরপাক খাচ্ছে। কথাগুলো বলে গেল নারী একটু উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে।

পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, কি চুপ করে রইলে কেন মাথা নিচু করে? ভালো করে তাকাও আমার দিকে। ভগবান দুটো সুন্দর চোখ দিয়েছে তোমায়; সেই চোখের দৃষ্টি-পাত্রে আমার রূপের শীতল-ব্রাকারস কানায় কানায় ভরে নিয়ে তুমি পান কর, আমি তা চেয়ে চেয়ে দেখি।"

নির্লজ্জের মত চোখ তুলে তাকালাম নারীর দিকে। ওর চোখে চোখ পড়া মাত্রই মনে হোলো আমারও যেন প্রাণবান হোমেই রোয়েছে আমার দিকে দু'চোখের দৃষ্টি দিয়ে আর সেই বান যেন বিদ্রূপের বিষ মাখানো।

বেশ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল একটা গভীর নিস্তব্ধতা আর প্রগাঢ় অনুভূতির মধ্যদিয়ে। নারী এমনভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে ওর জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে যে আমি একটা কিছু না বলে থাকতে পারলামনা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলে ফেললাম, "আমরা এরোপ্লেন্ আবিষ্কার করেছি।"

"রামায়ণ পড়েছ?" আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল নারী।

বললাম, "পড়েছি।"

"বিশ্বাস কর রামায়ণের কথা?"

"করি।"

"ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করত পুষ্পক-রথে চ'ড়ে এ কথা জানা আছে?"

"আছে।" বললাম নির্দ্বিধাবে।

"তা হ'লে এখন আমি যদি বলি তোমাদের এই এরোপ্লেন্ সেই পুষ্পক-রথেরই একটা নামান্তর মাত্র, আসলে তোমাদের মৌলিকত্ব এর মধ্যে কিছুই নেই, তা হলে আমার কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে?"

হতভম্ব হ'য়ে গেলাম নারীর কথা শুনে। কি জবাব দেব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না ভেবে।

আমাকে নির্বাক দেখে নারী আবার বলে উঠল, "এখন তোমরা যদি বল আমেরিকা কলম্বস্ আবিষ্কার করেছে আমি বলব—না।"

"কেন?" প্রশ্ন করলাম।

"তার কারণ কলম্বস্ করেনি, করেছে আমেরিগো।"

"কি রকম?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি। নারী বলতে আরম্ভ করল, "আরিস্তটল বুঝতে পেরেছিল যে পৃথিবী গোলাকার এবং এই ভিত্তিতেই আরিস্তটল যে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের দিকে জলপথে ঠিক পশ্চিম দিকে এগুতে থাকলে একটা নতুন আবিষ্কার হতে পারে। কলম্বস এই পরিকল্পনা নিয়েই কাজে নামে এবং তার ফলেই আমেরিকা আবিষ্কার। যে কোন আবিষ্কারের কথাই বল না কেন, বাস্তবে রূপ দিতে না পারলেও প্রথমে যেই নিজের কল্পনা শক্তির মধ্যে ধরে এনে অপরের কাছে তার সম্ভাবনার রাস্তাটা পরিষ্কার ক'রে তুলে ধরে আসলে কৃতিত্বটা তাঁরই। কাজেই আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কলম্বসের চেয়ে আরিস্তটলেরই বেশী। ঠিক এই রকম তোমরা যদি এখন বল যে শুক্রগ্রহ তোমরা আবিষ্কার করেছ তা হলেও আমি বলব, না। তার কারণ শুক্রের প্রকৃত আবিষ্কারক হলো পাইথেগোরাস্। পাইথেগোরাস্ই প্রথম বুঝতে বা দেখতে পেরেছিল যে সৌরমণ্ডলে দশটি গ্রহ আছে তার মধ্যে শুক্র একটি। অবশ্য কিসের ভিত্তিতে পাইথেগোরাস্ এ কথা বলেছিল তা আমার জানা নেই তবে ওর মুখ থেকেই যে প্রথম একথা বেরিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। তোমরা সব পরজীবী।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম নারীর বিদ্যাবুদ্ধির এই অপরিসীম পরিধি দেখে। তর্ক করবার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেললাম তবু সভয়ে বুক ফুলিয়ে বলে উঠলাম, "আমরা চন্দ্রগ্রহে গেছি।" অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নারী প্রতিবাদের সুরে বলল, "মোটেই না। তোমরা রকেটে করে শুধু পৃথিবীটাই পরিক্রমা করেছ। হয়ত চন্দ্রের যার কাছ দিয়েই ঘুরেছ, কিন্তু তাতে হোলো কি? আগে সেখানে যাও। সেখানে গিয়ে আমার মত নারীকে আবিষ্কার কর। মাটি বলে যদি সেখানে কিছু থেকে থাকে তাকে খুঁজলা খুঁজলা করে তোলো। মানুষে মানুষে ভরে যাক ঐ চন্দ্র। তবেত বুঝব তোমাদের কৃতিত্ব! তার আগে তোমাদের কোন গৌরবই সাজে না।" কথা শেষ করেই গ্রীবাদেশ বঙ্কিম করে অধরোষ্ঠে বিদ্রূপাত্মক একটা হাসি ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল নারী আমার দিকে।

অসহ্য মনে হোলো নারীর এই ভঙ্গিমা আমার কাছে। ঈষৎ উত্তেজনার সুরেই বললাম, "আমরা পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছি।"

নারী খুব ধীর কণ্ঠে বলল, "জানলাম, কিন্তু এই পারমাণবিক শক্তিকে জগতের কোন কল্যাণে লাগাতে পেরেছ তোমরা? পারনি। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য ঘুচেছে এই শক্তির আবির্ভাবে? ঘোচেনি। এই গোটা পৃথিবীর মানুষকে একটা অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে পেরেছ এই শক্তি দিয়ে? পারনি যদি সমস্ত মানবজাতিকে তোমাদের এই পারমাণবিক শক্তি দ্বারা অহিংসা এবং ভ্রাতৃত্বের এক সূত্রে

বাঁচতে পারতে তা হলে তোমাদের বহু কৃত্রিম আর মৌলিকত্ব যাই বল সব স্বীকার করে নিতাম। তা যখন পারনি তখন তোমাদের এই আবিষ্কারের কোন মূল্যই নেই আমার কাছে।"

ক্লান্ত আর অবসাদের শেষ পর্য্যায়ে চলে এসেছি আমি। মনে হোলো নারীর যুক্তি তর্কের কাছে আমি হার মেনে যাচ্ছি প্রত্যেক পদে পদে। কিন্তু তবু বলতে ছাড়লাম না "আমরা রেডিও আবিষ্কার করেছি, আমরা টেলিভিশন···।"

"তুমি ত বড় অদ্ভুত মজার লোক দেখছি।" আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল নারী।

প্রশ্ন করলাম, "কেন?"

নারী বলল, "তোমাদের এই রেডিও আর টেলিভিশন কি মানুষের চোখের জল মোছাতে পেরেছে? পারেনি। দিতে পেরেছে মানুষকে সহস্র-সহস্র পরমাণু? দেহে অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি? আণাতে পেরেছে প্রাণে প্রাণে রূপ-রস-গন্ধ প্রীতির বিচিত্র ছন্দ? মেয়েদের করতে পেরেছে মোহিনী অপ্সরা? পারোনি আমি জানতে চাই বিশে শতাব্দীর গর্বোৎফুল্ল মানুষ তোমরা এই ধূলার ধরণীতে কোন্ অমরাবতী সৃষ্টি করেছ? বিত্ত হয়ত তোমাদের আছে, কিন্তু আয়ু? আমি দুই-ই চাই। পেরেছ অফুরন্ত বিত্ত আর অর্জিত রত্নের একত্র সমাবেশ করে এক নতুন মানব সমাজ সৃষ্টি করতে? পেরেছ আবিষ্কার করতে শ্রীতির কোন বিপরীত রীতি? যে রীতির কাছে স্বর্গজিৎ ও হার মেনে লজ্জা পাবে। পারনি। তবে? এমন একটা রাজ্য তুমি দেখাতে পার যেখানে ঘরে ঘরে শত বসন্ত আর অপর্য্যাপ্ত হিরণ্যের একত্র মিলন ঘটেছে? যেখানে সবাই বীতরাগ বীতশোক আর বীতমন্যু। শুধু মিলনের মধুস্রাবী আর আনন্দ-বাঁশরী বেজে চলেছে উন্মাতাল। পারবে দেখাতে? যদি পার তবে সেই রাজ্যের রাস্তা আমায় বাতলে দাও, আমি সেখানকার আস্বাদ পেতে চাই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। পারবেনা···তুমি পারবেনা···উঃ! কি কৃত্রিম কি দুর্বল যুগ তোমাদের।" এই পর্য্যন্ত বলেই নারী দু'হাতে দিয়ে চোখের পাতা ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর দু'চোখ থেকে মুক্তা সিন্দুর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে কোলের উপর।

আমার ঘরে দারা রাতই একটা নীল রংএর ভিমলাইট জ্বালা থাকে। ড্রেসিং টেবল-এর উপর থাকে একটা এলার্ম ঘড়ি। তাতে এলার্ম দেওয়া থাকে ঠিক ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্যে।

এগিয়ে কাতর হয়ে এগিয়ে যাব ভাবলাম নারীর চোখের জল মুছিয়ে ওকে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে, কিন্তু দেখি নারী ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছে আমার চোখে।

ঠিক এমন সময় এলার্ম বেজে উঠল। ফুটন্ত-প্রায় ফুলের পাপড়ির মত আমার নিমিলীত আঁখি পল্লব ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে গেল। চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিয়ে কাউচের দিকে তাকালাম ঈষৎ ভীতি বিহ্বল আর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে।

যেখানে কাউচ যথাস্থানেই রয়েছে। একটুও এদিক ওদিক হয়নি! ঘরের দরজা ও যেমন বন্ধ করা ছিল ঠিক তেমনিই আছে।

---

* শিরাজ দুই'র "A new Sensation" গল্পের ছায়াবলম্বনে।

ঘেরাও ঃ এক নতুন বুমেরাং

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দিন পাঁচ ছয় আগে সকালবেলা এক পুরনো বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলাম।

বন্ধুটি সম্প্রতি সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে মোটা পেনসন ভোগ করছেন। বাড়িতেই বেশী সময় কাটান। তিন ছেলে, চার মেয়ে, দুই পুত্রবধূ, স্ত্রী, তিন চারটি নাতি নাতনি। চাকর বাকর। স্বচ্ছল সংসার।

তাঁর বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখলাম, সদর দরজা বন্ধ। সাড়া শব্দ নেই।

কলিং বেল টিপলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কোন সাড়া না পেয়ে আবার টিপলাম কলিং বেল।

ব্যাপার কি? বন্ধুর বাড়ি তো এত নিস্তব্ধ থাকে না। বাড়ি ভর্তি লোকজন। সর্বদাই তো সরগরম থাকে দেখেছি।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে একটি আটদশ বছরের ছেলে মুখ বাড়ালো। চিনলাম। বন্ধুর বড় নাতি।

বললাম, খোকা, তোমার দাদু কি বাড়ি নেই?

ছেলেটি আমায় চেনে। ঘাড় নেড়ে বললে, আছেন।

বললাম, খবর দাও। বল, আমি এসেছি।

মাথা হেলিয়ে ছেলেটি বললে, দাদুর সঙ্গে তো দেখা হবে না।

দেখা হবে না! কেন বলতো? তাঁর কি শরীর খারাপ হয়েছে?

ছেলেটি জবাব দিলে, না, তা নয়। দাদু ঘেরাও হয়েছেন।

ঘেরাও হয়েছেন! আকাশ থেকে পড়লাম।

বন্ধু ঘেরাও! তাঁর বাড়ির মধ্যে? সে আবার কি?

ছেলেটিকে কয়েকটা প্রশ্ন করে ব্যাপারে যতটুকু বোঝবার হল:

আমার বন্ধুটি বর্তমানে তাঁর শোবার ঘরে অবরুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করছেন। দরজার মুখে, ঘরের মধ্যে, তাঁর ছেলেমেয়ে পুত্রবধূ স্ত্রী মায় চাকর বাকর সবাই তাঁকে ঘিরে বসে আছে ঘেরাও করে। তাঁকে তারা ঘর থেকে বেরুতে দেবে না।

ঘেরাওয়ালাদের অনেকদিনের অনেক দাবী তিনি নাকি কিছুতেই মানছিলেন না, তাই তারা শেষ পর্যন্ত এই পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

যতক্ষণ না তাদের দাবী তিনি মেনে নিচ্ছেন ততক্ষণ তারা খেরাও তুলে নেবে না, অর্থাৎ তাঁকে ঘর থেকে বেরুতে দেবে না।

গৃহস্বামী সোল্লাসে বাহা খেরাও! লেটেস্ট ফুল!

• • •

পরদিন ভোরবেলায় আমার বাড়ীর দরজার বাইরে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

খেরাও-বন্ধু এসেছেন।

এসো, ভেতরে এসো। বস। ব্যাপার কি? খুব কাহিল যে···

বন্ধু বললেন, তাল তুমি সিকলে। শুনেছো সব?

শুনেছি। কিছুটা। কিন্তু ব্যাপার কী! তুমি ছিলে একজন ডাকসাইটে আমলা, দোর্দণ্ড তোমার প্রতাপ ছিল, ছেলেমেয়েরাও তোমায় বিলক্ষণ ভয় করত। হঠাৎ একী হল?

হল আর কি! বন্ধু বললেন, ছুমিছাটা রাতারাতি বদলে গেল।

খুলে বল তো তুমি, কি ব্যাপার।

বলছি। বলব বলেই তো এসেছি।

এই বলে তিনি যে কাহিনী বিবৃত করলেন তা যেমন হাস্যকর তেমনি মর্মবিদারক।

পেনসন নেবার পর তিনি সাংসারিক খরচ কমাবার দিকে নজর দিয়েছিলেন। (ঐ এক ভুল চালেই তিনি নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছিলেন)

বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, নানা দিকে অথথা অনেক টাকার অপব্যয় হচ্ছে। খাওয়াদাওয়ার এলাহি তাণ্ডবকারখানা ছাড়াও বাড়ির ছেলেমেয়েদের বিশেষ করে মেয়েদের নিত্য সিনেমা দেখা, বেড়াতে যাওয়া, বৌমাদের বাজার করতে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ-পত্র কিনে আনা, মেয়েদের শাড়ী আর প্রসাধনের বাহার আর আড়ম্বর, গৃহিনীর সদাব্রত—এই সব অপব্যয় দেখে দেখে তিনি অত্যন্ত বেদনা ও অসহিষ্ণু বোধ করছিলেন। ছেলেদের বলেছিলেন বারবোর কিন্তু কেউই ওঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিষ্ঠা এবং অভিভাবকত্ব বজায় রাখবার জন্যে তিনি একটি তুঘলকে বরখাস্ত করেন এবং পেনসনের টাকা সংসার খরচের জন্যে দেওয়া বন্ধ করে দেন।

ব্যস। আর যায় কোথায়!

চতুর্দিকে তীব্র বিক্ষোভ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহ চরম সীমায় উঠল।

তিনি খেরাও হলেন।

সারাদিন অভুক্ত থাকার পর তিনি তাঁর সেই পেনসনের টাকা বার করে দিয়েছেন এবং শুধু তাই নয় তাঁকে মুচলেখা দিতে হয়েছে যে ভবিষ্যতে তিনি সাংসারিক বিষয়ে কোন কথা বলতে পারবেন না এবং পেনসনের টাকা আসামাত্র তা গৃহিনীর হাতে তুলে দেবেন। এই চুক্তির পর তিনি খেরাও থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

সত্য ঘটনা এটি।

• • • •

অনশন ধর্মঘট, হরতাল, স্ট্রাইক, ওয়াকআউট—এসব পুরনো হয়ে গেছে।

নতুন খেলা এসেছে—ঘেরাও।

কথাটা এত দ্রুত এবং এমন মারাত্মকভাবে চালু হয়ে গেছে যে বিদেশের সংবাদিকরাও কথাটা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

দাবী আদায়ের নতুন টেকনিক—ঘেরাও।

সকলেই এর কবলে পড়েছেন। পড়ছেন। পড়বেন। অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, হাকিম, ম্যানেজার, মালিক—কে নয়?

তবে ম্যানেজার মালিকদের প্রতিই ঘেরাও বিশারদদের পক্ষপাত বেশী। প্রতিদিনই তাঁরা ঘেরাও হচ্ছেন। কৌতূহলী হয়ে এক সপ্তাহের সংবাদপত্র ঘেঁটে দেখলাম, আটদশ দিনে সারা বাংলায় একশো বিয়াল্লিশটা ঘেরাও হয়েছে। অবশ্য কলকাতাতেই সর্বাধিক, শতকরা পঁচাত্তরই তাই। এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ঘেরাওর কবলে পড়েছেন, কোম্পানী কারখানার ম্যানেজার ও সমশ্রেণীর কর্মকর্তারা, মালিকরাও আছেন তাঁদের মধ্যে।

একটা বিশেষ মজার কথা এই প্রসঙ্গে একটি ইংরেজী দৈনিকের খবরে বেরিয়েছে। একটি কারখানার ঘেরাও-র সংবাদ দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে—"The demands of the workers were not known."

বুঝুন। কারণ না থাকলেও ঘেরাও।

যেমন art for art's sake, তেমনি ঘেরাও for Gherao's sake.

• • •

আমার একটি প্রিয় নাট্য সংস্থা আছে। তারা মাঝে মাঝে নতুন নাটক নিয়ে অভিনয় করে। গত ৭ই এপ্রিল তাদের একটি অভিনয় হবার কথা ছিল। সব প্রস্তুত। মঞ্চের জন্য আগাম টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আরও অনেক খরচ হয়ে গেছে। প্রত্যেকদিন আখড়ায় সকলে সমবেত হচ্ছে—শেষ পৌঁচ লাগানো চলছে।

কিন্তু অভিনয়ের দু'তিন দিন আগে থেকে লক্ষ্য করা গেল, মুখ্য অভিনেতা দু'জন পর পর ক'দিন অনুপস্থিত।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেই যে তারা তিনচার দিন আগে আপিসে গেছে, আসে নি কেরেনি।

আপিসে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, আপিসের ম্যানেজার ঘেরাও হয়েছেন এবং সেই ঘেরাও-ঘরে সেই দু'জন অভিনেতাও ম্লানমুখে উবু হয়ে বসে আছে। ঘেরাওতে যোগ না দিয়ে উপায় নেই, ঘেরাও থেকে উঠে আসারও জো নেই। তা করলে তো তারা বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে পড়বে। এবং তারপর...

অতএব ইচ্ছে না থাকলেও সেই অভিনেতা দু'জন ক্লাবের অভিনয় ভুলিয়ে, ক্লাবের টাকায় অন্তর্জলী করে ঘেরাও ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

• • •

আর একটি ঘটনা।

বি. এ. পার্ট ওয়ান পরীক্ষা পেছিয়ে গেল। ঘেরাওয়ের দ্বারা কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করার ফলেই পরীক্ষা হটে গেল।

আমার এক আত্মীয়-কন্যার পরীক্ষা পরের বছর। কিন্তু এবছরই তাকে পরীক্ষার্থিনী হতে হল, অর্থাৎ মেয়েরা যাহারা ভরসে, বস তারী করবার জন্যে সবাইকেই রসে যোগ দিতে হবে। অতএব নবম শ্রেণীর ছাত্রীরাই পোষাআষা করে কর্তৃপক্ষের ঘরে ঢুকে খরচা আটকে চারিদিকে ছড়িয়ে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও নবম। পরীক্ষা পিছিয়ে গেল।

• • •

তবছি এবার পরীক্ষকরা ঘেরাও হবেন।

কেস করা চলবে না, কেস করলেই ঘেরাও।

যে সব মামলায় পরীক্ষক প্রতি বছর খাতা দেখেন, তাঁরা তো অত্যন্ত শংকিত চিত্তে দিন যাপন করছেন।

এই বুঝি ঘেরাওলল তাঁদের বাড়ি চড়াও হল।

সংক্রামক রোগ যেমন কোন কোন বছর মহামারী রূপে দেখা দেয় তেমনি কলকাতায় সাম্প্রতিক এপিডেমিক হচ্ছে—ঘেরাও!

ক্রত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন কি গৃহস্থের অন্তঃপুরেও ঢুকে পড়েছে। সে কাহিনী তো শুনতেই পেয়েছি। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

"পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়,
কী আছে শেষে।"

•

• • • •

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে একটি খেলা আছে, তার নাম বুমেরাং। একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা ঐরকম গড়নের পাতলা লোহার পাত এমন কায়দায় হাত ঘুরিয়ে সামনের দিকে নীচু থেকে উপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় যাতে সেটা ঘুরতে ঘুরতে কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরতে ঘুরতে নিক্ষেপ-কারীর দিকেই ফিরে আসে।

সাহিত্যিকার স্বামী

(ছোটগল্প)

ডক্টর মতিলাল দাশ

সাহিত্যিকাদের প্রতি দেশের মানুষের একটি উগ্র কৌতূহল আছে তাই বিশ্ববন্ধু দৈনিক বাংলাদেশের লেখিকাদের জীবনী রবিবাসরীয় কাগজে ছাপবার সংকল্প করলেন। রচনার ভার পড়ল সাংবাদিক নিখিলেশের উপর। নিখিলেশ উদীয়মান কবি, সে-প্রথমেই এ যুগের মহত্তম উপন্যাসের রচয়িত্রী শম্পা দেবীর জীবনী লিখবে ঠিক করল।

নিখিলেশ শম্পাদেবীর স্বামী সজীবকুমার মিত্রকে পত্র লিখল তারপর একদিন সন্ধ্যায় শম্পাদেবীর নিভৃত-নিবাস ভবনে হাজির হল। শম্পাদেবী অসামান্য কীর্তি অর্জন করেছেন। তার লেখায় রয়েছে একটি বিষণ্ণ উদাস সুর-স্বচ্ছ উজ্জ্বল ভাষায় তিনি জীবনের এক আশ্চর্য অনাবিল ছবি এঁকেছেন তার রচনায় পরিমণ্ডলের পিছনে যে রহস্যময় ইতিহাস রয়েছে তাই জানবার এবং জানাবার আগ্রহেই নিখিলেশ সজীব কুমারের সঙ্গে আলাপের জন্য চিঠি লিখেছিল।

নিভৃত নিবাস বালিগঞ্জ লেকের ধারে বিস্তৃত পরিসর এক বিরাট বাড়ী সম্মুখে সংরক্ষিত ফুল বাগান—মৌসুমী ফুলের বাহারে পথিককে মুগ্ধ করে। গেটে দারোয়ান সেলাম দিয়ে বলল—"সোজা চলে যান বাবু।" প্রবেশ করতেই সুবেশ ভৃত্য এসে ড্রয়িংরুমে বসাল। আধুনিক সাজসজ্জায় সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম চোখে ধাঁধা লাগায়মত। ভৃত্য বলল "মা ত এখন খুব ব্যস্ত এখন তাঁর দেখা মিলবেনা।"

নিখিলেশ বলল—"আমি সজীব বাবুর সাথে দেখা করতে এসেছি।"

"ওঃ, তিনি পাশের দিকের ঘরে; চলুন আপনাকে দিয়ে আসি।" বাড়ীর একেবারে ডাইনের দিকের ছোট একটি ঘর—একখানি টেবিলের পাশে বসে ছিলেন সজীব বাবু। টেবিলের উপর কয়েকখানি আইনের বই আর একপাশে খানকয়েক চেয়ার তাছাড়া তিন চারটি আলমারিতরা আইনের বই।

সজীব বাবু উকিল কিন্তু নিখিলেশের মনে হল—ওকালতি তার পেশা নয়, নেশা। বয়স পঞ্চাশের মত চোখ দুটি ছোট ছোট—নিখিলেশের মনে হল ভদ্রলোক সংসারী অসুখী মানুষ।

"কি চান আপনি?"

"আমি বিশ্ববন্ধু থেকে আসছি আমার চিঠি নিশ্চয়ই পেয়েছেন।"

"আপনিই নিখিলেশ মৈত্র, বসুন—আমি কাট খোট্টা উকিল মানুষ। সাহিত্যের রচনার সঙ্গে আমার আদৌ সম্বন্ধ নেই কাজেই আপনার আসা বৃথা হবে…"

নিখিলেশ বক্তার সুরের তাৎপর্য বুঝতে পারল না তবু তাকে প্রশ্ন করবার জন্য বলল—"আপনি শম্পাদেবীর মত এমন একজন সর্বজনশ্রদ্ধা সাহিত্যিকার স্বামী···"

"এ আপনি ভুল বলেছেন—স্ত্রীর মনীষা স্বামীকে মহৎ করে না।"

খোলাখুলি করবার দুষ্টবুদ্ধি নিখিলেশকে পেয়ে বসল। সে বলল "কিন্তু যশস্বী করে···আপনিও আজ সর্বজন পরিচিত।

সঞ্জীব বাবুর ভ্রূকুঞ্চিত হল, আপনাকে বিব্রতভাবে সংযত করে বললেন "দেখুন—এ আমি চাইনে... আমি আমার স্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঘৃণা করি···"

বক্তার সুরে একটি আহত বেদনা স্তব্ধ হয়ে উঠল, নিখিলেশ সহানুভূতি জানাবার জন্য বলল—"কিন্তু কেন বলুন তো?"

সঞ্জীববাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"যে কথা আপনাকে বলব, এই প্রথম আমার অসহ্য হয়েছে—কাউকে আমার মনের কথা বলতে না পারলে স্বস্তি নেই—কিন্তু আপনাকে শপথ করতে হবে নিখিলেশ বাবু আমার কথা নিয়ে আপনি কাগজে কিছু লিখতে পারবেন না।

"আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি, এ কথা কাউকে বলব না"।

"না কেবল কথা নয়—মাকালীর নামে দিব্য করুন—এ কথা কাউকে বলবেন না"।

"এই দিব্যই করছি"।

সঞ্জীববাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন—তাকে দেখে মনে হল তিনি যেন অক্ষম অসহায় পরাজয়ের ব্যর্থতায় তিনি যেন কাঁদছেন। পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন—"শুনুন যে কথা কেউ জানে না কেউ শোনেনি সেই কথাই আপনাকে বলছি···"

নিখিলেশ সাংবাদিক—জীবিকার প্রয়োজনে তাকে নানা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়, কিন্তু আজকের মত নিজেকে সে কখনও বিপন্ন মনে করেনি একটি অনিশ্চিত আশঙ্কায় সে যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

সঞ্জীব বাবু বললেন—"শম্পা গরীবের মেয়ে, লেখাপড়া খুব শেখেনি—কিন্তু সুন্দরী বলে বাবা ওকে ঘরে এনেছিলেন—আমাদের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল—তাই বিয়ের পর শম্পা আমাদের বাড়ীতে পরমাদরে ছিল। আমি একমাত্র পুত্র, কাজেই বাবা মা শম্পাকে খুবই আদর করতেন।

আপনারা যাকে নভেলিয়ানা প্রেম বলেন, তা আমার কোনও দিন ছিলনা এখনও নেই আমি নীরস কাটখোট্টা মানুষ কিন্তু কর্তব্যে আমার কোনদিন ত্রুটি—আমি শম্পাকে ভাল করে লেখাপড়া শিখালাম সে আমাদের বাড়ীতেই এসেই বি. এ পাশ করল, তার মানসিক উৎকর্ষের জন্য আমি নিজের বাড়ীতে বিরাট গ্রন্থাগার করলাম—সে মাঝে মাঝে কবিতা লিখত তাও আমি যথাসাধ্য উৎসাহ দিতাম। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দশ বৎসর তাই খুবই আনন্দে কেটেছিল। একটি মাত্র দুর্ভাগ্য আমাদের কোনও সন্তান হয়নি—কিন্তু তার জন্য আমি কোনও ক্ষোভ করিনি।

এই সুখের সংসারে সেবারের পুরীবাসও আমাদের কাল হল। সেবার ওকালতিতে বেশ কিছু অর্থাগম হ'ল। শম্পাকে সুখী করবার জন্য সমুদ্রতীরে একটি সুন্দর বাড়ী ভাড়া নিলাম। এই খানেই প্রণব মজুমদারের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয় ঘটনাচক্রে। প্রণব মজুমদার বিরাট ধনী সে ছিল ধনিকী কাগজের সম্পাদক—শম্পা তারই ছলনার জালে ধরা পড়ল।"

নিখিলেশ সহসা এক প্রবল উত্তেজনা অনুভব করল। সে বাধা দিয়ে বলল—"প্রণব মজুমদার ত বহুদিন হল মারা গিয়েছেন—"

সঞ্জীব বাবু হিংস্র হয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন—"তা গিয়েছেন—কিন্তু যে আগুন জ্বালিয়ে গেছেন—আজও তা নেভেনি সেই থেকে আমার বুকে দাবানল জ্বলছে—আপনি অবাক হয়ে গেছেন বোধহয় ভাবছেন এ আমার অত্যুক্তি—এ আমার অলস ভাবণ—কিন্তু তা নয় এর অন্তরঙ্গ প্রমাণ রয়েছে।"

নিখিলেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বক্তার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল। সঞ্জীব বাবু পুনরায় সুরু করলেন—"হাঁ, আপনারা যাকে বাংলাসাহিত্যের রূপসিকারী উপন্যাস বলেন—সেই প্রেমের স্পর্শ নামক উপন্যাসই শম্পার কলঙ্কের শাশ্বত সাক্ষ্য"

নিখিলেশ আশ্চর্য হয়ে বলল—"বলেন কি?"

"হাঁ, যা বলছি, তা একেবারে সত্য। প্রেমের স্পর্শ যদি দিয়ে আজই আর একবার পড়ুন—দেখবেন ও লেখা লেখা নয়—কল্পনার ইন্দ্রজাল নয় লেখিকা তার আপন অন্তরের নিখুঁত ছবি ওতে ফুটিয়েছেন—গল্পের নায়কের স্থলে প্রণব কুমারকে বসাবেন—তাহলে দেখবেন যে বইটি একটি মানস পত্রের অকপট ছবি। কায়মনবাক্যে স্বামীকে ভক্তি করাই ছিল আমাদের সতীত্বের আদর্শ কিন্তু এই বইয়ের পাতায় পাতায় শম্পা আপনার অন্তরের ছবি এঁকেছে, আর তাকেই আপনারা দশজনে একেবারে আকাশে তুলেছেন—"

"তাহলে আপনি বলতে চান—যে এটি কেবল মানস ব্যভিচার—?"

ক্রুদ্ধ হয়ে সঞ্জীববাবু উত্তর দিলেন—"মানস ব্যভিচার কি ব্যভিচার নয়, দৈহিক ব্যভিচারের কথা আমি জানি না—কিন্তু প্রেমের স্পর্শ যত বারই পড়ি ততবারই আমি আগুনে পুড়ি—সে আগুন নরকের আগুন তার লেলিহান শিখা বেড়েই চলে—আচ্ছা বলুন—এই কি সাহিত্য যা মানুষকে নিয়ে যাবে সুন্দরের দিকে যা মানুষের অন্তরে আনবে তৃপ্তির স্পর্শ—তা কি তো কেবল কামায়ন?"

নিখিলেশ উত্তর দিতে পারল না—একি বক্তার পুঞ্জীভূত সংশয়ের উচ্ছ্বাস অথবা বাস্তব সত্য। কিন্তু নিখিলেশকে ভাববার অবকাশ না দিয়ে সঞ্জীব বাবু আরম্ভ করলেন—"তারপর থেকে অনেক বই শম্পা লিখেছে—প্রত্যেক বইখানি তার কলঙ্কিত মনের প্রকাশ তার যৌনক্ষুধার অভিব্যক্তি..."

"আমার মনে হয়...আপনি অবিচার করছেন—কালের পরিবর্তন হয়েছে রুচির পরিবর্তন হয়েছে—তাকে আপনি বরদাস্ত করতে পারছেন না..."

"না আদৌ নয়, সাহিত্যে শাশ্বত প্রকৃতির খোলা পরিচয় দিয়ে আজটাকে আপনারা ধ্বংস করতে বলেছেন প্রাণের ও স্নেহের বাসনাকে বঞ্চিত তৃপ্তি মানুষকে মৃত্যুর পথে টানে—সাহিত্যের কাজ হবে মানুষী থেকে ভাগবতি জীবনের মধ্যে উত্তরণ তা না করে বিবরেরা অবগান করলে আসবে সর্বনাশ..."

অপরাজিত কথা শিল্পী বলে বাংলাদেশ যে মহিলাকে অভিনন্দিত করেছে—সেই যশস্বিনী নারী আপন গৃহে সম্মান তো পান নি পেয়েছেন লাঞ্ছনা—এবং অপমান। স্বামীর জীবন যে স্ত্রীর সাহিত্য রচনায় বিষাদিত হয়ে উঠেছে—তার কোনও ভুল নেই। যশোত্তীর্ণ এইসব লোভনীয় উৎস কি নিন্দিত

ভালবাসা। নিখিলেশ কিছুতেই দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে পারল না—সহসা প্রশ্ন করে বসল—"আপনার ভাষণের সাথে ও আপনার আচরণের মিল নেই…"

"না, তা করিনি অসতী নারীর অমর্যাদা রাজাদেই যোগ্যতর আপনারা খুসি হতেন, কিন্তু আমি যোগ্য জনকে আর যোগ্য করতে চাইনে—নিজের অন্তর্দাহকে যথাসাধ্য লুকিয়ে দুর্বহ জীবন যাপন করে চলেছি…

নিখিলেশ নীরবে নমস্কার করে বার হয়ে আসল। শম্পাদেবীর জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলেছে—সে সময় এই অপ্রিয় সত্যকে জেনে নিখিলেশের মনস্তাপের সীমা রইল না—একবার মনে হল এত মরীচিকা নয় লেখনীর কল্পনায় সৃষ্টি নয়। না বাড়ী গিয়ে শম্পার সাহিত্য সৃষ্টিকে নূতন দৃষ্টিতে আর একবার ভাল করে পড়বে তারপর সিদ্ধান্ত করবে।

---

* * *

"জনসাধারণের মধ্যে দরদ বন্ধুত্ব এবং সহিষ্ণুতার ভাব জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। যে সাহিত্য বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ এবং অসূয়া প্রচার করে সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়। প্রত্যেক ধর্মই সামাজিক সখ্যতা ও সহিষ্ণুতা শেখায়, সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের অবসান চায়। প্রত্যেক ধর্মই সামাজিক বিপ্লব চায় এবং মানুষকে কাছাকাছি আনতে চায়। ধর্ম বলে, নৈতিক শক্তির অধিকারী হতে হলে আত্ম-শুদ্ধির প্রয়োজন। নিজের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখবার সময় এসেছে এবং তা করতে পারলেই দেশের সমস্ত সংকট ও সমস্যা দূর হবে।

কুড়িয়ে পাওয়া

শ্রীগোপাল ঘোষ

কুড়িয়ে পাওয়া সদাশিব।

হ্যাঁ, তাকে তার বর্তমান অভিধা কুড়িয়েই পেয়েছিল। কোন এক অন্ধকার রাতে—সদাশিবের মতে, হয়ত বা সেটা আমাবস্যাই হবে! প্রান্তর নয় অথৈ অন্ধকার! তিন্ গাঁয়ে গান গেয়ে ফিরছিল ওস্তাদ তার দলবল নিয়ে। রাত তখন অনেক। হঠাৎ সেই অন্ধকার থেকে ভেসে এল এক আর্ত শিশুর কাঁপা-কাঁপা কান্না। সঙ্গীরা আর এগোতে চাইল না, বরং পরামর্শ দিল, ফিরে যাওয়ার। ওস্তাদ কিন্তু নাছোড়বান্দা। দেখতেই হবে—না দেখে সে ফিরবে না কাকেও ফিরতে দেবে না। একাই এগিয়ে গিয়েছিল ওস্তাদ টিমেটিমে লণ্ঠন হাতে।—পেয়েছিল তাকে। একটা মাটির ঢিলের নীচে কালো কুচকুচে কি একটা, রক্তাক্ত ন্যাকড়ার বেষ্টন কাঁদছে। ওস্তাদের পায়ের শব্দ শুনে দু'একটা শেয়াল ছুটে পালাল।—না, আর কোন ভিন্ন করেনি—ও'কে বুকে করে নিয়ে এসেছিল ওস্তাদ।

ভূতো চেহারার সদাশিব!

ভূত আপনি দেখেননি নিশ্চয়ই তাহলে সদাশিব কে দেখে আপনি তাদের একটা পরিষ্কার আইডিয়া করে নিতে পারেন। শরীরটা তার আরশোলার চৌকুনো। তাতে কাঠির মত হাত-পা গুলো ঠিক তালপাতার সেপাইয়ের মত! মাথাটা ছোট্ট সামনের দিকে লম্বাটে চ্যাপটা? দু'টো ভুৎভুতে ভাসো চোখ। ছোট্ট মুখ, তাতে ঝক-ঝকে সাদা দাঁত। ওই কালো মুখে যখন ও হাসে, বাঁদরের মত ছোট্ট ছোট্ট দাঁত মেলিয়ে চেহারাটা আরো ভুতুড়ে দেখায়! ওর ওস্তাদ আজও ও'কে বলে, সে রাতে তোকে ওঅবস্থাতে দেখেও কেও ধারে পাশে ঘেঁসতে চায়নি! ফিসফিস্ করে বলেছিল, ওসবে মাথা গলিয়ে কাজ নেই ওস্তাদ চল পালাই। এ নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মার লীলাখেলা। কিন্তু ওস্তাদের বুকের পাটা আছে সে কারো কথায় কোন কান করেনি। আজকের সদাশিবের তাই—ওস্তাদের নাম উঠলে গলাটা ধরে আসে চোখ দু'টো সজল হয়ে ওঠে।

হাস্যাভিনেতা সদাশিব!

তার ওস্তাদের বালক সঙ্গীতের দলে তাঁড়ামির পার্ট করে সদাশিব। হাসায় সদাশিব। ও-না আসা পর্যন্ত আসর ঝিমে মারে। ওর এই ভাঙা-চোরা ভূতের মত চেহারা দেখলেই লোকে হেসে খুনোখুনি হয়। তার উপর আছে নানান অঙ্গভঙ্গী-বিকৃত গলায় শব্দ ভাঙা বেসুরা গান। এসব মিলেই তাকে এক সফল হেসুড়ে করে তুলেছে। তার সমবয়সী ছেলের দল ভয়ানক। বুড়ো-হোকরার দল পর্যন্ত বাহবা না-দিয়ে পারেনা। রাত্তিরে প্রায় বারোটা পর্যন্ত চলে তাদের আসর। সকালে, যখন তার ন্যাকপেকে লম্বা লম্বা পাগুলো দিয়ে রাস্তায় হেঁটে যায়; তখন তার সম-বয়সীরা তাকে নিয়ে চেঁচামেচি করে। বড়রা দল কৌতুকের চোখে তাকায়। দুঃখ হয় সদাশিবের, সকলেই ও'কে

হেসে হাসে। ও যেন একটা হাসির পোটলা। হাসে গদাধরও তাদের সাথে; কিন্তু বুকের ভেতরটা কেমন কান্না-কান্না আসে।

ভবিষ্যতের গদাধর।

আমি কিন্তু ওর মাঝে হাসির কিছুই খুঁজে পাইনা; উপরন্তু তাকে দেখলে, বিধাতার নিষ্করুণতার একটা বেদনা অনুভব করি। সেদিন ও ছোট বাবু, ছোট বাবু, করতে করতে ছোট ভাইটার পিছনে পিছনে এসেছিল—একটু চা খাবে। ও যে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে এ বাড়ীতে ঢুকেছে তা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। একটু আশ্বাস দিলাম—একটু চা দিতে বললাম। দেখলাম মাত্র এটুকু অনুগ্রহেই সে যেন আনন্দে উপচে উঠেছে। প্রাণের অনেক কথাই সে খুলে বললো আমাদের। তাদের দলে মাত্র দশজন ছেলে সকলেই তার সমবয়সী। তার বড়ই কাছে কেও নেই কোথাও। তারা এদেশে সং সেজে খেটে খায়। তারা বেতন পায়—পায়না কেবল গদাধর। সে আবার বেতন পাবে কি সে-তো ওস্তাদের আশ্রিত। তার বাড়ীতেই খাকে খায়, কাজ করে। আবার যখন বায়না আসে গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামে গ্রামে। তাদের সকলের সঙ্গে ক'টি ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক, একটা ভাঙা হার্মোনিয়াম আর বাঁয়া তবলা। এর বেশী আর পাবেই বা কোথায়। বায়না তো মাত্র খাওয়া খাওয়া আর বড়জোর দশটি টাকা! ওস্তাদ বলে, আগের দিনে পয়সা ছিল কদর ছিল। লোকে বাড়ী ঘরে এসে বায়না করে যেত। না-না করে যা রোজগার করতাম তোদের মত দু'টো দল পোষা যেত। এখন জিনিষ তো তখনই করা!—তোরা আর কি দেখলিরে, তোরা আর কি দেখলি! ওস্তাদ আমাদের খুব ভাল বাবু। ও না থাকলে, আমাদের যে কি হোত! দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গদাধর। তবে ওস্তাদেরও মন উচাটন হয়ে গেছে। আর ও এ লাইনে থাকতে চায় না। একবার এক গ্রামে গিছলাম। গান হোল। সব ফুরাল। আর কেউ খোঁজখবরও নিতে এল না। না খেয়েই রাতটা কাটল আমাদের। সেই রাতেই রাগে অস্থির ওস্তাদ সব ভুলে দিতে চেয়েছিল। আমরা তার পা ধরে কেঁদে ফেললাম, আমাদের কি হবে! আমাদের মুখ চেয়েই আজ পর্য্যন্ত দলটাকে জিইয়ে রেখেছে ওস্তাদ। তোর বড় হ আর না, অনেক শিক্ষা হয়েছে; তারপর ভুলে যোব সব। ভাঙা সুরে চুপ করল গদাধর। আমি বললাম, তোর কি হবে! এবার একটু হাসল গদাধর। আমার নিজের জন্যে ভাবিনা আমি। ওস্তাদকে দিয়ে নিজের নামে খানিকটা জমি লিখিয়ে নিয়েছি। নিজে হাল বাইতে জানি চাষ করতে জানি। নিজের রোগা পটকা চেহারাটার দিকে সগর্বে চাইল গদাধর। বললাম, লেখাপড়া করিস না কেন? খুব একচোট হাসল ছেলেটা। যেন খুব হাসারই কথা বলেছি। বললে, দু'বেলা পেটভরে খেতে পাইনা বাবু, আমরা করব লেখাপড়া।

স্নেহের কাঙাল গদাধর!

গদাধরের বয়স কত? এও এক সমস্যা। ওর সঙ্গীরা বলে ওর বয়সের ডাল-পালা নেই। ওরা যে বয়সে এ দলে এসেছে, গদাধর তখন যা ছিল; এখনও তাই। ওকে জিজ্ঞেস করলে বলে, বয়স? তা সতেরো-আঠরো হবে! বলি, সেকি, তুই তো একরত্তির একটা বাচ্চা ছেলে। এবার চোখ নাবিয়ে বলে গদাধর, শরীরে কি বয়স লেখা থাকে বাবু। মেপে মেপে বেলা কম হয়নি। সে যাই হোক, মনের দিক থেকে গদাধর সেহাৎ বাচ্চা আর হয়ত বা চিরকাল তাই থাকবে। ওর

শারিরীক অসম্পূর্ণতার সাথে মনের দিকটাও এমনি অসম্পূর্ণই থাকবে। তাই স্বাভাবিক। জগতের স্নেহ-ভালবাসার দিকটা তার কাছে নীরব হাহাকার। অপরের হাসি জোগায় প্রচুর; নিজে হাসতে পারেনি কোনদিন। ও জানে তার জীবন অপরের করুণা মাত্র। তাই অপরের চেয়ে সে নিজেকে করুণার চক্ষে দেখে তারও বেশী। যখন যা পায় মাথায় তুলে নেয়।

সেদিন দাড়ি কামাচ্ছি; গদাধর এসে বলল, বাবু!

বললাম, কিরে?

—চারটে পয়সা আমার কাছে আছে; আর দু'টো দেবেন!—আশা নিরাশার কাঁপা কণ্ঠস্বর? বললাম, কি হ'ল আবার?

—চা খেতে গিয়ে দোকানের একটা গ্লাস ভেঙে ফেলেছি। পিট পিট করে চাইল আমার দিকে খানিকক্ষণ।

আবার বললে, সত্যি বলছি বাবু আমি ভাঙিনি। ও ছেলেগুলো আমাকে নিয়ে এমন টানাটানি হাসাহাসি আরম্ভ করে দিলে; গ্লাসটা আমার হাত থেকে খসকে গেল। এখন দোকানী বলছে, দাম না দিলে, ওস্তাদের কাছ থেকে আদায় করবে—বলতে যে কি হবে তা ওর মুখ চোখ দেখেই ঠাওরালাম!

হাসলাম, ছয় পয়সায় কি গেলাস হয়!

গদাধর সরল বিশ্বাসে বললে, হ্যাঁ হয় বাবু—দোকানী বলেছে।

আবার হাসলাম, দিলাম পয়সা।

সকৃতজ্ঞ চোখে ও আমার দিকে তাকাল। অনেক গল্প করল। কথার ফাঁকে এক সময় বলল, বাবু আয়নাটা ঘুরিয়ে রাখুন!

—কেনরে?

বিষাদ-ভরা স্বরে ও বললে, আমি আইনা দেখি না। একবার দেখেছিলাম—দু'দিন কিছু খাইনি—ঘুমোই নি। শুধু কেঁদেছিলাম। হাসতে নেমে হাসতে পারিনি—কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছি; আর মার খেয়েছি। থর থর করে কেঁপে ফেলল্ গদাধর।

আমি মরমে মরমে অনুভব করলাম, তার সে অন্তর্ভেদী দুঃখ। কিছুই বলতে পারলাম না। বেদনা ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। ও উঠে গেল উদাস পায়ে।

নেশায় পাওয়া গদাধর।

ছোট মেয়ে ঝুনি। একরাশ দুই দুধের মত। ফর্সা রঙ—ভরন্ত শরীর দু'টো কালো চোখ আর মাথার একরাশ চুল অদ্ভুত মোহময়তা এনে দিয়েছে তাকে। গদাধরের অসংখ্য দর্শকের সেও একজন। স্কুল থেকে ফিরছিল। পথে গদাধরের পরিচিত অপরিচিতের বালাই নেই। বললে, কোথায় গিছলেন দিদিমণি?

ওর মুখের পানে চেয়ে দয়া হ'ল ঝুনির। একটু হেসে বললে, স্কুলে।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কোথাও না, এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটুতেই বেশ ভাব জমিয়ে নেয় গদাধর। ওদের

চৈতন্য সজাগ করে এনেছে তার জীবনকে। ঝুলির স্নেহের আস্বাদ পেয়ে ভরে উঠল গদাধর। দুপুরের দিকে হাতে কোন কাজ থাকে না। যদিও ওস্তাদের কড়া তাগিদ—কেউ কারো বাড়ী যাবে না। কেন না, ওস্তাদ চায় না, তার মনছাড়া কোন ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা করে নেয়—তবু কোন এক ফাঁকে গদাধর পালায়। কিছুটা গিয়েই রাস্তার এক পাশে তেঁতুল বন। বড়বড় পুরোনো-ভাঙলা ঘরা তেঁতুল গাছ।

রাস্তার এপারে ঝুলিদের সোনালী রঙের খোলামা বাড়ীটা। শুধু দুপুর। ভয় করে গদাধরের; তবু টোকা দেয় দরজায়। এক মুখ হাসি নিয়ে বেরিয়ে আসে ঝুলি। দুপুর ভর গল্প করে গদাধর। কখনো ঝুলির বইগুলো ওল্টে-পাল্টে দেখে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে। তার মনে এক অদ্ভুত স্ফূর্তি দেখা দেয়। মনের যে দিকটা এতোদিন কান্নাদের মত হা-হা করছিল, সেটা যেন আর তেমন লাগে না। খিলখিল করে ঝুলি কেবল হাসে, আর গদাধরের সাথে কথা বলে। মায়ের কাছ থেকে চা-টা, খাবারটা এনে দেয় গদাধরকে। আহা বেচারা, আহা বেচারা! এই দু'টি কথায় উজাড় করে দেয় সে তার বুকের সমস্ত করুণা। এ বাড়ীতে একটা লক্ষ্য করার মত হ'ল—অন্যান্য বাড়ীতে যেমন গদাধর তাড়াহুড়োর মাঝে যা পায় আত্মসাৎ করে—এ বাড়ীতে ঠিক তার উল্টোটি। ঝুলি কিছু দিতে চাইলেই সে নানান টাল-বাহানা করে—পারতপক্ষে নেয় না নিতে চায় না। ও যে ঝুলির সাথে কথা বলে; তার স্নেহ পেয়েই কৃতার্থ; এটুকু কিন্তু ঝুলি কিছুতেই বুঝতে চায় না; কিছু-না-কিছু একটা সহায়ই।

গতকাল তুমি যাওনি দিদিমণি? আমি তোমাকে কত খুঁজলাম—কোথাও পেলাম না। অনুযোগ করে গদাধর। ঝুলি অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলে, না, ভাই, রোজ গান শুনতে গেলে মামা রাগ করেন। তারপর আবদার ধরে, কাল কি কি নতুন দেখালে; একটিবার দেখাও না গো।

গদাধর গদ্‌গদ্। গত রাত্রির আসাপোড়া নিখুঁত ভাবে দেখিয়ে যায়। হাসে ঝুলি—একটানা অনেকক্ষণ ধরে—যতক্ষণ না তার কর্সা গাল দু'টো লাল হয়ে উঠল কালো চোখ দু'টো ভিজে উঠল। আর নেশার আচ্ছন্নতায় সব কিছু উজাড় করে দিল। একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ যে আনন্দ দিল তাকে, তা তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করল।

খেয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল, আজ যাবে তো! ঝুলির মুখটা একটু করুণ হ'ল। গদাধরের আর কিছু বলার আগেই, দৃঢ় গলায় বলল, না, আজ আমি যাবই—কারো কথা শুনবো না।

আসর বসার থেকে শেষ পর্যন্ত ঝুলিকে খুঁজল গদাধর। কোথাও পেল না।—না, আজও ঝুলি আসেনি। গদাধরের উৎসাহ উদ্দীপনা নিমেষে কে যেন নিংড়ে নিংড়ে দিল।—কিছু ভাল লাগল না। তবু ওস্তাদের ভয়ে কিছুই বেঠিক হতে দিল না।

পরের দিন দুপুরে গিয়ে হাজির হ'ল গদাধর ঝুলিদের বাড়ীতে। দরজায় টোকা দিতে ভেতর থেকে একটা কর্কশ গলা ভেসে এল, কে?

ঝাঁকে উঠল গদাধর। ঘাবড়ে গিয়ে, পালানোর কথাও ভুলল। দরজাটা ফাঁক হ'ল। নিমেষে গদাধরের ভীত মুখখানা সাদা হয়ে গেল। চিনলে গদাধর ঝুলির মামা। বকে উঠলেন ঝুলির মামা, হারামজাদা, রোজ এসে এখানে আড্ডা মারা হয় আস্পর্দা তো তোর কম দেখি না। ভাগ এখান থেকে—ফের যদি কোন দিন দেখেছি; তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব। আরো কি কি

সব গালাগালি দিলেন ; গদাধর শুনতে পায়নি। গদাধর প্রাণ নিয়ে ছুটল। বামন এসে একেবারে আখড়ায়।

তার হাসানি আর কাঁদুনি দেখে সঙ্গীরা জানতে চাইল, কি হয়েছে? গদাধর কিছু বলতে পারল না—কিছু ভাবতে পারল না। ও কেমন করে বোঝাবে, ওর শুধু চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

বিদায় নেওয়ার আগে।

আর মাঝে একটা দিন তার পরই তাদের পালা ফুরাল। কলে ভোরেই তাদের রওয়ানা দিতে হবে। জিন্ গাঁয়ের বায়না এসেছে। গদাধরের ভাবে তার চেহারায়, তার কথা-বার্তায় ধরণ ধারণে যে একঘেয়েমি উৎকট হয়ে ওঠে ; তারই তাড়নে সে কোথাও বেশী দিন টিকতে পারে না। অপরকে ভুলিয়ে রাখার মাঝে তার একটা বিরাট স্বার্থ আছে, তাহল ; বিশ্রীটে চেহারাটা আড়াল করে রাখা। সেই যে ঘোর কাটল—সরে পড়ার জন্ত অস্থির হয়ে উঠল গদাধর। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম একটি যায়গার জন্ত মায়ার টান অনুভব করল সে। তার মন চাইল না সে যায়গা ছাড়তে। তবু ছাড়তে হবে! ভুলির সাথে তার দেখা হয় না—তার বাড়ী যাওয়ার সাহসও গদাধরের নেই। এক একবার ভুলির দাদার কুৎসিৎ মুখ মনে পড়ে আর গদাধর আঁৎকে ওঠে। তার অভিজ্ঞতার ছোট পরিধির মাঝে বুঝেছে গদাধর ; মানুষগুলো তাকে শুধু মাত্র দয়া করে, আর কিছু না। —আদর দু'একটা যাচবাও দেয়। কিন্তু তারপর তারজন্ত রাখা থাকে রাশিকৃত অবহেলা আর বিরক্তি। তবু খেদ নেই গদাধরের উপেক্ষা ছাড়া তার বাঁচা অসম্ভব!

আসরে হাসাতে এসে, বার বার সজল চোখে খুঁজল ভুলিকে—না কোথাও পেল না। আসর যখন ভাঙল, তখন আর কোথাও যাওয়া যায়না। তবু রাতের আহার কটা মুড়ি চিবুতে চিবুতে ইচ্ছে হ'ল, শেষবার ভুলির বাড়ী থেকে ঘুরে আসতে। এখন রাত রাতের কাছাকাছি—সকলেই ঘুমে কাতর। আর যাবেই বা কি করে গদাধর। তবু মনটা ভুলির সাথে শেষ দেখার জন্ত টনটন করে উঠল। তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভোরে—তখনো চারিপাশে আঁধার ছড়ানো—ওস্তাদ ডেকে তুলল তাদের। মোটঘাট সব রাত্রিরেই বাঁধা ছিল যে যার কাঁধে নিয়ে রওয়ানা দিল। এক বিদ্রোহী মনের কান্নার আঁকু-পাকু নিয়ে যন্ত্রের মত গদাধরও চলল। পিছু দিয়ে একবার না যায়বার তাকাল। শেষ রাতের ঘুম-ঘুম সমস্ত গাঁয়ের উপর পাতলা অন্ধকার ঝুলছে। চারিপাশ নিঝুম নিথর। চলতে চলতে কেঁদিয়ে উঠল গদাধর। আর কিছু নেই।

সামান্ত একটা গেঁয়ো বালক সঙ্গীতের দল। তারও মাঝে সামান্ত গদাধর। তার আর মনে রইল। দু'দিনেই সকলে ভুলল তাদের। ভুলিও ভুলল। মনে থাকার মত কিই বা ছিল গদাধরের! কেনার পর বিক্রেতাকে কে কবে মনে রেখেছে। গদাধরও এসেছিল হাসির পসরা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু গদাধর ভুলতে পারল না। ভুলির স্নেহের মাঝে সে খুঁজে পেয়েছে তার অবহেলিত সত্তাকে—ভুলবে সে কেমনে! আজও তাই চিরঅপরিশীত বিকলাঙ্গ স্নেহমনের চির শিশুটি অনুনয় কাতর স্বরে তার ওস্তাদকে জিজ্ঞাস করে আবার কবে যাব আমরা সেখানে!

অদ্ভুত জলসা

প্রতি রাতে এপারো জন লোক দেখা করতে যেতো জলসী এন্টোনিয়েটা কেপিটেলির সঙ্গে নেপলসে তার প্রাসাদোপম বাড়িতে। ধামী সিগারের ধোঁয়া ওড়াতে-ওড়াতে পাখির পালকের মতো নরম লোক'র জেলাব দিয়ে তারা শুনতো এল, পি, রেকর্ডে পেঁপার অমর শিয়ানো-বাদন। আর এন্টোনিয়েটা মধুর গলায় আবৃত্তি করতেন প্রেমের কবিতা।

অনুষ্ঠানের শেষে প্রতি অতিথি মেয়ে যেতেন কাজে। মানে তারা অলংকারের দোকান লুট করতেন। এন্টোনিয়েটার আদেশে।

এন্টোনিয়েটা ছিলো এক রহস্য ময় নারী। দলের লোকদের সে বশীভূত করে রেখেছিলো হিপ্নোটিজমের সাহায্যে। সংগীত ও আবৃত্তি ছিলো হিপ্নোটিজমের একটি দিক। এর দ্বারাই সে দলের লোকদের দিয়ে ডাকাতি করাতো।

এন্টোনিয়া ছিলো বহু ট্রাক, গাড়ি এবং দোকানের মালিক। তাই লুটের মাল পাচার করবার কোনো অসুবিধাই হতোনা। শেষ-পর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়ে। তখন তার বয়েস তিরিশ বছর। হিসাব ক'রে দেখা গেলো এর মধ্যেই সে ডাকাতি করেছে ৫০,০০০ ডলার মূল্যের জিনিস।

তার অপরাধের প্রমাণ তবু তেমন স্পষ্ট ছিলোনা। মাত্র এক বছরের জন্য এন্টোনিয়াকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার দলের একজন ডাকাত ছিলো তার স্বামী। নাম জিনসেনজো। বয়েস ৩৫। স্বামী ও অন্য দুজন ডাকাতকে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হয়। দলের অন্য লোকদের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অন্ধকার পণ্ডিত

আরব দেশীয় পণ্ডিত ইউসিফ আলিজেক আট বছর ধ'রে পরিশ্রম ক'রে কোরাণের কপি করেন। তুলি আর রং দিয়ে। কিন্তু কোরাণ কপি করা শেষ হওয়া মাত্র সকলকে চমকে দিয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ ক'রে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন।

সিগ্রেটের ঘটনা

ব্যাঙের একটা নতুন বাড়ি তৈরী হয়েছে। ব্যাঙে ঢুকতে গেলেই সামনে পড়ে একটা হল ঘর। তাজ্জব ব্যাপার। সেই ঘরের মেঝে থেকে উত্থিত হচ্ছে গানের ফোয়ারা। অনবরত উত্থিত হয়ে পাঁচদিন পরে বন্ধ হলো সেই গান। কী ব্যাপার! হল ঘরের মেঝে তৈরী করবার সময় একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো গাঁথা হয়ে যায় তার মধ্যে। ব্যাটারীর আয়ু যতক্ষণ ছিলো ততক্ষণ গানও শোনা গেছে। ব্যাঙমিস্ত্রির ভুলে ওই গানের সাময়িক প্রবন্ধন।

চিকাগোর গায়ক

আমেরিকার গায়ক অ্যাবে লিঙ্কন-এর শেষ রেকর্ডখানা বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে। রঙমহলে আলোর এক বিজ্ঞাপন দর্শকদের সামনে উপস্থিত ক'রেই তিন ঘণ্টার জন্য সমস্ত চিকাগো শহরকে অন্ধকার ক'রে দেয়া হয়। রেকর্ডের নাম 'ইন দি ডার্ক উইথ ইউ' কিনা।

সন্ন্যাসীর রূপান্তর

আমেরিকাতেই আরেক আজব কাণ্ড ঘটে গেছে। এবার মঠে বছরছয় কাটাবার পর ব্রাদার ইগনেসিয়াস নামে এক সন্ন্যাসী একদিন এত বেশি মদ্যপান করলেন যে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে হলো। তারপর দেখা গেলো ব্রাদার ইগনেসিয়াস মোটেই সন্ন্যাসী নন, তিনি আসলে একজন মহিলা। সুস্থ হওয়ার পরে আর মঠে নয়, তাকে পাঠানো হলো সন্ন্যাসিনীদের এক আশ্রমে।

ভাস্করের কীর্তি

ভাস্কর বেঞ্জামিন ফ্রীড-এর কৈশোরের প্রেমিকা ছিলো র‍্যাচেল গোল্ডহিল। একটি মিলন-কেন্দ্রে বেঞ্জামিন কৈশোরের প্রেমিকার একটি প্রস্তর-মূর্তি স্থাপন করলেন। মূর্তিটি যারপর নাই সজীব। যেন কথা ব'লে উঠবে। কিন্তু তিনি অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মিলন-কেন্দ্রের কিশোরী-মূর্তির মুখ বাটালি দিয়ে বিকৃত ক'রে দেন। কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়ার ফলে তাকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

ব্রিটেনে বিদেশিনীদের বিপদ

য়ুরোপের অন্য দেশগুলি বা বাইরের দেশগুলি থেকে যেসব তরুণীরা ব্রিটেনে যায় তাদের খুবই সতর্ক থাকতে হয়। বিশেষ ক'রে যারা অনভিজ্ঞ ও নির্দোষ তাদের যে কত বিপদ ঘটতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। সততার পথে চলতে গেলে পদে পদে প্রলোভন, নানা ষড়যন্ত্রের হাতছানি। বিন্দুমাত্র অসতর্ক থাকলেই পদস্খলন। তারপর পরিণতি হতে পারে মর্মান্তিক। জানা গেছে ১৯৬৯ সালেই ৪৩৭টি জার্মান মেয়েকে ব্রিটেন থেকে জার্মানীতে ফেরৎ পাঠানো হয়। কারণ, আবিষ্কৃত হয় তারা প্রত্যেকেই গর্ভবতী। এ ছাড়া আরো ৯১টি জার্মান মেয়ে ব্রিটেনে থাকাকালীন অবস্থাতেই সন্তান প্রসব করে। একটি জার্মান মেয়ে লিখেছে কী ভাবে ব্রিটেনে তার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। যেখানেই যায় সেখানেই লম্পটের রাজত্ব। কোনো বাড়িতে গেয়ি সেই হয়ে থাকার উপায় নেই। হাসপাতালের ডাক্তার স্বয়ং লম্পট। মেয়েটি কোনোরকমে আত্মরক্ষা ক'রে জার্মানীতে ফিরে যায়।

ঠোঁট তো চুমো খাবার জন্যেই

কথাটা বলেছে উদীয়মান চিত্র তারকা ববিতা। 'রাজ' ছবিতে অভিনয় করার পর এই নতুন অভিনেত্রীকে নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তার কাছে বহু চিঠিপত্র আসতে থাকে। তাকে 'কিস গার্ল' নামে অভিহিত করা হয়। ববিতার একজন অনুরাগী দর্শক পরিষ্কার লেখে: "ডিয়ার মিস ববিতা, আপনার মধ্যে একজন বড় অভিনেত্রীর সম্ভাবনা দেখে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম; কিন্তু 'কিস গার্ল' রূপে আপনাকে বিজ্ঞাপনে দেখার পর থেকে মিস ববিতা কারিয়ার সঙ্গে আপনার পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছিনা।" ববিতা এই ধরনের রক্ষণশীলতাকে অপছন্দ করে। তার মতে অভিনেত্রীকে সতী নারী ও পতিতা দুয়ের ভূমিকাতেই অভিনয় করতে হয়। যদি অভিনয় ভালো হয় তবে কার ভূমিকায় অভিনয় করা হলো সেই প্রশ্ন অবান্তর। তেমনি চুম্বন নর-নারীর প্রেমের ও আনন্দের প্রকাশ। রূপালী পর্দায় তা প্রদর্শিত হ'লে ক্ষতি কী।

গৃহ সজ্জায় দেওয়াল প্রসাধন

বেলা দে

সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে মানুষ তার দেহ ও গেহ একসঙ্গেই সাজাতে আরম্ভ করেছে। আদিম অসভ্য নরনারী যেমন অঙ্গে ভূষণ পরে, তেমনি তাদের কুটীরখানিকেও আপন আদর্শমত শোভিত করে রাখে। সাঁওতাল পল্লীর পরিচ্ছন্ন আলপনা আঁকা মাটির ঘরখানি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাদের সামান্য বাসনপত্র ঝকঝকে মাজাঘষা। কাঠের সামান্য আসবাব যথাস্থানে সাজানো সবকিছু মিলিয়ে একটা অপূর্ব সৌন্দর্যের ছবি। সম্পদ না থাকলেও শ্রীর অভাব নেই। তাই, গৃহের গৃহিনী যদি বিচক্ষণা হন, তাহলে ঘরের ছেঁড়া কাপড়গুলিকেও সযত্নে সাজিয়ে রাখেন তাঁর হাতের ছোঁয়ায় মাটির ঘরেই স্বর্গ নেমে আসে। চলিত কথায় যে খেলতে জানে, সে কাণাকড়ি নিয়েই খেলতে পারে। কবির ভাষায় 'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।' গৃহের অদৃশ্য পুষ্পটিকে নানা বস্তুর মধ্যে বিকশিত করে তুলতে পারেন তিনি যাঁর সহজ সৌন্দর্য বুদ্ধিটী বিলাসিতার জটিল ফাঁদে অপমৃত্যু লাভ করেনি।

সুরুচি সম্মত সুন্দর গৃহশ্রী মানুষের জীবনের রূপ বদলে দিতে পারে। গৃহসজ্জার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ঘরের দেওয়ালই তার বিভিন্ন অংশকে ধরে আছে। কারণ দেওয়াল ঘরের একটী প্রধান অংশ। দেওয়ালকে বাদ দিয়ে ঘরখানির পরিকল্পনা করা যায় না। দেওয়ালকে যদি ঘরের প্রচ্ছদপট হিসেবে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ দেওয়ালকে পিছনে রেখে দেওয়ালের বুকে যদি ঘরের আসবাবপত্র, পর্দা প্রভৃতির বিচিত্র ছবি ও খেলা কল্পনা করা যায় তবে দেওয়ালের প্রাধান্য অনেক কমে যায় বটে, আবার একদিকে দেওয়ালই সর্বপ্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ দেওয়ালের যেমন রূপ ও রং হবে সেই অনুযায়ী ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলিরও রূপের ঔজ্জ্বল্য কমবে বাড়বে। কাজেই দেওয়ালের রূপ ও রংয়ের পরিবর্তনের উপরেই ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলির ঔজ্জ্বল্য বা বিকাশ নির্ভর করছে। সুতরাং দেয়াল প্রচ্ছদপট হলেও তাকে পিছনে ফেলে রাখা যায় না বা তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখানো চলে না।

তবে দেওয়াল প্রসাধনের আগে ঘরখানির আয়তন ছোট না বড়, সে ঘরে যথেষ্ট আলো আছে কিনা, ঘরের দেয়াল ভাঙাচোরা কি না, এগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে তবে দেওয়াল প্রসাধন করতে হবে। তারপর কোন্ ঘরে কোন রং মানাবে তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন খাবার ঘর, বাড়ীর প্রবেশপথ এগুলির দেওয়ালের রংয়ে যা লক্ষ্যায় যথেষ্ট উজ্জ্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু বসবার ঘর, শোবার ঘর এগুলির রংয়ের উজ্জ্বল্যের পরিবর্তে শান্তি ও স্নিগ্ধতা ফুটাবার চেষ্টা করতে হবে। যাতে দেওয়ালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই মানুষের কর্মক্লান্ত মন সহজেই শান্ত হয়ে আসে।

ঘরখানি যদি পুরনো ফাটল-ধরা হয় তাহলে ন্যাওপেপার, চুণ প্লাষ্টার, সাবানজল ইত্যাদির সাহায্যে এ খুঁতগুলি দূর করতে হবে। তারপর দেওয়াল সজ্জায় মন দেবেন। পশ্চিমদেশে এবং ভারতবর্ষের কোনো কোনো শীতপ্রধান দেশে দেওয়ালের উপর মানান নকসা করা দেওয়াল কাগজ এঁটে দেওয়া হয়। এই দেওয়াল পেপার বিভিন্ন রংয়ের ও নকসা করা পাওয়া যায়।

দেওয়ালে তেলের রংয়ের ছবি এঁকেও অনেক গৃহস্থ তাদের ঘরগুলিকে সাজাবার চেষ্টা করেন। তবে দেওয়াল প্রসাধনে দেওয়ালের গায়ে একটী সরল সহজ রেখারও মূল্য অনেকখানি। চিকমত আঁকতে পারলে বা রং ইত্যাদি ফুটাতে পারলে একমাত্র কয়েকটী রেখাই ঘরের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। প্রাচীনকাল থেকেই আলপনার সাহায্যে দেওয়াল সাজাবার রীতি চলে আসছে। এখনো বাংলা দেশ ও সাঁওতাল পরগণার বহু অঞ্চলের ঘরের দেওয়ালে আলপনা আঁকা হয়ে আসছে। মাটির বুকে, মাটীর ঘরে, মাটির রংয়ে চালের গুড়োর সাদা আলপনা সত্যিই মনোরম।

অনেকে ছবি টাঙিয়েও দেওয়াল প্রসাধন করে থাকেন কিন্তু প্রয়োজনও ঠিক রুচি সম্মত ছাড়া দেওয়ালে অযথা ছবি দৃষ্টিকটুই লাগে। দেওয়াল সজ্জায় যদি কোনও উপকরণই সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে লতাপাতা ইত্যাদি দিয়েও দেওয়াল সাজানো যায়। নানারকম লতানে গাছ আছে এগুলো জলে ভাসিয়ে রাখি বা কিতার সাহায্যে দেওয়ালে টাঙানো যেতে পারে। অথবা যে সব ঘরের মধ্যে দেওয়ালে কার্ণিস আছে বা তাকের মতো আছে সেখানে একটী পাত্রে জল রেখে লতা ঝুলিয়ে দিতে পারেন। অল্প নীল বা সাদা দেওয়ালের গায়ে ঝুলে পড়া সবুজ লতাটী ঘরের মধ্যে অনেকখানি স্নিগ্ধতা এনে দেয়। কারণ দেওয়াল সজ্জা ও চিত্র সন্নিবেশের উদ্দেশ্যই রুচিকে উন্নত করা যায়।

সৌন্দর্য্য বোধের সঙ্গে সুনীতির একটি নিকট সম্পর্ক আছে। ধনিগৃহের মূল্যবান অর্দ্ধনগ্ন নারীমূর্ত্তিটি যে অলক্ষিতে গৃহের শালীনতা নষ্ট করে, সে কথা হয় তো গৃহস্বামী ভেবে দেখেন নি। তার গৃহ শোভা কলাবিভার হস্তাবেশ মাত্র। কাজেই সৌন্দর্য্যের দুটি রূপ আছে একটী স্থির মূর্ত্তি, গৃহসজ্জার উপকরণের মধ্যে তার বিকাশ আর একটি প্রবাহিনী মূর্ত্তি সুনীতি সুরুচিসম্মত আচার বিচার, চলাফেরা, কথাবার্ত্তায় অহরহ তার তরঙ্গ উছলে ওঠে। যিনি তাঁর গৃহে এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারেন তারই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। নাই বা রইল চেয়ার টেবিল, সোফাসেট, ফুলের মালা, অয়েলপেন্টিং। যা আছে তাকেই মনের পরশ দিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে হবে। মনে পড়ে পুরনো দিনের একটী কথা লক্ষ্মীর হাঁড়িতে অতি ক্ষুদ্র শস্য কণাই থাকে, যদি মুক্তো থাকে না।

গৃহের ভিতর ও বাহির সমান সুন্দর হওয়া আবশ্যক। আর সে সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলবার ভার সম্পূর্ণ মেয়েদের উপর-মেয়েরাই লক্ষ্মী! অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি নিত্য বিরাজ করে।"

হাতের একটুখানি রূপচর্চা

কল্যাণী রায়

নৃত্যশিল্পীর হাতের কথা একটু ভাবুন তো। যা তার নৃত্যকে ফোটাতে নানা আঙ্গিকে বা লতায় পাতায়। কঠ ব্যবহারেই শুধু ভাষার ওজন হস্তভোগে তা নয়। নরনারীর চোখে, পায়ের ছন্দে, বাহুর ভঙ্গিতে, দেহের নানা ভঙ্গিতে কত ভাষার, কত ভঙ্গের কারুকাজ।

হাতের কথাই ধরুন না। আপনারা হয়তো মুখ বা চোখের কথা না বলে হাতের উল্লেখ করছি বলে বিরক্ত হচ্ছেন। হাতেরও যে নীরব ভাষা আছে, তা আচম্বিতে ছাড়া হয় তো কখনও মনে না হওয়াই সহজ। রূপসী নৃত্যশিল্পীর হাত ও বাহুর বিচিত্র প্রকাশ দেখে সব সন্দেহ দূর হয়। সুন্দর মুখের মতোই নরম মিষ্ট মিঠে সুন্দর হাত ও বাহু হয়ে ওঠে মানুষের মনের নানা অনুভূতির আনন্দিত প্রকাশ।

নৃত্যশিল্পী আমরা সবাই নই। তবুও হাত যে আমাদের হবে না কারুর এমন অভিশাপও নিশ্চয় নেই। যদি চেষ্টা প্রচেষ্টা নিয়মিত করা যায় তবে এরকম হাতও বাহু নিশ্চয় আমরাও পেতে পারি।

দিনের মধ্যে কত না রূঢ় কঠিন কাজ আমাদের হাতকে করতে হয়। নানা প্রতিযোগিতার চাপে ও সময় সংক্ষেপের জন্য তার দুর্ভোগ বেড়ে যায়। আর বিশেষ করে মেয়েদের হাতকে তো জলের মধ্যে আর বেওয়ার মতো সব সময়েই ভিজিয়ে, রাখতে হয়। তাই ফল ক্রমশ হয়ে ওঠে রুক্ষও লালিত্যশূন্য মেয়ের স্বাভাবিক সৌন্দর্য যায় হারিয়ে। এই হাতে আমরা রান্না করি, টাইপ করি। প্রতিদিনের এত মেয়ে গৃহকাজ ও মেঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এমনি কত কাজ না করতে হয়। অথচ এই হাতের যত্ন আমরা কতটুকুই বা নি?

সহজাত স্নেহ তৈল হাত থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্কাশিত হচ্ছে। তা পূরণ করার জন্য হাতে ক্রীম ব্যবহার প্রয়োজন। কোন জলের কাজ করার আগে বা পরে হাতে ক্রীম মাখানো একান্ত উচিৎ রান্নাঘরে রাখবেন, এবং শয্যাকক্ষে হাতে মাখবার ক্রীম রাখবেন!

হাতের সর্বাপেক্ষা অনাদৃত ও অবহেলিত অংশ মনে হয় কনুই। আমরা অনেক সময় শক্ত জিনিসের উপরে কনুইয়ের ভর রেখে বসি, তাতে ত্বকের সে অংশের রংয়ের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। রূপসী হ' নৃত্যশিল্পীর পক্ষে তা কখনই তো ঘটে। মুখের মতোই কনুইয়েতে বারবার ক্রীম ব্যবহার করা যেতে পারে। অবসর সময়ে কিংবা বিশ্রামের সময়ে কনুইয়েতে লেবুর রস ঘষুন।

দিনের মধ্যে বাহুতেও বার কয়েক ক্রীম ব্যবহার করুন। হাতের ওপরের অংশে মাংসল এবং সেখানকার ত্বক পুরু হ'লে ভালো সাবান ফেনে নরম তোয়ালে দিয়ে বার কয়েক মৃদুভাবে রগড়ে নিন। আপনার হাত সঙ্গীব হয়ে ওঠবে ধীরে ধীরে সৌন্দর্যের অমৃত স্পর্শে। হাত ও বাহুর নিটোল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য কয়েকটি সহজ সরল ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস করুন না।

সৌন্দর্যের স্বাভাবিক উপকরণ

মীলিমা সে

প্রত্যেকনারীরই রূপবতী হওয়ার ইচ্ছা খাভাবিক। এজন্য অনেকে ব্যাকুলতাও দেখায়। আবার কারো সে আকাঙ্খা থাকে মনের গোপনে। অথচ প্রত্যেক নারীই তো সুন্দরী হয়ে জন্মায় না। তবে তার জন্য হতাশ হয়ে কিংবা আপশোস করে কোনো লাভ আছে কি?

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যেমনভাবে কিংবা জীব জন্তুরা জন্মের পরে লাভ করে। তেমনি নারী তার চেষ্টার দ্বারা মুখের বা চোখের আকৃতি যদিও বদলাতে পারে না তবু প্রকৃতির সামগ্রী দিয়ে কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত রূপচর্চার নানা উপকরণ ব্যবহার করে তার দেহের সৌন্দর্য্য যে কিছুটা বাড়াতে পারে তা আমি অস্বীকার করিনা।

সুন্দরীর রূপলাবণ্য কেবল সাহিত্যের বা কাব্যের বিষয় নয়। প্রত্যেক নারী ও পুরুষের আনন্দেরও উৎস।

তাই নানা উপকরণের সাহায্যে রূপলাবণ্য কী ভাবে বাড়ন যায় তা আলোচনা করা যাক্।

জল, বায়ু, মাটি ও অগ্নিকণা যেমন জড় পৃথিবীর উপাদান, তেমনি মানব-দেহের সৌন্দর্যেরও। তাই এদের সম্বন্ধে প্রত্যেক নারীকে জানতে হবে।

জল সুলভ্য সমাজে পরিচ্ছন্নতা ও প্রসাধনের সহজ লভ্য অথচ মূল্যবান সামগ্রী। স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জলের গুণাগুণ আমরা সবাই জানি। শুধু পানীয় হিসাবেই নয় বলিষ্ট নিরোগ স্বাস্থ্যরক্ষায় একজন্য ঔষধও বটে। জল প্রসাধনের পরোক্ষ সহায়ক। জলকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি কি? জল ছাড়িয়ে। স্নান একটি আনন্দ্য প্রসাধন নয় কি? দেহ শুধু নয়, চুল ও সজীব আর মসৃণ ক'রে তোলে জল।

বায়ু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ু ছাড়া আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না। আমরা সৌন্দর্য্য লাভও করতে পারি না। বায়ু দেহের বিভিন্ন রক্তপথে ভুধ দিয়ে ফুসফুসে ফিরে আসিয়ে হয়। তারপর ফুসফুস স্ফীত ও সংকুচিত করে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করে। ফলে রক্তস্রোত খাভাবিক ভাবে চলাচল করে। গ্রীষ্মের বাতাসের ছোঁয়া যেন অমৃত আরোগ্যকারীর স্পর্শ। যোগ শিক্ষক ছাড়া অনেকেই বায়ুর গোপন সাহায্য সম্বন্ধে সচেতন নয়। সচেতন থাকা কিন্তু খুবই দরকার। প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু যাতে ঘরের ভিতরে খেলা করে সে-দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তাপ জীবনের শুধু লক্ষণ নয়, অন্যতম উৎস। তাপ মানুষের মনও দেহ দুইকেই বাঁচিয়ে রাখে। তাপের অমন্য উৎসাহ আমরা দেহে রক্ষা করতে পারি যদি তালিকায় মাংস ও সমুদ্র শাকসবজী ও ফলা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিরোধ শক্তির বিশেষ সহায়ক অগ্নির তাপ।

মাটি দেহের নানা সূক্ষ্ম প্রত্যঙ্গকে সচল ও সুদৃঢ় রাখে। অথচ আজকাল অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই এবং শহরে মাটির সঙ্গে দেহের সরাসরি যোগাযোগ রাখা যায় না। তাই মাটিকে আমরা মুখাবয়ব, হস্তও বাহু সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করতে পারি না।

প্রাচীনকালে মেয়েরা বনজঙ্গল থেকে প্রসাধনের নানা সামগ্রী সংগ্রহ করে প্রসাধন করতো? কিন্তু আধুনিক জগতে প্রকৃতির প্রসাধনকে ব্যবহার করার সুযোগ তেমন নেই। তাই বিভিন্ন গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিজাত দ্রব্যকে রাসায়নিকরা নারীর প্রসাধনের যোগ্য সামগ্রী করে তুলেছে। তা ব্যবহারে নারী তার সৌন্দর্যের কোমনীয়তা ও লাবণ্যকে বাড়াতে পারে।

প্রাচীনকালে মেয়েরা দুধের ব্যবহার দ্বারা কিংবা গর্দভ দুগ্ধে স্নান করে রূপচর্চা করতো। বর্তমানে দুধের মাখন কিংবা ক্রীম দিয়ে মেয়েরা রূপচর্চা করতে পারে। এমন কি পরিমাণ মতো গুঁড়ো দুধের সঙ্গে দু-এক চামচ জল ব্যবহার করে পেস্ট তৈরী করে মুখে ও বাহুতে লাগালে বাহুও মুখাবয়ব কোমল স্নিগ্ধ এবং মসৃণ হয়।

প্রাচীন গ্রীস দেশের মেয়েরা মাটি মেখে স্নান করতো। এখনো কোথাও কোথাও তার প্রচলন আছে। সাজিমাটি কিংবা বিশুদ্ধ মাটির সঙ্গে দু'চামচ পরিমাণ ডিমের কুসুমাংশ কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন এবং সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে লোশনের মতো তৈরী করে ব্যবহার করা ভালো। তবে এই জিনিসটি মাসে তিন বারের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। ২০।২৫ মিনিট পরে অল্প গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলে আস্তে আস্তে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিতে হবে।

বর্তমান কর্মচঞ্চল পৃথিবীতে নারীর রূপ চর্চার রুটিন যাতে সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর মনে রাখতে হবে দেহের সব চাইতে বড়ো প্রসাধন পরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে স্নো-পাউডার বা অন্য কোনো প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার ক'রেও কিছু লাভ হয় না।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

সাংবাদিক-বন্ধু উদ্যম হয়ে উঠলেন, তোমরা অনেক পিছিয়ে আছো, আজকালকার দৈনিকের সংবাদ পরিবেশন আর সম্পাদকীয়গুলো যদি পড়ো তাহলে দেখতে পাবে, ভাষার বল, বানানের বল, কী অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে। চং একেবারে বদলে গেছে। এখন আর জ্ঞান দেবার দিন নেই। এখন কেবল রসকলি। রসের মাধ্যমেই আসল বক্তব্যের প্রকাশ।

চুপ করেই রইলাম। বন্ধুটি যেভাবে ক্ষেপে উঠেছেন, তাতে ওঁর ভিতরকার বাষ্প দ্রুত নির্গত হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি বলতে লাগলেন, বানানে বল, বাক্য রচনায় বল, আমরা নতুন যুগ এনেছি, এক সময়ে আমরা লন্ডনের ফ্লীট স্ট্রীটের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আজ আমাদের দৃষ্টি মার্কিনের ডিজেস্ট পাবক থেকে প্রেসের পাবক সারকাস পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। অদ্ভুত ভাবে আমরা বিদেশের আরটকে পাচ করে নিয়ে নিত্য নতুন শব্দ কয়েন করছি।

বললাম, তা বেশ করছ? কিন্তু একটা কথা বলব।

কী আবার বলবে?

আমার কথা নয়, একটি ইংরেজি উক্তি তোমায় শোনাই। You have a right to coin new words. But you must get them coined in the public mint. If you do so in private mint, you are liable to be punished for making counterfeit coins।

বন্ধু সরগরম করতে লাগলেন, এসব ছেঁদো কথা আমরা মানি না। মোটের ওপর তুমি এখনো মানতে বাধ্য যে আজকের সাংবাদিকতা, আজকের সম্পাদকীয় আর সেদিনের মতো নেই—

বললাম, না, তা নেই। তোল পাল্টে গেছে। তার কারণ, সেদিনকার সম্পাদক চিন্তা করে অনুভব করে লিখতেন প্রাণের আবেগে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়, কোন কারণ দেখিয়ে "রসসৃষ্টির" বাসনায় নয়।

আমার হাতের কাছেই ছিল একটি পুরনো খাতা তার ভিতর কিছু কিছু লেখার কাটিং ছিল। বললাম—তখনকার দিনের এক সম্পাদক (যার নাম তোমরা আজ ভুলে গেছ) তাঁর একটি সম্পাদকীয় রচনা শুনবে? লেখাটা অবিশ্যি আজ আর তোমাদের ভাল লাগবে না, হয়ত বলবে, এ আবার কী রকম ভাষা? এত কষ্ট করে এত চিন্তা করে আজ আর আমাদের লেখবার সময় নেই—

বাধা দিয়ে বন্ধু বললেন, বাজারটা রেখে লেখাটা পড়ে ফেল। কত দিন আগের লেখা?

১৯৩০ সালের মার্চ মাসের লেখা। তখন তুমি হামাগুড়ি দিচ্ছ। আমো বোধহয় সে সময় বেণে কার তেরী বাজছিল, কিসের টংকার শোনা যাচ্ছিল। থাক শোন, পড়ি—

"মহাকালের ভৈরব ভেরীর উদাত্ত আহ্বানের তালে তালে, নটরাজের তাণ্ডব নটিছন্দে যে প্রলয় ঘুলিয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণ সুন্দর মহিমার সম্মুখে তুমি আজ ভীত বলির পশুর মত আর্তনাদ করিও না। সুখশান্তি আরাম আয়াসের ক্ষুদ্র বিচ্ছাহিতে বিলাস করিয়া জাতির লজ্জাকে অসহনীয় করিয়া তুলিও না। মাথা তুলিয়া এই আবর্ত-সংকুল বিচিত্র ঘূর্ণাবর্তচঞ্চল প্রলয় সিন্ধুর পরপারে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে দিগন্তরে নবসৃষ্টির সৌনাতরল তরঙ্গে তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। দেখিবে প্রলয় শেষ নয়—সৃষ্টি বিচিত্র প্রলয় মহাকালের বুকের উপর দিয়া অনন্তকাল ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়াছে। প্রলয়ের মহাঘূর্ণাকে বাঁধ দিয়া সৃষ্টির কূলে উঠিব—জাতির অন্তর হইতে এই শুভ সংকল্পকে আজ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার তপস্যার দ্বারা উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছেন। চারিদিক হইতে জীবনের ধারা দুর্বার বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। আগামী ৬ই এপ্রিল এই ইতিহাস বিখ্যাত নিয়ন্ত্রের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত সশস্ত্রের সংঘর্ষের সূচনা হইবে। এই আশুর অভূতপূর্ব যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি সমগ্র জগৎ চাহিয়া আছে। এই কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক ভারত সন্তান তাঁদের কর্তব্য বাছিয়া লউন। বন্দে-মাতরম্!"

শুনে হাই তুলে বন্ধু বললেন, বোমবাসটিক। বললাম, শুধু বোমবাসটিক নয়, রীতিমতো গোলাকার বোমা। সে সময় এই রকম বোমবাসটিক বোমার মতোই কাজ করেছে।

দেখলাম, বন্ধুর উদ্যমতা কিছু স্তিমিত, বললেন, তা, হ্যাঁ, তখন আর এখন···

বললাম, হ্যাঁ, এখন সব ন ন ড ন ন ন ড ন ড। যাক গে! আর এক কাপ চা খাবে?

• • •

ভাত নেই। কাপড় নেই। মাথার ওপর চাল নেই। কেরল নেই নেই। আরে বাপু, ওসব তুচ্ছ নেই নেই করেই মরছ কেবল, এদিকে বিদেশের হাটে আমাদের কত সম্মান কত অমূল্য তা দেখে শুনে তোমাদের আনন্দ হয় না? এই যে আমাদের দেশের মেয়ে, শ্রীমতী ইন্দিরা মার্কিন দেশের আন্তর্জাতিক সংযুক্ত সংবাদ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশ্বনায়িকার পদ লাভ করলেন এ কী আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা। দেখ তো, মার্কিন দেশ ভারতের কত বড় অনুরাগী। তবু তোমরা মার্কিন-দের সি. আই. এর কথা তুলে যা-তা সব-অসুবিধাজনক নজীর দেখাবে। হ্যাঁ, ভাল কথা। এই নির্বাচনে বিশ্বনায়ক রূপে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন, কে বলুন দেখি? প্রেসিডেন্ট জনসন। জনসন আর ইন্দিরার ছবি পাশাপাশি ছাপা হয়েছে সব কাগজে। ইন্দিরার প্রতিযোগিনী ছিলেন রাণী এলিজাবেথ আর জ্যাকুলিন কেনেডি। তাঁরা দুজনে সমান ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। জনসনের পরেই ভোট পেয়েছেন মাও সে তুং।

জয় বিশ্বনায়িকার জয়।

• • •

কিন্তু এই বিশ্বনন্দিতা শ্রীমতী ইন্দিরাকে ঐ মার্কিন দেশেই আবার অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। মার্কিনের এক মফঃস্বল শহরের এক মাটুকে দল, তাদের নাম "লোফারের হাস্যকর থিয়েটর"

একটি অশ্লীল নাটক দেখানো হচ্ছে—সে নাটকে এমন সব কাণ্ডকারখানা দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যা প্রকাশ্যভাবে দেখানোর কল্পনাই করা যায় না—যাকে বলে চরম এবং চূড়ান্ত অশ্লীলতা এবং নোংরামি! এবং এই অশ্লীলতা ও নোংরামির অন্যতম নায়ক নায়িকা রূপে কদর্যভাবে চিত্রিত হয়েছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ।

ঠৈ-ঠৈ ব্যাপার! থিয়েটর লোকে লোকারণ্য। কামরাজ আর ইন্দিরার অশ্লীলতম আচরণ দেখে দর্শকদের সে কী হাততালি আর কী শিস্!

এই নাটক নিয়ে আমাদের লোকসভায় কথা উঠেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাগলা সাহেব বলেছেন, ভারত প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ফলে ঐ নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু লোকে যা দেখবার তা তো দেখে নিয়েছে! এবং ভারত সম্বন্ধে যা সব মন্তব্য করবার তা তো করে নিয়েছে! অর্থাৎ মানহানির দিক থেকে ভারতের যা ক্ষতি হবার তা হয়েই গেছে। আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে ওই লোচ্চা থিয়েটরের নাটকে শুধু কামরাজ ইন্দিরা নয়, প্রেসিডেন্ট জনসন, কুশ্চেভ, এমন কি প্রেসিডেন্ট অবদনের কন্যাও আছেন।

• • •

পরীক্ষার সময় টোকাটুকি কী করে বন্ধ করা যায়? কত রকমের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু টোকাটুকি আটকানো যায়নি। জামার পকেটে, প্যান্টালুনের ভিতরে, কাপড়ের ভাঁজে, বই, কাগজ-পত্র নিয়ে আসে ছেলেরা আর সুবিধা পেলেই সেগুলো বার করে কাজ সারে। এইসব কৌশল বন্ধ করার জন্যে নাগপুরের অমরাবতীর জেলার অন্তর্গত অচলপুর পরীক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক এক অভিনব পন্থা নিয়েছেন। উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় যেসব পরীক্ষার্থী বসবে তাদের বেশবাস সম্বন্ধে তিনি হুকুম জারী করেছেন, তারা কেবলমাত্র খাটো ইজের পরে আসবে—অন্য কোন জামা বা কাপড় তারা পরতে পারবে না। অর্থাৎ নেংটি পরে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে। অদ্ভুত ব্যবস্থা! আচ্ছা, একটা কথা। মেয়েরাও পরীক্ষা দেয় এবং তারাও টোকাটুকি করে, কাগজ-বই দেখে নকল করে। সম্ভবত উক্ত পরীক্ষায় পরিক্ষার্থিনীও আছে। তাদের পরিধেয় সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা তো জানা যায়নি!

• • •

বোম্বাইএর এক নাচঘরে বেলা দুটোয় নাচতে সুরু করলেন 'নৃত্যসম্রাট' গোপীকৃষ্ণ। নাচছেন তো নাচছেনই, নাচ আর থামে না। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কেটে গেল—তবুও বিরাম নেই। ব্যাপার কী? না, গোপীকৃষ্ণ বিরামহীন নাচের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে সংকল্প করেছেন। সব ব্যাপারেই বিশ্বরেকর্ড আছে, হাঁটা, হোঁচট, লাফ, ডিগবাজি, এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে থাকা, আরো কত কী! তাহলে বিরামহীন নাচেরই বা বিশ্বরেকর্ড থাকবে না কেন? তাই গোপীকৃষ্ণ এক নাগাড়ে ৯ ঘণ্টা ২০ মিনিট নাচলেন। আর সে কি যে-সে নাচ, রীতিমত তাণ্ডব নৃত্য। শেষ পর্যন্ত তাঁর মা এবং অনুরাগীরা তাঁর পা চেপে ধরে তাঁকে বিরত করলেন। তা না করলে তিনি হয়ত নাচতে নাচতেই এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে সরে পড়তেন!

• • •

হ্যাঁ। একখানা শপথের মতো শপথ বটে। দুঃসাধ্য কার্যসাধনের জন্যে মানুষ অনেক রকমের প্রতিজ্ঞা নেয়। কিন্তু দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ২৩ বছরের তরুণী বধূ যে শপথ নিয়েছেন তা যেমন অভিনব তেমনি চটকদার। ঐ এক শপথেই তাঁর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। একেই বলে পাবলিসিটি স্টান্ট্। সকলেই এক বাক্যে বলছে—"কী মহান স্বার্থত্যাগ।" সদ্য বিবাহিত মেয়েটির নাম ডায়না বার্জ। স্বামীর নাম গ্রাহাম বার্জ। ডায়না কৌড়রাজ মেয়ে। ১৯৪৬ সালে জামাইকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠানে তিনি তিনটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রীড়ায় শত মিটারেও ইনি বিজয়িনী। ১৯৫৮ সালে মেলবোর্নে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। তাতে ইনি যোগ দেবেন। এবং স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এবং সেই সূত্রেই তিনি শপথ গ্রহণ করেছেন যে ১৯৫৮ সালের অলিম্পিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সন্তান ধারণ করবেন না। সংবাদে প্রকাশ ডায়নার স্বামী গ্রাহামও ডায়নার শপথ রক্ষায় সহায়তা করবেন। পত্রিকায় পত্রিকায় ডায়নারই নাম, কি কঠিন শপথ! কী মহীয়সী মেয়ে! কিন্তু ভেবে দেখুন, গ্রাহাম বার্জের ত্যাগটাই বা কী কম!

• • •

পার্লামেন্টের স্বতন্ত্র সদস্য সি সি দেশাই-এর রসবোধ আছে বলতে হবে। এবারকার ইন্দিরা মন্ত্রীসভায় মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৫২। দেশাই বাবা খেলিয়ে একটা মজার উপমা ছেড়েছেন। বলেছেন, এই মন্ত্রীসভা যেন এক প্যাকেট তাস! তাসের সংখ্যা ৫২। মন্ত্রীসভার সংখ্যাও ৫২। অবশ্য এক প্যাকেট তাসের সঙ্গে একটি জোকার থাকে। এই মন্ত্রীসভায় সেই জোকারটি কে? দেশাই বলেন, তাসের প্যাকেট নিয়ে যখন খেলা চলে তখন তো আর জোকার তার মধ্যে থাকে না। তাকে সসম্মানে একপাশে রাখা হয়। এই মন্ত্রীসভায় জোকারটিও তেমনি ঐ বাহার জনের মধ্যে নেই। তিনি আছেন বেপাত্তা! এবং সেই সঙ্গে সেই উক্তিটি ঝাড়েন—

"মুখ সাধু যে আর সন্তান।"

• • •

সাংবেতিক (?) বন্ধু কবিতা বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন:

বড় বাজারের তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে কিসের মন্ত্রে
আসিয়া উত্তীর্ণ শিখ।
নির্ধন নিস্তীক।

বলি, ওহে চক্র-পাণি! সেই গুপ্তমন্ত্রটি কি তা কি জানতে পেরেছো?

মাথা নেড়ে অজ্ঞতা জানাতে হল। বন্ধু বললেন—কাগজগুলো ভাল করে পড়না বুঝি? গত ২৯শে মার্চ অনেকদিন পরে আবার কলকাতায় যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল তার যেসব সংবাদ বেরিয়েছে তার মধ্যে দুটি অনবদ্যনীয় রসসৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে আনন্দবাজারের পরদিনকার রবিবাসরের রিপোর্টে, লক্ষ্য করেছো? তা করবে কেন, কাগজ খুলে দেখ তো কেবল সোনেরা ফিল্ম আর তার নায়িকার ছবি, সিনেমার পাতা আর নব্য বাংলার দেখা টিকাটিপ্পনীয় ব্যস্ত-কষ্ট-নষ্ট। আসলে

সেদিনকার ঘটনার গুপ্ত রহস্যটা কি? সে রহস্য হচ্ছে বাইশটা ট্রাংক টেলিফোন-কল্। অবাক হচ্ছ? আজ্ঞে হ্যাঁ, সেদিন সকাল থেকে "বড়বাজার অঞ্চলে কলকাতার এক টেলিফোন নম্বর থেকে দিল্লীতে এবং পাঞ্জাবে ২০।২২টি টেলিফোন কল করা হয়। প্রকাশ, এক ব্যক্তি দিল্লীতে বিভিন্ন মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তির নিকট এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে চাপ সৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেন।"...বুঝলে এবার। ঐ টেলিফোন যাতে করা যায় সেজন্যেই বুধবারের ওই ঘটনা!...আর একটি রসসৃষ্টির পরিচয় হচ্ছে নতুনতর ভাষা ও শব্দের ব্যবহার! শোন, নানা গোলমালের খবরে বলা হচ্ছে —"বেলা দুটো নাগাদ একটি প্রাইভেট গাড়ী লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়া সুরু করলে (!) চালক ভয়ে গাড়ী থামিয়ে দেন। এসময় (!) একজন পথচারী এই গাড়ীটি চালনা করেন। পরে জানা যায় আহত ব্যক্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফয়াদ (!)" —কী রকম বুঝলে, আহত ব্যক্তি বিদ্যাবার চাদরে পরিণত হলেন, মাকি, ফয়াদের অন্য কোন গূঢ় অর্থ আছে? সন্তোষ ঘোষ মশাইকে জিগেস করতে যাচ্ছি। ততক্ষণ ঐ তারিখের কাগজের এক পৃষ্ঠা ৪র্থ কলমের নীচে থেকে পঞ্চম পংক্তি দেখছ।

এই বলে বন্ধু অন্তর্হিত হলেন। আমি পত্রিকাটি সংগ্রহ করে খুলে বসলাম।

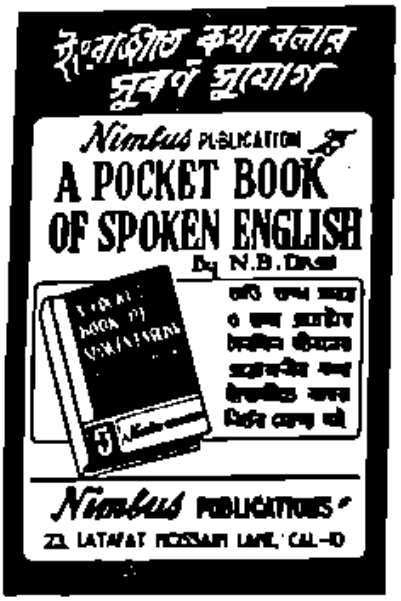

॥ সর্ব্বকালের স্মরণীয় বই ॥

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার ও যুগান্তর
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের

অনুপম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫

এ শুধু সাধারণ কথা-কাহিনী গুচ্ছ নয়,—
প্রতিটি কাহিনীতে রক্ত-মাংসের
জীবন স্পন্দিত।

অর্চ্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

গল্প-ভারতী

- আষাঢ় মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ।
- যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়।
- বার্ষিক চাঁদার হার সডাক ১৫৲ টাকা।
- বার্ষিক গ্রাহকগণ কোন অতিরিক্ত মূল্য না দিয়াও পূজা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং-এ বই পাঠান হয়। যথাসময়ে পত্রিকা যদি কেহ না পান, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে, ব্যবস্থা করা হয়।

পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সহরে ও গ্রামে এজেন্ট আবশ্যক।

লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখার কপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন—অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য,
অম্ল, অক্ষুধা

কোনটী থেকে ভুগছেন ?

আমাদের

ভাস্কর লবণ

খেলে নিশ্চয়ই সেরে যাবেন।

যাঁরাই ব্যবহার করেছেন তাঁরাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন,
অর্ডার দিলে ভিপিতে পাঠান হয়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রচিত

ঠাকুরবাড়ীর কথা

ঠাকুরবাড়ী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারাকে দুইভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রথমত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সংঘাত আমাদের জরাগ্রস্ত সংস্কৃতির মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করেছে। দ্বিতীয়ত, তা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যা এই বাড়ীর সন্তান রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভার ঠিক পথে বিকাশের সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতা ভগিনী ও ভ্রাতৃজায়াগণ সেই পরিবেশটি রচনা করেছিলেন।

এই গ্রন্থে দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথের পরিবার, রবীন্দ্রনাথ, পরিবারের উত্তর পুরুষ এবং বাঙলার সমাজ-জীবনে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা—বিষয়গুলি বহু তথ্যসহ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। বাঙলার সংস্কৃতিচর্চায় একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট প্রকাশন-সৌষ্ঠব।

দাম বার টাকা।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘরে বাইরে যেখানেই থাকুন

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের সিল্ক শাড়ীই

আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারণ।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

পোড়া .... কাটা .... গোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ জ্বালা লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চরিত্রজিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরামদায়ক

হাতের কাছে রাখুন

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
বৈশাখ ১৩৭৪, MAY . 1967
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ—১১শ সংখ্যা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা।
বার্ষিক পনের টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো,
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক :
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-৭৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৮৬৯
ভাববার কথা	৮৭২
দুর্গত মহানগরী (কার্টুন)	৮৭৩
উৎসব—রবীন্দ্রনাথ	৮৭৬
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৮৭৭
বন্দী-জীবনে সাহিত্য-সাধনা—নগেন্দ্রকুমার গুহরায়	৮৮৪
গুপ্তচর কাহিনী—গৌরীশঙ্কর দে	৮৯১
সমাধান (গল্প)—নিবেশ মুখোপাধ্যায়	৮৯৫
তৃপ্যতু „ —সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০২
ঘুম নেই „ —পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৯০৭
শুকনো গোলাপ „ —অসুনাথ মুখোপাধ্যায়	৯১৫

এই সংখ্যায়

স্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন—নীলাদ্রি সোম ৯১৮

নাটমঞ্চ—রত্নাকর ৯২০

ছায়াবাণী—চিত্রমিত্র ৯২৯

মেয়ে-মজলিশ

রান্না আর রান্না—আভা পাকড়াশী ৯৩৪

বৈশাখী ব্রত—হাসি ভট্টাচার্য্য ৯৩৮

চলতি দুনিয়া ৯৪১

খেলাধুলা—শ্রীজ্যোতির্ময় ৯৪৪

ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ৯৪৮

মেয়েরা প্রত্যেকেই পছন্দ করে **খাটাউ** ভয়েল্‌স

দি খাটাউ মাকাঞ্জী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ

খুচরা দোকান :

১৪৯. মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-১৯৯৯

১৮এল. পার্ক ষ্ট্রীট, প্রবেশ পথ মিডিলটন রো, কলিকাতা-১৬ ফোন : ২৩-৫২৮৩

এই সংখ্যায়

●

সচিত্র সংযোজন :

শিল্পে ছিটেফোঁটা—ডঃ কালিদাস নাগ ৯৫৩
(অপ্রকাশিত রচনা)

রবীন্দ্র সন্দর্শনে—মনোরঞ্জন গুপ্ত ৯৫৬

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৯৬৩

রবীন্দ্রমানসের মণিমুক্তা ৯৭০

মহাজাতী সদন : নেতাজীর স্বপ্ন—ডঃ কালিদাস নাগ ৯৭২

এলেম নতুন দেশে—

রবীন্দ্র সংস্কৃতির পীঠস্থান শহর কলকাতায়

পুরীধামের রবীন্দ্রানুসারী সংস্থা

পুরী হোটেল রিক্রিয়েশান ক্লাবের

প্রথম শ্রদ্ধাবিনম্র পদসঞ্চার

তাঁদের বহুপ্রশংসিত দুটি নৃত্যনাট্য নিবেদনের মাধ্যমে

২৯শে জুন শনিবার ১৯৬৭ ... তাসের দেশ
সন্ধ্যা ৬টায়...

২৫শে জুন রবিবার ১৯৬৭ ... শ্যামা
সন্ধ্যা ৬টায়...

স্থান : অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চ

ক্যামিড্রাল রোড, কলিকাতা।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন : ম্যানেজার, পুরী হোটেল, পুরী।

আপনার কেশগুচ্ছ
দীর্ঘ সুন্দর করে
আপনাকে রূপ-লাবণ্যে
উজ্জ্বল করবে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
সুবাসিত
তিল তৈল

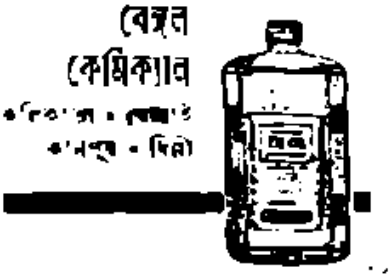

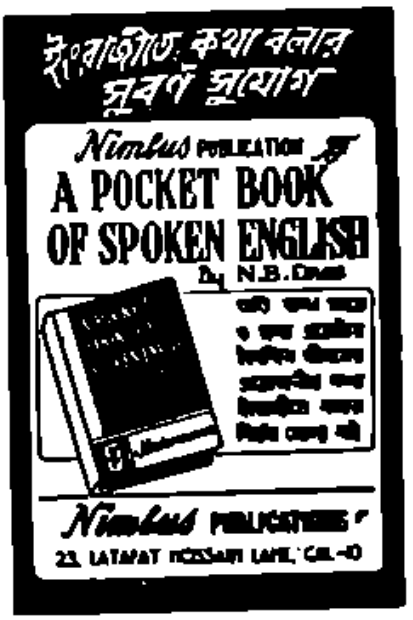

॥ সর্বকালের স্মরণীয় বই ॥
অমৃতবাজার, আনন্দবাজার ও যুগান্তর
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের
অনুপম কথাশিল্প

দ্বিতীয় বাসর

দাম—২·৫০

এ শুধু সাধারণ কথা-কাহিনী গুচ্ছ নয়,—
প্রতিটি কাহিনীতে রক্ত-মাংসের
জীবন স্পন্দিত।

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭

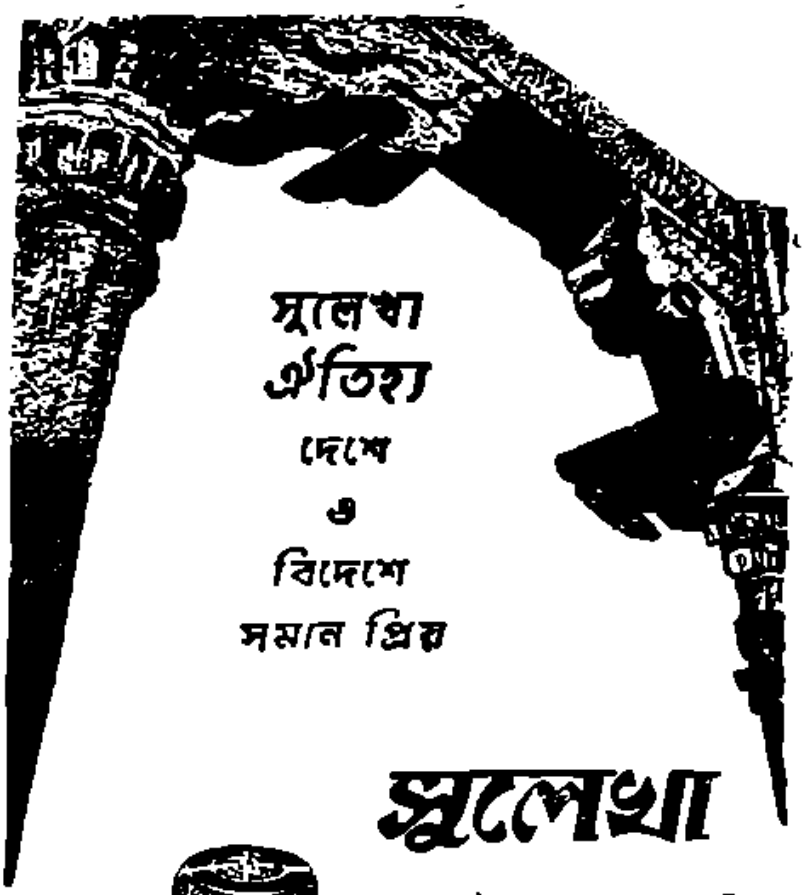

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive SW-318

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
একমাত্র গেঞ্জী, টী-শার্ট, টেনিস-শার্ট,
চেন শার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

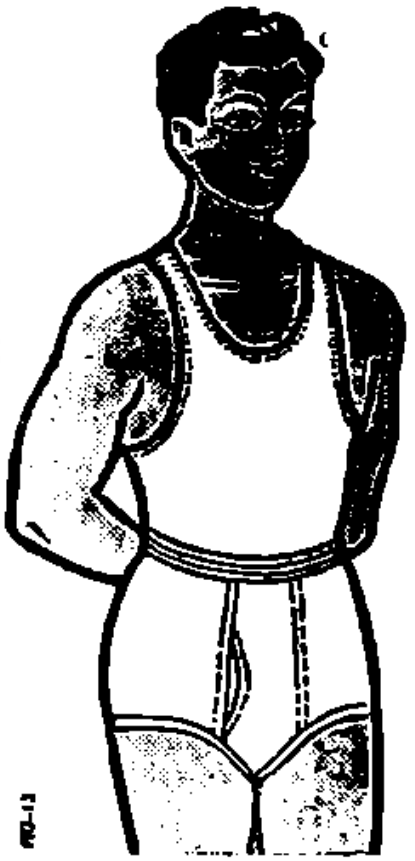

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম শ্রেণীর বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবসা করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই লিখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; সোসাল স্টোর্স, খোডনালয় এবং বালীগঞ্জ মিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১৩৩, এস. এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্ডাষ্ট্রী স্টোর্স—২১/১, মির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, দাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ভাগনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ নিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, গাঙ্গালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; কালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ভাবেরমল; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ ঘনশ্যাম কেজ্রী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চন্দ্রালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চানাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৮৩৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিস।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীঅকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, অনায়াসে স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

ওকে হাতে-নাতে ধরুন!!

ও জন-সাধারণের শত্রু !

বিপদ শৃঙ্খল হ'ল জরুরী ব্যবস্থা; একমাত্র অপরিহার্য্য কারণেই ব্যবহারের জন্য—খেয়ালখুশি মতো বা তুচ্ছ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়।

বিপদ শৃঙ্খলের ব্যবহারে দেশের চলাচল ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে, প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায় এবং প্রায়ই সামগ্রিক-ভাবে বিপুল ক্ষতি ও অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বিপদ শৃঙ্খলের অপব্যবহার থেকে নিজে বিরত থাকা শুধু নয়; জাতির স্বার্থে, এই অপব্যবহাররোধে সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্য প্রত্যেকে সক্রিয় হোন।

পূর্ব রেলওয়ে

লর্ডের

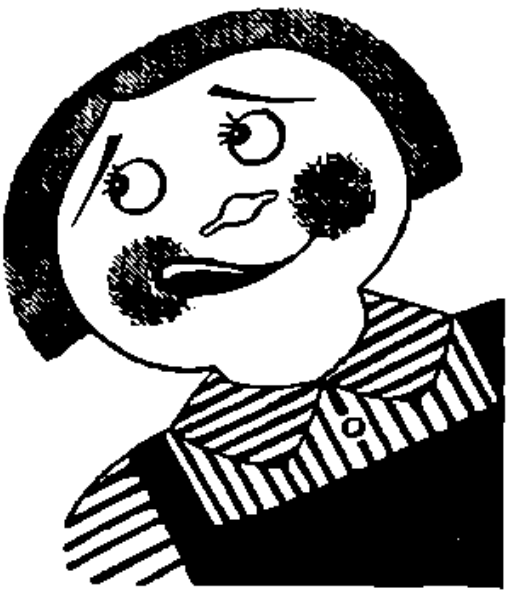

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১

THE HOUSE OF
NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS
OF INDUSTRIAL RUBBER
PRODUCTS IN INDIA

NATIONAL ROBBER
MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED
AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres
Limited

পশ্চিমবঙ্গের শহরে ও গ্রামে কোথায় কিভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা
বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠছে সে-সব খবর জানতে হলে নিয়মিত পড়ুন

সচিত্র বাঙ্গলা সাপ্তাহিক

পশ্চিমবঙ্গ

এতে সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংকলিত প্রবন্ধ

বার্ষিক : : ভিন টাকা ষাণ্মাসিক : : দেড় টাকা

আরও একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা

ওয়েস্টবেঙ্গল

পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক

বার্ষিক : : ছয় টাকা ষাণ্মাসিক : : তিন টাকা

: : : গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
: : : চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।

তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

ডব্লিউ. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) এ. ডি. ডি ১১৬২/৮৭

আমাদের বিনামূল্যে সুবিধা

দি ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

ডি. ডি. কানসারা
জেনারেল ম্যানেজার

আর. শারসাগ্রে
রিজিওনাল ম্যানেজার
(কলিকাতা শাখাসমূহ)

বিনামূল্যে আমাদের গ্রাহকদের জন্য, ভিমাণ্ড ড্রাফট, মেইল ট্রান্সফার বা টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারে দ্বারা, গ্রাহক প্রতি, এক দিনে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ফাণ্ড ট্রান্সফার করা হয়, ভারতে যে কোন শাখায়—প্রাপক গ্রাহক না হইলেও চলে। (টেলিগ্রামের মূল্য গ্রাহকের নামে ধার্য্য করা হয়)।

বিনামূল্যে গ্রাহকদের জন্য, আমাদের যেখানে শাখা আছে, ভারতের এমন যে কোন স্থানে যে কোন পরিমাণ টাকার চেক বা ক্লীন ভিমাণ্ড বিল সংগ্রহ করা হয়।

বিনামূল্যে গ্রাহকদের জন্য, আমাদের যেখানে শাখা নাই, ভারতের এমন সব স্থানেও চেক বা ক্লীন ভিমাণ্ড বিল সংগ্রহ করা হয়। (এই ব্যাপারে দেয় চার্জ গ্রাহক বা প্রাপকের নামে ধার্য্য করা হয়)।

বিনামূল্যে ভারতীয় মেসার্সোসিনীর ওয়ারাণ্টদের জন্য, একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের অফিসে আদায়যোগ্য চেক ও মাইনর বা পেনসনের বিল সংগ্রহ করা হয়।

বিনামূল্যে কোম্পানী বা ফার্মের কর্মচারীদের বেতন-বিলি ব্যবস্থায়, ভারতে আমাদের যে কোন শাখায় উহাদের কারেণ্ট বা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টে ক্রেডিট করা হয় বা যেখানে আমাদের শাখা আছে সেখানে অন্য ব্যাঙ্কেও ক্রেডিট করা হয়। (যেখানে আমাদের শাখা নাই, সেইসব স্থানে বেতন-বিলির জন্য অন্য ব্যাঙ্কে দেয় চার্জ গ্রাহকের নামে ধার্য্য করা হয়)।

বিনামূল্যে কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত পেয়ার মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

বিনামূল্যে আবেদনের সহিত প্রেরিত অর্থ ফেরৎ দিবার অভিপ্রায় অনুযায়ী অর্থ বিলি করা হয়।

বিনামূল্যে কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত ও ব্যাঙ্কে আদায়যোগ্য ডিভিডেণ্ড ওয়ারেণ্টের অর্থ বিলি করা হয়।

বিনামূল্যে গ্রাহকদের জন্য, গভর্ণমেণ্ট সিকিওরিটির মেয়াদ পূর্ণ হইলে মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

বিনামূল্যে গ্রাহকদের নির্দ্দিষ্ট ও স্বল্প মেয়াদের আমানতের রসিদ এবং ক্যাশ সার্টিফিকেট সেফ কাস্টোডিতে লওয়া হয় এবং তাহার সুদ ও ডিভিডেণ্ট সংগ্রহ করা হয়।

(১) কারেণ্ট একাউণ্ট পাশ বই ও একাউণ্টের বিবরণ ও (২) নির্দ্দিষ্ট ও স্বল্প মেয়াদের আমানতের রসিদ সাধারণ বা রেজিষ্টার্ড ডাকে গ্রাহকদের নিকট ডাকমাশুল ধার্য্য না করিয়া **বিনামূল্যে** পাঠানো হয়।

বিনামূল্যে ব্যাঙ্কের ভারতীয় টাকার ট্রাভেলার্স চেক দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

পিপাসার সময় জল না পাওয়ার প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা বাস্ এই কলকাতা শহরে বসেই সেদিন হয়ে গেল।

বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম দুপুরে, সন্ধেবেলা বাড়ী ফিরেই দেখি—কোথাও একফোঁটা জল নেই। টাট্‌কা জল ধরবে বলে চৌবাচ্চায় বাসি জল যেটুকু ছিল সেটুকুও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মকাল। সন্ধ্যায় স্নান করা অভ্যেস। স্নান হলো না। এদিকে পিপাসাও পেয়েছে। কুঁজোয় জল নেই।

খুব ভাবনায় পড়লাম।

গিন্নি বললে, তখনই নাকি বেড়িয়োয় বলেছিল জল আসবে না। কিন্তু কে তোমায় বেড়িয়োতে কান দিয়ে বসে থাকতে বলে।

বাড়ীতে একটা চাকর নেই যে একটু জল ধরে এনে দেবে!

—কোত্থেকে আনবে?

—গগনবাবুর বাড়ীতে একটা টিউবওয়েল আছে শুনছি। গিন্নি বললে, তুমি যাও না একটা বাল্‌তি হাতে নিয়ে। এক বাল্‌তি জল হলেই আমি রান্নাটা চড়িয়ে দিতে পারি।

বললাম, রান্না আজ থাক্। আগে পিপাসার জল চাই।

একটা বাল্‌তি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রাণের দায়ে।

সেইদিনই বুঝতে পারলাম—জলের আর-এক নাম জীবন।

গগনবাবুর বাড়ী গিয়ে দেখি—মস্ত লম্বা একটা কিউ।

কিউএর পেছনে দাঁড়িয়ে জল নিতে রাত্রি দশটা বাজবে।

বাজুক্। তবু দাঁড়াতে হলো।

তাকিয়ে দেখি, অনেকেই এসেছেন।

তিনকড়িবাবু বাল্‌তি হাতে নিয়ে কিউএর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন লজ্জায় বেয়ারার দিকে মুখটা ফিরিয়ে।

সন্ধ্যা-পরামর্শের বাসাই সেই চৌকো হরিচরণের। প্রকাণ্ড বড় বড় দুটো হাতের মত বাহুওলা লিউএর দাড়িতে নিজের আঙুলগুলো বাড়িয়ে রেখে পাশের ঘরে বসে বসে সে বিড়ি টানছে আর ক্রমাগত বড় বড় ভরে ধোঁয়া ছাড়ছে।

—এর চেয়ে পাড়াগাঁ আমাদের অনেক ভাল। জল আর হাওয়ার জন্যে পয়সা লাগে না। ভগবান এই দুটো জিনিস আমাদের এমনিই দিয়েছেন। পুকুর আছে, ঈঁদারা আছে, কুয়ো আছে। আর এখানে? পৃথিবীবিখ্যাত এই সভ্য নগর মহানগরী কলিকাতায়? দুইই টিন্‌এই আনো অনছে, কল খুল্‌লেই জল পড়ছে। সুখও বড়, দুঃখও তত। জল একটু বিগ্‌ড়েছে কি বাস্, চারিদিক অন্ধকার। আর এই ভাখো না—মাস্তারের আমলের লোহার পাইপ—মরচে ধরে ফুটো হয়ে গেছে। এখন বিদ্যাসাগর যদি হাজির হোন তবু এক ফোঁটা জল পাবে না।

—তোমার কথা কেউ শুনছে না হরিচরণ, তুমি চুপ কর।

তাকিয়ে দেখলাম—কথাটা বললেন বৃদ্ধ শীতলবাবু। তবেছিলেন বুঝি হরিচরণকে ধমকে বসে খুব রসিকতা করেছেন। তাই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন তিনি।

কিন্তু আর কেউ হাসলো না।

কারণ জলের অভাবে সবারই মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। এবং হরিচরণ অন্যায় কিছু বলেনি।

হরিচরণ তার হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শীতলবাবুকে উদ্দেশ করে বললে, আজ হাসছো শীতল-দাদা, কিন্তু একদিন মরবে বলে। জলের পাইপে একটি ফুটো হয়েছে তাইতেই এই, এমন পাকিস্তান দিয়ো চীনের সঙ্গে যুদ্ধ যখন বাধবে, তখন তারা যদি একটি বোমা ফেলে দিয়ে যায় জলের বড় ট্যাঙ্কটার ওপর, তখন কি হবে একবার ভেবে ভাখো। কলকাতার লোকগুলো সব জলের অভাবে হাহাকার করবে। এর একটা ব্যবস্থা এখন থেকে করে রাখা উচিত।

শেষের কথাটা সে এমনভাবে বললে, মনে হলো যেন ব্যবস্থাটা তাকেই করতে হবে।

তা হলুক, কিন্তু কথাটা সে মিথ্যা বলেনি। সত্যিই ভাববার কথা। যে বুড়ো শীতলবাবু তাকে বাসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনিও জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তা কি ব্যবস্থা করতে হবে তুমি?

এদিক দিয়ে কথাটা তিনি এতক্ষণ ভাবেননি বোধহয়।

হরিচরণ বললে, কলকাতা সহরের প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ছোট বড় ব্যবসায়ীদের ট্রিটমেন্ট তৈরি করিয়ে রাখতে হবে। বড় বড় ব্যবসায়ী বাড়ী যারা তৈরি করবেন ট্রিটমেন্ট না থাকলে সে বাড়ীর প্ল্যানই স্যাংসান্ হবে না।

শীতলবাবু বললেন, আগামী যুদ্ধের সময় একবার তো অনেক ট্রিটমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল সেগুলো গেল কোথায়? সব তো নষ্ট হয়ে গেছে।

হরিচরণ বললে, নষ্ট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। পাড়ার ছেলেদের নিয়ে এক একটি ব্রতকমিটি তৈরি করতে হবে। ট্রিটমেন্টগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকবে তাদের ওপর। খারাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সারিয়ে নেবার ব্যবস্থা থাকবে।

শীতলবাবু বললেন, বলে তো দিলি, কিন্তু টাকাটা আসবে কোত্থেকে? কন্ট্রোলেশন তো বলেই বসে আছে—টাকা নেই।

হরিচরণ বললে, প্রত্যেকটি বাড়ীর মালিক যদি মাত্র একটি করে টাকা দেয় তাহলেই টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বিভাবরী আবার প্রতিবাদ করলেন, এই একটি ব্যাপারে হরিচরণ তাঁকে দিতে চাইবে না।

হরিচরণ বললে— নিজেদের মরণ যদি চাও, ভবিষ্যতের কথা যদি ভাবো তো দিতে হবে। যতো এই পাইপের ফুটো একদিনে যদি সারানো না যায়, একদিনের আগুনায় যদি তিনদিন লাগে, তাহ'লে কি হবে? ঘুমের কথা বোলার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আজ এক আগুনায় ফুটো বেরোয়, কাল যদি দশ আগুনায় হয়? তখন কে সারাবে এই জলের ফুটিক? আর কেমন করেই বা সারাবে?

হরিচরণ থামলো। আমি কিন্তু থামতে পারলাম না।

হরিচরণ ঠিকই বলেছে।

কলকাতার মত বড় বড় শহরে মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় পরিষ্কৃত পানীয়জল যেখানে মানুষের নানারকম দুষ্কৃতী হাতে পায়িয়ে দেবার চেষ্টা করে সেই সব শহরে এই পানীয় জলের সহজলভ্যতা একটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। একটি দিনের এই অভাবনীয় দুর্ঘটনার দৃষ্টান্তে এখন থেকে আমরা যদি সতর্ক না হই, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুর্দিনে (ভগবান না করুন) আমাদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকবে না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাববার কথা

বহুমুখব্যাপী সংগ্রাম, নিগ্রহভোগ, অপরিসীম ত্যাগ, কৃচ্ছসাধন, সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ও নিষ্পেষণ ভোগের পর দেশ স্বাধীন হল। দেখতে দেখতে বিশ বছর কেটেও গেল। কিন্তু এই বিশ বছরের কোনদিনই আমরা স্বাধীনতার অমৃত আস্বাদ পেলাম না। বরং পরাধীনতার গ্লানি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে, আমাদের জর্জরিত করে চলেছে।

শাসন ব্যবস্থা যাদের সুখ সুবিধার জন্য, দেশ বলতে যাদের বোঝায়—সেই কোটি কোটি দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে আমরা সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমরা তাদের বরাবর দূরে সরিয়ে রেখেছি। যদিও একদিন গান্ধীজী বলেছিলেন, Go back to the villages and meet the masses. গণতন্ত্রের মূল কথাই আমরা বিস্মৃত হয়েছি। জনগণের সরকার একথা ভুলে গিয়ে আমরা দলীয় সরকার তৈরী করেছি। এবং নিজের দল, আত্মীয়-স্বজন আর মোসাহেবের দল নিয়ে আমরা রাজ্য শাসন করতে গিয়ে দুঃশাসনে পরিণত হয়েছি।

জনসাধারণের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা না করে আমরা বড় বড় পরিকল্পনায় দেশের সর্বস্ব এমনকি বিদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ধার করে এনে খরচ করছি। ফল যা হয়েছে আমরা সকলেই দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। চারিদিকে আজ হাহাকার। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই, নেই আর নেই! দিনের পর দিন নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিচ্ছে, কিন্তু একটিরও সমাধান হচ্ছে না।

আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে, অতীতকালের দেশকে যখন স্মরণকরি তখন দেখতে পাই এই দেশে কোনদিন কেউ অভুক্ত থাকবে এ কথা কল্পনাও সেদিন কেউ করতে পারত না। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য এই দেশের প্রতিটি গৃহস্থের দ্বার থাকতো উন্মুক্ত। না খাইয়ে কেউ ছাড়ত না—আর আজ! আজ জীবনের মূল্যবোধ লোপ পেয়েছে, মনুষ্যত্বের আদর্শ লোপ পেয়েছে। সর্বদিক থেকে দেউলে হয়ে আমরা আজ বিদেশীদের অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছি এবং বিদেশীদের পরম অনুকম্পায় কোনক্রমে দেশের অস্তিত্ব বজায় রেখেছি। দেশের যুব সম্প্রদায় আজ বিকৃতরুচি বিকৃত জীবন যাত্রার মোহে অন্ধ হয়েছে। তাদের সামনে কোন উচ্চ আদর্শ নেই—কোন আকাঙ্খা নেই—কোন নীতি কোন ধর্মের বালাই নেই। আমাদের দেশের প্রতি—দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা নেই। নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থ আর আত্ম-প্রবঞ্চনাকেই আজ আমরা একমাত্র কাম্য বলে মনে করেছি।

দেশের বর্তমান অবস্থায় সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে দেশের মানুষকে নূতন চেতনায় জাগ্রত করা। মনুষ্যত্বের পথে ফিরিয়ে আনা। আজ সর্বাগ্রে যে পরিকল্পনা ও আন্দোলনের প্রয়োজন তা হচ্ছে দেশহিতব্রতের আন্দোলন।

আমাদের দেশে আজও স্বার্থত্যাগী দেশ প্রেমিক মানুষের অভাব নেই। কিন্তু শাসক শ্রেণীর সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক যুক্ত। তাঁরা সত্যিই দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালবাসেন এবং দেশের মঙ্গল সর্বান্তকরণে চান। কিন্তু তাঁরা হৈ চৈ-এর মধ্যে নেই। প্রসাধনের প্রলোভন তাঁদের প্রলুব্ধ করতে পারে না। তাঁদের অনেকেই আজ অবসর-জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও মনীষা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সম্প্রদায়কেই আমরা আজ দেশের কাজে লাগাতে পারি। শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ কল্যাণ, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য সমস্যা, চিকিৎসা, সুশাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি শাসন যন্ত্রের প্রতিটি বিভাগকেই তাঁরা তাঁদের সারাজীবনের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের দ্বারা উন্নত ও পরিপুষ্ট করতে পারেন এবং ঠিক পথে চালিত করে দেশের এই মহাসঙ্কট মুহূর্তে দেশের মহাকল্যাণ সাধন করতে পারেন। কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে দেশের প্রতিটি প্রদেশে শাসকগোষ্ঠী যদি এই সব মনীষীদের নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন এবং তাঁদের সঙ্গে সর্বদাই পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহলে শুধু দেশের সর্ববিষয়ে সুব্যবস্থা ও সুব্যবস্থা হবে তা নয়, দেশের লোকের কাছে তাঁরা আত্মীয়জন হবেন। এই ব্যবস্থা চালু হলে দেশের মহামঙ্গল সাধিত হবে, শাসনব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হবে। দেশের লোকের সঙ্গে শাসকদের যোগসূত্র আরোও ঘনিষ্ঠ হবে।

দেশের নৈতিক চরিত্রকে পুনরুজ্জীবিত করাই আজ সবচেয়ে বড় কাজ। দেশের মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব হারায় তাহলে কোনো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই কাজে লাগবে না।

একদিন এই দেশের নেতারা স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে সারা দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করেছেন। তাঁদের ডাকে সেদিন আসমুদ্র হিমাচলের প্রতিটি মানুষ সাড়া দিয়েছিল, এমনিই ছিল নেতাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জনত্ব ত্যাগ স্বীকার। তেমনি করে আজ আবার দেশ নায়কবৃন্দ সকল মতভেদ ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসুন দেশকে কলুষ মুক্ত করতে। দেশের মানুষকে মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে তাঁদের কণ্ঠ উদ্দীপ্ত হোক! আজকের দেশের এই মহাদুর্দিনে, সেই হবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজ, তার চাইতে বড় কাজ আজ আর কিছুই হতে পারে না। দেশের মানুষ মনুষ্যত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ যদি হয় তাহলে যে কোন সমস্যা, যে কোন সংকট, যে কোন বাধা, কোথায় দূর হয়ে যাবে!

———

দুর্গত মহানগরী

একদিকে.....

জঞ্জাল
জল নেই
চাল নেই
ঘেরাও
মিছিল

অন্যদিকে.....

সিনেমায় লাইন
নৃত্য, উৎসব
সংস্কৃতি, মেলা

আমরা বেশ আছি ॥

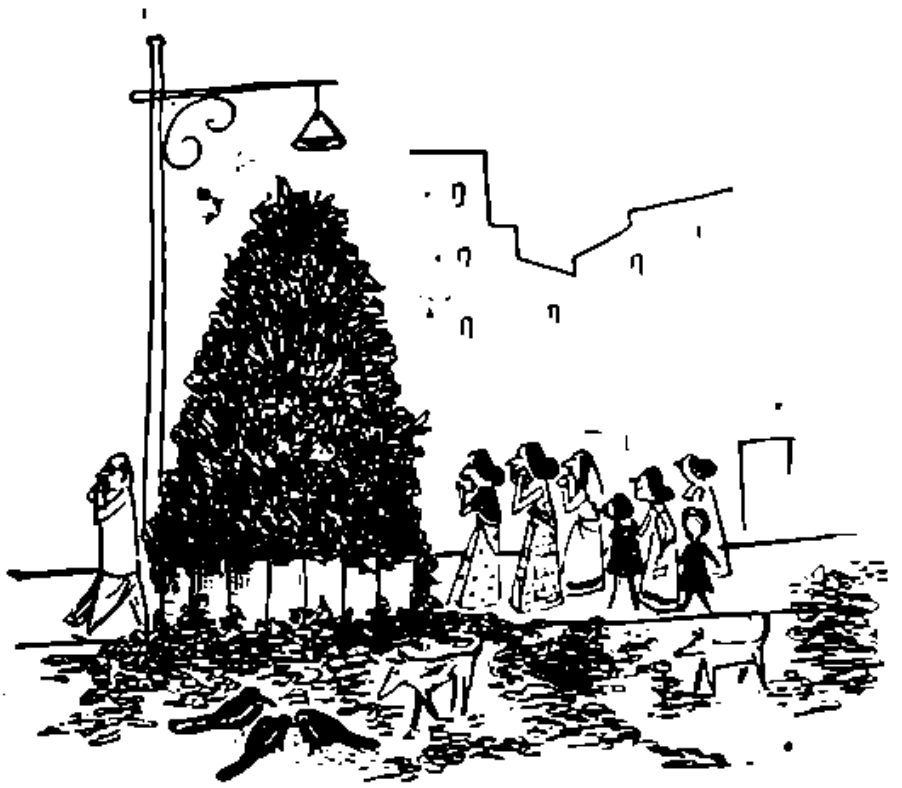

মিষ্টান্ন ভান্ডার

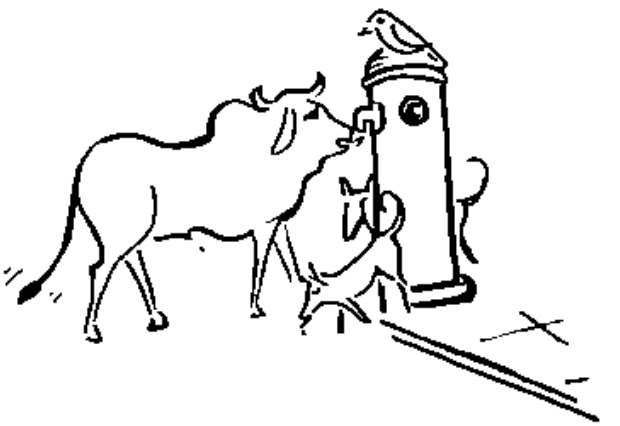

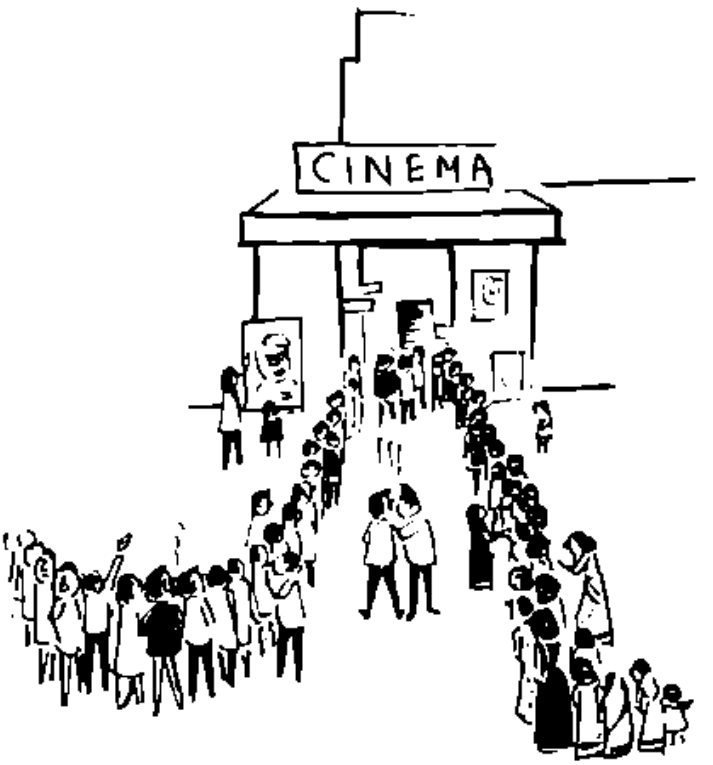
CINEMA

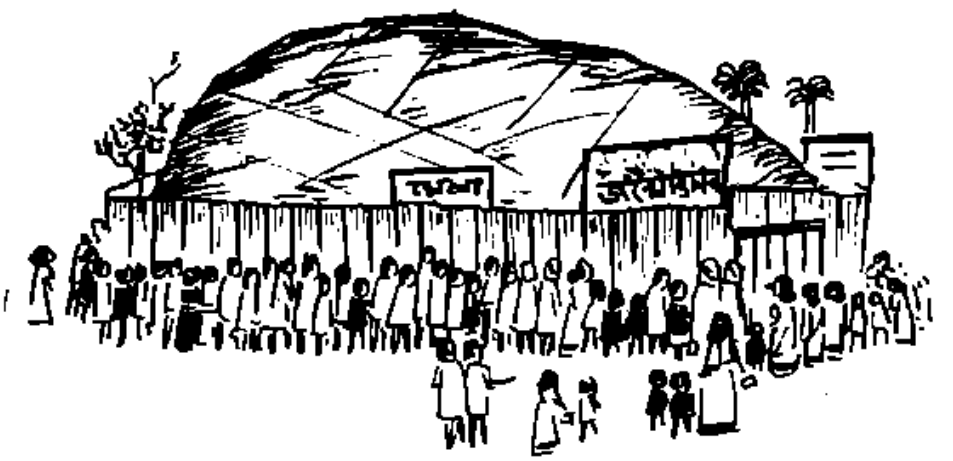

উৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বছরে বছরে তাঁকে নিয়ে, তাঁর নাম ভাঙিয়ে যে অসংখ্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাদের মধ্যে আন্তরিকতা বা শ্রদ্ধার চেয়ে হুজুগের মনোভাবটাই যেন প্রধান ব'লে মনে হয়। তাদের মধ্যে আবার দলাদলিও আছে। এতদিন যা হয়নি, এবছর তাও হল, রবীন্দ্রনাথকে দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে টেনে নামানো হল। উৎসবের আসল রূপটি কী রকম হওয়া উচিৎ, উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য কি, সে সম্পর্কে কবিগুরুর নিজের একটি বিশেষ অভিমত এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। —সম্পাদক : গ: তা:।

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলে থাকি, উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করবার দিন—এই জন্যে উৎসবের মধ্যে চাই মিলন। মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা।...

কিন্তু হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ ক'রে আনছি। একদিন যা বিনয়নম্রতায় মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, আজ তা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হয়েছে। আজ আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনী মানী ছাড়া মঙ্গল-কর্মের দিনে আমাদের উৎসব ক্ষেত্রে আর কারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানব সাধারণকে দূর করে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র করে, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্র প্রকাশ হোতে বঞ্চিত ক'রে বড়ো হলাম ব'লে কল্পনা করি। আজ আমাদের আয়োজন ও আড়ম্বর প্রয়োজনাতীত, বিচিত্রতর—কিন্তু অন্তর আমাদের শুষ্কতা, হীনতা, নির্লজ্জতায় পরিপূর্ণ। আমরা কেবল নিজেকেই দেখছি, নিজের সোনা-রূপোর চাকচিক্য দেখাচ্ছি, নিজের নাম শুনছি ও শোনাচ্ছি।

যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হোতে যে সকল অভয়বাণী অমৃতবাণী উৎসারিত হয়েছে তা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খ নির্ঘোষের মতো আজ না শুনতে পাই, শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার রাগবিস্তার, তবে সমস্তই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

দূর করো, দূর করো এই সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদি চূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে আজ আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও। সেখানে সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হোতে দীক্ষা নেব প্রভু—

দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অঙ্গে দীক্ষা দেহো
হে গুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধরিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নরধীর বেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

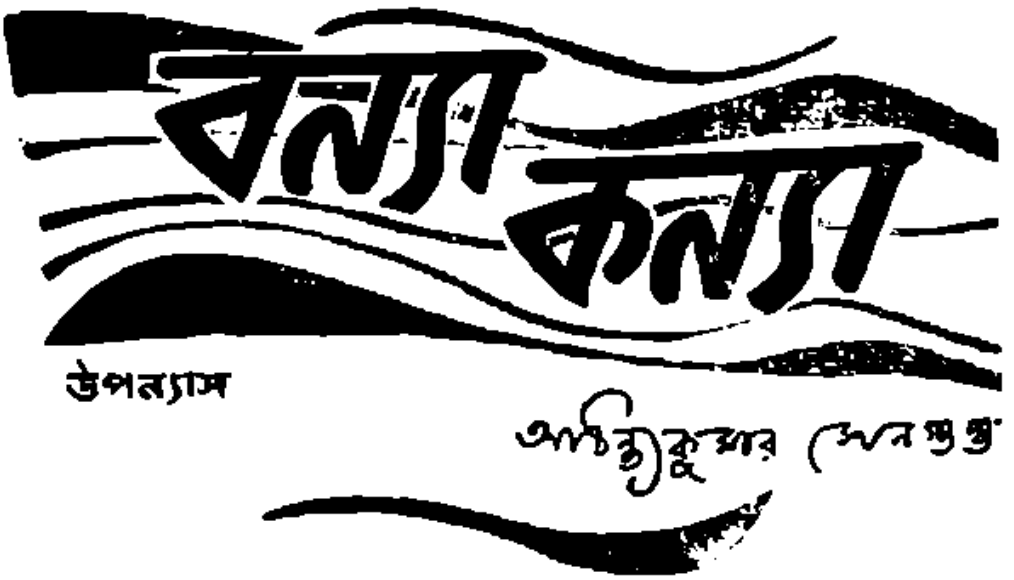

উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[পূর্বকথা : সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও বা ভাবে জার্নালিস্ট হই যেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই হৃদয়-মহরম করে। সুধীর নামে এক আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে সরিৎকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুধীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু ঘোষ নামে এক কৃতী এঞ্জিনিয়র ঠিক করেছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কিন্তু তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে? সন্দীপ না সুধীর? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকেই বরণ করবে? হিমাংশুর বন্ধু আর মুকুন্দ দেবজ্যোতি তৌমিক, যে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম?]

৭

টি-পার্টিতে বনছায়া রাজি হয়েছে—সরসিজ বিস্মিত হলেন। মেয়েরা তো বস্তুতন্ত্র উন্নসিত—সম্পর্কের আগে একটা রাঘব বোয়ালকে গাঁথতে পারবে। বৌদিদিরা শুধু মুখ টিপে হাসল, যে হাসির অর্থ—সেই খেতাই তো মাচলে বাসু, তবে আসরে নেমে ঘোমটা টানা কেন?

সরসিজ জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কাকে বলব?'

'আর কাকে বলবে!' বনছায়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'যে চা খেতে উৎসুক তবু তাকেই বলবে।'

সরসিজ কুণ্ঠিত মুখে বললেন, 'হিমাংশু তার এক বন্ধুর কথা বলছিল।'

'বন্ধু—বন্ধু এখানে এসে কী করবে?' বনছায়া আবার বলতে উঠল: 'এ কি শ্বশুর বাড়িতে দল বেঁধে মেয়ে দেখতে আসা নাকি?'

দু'দারা—কৌশিক আর গৌতম—বনছায়ার পক্ষ নিল। হিমাংশুর টি-পার্টিতে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে বনছায়ার সঙ্গে একটু মুখোমুখি আলাপের জন্য, একটি পূর্বরাগের পরিচ্ছেদ রচনার জন্যে। একটি সুন্দর বিভূতি না হলে তা হয় কী করে? বাড়তি দুটো আগন্তুক অতিথির আবদারে হলে সে বিভূতি তৈরি হতে পারে না।

'ও মিস্টার কৌশিকের কথা বলছিল।' সরসিজ মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'কে মিস্টার কৌশিক?' বনছায়া ভুরু কুঁচকোলো।

'তোর অফিসের যে বস্—দেবজ্যোতি—'

'তিনি ঐ ভদ্রলোকের বন্ধু হন কী করে?' বনছায়া প্রায় চমকে উঠল: 'ওঁর বয়েস তো অনেক বেশি।'

'ব্যবসার সম্পর্কে বন্ধু হয়তো।' সরসিজ সাফাই দিতে চাইলেন: 'বন্ধুত্বে কোনো বয়সের দরকার হয় না। কে জানে কোনো আত্মীয়তাও থাকতে পারে।'

'না, না, মিস্টার কৌশিককে নেমন্তন্ন করা হবে না। ওঁর এখানে কাজ কী? তিনি কেন আসবেন? এ শুধু আমাকে—'

কথাটা বনছায়া শেষ করল না বটে কিন্তু বাবারা সহজেই বুঝে নিল। এ শুধু বনছায়াকে বিব্রত করা, বিড়ম্বিত করা।

তার চেয়েও বেশি। সেটা বনছায়ার ধারণা—এতে করে তার উপরে একটা চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা। যেন দেবজ্যোতিকে যুক্তি করে নিয়ে এলেই বনছায়া হিমাংশুকে একবাক্যে বরণ করে নেবে। নিজের আলোতে জোর নেই, দেবজ্যোতিকে ডাকা।

'তবে থাক। কিন্তু ওটা হিমাংশুরই সাজেশন্। বলছিল, একেবারে একা আসবে!' সরসিজের খুঁতখুঁতুনি তবু যেতে চায় না।

'একা আসাই তো ভালো।' বউয়েরাও স্বামীদের অনুসরণ করলে: 'কৌশিক এলে ঠাকুরঝি কাঠ হয়ে থাকবে, মোটেই মুখ ফোটাতে পারবে না।'

এর পরে আর কথা নেই। হিমাংশু একাই এল চা খেতে।

'এই আমার মেয়ে বনছায়া।' সরসিজ এগিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলেন।

এ আর হিমাংশুকে বলে দিতে হবে না। তবু নিষ্পলকে বনছায়ার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। এই বনছায়া।

বনছায়াই স্মিতমুখে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নমস্কার করলে।

হিমাংশু এত অভিভূত যে নমস্কার ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেল। নমস্কারের দরকার কী। ঐ হাতদুখানি তো আর পদ্মকুঁড়ির মত কপালের উপর থাকছে না, শত শত পুষ্পমাল্য হয়ে নিটোল মালার মত তার গলায় এসে দুলছে। তবে ও সব মামুলি সৌজন্য ভঙ্গির বাজেখরচ মাত্র।

'ওহ গড!' হিমাংশু ভয় পেয়ে পিছু হটার ভঙ্গি করল: 'এ যে দারুণ আয়োজন করেছেন!

কর্ত্রী বলতে বড় বউ মলয়া ছিল, তার ডেপুটি বলতে ছোট বউ শাশ্বতী ছিল, স্বয়ং সরসিজ ছিলেন, কৌশিক আর সৌভদ—দাদারা ছিল, বনছায়া সবাইকে ঠেলে সরিয়ে আগবাড়িয়ে বললে, 'তা আপনার যতটুকু খুশি ততটুকুই নেবেন।' শুধু বললে না, চোখে খিলিক দিয়ে একটু হাসলও।

তার অর্থ বনছায়া সকলের পিছে পড়ে থাকা নীরবে লাজ দেয়া আশাংহারের দলে নয়, সে এগিয়ে আসার চেঁচিয়ে বলার দলে। এক কথায় সে নিজের কথাটা স্পষ্ট করে বলতে পারে, আগে ভাগেই বলতে পারে, দাঁড়াতে পারে নিজের মেরুদণ্ডে। অন্যের কাছ থেকে ঘরিয়ে-মেরার জন্যে প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়ার হাসির আলোতে বনছায়াকে আবার আরেক রকম করে দেখল হিমাংশু। তারও মুখে আরেক রকম হাসি ফুটল। বললে, 'খুশি তো অনেক কিছু কমতাই লাগছে।'

বইয়ের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছেন সরসিজ, সমস্তই একটা ঘরোয়া পরিবেশের মেজাজ নিয়েছে। তাই মলয়া সরল হাসিমুখে বললে, 'এ যে আপনি প্রায় কবির মত কথা বললেন।'

'ওরে বাবা, সে আবার কী জিনিস!' হিমাংশু আবার একটা আতঙ্কের ভঙ্গি করল।

'হ্যাঁ, কবিরাই তো অমনি করে বলে'—মলয়া বললে, 'যত সাধ আছে তত সাধ্য নেই, যত আশা আছে তত ভাষা নেই—'

'রক্ষে করুন,' ভূমন্ত লোক যেমন হাত তোলে হিমাংশু তেমনি হাত তুলল: 'আমাদের সাত গুষ্টিতে কেউ কবি-টবি নেই। আমরা জাত-ব্যবসায়ী। তা ধান-চালই বলুন বা বস্ত্রপাতিই বলুন—'

'কিন্তু এবার আপনি ঠিক কবি হয়ে উঠবেন।' এবার শাশ্বতী মুখ খুলল। বললে আরো একটু মিষ্টি মিশিয়ে: 'ঠিক ছোঁয়াচ লাগবে।'

'ছোঁয়াচ লাগবে?' হিমাংশুর কাছে সেও একটা আতঙ্কের বস্তু, সে ধড়ফড় করে উঠে বললে, 'না, না, আমাকে কেন লাগবে? কোত্থেকে লাগবে?'

'বা, আমাদের ঠাকুরঝি যে কবি।' শাশ্বতী প্রাণপণ শক্তিতে মুখে গাম্ভীর্য আনল।

'আমি মোটেই কবি নই।' প্রতিবাদ করে উঠল বনছায়া 'আমি—' কথাটা শেষ করল না। কী হবে নিজের পরিচয় দিয়ে? সমস্ত কিছু প্রচ্ছন্ন করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শাশ্বতী তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিল। বললে, 'ও হ্যাঁ, ঠাকুরঝি কবির চেয়েও বেশি, ঠাকুরঝি সাহিত্যিক।'

'তার মানে, গল্প লেখেন?' হিমাংশু সন্ত্রস্ত চোখেই তাকাল। যখন সেটা বনছায়ার কীর্তি তখন সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের গুণ, সেই অর্থে নিশ্চয়ই সম্মানার্হ।

'না, না, ওসব কিছু নয়—' বনছায়া এক কথায় সমস্ত ক্ষুব্ধ করে দিতে চাইল: 'কাজকর্ম না থাকলে অনেকেই ওরকম হিজিবিজি কাটে।'

'বিশেষত মেয়েরা।' পরিবেশ আরো তরল হয়ে এসেছে বলে কৌশিক বলতে সাহস পেল: 'বিশেষ করে বিয়ের আগে।'

কথাটা সরসিজকে যুৎসই লাগল। তিনি নিজে অবশ্য বনছায়ার সাহিত্যচর্চার কোনো মূল্য দেন না, দেননিও কোনোদিন, তাই বলে তার সমস্ত উদ্যমকে একেবারে হেয় করে দিতে তাঁর কষ্ট হল।

কণ্ঠস্বরে তাই ভিন্নি মমতা এনে বললেন, 'না না বনছায়ার লেখাকে একেবারে ক্রিটিসিং বলা যায় না। কত ম্যাগাজিনে ওর গল্প বেরিয়েছে—'

'সত্যি?' যেন গল্প কত বোঝে, কত পড়েছে, এমনি ভাবের থেকে উল্লাস করে উঠল হিমাংশু।

'একটা উপন্যাসও লিখেছে।' যেন সেই মামুলি মেয়ে-দেখানো সভায় মেয়ের গুণপনার 'রিপিটি হেওড' হচ্ছে এমনি ভাবের থেকে বললে মলয়া।

হাঁ, গুণপনা বৈকি। খবর শুনে হিমাংশু আরো উত্তেজিত হল। 'বলেন কী! উপন্যাস! বই হয়ে বেরিয়েছে? নাম কী?' শেলে যেন এখুনি এক কপি কিনে নেয় হিমাংশু।

'বই হয়ে এখনো বেরোয়নি।' মলয়া অপরাধীর মত বললে।

'তবে কোনো ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে? কোন ম্যাগাজিন?' শেলে যেন হিমাংশু এখুনি সেই ম্যাগাজিনের গ্রাহক হয়ে যায়, সমস্ত ব্যাক-ইস্যু কিনে নেয় একসঙ্গে।

'এখনো বেরোয়নি কোথাও।' অপরাধ ভার করে নিল শাশ্বতী। বললে, 'এখনো খাতায় রয়েছে।'

'কই দেখি খাতাটা।' বনছায়ার কাছেই হাত পাতল হিমাংশু।

এ যেন আরো কিছু দেখতে চাইছে এমনি সেই আকাঙ্ক্ষার স্পর্ধা। একটা আগন্তুক চোখের সামনে তার নিভৃতি দিয়ে লালিত তার স্বপ্ন দিয়ে আবৃত অক্ষত খাতাটা মেলে ধরবার প্রস্তাবটাও বনছায়ার কাছে অসহ্য লাগল। কিন্তু রূঢ় সে হবে না, কিছুতেই না, তাই মুখে সাধ্যসজ্জার আভা ফুটিয়ে বললে, 'এখনো শেষ হয় নি।'

'এখনো সমস্তই খাতা।' তার মানে সমস্তই ব্যর্থ চেষ্টা, এই ভাবের থেকে বললে কৌশিক।

'তার মানে এখনো কোনো বই ছাপা হয়নি?' সান্ত্বনিবে অর্থেই বললে হিমাংশু।

'বই ছাপা হবে তো বিয়ের পর।' ছোড়দা গৌতম কথাটার মধ্যে একটা অন্য অর্থ নিয়ে এল। বললে, 'কুমারী খাতা বিয়ের পরেই তো মুদ্রিত বই হয়ে উঠবে।'

এ কথাটাও হিমাংশু তার প্রাথিত ব্যাখ্যার মধ্যে ধরে রাখল। আনন্দিত সমর্থনে বললে, 'বিয়ের পর আমি আপনার সমস্ত বই ছেপে দেব।'

চমৎকার! আর তবে কথা কী। সরসিজ তৃপ্তিতে ভরে উঠলেন। বললেন, 'ধনির ভয় ছিল, শ্বশুরবাড়িতে ওর সাহিত্যচর্চা না প্রশ্রয় পায়।'

'শ্বশুরবাড়ি! শ্বশুরবাড়ি কোথায়?' এটাও খুব একটা গর্বের ব্যাপার এমনি ভাবের থেকে হিমাংশু বললে, 'আমি থাকব আমার নিজের ফ্ল্যাটে। মা-বাবা আলাদা।'

'তবে তো আর কথাই নেই।' সরসিজ ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। বললেন, 'স্বয়ং স্বামী যখন পক্ষে আছে তখন তো সোনায় সোহাগা।'

'পক্ষে থাকব না কেন?' হিমাংশু খোলা গলায় হেসে উঠল; 'লেখাটা একটা ভালো 'হবি'। প্রত্যেকেরই একটা না একটা 'হবি' থাকা উচিত।'

'আপনার কী হবি?' আর থাকতে পারলনা বনছায়া, মুখের উপর জিজ্ঞেস করে বসল। পরেই আবার সন্ত্রস্ত হল কথাটা রূঢ় হয়ে গেল বুঝি, সেই মুহূর্তেই আবার কোমল হাসির প্রলেপ বুলিয়ে বললে, 'গার্ডেনিং বা ফোটোগ্রাফি, বা—'

বনছায়ার দিকে চেয়ে ছোট্ট করে হাসল হিমাংশু। বললে, 'সে তুমি জানতে পারে—'

যেন মন হতে মনস্তর, মনন্তর হতে মনিষ্ট হলেই সেটা জানা যায়। সেটা বুঝি সকলের সামনে চেঁচিয়ে বলবার মত নয়।

'সেটা হচ্ছে বউয়ের বই ছাপানো।' ছোড়দা সৌভিক বললে।

সবাই হেসে উঠল।

'খুব এক্সপেনসিভ্ হবি।' বললে কৌশিক।

'বড়লোকের বউ অমনি এক্সপেনসিভ্ই হয়ে থাকে।' মনয়া কথাটাকে বাঁচিয়ে দিল।

'শুধু এক্সপেনস দেখছেন কেন, ডিগনিটিটাও দেখুন।' কথাটাকে হিমাংশু একেবারে মাথায় তুলে নিল: 'শুধু বড়লোকের বউ নয়, লেখিকা বউ।'

'শুধু লেখিকা নয়, রূপসী লেখিকা।' শাশ্বতী মিষ্টি করে টিপ্পনী কেটে বসল।

সবাই আনন্দ করে উঠল। সমস্তও খুশি হয়ে তাকালেন চারদিকে। দেয়ালে টাঙানো মৃতা স্ত্রীর প্রতিচ্ছবিতেও একবার চোখ পড়ল।

কথাটা হচ্ছে বড়লোকের বউ নয়, কথাটা হচ্ছে যত লেখিকা, স্বামীর পয়সায় বই ছাপানো নয়, পাঠকের পয়সায় বই ছাপানো—বনছায়ার ইচ্ছা হচ্ছিল এমনি একটা রূঢ় উক্তি করে রসভঙ্গ করে দেয়, কিন্তু, না, একটু ধৈর্য ধরে দেখে যেতে হবে তার অভিসন্ধিটা সিদ্ধ হয় কিনা, যদি হয় তবে হিহিহিহি আগে থেকেই অশান্তিকে ডেকে আনা কেন?'

তারপর খাওয়াদাওয়া সুরু হল আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে মুখোমুখি বসা বনছায়াকে বারে-বারে দেখতে লাগল হিমাংশু, এও নাজানি কী উপাদেয় খাদ্য হয়ে উঠবে।

এতক্ষণ সাহিত্যের এলেকায় ছিল, সমস্ত কিছুই যেন অবাস্তব হয়ে ছিল, বনছায়াও বুঝি ছিল খানিকটা ধোঁয়াটে স্বপ্নের মত, যেন সবটা রক্তমাংসের মানুষ নয়, খানিকটা বুঝি বা পরীর রাজ্যের মেয়ে আর এখন এই খাদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অনেক স্থূল অনেক মাংসল, অনেক লোভনীয় বলে মনে হল। তাছাড়া যা অধিকারিত, যা বিধীকৃত, তার জন্যে আর অপেক্ষা করে লাভ কী? বনছায়াকে এখুনি তার জোটরে করে খানিক বেড়িয়ে একেবারে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলতেই তো চুকে যায়।

সেই তাদের গৃহপ্রবেশের উৎসবের দিনে বনছায়াকে যেন এত স্পৃহণীয় মনে হয়নি। কী করে হবে? সেদিন সে দেখেছিল একটা অনিশ্চয়ের সুদূর থেকে। হয় কি না হয় পাই কি না পাই এমনি একটা কুয়াশার ভিতর দিয়ে। তা ছাড়া তারও মনে সেদিন অহংকার ছিল বনছায়া একটা পাবার মতন পদার্থ কিনা। সে অহংকার সে বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। দেখেছে আর দেখার পরেই ভেবেছে বনছায়াকে তার চাই, বনছায়াকে না পেলে তার চলবে না, আর পাবার পথটাও কী সুন্দর প্রশস্ত—একেবারে রাজপথ—পাবে তাকে সমাজবিহিত বিবাহের মধ্য দিয়ে। সম্মানে শ্রদ্ধায় উন্নতশ্রীতে। এর চেয়ে পূর্ণতর যথার্থতর পাওয়া আর কী আছে সংসারে?

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বনছায়া কি তাকে চায়?

বাস্তুনি মর্যাদার বিচারে সে হয়তো পাওকেয়েরই একজন, কিন্তু কে জানে সে বনছায়ার সমস্ত বাসনার পরিপূরক কিনা। কে জানে বনছায়ার মন হয়তো অন্যত্র নিবিষ্ট আছে, সেখান থেকে তাকে বিচলিত করবার মত ক্ষমতা তার নাও থাকতে পারে—কখনো কখনো একটা বাজে প্রেমও

রাজারাজড়ার ঐশ্বর্যের চেয়েও বড় মনে হয়। সুতরাং তার ইচ্ছা দিয়েই যখন সুখন চলছে না তখন চুপচাপ ধৈর্য ধরেই বসে ছিল হিমাংশু আর এদিক-ওদিক খুঁজে দেখছিল বনছায়ার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারে এমন একটা দ্বিতীয় কাউকে পায় কিনা। অনেক অনেক আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মনের ছায়াটি ঠিক না পড়লে বনছায়ার কাছাকাছি বলে তাকে ভাবা যায় কী করে?

প্রতীক্ষাও প্রায় একটা অভ্যাসের মতন দাঁড়িয়ে যায়, হয়তো এক্ষেত্রেও তাই হত, কিন্তু সমলিক বাবুর চায়ের নেমন্তন্ন সব গোলমাল করে দিল। নেমন্তন্ন যখন তাঁর বাড়িতে পারিবারিক পরিবেশে, তখন সন্দেহ নেই, বনছায়ার সম্মতিতেই এই নিমন্ত্রণ। ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারেই দেবজ্যোতির সঙ্গে তার আনাগোনা, তখন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই ঘোষদের বিষয়টা সুসাধ্য হবে, কিন্তু না, বনছায়াই বলে দিয়েছে, ছিঁড় বাড়িয়ে লাভ নেই। একা হিমাংশুই যখন বর তখন একাই সে বরণীয় হোক।

তবে আর দ্বিধা নেই। সন্দেহের বাষ্পটুকুও উড়ে গিয়েছে। এখন সব স্পষ্ট, স্থির, স্বচ্ছ। সমস্ত অবধারিত।

বেশে-বাসে শোভায়-সজ্জায় সাজে-হাসে বনছায়া স্পষ্ট জানান দিচ্ছে সে হিমাংশুর জন্যেই বলিপ্রদত্ত। তবে তাকে এখন একটু সেই নিবিড় চোখে দেখলে দোষ কী।

কী নিদারুণ আশ্চর্য লাগছে, কত সহজেই বনছায়াকে সে পেয়ে যাচ্ছে, প্রত্যক্ষে কোনো মূল্য না দিয়েই। কোন পূর্বজন্মে বড়লোক বাপের ঘরে জন্মেছিল, সুযোগসুবিধে পেয়ে পড়াশোনায় ভালো ফল করেছিল, বিলেতে গিয়েও উঁচু ডিগ্রি নিতে আটকায়নি, পরে নিজেই কেমন অমলঘাট কার্ম খুলে বসেছে। তার পক্ষে অভিজাত বংশের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনাটা কিছু কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সে মেয়ে বনছায়া হবে এ বুঝি ভাবনাতীত। সব কিছু হয়েও যেন বনছায়া আরো একটু কিছু—সে বুঝি একমাত্র সে-ই। সে বুঝি অবধারিত হয়েও আবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

নির্ধারিত হয়েও আবার নিশ্চিন্ত।

তাই ধৈর্য না ধরে উপায় নেই। শুধু শরীরের উন্মোচন হলেই তো চলবেনা, মনেরও উন্মোচন চাই। আর তারই জন্যে প্রতীক্ষা। খাদ্য তো খাদ্যের নয় খাদ্য ক্ষুধার। ক্ষুধা তীব্র হলেই তো খাদ্য সুস্বাদু। প্রতীক্ষায় উদার না হলে প্রাপ্তি অমৃত হবে কী করে?

তাই তুমি যা চাও তাই আমি তোমাকে দেব। প্রভুত্ব বলো প্রতিষ্ঠা বলো, যা আমার সাধ্যের মধ্যে, দেব তোমাকে। সবচেয়ে বেটা বড় কথা—আত্মকুণ্ঠা দেব। তোমাকে সুখী করবার জন্যে কোনো ন্যায্য পথই নিষিদ্ধ করে রাখব না। তোমার সুখেই আমার ঘর উজ্জ্বল, কাজ উজ্জ্বল, আমি নিজে উজ্জ্বল।

সুখ এমনই জিনিস তা শুধু অন্যকে দিলেই ফিরে পাওয়া যায়, দ্বিগুণ করে ফিরে পাওয়া যায়। অমনি-অমনি চাইতে গেলে আসেনা, একার জন্যে আসে না। আরেকজনকে সুখী করলেই তবে সুখ।

'আমাদের কার্যের লেবার পলিসিটাও মোটামুটি এই নীতির উপর দাঁড় করিয়েছি।' বলছে হিমাংশু, 'শ্রমিকদের সুখী রাখতে পারলেই আমাদের উৎপাদন বেশি, মুনফা বেশি—'

'কিন্তু ওদের সুখের যে অন্ত পাওয়া যায়না।' কৌশিক টিপ্পনী কাটল।

'আমাদেরও লোভের অন্ত নেই। একটু দিলেই যেখানে অনেক পাওয়া যায় সেখানে আমরা সেই একটু দিতে চাইনা। কী বলেন, তাই নয়?' বনছায়ার দিকে তাকাল হিমাংশু।

'নিশ্চয়ই।' সম্পূর্ণ সায় দিল বনছায়া: 'একটু হাসি একটি মিষ্টিকথা একটু সময় ব্যবহার অনায়াসাধন করে দিতে পারে। কিন্তু সংসার এমন রুক্ষভূমি যে ঐ সহজ জিনিসগুলিই সহজে মেলেনা—'

'কিন্তু সংসারকে সরস করে তোলবার জন্যেই তো আমাদের আসা।'

শাশ্বতী মলয়ার কনুইয়ে একটা চিমটি কাটল: 'ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছে।'

তারপরেই আস্তে-আস্তে টেবিল পাতলা হয়ে গেল। আগে সরসিজ উঠে গেলেন। পরে কৌশিক-গৌতম। সঙ্গে-সঙ্গে মলয়া-শাশ্বতী।

তারপর দুটিতে একলা হলেই বনছায়া সুধীরের চাকরির কথাটা পাড়ল।

'আচ্ছা, আসি। বিদায় নেবার সময়ে বাড়ির সবাই আমায় অতো বলল। হিমাংশু তাকাল বনছায়ার দিকে: 'তুমি—আপনি কোথাও যেতেন কি?'

'চলুন না। একটু দরকার ছিল বাইরে।' বনছায়া প্রশান্ত মুখে বলল।

অপরিচিতের সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে বাড়ির কেউ আপত্তি করল না, বরং আশীর্বাদ করল।

'বেশ তো আসুন। আমি নামিয়ে দেব ঠিক জায়গায়।'

(ক্রমশঃ)

বন্দী-জীবনে সাহিত্য-সাধনা

শ্রীনগেন্দ্র কুমার গুহরায়

আমাদের রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে প্রথমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি 'রাষ্ট্রগুরু' ব'লে অভিহিত হয়ে আসছেন বিশ্বে ভারতে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আদালত অবমাননার। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁর সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় একটি মামলা সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করেছিলেন। তখন ওই ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত কাগজখানা ছিল সাপ্তাহিক। পরবর্তীকালে তা' রূপান্তরিত হয় দৈনিকে এবং সর্বভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে হৈ-চৈ প'ড়ে যায়। বাংলা ভাষায় অনেক বই বেরিয়েছিল ; আমাদের ছাত্র-জীবনে আমরা 'সুরেন্দ্র-কারাবাস' নামে একখানা পদ্যে লিখিত পুস্তিকা প'ড়েছি। রচয়িতা ছিলেন তৎকালীন অন্যতম জননেতা আইন-ব্যবসায়ী বোয়াখালী জেলার বর্তিষ্ণু গ্রাম নামচর নিবাসী প্রসন্ন রায়।

কারাবাস-কালে সুরেন্দ্রনাথ কোনো বই লিখেন নাই, কিন্তু তাঁর আত্মচরিত 'এ নেশন ইন্ মেকিং' গ্রন্থে ওই বিষয়ের বিশদ তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুরেন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার যোগেন্দ্র নাথ বসু স্বত্বাধিকারী এবং তৎসঙ্গে সম্পাদক ও প্রকাশককে সেই সময়ে প্রবর্তিত 'সহবাস সম্মতি' আইনের বিরুদ্ধে লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার হয়েছিল হাইকোর্টে। কিন্তু জুরীরা একমত হয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন নি ব'লে বিচারপতি কোন রায়াদেশ দেননি। তাঁদের অন্য আদেশ দানকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তৎকালে ওই আইন নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে ওই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে ১৯০৭ সালে বিদেশী সরকারের নির্যাতন-নীতির স্টীম্ রোলার যখন দলিত বাংলার বুকের উপর দিয়ে বেপরোয়া ভাবে চালানো হচ্ছিল আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য, তখন আমাদের নেতৃবর্গ—বিশেষ ক'রে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন চন্দ্র পাল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, ডাঃ সুন্দর চক্রবর্তী, রাজা সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিক, ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রভৃতি 'প্রেস্ এ্যাণ্ড প্ল্যাটফর্ম্'—সংবাদপত্র এবং বক্তৃতা মঞ্চের মাধ্যমে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড

কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদকে জোরদার ক'রে তুলেছিলেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স্ জোর ক'রে ভেঙে দেবার পর থেকে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রবহমান ধারা দুনিবার বেগে বয়ে যেতে লাগল দুটি পৃথক খাতে। একটি নিয়মতান্ত্রিক আইন-সম্মত পথে, আর অপরটি বিপ্লববাদের গোপন পথে, কিন্তু উদ্দাম বেগে।

এদিকে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য ছোট-বড় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আনা হল রাজদ্রোহের অভিযোগ, বক্রোক্তিও বাদ গেলেন না। নয়া প্রেস আইনের বিধান অনুসারে সহস্র সহস্র টাকার জামীন তলব করা হল প্রেসের মালীকদের কাছ থেকে। অরবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্র কুমার, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির পরিচালিত সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকা বন্ধ করতে পারল না সরকার কয়েক দফে নূতন প্রেস আইনে আদালত হাজার হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত ক'রেও। তখন কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নয়া কানুনের দ্বারা যত্নে বন্ধ ক'রে দেয় নিখিল সংবাদপত্রের ছাপাখানাগুলোকে। সাপ্তাহিক যুগান্তরকে বন্ধ করা হল প্রথমে। অতঃপর রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হল জাতীয়তাবাদী দলের (ন্যাশন্যালিস্ট পার্টির) মুখপত্র তৎকালের ভারত-বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ ও মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে। সাপ্তাহিক যুগান্তরে প্রকাশিত 'কাবলী ল্যাওয়াই' নামক একটি বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধে লিখিত হয়েছিল যে,—কাবুলীরা তাদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য যেমন লাঠীর সাহায্য নিয়ে থাকে, ভারতবাসীকেও ইংরেজের কবল থেকে মুক্তিলিপ্সু ভারত-মাতাকে মুক্ত করতে হলে সেই পন্থা অনুসরণ ক'রে চলতে হবে, নইলে কাজ হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে অভিযুক্ত করা হল সম্পাদক ব'লে, যদিও পত্রিকায় সম্পাদকের নাম মুদ্রিত ছিল না। কেননা তখন পর্যন্ত নয়া প্রেস আইন কার্যকরী ক'রে সম্পাদকের নাম প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক বা অবশ্য-করণীয় ('ম্যান্ডেটরি') ছিল না। সেজন্য ওই আদালতে সরকার পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ সমন দিয়ে আনা হল মনীষী-বাগ্মী সাংবাদিক জাতীয়তাবাদী দলের অন্যতম নেতা বিপিন চন্দ্র পালকে। তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলে তাঁকে আইনের বিধান মতে হলফ্ নিতে বলা হলে তিনি গম্ভীর স্বরে নির্ভীকতার সঙ্গে বললেন—I refuse to take oath অর্থাৎ আমি হলফ নিতে অস্বীকার করি। এই অস্বীকৃতির দ্বারা তিনি ইচ্ছাপূর্বক ফৌজদারি বিচারালয়ের অবমাননা (contempt of court) করেছেন ব'লে অভিযোগ আনা হল। কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতেই বিচার হল এবং তিনি ছয় মাস বিনা শ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ওই অভিযোগে উহাই চরম দণ্ড। তখন দেশের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিদেশী শাসকগণ সত্যি সত্যি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই কারণে জননায়ক বিপিন চন্দ্রকে পাঠানো হল বাংলার বাইরে একটি জেলে। তথায় তিনি নিঃসঙ্গ বন্দী-জীবন কাটালেন পড়াশুনা ক'রে ও লিখে এবং অন্যান্য সাধনার মধ্য দিয়ে। আমরা পেলাম তাঁর রচিত 'জেলের খাতা' বইখানা—যা বিবিধ বিষয়ক তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ। উচ্চ শ্রেণীর জটিল দার্শনিক তত্ত্বও মনীষী বিপিন চন্দ্রের লেখার গুণে সরল ও সহজ-বোধ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থখানাতে প্রবিষ্ট হয়েছে আটটি প্রবন্ধ :—

(১) সাকার ও নিরাকার, খ্রীষ্টীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব, (৩) অবতারবাদ ও সাকারবাদ, (৪) স্বয়ম্ভোপাসনা, লক্ষ্যুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা, (৫) প্রাণের কথা, (৬) নিজের কথা, (৭) জীবনের হিসাব-নিকাশ, (৮) আভাস ও আকাঙ্ক্ষা।

এই উপাদেয় ও মননশীলতাপূর্ণ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন মনীষী সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করছি: "অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু গত পনর বছর কাল তাঁহার হৃদয়ে ভাবের কেমন বিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি—এখনও করিতেছি। তাই তিনি জেল হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার 'জেলের খাতা' দেখিবার ভার যখন আমার উপর অর্পণ করেন, তখন আমি সুখ অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট-দোষে সময়াভাবে যেমন করিয়া দেখিয়া দিলে আমার মনোমত হইত, 'জেলের খাতা' আর তেমন করিয়া দেখিয়া দিতে পারি নাই। তবে ভরসা এই যে, সমাজে এখন অহরীর অভাব নাই, কাটছাট সমাজ্য ভাল হউক, আর মাই হউক, মাসিকের আদর অনেকেই করিবেন।

"আমি যাহা ভাল বুঝি ও ভাল দেখি তাহাকে ভাল না বলিয়া আমার সর্বস্ব—আমার ইহপরকাল যে অতি সুন্দর, অতি মনোহর, অনুপম—এই কথাটা এখন সমাজে প্রচার করিতে হইবে। যে হীনতা লাভ করিলে এমন কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হয়, এই পুস্তকে সেই দৈব হীনতার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি এক হিসাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমার সব ভাল—কলঙ্কও ভাল গৌরবও ভাল; আমার পাণ্ডিত্যের দাবদাহ ভাল, আমার অনন্ত অতীতের অপরিমেয় শ্লাঘাও ভাল। আর ভাল আমি এবং আমার দেবতা। শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল ধর্মের ও আত্ম-বিশ্লেষণের মন্দাকিনী-ধারায় এই কথাই স্বয়ং বুঝিয়াছেন, অন্যকে স্বয়ং বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন।"...

এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বিপিন চন্দ্র ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীজীর শিষ্য। আলোচ্য গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ হইতে কতক উদ্ধৃতি দিতেছি:

"হে গুরো! আজ তোমার চরণে বিশেষভাবে আমার এই জন্মভূমি মাতৃভূমির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। আজ তোমার বিধানে আমি বন্দী, দেশের ভাইয়েরা যখন মাতৃবন্দনা করিতেছেন, মায়ের দুঃখ শোক মোচনের পন্থা বিচার করিতেছেন, আমি তখন এখানে আবদ্ধ। বড় সাধ ছিল যে তাঁদের সঙ্গে যাইয়া আবার এ সকল আলোচনা করিব। তুমি অন্য বিধান করিলে। তোমার ইচ্ছারই জয় হইয়াছে—তাই হউক, তাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কখনও হইবে না। তবে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার চরণে দেশের কল্যাণ ভিক্ষা করিতেছে। প্রভো! কি পাপে বা কি কর্মদোষে যে এমন জগতকে এত হীন করিয়া রাখিয়াছ, তুমিই জান। দয়াল! আমাদের তাতে প্রাণে বাজে। এও তোমারই কৃপা। তুমি মুখ ফিরাইতেছ, তাই আমাদের প্রাণে এত যুগযুগান্তর পরে এই বেদনা অল্পে অল্পে জাগিতেছে। এই বেদনা, তোমারই অনুকম্পা, তোমারই কৃপা নির্দেশ করিতেছে। আশা হয়, দয়াল, এ দুঃখের নিশ্চয়ই অবসান হইবে। এ দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচিবে। সেই আশায় আজ তোমার চরণে প্রার্থনা করিতেছি, প্রভো, আমার মাতৃভূমির দুঃখ তুমি সত্বর দূর কর।"

বিপিন চন্দ্র সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার ক'রে রাজদ্রোহের অভিযোগ থেকে বাঁচালেন সহকর্মী বন্ধু অরবিন্দ ঘোষকে।

আমরা এই প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত কেবল কারাগারে এবং অন্তরীণে আটক থাকা কালীন

রচনাবলীকে করব না, ওই দলভুক্তকেও করব—যেগুলো বাইরে এসে লেখা হয়েছে বন্দী-জীবনের স্মৃতি নিয়ে। ওই সকল বিষয়-বস্তু অবলম্বনে যে সকল পুস্তক রচিত হয়েছে, তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মামলার মুক্তির পরে লিখেছেন 'কারাকাহিনী'। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল অধুনা-লুপ্ত 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রে। পরে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থাকারে। সুপ্রভাতের সম্পাদিকা ছিলেন তাঁর মাসতুতো বোন কুমুদিনী মিত্র বি. এ. সরস্বতী (পরে বসু) অর্থাৎ নির্বাসিত নেতা সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

শ্রীঅরবিন্দের 'কারাকাহিনী' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি :

"আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধেও সহৃদয় কর্তৃপক্ষ অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটী উহাদিগকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব স্বরূপ থালা বাটীর এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গলতে' বিমুক্ত রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু জোরে আঙুল দিলেই তাহা আংবীয়ানের ধরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত; তখন এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নতুবা সুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অভ্যন্তরীণ মৃত্তিকায় লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটীটিই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন বৃটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্বকার্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে,—জজ, শাসনকর্তা, পুলিস, শুল্ক বিভাগের কর্তা, মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্মোপদেষ্টা যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ কর্তা, পুলিস, বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষে কৌন্সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে শ্রীতিসম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য,—আমার আদরের বাটীরও তদ্রূপ। বাটীর জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচ-ক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকর্মক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরেজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া ঘোর সাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। বৃথা পরিত্যাগের এমন সহায়ও উপদেষ্টা কোথায় পাইবে?"

শ্রীঅরবিন্দ যে বাংলাভাষা ভালো ক'রে আয়ত্ত করেছিলেন, তা' ওই উদ্ধৃতি থেকে কতকটা বুঝা যাবে। এমনই রসাল রচনা তাঁর লেখনী-মুখে আরও বেরিয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেন্দ্র কুমার রায় ছিলেন বরোদায় তাঁর বাংলা শিখবার গুরু-শিক্ষক।

মানিকতলা বোমার মামলায় দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন 'বারীন্দ্রের আত্মকথা।' সুন্দর রচনা। সেই গ্রন্থে বন্দী-জীবনের অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের সতীর্থ দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'নির্বাসিতের আত্ম-কথা,' উৎকৃষ্ট রচনা। ওই দলের দণ্ডিত অন্যতম নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো মুক্তির পরে বাইরে এসে লিখেছেন 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা'। তাতেও প্রবিষ্ট হয়েছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বন্দী জীবনের

বিবিধ বিষয়ক। বাংলার মরীচি-দুপল সন্তোষ-কানাইয়ের কথা, প্রফুল্ল চাকী-ক্ষুদিরাম বসুর কথাও আছে।

এখানে উল্লেখ করছি যে,—স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য পর্বে বাংলার যে নয় জন দেশ-সেবক নির্বাসিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা লিখেছেন 'নির্বাসিতের আত্মকথা।' একখানি সুলিখিত গ্রন্থ। অন্যতম নির্বাসিত নেতা কৃষ্ণ কুমার মিত্র লিখেছিলেন 'আমার চরিত'। কিন্তু পাণ্ডুলিপি কারা-কর্তৃপক্ষের অসাবধানতার জন্য হারিয়ে যাওয়ায় উহা প্রকাশিত হয় নাই।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কালে মেদিনীপুরের ধীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রতিষ্ঠিত হয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন 'কারাকাহিনী'। আমিও তৎকালে ওই জেলে ছিলাম। আমি লিখেছিলাম দু'খানা বই : 'স্বরাজ সাধনায় বাঙালী' এবং 'স্বাধীনতার কথা'।

বন্দী-জীবনের সাহিত্যিক সাধনায় শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীর ('মহারাজ')-এর 'জেলে ত্রিশ বৎসর' একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক শ্রীনলিনী কিশোর গুহ লিখেছেন 'বাংলার বিপ্লববাদ'। ওই বই নিয়ে নোয়াখালীতে টেররিস্ট পাব্লেশন র‍্যাক্ট অনুসারে দুই জনকে গ্রেপ্তার ক'রে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আসামী ভদ্রলোক দু'জনের পক্ষে মামলা চালিয়েছিলাম আমি। স্বাধীনচেতা মরকুমা হাকিমের বিচারে তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন। বন্দী-জীবনে শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিপ্লবী নেতা শ্রীযতীন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথা' একখানা তথ্যসমৃদ্ধ সুলিখিত গ্রন্থ। তিনি কারাবাসে থাকা কালেই লিখেছেন গ্রন্থখানা। অরুণ বাবু ও মনোরঞ্জন বাবুর জীবনের ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর কেটেছে অখণ্ড ভারতে বিভিন্ন জেলে—মাদ্রাজ পাঞ্জাবও বাদ পড়েনি। বন্দী-জীবনে সবচেয়ে বেশী বই লিখেছেন মনোরঞ্জন বাবু। তাঁর কারাবাসে লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী : (১) ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতি, (২) মিলের ও সমদায়বাদ আলোচনা, (এই বইখানা পুলিশ নিয়ে যায়, তারপর তিনি মিনওয়ালী জেলে এবং নাসিক জেলে আবার লিখেন), (৩) মহারাষ্ট্র বীরচরিত, (৪) রবীন্দ্র চিত্রকলা (নন্দলাল বসুর লিখিত ভূমিকা ভূষিত), (৫) যারা হারিয়ে গেল (বিপ্লবীদের সম্পর্কে গল্পের টেকনিকে লেখা)।

অনামধ্যাত বিপ্লবী শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের লেখা 'বিপ্লবতীর্থে' একখানা চমৎকার বই, এতে বি. কি. দলের ইতিহাস, ত্রিবৃত্ত বিপ্লব-বাদল-দিনেশ এবং অনাথ পাণ্ডা প্রভৃতি অগ্নিযুগ প্রভৃতি অনেকের কাহিনী আছে; গল্পের টেকনিকে রচিত। শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়' ওই শ্রেণীর আর একখানা সুলিখিত গ্রন্থ। ভূমিকা লিখে দিয়েছেন সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি :

"স্বাধীনতা-সংগ্রামে চন্দননগরের অবদান বড় সামান্য নয়—চন্দননগর না থাকিলে সংগ্রাম ভিন্ন রূপ ধারণ করিত—ইহা নিঃসন্দেহ। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনের স্রোতের কিছু অংশ ক্ষুদ্র পল্লী সোমলপাড়ার মধ্যেও আসিয়াছিল—তাহার ফলে চন্দননগরের মধ্যে সোমলপাড়াতেই বৈপ্লবিক কার্যের প্রথম সূচনা এবং সেই সূত্র হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি-কাল পর্যন্ত সোমলপাড়া যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই একটা ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বসন্ত কুমারের একান্ত ইচ্ছা। গুপ্ত সমিতি (secret society) হিসাবে কোনরূপ যশ কামনা না করিয়া পল্লীর প্রত্যেকটি নীরব সেবক তাৎকালে বিপ্লবিগণকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া তাহাদিগের ক্ষুদ্র সামর্থ্য মত দুঃখবরণ করিয়াছেন,

তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগ ও দেশসেবার কথা স্বাধীনভাবে গোপন রাখা তাঁহার নিকট কর্তব্যচ্যুতি বলিয়া মনে হয়। "Aft the most honour, Forward the better man"—সেই সকল better man দিগের ত্যাগের গোপন কথা অপ্রকাশ থাকা সত্যই উচিত নয়।

"বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে চন্দননগরের অবদান চির-স্মরণীয়। সেই সংগ্রামে গুপ্ত-সমিতির কার্যধারা কিভাবে গোঁজলপাড়া সত্যই চিরকাল নিজদিগকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিল —ইহা বিশেষ কৃতিত্বের কথা স্বীকার করিতে হইবে। সেই সকল বীর সেবকদিগের কথা অপ্রকাশ থাকা আমার কাছে অন্যায় বলিয়া মনে করি।

"নরেন্দ্রনাথ আজীবন আত্মবিলুপ্তি সাধন করিয়া বিপ্লব-যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিল। সেই যজ্ঞের সহিত ধরাধর তাহার সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমি জানি। সে আমাকে এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরোধ করে। অতীত সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমি তাহার এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এই ভূমিকা লিখিতে দ্বিরাবোধ করিলাম না।

"ধারাবাহিক ভাবে যদি নিখিলেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে— নরেন্দ্রনাথ ও অপরাপর কর্মীর কর্মবহুল জীবনের যত ঘটনার বিশদ বিবরণ তাহাতে লিপিবদ্ধ হইবে। এই বিবৃতির মধ্যে গোঁজলপাড়ার সেবকদিগের বিশিষ্ট সেবার কথা খণ্ডিত ভাবে ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র।"...

নির্যাতিত বিপ্লবী শ্রীবিভেশ সাহিড়ী লিখেছেন: 'নয়াদি' ও 'সমাধি'। গল্পের টেকনিকে লেখা চমৎকার দু'খানা বই! অল্পকাল মধ্যে একাধিক সংস্করণ থেকেই গ্রন্থ দু'খানির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে।

ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়ের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন অর্ধশতকেরও উর্ধ্ব কালের। তিনি কারাবরণ করেছেন অনেক বার স্বাধীনতা-সংগ্রামে। তিনি বন্দী-জীবনে লিখেছেন দু'খানা গ্রন্থ: 'প্রজাশক্তি' ও 'নমস্য যেয়ে'। উভয় গ্রন্থই সুলিখিত। প্রথম বইখানার একাধিক সংস্করণ হয়েছে। সেই গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দিতেছি:

"এই বইখানি লিখিয়াছি সেণ্ট্রাল জেলে বসিয়া। কর্মকোলাহলময় বহির্জগৎ হইতে নির্বাসিত হইয়া আগন্তুক সম্পর্কশূন্য প্রাচীরঘেরা জেলের ভিতরে বিষয়গুলি নূতন ভাবে ভাবিবার সুযোগ পাইয়া বন্দী-জীবনের সেই মুক্ত চিন্তা প্রসূত এই নামান্য অর্ঘ্য দেশবাসীর চরণে অর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভে আমি ধন্য।"...

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া নির্বাসন দণ্ড ভোগ কালে ব্রহ্মদেশের কারাগারে লিখেছিলেন মারাঠী ভাষায় 'গীতা রহস্য'—যা' তত্ত্বে ও তথ্যে সমৃদ্ধ এবং মনীষা ও ও পাণ্ডিত্যে সমুজ্জ্বল একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পর্কে ওই রূপ সুলিখিত ও সুচিন্তিত গ্রন্থ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

দেশনায়ক জওহরলাল নেহরু কারাবাস কালে লিখেছেন: 'Glimpses of World history' এবং 'Discovery of India.' শেষোক্ত গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের অবদানের উল্লেখ ছিল না ব'লে তাঁকে তীব্র প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি ভক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাধীনতা সংগ্রামে একাধিক বার কারাবরণ করেছেন।

বন্দী-জীবনে তিনি ইংরেজীতে লিখেছেন 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড্,' একাধিক খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও গল্পভারতীর নিয়মিত লেখক পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই গ্রন্থে রাজেন্দ্র প্রসাদ গান্ধীজীর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত লিখেছেন স্মৃতিকথার ধরনে। এতে আছে গান্ধীজী সম্পর্কে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ইংরেজীতে 'দ্যাম্ ইণ্ডিয়াম্ অন্ পিলগ্রিমেজ' যা তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। সে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর এবং সারা জগৎ ব্যাপী নেতাজীর অগণিত অনুরাগী নর-নারীর, আর তাঁর হাতে গড়া আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর যোদ্ধা বীর ও বীরাঙ্গনাদের।

মহান নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহু ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। পরে তিনি হিন্দী উর্দু ভাষা এবং কয়েকটি বিদেশী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামী সর্ব শ্রেণীর নর-নারীকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাণী দিয়ে গেছেন—আমাকে তোমরা রক্ত দান কর, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিব। দিয়েও গেছেন তিনি বীরের মতো রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করে। তাই তো স্বাধীন ভারতে সকলের কণ্ঠে আজও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—জয় হিন্দ্—আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের রণ-ধ্বনি। নানা অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জয় হিন্দ্ ধ্বনিও আজ দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করে।

গৌরীশঙ্কর দে :

১৯০০ সাল। মধ্য য়ুরোপে তখন অস্ট্রিয়া হাঙ্গারী মিলে একটি রাজ্য। আর সেই রাজ্যের যিনি অধীশ্বর তাঁর দারুণ প্রতাপ। এই রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধিতে রাশিয়া শঙ্কিত। তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না তো?

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ কী সামরিক পরিকল্পনা করছেন তা জানার জন্য রাশিয়া তৎপর হয়ে উঠলো। সব চাইতে চতুর কয়েকজন গুপ্তচর পাঠালো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীতে।

বছর খানেক সে দেশে থাকার পরও কিন্তু রুশ গুপ্তচরেরা গোপন খবর কিছুই বার করতে পারলে না। রাশিয়াতে শূন্য হাতে ফিরে আসার পর প্রধান গুপ্তচরের তলব পড়লো সদর আপিসে। বড় কর্তা গুপ্তচরটির দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন: "পুরো একটি বছর তো হিসেবমত কাটিয়ে এলেন। শুনতে পাই কাজের মধ্যে কাজ করেছেন প্রায়ই আপেরা দেখতে যেতেন। তাই না?"

গুপ্তচরটি মাথা চুলকে জবাব দিলো: "আজ্ঞে, আমার উপর অবিচার করবেন না। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের গুপ্তচর বিভাগ অত্যন্ত সজাগ। বিদেশী গুপ্তচরদের উপরে তাদের তীক্ষ্ণ নজর। তারা এত হুঁশিয়ার যে বোধ হয় নিজেদেরও সন্দেহ করে ও পরস্পরের প্রতি নজর রাখে।"

বড় কর্তা একটু শান্ত হয়ে বললেন: "আচ্ছা, অস্ট্রিয়ার গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ব্যারন ফন স্টীলকে কী রকম মনে হলো? অর্থ দিয়ে কি তাকে বশ করা সম্ভব?"

—"আজ্ঞে না। তিনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। কিন্তু ঠিক তাঁর নিচেই যে কর্মচারীটি রয়েছেন অর্থের জন্য তিনি বেশ লালায়িত। কাজের অনুপাতে তেমন পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না তাকে এ রকম কথা বলতে শুনেছি।"

—"তাহলে তো তাকেই বাগে আনতে হয়। তার নাম কি ?"

—"অ্যালফ্রেড রেডি। র‍্যাঙ্কের অধীনে হ'লেও তিনিই গুপ্তচর বিভাগের পরিচালক।"

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর গুপ্তচর বিভাগের পরিচালক রূপে রেডি বহু নতুন ও অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। তার ফলে ওই রাজ্যের গুপ্তচর বিভাগ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

যে আগন্তুকই রেডির সঙ্গে দেখা করতে আসুক না কেন রেডি তার উপরে কড়া নজর রাখতেন। নোট বুকে তার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য টুকে রাখতেন।

আগন্তুককে আপ্যায়ন ক'রে বসাতেন। কিন্তু পাশ থেকে এবং সামনে থেকে গোপন ক্যামেরায় উঠে যেতো আগন্তুকের ফটো!

আগন্তুকের সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হতো তা গোপনে টেপ রেকর্ডে ধরা পড়তো।

রেডির টেবিলের নিচে গোপন টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিলো।

ভালো দামী সিগারেটের বাক্সের দিকে দেখিয়ে তিনি অতিথিকে ধূমপান করতে অনুরোধ করতেন। সিগারেট নিতে গিয়ে অতিথির আঙুলের ছাপ যাতে ওই বাক্সের গায়ে পড়ে।

এমনি নানা ধরণের ব্যবস্থা ছিলো রেডির ঘরে। আগন্তুক যখন বিদায় নিতেন জানতেও পারতেন না কী ভাবে তিনি ধরা পড়েছেন মারাত্মক গুপ্তচরটির অদৃশ্য ফাঁদে।

১৯০২ সাল। ভিয়েনার এক বারে একা ব'সে রুশ গুপ্তচরটি সুরা পান করছিলেন। তার টেবিলেরই অন্যপ্রান্তে ব'সে আছেন রেডি। রুশ গুপ্তচরটি হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন: "দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন তো আসুন না আমার মদটা দুজনে মিলে ভাগাভাগি ক'রে পান করি। অনেকটা দিয়ে গেছে। একা পান করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

মদের বোতলটার দিকে তাকিয়ে রেডির তো চোখ কপালে উঠলো: "সে কী! এ যে মদের ১৮৭০। ভীষণ দামী মদ। আমার মতো অপরিচিত একজন লোককে অনুরোধ করছেন পান করতে? বহু বছরের মধ্যে এই মদ এক ফোঁটাও মিতে পড়েনি।"

—"কেউ যদি সত্যি চায় তো সে নিশ্চয়ই এই মদের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে। এই ওয়েটার, আরেক গ্লাস নিয়ে এসো তো।"

এর দিনকয়েক পর থেকেই অর্থের বিনিময়ে রেডি গোপন তথ্য পাচার করতে শুরু করলেন রাশিয়ানদের কাছে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর কোন্ কোন্ গুপ্তচর রাশিয়াতে রয়েছে তাদের নাম পর্যন্ত তিনি রুশদের কাছে ফাঁস ক'রে দিলেন। রুশ গুপ্তচর বিভাগের কর্তা তো অদম্য খুশি। যা আশা করা গিয়েছিলো রেডির কাছ থেকে তার চাইতেও বেশি কাজ পাওয়া যাচ্ছে। রেডির কাছ থেকে পাওয়া খবরের উপর ভিত্তি ক'রে অস্ট্রীয় গুপ্তচরদের গ্রেপ্তার ও জেরা ক'রে অনেককে ফাঁসিতে লটকানো হলো।

একই সময়ে রেডি নিজের দেশের গুপ্তচর বিভাগ ভুক্তিতেও পরিচালনা করছিলেন। ১৯০৫ সালে তাঁর পদোন্নতি ঘটলো। তিনি হলেন কর্ণেল। নতুন কাজের দায়িত্ব নিয়ে গেলেন প্রাগে। সেখানে যাবার পরেও রুশদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রইলো অব্যাহত। বছরের পর বছর নির্বিঘ্নে তিনি বহু দলিল-পত্রের নকল পাচার ক'রে যেতে লাগলেন রুশ দেশে।

কিন্তু ১৯১৩ সালে। নির্মেঘ আকাশে প্রথম মেঘ উঠলো।

ভিয়েনার ডাকঘরের একজন কর্মচারী একদিন ছুটে গেলো গুপ্ত পুলিশ বিভাগের আপিসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো: "ক্যাপ্টেন রস্ত, সকালে আমাদের হাতে এই চিঠি এসে পৌঁছেছে। চিঠি এসেছে জার্মানী ও রাশিয়ার সীমান্ত অঞ্চল ইউরুডেন থেকে।" ডাকঘরের উপরে নির্দেশ ছিলো সীমান্ত শহরগুলি থেকে চিঠি এলে সেগুলি খুলে দেখবে ও তাতে কী লেখা আছে তা পুলিশকে জানাবে।

গুপ্ত পুলিশ বিভাগের উর্ধতন কর্মচারী উষ্ণির মুখে চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন: "চিঠিখানা এসেছে অপেরা থল-১৩-র নামে। চিঠির উপরে নির্দেশ রয়েছে চিঠির মালিক এসে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত চিঠিটি ডাকঘরেই রেখে দিতে।"

লেফাফা খুলতেই পুলিশের কর্তার চোখ তো ছানাবড়া! "সর্বনাশ! খামের ভিতরে যে চৌদ্দ হাজার ক্রনেনের নোট! নিশ্চয়ই কোনো রে-আইনী কাজের পারিশ্রমিক। নোটগুলি আবার খামের ভিতরে রেখে মুখ বন্ধ ক'রে দিন। আমি এখনই কয়েকজন গোয়েন্দাকে বলছি ডাকঘরের উপরে কড়া নজর রাখতে।"

যে বাড়িতে ডাকঘর সেই বাড়িরই অন্য একটি ঘরে আস্তানা গাড়লো পুলিশ। দুজন গোয়েন্দা কড়া নজর রেখেছে কাউন্টারের দিকে। কাউন্টারের সঙ্গে পুলিশের ঘরের টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়া যাবে।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়। খাম নিতে কেউ আসে না। অপেরা থল-১৩ নামে আবার কোনো লোক থাকতে পারে নাকি? গোয়েন্দারা যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু ১৯১৩ সালের ২৪শে মে তারিখে সত্যি সত্যি ঘণ্টা বেজে উঠলো। গোয়েন্দারা সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লো ডাকঘরের ভিতরে। কাউন্টারের কর্মচারী বলে উঠলেন: "এই যে লোকটা এই মাত্র খাম নিয়ে বাইরে বেরিয়েছে।"

গোয়েন্দারা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে দেখে একটা ট্যাক্সি চ'লে যাচ্ছে। কাছাকাছি আর কোনো গাড়ি নেই। গোয়েন্দারা রীতিমতো বোকা ব'নে গেছে। হাতের মুঠো থেকে এমন ভাবে শিকার ফসকে গেলো! বড়কর্তা শুনলে কী বলবেন? ওরা তো রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়লো। আধঘণ্টা কেটে গেলো।

হঠাৎ ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আরে। যে ট্যাক্সিটা নিয়েছিলো সেটাই যে ফিরে আসছে।

ট্যাক্সিটা কাছে আসতেই থামিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেলো লোকটি গেছে কাফে কাইসার হফে। সঙ্গে সঙ্গে ওই ট্যাক্সিতে উঠেই গোয়েন্দা দুজন ছুটলো ওই কাফের দিকে।

ট্যাক্সির ভিতরে পাওয়া গেলো একটা কাগজ-কাটা ছুরি। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেলো ওই ছুরিটা দিয়েই লোকটা খাম খুলেছিলো।

কাফেতে পৌঁছে কিন্তু তাকে পাওয়া গেলো না। সেখানে শুধু জন কয়েক মহিলা। কাছেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে লোকটা বোধ হয় আরেকটা ট্যাক্সি ভাড়া করেছে।

সেখানে খোঁজ ক'রে জানা গেলো সত্যি সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে একজন লোক এই মাত্র হোটেল ক্রোমনের-এর দিকে গেছে।

গোয়েন্দারা তক্ষুনি গিয়ে হাজির হলো হোটেলে। সামনেই বসেছিলো হোটেলের ম্যানেজার। ওরা তাকে জিজ্ঞেস করলো:

"আচ্ছা, এখুনি কোনো লোক কি আপনার হোটেলে এসেছে?"

হোটেলের ম্যানেজার জানালে: "স্যার, একজন নয়, চারজন এসেছে। তার মধ্যে আপনি কাকে চান?"

ছুরিটা দিয়ে ওরা বললো: "দেখুন, তাদের মধ্যে কেউ বোধ হয় এই ছুরিটা পথে ফেলে এসেছে। মিলিয়ে ক'রে দেখুন তো এটা কার?"

গোয়েন্দা দুজন সেখানে দাঁড়িয়েই খবরের কাগজ পড়ার ভাণ করতে লাগলো। একটু পরেই সেখানে সাধারণ ভদ্রলোকের পোষাকে হাজির হলেন কর্ণেল রেডি।

একটুও দেরি না ক'রে একজন গোয়েন্দা ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে ক্যাপ্টেন রক্সকে ফোন করলো: "আমরা বল-১০তে আবিষ্কার করেছি। তিনি হলেন স্বয়ং কর্ণেল অ্যালফ্রেড রেডি।"

রেডি হোটেল ছেড়ে পথে নামতেই গোয়েন্দা দুজনও তার পিছু নিলে। এদিকে ক্যাপ্টেন রক্স তাকঘরে গিয়ে মিলিয়ে দেখলেন যে সই ক'রে চিঠিটা দিয়ে গেছে তার হাতের লেখা আর কর্ণেল রেডির হাতের লেখায় কোনো পার্থক্য নেই। রেডির সঙ্গে যে রুশদের যোগাযোগ রয়েছে এতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

রেডি হোটেলে ফিরে আসতেই ক্যাপ্টেন রক্স এবং আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী একটু পরেই তার ঘরে এসে ঢুকলেন। রেডিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি জানালেন "আমি কিছুই বলতে চাই না। প্রয়োজনবোধ করলে আমার বাড়ি সার্চ ক'রে দেখুন।"

উত্তরে ক্যাপ্টেন রক্স বললেন: "আমরা সবই বুঝতে পারছি কর্ণেল। এই পিস্তলটা রেখে যাচ্ছি। এতে কেবল একটি গুলিই রয়েছে।"

সেই রাতেই রেডি আত্মহত্যা করলেন। তার বাড়ি সার্চ ক'রে পুলিশ উদ্ধার করলো বহু সামরিক মানচিত্র, প্লান এবং ফটো। ১৯১৪ সালে শুরু হলো বিশ্বযুদ্ধ। প্রায় প্রথম ধাক্কাতেই রেডির নিজের দেশ অষ্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটলো। অর্থের বিনিময়ে রেডি রুশদের হাতে যে-সব কাগজ-পত্র পাচার করেছিলেন তারই ফলে তার দেশের ওই শোচনীয় পরাজয়।

সমাধান

শিবেশ মুখোপাধ্যায়

সুনন্দা বলল—'আমার ছেলেকে সব সময় ওরা রাখবে কেন?'

সুরজিৎ আজ অনেক দিন এরকম কথাই শুনে আসছে সুনন্দার মুখে। এখন বৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল—'তোমার ছেলে সব সময় ওদের কাছে থাকছে কোথায়? আর যদি বা থাকেই, তোমার ছেলে কি তোমাকে ভুলে যাবে? তোমার কাছে পর হয়ে যাবে, আর আপন করবে ওদের?'

'পিন্টু দিনের মধ্যে প্রায় সারাক্ষণ ওদের কাছে থাকে কিনা খবর নিয়ে দেখ', বলল সুনন্দা, 'আর ছোটবেলা থেকে মার কাছে না থেকে ছেলে যদি পরের কাছে থাকে ছেলে যে আপন থাকেনা, পর হয়ে যায় এমন দৃষ্টান্ত কি বিরল? তোমার বৌদি দিনের মধ্যে সারাক্ষণই ওর দেখাশোনা করে। ঘুম থেকে ওঠা থেকে মুখ ধুইয়ে দেওয়া, সকালের জলখাবার খাওয়ানো, তারপর বেলা হলে স্নান করিয়ে দেওয়া, নিজের হাতে খাওয়ানো, দুপুরে গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ানো, রোজ বিকেলে গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, আবার রাত্রে নিজের হাতেই খাওয়ানো আর ঘুম পাড়ানো।'

সুরজিৎ মন দিয়ে কথাগুলো শুনল। তারপরে এক সময়ে বলল—'কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে তুমি কি পিন্টুকে একটুও পাও না?'

'পাই,' বলল সুনন্দা, 'কিন্তু তাতে কখনও তৃষ্ণা মিটতে পারে না। নিজের ছেলেকে যদি চান করাতে না পারলাম, খাওয়াতে না পারলাম, ঘুম পাড়াতে না পারলাম তো এক মিনিট বা দু মিনিট আদর করে বা সোহাগ করে কখনও তৃপ্তি হতে পারে না।'

সুরজিৎ সুনন্দার এ ধরণের অভিযোগ কখনই গভীর ভাবে নিতে পারেনি, বরাবর হাল্কাভাবে সমস্ত কিছুই উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। তাই আজও সুনন্দার সমস্ত অভিযোগ আগের মতই হাল্কাভাবে উড়িয়ে দিতে চাইল। সুনন্দার শেষ কথাগুলো শুনে হো হো করে হেসে ফেলল।

হাসিটা সুনন্দার কাছে অনর্থক মনে হল। আর এর পেছনে ওরকমটাকে হাল্কা করার চেষ্টাই রয়েছে যেন, ভাবল ও। বলল—'হাসি পাওয়ার মত কথা বলেছি নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে'—বলল সুরজিৎ।

'তার মানে?'

সুনন্দার রাগত মুখটার দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে হাসতে বলল সুরজিৎ—'অনেক মায়ের ছেলেরাই জন্ম থেকে জানী, মেট্রন, গভর্ণেস এদের হাত ধরাধরি করে বড় হয়। তারা সবাই কি তাদের মাকে চিনতে ভুল করে? নাকি মার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়?'

সুনন্দা কথাগুলো শুনে আগের চেয়ে বেশী রেগে উঠল। বলল—'তাদের হাত ধরাধরি করে যারা বড় হয় তারা সেরকম ঘরে জন্ম নেয়। তাদের সঙ্গে পিন্টুর কোন সাদৃশ্য নেই। হয় আয়েসার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই জানী, মেট্রন বা গভর্ণেসের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কিম্বা মার অক্ষমতার জন্য অনিবার্য। কারণেই তাদের কাছে যেতে হয়। তাই তারা সন্তানের উপস্থিতির অভাবটা তেমন করে অনুভব করে না। কিন্তু আমার অবস্থাটা? আমার কাছ থেকে দূরে তাদের হাতে আমার ছেলে পালিত পালিত হচ্ছে না। আমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, আমার আগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও আমারই চোখের সামনে আমার ছেলে আমারই বয়সের অন্য একটি মেয়ের কাছে মা আন্টি আর নানান পালন পাচ্ছে দিনের পর দিন।'

সুরজিৎ সুনন্দার এরকম আবেগময় অথচ যুক্তিপূর্ণ কথার সামনে কখনও পড়েনি। হেসে বা হাল্কাভাবে এবার আর উড়িয়ে দিতে পারল না সুরজিৎ সুনন্দাকে।

সুনন্দা ফের বলল—'দিনের পর দিন এ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না।'

সুনন্দার চোখে জল দেখে সুরজিৎ এবারে বিচলিত হয়ে উঠল, বলল—'কেঁদো না, সুনন্দা।'

সুনন্দা সুরজিতের দুটো হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল—'চল, আমরা এ বাড়ী থেকে চলে যাই।'

'অবুঝের মত কথা বোল না'—সুনন্দার হাত দুটো আস্তে করে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল সুরজিৎ।

সুনন্দা কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলল—'আমরা এ বাড়ী থেকে চলে গেলে তোমার বৌদি আর এভাবে পিন্টুর উপর অধিকার নিতে পারবে না।'

'আমার মনে হয় তুমি পাগল হয়েছ'—বলল সুরজিৎ।

'পাগল হয়েছি!'

'সুস্থ মস্তিষ্কে থাকলে তুমি কখনও এরকম কথা বলতে না। দাদা বৌদিকে ছেড়ে আমার বা তোমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। একথা আমি গোড়া থেকেই বলেছি। আর তুমি জেনে রাখ, এটাই আমার শেষ কথা।'

সুরজিৎ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুনন্দা জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল সুরজিৎ লনের উপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে গেটের কাছে চলে গেল। তারপরে গেট খুলে এসে পড়ল রাস্তায়। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুনন্দা জানালার রড ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে।

বাড়ীর চাকর শ্রীনিবাস এসে এক সময়ে ডাকল। বলল—'স্নান করবেন না? খাবেন না?'

সুনন্দা দেখল, দেওয়াল ঘড়িতে একারোটা বেজে গেছে। অথচ ঘন্টার আগে সুরজিৎ অফিসে বেরিয়ে যেতেছিল। এক ঘন্টার উপর সুনন্দা এভাবে দাঁড়িয়ে এ বাড়ীর সকলের সম্বন্ধে নানা কথাই ভাবছিল আর ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্বন্ধে নিজের মন ঠিক করছিল।

শ্রীনিবাস চলে গেলে সুনন্দা একবার সুরজিতের বৌদির ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। মুখিয়ে

দেখতে চাইল পিউকে নিয়ে আশা কি করছে। দেখল ঘুম পাড়াচ্ছে। আর সেই পুরোণো ঘুম পাড়ানি গানটা সঙ্গে সঙ্গেই গাইছে। হঠাৎ কি হল। মাথার আগুন জ্বলে উঠল সুনন্দার। মনে মনে ঠিক করল যতদিন আশা এতাবের পিউর উপর অবাধে অধিকার চালিয়ে যাবে ততদিন সুনন্দা এ বাড়ীতে কিছুতেই জলগ্রহণ করবে না। ফিরে এল ও নিজের ঘরে। জানালার ধারে ইজিচেয়ারে বসল এসে। আর সেই সঙ্গে সব চিন্তাই এল সুনন্দার মনে সুরজিৎ অফিস চলে গেলে যেগুলো ওর মনে আনাগোনা করছিল।

আজ তিন বছর হয়েছে সুনন্দার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বিয়েটা হয়েছিল অসবর্ণ। অর্থগত বৈষম্যের জন্য আপত্তি উঠেছিল সুরজিতের বাড়ী থেকে আর সুনন্দার বাড়ী থেকে আপত্তি উঠেছিল শ্রেণীগত বৈষম্যের জন্য। সুরজিতরা বড় বড় লোক। কোলকাতার বুকে তিনতলা প্রাসাদ আর গাড়ীও রয়েছে! কিন্তু সুনন্দাদের নিজেদের অবস্থা নিঃসহায়। বাবা গভর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণী ছিল। এখন রিটায়ার্ড। আর কেউ চাকরী করে না। শুধু সুনন্দা নিজে সামান্য রোজগারের একটা চাকরী করত। অল্প দিনে সুনন্দারা চাটাচাটি। সুরজিতরা ধনী।

বাবা হয়ে একদিন সুরজিৎকে তাই রেজিষ্ট্রি বিয়ের জন্য দরখাস্ত করতে হল। আর কয়েক দিনের ছুটিও তাই।

খবরটা শুনে সবচেয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আশা। সুরজিতের বৌদি। বলেছিল তার প্রাণ থাকতে সে কিছুতেই সুনন্দাকে এ বাড়ীর বৌ করে আনতে পারবে না। এ বিয়েতে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বরাবর অমত জানিয়েছে, তীব্র কণ্ঠে তা ঘোষণা করেছে আশা।

সুরজিৎ বিয়ের আগেই একটা বর ভাড়া নিয়েছিল। রেজিষ্ট্রির কাজটা সেরেই সে ঘরে এসে উঠল ওরা।

মাত্র কয়েকশো টাকা মাইনে পায় সুরজিৎ। এই কয়েকশো টাকা আর নিজের অস্থায়ী চাকরীর সামান্য মাইনে সম্বল করে সুনন্দা একটা বছর যে কি কষ্ট করে সংসার চালিয়েছে সেকথা সুনন্দা কোনদিন ভুলবে না।

এক বছরেই সুনন্দার ছেলে হল।

খবরটা আশাকে ফোন করে সুরজিৎই জানিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, হাসপাতাল থেকে যেদিন ছাড়া পেয়ে সুনন্দা বাড়িতে ফিরে এল সেদিনই দুপুর বেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে আশা ওদের ঘরে এসে হাজির হল।

সুনন্দার তখন জাতুড় কাটেনি। কাটবার কথাও না। কিন্তু আশা যখন জাতুড়ের ছেলেটাকেই আচমকা কোলে তুলে নিল তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সুনন্দা। অধিকতর বিস্ময়ে সুনন্দাকে বিস্মিত করে আশা বলল—'এখুনি তৈরী হয়ে নাও।'

'কেন?'—বলল সুনন্দা।

'আমার সঙ্গে যাবে।'

'কোথায়?'

'আমার বাড়ীতে। তোমার এ সংসার আজ থেকে হবে ও বাড়ীতে।'

সুনন্দা দুর্বল শরীরে রাগের ভঙ্গ তুলে বলল—'না।'

আশা জানত সুনন্দার অভিমান ন্যায়সঙ্গত হবে। কিন্তু তার দৃঢ় ধারণা, তার সেদিনকার ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল আর তার আজকের ব্যবহারও নিরর্থক নয়। বলল—'যা হবার হয়েছে। সেসব ভুলে যাও সুনন্দা।'

'সেদিন কেন আমায় বলনি?' বলল সুনন্দা অভিমানের সুরে, 'আমরা এভাবেই থাকতে পারব।'

'তুমি যদি না যাও তো আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি। বাইরে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার পক্ষে তোমার চোখের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব হবে না।'

এর পরে কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যিই সুনন্দাকে তৈরী হয়ে নিতে হল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সোটা সংসারটাকে বেঁধে আশা তার নিজের বাড়ীতে তুলে নিয়ে এল। আর এসেই সুরজিতের অফিসে সুরজিৎকে খবরটা জানিয়ে একটা ফোন করে দিল।

সুনন্দার এখন মনে হচ্ছে এইরকম আসাটা যদি কিছুদিন আগেও সম্ভব হয়ে উঠত তবে খুশীই হত ও। আর আশা যদি সন্তানহীনা বা বন্ধ্যা না হত, আর হাসপাতাল থেকে সুনন্দার ছেলে নিয়ে আসার দিনই আশা যদি না আসত তবে সুনন্দার এত অনুশোচনা, সন্দেহ বা আসার কারণ হত না।

সুনন্দার চিন্তার সূত্র হঠাৎ একটা আঘাত খেয়ে ছিঁড়ে গেল।

আশা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে, বলছে, 'নাওয়া খাওয়ার কথা রোজই কি ভুলে যাও নাকি?'

সুনন্দা তাকাল একবার আশার দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ঘৃণায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেল ওর। জবাবটাও তেমনি ঘৃণাব্যঞ্জক হয়ে উঠল—'আমার নাওয়া খাওয়া না করাটা কি আপনাদের খুব চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে নাকি?'

'তা একটু উঠছে বৈকি', বলল আশা, 'আমাদের এখানে যখন রয়েছ তখন মাঝে মাঝে এরকম হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে এখানকার লোকেদের চিন্তা হওয়াটা কি খুবই অন্যায়ের? কি হয়েছে কী?'

'যেখানে থাকি সেখানকার লোকেদের কাছে কি কেনা হয়ে গেছি নাকি যে তাদের কাছে সব সময় আমাদের সুখ দুঃখের কৈফিয়ৎটা দিতে হবে?'

রাগে যেন জ্বলে উঠল আশা—'তার মানে?'

'তার মানে আর বেশী কিছু বলতে পারব না'—উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সুনন্দা।

'এটা কি হোটেল নাকি আর তুমি কি সেই হোটেলের বোর্ডার নাকি যে হোটেলের মালিককে বলে দিচ্ছ আজ সকালে ব্রেকফাষ্ট করবে না, কাল রাত্রে খাবার খাবে না? কেন খাবে না?'

'আপনি আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে বেশী কৌতূহলী নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কৌতূহলী। মাথাও ঘামাই। নয়ত কালিঘাটের সোটোপাড়ার এঁদো গলির ত্রিশ টাকার ভাড়ার সেই ঘর থেকে সেদিন জোর করে তোমাকে তুলে এই কোয়ার্টারের বাড়ীতে নিয়ে আসতাম না।'

ঘৃণায় সমস্ত মুখটা আগের চেয়ে বেশী বিকৃত হয়ে উঠল সুনন্দার। সমস্ত শরীরটাকে ঘৃণায় আর রাগে দুলিয়ে নিয়ে বলল—'থাক।'

আশা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল—'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'সব কথা বুঝবার দরকারও নেই' বলল সুনন্দা, 'আপনি জানেন ওর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে বচসা হয় আর সেজন্য যে আমি মাঝে মাঝে যাই না এটাও আপনি জানেন।'

তার মানে ধরে নিতে হবে যে সুরজিতের সঙ্গে তোমার বচসা হয়েছে আর সেই জন্যেই তুমি যাবে না?'

'হ্যাঁ, আপনি দয়া করে এবারে যান।'

'বেশ।'

আশা ঘর ছেড়ে চলে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সুনন্দা।

সন্ধেবেলায় সুরজিৎ অফিস থেকে ফিরে এসে খবর পেল সুনন্দা সারাদিন কিছু খায়নি।

ঘরে ঢুকে সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করল সুরজিৎ—'শুনলাম তুমি নাকি আজও সারাদিন খাওনি?'

'হ্যাঁ', বলল সুনন্দা, 'আমি যদি এ বাড়ী থেকে না যাই তো আমি কিছুতেই জলগ্রহণ করব না। আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব।'

'এরকম ছেলেমানুষী কোর না, সুনন্দা।'

'ছেলেমানুষী? তোমার বৌদি নিষ্ঠুর। তার সন্তান নেই বলে সে নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করে।'

তারপর রাগে দিশাহারা হয়ে সুনন্দা বলল কের—'তুমি একশো টাকার চাকুরে বলে দাদা বৌদির সম্পত্তির লোভে স্বচ্ছন্দে নিজের ছেলেকে পর করে দিতে পারছ। তুমি জান, দাদা বৌদির সন্তান নেই। এই বিশাল সম্পত্তি একদিন যদি ভোগ করতে পার সেজন্যে দাদা বৌদিকে খুশী করবার জন্যে এটুকু ক্ষতিস্বীকার করতে ইতস্ততঃ করছ না। তুমি ছেলের বাপ বলে তোমার কাছে এটা সামান্য ক্ষতিস্বীকার হতে পারে কিন্তু আমি ছেলের মা। আমার কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না।'

'আমার সম্বন্ধে তুমি অনেক গভীর চিন্তা করেছ দেখছি'—বলল সুরজিৎ।

'বোঝাই তোমায়! আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। চল, এ বাড়ী থেকে আমরা চলে যাই। আমি পাগল হয়ে যাব। প্রায়ই আমার ঘুম হয় না। নানারকম আজে বাজে স্বপ্ন দেখি। ঘুমের ঘোরে কখনও চীৎকার করে উঠি। প্রায়ই আমার মনে হয়, আমি আত্মহত্যা করব।'

'কি বলছ কী।'

'বিশ্বাস কর, সুরজিৎ।'

সুরজিৎ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপরে বলল—'আচ্ছা তোমার কথাই থাকবে। আমি ঘর দেখে দুএক দিনের মধ্যেই এ বাড়ী থেকে উঠে যাব।'

সুরজিৎ পরদিনই অফিস থেকে ফিরে এসে বলল—'একটা ঘর পেয়েছি।'

'পেয়েছ!' বিস্ময়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল সুনন্দা।

'হ্যাঁ। তবে ভাড়াটা একটু বেশী।'

'কত?'

'চল্লিশ টাকা।'

'আগের ঘরটার চেয়ে দশ টাকা বেশী! তা হোক। কোলকাতার ঘরের যা দুরবস্থা এটা ছেড়ে দিলে কত দিন পরে আবার পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। চল, কালই আমরা চলে যাই!'

'বেশ।'

সুরজিৎ তখনই একবার দাদার ঘরে যাবার জন্যে উদ্যত হল। কাল চলে যাবে সে খবরটা একবার দাদাকে দেওয়ার দরকার।

ঘর থেকে বেরিয়েই বৌদির সঙ্গে বারান্দায় দেখা হয়ে গেল সুরজিতের। পিন্টুকে পাওডার মাখাচ্ছে আশা। প্রাত্যহিক কর্তব্য অনুযায়ী বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন চলছে।

আশা বলল—'অফিস থেকে এই আসছ?'

'হ্যাঁ', বলল সুরজিৎ। তারপরে একটু থেমে বলল—'একটা কথা বলার আছে।'

'বল।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি ঘর দেখেছি। চলে যাচ্ছি।'

সমস্ত মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আশার—'চলে যাচ্ছ মানে?'

'মানে এ বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি'—বলল সুরজিৎ।

'কবে?'

'কাল। কাল রোববার আছে। কাল অফিস যাওয়ার তাড়া নেই। সকালেই আমরা চলে যাব।'

ধোকার মত বলল আশা—'তোমরা মানে!'

'মানে আমি, সুনন্দা আর পিন্টু'—বলল সুরজিৎ।

'পিন্টুও যাবে!'

'তা যাবে না!'

আশা বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পিন্টু এর মধ্যে একসময়ে পাওডারের কৌটোটাকে উল্টে দিয়েছে আর সমস্ত পাওডার ছড়িয়ে দিয়েছে মেঝেতে।

সুরজিৎ বলল—'আমি দাদাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

বারান্দা দিয়ে চটির শব্দ তুলতে তুলতে সুরজিৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিন পিন্টুকে নিয়ে আশার বেরোন হল না। রাত্রে কিছু খেলও না আশা।

পরদিন সকালে সুরজিৎ সুনন্দা আর পিন্টুরা চলে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল অনেকগুলো দিন।

একদিন সুরজিৎ অফিস থেকে একটু দেরী করে ফিরল। এসে সুনন্দাকে বলল—'দাদার ওখানে গিয়েছিলাম!'

কোন সংবাদ আছে মনে করে কৌতূহলের বশে সুনন্দা সুরজিতের মুখের দিকে তাকাল।

সুরজিৎ বলল—'ভালোই আছে।'

'ভালোই আছে' কথাটার মধ্যে একটা হেঁয়ালীর সুর আছে মনে হল সুনন্দার। বলল—'আপা বৌদি ?'

'বৌদি একটা ছেলে দত্তক নিচ্ছে', বলল সুরজিৎ, 'শ্রীনিবাস বলল বৌদি সেদিন বলছিল ঠিক পিন্টুকে যেমন নিজে হাতে ঘাস করাত, খাওয়াত, ঘুম পাড়াত, বেড়াতে নিয়ে যেত এই ছেলেটাকেও বোধ হয় বৌদি তাই করবে।'

'আশ্চর্য !'

'আমার মনে হয় বৌদি কিন্তু পিন্টুকে সহজে ভুলতে পারছে না।'

একটু পরে সুনন্দা বলল—'আজ একটা মনিঅর্ডার এসেছে আমার নামে। তোমার বৌদি পাঠিয়েছে। ছশো টাকা।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না'—বলল সুরজিৎ।

'লেখকাগজটায় লিখেছে, তোমার ছেলে কষ্টে থাকবে বলে হাসপাতাল থেকে যখন ফিরলে তখনই ওকে আমার কাছে রাখতে চেয়েছিলাম। এই টাকাতে ছেলেটাকে একটু সুখে রাখবে। প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাবে লেখকাও বলেছে।'

সুরজিৎ অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু পরে সুরজিৎকে সুনন্দা যা বলল তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ও।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুরজিৎ বলল—'একজন মা হতে চায়, অথচ আছে লালন পালন করার, সে তা হতে পারে না। তুমি আবার মা হতে চাও না অথচ তুমি সেই আবার—'

সুরজিৎ একটু পরে আবার বলল—'আমার মনে হয় যে আসছে তার মুখের দিকে চেয়ে এখুনি বৌদির কাছে আমাদের আবার ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'আমারও মনে হয় তাই', বলল ফের সুনন্দা, 'নয়ত মাসের পর মাস এভাবে টাকা নিয়ে আমাদের বোধহয় পরাজয়ই বরণ করতে হবে।'

সুরজিৎ একটু পরে আবার বলল—'আর বৌদির অন্তেও বোধহয় যাওয়া উচিৎ।'

সুনন্দার চোখে জল এল একটু পরে।

তৃপ্যতু

সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমিতা, বিশ্বজিৎ-প্রমিতার বেশ বেশীবয়সের সন্তান—ওদের দাম্পত্য সম্পর্কে তখন যেমানান্ একটু চিড় খেয়েছে। বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার সাহেব ততদিনে বেশ একটু সমাজিকেই 'ডোজ' বাড়িয়ে দিয়েছেন—যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা। ব্লাক এ্যাণ্ড হোয়াইট্ নিয়ে যতোরা আলোচনা ডিক্যাণ্টার থেকে নেমে এসে পৌঁছতো গ্যাসপে ও ক্যাণ্টারে, তারপর অধরামৃত স্পর্শ করে অগ্নিস্বরূপিনী হয়ে উঠতো যাহা বহ্নি মুখে। বিশ্বজিৎ তখন শুধু একজন বড় আইনজ্ঞ নয়, নেতা, বক্তা, নায়ক, দেশের জন্য দশের জন্য সদাসদা হয়ে বক্তৃতা করছেন, ভোটরদ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন, মানভঞ্জনের পালা গাইছেন, হাততালি পাচ্ছেন। বাহবা, বাহবা, নন্দলাল।

পিউরিটান ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে প্রমিতা আপটুডেট্ হলেও অতোটা বরদাস্ত করতে পারলেন না, বিশেষ করে বিশেষ ধরণের বান্ধবীদের অভ্যাগম। পুরুষের বিলাসের উপকরণ হওয়া ছাড়া মেয়েদের ঊর্ধগতির কী আর কোনো সার্থকতা নেই। কে'কে চাপলো ওঁর, যে নিজের মেয়েকে গড়ে তুলে তিনি দেখাবেন পুরুষ-নিরপেক্ষ জীবনেও নারীর মূল্য আছে কিনা এই ভারতেরই এক তপস্বিনীর কণ্ঠে একদিন উদ্গীত হয়েছিল—যাতে আমি অমৃত হবোনা, তা নিয়ে কি করবো—ধন নয়, মান নয়। প্রেম, ভালোবাসা—এসব ছেলে মানুষী কথার কথা, লোলুপতা মূঢ়তা, জৈব আকর্ষণ ছাড়া আর কী? কিন্তু, কেঁপে ওঠে তার মন বিশ্বজিৎকে তো তিনি ভালোবেসেই গ্রহণ করেছিলেন, তবে —শক্তি দাও ভগবান, শক্তি দাও, পথ দেখিয়ে দাও। তাই দাম্পত্য কলহ যখন হলো, তখন সমুক্তিয়ায় পর্যবসিত হলোনা, অমামুত, ঋষিপ্রাণের উপমা অমামুত হয়েই পড়ে রইলো। আলাদা হয়ে গেলেন ওঁরা।

সুমিতার বয়স তখন একবছর—আমার উপর জোর হুকুম ছিল, মেয়ে যেন বাপের কাছে না যায় নিজে তখন প্রায় সন্ন্যাসিনী—জগতপ পূজা অর্চনার দিকে মন ফিরে গেছে এই আধুনিকার—ঠিক করলেন বালীগঞ্জের তালীকুঞ্জ ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকবেন, সহরতলীতে, গঙ্গাধারে মেয়েকে নিয়ে বিধুবিধিকে আশ্রয় করে, ওঁরই সম্পর্কে এক বিধবা দিদি, এক আশ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত—স্বামীর সঙ্গে আর নয় আইনতঃ বিচ্ছেদ না হলেও স্বামীকে মনে জানে চিঠিতে লিখে অব্যাহতি দিয়ে ছিলেন তিনি। ওঁর নিজের মনে সে দলিল পাকা। শুধু সিঁথির সিন্দুর নয়, নামধাম পরিচয় সবই মুছে ফেললেন নিজের হাতে অর্থ সাহায্যও নিলেন না।

সুমিতাকে মানুষ করতে গিয়েই ভাগ্যের আঘাত খেলেন তিনি আবার। কী গভীর মমতা আর আসক্তি নিয়ে নিজের মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। শিশু সাইকোলজীর কতো বই পড়েছেন রাতজেগে, কতো ধ্যানধারণা করেছেন নিজের মেয়েকে ঘিরে। লোকজন পূর্বপরিচিত আত্মীয় স্বজনদের কেউ কেউ যে আসতোনা তা নয়, সবার সঙ্গে বাইরের হৃদ্যতা ছিল, অন্তরের আত্মীয়তা নয়। কিন্তু তাদের উপর প্রমিতার কড়া হুকুম ছিল, বাপের কথা যেন মেয়েকে বলা না হয়। কোনো ফটো ছিলনা বিশ্বজিতের ওদের কাছে। প্রমিতার কাছে কথায় কেউ কোন ত্রুটি ধরতে পারতোনা—কঠিনে মাখা কর্তব্যপরায়ণা এক নিষ্ঠাবতী নারী নিজের আগুনেই জ্বলেছে, পুড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিমতী হয়ে নিজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে চলেছে। এদিকে সুমিতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুমনের স্বাভাবিক কৌতূহল বশতঃ তার বাপের কথা মনে হতো—কোথায় তিনি, তাঁর বিস্তৃত পরিচয়। প্রমিতা কিন্তু কথা শুনতে দিতে একেবারেই নারাজ—কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠেছিলেন ঐ একটি বিষয়ে। বিন্দুবাসীকে সই সই করে বলা ছিল। সুমিতা শিশুমনের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বুঝতো যে এখানে গলদ না থাকে গোলমাল আছে। একদিন যখন তার বারোতেরো বছর বয়স তখন স্কুলে এক সহপাঠিনীর কাছে মায়ের নামে কটূক্তি শুনেছিল যে তিনি স্বামীত্যাগিনী, স্বাধীনা জেনানা। বাড়ীতে ফিরে এসে তার চোখের জলের বিরাম ছিলনা। বিন্দুবাসী এসে সব শুনে বলেছিল—তুই বড়ো হ—সবই জানবি, বুঝবি, তবে এইটুকু জেনে রেখে যে যে তোর মাকে লোকে অপবাদ দিলেও ওর ভেতরে যা তেজ আছে তাতে পাঁচশোতটা সতীকুলললক্ষী ভস্ম হয়ে যায়। তোর মা এমন কিছু করেননি, যাতে লজ্জা পাবার আছে।

আমার বাবা, তিনি কোথায়, তিনি কে—

জানবি, জানবি, সবই শুনবি—

সুমিতা তার মায়ের রূপ আর অঙ্গসৌষ্ঠবের কিছুটা পেয়েছিল। তার পা দুটো আপনি নেচে উঠতো হাতের কঙ্কণ কন্ কন্ করতো, দেহটা দুলে উঠতো পাকখেয়ে। প্রমিতা বলতো—তুমিকে আমি শিল্পী করবো, এমন শেখাবো যে উর্বশী মেনকা রম্ভা মিশ্রকেশীরা হার মানবে।

বিন্দুবাসী জবাব দিতেন—তোর মেয়ে নাচওয়ালী হতে পারবেনা—

ঠিক বলেছো দিদি,—ওকে আমি শেখাবো পুজারিণী নৃত্য, নাচের মধ্য দিয়ে সে ভোগের নৈবেদ্য হবেনা, হবে পূজার ফুল, শুভ্র অনাঘ্রাত। তাইনে বাবে দুর্গ মাসে নব অন্নের মাসে কবিগুরুর নটীর পূজার তখন খুব প্রচলন।

সুমিতারও মনে যেন রং ধরে গেলো। নাচ, নাচ, নাচ, কতো ধরণের কত রকমের নাচ—মার মতো উৎসাহ মেয়ের তেমো উদ্দীপনা। তিনবছর ধরে নাচ শিখছিলো সুমিতা। কতো সভায় সমিতিতে, আসরে বাসরে, উৎসবে অনুষ্ঠানে তার আমন্ত্রণ হতো, দৈনিক মাসিক বার্ষিকীতে নাম ও ছবি বেরিয়েছে কিন্তু পিতৃ পরিচয় বিহীন। কিন্তু কয়েক বছর পরেই সে বুঝতে পারলে তার শরীর ভারী হয়ে আসছে, নাচের ছন্দে পা দুলতে চায়না, দেহ সাড়া দেয়না। মাকে বললে, বিন্দুবাসীকে বললে। ছুটলেন তাঁরা ডাক্তারের কাছে, স্পেশালিষ্টের কাছে। বৃদ্ধ ডাঃ সোম শেষ রায় দিলেন—মা, এ হচ্ছে গ্ল্যাণ্ডের ব্যাপার ভয়ের কিছু নেই, শুধু লিখে দিচ্ছি তবে নাচ আর চলবে কিনা, বলতে পারিনা।

তার মা তার দিকে তাকালেন সর্বহারার দৃষ্টি নিয়ে। সুমিতা কিন্তু একেবারেই মুষড়ে পড়েনি —বাচ গেলো তো কী হয়েছে, গান আছে, আঁকা আছে, সেবাপড়াতো চলছেই—অন্তত: গানের মধ্য দিয়েই নিজেকে ফুটিয়ে তুলবে সে। মার অজান্তেই সুরসাধনা আরম্ভ করলে সে, বাচের সঙ্গে কিছুটা অভ্যেস তো ছিলই। দিনরাত শুধু গান আর গান—সুরলহরী আর সুরবিতান, কর্ডব আর বিস্তার, বিস্তার আর ঝঙ্কার। এরই ভিতর সে বুঝে নিয়েছে আবহায়—সে কে, কোথায় বাড়ী, বাপের বাড়ির, মা অবশ্য বলতেন—তিনি মৃত, বিধুমাসীও প্রশ্ন এড়িয়ে যেতো। তখন সে কলেজে পড়ে, বিজ্ঞানের ছাত্রী।

একদিন হঠাৎ সর্দি লেগে গলাটা ভারী হয়ে উঠলো। মা, বিধুমাসী দৌড়ে এলো, আবার ডাক্তারের ঘর ভিড় করলো, পরীক্ষা বসো এস্বরে দিয়ে, দেওয়া হলো আন্ট্রাভায়োলেট রে, কোবাল্ট রে, কত কিছু। সব কিছু বিক্রী করে মা নিয়ে গেলেন ভিয়েনায়, কোপেন হেগেনে—ফল হোল না কিছুই —প্রাণ রাখতে গেলে গান শুধু বন্ধ নয়, জ্যোকাল কর্ডের কিছুটা বাদ দিতে হবে—তা নাহলে পরে ক্যান্সার। ঘরেতে ঝরল শুধু মনে মনেই গুনগুনিয়ে চলে গেলো।

গান যখন শিকেয় উঠলো, তখন তার বয়স মাত্র উনিশ, বি. এসসি. পাশ করেছে—ততদিন সে জেনে ফেলেছে তার পিতৃপরিচয় মা ও বিধুমাসী না বললেও—দেশের অভিকৃতী পুরুষদের একজন তিনি, তাঁকে সজ্ঞানে দেখেনি, পিতৃ স্নেহের আস্বাদ পায়নি, তবু কাগজে মাসিকে ছবি বেরিয়েছে, তাই থেকেই একটা রূপ সে নিয়েছে এঁকে মনে মনে, ধরেছে—না, না, নিজের সন্তানের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা মমতা ভালোবাসা নিশ্চয়ই আছে, ভেবেছে সাবালিকা হয়ে কলকাতায় গিয়ে একদিন হঠাৎ চমকে দেবে তাঁকে। কিছু বলতে না অবশ্য মাকে বা বিধুমাসীকে। ওঁরা দুজন তখন আবার প্ল্যান করছেন সুমিতার ভবিষ্যৎ।

বিধুমাসী বললে—এবার ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর—

প্রমিতা চটে বললে—হ্যাঁ, সেই সনাতন বিধান্—মেয়েদের যেন আর কিছু করবার নেই, আঁতুড়ঘর আর রান্নাঘর না করুক, স্বামীর মনোরঞ্জন—নৈব চ নৈব চ—

সুমিতা জবাব দিলে—তোমরা মিছে ভাবছো মা, আমার ভাগ্য গড়বার অধিকারটা আমাকেই ছেড়ে দাও না—এম্. এস্. সির.-পর রিসার্চ করবো—সেও মধুরের উপাসনা—আর তুমি যে নিজেও তো এতদিন টুং-টাং করলাম—

মা ভাবলেন—তা বটে—

বিধুমাসী কিন্তু ওর মাকে জপায়—শিক্ষাদীক্ষার অর্থ হচ্ছে জীবনকে শুচিস্নাত সংযত সাহত করার কৌশল—মেয়ে ঘরে নেওয়া—গুরুদেব তাই বলেন—প্রাণকে ফুলের মত ফুটিয়ে দিতে গেলে আর একটি প্রাণের দীপশিখায় জ্বালিয়ে দিতে হয়—তুই পারিস নি বলে, তোর মেয়েকেও কানে কানে সেই মন্ত্র দিবি? এ যে তোর বন্ধুকতাও পথ, ওর বাপের কোন খবর ওর কানে তুলবি না, বলবি, সে মরে গেছে, কিন্তু ও কী একদিন জানবে না, তখন ভাববে কী বল দিকিন্—সত্যকে সহজ করে দেওয়াই হচ্ছে আসল তপস্যা।

হয়তো ভালো করিনি—বয় বয় করে কেঁদে ফেললেন প্রমিতা দেবী—বললেন—ওর বাপ কতো প্রতিষ্ঠাবান, আমার বোধ হয় উচিত হয়নি ওর পিতৃ পরিচয় লুকিয়ে রাখা—ওর এখন বয়স হয়েছে। ভালোমন্দ বিচার করবে নিজে।

যাক্, ওকেই জিজ্ঞেস করু—কী করবে—বাপের কথা ওর অজানা নয়—

জানে ?—বলে চমকে উঠলেন প্রমিতা দেবী।

হ্যাঁ—বললেন বিন্ধ্যবাসী, তারপর—আয়, বলে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলেন সুমিতার স্টুডিয়ো ঘরে। প্রমিতা বিশেষ আসতেন না এদিকে। হঠাৎ একটা ছবির ঢাকা খুলে তুলে ধরলেন।

বিন্ধ্যবাসী। আঁ!—একী—বলেই থরথর করে কেঁপে বসে পড়লেন প্রমিতা। এই কী সেই ভণ্ড মানুষটি যে তাঁর যৌবনের চরম দিনে তাঁর হৃদয়কে দাবী করেছিল, যার প্রতিকৃতিতে ঘৃণা পরেও আজ মন থেকে নির্বাসন দিতে পারেন নি, সেই ভদ্রলোকটিই ছবিতে পূর্ণাবয়ব লাভ করে তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে তাঁর কন্যা। এ যে শিল্পীর মন দিয়ে দেখা, ধ্যান দিয়ে গড়া এক অবিস্মরণীয় কান্তিমান পুরুষ, বাইরের কাদা যাকে স্পর্শ করেনি, অন্তরের মহিমায় যিনি সমুজ্জ্বল। তাঁর অবচেতনে এই মানুষকেই যে তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত রূপ যৌবন, আশা আকাঙ্খা কাম-কামনা দিয়ে—তারই ফলশ্রুতি তো তাঁর কন্যা। তাকে তার পিতৃ পরিচয় থেকে বঞ্চিত করার অধিকার তাঁর নেই। তিনি বললেন তাকে পিতৃ সন্দর্শনে যেতে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি মেয়ের আঁকা ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন নির্নিমেষে, উপেক্ষাতাপার ইব লোচনাভ্যাম।

বলতে হোলনা বিন্ধ্যবাসী দৌড়ে এসে চোখ মুছে একটা কাগজ এগিয়ে দিলে ওর কাছে—আগুনের লেখার মত অক্ষরগুলো বহ্নিময় হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো চোখের উপর। অভিভূতের মত বসে রইলেন প্রমিতা। হ্যাঁ, সত্যিই,সুমিতার অন্নদাতা ভাগ্যদাতা পিতা মহামান্য বিশ্বজিৎ গতায়ু হয়েছেন—প্রশস্তির শেষ নেই—তিনি কর্মী, তিনি আদর্শবাদী, জ্ঞানী-গুণী বীমান, কতো প্রতিষ্ঠান তিনি গড়েছেন, কতো লোককে কত সাহায্য করেছেন কতো পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। এই বিশ্বজিৎই একদিন আশিক ছোতা ছিলেন দেশ মাতৃকার বেদীতে, গান্ধীযুগে ইনিই ছিলেন অদ্ভুত কর্মী, উহার বন্ধু বৎসল। লোকে বলে তাঁর সহকর্মী আনন্দময়ীর আন্তরিক চেষ্টা শিক্ষা মন্ত্রণাই নাকি তাঁর ঊর্ধ্বায়নের মূল শক্তি ছিল। সেরা মেয়েটি শিক্ষায়-দীক্ষায় তপস্বিনী মনস্বিনী না হোক এক অদ্ভুত দৃঢ়তায় বেঁধে ফেলেছিল বিশ্বজিৎকে। তার পরের যুগে এসেছিল প্রমিতা যখন তরা যৌবনের মত ভাবনার উষ্ণ স্পর্শের মোহমাদকতা মাতাল করে রেখেছে মনকে। প্রমিতা কিন্তু সেই তালে তাল দিয়ে চলতে পারেন নি তাই বেতাল হয়ে গেছলো তাঁর জীবন এবং বিশ্বজিৎও ভেসে গিয়েছিলেন অর্থের ও আভিজাত্যের বন্যায়। কত কিছু ঘটলো তারপর, দেশের এপার-ওপার হয়ে গেলো আলাদা। মানুষ হলো অমানুষ, অমানুষ হলো মানুষ। চক্র উঠলো, নামলো।

সুমিতা কিন্তু তৎক্ষণে জেনে গেছে মহাপ্রয়াণের কথাটা, ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে, শেষ দেখা দেখবে বলে। মুখোমুখী হয়নি যাঁর কোন দিন, কথা বলে গ্রহণ করেন নি যিনি তাকে কোন কালে, তাঁর মৃত্যুতে এতোটা বিচলিত হবে সে ভাবতেই পারে নি।

মন গুমরে গুমরে উঠছে—বাবা, বাবা—

বাড়ীর সামনে এসে দেখে এতো মৃত্যুর শোক নয়, এ যে সমারোহ। বাড়ীতে আলোতে ফুলেতে সমস্ত জায়গাটায় যেন উৎসবের সাজ-সাজরী বাজছে। মানুষগুলো ছুটোছুটি করছে, মিনিটে মিনিটে টেলিগ্রাম টেলিফোন চিঠি। সুবেশিনীরা আসছেন, যুরছেন ফিরছেন, সত্যিই গীতাপাঠ এরা করেছিল বটে—এই বিগতশোক অনুদ্বিগ্নচিত্ত লোকেরা।

সুখেন্দু বিস্তব্ধ নাই বা হলো—
ফুল, ফুল—
চন্দন কাঠ অন্তত:—
ক্রমেটোরিয়ামটা চলছে তো—
তার এস্টেটকে 'কেবল্' গেছে—
'ইউ পি আই,-কে খবর দেওয়া হয়েছে—
নিউইয়র্কে টেলিফোন করলে কে?—
কীর্তনওয়ালায়া কই—
নিউজরীলে ছবি নেবার কী ব্যবস্থা হোল—
প্রেস করেস্পনডেন্টরা কোথায়?
ইন্দ্রপাত হলো মশাই—

কি হয়েছিল যে, ইরানীং তো বেশ ভালই ছিলেন—মিসেস্ তো রাবে সেই কথাই বলছিলেন, নতুন ট্রিটমেন্ট'—

নবতমটি কে ছিল কোন বিশ্বা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কাটতো রাত? কুমার বন্ধুর শ্রীরাধা ত্যাগ তো অনেকদিনের—

দেখেননি ক্যাডিল্যাকটা রাত্রে কার দুয়ারে বাঁধা হতো—
লাইসেন্স, পারমিট সিনেমাস্টার—
তারপর রাখো এখন, সেরীকে মিটিং ডাকতে বলা হচ্ছে কবে?—
কমার্সচেম্বার কাউন্সিল কর্পোরেশন হাইকোর্ট রেকারেন্স—
আরে সুপ্রীমকোর্ট এবং দিল্লীতে হওয়া চাই—
দিল্লী আর দূর অস্ত নয়, হাসা—
এন্ড্রোর্সমেন্টটা মুভ করছে কে?

গয়না, চেলী, জোড়, নতুন খাট, ফুল, ফটোগ্রাফার, ষোলকরতালের মধ্যে মৃত্যুর যে রাজসিক মহিমা দেখলো সুমিতা, তাতে মনে হলোনা কোথাও এক বিন্দু নয়নের জল কেউ ফেলেছে। শুধু সে সজল চোখ দেখছে তার জন্মদাতা চলেছেন গম্ভীরোক্তিঃ পরিক্ষিঃ—যত্র ন পূর্বে পিতরঃ পরেষু—

ভাবতে ভাবতে কেওড়াতলার বহুৎসবের প্রাঙ্গণে হাজির হলো সে জনতা মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে। কেউতাকে চেনেনা, কেউ তাকে জানেনা, যে এখানে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে ঐ সদ্যমৃত বিশ্বজিতের আত্মার আত্মীয়তার সম্পর্ক রেখে এবং মনে সেই সত্যিকারের পারলৌকিক কর্মের অধিকারিনী—

বাবা, বাবা—বলে চুকরে কেঁদে উঠলো সে। আস্তে আস্তে নেমে গেলো আদিগঙ্গার নদীর ঘাটে। এক গণ্ডুষ জল দিলে বিদেহী আত্মার উদ্দেশে—তৃপ্যতু। মৃত্যুই তাকে নিয়ে যাক্ অমৃতে। হাঁগো কে গেলো গা তার সর্বনাশ হলো।

বিদুষাসী প্রমিতাকে খবর দিয়েই বুঝেছিল, সুমিতাকে কোথায় পাওয়া যাবে। তারই খোঁজে পিছনে আসছিল সে এগিয়ে বসে বললে চল্ সুমি, তোর মা একা রয়েছে—

যা, যাবা।

ঘুম নেই

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এত তাড়াতাড়ি যে সব শেষ হয়ে যাবে তা বোধ হয় ওরা কেউ ভাবেনি। না ত্রিদিবেশ না সুচেতা।

এইতো চার বছরও পুরো হয়নি ওরা বিয়ে করেছে। বয়সটা চার বছর মাত্র হলেও মন বদলের পালা সুরু করেছে আরও দুবছর আগে। সেই যে এক শীতের শেষ রাতে এক মিষ্টি কণ্ঠস্বর ত্রিদিবেশের মেঘমনে নেশা ধরিয়েছিল। সেই জীবনে প্রথম মনে হয়েছিল ত্রিদিবেশের—পৃথিবীতে যা মধুর তাই যেন ক্ষণস্থায়ী।

আজ আদালত থেকে ফিরে শূন্য ঘরখানির দিকে তাকিয়ে সেসব কথা মনে পড়ছিল ত্রিদিবেশের।

মনে হচ্ছিল সে যেন শ্মশান থেকে ফিরেছে। যেন নিজে হাতে চিতা জ্বালিয়ে চলে এসেছে ত্রিদিবেশ। সুচেতার দেহ, অস্থি, মাংস, স্নেহ-মমতা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মৃত্যুইতো। সুচেতা মিত্রতো আজ থেকে মৃত। একটা অশরীরী কল্পনা অথবা শূন্যময় অস্তিত্ব মাত্র। আদালত আজ থেকে সুচেতা মিত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। সুচেতা মিত্র বেঁচে নেই—বেঁচে আছে সুচেতা রায়।

আর সুচেতার হৃদয় থেকেও ত্রিদিবেশের মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন। আজ আদালতে সুচেতার সিঁথির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিল ত্রিদিবেশ। বিবাহিত জীবনের শেষ চিহ্নকে নির্মূলভাবে বিলাপ করে ফেলেছে সুচেতা। একটা শূন্য প্রান্তর। হাহা করে ওঠা এক মরুভূমি। রিক্ততা যে এত নিদারুণ, এত হিংস্র এত হৃদয় বিদারী হতে পারে ত্রিদিবেশ যেন এর আগে কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেনি।

এই ঘর এই শয্যা। এই শয্যা সুচেতা একদিন নিজে হাতে পেতেছিল। এই বালিশের ওয়াড়ে ফুলের কাজ সুচেতার। ড্রেসিং টেবিলে সুচেতার এক কটো ছিল সেটি অনেক আগেই সরিয়ে ফেলেছে। যা বর্তমান তাকে নিয়েই জীবন। অতীতের স্মৃতির অবশেষ ত্রিদিবেশ বোধ হয় এমনি করেই মুছতে চেয়েছিল। যেমন করে সে সরিয়ে ফেলেছিল সুচেতার তোয়ন; আলমারি বইপত্র। সেগুলি সে মোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুচেতার বাড়ি। সুচেতা নিতে আপত্তি করেনি।

কিন্তু এই শব্দটা এখনও রয়ে গেছে। ভাবল বেডের খাট। এটিকে পরাবার ইচ্ছা যে তার হয়নি তা নয়—কিন্তু কোন উৎসাহ দেখায়নি।

আর রয়েছে টেলিফোন।

নিথর নিস্তব্ধ এই ঘরটার সঙ্গে সুচেতার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই রিসিভারের ভিতর থেকেই সুচেতার প্রথম সংক্ষিপ্ত কথা দুটি ভেসে এসেছিল দু'বছর আগে।

ত্রিদিবেশ ইনজিনিয়র। তাকে উঠতে হয় ভোর রাতে। ঠিক দু'টায় সময় ডিউটি আরম্ভ। শিয়ালদহ থেকে পাঁচটায় ট্রেন ধরে তাকে নামতে হয় শহরতলীর স্টেশনে। অতএব রাত চারটের তার ওঠা চাই।

নতুন চাকরিতে ডিউটিটা এই রকমই ছিল, ত্রিদিবেশ এমনিতে লেট রাইজার। তাই সে ফোন করে রেখেছিল অ্যালার্ম সেকসনে। তাকে ভোর চারটের সময় জাগিয়ে দিতে হবে।

ঠিক ভোর চারটের ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

হ্যালো।

গুড মরনিং। ওয়ান সেভেন থ্রি।

থ্যাঙ্ক ইয়ু।

দুটি মাত্র কথা। কিন্তু কানে লেগে আছে মিষ্টি জল তরংগের আওয়াজ। যেন ভৈরোঁর আলাপের প্রথম একটি কলি। গুন গুন করে এক লাইন গেয়ে কে থামিয়ে দিয়েছে।

পরের দিনও সেই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দ। আশ্চর্য, এত মিষ্টি যার কণ্ঠস্বর সে কি করে এত যান্ত্রিক হতে পারে!

তিনদিন পরের কথা। সেদিন কিন্তু ঘুম ভাঙল না টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে। ত্রিদিবেশ ধড়মড় করে উঠে দেখল ইস কত বেলা হয়ে গিয়েছে! অথচ—অথচ গতকাল রাতেও তো সে ওয়ান সেভেন থ্রি কে ফোন করে বলেছিল তাকে ভোর চারটেয় জাগিয়ে দিতে।

অফিসে লেট হয়ে গেল। এবং সারাদিন রাগে সারা দেহ জ্বলে যেতে লাগল ত্রিদিবেশের। বাড়ি ফিরে সে একটা কমপ্লেন করল।

টেলিফোন অফিস থেকে তাকে জানানো হল, অভিযোগের ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ অনুসন্ধান করবেন। ত্রিদিবেশ যেন নিশ্চিন্ত থাকে।

রাত তখন দশটা, তখন বেজে উঠল টেলিফোন। হ্যালো নমস্কার। আমি ওয়ান সেভেন থ্রি থেকে বলছি।

সেই মেয়েটি। সেই কণ্ঠ। সেই জল তরংগের মিষ্টি আওয়াজ।

বলুন।

আপনিই কি একটা কমপ্লেন করেছিলেন?

হ্যাঁ। আমাকে কাল রাতে জাগিয়ে দেওয়া হয়নি। দেখুন, কাল আমি কিন্তু আপনাকে রিং করেছিলাম। আপনার নম্বরও আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু নো রিপলাই পেয়েছি। অবশ্য আমি খুব বেশীক্ষণ ওয়েটিংয়ে করিনি। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে আরও কয়েকটা রিকোয়েস্ট ম্যাটেও করার ছিল।

আমি কোন দিই নাইনি।

হয়ত আপনি ঘুমোচ্ছিলেন। শুনতে পাননি।

আমার ঘুম একটু সজাগ। কিন্তু তাই বলে—।

অনেক সময় হয়। আর সাউণ্ড স্লিপ হওয়াতো ভাল লক্ষণ। দূরভাষিণীর কণ্ঠে এবার যেন কিছুটা সহানুভূতি ঝরে পড়েছিল।

আপনি বোধ হয় ফিজিক্যাল লেবার বেশী করেন।

ঠিকই ধরেছেন। আমি ইনজিনিয়র।

আপনাদের ঘুম ভাঙানো একটু ডিফিকালট বই কি?

কেন, আমরা কি কুম্ভকর্ণ।

না, তা বলছিনা। তবে আপনাদের বাটুনি হয় খুব। একজন প্রফেসর কিংবা ল-ইয়ার দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরেন। ইনজিনিয়ারদের একটু ধরতে দেরী হয়। তার মানে কিছু নয় —সাউণ্ড স্লিপ।

নিদ্রা সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন দেখছি।

গবেষণা নয় অভিজ্ঞতা। আচ্ছা ছাড়ছি: কেমন?

ছাড়ার আগে বলেছিল, আজও আপনার নম্বর পেয়েছি। দেখবেন যতক্ষণ না ওঠেন ততক্ষণ বাজতে থাকবে।

তাই হয়েছিল। ইচ্ছা করেই দ্বিপ্রহরের প্রথম দিকে টেলিফোন ধরেনি। ক্রিং ক্রিং করে বেজে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। ধরল প্রায় দু' মিনিট পরে।

শুভ মর্ণিং ওয়ান লেভেন থ্রি।

থ্যাঙ্ক-ইয়ু।

বাব্বা! এত ঘুম আপনার?

যদি বলি পরীক্ষা করছিলাম।

কার পরীক্ষা? আমার ধৈর্যের না প্রতিক্ষমতার?

যদি বলি দুটোরই।

পাশ না ফেল?

পাশ। তবে ফার্স্ট ডিভিশন নয়।

দারুণ কড়া এগজামিনারতো আপনি? ফার্স্ট ডিভিশন না হবার কারণ কি?

আপনি পরিচয় দিচ্ছেন না। আলাপ যখন হয়ে গেল তখন নামধাম জানতে দোষ কি?

তাহলে বোধ হয় কমপ্লেন জানাতে সুবিধা হবে?

কমপ্লিমেণ্ট জানাতেও সুবিধা হতে পারে।

থাক। অত সুখে আর কাজ নেই।

আমার তো কাজ থাকতে পারে।

আমরা দূর ভাষিনী। দূরেই থাকতে চাই।

সুহাসিনী এবং সুমধুর ভাষিনীও।

অবজারভেশন দেওয়া এখন থেকেই সুরু করলেন ?

এক অর্থে তাই। সেই সুরু। প্রশংসায় সুরু সেখানে থেকে। মুগ্ধতায় সুরু সেখান থেকে এবং বোধহয় প্রেমেরও।

শেষ প্রহরের নিস্তব্ধতা ঘিরে রেখে পৃথিবী। খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসে হাসুহানার উগ্রগন্ধ। পুবের আকাশে প্রতীক্ষোন্মাদনা।

সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। মাত্র আধমিনিট অথবা এক মিনিট। নাম জেনে নিয়েছে ত্রিদিবেশ—যুবতাবিনীর নাম সুচেতা। সুচেতার হাতে সময় খুব কম। তাকে অনেক অনেক লোককে জাগাতে হবে।

মাস দুয়েক এমনিভাবে চলার পর দেখা করল দুজনে। দাঁড়িয়েছিল শহরের এক ছবিঘরের সামনে। চোখে গগলস। লাল শাড়ি। লাল ব্লাউজ। আর ত্রিদিবেশ এসেছিল কালো টাউজারস আর শাদা বুশ শার্ট পরে।

চিনে নিতে কষ্ট হয়নি।

দুজনে গিয়ে বসেছিল ময়দানে।

সুচেতা বলেছিল, আমি কিন্তু কোনও দিনও তাবিনি না দেখা মানুষের ডাকে এমনিভাবে চলে আসব।

ত্রিদিবেশ বলল : আমিও ভাবিনি শুধু কথা শুনেই কাউকে দেখার জন্য মন ছটফট করবে।

আপনার অমন বিদঘুটে ডিউটি কেন ? সবাই যখন ঘুমোচ্ছে তখন আপনাকে উঠে যেতে হয়।

আপনারও তো অমন বিদঘুটে ডিউটি। সবাই যখন ঘুমোয় তখন জেগে থাকতে হয়।

আমার জাগাতো আপনাদের জাগাবার জন্যে।

আপনার তাই একটা নাম মনে মনে ঠিক করেছি।

কি নাম ?

ভোরের পাখী। ভোরের পাখী যেমন পৃথিবীকে জাগায় তেমনি আপনারাও জাগিয়ে দেন ঘুম থেকে।

পাখীরা তো শুধু কলরব করে।

যার হৃদয় আছে সে বোঝে ওটা অর্থহীন কলরব নয়—ওটা গান।

॥ ২ ॥

শেষ পর্যন্ত ওরা বিয়ে করেছিল।

মন দেওয়া নেওয়ার পালা শেষ। এবার ঘর বাঁধার দিন। মেপে মেপে বেলাতো কম হ'ল না। ত্রিদিবেশের বয়স তো চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। কানের পাশে দু'একটি চুল পেকে গেছে এরই মধ্যে। এর মধ্যে চাকরিই বদল করেছে মোটা তিনেক।

সে তুলনায় সুচেতার বয়স বছর দশেক কম। তবে মেয়েরাতো বুড়িতেই বুড়ি। কিন্তু সুচেতার বয়স যে পঁচিশ পেরিয়েছে তা বলা মুশকিল।

ছিপছিপে দেহ। যৌবনের অতিরিক্ত ভার নেই তবে ধার আছে বোল আনা। ত্রিদিবেশের

মনে সন্দেহ ছিল ওকে দেখে হতাশ হতে পারে সুচেতা। কিন্তু অন্তরের ঘর তাকে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি। সুচেতার ঐ কণ্ঠস্বর তার মনে দেহে আলো ধরিয়েছিল।

এ থেকে তার মুক্তি নেই।

রাজি হয়েছিল সুচেতা।

সুচেতার সংসারে বাধা নেই। মা আছেন। কিন্তু বিধবা মায়ের স্নেহ আছে জোর নেই। বিশেষ করে চাকুরে মেয়ে। এ বিয়েতে তার দু'দলের একজনেরও তেমনি উৎসাহ ছিলনা। শুধু লৌকিক কর্তব্যের খাতিরেই তারা হাত্তিয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম কটা মাস কেটে গিয়েছিল এক মধুর আবেশের মধ্যে। ত্রিদিবেশ ও সুচেতা দুজনেই চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছিল একমাস করে।

ত্রিদিবেশ বলেছিল, চাকরিটা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে সুচেতা।

ওমা সেকী! টেলিফোনের এমন সুখের চাকরি! আরো চারশ টাকা মাইনে আমার।

আমিও এমন কিছু কম পাইনা।

তাওতো দেখে দুশো টাকা করে পাঠাতে হয়। ওটাকাতে ট্যাক্সারড্ মেকটেন হয়না। আমরা গাড়ি কিনব!

তোমার চাকরির টাকায়?

না কেন?

না। ত্রিদিবেশ গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল।

সুচেতা বোঝেনি। শুধু আলোয় রঙ্গা করেছিল। রাতের শিফটে সে আর কাজ করবেনা। এর জন্য বহু কাঠ খড় অবশ্য তার পোড়াতে হয়েছে। সকালের বা দুপুরের শিফটে কাজ করে সে ফিরে আসবে।

কিন্তু ত্রিদিবেশ যে তিমিরে সে তিমিরেই। তার সেই ভোর বেলার চাকরি। আর উঠতে হয় ভোর চারটেয়। ত্রিদিবেশ তাই রাতে বিছানায় শুয়েই ঘুমতে আরম্ভ করে। তাকে ভোর বেলা উঠতে হবে।

সুচেতা বলে: এত ঘুম তোমার!

ডেকে দেবার লোককে পাশে এনে রেখেছি। তাইতে এত নিশ্চিন্ত।

সুচেতা বলে, অত নিশ্চিন্ত হওয়া ভাল নয়। শোন আজ অফিসে যা একটা মজা হয়েছিল না…

ঘুমের ঘোরে ত্রিদিবেশ বলে, আঃ সু, কাল বিকেলে সব গল্প শুনব। এখন ঘুমটা দাও। চারটের সময় আমাকে যে উঠতে হবে!

সুচেতা রাগ করে বলে: বেশ তুমি ঘুমোও।

এমনি চলে প্রায় অধিকাংশ দিন। ত্রিদিবেশ ঘোরে তার পাশে এক পূর্ণ যৌবনা নারী তৃষিত দেহ নিয়ে ঘরময় ছটফট করছে। কিন্তু—কিন্তু বিছানায় শুলে সে যে চোখ খুলে শুয়ে থাকতে পারেনা। মনে হয় পৃথিবীর সব ঘুম এক সাথে অভিমান করে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সুচেতাও কি ঘুমোতে পারে নাকি? তাই ত্রিদিবেশ যে বিয়ের একমাস পরে এমনি ভাবে মৃতের মত বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে পারে তার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় বড্ড বেশী বয়স হয়ে গিয়েছে

ত্রিদিবেশের। যৌবনের উচ্ছল লীলাচপল মোহনীয় মুহূর্তগুলিকে সে বহুদিন আগে পিছনে ফেলে এসেছে।

অথবা ত্রিদিবেশের দুদিনের ভালবাসা ঘুচে গেছে। সারারাত বুঝি ঘুম আসেনা সুচেতার। কখন রাত্রির বয়স বেড়ে বেড়ে মৃত্যুর দিকে চলে পড়ে। ঘেলঘাঁনার ঘণ্টা বাজে। সুচেতার মনে পড়ে যায় রাত চারটে এখন। এই সময় ডেকে দিতে হবে এই নিথর নিশুপ বুড়ো পাইথনটাকে। চোখ মুছতে মুছতে সে চা খাবে। হাত মুখ ধোবে। নিঃশব্দে জামা কাপড় পরবে। আর যাবার সময় বড়জোর বলবে গুড বাই।

ত্রিদিবেশও কেমন হয়ে গেছে আজকাল। ওকি আজকাল বোঝে নাকি তার বয়স বাড়ছে। ইদানিং বেশ কটা চুলে পাক ধরেছে।

এত দুঃখের মধ্যেও সুচেতা সেদিন ঠাট্টা করে বলে। কেশে তোমার পাক ধরেছে। দু' একটা চুল তুলে দেব।

ত্রিদিবেশ যেন আঁতকে ওঠে। বলে : শোন সুচেতা।

বল।

আমার বেশী বয়স বলে তোমার এখন আফশোষ তাই না?

সুচেতা বলে : পুরুষের বয়স ক্যালেণ্ডারের তারিখ ধরে বাড়েনা। এ ম্যান ইজ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ হি ফিলস।

তার মানে শুধু দেহে নয় আমার মনেও পাক ধরেছে।

যা খুশী মানে করতে পার।

কিন্তু তুমিইতো একদিন বলেছিলে সাউণ্ড স্লিপ আয়ুর লক্ষণ।

আই টোলড অ্যাবাউট স্লিপ নট অ্যাবাউট স্লামবার।

কিন্তু আমি যে কিছুতেই রাত জাগতে পারি না। আর তাছাড়া তোর চারটের ঘোর ওঠা।

অমন চাকরি ছেড়ে দিলেইতো হয়।

কি বলছ? ওখানে আমি ডেপুটি ওয়ার্কস ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছি। সামনের জুনে প্রোমোশনের এতবড় একটা চান্স।

আমাকে শোনাতে এসনা।

সুচেতা প্লিজ। কাল কিন্তু তোরে ওঠা নেই। টুমরো ইজ সানডে।

তোমার ভিক্ষার দান আমি নিতে চাইনা। প্লিজ ডোণ্ট ডিসটার্ব মি, প্লিজ।

এরই কিছুদিন পরে নিরাপদর কথা জেনেছিল ত্রিদিবেশ। ওরই এক বন্ধু বলেছিল তোমার বউকে বিকেলে দেখলাম মোকামঘোতে। সঙ্গে এক ভদ্রলোক তোমার শালা বোধ হয়?

কি রকম দেখতে বলতো।

চোখে চশমা। কালো। বয়স এই বছর ত্রিশ।

নিঃসন্দেহে শালাদের কেউ নয়। কিন্তু আমতা আমতা করে সে প্রশ্ন কাটিয়ে গেল ত্রিদিবেশ। আর বাড়ি ফিরতেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করল সুচেতাকে। মোকামঘোতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

সঙ্গে কে একজন ছিলেন ?

পোয়েন্সারিতে পোক্ত হয়ে উঠেছ দেখছি।

ছিল কি ছিলনা ?

যদি বলি ছিল। আমার অফিসের বন্ধু। কি করবে তুমি ?

কি আর করব! বলতে এত সংকোচ হচ্ছে কেন ?

সংকোচ নয় ঘৃণা হচ্ছে। তুমি আমাকে বিয়ে করে কিনে নাওনি। আমার স্বাধীনতা আছে। আমি কারোর ডিপেনডেন্ট নেই। আই ওন্ট সুট মাই সেল্ফ।

সব-সব আর সব। চারশো টাকার লাগটে ধরাকে সরা জ্ঞান কর তুমি। চাকরিই তোমার সব। চাকরি ছাড়া তোমার অস্তিত্ব নেই।

তোমারওতো নেই। তোমারতো চাকরির উন্নতিই ধ্যান জ্ঞান। আমাকে খাটিও না। তোমার কোন কথা আমার জানতে বাকি নেই। ওলড ফুল।

কি বললে ?

কানও গিয়েছে দেখছি। শোন বলেছি ওলড ফুল! চিৎকার করে একথা বলতে পারি। একজন বুড়োর যা কিছু দোষ সব তোমার আছে।

॥ ৩ ॥

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে ত্রিদিবেশ এই সব কথা ভাবছিল। মাস ছয়েক পরে একদিন ভোরে ট্যাকসি ডেকে চলে গিয়েছিল সুচেতা। বাকি রিয়ে উঠেছিল নিরাপদর ফ্ল্যাটে।

অ্যাডালটারির মামলা আনতে বলেছিল অনেকে। ত্রিদিবেশের কাছে প্রমাণও ছিল। তার হাতেই সুচেতাকে লেখা নিরাপদর বেশ কিছু চিঠি আছে। ইথানিংতো নিরাপদ ত্রিদিবেশ না থাকলে এ বাড়িতেও আসত।

একটা শূন্যময় পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিদিবেশ ডুবে গিয়েছিল। একেই কি নিয়তি বলে বাকি!

আজ ছিল ডিভোরসের সেই মামলার রায় বেরুবার দিন। এক বছর সেপারেশনের পর কাইন্যাল রিয়ারিং। এ মামলা এনেছিল সুচেতা নিজে। চায়ন্ত এনেছিল নিষ্ঠুরতার। স্বামীর কর্তব্য একদিনও যে পালন করেনি সে নিষ্ঠুর নয়ত কি ?

সব শেষ হয়ে গেল আজ। ত্রিদিবেশ ভাবছিল। এত তাড়াতাড়ি যে সব শেষ হয়ে যাবে তা বোধ হয় ত্রিদিবেশ কোনদিনও চিন্তা করতে পারেনি।

আজ একবছর ধরে রাতে তার ঘুম আসেনা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। একটা প্রবল আশঙ্কিতে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। অস্থিরভাবে পায়চারি করে। বই নিয়ে পড়ে। আবার শুতে যায়।

এমনি করে ভোর চারটে বেজে যায়। ত্রিদিবেশের তখন অফিস যাবার সময়।

আজ, আজও ত্রিদিবেশ এমনিভাবেই জেগেছিল। প্রহর ঘোষণা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জেলখানার ঘন্টা। রাত চারটে বাজল এই মাত্র।

হঠাৎ—হঠাৎ চার বছর পরে আবার ভোরের টেলিফোন বেজে উঠল। কই? আজকালতো সে ওয়ান সেভেন থ্রিকে অনুরোধ জানায় না তাকে ডেকে দেবার জন্য। তবে? তবে কেন বেজে উঠল ফোন?

হ্যালো।

সুচেতা। সেই গলা সেই সুর। সেই একই ভাবে হ্যালো বলা।

হ্যালো।

ওয়ান সেভেন থ্রি। গুড মর্ণিং।

না। সে সব কিছু বলল না সুচেতা।

বলল: অফিস নেই আজ?

আছে।

আজ থেকে রাতে ঘুম ভাঙানোর ডিউটি নিলাম কিনা। তাই মনে হল, তোমাকে—। আর কিছু বলতে পারল না সুচেতা।

আর ত্রিদিবেশ? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। কি উত্তর দেবে সে।

সুচেতা, শুধু ঘুম ভাঙাতেই জানে, কিন্তু গত দেড় বছর ধরে ত্রিদিবেশ যে একান্ত ভাবে চেয়ে আসছে এমন কোন নম্বর যদি থাকত যেখানে ডায়াল করলে কেউ তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। দুবছর ধরে চোখে তার ঘুম নেই। কিন্তু সে নম্বর কিছুতেই মনে করতে পারল না ত্রিদিবেশ। আর পারলেও সে নম্বর থেকে দোষহর সুচেতা কোনদিনও কথা বলবে না।

ও ঘুম ভাঙাতেই শুধু জানে।

শুকনো গোলাপ

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

ফুলের ডোঙাটা কলেজস্ট্রীটের বাজার থেকে কিনে বেশ সাবধানে বাসে উঠলো বাসন্তী। লোকের ভীড়ে যেন এটা নষ্ট না হয়ে যায়। বাড়ী পর্যন্ত এইভাবে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে। এটা না কিনলেও এমন কিছু ক্ষতি হত'না। তবু সখ ক'রে যখন কিনেই ফেলেছে, তখন বাড়ী পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে বৈকি!

বাসন্তী মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছে যে, এটাকে ও রাখবে সোপার ঘরে ফুলদানিতে সাজিয়ে। অমন দেখলে হয়তো খুসীই হবে।

বিয়ের পর আটদিনের মাথায় ওরা আসছে। অবশ্য আসতে সেই সন্ধ্যে সাতটা। কিন্তু, এর মধ্যেই বাসন্তীকে সমস্ত গোছান, বাজার ক'রে রাখতে হবে। তারপর আবার রান্নার ব্যবস্থাও আছে—অনেক কাজ। যা কিছু করার, তাকেতো একাই ক'রতে হবে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলতে তো আর কেউ নেই?···

কিন্তু, সোপার ভাগ্যটা ভালোই ব'লতে হবে। ইদানীং সোপাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় প'ড়েছিলেন বাসন্তী। অথচ ওর সঙ্গে অমলের বিয়েটা যেন হঠাৎ হ'য়ে গেল। ঘোরা-ঘুরি নেই, ধরা-ধরি নেই, অমন বিদ্বান, সুপুরুষ এবং চাকুরে ছেলে পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা বৈকি!···

তবে দুঃখু রয়ে গেল যে, বাবা-মা দেখতে পেলেন না। কিন্তু, তাঁরা ওপর থেকে নিশ্চয়ই ওদের আশীর্বাদ করছেন। আর তার সঙ্গে বাসন্তীকেও নিশ্চয়ই। কেন না বাসন্তী তা'র কর্তব্য পালনে এতটুকু ত্রুটি কোথাও হ'তে দেয়নি।

মা মারা যাবার দিন বাসন্তীর হাত দুটো চেপে ধরে বলেছিলেন, 'সোপাকে দেখিস।'

আর মার মতো বাবাও, শেষ সময়ে বাসন্তীকে কাছে ডেকে ব'লেছিলেন, তুই তবু বড় হ'য়েছিস, লেখাপড়া শিখেছিস, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি; কিন্তু সোপার কী হবে? ওযে বড্ড ছোট?···

তাঁদের সেই দুটা সময়ের শেষ কথাগুলো যেন এখনও বাসন্তীর কানে বাজছে। অবশ্য ওরা যদি কিছুই না ব'লে যেতেন, তা'হলেও তো সোপাকে দেখার দায়িত্ব ওরই! এছাড়া আর কেই বা আছে সোপার এ পৃথিবীতে? যার অভাবে ওকে কখনও জানতে দেয়নি বাসন্তী। যদিও সোপা তার ছোটবোন, কিন্তু মার মতো গায়ে হাত দিয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়েছে। নিজে হাতে ওকে খাইয়ে দিয়েছে।

লেখাপড়ার দিকে নজর দিয়েছে। অর্থাৎ, কোন কিছুরই অভাব রাখেনি বাসন্তী। সব কিছুই সে সোপার জন্যে ক'রেছে। অবশ্য বাবা-মার জন্যে তার নিজেরও খুব মন কেমন ক'রত। সোপাকে কাছে টেনে, বুকে জড়িয়ে ধ'রে, দুঃখ ভোলবার চেষ্টা ক'রত ও।

কিন্তু সোপা যেদিন ফ্রক ছেড়ে সাড়ী পরতে আরম্ভ করল, সেদিন থেকেই আর এক চিন্তায় পড়ল বাসন্তী। আর এক দায়িত্বের বোঝা চাপলো ওর মাথায়। অবশ্য পাশের বাড়ীর বিভাদিরা সোপার জন্যে যথেষ্ট ক'রেছেন। ও'দের ঋণ জীবনে ভুলতে পারবে না বাসন্তী। ওঁরা না থাকলে বেশ একটু অসুবিধের মধ্যেই পড়তে হত। তবে একদিন বিভাদি এসে বাসন্তীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বল'লেন, 'একটা কথা তোমাকে ব'লব ভাবছি।'

'বেশতো, বলুন না।'

'সোপা যখন ছোট ছিলো, তখনকার কথা আলাদা। তুমি আমার ভরসায় রেখে আপিস যেতে, আর তাতে আমারও কোন অসুবিধে হ'ত না। কিন্তু এখন ও বড় হয়েছে, সোমত্ত মেয়ে। বুঝিতো সবই বোন'···

'আর যেদিন আপনাকে আলাতন ক'রব না সেদিনই ওর একটা ব্যবস্থা ক'রব।'—বাসন্তী বলল।

অবশ্য বাসন্তীর ইচ্ছে ছিলো যে, একটা পাশ ক'রলেই সোপার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রবে। কিন্তু তত্তদিনও অপেক্ষা ক'রতে হ'ল না: হঠাৎ এই ভালো সম্বন্ধটা জুটে যাওয়াতে আর হাতছাড়া ক'রতে মন চাইলো না। বলা যায় না, এমন সুযোগ হ'য়তো আর নাও আসতে পারে।···

কথা মতো ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় অলক আর সোপা এসে হাজির। ঘোমটার নীচে সোপার মুখটা কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

প্রথমে চা জলখাবার। তারপর ঠিক রাত সাড়ে নটায় আসন পেতে অলককে খেতে ডাকলো বাসন্তী।

সেজি গায়ে, কোঁচার খুঁটটা বাঁ হাতে চেপে ধ'রে, অলক আসনে এসে ব'সল। মাথা নীচু ক'রে খেতে খেতে অলক ব'লল, 'বাঃ। সুন্দর রান্না হ'য়েছে তো? এসব নিশ্চয়ই আপনার নিজের হাতের তৈরী?'

বাসন্তী মাথা নেড়ে ব'লল, নিজে ক'রছ নাতো?'

'না-না নিজে নয়—সুখ্যাতি।'

'তবু ভালো।'

জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে, অলক পুনরায় ব'লল, 'আপনার বোন ব'লে যে, দিদি আমাকে কোনদিন রান্না ক'রতে দেয়নি।'

বাসন্তী ব'লল, 'একথা ঠিক। তবে এবার আস্তে আস্তে সব নিয়ে নেবে।—একী। ওটা ফেলে রাখলে কেন? খেয়ে নাও।'

'আর পারছিনা দিদি। পেট একেবারে ভ'রে গেছে।'

অলক উঠে পড়ল।...

এবার সোপা আর বাসন্তী গল্প ক'রতে ক'রতে খেতে লাগলো। দীর্ঘ আটদিন পর দুই

বোনে একসঙ্গে হয়েছে। এই ক'দিনে ওদের মনের মধ্যে অনেক কথা জমা হ'য়ে আছে। এরপর আবার কবে দেখা হবে কে জানে।...

সমস্ত রকমের খুঁটি-নাটি কাজ শেষ ক'রে বাসন্তী যখন তার নিজের ঘরে এসে ঢুকলো, তখন ঢং-ঢং ক'রে ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজার আওয়াজ হ'ল। ওদের শোবার ব্যবস্থা হয়েছে পাশের ছোট্ট ঘরটাতে। কিন্তু বাসন্তীর এখন ঘুম পাচ্ছে। বড় ক'রে একটা হাই তুললো। অনেকদিন অনেক আগেই শুয়ে পড়ে সে। আজ বেশ একটু রাত হ'য়ে গেল। ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রতে এগিয়ে এলো বাসন্তী। এই যা। একেবারে ভুল। ফুলের তোড়াটাতো গোপালের ঘরে দিয়ে আসা হ'ল না? কিন্তু, এখনও তো দিয়ে এসে হয়। ওরা নিশ্চয়ই এখনও ঘুমোয়নি। তাড়াতাড়ি ওটাকে ডান হাতে চেপে বাসন্তী এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই হতাশ হ'য়ে পড়ল, ঘরের দরজা বন্ধ দেখে। কান পেতে শুনলো ঘরের মধ্যে ওদের কিস্ কিস্ কথার আওয়াজ। কম পাওয়ারের নীল আলোর রেখা দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে। ডাকবে না কী একবার? ওপাশের জানালাটা তো খোলা র'য়েছে। আস্তে আস্তে ঐ দিকে এগিয়ে গেলো ও। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই বাসন্তী মুখ ঘুরিয়ে নিলো। নাঃ! এখানে আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালো ও।...

ফুলের তোড়াটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে, ঘরের মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে বাসন্তী ভাবতে লাগলো যেটা আজ গোপালের ঘরে রাখার জন্যে বাসন্তী ব্যস্ত হয়েছে, সেটা তো এখানেও ফুলদানিতে সে সাজিয়ে রাখতে পারতো? সেওতো দিব্য চাঁদের আলোর মতো, কম পাওয়ারের নীল আলো জেলে, গোপালের মতো ফিস্ ফিসিয়ে গল্প ক'রতে পারতো? সেও তো...

কিন্তু হঠাৎ ফুলের তোড়াটার মাঝখানের ঐ শুকিয়ে আসা লাল গোলাপটার দিকে নজর পড়তেই, লজ্জায় কেমন যেন জড়ো-সড়ো হ'য়ে পড়ে বাসন্তী। ছিঃ-ছিঃ। এখনও সে বেহায়ার মতো এটাকে হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে?

স্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন

মীনাক্ষি সোম

লণ্ডন থেকে ৯০ মাইল দূরে, ওয়ারউইকশায়ারের একটি ছোট শহর স্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন। এখানেই ১৫৬৪ সালে জন্মেছিলেন শেক্সপীয়র। ছোট শহরটি আজ সারা পৃথিবীর তীর্থ।

শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে ইংল্যাণ্ডে গ'ড়ে উঠেছে অগণন কল-কারখানা। কিন্তু আগের মতোই আছে অমলিন স্ট্রাটফোর্ড শহর। এর রাস্তাঘাট, বাজার, বাড়ি-ঘর যেন পৌঁছে গেছে এলিজাবেথের যুগে। চোখে পড়ে পুরোনো কাঠের বাড়ি, একাণ্ডই ইংল্যাণ্ডের গ্রাম-অঞ্চলের রং-বেরঙের ফুল, সাদা-সবুজ ঘাসে-ঢাকা লন, পরিপাটি ফোপঝাড়ের বেড়া, প্রবীণ গাছপালা, শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত স্বপ্ন-মন্থর নদী অ্যাভন, তার স্রোতে ভাসমান দয়ালশ্রেণী, তীরে অবস্থিত 'শেক্সপীয়র মেমোরিয়েল থিয়েটার'। অ্যাভনের ঝিলমিল স্রোতে কাঁপে তার ছায়া।

মেমোরিয়েল থিয়েটার সত্যিকারের একটি স্মৃতি-সৌধ। মহাকবির নাটকগুলি বারবার অভিনীত হয় এখানে। জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তাঁর কল্পনার নর-নারীরা! লাল ইটের তৈরী আধুনিক রঙ্গালয়টির পরিকল্পনা মিস এলিজাবেথ স্কটের। ১৯২৬ সালে পুরোনো নাট্যশালাটি পুড়ে যাওয়ার পর তার জায়গাতে এটি তৈরী হয়। এই নব-গৃহ নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এসেছে পৃথিবীর সব দেশ থেকে। শেক্সপীয়রের মতো তাঁর স্মৃতি-সৌধ আন্তর্জাতিকতার মূর্ত প্রতীক।

শেক্সপীয়র যেখানে জন্মেছিলেন সেই বাড়িটি আবার স্ট্রাটফোর্ড-আপন-অ্যাভন-এর মূল এবং স্বাভাবিক আকর্ষণ। এক আশ্চর্য শান্তির নীড়। জাতীয় সম্পদ বিবেচনা ক'রে এই বাড়িটি কিনে নেয়া হয় ১৮৬৯ সালে। এর তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনার ভার 'শেক্সপীয়র বার্থ-প্লেস ট্রাস্টিস্'-এর হাতে। যেভাবে বাড়িটি সংরক্ষিত হয়েছে তা দেখলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। যতটুকু পরিবর্তন না করলেই নয়, কেবল তা-ই করা হয়েছে। সেকালের আবহাওয়া বজায় রয়েছে প্রায় পুরোপুরি।

যে ঘরে শেক্সপীয়র জন্মেছিলেন সেখানে আজো রয়েছে সেকালের ক'য়েকটি আসবাব: অষ্টম হেনরীর আমলের রীতিতে তৈরী একটি অলংকৃত সিন্দুক, এলিজাবেথের যুগের একখানা চমৎকার ওক-কাঠের-খাট, সপ্তদশ শতকের শিশুর দোলনা, সূচি-শিল্পের কিছু নমুনা।

বাড়িটি ঘিরে রেখেছে একটি সুন্দর বাগান। তাতে শেক্সপীয়রের নাটক আর কবিতার ফুলের নাম আর বর্ণনা আছে সেই সেই ফুল, ফুল, গাছপালা। বাড়ির একটি অংশে দুষ্প্রাপ্য বই, পাণ্ডুলিপি, ছবি ইত্যাদির মূল্যবান সংগ্রহ। এই সংগ্রহ-শালার সামনে দাঁড়ালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শেক্সপীয়রের জীবন ও সময়কাল।

অ্যান হাথাওয়ের কুটির

খড়ের ছাউনি, লাল ইটের দেয়াল, আর ক'ঠের জানালা নিয়ে ফুল-বাগানে ঘেরা অ্যান হাথাওয়ের কুটিরটি আজো দাঁড়িয়ে আছে সেকালের চেহারা নিয়ে। এখানেই বাস করতেন মহাকবির ভাবী স্ত্রী। একেবারে প্রথমে এ'টি ছিল একটি খামার-বাড়ি। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত বাড়িটি ছিল হাথাওয়ে পরিবারের দখলে। ওই বছরই বাড়িটি কিনে নেয় 'শেক্সপীয়র বার্থ ডে ট্রাস্টিস'। তাঁরা স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

স্ট্রাটফোর্ড-এর আরেকটি অবশ্য দর্শনীয় জায়গা হল 'নিউ প্লেস'। অবসর নেবার পর জীবনের বাকি দিনগুলি এখানেই অতিবাহিত ক'রে ১৬১৬ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন শেক্সপীয়র। এক সময়ে নিউ প্লেস ছিল শহরের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। রাজা প্রথম চার্লসের স্ত্রী রাণী হেনরিয়েটা মেরিয়া এখানে কিছুদিন ছিলেন। সেই নিউ প্লেস আর এখন নেই। কেবল আজো টিঁকে আছে তার 'নট গার্ডেন।' এলিজাবেথের যুগে যেমনটি দেখা যেত অবিকল তেমনি। সেই কেয়ারী করা ঝোপ-ঝাড়, লতাপাতা, ফুল।

'নট গার্ডেন'-এর লনগুলি সবুজ ভেলভেটের মতো। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরোনো তুঁতগাছ। গাছটি এখনো বেড়েই চলেছে। শেক্সপীয়র নিজের হাতে যে চারাটি পুঁতেছিলেন তা থেকেই এই গাছটির উৎপত্তি। 'নট গার্ডেন' এক সময়ে ছিল একটি কিচেন গার্ডেন ও ফলের বাগান। এখানকার শান্ত পরিবেশ ভালোবাসতেন শেক্সপীয়র। মাঝে মাঝে এসে বসতেন এই বাগানে, স্বপ্ন রচনা করতেন আপন মনে। পনেরো শতকে তৈরী 'হিল্ড চ্যাপেল' নামে গির্জাটির পশ্চাৎপটও 'নট গার্ডেন'। গীর্জার পরেই পুরোনো 'গ্রামার স্কুল'। হিল্ড-এর সহস্তরের শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে 'গিল্ড অব দি হলি ক্রস' নামে একটি সংস্থা ১২৯১ সালে এই শিক্ষায়তনটি তৈরী করে। শেক্সপীয়র নাকি এই স্কুলেই পড়াশুনো করেছিলেন। স্কুলটির সামনেরা 'গিল্ড হল।' ভ্রাম্যমান অভিনেতারা মাঝে মাঝে এসে এখানে অভিনয় ক'রে যেতেন। হয়তো তাদের অভিনয় দেখতে দেখতেই ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল বালক শেক্সপীয়রের সহজাত রঙ্গালয়-প্রীতি।

বিশ্রাম-স্থান

সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে 'হলি ট্রিনিটির প্যারিশ চার্চ'। এর চমৎকার চূড়াগুলির ছায়া পড়েছে জলে। ব্রিটেনের স্থাপত্য-নিদর্শনগুলির মধ্যে এই গীর্জাটির বিশেষ খ্যাতি আছে। সেকালের অন্যান্য গীর্জার মতো এই গীর্জাটিও ছিল পলাতক আর শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়। এর ভেতরে রয়েছে শেকলে বাঁধা একখানা পুরোনো বাইবেল। এর প্যারিশ রেজিস্টারে আছে শেক্সপীয়রের দীক্ষা গ্রহণ আর তাঁকে সমাধিত করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। গীর্জাটির পুব অংশে আছে একটি মনুমেন্ট। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর ক'য়েকদিন পরে তৈরী। মহাকবির একটি আবক্ষ মূর্তি। হাতে কুইলের কলম। একখানি সমাধি-ফলক নির্দেশ করছে তাঁর চির-বিশ্রামের স্থান। প্রতি বছর একটি শোভাযাত্রা তাঁর জন্মস্থান থেকে যাত্রা ক'রে এসে থামে তাঁর সমাধির পাশে। চির-নিদ্রিত মহাকবির প্রস্তর শয্যায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দেশ-বিদেশের অসংখ্য নরনারী।

রত্নাকর

নাটক দেখতে যারা আসে পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স অর্থাৎ শ্রোতা।

কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যই অভিনয়।

শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশ বাক্য—রথবেগং নাটয়তি।

বোঝা যাচ্ছে রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশিত হত। রথের দ্বারা নয়।

রবীন্দ্রনাথ

নাট্য চিন্তা

কাব্যেষু নাটকম্

কাব্যের মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ। আর কাব্য মাত্রেই একটা ছন্দ আছে। অতএব নাটকেও একটা ছন্দ আছে। আর ছন্দের কাজই হচ্ছে মনকে তৃপ্তি দেওয়া, এক কথায় মনের খোরাক যোগানো।

দেশ ভেদে যেমন রুচির পার্থক্য আছে তেমনি যুগ ভেদেও রুচির বদল হয়। যে যুগে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক আদৃত ছিল সেই যুগে আধুনিক প্রগতিবাদী নাটক অচল ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগেও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজন আছে। তা শুধু অতীতকে জানবার জন্যে। যেমন কর্ণার্জুন শাজাহান প্রভৃতি নাটক। নাটকের আর একটি কাজ হ'ল যুগের দাবী মেটানো। কিন্তু যুগের দাবী বলতে কী বোঝায়? এক কথায় বলা যায় যুগ ভেদে দেশ ভেদে মানুষের মনের চাহিদাকেই বলা যায় যুগের দাবী। কিন্তু এই চাহিদাটা কী? নাটককে যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি বলে ধরা যায়—তাহলে সেই ছবিটাই বা কী? সেই ছবিটা হ'ল একাধারে যেমন শোষিত ও শোষক, দুঃখ ও দুর্দশা, এবং বহুল সৃষ্ট সমস্যা থেকে

উত্তরণের ছবি, অন্যদিকে তেমনি অন্ন, মৃত্যু, বিয়ে, প্রেম, ভালবাসা, মিলন বিরহের ছবি। এক দিয়ে দেখতে গেলে রস বলতে যা বোঝায় সেই শৃঙ্গার, বীভৎস, হাস্য, বীর, রৌদ্র, ভয়, করুণা, অদ্ভুত, শান্তি ও বাৎসল্য এই নয় প্রকার রসই সব দেশে সবকালের নাটক উপন্যাস গল্প কবিতার উপজীব্য। দেশ ও কাল ভেদে প্রকার ভেদ হয় মাত্র।

এদেশে বাংলার বিদেশী নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে হয় বিদেশী নাটকের হুবহু রূপান্তরিত অভিনীত হওয়া উচিত। অর্থাৎ জুলিয়াস্ সীজারকে রাজা বিক্রম সিং না বানিয়ে জুলিয়াস্ সীজারই রাখা উচিত এবং নাটকের বিষয়বস্তুও অবিকৃত রাখাই উচিত। তাতে মনকে সেই নাটকের অনুযায়ী প্রস্তুত করে নেওয়া যায় এবং নাটক দেখেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ভাবানুবাদে সেই মূল নাটকের স্বাদ যেমন বিকৃত হয় তেমনি ওদেশের আচার আচরণকে এদেশীয় করতে গিয়ে জগা খিচুড়ী পাকিয়ে যায়। তাতে না বোঝা যায় সেই মূল নাটকটিকে না পাওয়া গেল মনের তৃপ্তি।

আর এক কথা। নাটক এখন দেশের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর অঙ্গ থাকলেই তার আঙ্গিক থাকতে হবে। আঙ্গিক তো অলংকার। আর অলংকার তো অঙ্গেরই সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। এমন যে দিগম্বর ভোলানাথ তাঁর অঙ্গেও অলংকার আছে সাপ। অতএব নাটকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যেই আঙ্গিক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখতে হবে—অলংকার হচ্ছে দেহের আভরণ মাত্র। সেই আভরণ যেন আবরণ না হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ আঙ্গিক যেন মুখ্য হয়ে নাটককে গৌণ করে না ফেলে। কারণ দেহের সৌষ্ঠবের জন্যেই অলংকার। সেই অলংকার পরার মধ্যে একটা পরিমিতি বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আজকাল নাটক নিয়ে বহু নাট্যকার, নাট্যসংস্থা নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। কালের বিচারে কে টিকে থাকবে তা জানিনা। তবে একটা কথা অসংকোচেই বলা যায়—নাটক বা সাহিত্য জাতির মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে সাহায্য করে। প্রতি দেশে তাই করেছে। যখন শাসকের অত্যাচার অবিচারের মাত্রা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে তখন এই নাটক বা সাহিত্যই তার বিরুদ্ধে উদ্যত খড়্গ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। অগ্নির চেয়ে যদি যে কত শক্তিশালী তা প্রমাণিত হয়েছে। এই আমাদের দেশেও বর্তমানের অসরকারকে শাসকের আসনে বসাতে আর শোষক পূর্বতন সরকারকে হটিয়ে দিতে নাটক ও সাহিত্য তাদের কর্তব্য করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই আশংকাও করছি যেভাবে দেশের যুবমনকে বিপথগামী ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে যৌন ছায়াছবি, যৌন-সাহিত্য ও নাটকের আমদানী ও সৃষ্টি করানো চলছে এর বিরুদ্ধে যদি লেখক ও নাট্যকারেরা কলম না ধরেন তাহলে জাতের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরে যাবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জনপ্রিয় সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ নাটক ও সুসাহিত্য সৃষ্টি করার জন্যে তাঁরা সক্রিয় হোন এবং নাটকের উন্নতির জন্যে যেমন কলকাতা ও মফঃস্বল সহরে প্রেক্ষাগৃহ করা হোক যেখানে সুলভ দক্ষিণার বিনিময়ে নাটক পরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে, তেমনি সুসাহিত্য সৃষ্টি করার জন্যে নিখাদ সাহিত্য-পত্রিকা ও সাহিত্যিকদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হোক।

সুশীল চক্রবর্তী

যুগ চিন্তা

স্টেজের আদর

বক্তা ও অভিনেতা যেরূপ আদর পান,—এরূপ আদর আর কেহই পান না বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু আবার অভিনেতা যেরূপ নিন্দার ভাজন হয়, সেরূপও আবার কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। আদর ও অনাদর সমভাবেই চলে। রাজার সহিত একত্রে ভোজন, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সমভাবে ভ্রমণ,—একদিকে এত আদর, আবার অপরদিকে অভিনেতার শবদেহের সৎকার স্থান পাওয়া কষ্টকর হয়।

নাট্যালয় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ব্যক্তি যাঁহারা—যতদিন জগতে অক্ষর চলিবে, ততদিন মহত্ত্বের মধ্যে শীর্ষস্থান পাইবেন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে—শুনিলে হৃদয় বিদলিত হয়।

জগদ্বিখ্যাত 'মলেয়ার' নাট্যকার ছিলেন এবং নিজ নাটকের অভিনেতা ছিলেন। পাদ্রীর বিদ্বেষে তাঁহার শবদেহের কবরের স্থান পাওয়া যায় নাই।

শোনা যায়, একদিন একজন সঙ্গীতজ্ঞ সুরস্রষ্টা মহাশয় পথে যাইতে যাইতে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, "হায়! উচ্চ অট্টালিকায় আমারই রচিত গান গীত হইতেছে কিন্তু আমার এই দারুণ শীতে বস্ত্র নাই, ক্ষুধা নিবারণের একখানি রুটি নাই।"

সমস্ত সভ্য প্রদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত পাওয়া যায়।

আবার আদরের দৃষ্টান্তও এইরূপ শত শত। এ আদর বঙ্গীয় অভিনেতাও পাইয়াছেন।

স্বর্গীয় নাট্যোদ্যের রাজা কোনও অভিনেতাকে নিজ রাজসভার দ্বারা স্বহস্তে 'ভীমসিংহ' সাজাইয়া দিয়াছিলেন ; অভিনেতাবর্গ লইয়া আহার করিতেন, তাহাদের সহিত রহস্য করিতেন ও রহস্যালাপে উত্তর প্রত্যুত্তরে বিরক্ত না হইয়া হাস্য করিতেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আলোচনা

অভিনয়

অভিনয়কে যদি বিভিন্নমতভাবে শাস্ত্র হিসেবে ধরা যায়, তাহ'লে আমার মনে হয় যে সে শাস্ত্রের স্বরূপ কি তা কারুরই জানা নেই। আমার নিজের দিক থেকে নিঃসঙ্কোচ চিত্তে আমি বলতে পারি যে আমি তা জানি না। কারণ এশাস্ত্রের সূত্র এখনও রচিত হয়নি।

অভিনয় ছাড়া অন্য একটা কলাশাস্ত্রের কথা ধরা যাক। ধরুন সঙ্গীত। সঙ্গীত শিখতে গেলেই কতগুলি প্রাথমিক ধারাবাঁধা নিয়মের সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হয় এবং এই নিয়মগুলির একটা স্পষ্ট আইনে বাঁধা রূপ আছে। সেইগুলো হলো সঙ্গীতের সূত্র। কিন্তু অভিনয় কলা সম্বন্ধে সে কথা মোটেই খাটে না। অভিনয় কলার সূত্র কি? যদি কোন সূত্র থাকে কি আইনে তারা গ্রথিত? মনে হয় ঐ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তর পৃথিবী আজও দিতে পারে নি।

দু-একটি বিভিন্ন কলাশাস্ত্রের তুলনা করে দেখা যাক। পট, তুলি আর রঙের ভাঁড় রয়েছে. চিত্রকর তাই নিয়ে রেখার বা রঙে ছবি আঁকতে বসলেন। এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে একটি হচ্ছে চিত্রকর স্বয়ং আর একটি হচ্ছে তাঁর উপাদান। রেখা বা 'ছন্দ' রয়েছে, যাতকর

এলে সেই ছন্দ নিয়ে হাতের নির্দিষ্ট-গতির বা তন্ময়তার কারবার তাতে সুর তুলসেন—সেই হলো তাঁর সঙ্গীত। এখানেও সেই দুটি জিনিস বর্তমান—স্রষ্টা আর তাঁর উপাদান। কিন্তু অভিনেতার সেই রকম উপাদান কি? এক্ষেত্রে তিনিই স্রষ্টা আবার তিনিই উপাদান। এই বিশ্লেষণটি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, চিত্রকরের রূপসৃষ্টি প্রথমাবস্থায় আত্ম-নিরপেক্ষ, একদিকে স্রষ্টা অপরদিকে সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাঁহার সৃষ্টি-পদ্ধতি। কিন্তু অভিনেতা কখনই এই সৃষ্টি-পদ্ধতি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার অবকাশ পাননা। এই জন্যই অভিনয় বিজ্ঞানের কোন সূত্র নির্দিষ্ট করা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। এখানে স্রষ্টা ও তাঁর উপাদান যুক্তাক্ষরের সাবর্ণের মত এক ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে।

চিত্রকরের সম্মুখে থাকে, তুলি, পট, তাঁর রঙের ভাঁড়, ভাস্করের সামনে থাকে তাঁর যন্ত্র। অভিনেতার সামনে সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে থাকে কি? তিনি নিজে রক্তমাংসের মানুষ এখন তাঁর পাত্র বলে যে তাঁকে আর একটি মানুষ গড়তে হবে। আত্মা দেহ আর মন নিয়েই মানুষের গঠন। আমাদের জীবনে এমন কোনও কাজ আমরা করিনা—যেখানে এই তিনটি জিনিসের একত্র কার্যকলন না থাকে।

কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, আত্মা দেহ আর মন যদি উপকরণ হলো তবে স্রষ্টা কে? জানিনা স্রষ্টা কে—শুধু এইটুকু বলতে পারি এই তিনটি উপকরণের বাইরে নিশ্চয়ই আর কোনও শক্তি আছে—নানা দেশে নানা শাস্ত্রে তার নানা নাম—আমি তাদের নাম দিলাম Spirit অর্থাৎ পরমাত্মা এবং Will অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি। আত্মা, দেহ মনকে বিস্মিত করে এই Spirit এবং will.

এই Spirit এবং Will-এর বিভিন্ন এবং বিশেষ বিশেষ প্রকাশ আছে। যে will বা ইচ্ছাশক্তি ব্যালজাককে ক্রমাগত তিনদিন চারদিন ধরে একাসনে বসিয়ে লেখাতো, যে ইচ্ছাশক্তির গোপন নির্দেশে সমুদ্রে সময় সময় নাবিককে চব্বিশ ঘণ্টা যন্ত্র ধরে থাকতে বাধ্য করায়—তাকে আমরা বলি professional will, will-এর একটা বিশিষ্ট প্রকাশ, যার প্রেরণায় মানুষ তাঁর কর্মজীবন গড়ে তুলতে পারে, মনে হয় এই will-ই হলো স্রষ্টা।

অবশ্য এতো সহজে Will বা Spirit-এর স্বরূপ বোঝানো সম্ভব নয় এবং কথায় বলেও তার উপলব্ধি আরও দুরূহ। কাকে আমরা বলবো Spirit?

সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সে হলো আসলে কতকগুলি অমূল্য মুহূর্তের ইতিহাস, সমগ্র জীবন চলে যায়—মানুষ রেখে যায় শুধু একটি কাজ বা একটি কথা। যে ব্যক্তি বলেছিলেন "England expects every man to do his duty—তাঁর সমগ্র জীবন লেগেছিল সেই কথাটিকে সত্য করে তুলতে। অনেকে বলেন এই সব মুহূর্তগুলো হলো inspiration-এর অর্থাৎ অন্তর্নিহিত প্রতিভার আকস্মিক স্ফুরণের সৃষ্টি। আমি জানি যে কলাশাস্ত্র নিয়ে যাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে ঈশ্বর বা প্রকৃতি যারই দেওয়া হ'ক এই মুহূর্তের চকিত দীপ্তিটুকু না বিকশিত হয়ে উঠলে তার জীবন ব্যর্থই যায়। সে যাইহোক এখানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইনা। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে কৈশোরের প্রান্তর থেকে যৌবনের সিংহদ্বারে যাঁরা এসে দাঁড়ান তাঁরা এই spirit-এর এই বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ inspiration কে যে ভাবে দেখেন ও যে মূল্য দেন তা আশঙ্কাজনক। কঠোর কর্মসাধনা খাঁটি উপকরণের বিধিবদ্ধ আয়োজন এবং দুঃসহ বেদনার মধ্য দিয়েই এই চরমমুহূর্ত আসে, এবং সেই কঠোর কর্মসাধনা, সেই আয়োজন

সেই বেদনা সইবার মনোবৃত্তি হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার জনক। যে অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে বীজকে কঠিন পৃথিবী থেকে রস আহরণ করে অঙ্কুরিত হতে হয় সেই একই অপরিবর্তনীয় নিয়মে কঠোর কর্মসাধনার মধ্যে থেকে এইসব অমূল্য মুহূর্ত অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সুন্দর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও অভিনেতা যদি আলস্যে দিন অতিবাহিত করেন তাহলে মনে হয় তিনি কখনই সফল হবেন না। প্রকৃতি ওঁকে যেটুকু ঐশ্বর্য দিয়েছে, তখন শুধু তিনি পণ্য হিসেবে সেইটুকু বিক্রী করেন এবং সহসা জীবনের পথে এমন দিন আসে যখন পণ্যহীন দোকানের মত সেই অভিনেতার জীবন নিরস হয়ে ওঠে।

অভিনেতা কিংবা যে কোনও রূপস্রষ্টার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন হলো একাগ্রতা। যাকে ইংরেজীতে বলে Concentration. নির্জন বনের মধ্যে কোনও লোক চলছে। সেই বন থেকে বেরোবার পথ খুঁজছে, সে জানেনা তার পায়ের তলায় মাটিতে গহ্বর আছে। সেই সময় সে কি করে, দেহ, মন, আত্মা সমস্ত তখন আপনা থেকে একাগ্র হয়ে ওঠে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, অভিনয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও বটেই, সেইজন্য প্রথম প্রয়োজন হ'লো দেহ মন আত্মার সেই একাগ্রতা। জীবনে সেই কয়জনা পায় যে একাগ্রতাকে আয়ত্ত করতে শিখেছে। এবং আমরা একসময়ে মাত্র একটি বিষয়ে একাগ্র হতে পারি। আমরা যদি একসঙ্গে দুই বা তিন বিষয়ে একাগ্র হতে চাই, তা হ'লে সেই কাজ শুধু যন্ত্রচালিত বোধ হবে।

এই একাগ্রতা সাধনার বস্তু, এবং এই শক্তিকে আত্মবশে আনতে হবে। অনেক সময় যখন আমরা ধ্যানে পড়ি, তখন বিনা চেষ্টাতেই আমাদের দেহ, মন, আত্মা একাগ্র হয়ে ওঠে। যে জিনিস আমাদের দেখতে বা শুনতে ভাল লাগে তাতে আমরা স্বভাবতই একাগ্র হই কিন্তু আমি অভিনেতার পক্ষে যে একাগ্রতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছি তা স্বতন্ত্র, মাংসপেশী নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতার মত অভিনেতাকে যখনই যে বিষয়ে একাগ্র হতে বলা হবে তখনই তাকে একাগ্র হতে হবে, হ্যামলেটের স্বগতোক্তির সময় একাগ্র হওয়া যত সোজা, অতি প্রয়োজনীয় সামান্য ব্যাপারে একাগ্র হওয়া তত সোজা নয়। কিন্তু অভিনেতার পক্ষে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন হলেই সমান একাগ্র হতে হবে।

নাট্যকার নির্দেশ করে দিলেন শীতের রাত্রি, নিশীথ কাল, অমুক ঘটনা ঘটছে। অভিনেতার দেহ, মন, আত্মাকে তখনই তাই বিশ্বাস করতে হবে—শীতের রাত্রি, নিশীথকাল অভিনেতা যদি বিশ্বাস না করতে পারেন দর্শক কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না। যদি এই বস্তু প্রত্যয় ব্যতীত কোনও অভিনেতা দর্শকদের কাছ থেকে করতালি আদায় করতে পারেন তাহলেও তিনি রসবেত্তাদের অনুমোদন কখনই পেতে পারেন না। যে জিনিসে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই যে জিনিস তোমার ভাল লাগে না, প্রয়োজন হলেই তৎক্ষণাৎ তাতেও মনঃসন্নিবেশ করতে হবে। অন্য কলাবিদেরা মনঃসন্নিবেশের জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা তা পারেন না।

মোটামুটি ভাবে অভিনেতার পক্ষে তিনরকমের একাগ্রতা প্রয়োজন—

(১) Concentration of the body—দেহের একাগ্রতা। ইচ্ছা করলেই দেহের যে কোনও অংশকে অভীপ্সিতভাবে চালনা করবার শক্তি এনে যে কোনও অংশকে যখন বিশেষ প্রাধান্য দেবার প্রয়োজন তখন সেই অংশেতে সমগ্র দেহকে একাগ্র করা। এর একটা ভাল উদাহরণ আছে।

আপনী মুহূর্তে খেলোয়াড়রা তাঁদের আঙুলে, হাতের তালুতে প্রয়োজন হ'লে দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করতে পারেন। অভিনেতাকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে রঙ্গমঞ্চে তিনি যে সৃষ্টি করছেন তার প্রধান উপকরণ যাতে সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয় সেদিকে অভিনেতার সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, এবং তার জন্ত দৈহিক একাগ্রতার সাধনা প্রয়োজন। আমরা প্রতিদিন হাতের পাঁচটি আঙুল সমান ব্যবহার করিনা; কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অনেক সময় আঙুলের বিশেষ তন্ময় প্রয়োজন হয়। প্রতিদিনের জীবনে আমরা শুধু আমাদের হাত আর পা ব্যবহার করি; বুক, কোমর, পিঠ কাঁধ এদের বিশেষ কোন ব্যবহার করিনা। অথচ অভিনয়ের সময় দেহের এই সমস্ত অঙ্গেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, সত্যভাবে তার ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সমগ্র দেহের একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন।

(২) Concentration of the mind—মনের অবস্থা। অভিনয় কিন্তু ঠিক মুখস্থ করা হাতে পা-তোলা বা বক্তা-বলা নয়। যন্ত্র নির্দিষ্ট নিয়মে চলে,—প্রতিদিন তার গতির একটা নির্দিষ্ট একঘেয়ে রূপ আছে, কিন্তু অভিনয় কলার গতি-বিজ্ঞানে নিত্য নব-তন্ময়ীর স্থান আছে। এই নিত্যনব প্রেরণাকে কাজে লাগাবার জন্ত অভিনেতার মনকে সর্বদা সচেতন বা একাগ্র রাখতে হবে। এবং সেইজন্তে যেমন প্রয়োজন মনের একাগ্রতা তেমনি প্রয়োজন মস্তিষ্কের ধৈর্য। মনের একাগ্রতা এবং মস্তিষ্কের ধৈর্য থাকলে আপনা থেকেই গতি তন্ময়তা বা প্রকাশ-তন্ময়তার সাবলীলত্ব ফুটে ওঠে। এক অভিনেতার সঙ্গে একরকম তন্ময়তায় অভিনয় করছে; আর এক অভিনেতার সঙ্গে সেই ভূমিকায় যখন নামলে তখন সে তন্ময়তা হয়ত বদলে যেতে পারে। কিন্তু যার মনের একাগ্রতা আছে সে সেই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক বিবেচনায় গ্রহণ করে তাকে অন্য রূপ দেবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে।

(৩) Concentration of feelings—অনুভূতির একাগ্রতা। মনে কর তোমার সামনে একটা উনুন রয়েছে। তোমার ধারণা হলো যে উনুনটা ঠাণ্ডা, হাত দিতেই দেখলে যে ভয়ানক গরম। তখন তোমার যে আকস্মিক অনুভূতি হলো, রঙ্গমঞ্চে সর্বদাই সেই অনুভূতির আকস্মিকতার জন্ত মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে। অনুভূতির ক্ষেত্রে যে কোনও আকস্মিকতার জন্তে অভিনেতার মনকে সর্বদাই সজাগ রাখতে হবে। এবং তাকেই বলে অনুভূতির একাগ্রতা। মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণের মত, মনঃসন্নিবেশের সাধনার মত, এও সাধনার ব্যাপার। স্বাভাবিক আকস্মিক ঘটনা ভেবে অবসর সময় নিজের অনুভূতিকে ধীরে ধীরে সেই আকস্মিকতার সাড়া দেবার জন্ত সক্ষম ক'রে তুলতে হয়।

একই ক্রিয়া কিন্তু কত বিভিন্ন অনুভূতি জাগায়। ঘর রাত্রিতে একলা তুমি ঘরে বসে আছো, অন্ধকারে শুনছো ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ, তারপর ভাবো তুমি কোনও বড় রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে বসে আছ—শুনছো তোমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক গান গাইছে, রাত্রে সহসা ঘুম ভেঙে গেল শুনলে পাশের বাড়ীতে একটি মায়ী কাঁদছে। একই কান একই নিয়মে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় কাজ করছে। কিন্তু এই তিনটি শোনা কত পৃথক।

এই পার্থক্য বোধের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে অভিনেতা চেতনার যত গভীর ও বিভিন্ন ভাবে থাকবে, অভিনেতা হিসাবে, স্রষ্টা হিসাবে, ততখানি সাফল্য তিনি অর্জন করবেন।

সত্য সেন

নানা প্রসঙ্গ

গত মাসের কয়েকটি অভিনয়। সারথী—দক্ষিণ কলকাতার এই নাট্য সংস্থা সম্প্রতি রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চে তিনদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। বিষমঙ্গল, রূপণের ধন ও আদিবাধা—এই তিনটি নাটক অভিনয়ে সারথীর শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই প্রথম শ্রেণীর নাট্য কুশলতা প্রকাশ করেন।

ইলেকট্রিক সান্নাই—এদের সাংস্কৃতিক শাখার সভ্যবৃন্দ স্টার মঞ্চে সুশীল মুখোপাধ্যায়ের অনর্থ নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। পরিচালনায় অজ ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

রজনীগন্ধা—বাসন্তের অনক্রিয় নাট্যসংস্থা রজনীগন্ধার সভ্যরা তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্য রাজা ও নীলোৎপল দেব প্রতিচ্ছবি মঞ্চস্থ করেন। নাটক দুটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন মিতা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মৌলিক, বাসু রায়, মৃণাল হালদার প্রভৃতি শিল্পীরা। দুটি অভিনয়ই বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পাতলত ইনস্টিটিউট—যুক্ত অঙ্গন মঞ্চে ডাঃ ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়-এর অপারেশন থিয়েটার মঞ্চস্থ হয়। নামধ্য পত্রিকায় এই নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখনই উৎসাহী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা, রাষ্ট্রক্ষমতার আগ্রাসী রূপ এবং তার পটভূমিতে বুদ্ধিজীবীর রক্তাক্ত জীবন জিজ্ঞাসা এই নাটকে অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। অভিনয়ে সকলেই অভিনয়ের নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঝরিয়া এল. এম. ক্লাব—ঝরিয়া এল. এম. ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি অরুণ কুমার দে রচিত 'ঘুনি' ও শক্তিপদ রাজগুরুর 'মেঘে ঢাকা তারা' মঞ্চস্থ করেন। দুটি নাটকই সুপ্রযোজিত। দুটি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন ধরণী বিশ্বাস, দেবীদাস দে, শচীন সরকার, দিলীপ দত্ত, শিশির সরকার প্রীতম দত্ত, রঞ্জিত ব্যানার্জী, কার্তিক চক্রবর্তী, তারাদাস ব্যানার্জি, যোগেশ সেন, রামধন দে, নিমাই ঘোষ, অশোক দত্ত, অতুল দত্ত, শ্যামাপদ সরকার, দেবী সরকার, ইলা ঘোষ ও কল্যাণী ঘোষাল।

আনন্দলোক—এঁদের নাটক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের নাট্যরূপ—অ্যাঠামশাই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের নাট্যরূপ দেওয়া দুরূহ কর্ম। গল্পের নাট্যরূপায়ণ ভালো হয়েছে। বিশেষ করে অ্যাঠামশাই। শচীশ, পুরন্দর, দীননাথ এসব চরিত্রের রূপদান প্রশংসনীয়। নাটকে শচীশ ও অ্যাঠামশাই চরিত্র দুটি যথাক্রমে অসিত মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ঘোষের অভিনয় গুণে প্রাণ পেয়েছে। অসিত মুখোপাধ্যায়ের স্পষ্ট উচ্চারণ ও সংযত ও সাবলীল অভিনয় উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বঙ্কিম ঘোষের আত্মভোলা রূপটিতে শিল্পী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দীননাথের চরিত্রে অরুণ ভট্টাচার্য বেশ ভালো অভিনয় করেছেন। পুরন্দরের চরিত্রে শঙ্কর মিত্র সুঅভিনয় করেছেন। একটি জায়গায় তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বল্প অবকাশে পিসিমার চরিত্রে কাশিশ্বরী সেন দর্শকদের মনে রেখাপাত করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন, কমল মুখোপাধ্যায়, তরুণ মুখোপাধ্যায়, ভূষণ গোস্বামী, শৈলেন মিত্র, গোপাল দাস, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর সেনগুপ্ত, শ্যামল মুখোপাধ্যায় মনিবালার চরিত্রে রূপদান করেছেন মীরা চট্টোপাধ্যায়।

অনুকার—অনুকার প্রযোজিত 'নাম-না-জানা তারা'র অভিনয় প্রশংসনীয়। নাটকটি অমিতা রায়ের স্বকীয় রচনা নয়, মিহাইল সেবাস্তিয়ানের একটি নাটকের রূপান্তর। অভিনয় প্রসঙ্গে বলা যায় মায়া ঘোষ (কমা) তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গিরীশ) তাপসী গুহ (কোকিলা দেবী) তাপস গুপ্ত (উদয়) পূর্ণেন্দু মজুমদার (মানস) শান্তজিৎ সেনগুপ্ত (স্টেশন মাষ্টার) অঞ্জলি ভট্টাচার্য (যমুনা) এবং তারপদ ভাদুড়ী (পরেশ) প্রত্যেকেই সুঅভিনয় করেছেন।

থিয়েটার লাইবর—এঁরা একটি ভ্রাম্যমান মুক্তমঞ্চ তৈরী করছেন। তারই ঘোষণা-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৮ই এপ্রিল প্রচারমন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর উপস্থিতিতে লেডোর মিত্র স্কোয়ারে অলীকবাবু নাটকের অভিনয় হয়। ভ্রাম্যমাণ মুক্তমঞ্চ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মঞ্চ। এ মঞ্চের দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট, গভীরতা ২৪ ফুট। ভূমি থেকে ৩½ ফুট উঁচু মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ও মঞ্চে প্রতিটি অংশকে আলাদা করে বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাটক এ মঞ্চের প্রযোজিত হবে। দর্শক সাধারণের স্বেচ্ছাদানের ভিত্তিতে এ মঞ্চের খরচ চলবে। থিয়েটার লাইবর-এর এই প্রচেষ্টা ভারতের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম।

নাট্যসম্প্রদায় গোষ্ঠী—সিনার্জি রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনটি বিভিন্ন রসের একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করে 'নাট্য সম্প্রদায়' তাঁদের শুভযাত্রা শুরু করল। প্রথমটি ছিল কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত কাব্যনাট্য 'একলব্য'। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি ছিল কৌশিক সান্যালের রচনা 'বাঘ এখন মানুষ খায়' এবং 'প্রজাপতির প্রাণ'। প্রত্যেকটি ভূমিকা সুঅভিনীত।

॥ আসন্ন অনুষ্ঠান ॥

পুরী হোটেল রিক্রিয়েশান ক্লাব

কলকাতায় অভিনয়ের আয়োজন

পুরীধামের উক্ত সাংস্কৃতিক সংস্থাটি কয়েকবছর যাবৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক ও নৃত্যচর্চার অনুশীলনে ব্যাপৃত আছেন। কোলকাতার বহু সুধী পুরীধামে ভ্রমণে গিয়ে তাঁদের অভিনয়াদি দেখে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। গত বিজয়া সম্মিলনীতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য দুটি পরিবেশন করে অগণিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা সচিত্র-ভারতীতে আমরা সেই অভিনয়ের আলোচনা করেছি। পাঠকবর্গ জেনে আনন্দিত হবেন যে, কোলকাতায় বহু রবীন্দ্রানুরাগীর অনুরোধে উক্ত সংস্থার শিল্পীরা কোলকাতায় এসে ঐ দুটি নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। আগামী ২৪শে ও ২৫শে মুভ আকাডেমি অব ফাইন আরটস্ মঞ্চে যথাক্রমে তাসের দেশ ও শ্যামার অভিনয় হবে। অভিনয় দুটি পরিচালনা করবেন—শ্রীমাখন লাল হালদার। সঙ্গীতাংশে কোলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা সঙ্গীত-শিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন। নৃত্যপরিচালনা করবেন শ্রীবৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী তনিমা গাঙ্গুলী। ব্যবস্থাপনায় আছেন শ্রীমতী রাণী হালদার ও শ্রীকানাই লাল দাস।

শিল্পী পরিচিতি : শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস

আধুনিক কালে যে কয়েকজন মহিলা সঙ্গীত শিল্পী নিভৃত সাধনায় নিরলস মগ্ন আছেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

বয়সে নবীনা হলেও বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীত পরিবেশনে ইনি ইতিমধ্যেই যে পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা এঁর সাধনার গভীরতার পরিচয় দিয়েছে।

অল্পবয়সে যখন লক্ষ্ণৌএ ছিলেন তখন মাতা শ্রীমতী ইন্দুবালা রায়ের উৎসাহে শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস সঙ্গীতকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনারূপে গ্রহণ করেন। তারপর স্বামী শ্রীকানাইলাল দাসের কাছে থেকেও পেয়েছে অকুণ্ঠ এবং সক্রিয় সহায়তা।

ইনি খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী শ্রীচিন্ময় লাহিড়ীর কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেছেন। শ্রীসাগর সেনের কাছে শিখেছেন রবীন্দ্র সঙ্গীত।

লক্ষ্ণৌতে এঁর শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ শ্রীরাধাবল্লভজী।

শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস লক্ষ্ণৌ ও কোলকাতার বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়াও আধুনিক, রাগপ্রধান, রামপ্রসাদী, অতুলপ্রসাদী, ঠুংরী গীত, গজল, ভজন, উত্তর ভারতীয় ও পল্লীসঙ্গীতেও শ্রীমতী দাসের বিলক্ষণ দখল আছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ইনি যেমন নিরহঙ্কার ও বিনয়ী তেমনি আত্মপ্রচারবিমুখ।

পুরী হোটেল রিক্রিয়েশান ক্লাব আয়োজিত কোলকাতার অভিনয়াঙ্গনে 'ভাষা' নৃত্যনাট্যে ইনি নেপথ্য থেকে ভাষার গানগুলিতে কণ্ঠদান করবেন।

• • •

"দেশের ও দশের মানসচেতনাকে যে শিল্প দর্শকদের মনের গভীরে পৌঁছে দেয় তার প্রয়োজন চিরকালের। সেই শিল্পের সাধনায় যাঁরা আত্মনিবেদন করেছেন তাঁরা দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতাভাজন।"

চিত্রমিত্র

অভিনেতা জীবনী

ব্রিটিশ অভিনেতা মাইকেল কেইন সম্প্রতি হলিউডে অভিনয় করছেন। ছবির নাম 'গ্যাম্বিট'। নায়িকা শালি ম্যাকলেইন। সুন্দরী অভিনেত্রীদের ঘিরে চাঞ্চল্য ও রোমাস সৃষ্টি স্বাভাবিক। কিন্তু অভিনেতা ঘিরেও যে তারকা সমাজ আলোড়িত হতে পারে তার নতুন নজীর কেইন। হলিউডের সমাজ ও নাইটক্লাবে গুলিতে তিনি ঝোড়ো হাওয়া আমদানী করেছেন। নানা গল্প-গুজব শোনা যাচ্ছে তাঁর জীবন, প্রেম-জীবন সম্পর্কে. মাতাদী উত্ত, মাল্টী সিনাত্রা, মিয়া ফারো এমনি বহু অভিনেত্রীর নামের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে কল্পনা-জল্পনা চলেছে। তবে কেইনের প্রেয়সী বোধহয় ফরাসী অভিনেত্রী এলিজাবেথ এরদি। এলিজাবেথ বেশির ভাগ সময় প্যারিসেই থাকে। তবে কেইন বলেছেন: "বিয়ে করতে আমি চাচ্ছি না, কারণ বেশির ভাগ সময়ই আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় দেশে-বিদেশে।"

সত্যি তাই। কেইন অনেকের অধরা। 'জুলু' ছবিতে অভিনয় করার জন্য গিয়েছিলেন আফ্রিকার 'আলফি'-র জন্য ইংলাণ্ডে, 'গ্যাম্বিট'-এর জন্য হলিউডে। আগামী দিনে 'ফিউনারেল ইন বার্লিন' ছবিতে অভিনয় করতে যাবেন পশ্চিম জার্মানীতে, 'লানডাউন স্ট্রারি'তে অভিনয় করতে

যাবেন অস্ট্রিয়ায়, বিলিয়ন ডলার হেইন'-এ অভিনয় করতে কিনলাতে আর অন্য একটি ছবির জন্য অষ্ট্রেলিয়ায়। চিত্র-তারকাদের মধ্যে এ-রকম বিশ্ব-পর্যটক আর দ্বিতীয় কেউ বর্তমানে আছেন কিনা জানিনা। বিয়ে করার বাধা কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরে কেইন বলেন: "যিনি নিজেই একজন অভিনেত্রী এবং যার নিজস্ব কেরিয়ার আছে এমন স্ত্রীকে তো আমি সঙ্গে নিয়ে দেশ-বিদেশে যেতে পারবো না।"

হেল ডেইটন রচিত উপন্যাস 'দি ইণ্ডেক্স ফাইল' ছবিতে অভিনয় করার পর কেইন প্রথম আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন।

কেইন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে তিনি ব্রিটেনের সামাজিক বিপ্লবের সন্তান। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে বিশ বছর আগে হলে তাঁর পক্ষে চিত্র-তারকা হওয়া অসম্ভব ছিলো। চিত্র-তারকা হ'তে হলে তখন কথা বলতে হতো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত উচ্চারণ-রীতিতে। বিশ বছর আগেকার লেখকরা যে সব চিত্র-নাট্য রচনা করতেন তার চরিত্রগুলি সবই তখন হতো উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বেশির ভাগ নাটকই তখন ড্রয়িংরুম নাটক। অর্থাৎ নাটকের বেশির ভাগ দৃশ্যই তখন ড্রয়িংরুমের। রোনাল্ড কোলম্যান, রবার্ট মার্শাল, কিংবা লরেন্স অলিভিয়ার না হ'লে তখন অভিনেতা হওয়াই যেতো না অর্থাৎ চলনে-বলনে অভিজাত হওয়া চাই। জন অসবোর্ন 'লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার' নাটকটি লেখার পরে এই আভিজাত্যের যুগ শেষ হয়ে যায়। এই নাটকের চরিত্র অধিকাংশই ব্রাত্য। এর পর থেকে বেশি ক'রে, আরো বেশি ক'রে ইংরেজী ছায়াছবিতে ছাড়পত্র পেলো সাধারণ শ্রেণীর নরনারী।

লণ্ডনের এক দরিদ্র অঞ্চল ওল্ড কেন্ট রোডে মাইকেলের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন বাজারের একজন কুলি! ষোলো বছর বয়সেই মাইকেলকে স্কুল ছাড়তে হয়। প্রায় তেরো বছর লাগে অভিনেতা রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে।

অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় মাইকেল লণ্ডনের অভিজাত রাজপথ বণ্ড স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যেতেন আর অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন দুধারের দোকানের শো-কেসে কত সুন্দর-সুন্দর জামা, প্যাণ্ট, আর জুতো। দেখতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। মাইকেলের অবস্থা ফিরে গেছে। এখন তাঁর শখ নানারকম জিনিস কেনা। তাঁর অনেক জামা, অনেক সুট।

আমেরিকা কেইনের মনের মতো জায়গা। সেখানকার ঝিল-ধরিয়া সমাজ, খাবার, ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া তাঁর খুব পছন্দ। "সব চাইতে আমার ভালো লাগে আমেরিকার স্বাধীনতা। আমার নিজের দেশে তো সব সময়েই শুক্র-রবাইরা চোখ পাকিয়ে বসে আছেন। রবি রাত হতে না হতেই বন্ধ হয়ে যায় টেলিভিশন। এগারোটা বাজতেই বন্ধ হয় বার। কিন্তু ইচ্ছা হ'লে আমেরিকায় আমি সারারাতও টেলিভিশন দেখতে পারি। ইচ্ছা হ'লে ক্যালিফোর্নিয়ার বার-এ থাকা যায় রাত দুটো পর্যন্ত, নিউইয়র্কে আরো গভীর রাত পর্যন্ত। আমার স্বাধীনতা আমার নিজের এই তো ভালো। এই তো গণতন্ত্র।"

অভিনেতা হতে পেরে যে খুশি হয়েছেন একথা জানাতে মাইকেলের কোনো দ্বিধা নেই: "আগে গরীব ছিলুম, এখন আমি ধনী। ধনী নিশ্চয়ই গরীবের চাইতে আরামে থাকে।" কেইন মোটর গাড়ি চালাতে জানেন না। বলেন: "যখন বেকার ছিলুম মোটরে চড়তে পারতুম না। এখন

কাজ পেয়েছি, কিন্তু মোটর চালনা শিখবার সময় নেই।" প্যাথিট ছবিতে অভিনয় করার জন্য মাইকেলকে আমেরিকায় থাকতে হয়েছে চারমাস। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সেখানকার ভাষা শিখে ফেলেছেন। আর আয়ত্ত করেছেন নানা খাবারের রুচি।

লণ্ডনের এক বাড়িতে মাইকেল একা থাকেন। বিছানার ব্যাপারে মোটেই খুঁত খুঁতে নন। বিছানায় শুয়ে পড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম এসে যায়। মাইকেল সুখী সন্দেহ নেই।

কাহিনী

মেকেড অ্যামস উলফ্‌স

বুকেনওয়াল্ডের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প! নরহত্যা এবং অমানুষিক ও পাশবিক নির্যাতনের কেন্দ্র।

নির্যাতন শিবিরের কয়েদীদের কঙ্কালসার দেহ। সারাদিন কাজ করতে হয় জন্তুর মতো। সন্ধ্যাবেলা আবার ঢুকতে হয় খাঁচায়। মানুষ হয়েও আজ যেন তারা মানুষ নয়। বাইরের জগতে কিন্তু দেখা দিচ্ছে পরিবর্তন। দুঃশাসনের রাজত্ব বুঝি শেষ হয়ে আসছে। দিন শেষ হয়ে আসছে ফ্যাসিবাদের। শীগগিরই থেমে যাবে যুদ্ধের দামামা। আবার শান্তি নামবে পৃথিবীতে। সেই সুদিনের অপেক্ষা করছে সবাই। কিন্তু সব চাইতে অধীর আগ্রহে বুঝি অপেক্ষা করছে নির্যাতন-শিবিরের এই কঙ্কালসার মানুষগুলি।

যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ দিতে হবে হয়তো ঘাতকের হাতে, তবু শিবিরের যারা সাহসী মানুষ তারা গোপনে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ দল। এস এস-এর বিষাক্ত নখর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। তাদের কাজ করতে হচ্ছে অত্যন্ত সতর্কভাবে, বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে। স্নায়ু টান-টান। উত্তেজনা চূড়ান্ত। এ'র মধ্যে ঘটলো এক অভাবিত ঘটনা। একেবারেই অবিশ্বাস্য। বন্দীরা একটা ট্রাক দেখতে পেলো খড়ের মধ্যে। কৌতূহলী হয়ে তার ডালা খুলে ফেলতেই দেখে ভিতরে একটি ফুটফুটে শিশু। এ কী কাণ্ড। কার শিশু? কোথা থেকে এলো? কে রেখে গেলো। জানা গেলো এ এক নির্ভীক পোলিশ কয়েদীর কাজ। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও সে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শিশুর মা-বাবা দুজনকেই শত্রুরা মেরে ফেলেছে।

কয়েদীরা সঙ্কল্প নিলো শিশুটিকে ওরা কিছুতেই খুনেদের হাতে পড়তে দেবে না। আর ওরা তো জানে মুক্তির দিন ক্রমেই ঘনিয়ে এসেছে। শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন লুকাবার জায়গা খুঁজে বের করতে হয়; ধোঁকা দিতে হয় প্রহরীদের। কয়েদীরা ভালো ক'রেই জানে যে শত্রুরা যদি কোনো-রকমে টের পায় তারা শিশুটিকে লুকিয়ে রেখেছে তবে শিশুটিকে তো মেরে ফেলবেই, কয়েদীদেরও সঙ্গে-সঙ্গে শেষ ক'রে দেবে। তবু ওরা ভয় পায় না।

কয়েদীদের মধ্যে যারা শিশুটির কথা জানে তারা সব সময়ই শঙ্কিত মনে ভাবছে এই বুঝি শত্রুরা শিশুটিকে দেখে ফেলে আর জেনে ফেলে গুপ্ত প্রতিরোধ সংঘটির কথা। এইভাবে শিশুটি হয়ে ওঠে তাদের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাদের ভাগ্য আজ এক হয়ে গেছে শিশুটির ভাগ্যের সঙ্গে।

ছায়াবাণী সংবাদ

ছায়াচিত্রের প্রখ্যাত সমালোচক মেরী সেটন বলেছেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতীয় ছায়াচিত্রে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন আসছে। এবারকার নির্বাচনে যে রকম পরিবর্তন ঘটেছে ছায়াচিত্রেও তেমনি পরিবর্তন ঘটবে ব'লে তিনি মনে করেন। লোকের মানসিকতাই বদলে যাচ্ছে ব'লে। মিস সেটন সম্প্রতি পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন হিন্দী ছায়াচিত্র অধিকাংশেই বাস্তবতাবোধ বর্জিত। যে পরিবেশ তাতে উপস্থিত বাস্তব পৃথিবীর কোথাও সে পরিবেশের অস্তিত্ব নেই। তিনি বলেন ফিল্ম হওয়া উচিত সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মের মতো যার মানুষ, ঘটনা, পরিবেশ বাস্তব আশ্রিত। অন্য পক্ষে হিন্দী ফিল্ম অবাস্তব এবং কৃত্রিম; ওই ছবি শুধু পলায়নী মনোবৃত্তিকেই আশ্রয় দেয়। দর্শকের বিচার-বুদ্ধি আছে বলে বোধহয় হিন্দী ছবির প্রযোজকেরা মনে করেন না। তাই যে কোনো গাঁজাখুরি গল্পকে যেন-তেন প্রকারেন ক'রে খাড়া করাতে তারা সাহস পান। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ফিল্ম ইনস্টিটিউট যে উন্নতি করেছে তাতে মিস সেটন ভারতীয় ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন।

• • •

ছায়াছবি নির্মাণকারী একটি দল দিল্লী থেকে সম্প্রতি বেরিয়ে পড়েছে ৩০০০ মাইলের এক মোটর যাত্রায়। উত্তর ভারতের প্রতিটি বিখ্যাত পার্বত্য শহরে এরা যাবে। এই দলে আছেন চিত্র পরিচালক মোহন সেগাল, প্রযোজক রাজেন্দ্র ভাটিয়া, আলোকচিত্র পরিচালক কে. এইচ, কাপাডিয়া এবং শিল্প নির্দেশক সুবেন্দু রায়। ইস্টম্যান কালারে ছবিটি নিবেদন করবেন কিরণ প্রডাকসন্স। ছবির নাম 'কল্যাণ।' ছবির আউটডোর সুটিং হবে অমৃ, শ্রীনগর, ডালহৌসী, মুসৌরী, কুলু উপত্যকা, নৈনীতাল ইত্যাদি রমণীয় স্থানগুলিতে। 'কল্যাণ'-এর লেখক শৈলানি।

• • •

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি' ছবিটি প্রথম মধুর, কাব্যগুণাশ্রিত একখানি উপভোগ্য ছায়াছবি। পৃথিবীর কবিতা চিরন্তন, চিরায়ত এর সঙ্গীত—এই বোধহয় কাহিনীর মর্ম। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নন্দিনী, মৃণাল মুখার্জী, অজিতেশ লাহিড়ী, মিসেস কালীপদ সেন এবং আরো অনেকে।

• • •

আবার এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টন

এলিজাবেথ টেলর এবং রিচার্ড বার্টন নতুন একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ছবির নাম 'দি পার্সিক আই।' প্রযোজক রস হাণ্টার। ছবির চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন ইলোওের পিটার শেফার। টেলর এবং বার্টন এই নিয়ে সাতবার একসঙ্গে রুপালি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করছেন। এর আগে এই যুগলকে দেখা গেছে ক্লিওপেত্রা, দি ভি. আই. পি. স, দি ভাচপাইপার, টেমিং অব দি শ্রু, এবং হু ইজ আফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ ছিলে। শেষের ছবিতে অভিনয়ের জন্য এরা অ্যাকাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

• • •

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা চুক্তিবদ্ধ

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা নতুন একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ছবির নাম 'শামুস।' পরিচালক গর্ডন ডগলাস। মারজিন এইচ. অ্যালবার্ট-এর উপন্যাস 'রিয়ার্মি মেহেম' অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন স্বর্গত রিচার্ড ব্রিন। এর আগে সিনাত্রা ডগলাস পরিচালিত আরো কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। যেমন ইয়ং অ্যাট হার্ট, রমিন অ্যাণ্ড দি লেডেন ইত্যাদি।

• • •

ওমর শেরিফ এবং জেমেসা

জেমেসা রেডগ্রেভকে বলা হয় এ যুগের গার্বো। সম্প্রতি তিনি প্রখ্যাত অভিনেতা ওমর শেরিফের সঙ্গে একটি নতুন ছবিতে নেমেছেন। ছবির নাম 'দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট।' পরিচালক সিডনী সুবেট। প্রযোজক মাইক সল। ছবিটি প্রযোজিত হবে রোমে।

• • •

নতুন অভিনেত্রী কেমিল্লা

হলিউড চিত্র জগতের উদীয়মানা তারকা সুইডিশ সুন্দরী কেমিল্লা। মাত্র আঠার মাস সময়ের মধ্যে তিনি চারখানি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন। কেমিল্লা অভিনীত নতুন ছবির নাম 'ডিপার্টমেন্ট-কে।' ওঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন স্টিফেন বয়াড।

রান্না আর রান্না

আতা পাকড়াশী

রান্নার কদর চিরদিনই থাকবে। একদিন ছিল যখন আমাদের বাংলা দেশে মেয়েদের রান্নার প্রশংসা ও সুনাম ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছিল।

আজ আর সেদিন নেই। তাইবলে আজ রান্নার আদর কে না করে ও ভাল রান্নার কোন সংসারে আনন্দের হিল্লোল বয়ে না যায়।

এই ঘোর সংকটের দিনে ভাল রান্না করতে শেখা ও ভাল রান্না করা শুধু যে অফুরন্ত আনন্দ ও তৃপ্তি এনে দেয়, তা নয়, সংসারের সাশ্রয়ও যথেষ্ট হয়।

প্রথমেই ভাল রান্নার কথা বলি—

এবারে কয়েকটি ভাল রান্নার কথা শুনুন। মুগ, মুসুর, অড়হর, কড়াই, ছোলা কতরকম ভাল। তাদের স্বাদও বিভিন্ন। সময় সংক্ষেপের জন্য সাধারণতঃ মুগ আর মুসুর ডালই বেশী রাঁধা হয়। তবে সেকালে ওঁরা রান্নার সময় সংক্ষেপের কথা ভাবতেই পারতেন না। বরং কি ক'রে আর কত ঘটায় নিত্য নতুন পদ বৃদ্ধি করা যায় এই ছিল সেকালের গৃহিণীদের চিন্তা। ওঁদের আর আমাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কাজেই আজকালকার অবস্থা অনুসারে আমাদের চলতে হবে।

ভাজা মুগ ভাল অনেকেই জানেন। কাঁচা মুগ ভেজেও ভাজা মুগ ডালের স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আগে কাঁচা মুগের ডালের কথাই বলি। খুব তাড়াতাড়ি হয়।

কাঁচা মুগের ডাল (ঠাকুর বাড়ী)

উপকরণ :—কাঁচা মুগ আড়াইশো গ্রাম। (ছোট ছোট ডাল হলেই ভাল) ধনেপাতা এক আঁটি। কাচালঙ্কা দশটি। ঘিয়ে চা চামচের এক চামচ। আদা কুচি দুচামচ। চিনি তিন চামচ। নুন। ঘি ধড় চামচের দু চামচ।

প্রণালী :—ভাল মুগ সেদ্ধ চড়ান। ঐ সঙ্গে নুন দিয়ে দিন। দেখবেন, একেবারে গলে ক্যাদা না হয়ে যায়। নামিয়ে রাখুন। কড়ায় একচামচ ঘি দিন সব কটি ঘিয়ে আর আদা কুচি ফোড়ন

দিন বেশ একটি সুগন্ধ বেরুলেই ডাল ঢেলে দিন। নুন, মিষ্টি দিন। নামাবার আগে আর এক চামচ ঘি আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে চাপা দিন। এতক্ষণ একটু ঘন থকথকে হবে। কোড়নের তাক বুঝতে হবে। কোড়ন যদি পুড়ে যায় বা কাঁচা থাকে তবে এইসব রান্নার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

ঠাকুর পরিবারের আরও কয়েকটি প্রচলিত রান্নার কথাও বলছি।

মুগ খিচড়ি (ঠাকুর বাড়ী)

উপকরণ :—বাসমতী চিনিগুঁড়ি আধকিলো। কাঁচামুগ বা চাল ভাজা মুগের ডাল আড়াইশো গ্রাম। হলুদ, লঙ্কা, জিরে, গোলমরিচ, আদা, গরম মশলা বাটা। ঘি বড় চামচের দুচামচ। নুন, মিষ্টি। তেজপাতা আধ কাপ। পিঁয়াজ মাঝারি সাইজ দুটি। রসুন ছয়কোয়া।

প্রণালী :—ভাজা মুগের ডাল হলে এমনি সেদ্ধ চড়ান। কিন্তু কাঁচা মুগ ভাজতে হবে কড়ায় আগে একটু তেল দিয়ে তারমধ্যে আস্ত জিরে আর গরম মশলা কোড়ন দিয়ে ডালটি একটু নেড়ে নেড়ে ভাজুন। নাড়তে থাকুন ডাল ছেড়ে তেল বেরিয়ে ফেনা উঠবে আর বাসমতী রং ধরে ভাজা গন্ধ ছাড়লেই বুঝবেন ভাজা হয়ে গেছে। জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। ডাল ধরে গেলে স্বাদ খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু। নুন দিন। অল্প হলুদ বাটা দিয়ে আধসেদ্ধ করে ডাল নামিয়ে নিন। এবার পেঁয়াজের সঙ্গে রসুন কুচিয়ে নিন। মাছ ভেজে নিন। মাথার খোলা ফেলবেন না। মশলা সব আলাদা বেটে নিন। শুধু জিরের সঙ্গে গোলমরিচ কয়েকদানা একসঙ্গে বাটা হবে। কড়ায় তেল চড়ান মাছটি আধভাজা করে তেল সুদ্ধ ঢেলে রাখুন। আবার তেল চড়ান পিঁয়াজ রসুন কুচি লাল করে ভাজুন। বাটা মশলা দিন আদাবাটা হবে বড় চামচের এক চামচ জিরে গোলমরিচ বাটা আধচামচ লঙ্কা বাটা আধচামচ চিনি দিন বেড় চামচ। একটু হলুদ বাটা দিন। ভাজা হতে না হতে ঐ তেল সুদ্ধ মাছ ঢেলে দিন। আবার ভাজুন, এবার ডাল ঢেলে দিন। ফুটে উঠবে মাছ সেদ্ধ হবে ভাঙবেনা ডাল গলে ফ্যান হবেনা, একটু গাঢ় থাকবে। নামাবার আগে ঘি দিন। গরম মশলা বাটা দিন নামিয়ে। ঢেকে রাখুন।

মাংসের কোর্মা (ঠাকুর বাড়ী)

এই মাংসের কোর্মা যদিও মোগলাই রান্না তবু ঠাকুর বাড়ীর রান্না বলে গিয়ে এর তোল পাল্টে গেছে।

উপকরণ :—ভাল মাটন্ (রাংএর মাংস) দু কিলো। বড় বড়টুকরো করে কাটা হবে। খোয়াক্ষীর বেড়শো গ্রাম। কিসমিস একশো গ্রাম। পিঁয়াজ আধ কিলো। রসুন দুটি। আদা দুশো গ্রাম। পাটনাই লঙ্কা কুড়ি বাইশটি। অরেঞ্জি আনারস ও কাবাবচিনি সব মিলিয়ে আধসের। কেওড়া বড় চামচের চার চামচ। টক দই আড়াইশো গ্রাম। সরষের তেল দুশো গ্রাম। ঘি আড়াইশো গ্রাম। চিনি বড় চামচের চার চামচ। জিরে গোলমরিচ বাটা। জিনিগার আধকাপ। গরম মশলা। নুন।

প্রণালী :—মাংস গরম জলে ধুয়ে জিনিগার মাখান। পিঁয়াজ ও রসুন অর্ধেক বাটা হবে

অর্ধেক কুচিয়ে নেবেন। আদা বেটে নিন। লঙ্কার ভেতরের বিচি ফেলে বাটুন। এছাড়া জিরে গোলমরিচ বাটা জয়েত্রি, আয়কল কাবাবচিনি সব বেটে আলাদা আলাদা রাখুন। ঘোয়া হাতে বেশ করে চটকে খুব ঘরে করে নিয়ে কড়াই ঘি দিয়ে লালচে করে ভাজুন। কিসমিস বোঁটা ফেলে ধুয়ে নিন। এবার একটি পুরু তেকচি বা হাঁড়িতে তেলে ঘিয়ে মিলিয়ে চড়ান। ঘি প্রায় সবটাই দেবেন। এবার গরম মশলা ছোড়ন দিন। একটু বেশী করে দেবেন। এলাচের খুব খুলে দেবেন ফুটে গেলে পেয়াজ রসুন কুচি ছেড়ে দিন। বেশ লাল করে ভাজুন। বাদামী রং ধরলে এবার লঙ্কা বাটা দিন, সঙ্গে বড় চামচের তিন চামচ চিনি দিন বেশ করে ভাজুন এবার হলুদ বাটা দিন একটু ভাজুন, এবার জিরে গোলমরিচ বাটা, তারপর আদা বাটা এবার পিয়াজ বাটা সবশেষে সবটা দই আর জয়ত্রি ইত্যাদি বাটা আর কিসমিস মশলা ছেড়ে ঘি বেরিয়ে আসবে এবার মাংসের টুকরোগুলি সব লাগিয়ে দিন বাকি তেল ঢেলে দিন—মাংসের জল শুকোবে আবার ভাজবেন তখন গরম জল দেবেন। মাংস আধসেদ্ধ হলে নুন দেবেন। বেশ ভাল সেদ্ধ হবে তবে ঘাঁটবেনা। নামার পর গরম থাকে বসাবেন একটা ভাজা-কিছু চাকা দেবেন। নামাবার কিছুক্ষণ আগে ঘোয়া ক্ষীর দেবেন। বাকি এক চামচ চিনি উনুনের ওপর ধরে পুড়িয়ে নিয়ে ঢেলে দেবেন। নামিয়ে একটু গরম মশলা বাটা ও কেওড়া দেবেন।

মাংসের পোলাও (মোগলাই)

উপকরণ :—ভাল লম্বা চাল আধকিলো। মাটন আধকিলো। বোঁয়ের রং আধ চামচ। কেওড়া সিকি কাপ। দুধ আধ কাপ। ঘি আড়াইশো গ্রাম বা দুশো গ্রাম। গরম মশলা, তেজপাতা পিয়াজ দুটি। আদাবাটা এক চামচ। লঙ্কা বাটা একচামচ। রসুন চার কোয়া।

প্রণালী :—ফুটন্ত জলে গরম মশলা আর তেজপাতা দিয়ে ভাত চড়ান। বেশী জলে চাল ফুটবে। একটু শক্ত থাকতে নামিয়ে ক্যান ঝরিয়ে নিন। মাংস অবশ্য আগেই একটু পেয়াজ আর আদা কুচি নুন দিয়ে বেশ করে সেদ্ধ করে নেবেন। তারপর ঐ সেদ্ধ মাংসে লঙ্কা আদা বাটা দিয়ে কষে নিন। একটু চিনিও দেবেন। এবার অর্ধেকটা ঘি ঢেলে দিয়ে মাংস ভাজুন। তারপর ঘি আর মাংস আলাদা করে নিন। বোঁয়ের রং টুকু দুধে গুলে নিন। বাকি ঘিটুকু ফুটিয়ে গরম করুন এবার ঐ ভাতের মধ্যে আগে মাংসের টুকরো দিন তারপর ঐ মাংসের ঘি দিন। রং গোলা দুধ ঢেলে দিন এবার গরম ঘি ঢেলে বেশ করে নেড়েচেড়ে কেওড়া ঢেলে দিন। ইচ্ছে হলে কিসমিস আর কাজু-বাদাম কুচি দিতে পারেন। এবার দমে বসান। ফুটন্ত গরম জলের ওপর বসিয়ে রাখলে গরমও থাকবে থাকও খুলবে। ছাঁ ফুলে গেছি পিয়াজ রসুন কুচিয়ে ঘিয়ে বাদামী করে ভেজে একেবারে শেষে ভাতের ওপর ছড়িয়ে দেবেন।

বড়দিনে বা জামাই ষষ্ঠীতে এই ধরণের রান্না কয়েকটি যদি কাজে লাগান দেখবেন কেমন সুখ্যাতির ঘটা। এবার দুটি মিষ্টি বলি। এও সেকালের জিনিষ।

ভাপা দই (চাকা)

উপকরণ :—আড়াইশো গ্রাম ক্ষীর ; আড়াইশো গ্রাম ছানা, আড়াইশো গ্রাম দই। কিছু মোলাপ পাতা, পেস্তাকুচি, কিসমিস ছোট এলাচের গুড়ো।

প্রণালী :—দইটি বেশ জমা দই হবে। এবার ছানা বেশ করে চটকে মিহি করতে হবে। শক্ত থাকলে একটু চিনি মিশিয়ে বেটে নিতে হবে। এবার ক্ষীর, ছানা, দই তিনটি জিনিষই এক করে খুব ভাল করে কেটাতে হবে। (ক্ষীর চিনি দিয়ে জাল দেবেন) বেশ করে মিশে গেলে এবার একটি কাচ:উচু পাত্রে একটু ঘি মাখিয়ে নিয়ে তাতে ঢেলে দিন। চাকা দিয়ে গরমজলের ওপর চড়ান। এই সময়েই কিসমিস ছড়িয়ে দিতে পারেন। জমে গেলে নামিয়ে এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। পেস্তা কুঁচি আর মোলাপ পাতা দেবেন একটু ঠাণ্ডা হলে। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তুলে পরিবেশন করুন।

বাঁধাকপির পায়েস (উত্তর প্রদেশ)

উপকরণ :—মাঝারি সাইজের বাঁধাকপির ভেতরের নরম অংশটি খুব কুচিয়ে কেটে দুকাপ হবে। দুধ আড়াই লিটার। কিসমিস পঞ্চাশ গ্রাম। ছোট এলাচের গুঁড়ো এক চামচ। কেওড়া বড় চামচের দুচামচ। ঘি বড় চামচের দেড় চামচ। তেজপাতা দুটি। চিনি চারশো বা পাঁচশো গ্রাম।

প্রণালী :—বাঁধাকপি কুচি গুলি থেকে জল ঝরিয়ে নিন। এবার কড়ায় ঘি চড়িয়ে তেজপাতা দিয়ে ওগুলি ছেড়ে দিন। বেশ বাদামি করে ভাজুন। দুধ ফুটিয়ে ঘন করুন। অর্ধেক ঘন হলে বাঁধাকপি দিয়ে দিন। কিসমিস দিন। বাঁধাকপি সেদ্ধ হলে নিজের রুচি মত চিনি দিন। কপি যেন বেটে না যায়। এবার নামিয়ে এলাচ গুঁড়ো আর কেওড়া দিন।

অপূর্ব স্বাদ হয়। ঠিক রাবড়ির মত। আরও কত রকম রান্নাই তো বাকি রয়ে গেল। উপস্থিত এই কটি বস্তুকরে খাদ্য বিলাসীদের খুশি বিধান করুন। আরও কত রকম পিঠে পায়েস যে আছে। আসলে আমরা এই বাঙালী জাতিটাই দারুণ খাদ্যরসিক। উপস্থিত মিষ্টি দিয়ে মিষ্টিমুখ করান। ঐ মিষ্টিমুখের বাক্যস্ফুরণেই আপনার পরিশ্রমের পারিশ্রমিক মিলবে।

———

বৈশাখী ব্রত

হাসি ভট্টাচার্য

ব্রত হচ্ছে নারীজীবনের কামনা। সেই কামনায় বাংলাদেশের মেয়েদের অন্তর-কথা প্রকাশ পায়। এই অন্তর-কথায় মেয়েরা চায় ঘর সংসার স্বামী পুত্র পরিজন ; এককথায় সামাজিক জীবন। বাংলাদেশের ব্রতে বাঙালী মেয়েদের সামাজিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপ প্রতিফলিত।

কিন্তু বিহুক কামনাকেই যেহি যেহি রবে প্রকাশ করলে তা শুধু চাহিদাই হয়। ব্রতে এই চাহিদা বিহুক প্রয়োজন সর্বস্ব নয় ; পরন্তু তা শিল্পরস সমৃদ্ধ। চিত্রকলায়, আলপনায় ব্রতের ছড়ায় তাই শিল্পের সুষমাকে উপলব্ধি করা যায়।

একদিকে বাংলার ব্রত তাই আনুষ্ঠানিক লৌকিক পার্বণ—অপরদিকে আবার তা মেয়েলি শিল্প এবং সংস্কৃতি। এই লৌকিক পার্বণ এবং মেয়েলি সংস্কৃতি প্রতি বছরে বছরে এবং মাসে মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পল্লী-বাংলার ঘরে ঘরে তার যে সমারোহ তা বাঙালী মেয়েলি-সমাজের অন্তর্মুখীন জীবনের সরল সৌন্দর্যময় শিল্প প্রকাশ।

নববর্ষে নতুন জীবনের সূচনা। সেই সূচনাকে উপলব্ধি করা যায় চৈত্রের ঝরাপাতার পর নবপত্রের সমৃদ্ধ সমারোহে। চৈত্রের শুকনো ও ঝুরঝুরে অশথ পাতার ঝরে যাওয়ার দিন শেষ হয়ে যায় বর্ষশেষে।

বাংলার প্রকৃতি-প্রাণা মহিলা-সমাজ নব-অশথকে, বন্দনা করে নববর্ষের প্রারম্ভে নব বৈশাখে। অশথপাতার ব্রতের মূলে যে সুরটী তা দেবতার বন্দনা গান।

বাঙালীর মানসে প্রকৃতি হচ্ছে জল তল, প্রকৃতি হচ্ছে সরস জীবন। প্রকৃতি শুধুমাত্র জড় নয়। বাংলাদেশের মেয়েরা সেই ধারণাতেই অশথ-ব্রত করে। এই ব্রত প্রকৃতি-পূজারই নামান্তর।

চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিনে এই ব্রত আরম্ভ করা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ-সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচটি পাকা কাঁচা কচি, শুকনো ও ঝুরঝুরে অশথপাতা নিয়ে পুকুরে নদীতে কিংবা গঙ্গায় গিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা স্নান করে এই ব্রত অনুষ্ঠান করে। এক একটি কামনা জড়ানো থাকে এক একটি পাতায়। সে-কামনা প্রকৃতি-প্রাণা মেয়েদের সংসার-জীবনের সহজ সরল কামনা,—

"পাকা পাতাটি মাথায় দেবো
পাকা চুলে, সিঁদুর পরবো,
কাঁচা পাতাটি মাথায় দেবো
কাজল পরীর পাবো।
শুকনা পাতাটি মাথায় দেবো
সুখ-সম্পত্তি ভোগ করবো।
কচি-পাতাটি মাথায় দেবো
নবকুমার কোলে পাব।

ঝুরঝুরে পাতাটি মাথায় দেবো
সোনা মুক্তার গহনা পরবো।
এই ব্রত যে উদ্‌যাপন করবে—
সে হবে ইন্দ্রের শচী।
যে না পারবে—সে হবে শ্রীকৃষ্ণের দাসী।"

ব্রতের মধ্যে কামনার সুরটিই প্রধান—কিন্তু ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে প্রকৃতি-প্রিয়তার যে শুভ্র সুন্দর সরল অভিব্যক্তি তা শিল্পীজনোচিত।

নববর্ষে বৈশাখ মাস ঘুড়ে গ্রাম বাংলার বহুরকমের ব্রত-অনুষ্ঠান প্রচলিত। এইবার পৃথিবী ব্রতের কথা বলি।

মাটী শুধু কাদা নয়, ধুলি নয়—তা আমাদের মাতৃ-স্বরূপা। মাটীর স্নেহ-ক্রোড়ে আমরা লালিত এবং পালিত।

বাংলাদেশের মেয়েরা তাই এই মাটী মাকে অন্তরতরা কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে। এই মাটীর বন্দনায় চমৎকার আল্পনা এঁকে ফুলে ভরা ছড়ায় ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে মনের কামনাকে প্রকাশ করা হয়।

পৃথিবী ব্রত সুরু হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে বৈশাখ সংক্রান্তিতে ব্রত সমাপ্ত। প্রতিদিন সকালবেলা আলোচালের পিটুলী গুলে বা সাদা চন্দন দিয়ে পরিষ্কার মাটীর উপরে পদ্ম এবং সোলাকার পৃথিবীর আলপনা রেখা অলঙ্কৃত করে ফুল, তুলসী, দুর্বা এবং চন্দন দিয়ে ব্রতের ছড়া বলা হয়। এই ব্রতের ছড়ায় প্রকৃতি-বন্দনার সুরের সঙ্গে মনের কামনাও সংযুক্ত।

"এসো পৃথিবী পদ্মাসনে পূজিব তোমায় একমনে
খাওয়াইব চিনি মাখাইব নবী
জন্মে জন্মে হবো রাজরাণী।
এ জন্মে খিলাইব ঘি জন্মান্তরে হবো রাজার ঝি।
একালে খিলাইব মৌ, কালে কালে হবো রাজার বৌ।"

নববর্ষের দশপুতুল ব্রত শুধুমাত্র কুমারী মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠান। চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে এই ব্রত সুরু এবং বৈশাখ সংক্রান্তিতে এই ব্রতের সমাপ্তি। বৈশাখের প্রতিটি বিকেলে কুমারী মেয়েরা আতপ চালের পিটুলী গুলে দশটি পুতুল এঁকে তার উপর ফুল, তুলসী, দুর্বা এবং চন্দন দিয়ে দশ পুতুলের ব্রত ছড়া বলে।

"এবার যদি মানুষ হবো, রামের মত পতি পাবো।
এবার যদি মানুষ হবো, সাবিত্রীর মত সতী হবো।
এবার যদি মানুষ হবো, লক্ষ্মণের মত দেওর পাবো।
এবার যদি মানুষ হবো, দশরথের মত শ্বশুর পাবো।
এবার যদি মানুষ হবো, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাবো।
এবার যদি মানুষ হবো, কুন্তীর মত পুত্রবতী হবো।"

এবার মনে মানুষ হবো, দ্রৌপদীর মত গুণবতী হবো।
এবার মনে মানুষ হবো, স্বর্গার মত সোহাগিনী হবো।
এবার মনে মানুষ হবো, পৃথিবীর মত ভার সবো।
এবার মনে মানুষ হবো, গঙ্গার মত স্নেহময় হবো।

সংসারে নারী-জাতির প্রতিটি সন্তান শিশু এবং কিশোরী কুমারী মেয়েদের মনে সুরে সুরে সঞ্চারিত করার এই প্রকার শিল্প মেয়েলি শিল্পের একটি আদর্শ।

সাধারণ কথার সুরের আবেগে এবং সামান্য উপকরণে চিত্রাঙ্কনের বেখায় মেয়েদের অন্তরকে ভরিয়ে সংসার ধর্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করার সুন্দরকলা-কৌশল এইসব ব্রতের সার্থকতা।

গ্রাম বাংলার প্রকৃতির জীবন থেকে শহরের যন্ত্র-জীবনে আজ আমাদের মেয়েদের অন্তরমুখীন ভাবধারা প্রতিহত। প্রকৃতির বিশালতার প্রভাব আমাদের মেয়েদের জীবনকে আর প্রসারিত করেনা; আমরা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছি দৈনন্দিন যান্ত্রিক জীবনযাত্রায়।

কিন্তু এখনো যখন শহরের চত্বরে নব বৈশাখী-পুণ্যিপুকুর ব্রতের কল-কাকলি ছোট ছোট কুমারী মেয়েদের কণ্ঠে শুনি তখন গ্রীষ্মের দাবদাহে জল কামনার সুরটি আমাদের মনকে অতিরিক্ত করে তোলে। এখনো পল্লী-বাংলার প্রকৃতি-প্রিয়তার ছবিটি আমাদের চোখ থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

ব্রতের কামনার কোন আদিকালে কোন পুরাঙ্গনা পুণ্যিপুকুরের পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে বৈশাখের আতপ্ত মাটির তৃষ্ণা প্রশমিত হয়েছিল।

"তুলসী তুলসী নারায়ণ।
তুমি তুলসী বৃন্দাবন॥
তোমার শিরে ঢালি জল
অন্তিম কালে দিও স্থল॥"

চলতি দুনিয়া

যৌবন সম্বন্ধে

আমেরিকার এক সাংবাদিক নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে নতুন কিছু কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর উচিত জীবনে তিনবার বিয়ে করা। পুরুষ হলে প্রথমবার বিয়ে করতে হবে পনেরো বছর বয়সে বছর তিরিশের নারীকে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে তিরিশ বছর বয়সে পনেরো বছরের মেয়েকে। আর তৃতীয়বার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পঁয়তাল্লিশ বছরের নারীকে। মেয়েদের ব্যাপারেও ব্যবস্থাপত্র একই রকম। এই ব্যবস্থা মতো কাজ চললে না কি নর-নারীর যৌন-স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি বেশ বজায় থাকবে। কিন্‌সে এবং অন্যান্য যৌনতত্ত্ব বিদদের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করেই ভদ্রলোক তাঁর ব্যবস্থা-পত্র হাজির করেছেন। জানা গেছে কিশোর পুরুষের এবং পরিণত যৌবনা নারীর যৌনশক্তি এবং উৎপাদন ক্ষমতা সব চাইতে বেশি থাকে। আমাদের সাম্প্রতিক কালের বিবাহ-ব্যবস্থায় প্রকৃতির এই নিয়মের স্বীকৃতি নেই।

ঝড়ের সময় সাবধান

বিদেশী পত্রিকা থেকে দরকারী তথ্য জানা গেলো। অনেকের ধারণা, ঝড়-বৃষ্টির সময়ে যাদের শরীর এবং জামা-কাপড় ভেজা তাদের চাইতে যাদের শরীর এবং জামা-কাপড় শুকনো তাদের তড়িতাহত হওয়ার কম সম্ভাবনা। কিন্তু বিদেশী কাগজটি বলছে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যার জামা-কাপড় ভেজা বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই সহজে তার শরীরের মধ্য দিয়ে গিয়ে মাটির সংস্পর্শে আসে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু যার শরীর এবং জামা-কাপড় শুকনো বিদ্যুৎ তাকেও আক্রমণ ক'রে, এবং যদি মৃত্যু নাও ঘটায় তাহলেও মগজ এবং অন্যান্য দৈহিকযন্ত্র বিকল ক'রে দেয়। এর পরে বেঁচে থাকা কি সুখের? ঝড়-বৃষ্টির সময় বাইরে থাকলে দুটি সতর্কতার ব্যবস্থা নিতে হবে। এক, যেখানে দেখবেন মাত্র একটি গাছ এ-রকম গাছের নিচে আশ্রয় নেবেন না, কারণ এ-রকম গাছের নিজেরই তড়িতাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুই, সিগারেট লাইটার ইত্যাদি ধাতবদ্রব্য সঙ্গে যতো কম রাখা যায় ততই মঙ্গল।

মানুষের জন্ম

মানুষের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে নতুন-নতুন তথ্য ক্রমেই আবিষ্কৃত হচ্ছে। অনেকদিন থেকেই মানুষের একটা জিজ্ঞাসা পুরুষ শিশুর চাইতে নারী-শিশু কেন বেশি জন্মায়? যদি ১০০টি পুরুষ শিশু

জন্মায়, তো নারী শিশু জন্মায় ১০০টি। কতগুলি পরিবারে দেখা যায় কেবল ছেলে জন্মাচ্ছে, আবার কোনো পরিবারে কেবল মেয়ে। কোনো মহিলা কি ইচ্ছা মতো ছেলে বা মেয়ের জন্ম দিতে পারেন না? কিছু সংখ্যক মহিলা বন্ধ্যা হন কেন? বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগার থেকে এই সব প্রশ্নের জবাব ক্রমেই বেশি ক'রে পাওয়া যাচ্ছে। চার শতাব্দী ধরে চিকিৎসকেরা এই ধারণাই পোষণ করতেন যে পূর্ণ মানব শিশু সমেত একটি ধনে গর্ভের ভিতরেই থাকতো। ডিম ভেঙে গেলে ওই শিশুটি আস্তে-আস্তে বড়ো হতো। জর্মানির বিজ্ঞানী ডাক্তার স্যাণ্ড্রাম সম্প্রতি পরীক্ষাগারে জীবন-সৃষ্টির নাটকটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

নিরাপদ লুপ তৈরী হচ্ছে

লুপ প্রবেশের পর মহিলাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিংবা আরো নানারকম অস্বস্তিকর উপসর্গ দেখা দিয়েছে এ-রকম ঘটনা বিরল নয়। তার ফলে লুপের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। খুলে ফেলবার জন্য চিকিৎসকের বাড়ির সামনে লম্বা লাইন পড়েছে এ-রকম ঘটনা হামেশাই খবরের কাগজে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জানা গেলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবার পরিকল্পনা শাখা নতুন ধরণের লুপ তৈরী করছেন যা ব্যবহারে কোনো রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে না। নতুন ধরণের লুপ তৈরী হচ্ছে কানপুরের কারখানায়।

জর্মানির পুলিস

জর্মানিয়াতে দাড়ি রাখতে হ'লে এখন আগে থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। পশ্চিমের 'প্রতিক্রিয়াশীল' ভাবনের স্রোত রুখবার জন্য সেখানে ওই অভিনব ব্যবস্থা।

পুলিশের উপরে হুকুম আছে দাড়ি-আলা লোক দেখলেই তাকে গ্রেপ্তার করতে। পুলিশ তখন চাইবে লাইসেন্স দেখতে। যারা তা দেখাতে পারবে না তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ আনবে সমাজ-বিরোধিতার অভিযোগ। জর্মানির কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী ও দেশে কেবল শিল্পী এবং অভিনেতারাই দাড়ি রাখবার অধিকারী। আর শল্যচিকিৎসা থাকতে পারবেন তারা যাদের গালে কোনো রকম ক্ষতচিহ্ন বা দাগ আছে।

ব্রেজিলের বীভৎস ঘটনা

ব্রেজিলে সম্প্রতি একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে। ওই দেশের পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় এক স্বামী-স্ত্রী অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে অন্য একটি পরিবারের লোকদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়ার পর তাদের সকলকে হত্যা করে। পরে, হত্যানো শবদেহের মাঝখানে ব'সেই স্বামী-স্ত্রী মৃদির মাংস সহযোগে ভোজন শুরু করে। মৃদিটা নিহত ব্যক্তির। স্বামীর বয়েস ২৮ আর স্ত্রীর বয়েস ষোলো। ভোজন শেষ করার পর রাতের অন্ধকারে তারা মৃতদেহগুলিকে কবর দেয়। তখন দু বছরের একটি শিশু জ্যান্ত ছিলো। পুলিশ এই খুনে দম্পতীকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের শাস্তি নিশ্চয়ই কঠিন হবে।

স্ত্রীকে ভালো শ্রোতা হতে হবে

ইস্টবোর্ন-এর একটা খবর থেকে জানা গেলো হৃদয় ও বুক বিশেষজ্ঞদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একজন হৃদয় বিশেষজ্ঞ এই অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে স্বামীরা যখন তাদের কোনো বিপদ বা অসুবিধার কথা বলে তখন স্ত্রীদের উচিত সহানুভূতির সঙ্গে ধৈর্য ধ'রে শোনা। এতে স্বামীদের স্নায়ু ও মনের উপরকার অস্বাভাবিক চাপ অনেকখানি হ্রাস পাবে, করোনারী থ্রম্বসিসে এত ঘন ঘন মৃত্যুও ঘটবেনা। বিশেষজ্ঞ মশাই বলেন : 'স্বামীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় স্ত্রীর দায়িত্ব অনেকখানি।

অভিনব বিবাহ-বিচ্ছেদ

লণ্ডনে এক অভিনব বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেখানকার আদালত ২১ বছর বয়স একটি মেয়ের বিবাহ বাতিল ক'রে দিয়েছে। মেয়েটির ইচ্ছা ক্রমেই আদালত এই রায় দেয়। কারণ সে ব'লে এই বিয়ে হয়েছে তার সম্মতি না নিয়ে। মিসেস এলিজাবেথ ক্রলি জানায় যে যাকে সে বিয়ে করছিলো সে পুরুষটি হয় তাকে বিয়ের সময় মদ খাইয়ে মাতাল করে রেখেছিলো, নয়তো হিপ্নোটাইজ করছিলো। মেয়েটি জানায় সে যখন কাজ ক'রে বাড়ি ফিরছিলো তখন ওই লোকটি জোর ক'রে তাকে মোটরে তুলে নেয়।

পার্লামেন্টে চাঞ্চল্য

আগে অপসরাদের দেখে মুনি-ঋষিদেরও তপোভঙ্গ হতো এ-রকম কথা আমরা রামায়ণ-মহাভারতে ও পুরাণে পড়েছি ও শুনেছি। সম্প্রতি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব তা তার চাইতে কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। গত ১২ই এপ্রিল রূপসী চিত্র-তারকা জেইন ম্যানসফিল্ড এমন অসাধারণ অথচ কুহকিনীর বেশে হাউস অব কমন্স-এ প্রবেশ করেন যে পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্যেরা ক্ষণকালের যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেন। পরে সেখানে এমন তুমুল হৈ চৈ বেধে যায় যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য স্পীকারকে তৎপর হয়ে উঠতে হয়।

সমকামী ছাত্র সংঘ

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা এক অভিনব প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'হোমোফেল্যুয়াল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' বা 'সমকামী ছাত্র সংঘ।' গত ১৯শে এপ্রিল এই সংঘটি স্থাপিত হয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা ১২। এই ১২ জনের মধ্যে একজন মেয়ে আছে। সদস্যদের নামধাম বিষয়ে সব রকমের গোপনতা রক্ষা করা হয়। সংঘের সভাপতি জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকে অসাম্য দূর করাই তার প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অখিতীয় হলেও কালক্রমে এর শাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র স্থাপিত হবে।

স্কুলে যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী মিষ্টার সি. এন. আন্নাদুরাই স্থির করেছেন যে যৌন বিদ্যাকে ওই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলির পাঠ সূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সরকারী সমর্থনেই তা করা হবে। বিবাহ সম্মিতির বহুল বৃদ্ধি ঘটে, পরিবার পরিকল্পনাকে আরো সার্থক ক'রে তুলবার জন্যও সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। পল্লীর বিদ্যা এবং মনোবিদ্যার অংশরূপে যৌন বিষয় শিক্ষা দেয়া হবে। ভবিষ্যত

নাগরিকদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তুলবার জন্যই বিদ্যালয়-গুলিতে অবিলম্বে যৌনশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত ব'লে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

পুলাঙ্গিনীদের রাণী

বুয়েনস এয়ারস-এ মারিয়া এসথার হারিয়োস নামে এক মহিলা পুলাঙ্গিনীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা রূপে সম্প্রতি নির্বাচিত হয়েছে। তার ওজন ২৪ স্টোন ৯ পাউণ্ড। তাকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে প্রচুর আলু, টমাটো, পেঁয়াজ, ময়দা, পনীর এবং আরো নানা রকম খাবার। যেমন প্রতিযোগিতা তেমনি তার পুরস্কার।

তাজ্জব ব্যাপার

ইতালির এক কারাগারে একজন স্ত্রীলোক চার বছর যাবৎ রয়েছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে সে গর্ভবতী। এতে সেখানে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অনুসন্ধান চলেছে। সকলেরই জিজ্ঞাস্য কী ক'রে স্ত্রীলোকটির এই দশা হলো। কারাগারের একজন মুখপত্র জানিয়েছেন কারারক্ষীরা সকলেই স্ত্রীলোক। হয়তো গত ডিসেম্বর মাসে সামান্য অপারেশনের জন্য তাকে যখন একটা বেসরকারী ক্লিনিকে পাঠানো হয় তখনই এই কাণ্ড হয়ে থাকবে। স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার অপরাধে স্ত্রীলোকটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে।

ব্রিটেনে টপলেস ক্লাব

দুটি আমেরিকান নাইট ক্লাবের মালিক মিষ্টার ভস বোয়েটা এবং মিষ্টার পিটার মেটিয়লি সান ফ্রান্সিসকো থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছেন। ব্রিটেনে একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান খুলবার জন্য তারা উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করছেন। ওই ক্লাবের ওয়েট্রেস এবং বারমেইডরা সকলেই টপলেস জামা প'রে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করবে। অবশ্য সরকারী এবং বেসরকারী ভাবে ব্রিটেনে এর প্রতিবাদ উঠেছে।

ড্রিম গার্ল

মেয়েটির নাম মেরিয়ান কচ। জার্মানীর একজন বিখ্যাত চিত্রতারকা। মিউনিকের এক কন্সিউটার যন্ত্রের বিচারে বহুর মধ্যে সে-ই, একমাত্র সে-ই আজ জার্মানীর ড্রিম গার্ল সাব্যস্ত হয়েছে। ড্রিম গার্ল সম্মান লাভকরতে হলে যা যা প্রয়োজন—উচ্চতা হবে ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, মুখ হবে ডিম্বাকার, চোখ আয়ত ও নীল, চুল কালো, পদযুগল দীর্ঘ ও ছিমছাম, কণ্ঠস্বর মধুর। সে হবে সজীব, হাসিখুশী ও সুরসিক। খেলাধুলো সে ভালোবাসবে, ভালোবাসবে শিশুদের, আর সে হবে প্রকৃত নারী। এই প্রত্যেকটি গুণই মেরিয়ানের আছে বলে কন্সিউটার যন্ত্রটি রায় দিয়েছে তারই পক্ষে। তাই মেরিয়ান আজ আর শুধু রুপালি পর্দার রূপসী নয়, সে বহু-সম্ভবা।

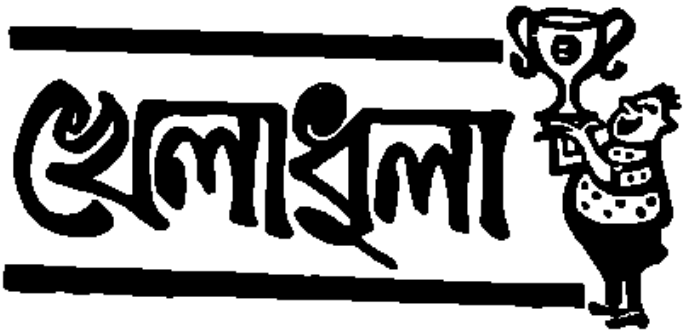

অলিম্পিকের জন্মকথা

শ্রীজ্যোতির্ময়

নানা ধরণের খেলাধুলার মধ্যে অ্যাথলেটিক্স অর্থাৎ বলগত স্পোর্টস, যথা, নানা দূরত্বের দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, বর্শা ছোড়া, চক্র ছোড়া, ইত্যাদি মিলিয়ে যে স্পোর্টস হয় তারই আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি! সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিটরা এই রকম প্রতিযোগিতামূলক যে খেলায় যোগদান করেন সেই খেলাকে বলা হয় অলিম্পিক। এই অলিম্পিক প্রথম কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ১৩১০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রীসে এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ৭৪৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রথম লিপিবদ্ধ রেকর্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই রেকর্ডে দেখা যায়, স্পার্টার চিওনিস নামে এক অ্যাথলিট দৈর্ঘ্য লম্ফে ২০ ফুট ৫ ইঞ্চি অতিক্রম করেছেন। সেই সুদূর অতীতে যখন প্রতিযোগিতা এত তীব্র ছিল না, সেই সময় এই রেকর্ড বিস্ময়কর বৈকি! আজ এই বিভাগের বিশ্বজয়ী রেকর্ড অধিকার করেছেন ব্যালক হোস্টন। তাঁর রেকর্ড ২১ ফুট ৫ ইঞ্চি!

গ্রীক যোদ্ধা ফেলদিপিদিস-এর ম্যারাথন দৌড়ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। ৪৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি ম্যারাথন এবং স্পার্টার মধ্যবর্তী ১৪০ মাইল পাহাড়ী পথ ৪৫ ঘণ্টায় পার হয়েছিলেন। সেই পথ-পরিক্রমা থেকে ম্যারাথন রেস নামটি চালু হয়েছে।

এ হেন অলিম্পিকের সূচনাকে কিন্তু রোম সম্রাট থিওডোসিয়াস ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে দেশে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের কুকথুদেও সেখানে এই ধরণের খেলাধুলার চল ছিল। রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৬৪ সালে মাঠের মধ্যে ঐ ধরণের সব খেলাকে বিপজ্জনক জ্ঞান করে নিষিদ্ধ করে দেন।

আদিযুগে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে লোকেরা পয়সার লোভে রাস্তায় ছুটতো, দু'তিনজন মিলে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামত। ১৬৬৩ সালে বিখ্যাত লেখক স্যামুয়েল পেপিস তাঁর ডায়েরীতে এই রকম একটি দৌড়ের কথা লিখেছেন। হাঁটার জন্যেও লোকে পয়সা পেত সেকালে। ফলটার পাইরেস নামে এক ব্যক্তি ১৭৮৯ সালে ২২ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পথ হেঁটে প্রচুর পয়সা পেয়েছিল এবং ক্যাপ্টেন বার্কলে নামে কোনও টাকার জন্যে ১৮০৯ সালে ১০০০ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পথ হেঁটেছিল এই রকম তথ্যও পাওয়া গেছে।

এইসব বিক্ষিপ্ত দৌড় ও হাঁটার প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে কোন বিধিবদ্ধ ভাবে নয়। এলোমেলো প্রথায় যখন তখন এবং কোনরকম পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকেই। খেলাধুলার প্রচলন যখন বাড়লো তখন ইংলণ্ডেই প্রথম স্পোর্টস ক্লাবের সৃষ্টি হল, একটি কেমব্রিজে ১৮৫১ সালে এবং অপরটি অক্সফোর্ডে ১৮৬০ সালে। ইংলণ্ডের দেখাদেখি আমেরিকা, নিউজীল্যাণ্ড, কানাডা, বেলজিয়ম সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও ক্রীড়া সংঘ গড়ে উঠল।

আধুনিক যুগের প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ব্যারণ ডি কুবারটিনের পৃষ্ঠপোষকতায় এথেন্স-এ ১৮৯৬ সালে।

তারপর ক্রমান্বয়ে নানা বিশ্ব-প্রতিযোগিতা মূলক খেলায় নতুন রেকর্ড স্থাপিত হচ্ছে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ এর মধ্যে সেই "উড়ন্ত ফিন' পাভো নুরমি ২০টি বিশ্বরেকর্ড ভাঙবার নয়। ১৯৫২ সালে হেলসিন্‌কিতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জাটোপেক ত্রিমুকুট অধিকার করে যে চমকের সৃষ্টি করেছিলেন তাও সকলেরই মনে আছে, ৫০০০ মিটার, ১০০০০ মিটার এবং ম্যারাথন, এই তিন বিভাগের দৌড়েই তিনি প্রথম হয়েছিলেন, যা আজো অন্য আর কারুর পক্ষেই সম্ভব হয়নি। রন্ ক্লার্ক ১৩ মিনিটে ৩ মাইল পথ দৌড়ে যে রেকর্ড করেছিলেন তাও এক বিস্ময়ের ব্যাপার!

১৯৫৪ সালে রোজার ব্যানিস্টারের ৪ মিনিটে ১ মাইল দৌড়, জেসি ওয়েন্স-এর ১০ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড় এবং আরও অনেক রেকর্ড অলিম্পিকের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে।

রেকর্ডের পর রেকর্ড তৈরী হচ্ছে। গতকাল মানুষ যাকে অসম্ভব বলে মনে করেছে, আজ তাই সম্ভব হচ্ছে। স্পোর্টস-এর প্রত্যেক বিভাগে তাই দেশে দেশে আজ আপ্রাণ প্রস্তুতি, খেলাধুলার পৃথিবীজয়ের দুর্দম প্রচেষ্টা! তাই চার বছর অন্তর অলিম্পিক খেলার সারা বিশ্বের যোগদান উপলক্ষে বিশ্বময় আলোড়ন উৎসাহ এবং প্রতিযোগিতার আহ্বান।

যে অলিম্পিক আজ পৃথিবীময় এই নবজীবন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে তার অগ্রদূত হল এথেন্স নগরে ১৮৯৬ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৭০ বছর আগে।

ক্রিকেট প্রসঙ্গ

আপনি জানেন কি?

টেস্ট ক্রিকেটে একদিনের মধ্যে তিনশ রান কোন্ খেলোয়াড় করেছেন?

একজন মাত্র খেলোয়াড় এই রেকর্ড-এর অধিকারী—ডন ব্র্যাডম্যান।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় একদিনে তিন শতাধিক রান করবার নজীর আছে।

যেমন ১৯২১ সালে ইংলণ্ডে নটিংহামের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ব্যাটস্‌ম্যান চার্লি ম্যাকার্টনি একদিনেই প্রায় ছেড়িয়ে ৩৪০ করেছিলেন।

আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি একদিনে সবাই মিলে খেলে যা অনেকে খেলে সর্বসাকুল্যে ৩৫০ রান করতে হিমসিম খেয়েছে।

সে হিসাবে একদিনে একজন ব্যাটসম্যানের পক্ষে একাই তিনশর উপর রান করা বিস্ময়কর কৃতিত্ব বৈকি।

তার উপর আবার টেস্ট খেলায়!

বহু রেকর্ডের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় ডন ব্র্যাডম্যানের পক্ষে তাই এই রেকর্ডই মানায়।

১৯৩০ সালে লীডস মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ডন ব্র্যাডম্যান প্রথম দিনেই করেছিলেন ৩০৯ রান। মোট রান করেছিলেন ৩৩৪।

বিখ্যাত ক্রিকেট লেখক উইজডেন ব্র্যাডম্যানের এই খেলা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—এই খেলায় ব্র্যাডম্যানের অন্যান্য কীর্তিও স্মরণীয়। এই খেলায় লাঞ্চের আগেই তিনি শত রান পূর্ণ করেছিলেন (টেস্ট রেকর্ড); তার পর দিনের শেষে ৩০৯ (টেস্ট রেকর্ড); টেস্ট ক্রিকেটে ১০০০ মোট রান সম্পূর্ণ (অল্প সংখ্যক খেলায় ঐ রান তোলার রেকর্ড); দ্রুততমের ২০০০ রান সম্পূর্ণ (রেকর্ড)।

টেস্ট খেলায় ব্র্যাডম্যানের গড় হচ্ছে ৯৯·৯৪ (রেকর্ড)। মোট ৫২ টেস্ট খেলে ৮০ ইনিংসে তাঁর মোট রান সংখ্যা ৬৯৯৬ (রেকর্ড); তার মধ্যে ২৯টি সেঞ্চুরি (রেকর্ড)। আর ইংলণ্ডের পক্ষে কীরকম কষ্টক তিনি ছিলেন তার প্রমাণ—৬৯৯৬ রানের মধ্যে ৫০২৮ রান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। এই সূত্রে বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক জন আর্লটের উক্তিটি স্মরণীয়—He set out to break all the batting records and he succeeded.

• • •

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ড পৌঁছে খেলা শুরু করেছে। খেলবে কি? একে দারুণ বর্ষা। তার ওপর হাড় কাঁপানো শীত। আমাদের ছেলেরা ঐ রকম আবহাওয়ায় ক্রিকেট খেলতে মোটেই অভ্যস্ত নয়।

প্রথম খেলায় মাঠে নেবে তো সবাই কেঁপে সারা! সুব্রত গুহ তো তিন তিনটে সোয়েটার চড়িয়েও ঠক ঠক করে কেঁপেছে সারাক্ষণ।

চন্দ্রশেখরের আঙুল ঠাণ্ডায় জমে গেছে বলে মোচড় খেয়ে কি, শীতে তার আঙুলগুলোই মোচড় খাচ্ছে।

যাই হোক, নানা বিরূপ সমালোচনা, তার মধ্যে দু'চারজনের ভাল কথা—এই দু'রকম আলোচনার মধ্যে ভারত ইংলণ্ডে সফর সুরু করেছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, প্রথম টেস্ট খেলার জন্য টিকিটের চাহিদা মন্দ নয়।

একেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট সম্বন্ধে সেখানকার অধিবাসীদের উৎসাহ আর আগেকার মতো নেই। তার উপর আবার ভারতের সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা! এবং সর্বোপরি প্রকৃতির নির্মমতা।

ভারত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে স্বচ্ছন্দগতিতে খেলে চলেছে এটাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চক্রপাণি

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মানুষ অনেক রকমে মরে। অসুখে ভুগে মরে। দুর্ঘটনায় পটল তোলে। অরাজীর্ণ হয়ে, বুড়ো গাছ যেমন করে শুকিয়ে যায়, তেমনি করে একদিন খিতে পড়ে। আর মরে, বিশেষ করে এদেশে, গুলি খেয়ে। গুলি মানে, চতুরঙ্গ-পাঁজা-গুলির গুলি নয়। বন্দুকের গুলি। এবং পুলিশের বন্দুকের গুলি। নানারকম পরিসংখ্যানের মত, এরও একটি হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পুলিশ এতাবৎ মোট ২০০০ বার গুলি ছুঁড়েছে। অর্থাৎ গড়ে বছর বেশী প্রতিমাসে ৯ বার। সঠিক সংখ্যা হচ্ছে ২০১৮ বার। এবং এর ফলে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে ১৮৭৫ জন মানুষের। অথম অঙ্গহানি প্রভৃতির সংখ্যা ৪২৮৪। এর জন্যে সরকারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকা। স্বাধীনতা লাভের বিশবছর পরে এইরকম একটি পরিসংখ্যানের নজীর অন্য কোন দেশের ইতিহাসে আছে কিনা জানা নেই।

• • •

থিয়েটার আর নাটকের মধ্যে দেশকে যেন মাতিয়ে তুলেছে। এর মধ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই থিয়েটারের আখড়া খুলে ফেললেন গত বছর মে মাসে। সুযোগ-সন্ধানী তরুণ রায় মোশন্ মাষ্টার নিযুক্ত হয়ে রিহার্সাল শুরু করিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের মুখরিত পাষাণ। শোনা গিয়েছিল গত বছর সেপ্টেম্বরে এর অভিনয় হবে। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কী অমনি হলেই হল? গৌরী সেনের টাকা! স্বর্গত বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে সে টাকা যখেচ্ছ খরচ না হলে চলবে কেন? মহলা গড়াতে গড়াতে, অর্থাৎ বরচান্ত হতে হতে শেষপর্যন্ত গত মাসে মুখরিত পাষাণ মঞ্চস্থ হয়েছে। এবং পর্যন্ত মুখরিত প্রসব করেছে। তরুণ রায়ের গুণগ্রাহী আর পেয়ারের সমালোচকরা অনেক রেখে ঢেকে সমালোচনা করলেন। কিন্তু সবাই তো সমান নয়। দু'একজন স্পষ্টবাদী ও সত্যবাদী সমালোচক হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। তরুণ রায় নিপুণ পরিচালক (এ হচ্ছে আমাদের বক্তব্য), তাঁর মত কম্পোজিশন জ্ঞান অতি অল্প পরিচালকেরই আছে, সহস্র সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যেও কি করে নাট্যমুহূর্ত সঞ্চার করতে হয় এ কৌশল তাঁর অধিগত। কিন্তু সে সব হলে কি হবে। সঙ্গীত প্রয়োগ ও নৃত্যব্যবস্থাপনা তালগোল পাকিয়ে এমনই কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গিছল যে পরিচালকের কোনো গুণপনাই কার্যকরী হয়নি। ফলে সমালোচনা বেরুলো—প্রচণ্ড চক্রনিনাদের পর এ আমরা কি দেখলাম, একি নাচ আর একি গান!! যেমন খেলো গানের সুর তেমনি খেটো

মাচের বাহার—The poor dances reminded us more of the 'Sakhis' of the Jatra Parties than of the romantic 'Nartakis' of the Arabian Nights। এর ওপরে শ্রী ভি. কে. সেন আরো কেচ্ছা বার করলেন। তিনি বললেন, এই বিজ্ঞাপন আর থিয়েটার বাবদ খরচে সরকারী তহবিলের (অর্থাৎ করদাতাদের) ৬০ হাজার টাকা। লোক সংস্কৃতি, লোক সঙ্গীত ইত্যাদি নানা ব্যাপারে এঁরা বরাদ্দ হাতে টাকা উদ্ধার করেন। লাখ লাখ টাকা। একদিকে দেশের লোকের হা-অন্ন হা-অন্ন করে জিভ বেরিয়ে পড়ছে আর অন্যদিকে সরকারী অর্থে পুষ্ট (করদাতাদের অর্থ অপচয়ের চূড়ান্ত নিদর্শন) এই ধরণের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে রং তামাশা আর কল্পিকারী কাজে টাকা ওড়ানোর মোচ্ছব—বিচিত্র এই দেশেই এরকম ব্যাপার সম্ভব।

• • •

অনেক বছর পরে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলাম, তারপর, তোমার ছেলেপুলেদের খবর বল। বন্ধু বলল—আমার ছেলেরা সবাই খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বড় ছেলে অমর ডাক্তারি পাশ করে ডাক্তার হয়েছে। মেজ অভয় বি. এল পাশ করে উকিল হয়েছে। সেজটি শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়েছে। কেবল ছোট ছেলে অমল তেমন সুবিধে করতে পারেনি।

প্রশ্ন করলাম—সে কি করছে?

বন্ধু বলল—সে কলেজ অবধি পৌঁছতে পারেনি। এখন রজির কাজ করছে। কিন্তু ভাই তোমায় একটা কথা বলি। অমল না থাকলে আমাদের বুড়োবুড়িকে না খেয়ে মরতে হত।

• • •

কোলকাতার মাঠে ফুটবল খেলায় দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে, মনে আছে কয়েক বছর আগে, বিলাত এবং মার্কিন খবর-কাগজগুলোতে অনেক আ-কথা কু-কথা লেখা হয়েছিল। ছুতো পেলেই হয়। ভারতবর্ষ যে এখনও পুরোপুরি সভ্য হয়নি তা প্রমাণ করবার জন্যে ওইসব কাগজওয়ালারা এবং আরো অনেক সুহৃদ্বর বিদেশী ব্যক্তি সদাই উন্মুখ। কিন্তু নিজেদের দেশে যেসব কেলেঙ্কারী হয় সেসম্পর্কে তাদের কণ্ঠ কোনোদিনই উঁচু পর্দায় ওঠে না। কিন্তু খবর তো আর চাপা থাকে না। বিদ্রূপক তট্টাচার্য তাঁর এক অনুবাদিত নাটকে একটি সংলাপ দিয়েছেন—'পাপ আর পারমেটিক চাপা থাকে না, বেরিয়ে পড়বেই'।

ঠিকই তাই। বিলাতের খেলার মাঠে যে মারপিট নিত্য লেগে আছে, যেসব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে, সেসব খবর এদেশে এসে পৌঁছেছে। খবরে বলা হয়েছে, ফুটবল খেলাকে ঘিরে মাঠে দর্শকদের দাঙ্গা এদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যে এখানে এবং ফটল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরে দুটি বড় খেলাকে উপলক্ষ করে দর্শকদের মধ্যে যে ধরনের দাঙ্গা বেধেছে তা রোমক যুগের এ্যাম্ফিথিয়েটারের লড়াইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্লাসগোর দাঙ্গাটি কার্যত সাম্প্রদায়িক। প্রায় ৩৮,৫২৪ দর্শকের উপস্থিতিতে গ্যাস্কোয়ার ইউনাইটেড বনাম ইংলিশ ফুটবল লীগের শেষ খেলায় আপটন পার্কে ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডকে ৩—১ গোলে হারিয়ে লীগে ৪১টি খেলায় ৫৯ পয়েন্ট অর্জনের সূত্রে নটিংহাম ফরেস্টের তুলনায় ৯ পয়েন্ট বেশী পেয়ে লীগ বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু এই খেলার সূত্র ধরে

মাঠে দর্শকে দর্শকে এমন প্রবল মারামারি লাঠা সুরু হয়ে যায় যে, মাঠের কোনেই সামরিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলতে হয়। পুলিশ বহু রক্তমাখা আহত দর্শককে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গ্লাসগোর অটিশ শীল্ডে গ্লাসগো রেঞ্জার্স বনাম সেলটিক ক্লাবের খেলায় ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে (প্রোটেস্টেন্ট ও রোমবিটেরিয়ান) দুদলের সমর্থকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মারা লেগে যায়। ফলে বারোজন দর্শক আহত হয়েছেন এবং মারা করার অভিযোগে পুলিশ বহু দর্শককে গ্রেপ্তার করেছে।

বিলাতেও ধর্মযুদ্ধ হয় তাহলে!

• • •

বাপরের মহাবলী ভীমসেন কী আবার এসেছেন এই ধরণীতে? ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় সেইরকম একজন বৃকোদরের আবির্ভাব ঘটেছে বলে খবরে প্রকাশ। এঁর নাম দেয়ন তেলকা মাইকেল। বয়স ৩৬। অসম্ভব এঁর গায়ের জোর। অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড কারখানা। ইনি দাঁত দিয়ে কিয়াট মোটর গাড়ী তুলতে পারেন, মাথায় করে ৪৫ কে. জি. ওজনের পাথর বইতে পারেন; পেশীতে আট কে. জি. ওজনের হাতুড়ির ঘা সহ্য করতে পারেন, বুকের ওপর ক্রমাগত হাতুড়ির ঘায়ে পঞ্চাশ কে. জি. পাথর গুঁড়িয়ে ফেলতে পারেন। উপরন্তু ১৪০ কে. জি. ভারোত্তোলন করতে পারেন। এছাড়া দাঁতে চিবিয়ে পেরেক ভাঙা, মাথায় মেরে কাঠের তক্তা ভাঙা, মাথা দিয়ে মোটা লোহার রড বেঁকানো প্রভৃতি ইনি সহজেই করতে পারেন। টেলিভিশনে মাইকেল-এর এইসব খেলা দেখান হয়েছে। ইনি প্রকাশ্যে এঁর খেলা দেখাচ্ছেন এখন। আর যেমন শক্তি তেমনি আহার। সারা দিনে-রাতে বার আষ্টেক খানা। প্রতিবার ৬।৭ কে. জি. পরিমিত আহার্য এঁর চাই। রান্না করা খাবার হলে তো উত্তম কথা। কাঁচাতেও আপত্তি নেই।

• • •

এই ভারাক্রান্তের মাঝে একটি মজাদার সুখবর। কোলকাতায় আর একটি সাধারণ পেশাদার থিয়েটার খোলা হোয়েছে। এই শহরে মহাজাতি সদন নামে যে সৌজন্যমূলক বাড়িটি আছে সেখানে বর্তমানে বৃহস্পতি, শনি ও রবিবারে নিয়মিত থিয়েটার চলছে। ভালই হোল। সদনের তহবিলে মোটা টাকা আসবে। তাতে আরও দু' চারজন পেটমোটা কর্মচারী রাখা চলবে। ইত্যাদি। আদর্শ নিয়ে কী ধুয়ে জল খাব? অতএব যত শীঘ্র ভুলে যাওয়া যায় যে এই সদন ছিল সুভাষচন্দ্রের স্বপ্নের জিনিষ, রবীন্দ্রনাথ এর নামকরণ করেছিলেন—এসব অতীত কাহিনী যত তাড়াতাড়ি ভোলা যায় ততই ভাল। আচ্ছা, একটা কাজ করলে তো হয়। এর নামটা বদলে ফেললেই তো হয়। 'মেছুয়া থিয়েটার' অথবা 'গ্যাড়াতলা নাট্যশালা'—এই রকম একটা চটকদার নাম দিলেই তো হয়। মহাজাতি সদনের কর্তারা আমার এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখবেন আশা করি।

রবীন্দ্রনাথ

সচিত্র সংযোজন

আমার মুক্তি আলোর মাঝে
আমার মুক্তি আলোর মাঝে
যেমন করে এই ভুবনের ভাসা
মিলিয়ে আছে।

যেমন করে এই নিমেষ-ভরা
প্রাণের হাসির নিচে নিচে,
ঘাসের পরে চরণ ফেলে
একা একাকিনী।

যেমন আমার কাজের মাঝে
কাজের ফাঁকে কাজ হারানো,
যেমন কাজের অবসানে
নিজের দিকে চাওয়া তখনি
ধারা বহুর ঘুমের পিছে
তারি ক্লান্তির তলায়।

২৫ বৈশাখ
১৩৩৩

শান্তিনিকেতন

শ্রীযুক্ত/যুক্তা-ঘন
বেলা দুপুরিয়ে কলকাতার প্রতি

বিদেশীদের সঙ্গে দিন অন্তরঙ্গ পরিচয় রেখো।
বিদেশী হিংসা সঁপো, সভ্যতা এর দাসির রক্ষো।

সোনালি রুদ্র হাত
ইস্পাত-হৃদয় শ্রেয়ান
বন্দী তার ঐতিহ্যের সনাতনের কী অভিমান॥

মুখোশের সিঁড়ি বেয়ে, মনের আকাশে দিয়ে আসি,
মুখমন্ত্রে বাক্যদানে সভার মুক্তির মন্ত্র বাণী।
মনোমাঝে কল্পনার
কী রঙ সঞ্চিত রয়,
মুক্তি দিয়ে বিশ্বজিৎ সমস্ত নরের কল্যাণী॥

সমস্যার সূত্র সমাধান কল্পনার স্বপ্নালোকে বিস্তার,
সমস্যা বিশ্বজিৎ নয়, সমস্যার কে দাসির সমস্ত;
বিজয়ের সমারোহে
দুলোকে দিগন্ত কেঁপে,
কবীর সূক্তসমাপ্তির মুক্তির কে দিন পরিচয়॥

শ্রীবিষ্ণুদে
১৩ পৌষ
৪৫৫

শিল্পের ছিটে কোঁটা

ডক্টর কালিদাস নাগ

[অপ্রকাশিত রচনা]

১৯২০ সালে যখন প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্যারিস নগরে আমার পাই তখন প্রায় বছর ধ'রে দেখেছি বাঙালী কবিকে শুধু সাহিত্যিকরাই বাহবা দেবার জন্যে আসেননি, বহু শিল্পী ও গুণীও এসেছিলেন। সাহিত্য বিষয়ক কথা 'রবীন্দ্র সুধা'-য় লিখেছি। এবার 'শিল্পের ছিটে কোঁটা' নামে ছোট-ছোট গল্প কাহিনী লিখে যাব, কারণ শুধু সাহিত্যিক নয় চিত্রী ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথকেও মনে রাখা দরকার। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রেরণায় যে-সব শিল্পীদের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁদের কথাও লিপিবদ্ধ না করলে অপরাধ হবে।

জোড়াসাঁকোর "ঠাকুরবাড়ী" যে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন-ক্ষেত্র তা আজ সবাই স্বীকার করেন। আমিও এ বিষয়ে বহুকাল লিখে আসছি। রবীন্দ্রনাথের মতো শুধু সাহিত্য নয়, পাশ্চাত্য শিল্প-স্রোতও মিলেছিল, তা দেখেছি। তাঁর চিত্র ও বেয়াল্লী অনুকরণ মতো পাশ্চাত্যের বহু শিল্পী উঁকি মেরেছেন, সেটি বোঝাবার জন্য শিল্পের ছিটে কোঁটা লিখে শুরু করলাম।

১৯২০—২৩ এই তিনটি বছর ইয়োরোপ মহাদেশের নগর ঘুরেছি। শুধু প্রয়াগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, চিত্রশালা ও ছবির ঘরেও। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পচর্চার কেন্দ্র প্যারিস মিউজিয়মে নিয়মিত নির্বাচিত বন্ধুদাদাদের তবে ক্ষান্ত হয়েছি। তার একমাত্র সাক্ষী বন্ধুবর অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমাদের স্নেহাস্পদা শ্রীমতী লেডী রাণু মুখার্জি। তাঁদের আজ করেও লিখছি।

তৃতীয় বার বিশ্বপ্রদক্ষিণ করতে বেরিয়ে দেখি যে শিল্পীকুলের শিরোমণি মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর-(১৪৭৫—১৫৬৪) মৃত্যুর ৪০০ বর্ষ পূর্তি হবে। তাই তাঁকে প্রণাম ক'রে এই 'ছিটে কোঁটা' শুরু করলাম। তাঁর সম্বন্ধে বহু তথ্য পেয়েছি রমাঁরাঁ রোলার কাছে। তিনি বীটোফেন-এর সঙ্গে মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর বিষয়েও বিখ্যাত জীবনী লিখে প্রেরণা দিয়ে গেছেন।

শিল্পের জন্মভূমি ফ্লোরেন্স-এর এলাকায় ক্যাপ্রিস অঞ্চলে মাইকেল জন্ম গ্রহণ করেন, ১৪৭৫ সালে। তুর্কীরা তখন কনস্টান্টিনোপল জয় ক'রে ইয়োরোপের বুকে বসেছে। (১৪৫৩—১৪৬৬) মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর জন্মের ছিলেন লোরেঞ্জো। তিনিও শিল্পের বিধাতা—ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্র-

কলার চর্চা ক'রে গেছেন। ফ্লোরেন্সের পনেরো শতকের শিল্পের প্রধান মন্টেন, চেলিনী প্রভৃতির শিল্পকর্মের সঙ্গে মোনাস্তেরো'র যোগ প্রমাণিত হয়েছে। শিল্প-নায়ক সিবার্টির সঙ্গে তিনি ফ্লোরেন্সে প্রথম গির্জার দরওয়াজার কাজে নেমে যান ১৪০৬ সালে। প্রায় তিরিশ বছরের উপর তাঁর শিল্প-সাধনার ইতিহাস পাওয়া যায়। মার্বেলমূর্তি ডেভিড দেখি ১৪১১ সালে। ফ্লোরেন্সে। সেন্ট জন এভেঞ্জেলিস্ট সেন্ট মর্ক মূর্তি খোদাই করেন ১৪২৪ সালে। মোনাস্তেরোর সঙ্গে সহযোগিতা করেন মাইকেল আঞ্জেলো। তিনি রোমে গেছে শিল্পের ক্লাসী রীতি অধ্যয়ন করেন। গ্রীক-রোমান শিল্পের মূল প্রেরণা আসে রোমের ধ্বংসাবশেষ থেকে। শিল্পের সঙ্গে পুরাতত্ত্বের যোগ সাধিত হয় ১৪৪০—৬০ সালে। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০০ বর্ষ পূর্তি উৎসব দেখে এসেছি। ১৪৪৪ সালের ম্যাগডেলেনের মূর্তিতে দেখা যায় বর্ষতার ও শিল্পের মোচড়, নূতন শিল্পছন্দের চেতনা।

মাইকেল আঞ্জেলোর আরেক ওস্তাদ ছিলেন গিবার্টি (১৩৭৮—১৪৫৫)। ফ্লোরেন্সের গির্জার দুটি দরওয়াজায় তাঁর হাতের কাজ দেখেছি। ১৪০১ সালের প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী হন। তাঁর সঙ্গে অন্য শিল্পীর নাম পাই। তাঁরা স্থাপত্যের খাতে চ'লে যান। গিবার্টি তাঁর আত্মজীবনীতে এ-সব কথা লিখেছেন। তিনি লেখক রূপেও পরিচিত। তাঁর কারখানায় দোনাতেল্লোর মতো ভাস্কর মানুষ হন। ১৪১৮ সালে গিবার্টি ফ্লোরেন্স-এ এক ভোজ পাঠান এবং ১৪২৪ সালে আরেক প্রোজেক্টে ওল্ড টেস্টামেন্টের ছবি আঁকেন। এই দরজাকে যে 'ডোর অব প্যারাডাইস' বলা হয়েছে তা সত্যি সার্থক। স্বর্গের দরজার বর্ণনা পড়েছি দান্তের মহাকাব্যে। দান্তের ৬০০ নূতুবর্ষ পূর্তি উৎসবে ফ্লোরেন্সে গিয়ে তন্নতন্ন ক'রে দেখে এসেছি, ১৯২১ সালে। আমার Greater India গ্রন্থে তার বর্ণনা দিয়েছি পাদুয়া ফ্লোরেন্স আগে।

দান্তে আবির্ভূত হয়ে মূলত আধুনিক সাহিত্য, শিল্প ও ভাবধারায় নূতন প্রেরণা এনে নব-যুগের সূত্রপাত করেন। তাঁর জন্ম ১০০ বার্ষিকী আগতপ্রায়। পেত্রার্কীয়ের ৪০০ শতকের পরে এইটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা। মাইকেল মধুসূদন এই উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছেন তা পুনরুদ্ধার করেছেন অধ্যাপক রবীন্দ্র দাশগুপ্ত। দান্তেকে কেন্দ্র ক'রে দুজন পরিচিত চিত্রশিল্পী দেখা যেন : জত্তো (১২৭৬—১৩৩৭) তাঁদের একজন। তাঁদের শিল্পকীর্তি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

লরেঞ্জো ডি মেডিসির ছোট ছেলে গোপ দশম লিউ মাইকেল আঞ্জেলোর পৃষ্ঠপোষক হন। ১৪২১ সালে দশম লিউ-এর মৃত্যুর পরে সপ্তম ক্লিমেন্ট ১৫২৩ সালে পোপ হয়ে মেডিসি চ্যাপেল গঠন-কর্মে মাইকেলকে নিযুক্ত করেন। ফ্লোরেন্সে গিয়ে দেখেছি। সেন্ট পিটার ডোমের মতো এখানেও স্থাপত্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের গভীর যোগ প্রতিষ্ঠিত। ১৫৩৪ সালে ফ্লোরেন্স ছেড়ে জীবনের শেষ ৩১ বছর রোমে কাটান মাইকেল। 'শেষ বিচার' নামক বিরাট চিত্র জগতের বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছে। ১৫৪৯ সালে ৯০ বছর বয়সে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো নির্বাণ লাভ করেন। এতবড় শিল্পী, একাধারে স্থপতি ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী আর নেই।

শিল্পী ভাসারী তাঁর প্রথম জীবনী লেখেন ও একালে রোমা তাঁর জীবনী (কবিতা সহ) রচনা ক'রে ধন্য হয়েছেন। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যেন শিল্পের বিশ্বকোষ। কত ভাষায় তাঁর রচনার অনুবাদ করা হয়েছে তা আজো জানা নেই। কিন্তু যে কেউ তাঁর হাতের কাজ দেখেছেন তাঁরা মানবেন যে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনিও যেন দিব্য প্রেরণায় সৃষ্টি ক'রে অমর হয়ে

গেছেন। 'Divine' আখ্যা প্রয়োগ করা কিছু 'অতিশয়োক্তি' মনে হয় না। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতশিল্প বিষয়ে বক্তৃতা করবার সময় (১৯৩১) তন্নতন্ন ক'রে অ্যাঞ্জেলোর শিল্পকীর্তি দেখে অবাক হয়েছি। পোপদের অভিষেক মন্দির সেন্ট পিটার-এর বিখ্যাত ডোমটি সংস্কার করেছেন তিনি। আবার সিস্টাইন চ্যাপেলের দেয়ালে বত্তিচেল্লীর মতো বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর মধ্যেও অ্যাঞ্জেলোর 'লাস্ট জাজমেন্ট' প্রভৃতি চিত্র দর্শককে আপন বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ করে। ওঁর 'ডেভিড' প্রমুখ মূর্তি তো চিরস্মরণীয়। আবার মন্দির ও মূর্তি গ'ড়ে, ছবি এঁকেও যেন তৃপ্ত হননি। বহু বিখ্যাত কবিতা ও চিঠি লিখে ইতালীয় ভাষার প্রসার ঘটিয়েছেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলো। রোমা রোলার কাছ থেকে ইতালীয় মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, জার্মানীর অমর সুরস্রষ্টা বীটোফেন ও রুশ কথাসাহিত্যিক টলস্টয়ের জীবনী পেয়ে ও প'ড়ে বড় হয়েছি।

পরলোকগত ডঃ কালিদাস নাগ এই লেখাটি আজ থেকে কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন। কালের বিচারে এখনো এর মূল্য যথেষ্ট। তাই এটি বৈশাখ '৭৭ সংখ্যায় মুদ্রিত হ'ল। এই রচনাটি আমাদের কাছেই ছিল ও আজও অপ্রকাশিত।

রবীন্দ্র সন্দর্শনে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

১৯৩৮ সালের কথা। শান্তিনিকেতন থেকে ডাক এসেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ যাবেন রবীন্দ্র সন্দর্শনে। আমরা চলেছি ওঁর সঙ্গে—আমি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু।

সন্ধ্যা ৬ টায় হাওড়া ষ্টেশন থেকে আমাদের গাড়ী ছাড়লো। গাড়ী চলতে লাগলো ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে, কোথাও গাঁয়ের সঙ্কীর্ণ অবসরের মধ্য দিয়ে, কোথাও সবুজ মাঠের উন্মুক্ত প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করে। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামে—লোকজন ওঠানামা করে—জনতার ভিড়, হাঁক-ডাক, সরগোল। পরক্ষণেই নির্জন প্রান্তর। মাঠের পরে মাঠ। গাড়ীর জানালায় বসে বসে দেখি—চোখের উপর দিয়ে বায়স্কোপের চিত্রের মতো প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন ছবি সার বেঁধে মিছিল করে চলে যায়।

বোলপুর ষ্টেশনে এসে যখন আমরা পৌঁছলাম তখন রাত অনেক। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্র নাথের প্রেরিত এক ভদ্রলোক এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এবং বললেন যে শান্তিনিকেতনের মোটর বাস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সেই বাসে চড়ে আমরা শান্তিনিকেতনে এসে অতিথি-শালায় উঠলাম। সেখানে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিল কুমার চন্দ মহাশয় আমাদের অভ্যর্থনা করে উপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের থাকবার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী চলে গেলেন সেখানকার ওঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকবেন বলে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে উত্তরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সূর্যদেব তখনো উদয়াচলের অন্তরাল অতিক্রম করেননি। অতিথিশালার এদিকটাতে তখনো জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু চার দিকে ঘনপল্লব ছাওয়া আম্র কানন অসংখ্য পাখির কল-কাকলিতে সমাচ্ছন্ন। প্রাণোচ্ছল মুখর প্রকৃতির প্রগাঢ় সবুজ আচ্ছাদনে অবগুণ্ঠিত রূপের পরামাশ্চর্য পর্যাপ্ত প্রকাশ—দেশ বিদেশে ঘুরে এমনটি আর কখনো দেখিনি। কবি-কল্পনার অননুকরণীয় অনুপম সৃষ্টি! এমন সাজানো-গোছানো সযত্ন-রচিত বাগান, অথচ তার ভিতরেই একটা স্বভাব-জাত বন্য প্রকৃতির আভাস সুস্পষ্ট; মনঃপূর্ণ মানুষের হাতের স্পর্শও সর্বত্র সুস্পষ্ট অথচ সবটা মিলে তার বাড়া একটা অপূর্ব রূপ-সৃষ্টি।

যেন এক শ্রেষ্ঠ কলা-শিল্পীর তুলি-আঁকা সুসঙ্গত অপরূপ শিল্প-রচনা—যেন কোনো মহাকবির একখানি ভাবোজ্জ্বল কবিতা।

সকালবেলা অনিলবাবু এসে আমাদের নিয়ে গেলেন শিক্ষাভবনে। সেখানকার বিরাট লাইব্রেরী দেখলাম। ছোট্ট একটা ঘরে দেখলাম শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় রাশিকৃত পুঁথি পুস্তকের ভিতরে বসে আপন মনে কাজ করছেন। আর এক ঘরে একা একা বসে কাজ করছিলেন মোসলেম সংস্কৃতির অধ্যাপক এক মুসলমান ভদ্রলোক। সেখান থেকে অনিল বাবু আমাদের কলা-ভবনে বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন।

নন্দ বাবু সব জায়গা ঘুরিয়ে চিত্র-শালার সব কিছু বিশেষত্ব আমাদের দেখিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে তিনি বললেন—"তাঁর অঙ্কন-রীতি সম্পূর্ণ নূতন। আর্টের জগতে তিনি নূতন পথের আবিষ্কারক। তিনি রূপ স্রষ্টা। নিজের খুশি মতো নব নব রূপের সৃষ্টি করেছেন। তা করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতির অনুসরণ আবশ্যক মনে করেননি। তিনি হয়তো এমন একটা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যার অনুরূপ প্রকৃতিতে কিছু নেই। তার একটা কিছু নাম হয়তো দেওয়া যাবেনা, কিন্তু দেখলে মনে হবে—"বাঃ, কি সুন্দর!" তাঁর চিত্রে কোথাও একটি অসুন্দর টান নেই। প্রত্যেকটি রেখা সৃষ্টু কলাদক্ষতা ভাবে অঙ্কিত। এদেশে চিত্র-কলার পুনরুজ্জীবন হয়েছে বটে, কিন্তু অঙ্কন পদ্ধতির দিক থেকে এত দিন আমরা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারিনি। সেই জন্যে বর্তমান ভারতীয় চিত্র-কলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিত্র-কলায় যে নূতন আদর্শ ও নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন, তার ফলে আমাদের চিত্রকলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। জগৎকে আমরা নূতন কিছু দিয়েছি, যার এখন পর্যন্ত কেবল মাত্র আরম্ভ এবং ভবিষ্যতে ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়ে পূর্ণ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।"

কলা-ভবন থেকে সেখানকার একটি ছাত্র আমাদের চীনা-ভবনে নিয়ে গেল। সেখানকার চীনা অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ হ'লো। সেখান থেকে আমরা উপাসনা-গৃহ হয়ে যখন আম্র-কাননে এসেছি, তখন দেখি স্থানে স্থানে গাছের ছায়ায় ছেলেদের ক্লাস বসে গিয়েছে। বাঁধানো ঘাটলার মতো, খোলার মতো করে খানিকটা জায়গা বাঁধানো। তার তিন দিকে ইট গেঁথে উঁচু করে টুলের মতো করে বাঁধানো, যাতে ছেলেরা তার উপরে পা-ঝুলিয়ে বসতে পারে। বাকী দিকটাতে এক জনের বসবার মতো একটা পাকা পোক্তা শিক্ষক-মহাশয়ের জন্যে নির্দিষ্ট। এই হ'লো ক্লাসের ব্যবস্থা সেখানকার। যখন বৃষ্টি নামে, তখন নিকটবর্তী যে কোনো দালানের বারান্দায় ক্লাস উঠে যায়। চেয়ার, টুল, টেবিলের বালাই-গন্ধও কোথাও নেই। মুক্ত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে বসে মুক্তির আনন্দের ভিতর দিয়ে এই শিক্ষা অতি অপূর্ব।

খাওয়া-দাওয়ার পরে বিকেলটায় সময়ে রথীবাবুর ব্যবস্থা মতো একটা বাসে চড়ে আমরা শ্রীনিকেতন দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানকার যিনি অধ্যক্ষ, তিনি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে দিলেন। বয়ন বিভাগে নানা রকম ডিজাইনের শাড়ি, বিছানার চাদর, গায়ের চাদর, সতরঞ্চ ইত্যাদি দেখলাম। চামড়া বিভাগে অতি সুন্দর নানা রকমের জিনিষ পত্র দেখে ইচ্ছা হচ্ছিলো সব কিনে ফেলি। সে বিভাগে অনেক লোক কাজ করছিলো। মহীশূর থেকে আগত একটি তামিল মেয়েকে দেখলাম সেখানে কাজ শিখছে। এমামেল বিভাগে মৃৎপাত্রের উপরে এনামেল

করা হয়। এনামেল করা নানা রকমের মাটির পাত্র চায়ের কাপ, পিরিচ, কেতলি, সেলাশ, বাটি, নানা রকমের খেলনা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে দেখলাম। সুতার বিভাগে, বিশ্বভারতীর সেখানে যে কাঠের জিনিষের প্রয়োজন, সব সেখানে তৈরী হয়। অর্থনৈতিক বিভাগটা দেখবার সুযোগ হ'লোনা। মোটরে করে তাড়াতাড়ি আদর্শ কৃষিক্ষেত্রগুলি একবার ঘুরে দেখে এলাম। তখনকার কৃষি-বিভাগে অনেক রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সাড়ে চারটের সময় রথীবাবুর ওখানে আমাদের যাওয়ার কথা। সেখানে রথীবাবু ও অমিল বাবু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। রথীবাবুর পত্নী প্রতিমা দেবী অসুস্থ। তাই তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে রথীবাবু দুঃখ জানালেন। সেখানে বসে রথীবাবু ও অমিলবাবুর সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলতে লাগলো। আলোচনার বিষয় হলো—"আমরা শান্তিনিকেতনের কাজে কতটা সাহায্য করতে পারি।" এই আলোচনার জন্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুযায়ী রথীবাবু কর্তৃক সেখানে আহূত হয়েছি। রথীবাবু বললেন—"দেশের দেশের আপনাদের লোকজন আছে—আপনারা নিজেরাও তো সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান। আপনারা আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।"

লোক-শিক্ষা-সংসদ নামে বিশ্ব-ভারতীর একটা বিভাগ আছে। এই বিভাগের পরিকল্পনা অনুসারে চারটি পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে—প্রবেশিকা, আদ্য, মধ্য ও অন্ত। প্রত্যেক পরীক্ষার জন্যে পাঠ্য বই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং যে-কেউ যে-কোনো জায়গায় বসে পরীক্ষা দিতে পারবে। বই দেখেও প্রশ্নোত্তর লেখা চলবে। প্রত্যেক পরীক্ষাই বাংলা ভাষার মারফতে হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে—এই পরীক্ষার নাম করে কতকগুলি উপযুক্ত বই পড়িয়ে নিয়ে সারা দেশময় এক অখণ্ড সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত বিশ্ব-ভারতীর সঙ্গে একটা সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপন করা।

আমরা বললাম—"এ বিভাগের কথা আমরা জানি। এ বিভাগের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা যে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়েও আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। একাজে সাহায্য করা সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা বা উৎসাহের কিছুমাত্র অভাব নেই। কিন্তু বর্তমানে বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই ঘোরালো। নানা কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় কংগ্রেসবিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা মনে করি, এ অবস্থা কেটে যাবে। কিন্তু বর্তমানে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখতে আমাদের সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। তাই আমাদের অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় এবং সুযোগ অতি কম। তবু আমরা কিছুই যে করতে পারিনে, তা নয় এবং যা পারি, তা আমরা অবশ্যই করবো। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে, সব বিষয়ের উপযুক্ত সস্তা বই। কিন্তু সব বিষয়ের বই তো নেই-ই, যা আছে, তা-ও সস্তা নয়। অথচ এই দরিদ্রের দেশে সস্তা বই না হলে কোনো শিক্ষা-প্রচারই সম্ভবপর নয়। কাজেই উপযুক্ত বই লেখানো ও তা ছাপানো এই বিভাগেরই একটা প্রধান কাজ হওয়া উচিত।"

রথীবাবু বললেন—"কথাটা খুবই ঠিক। ভালো বইয়ের অভাবে আমরাও অনেক সময়ে বিব্রত বোধ করি। এই অভাব দূর করবার জন্যে চেষ্টাও আমরা কিছু কিছু করছি। কিন্তু বইয়ের অসুবিধা সত্ত্বেও পরিকল্পনা অনুসারে এখনই কাজ আরম্ভ করাটা আমরা প্রয়োজন মনে করেছি। বিশেষতঃ

রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি সর্বদা এই বিষয়টা নিয়েই ভাবছেন। সম্প্রতি তিনি আদর্শ প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে একখানা বই লিখছেন। বইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হয়ে গেলেই ছাপতে দেওয়া হবে। তাতে আদর্শ প্রশ্ন-পত্রের নমুনা থাকবে। তাঁর মনের কথাটা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছেলেদের ঠকাবার চেষ্টা করা নয়, কিংবা তাদের মুখস্থ করার শক্তির পরিমাপ করাও নয়। পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—শিক্ষার ফলে ছেলেদের ভিতরকার শক্তির কতটা বিকাশ লাভ হয়েছে, তা ঠিক মতো বুঝবার চেষ্টা করা। এই আদর্শ অনুসারে প্রশ্ন করতে হ'লে প্রশ্ন-পত্রের স্বরূপ কি হওয়া উচিত, তা-ই এই বইতে দেখানো হয়েছে।"

ঠিক পাঁচটার সময়ে রথীবাবু ও অনিলবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে গেলেন। শ্যামলীর পাশে দেহলী নামে যে বাড়িটা আছে, কবি তখন সেই দেহলীর দো-তলার উপরে দক্ষিণ দিকের একটা জানালার পাশে পূর্বমুখী হয়ে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। আমরা গিয়ে কবিকে প্রণাম করে এক একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম।

কবি বললেন—"তোমরা তো আমার এদের ভিতরে আসোনা। এখন এসেছ, ভালই করেছ। সব দেখো এবং পরেও যখনি সময় পাও, এসে দেখবে। আমি বিশেষ করে এইটে দেখতে বলি যে এখানে যা কিছু গড়ে উঠছে, তার ভিতরে এমন কিছু আছে কিনা, যেটাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন এবং যদি তেমন কিছু থাকে মনে করো, তবে তার জন্যে তোমরা কি করতে পারো, তাও দেখা উচিত।"

রথীবাবু বললেন—"লোক-শিক্ষা বিভাগের কাজে এঁরা আমাদের সাহায্য করবেন বলেছেন এবং সে সম্বন্ধে এঁদের সঙ্গে আমাদের আলোচনাও হয়েছে।"

কবি বললেন—"বেশ, বেশ, ভাল কথা।"

সুরেনবাবু বললেন—"আমরা এখানে আসিনি, বলছিলেন। কিন্তু আমাদের আসবার ফুরসৎ মেলে কই! জেলে জেলেই তো আমাদের কাটাতে হয় প্রায় সবটা সময়। পাঁচ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে একবার এখানে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে, যাদুবাবুর (যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে ১৯২০ সালে। তার পরেই তো ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৮ সাল এবং ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জেলে জেলে কাটিয়ে সবেমাত্র সেদিন বেরিয়ে এসেছি। কখন আর আসবো, বলুন।"

কবি—"জেলে জেলেই তো তোমরা জীবনটা কাটিয়ে দিলে! আর জেলে যেও না। কি আর হবে জেলে গিয়ে!"

সুরেনবাবু—"আমরা কি আর ইচ্ছে করে জেলে যাই। আমরা তো চাইনে যেতে মোটেই। কিন্তু যারা দেবার মালিক, তারা তাদের খুশি মতো নিয়ে যায়—আমরা কি আর করবো!"

কবি—"তাও তো বটে! কোথাও কিছু হলেই, সবার আগে তোমাদের নিয়ে আটকে রাখা চাই। গভর্ণমেণ্টের এটা যেন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তবে এর পরে আর সেরূপ ব্যাপার নাও হতে পারে।" (অবশ্য কবির সে আশা সফল হয়নি)।

সুরেনবাবু—"যদি বাইরে থাকতে পারি, তবে এখন থেকে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে এখানে আসবো।"

কবি—"তাই এসো। আমি বলছিলাম কি, তোমরা তো আমার সৃষ্টির কোনো সংস্রবে বড়

আসনা—এখানকার খবরও হয়তো বিশেষ কিছু রাখোনা। সারা জীবন ধরে আমি এই একটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে অকূলে হাবু-ডুবু খেতে খেতে সম্প্রতি কূলের খানিকটা কাছে এসে পৌঁচেছি। এখনো কূল পেয়েছি বলতে পারিনে। এজন্যে আমার বই বেচে দিয়েছি, পুরীর বাড়িটা বেচেছি, দেশ-বিদেশের লোকের কাছে ভিক্ষা করেছি। কিন্তু দুঃখ এই যে আমার দেশের লোক—এই বাংলা দেশের লোক আমার পিছনে এসে দাঁড়ালো না। আসল কথা কি জানো? সবাই মনে করে যে আমার সৃষ্ট সব কিছুই কবিত্বের বিলাসমাত্র—কোথাও পদার্থ কিছু নেই। তাই কেউ মমত্ব বোধ নিয়ে এখানে আসে না। আসে নিজের প্রয়োজনে। আসে হয়তো একটা বাণী শিখিয়ে নিতে। সে প্রয়োজন সিদ্ধ হলে, এখানকার সম্বন্ধে আর কিছু মনে থাকে না।"

আমরা বললাম—"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে গড়া বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তার প্রায় সব বিভাগের আপনিই প্রবর্ত্তক প্রবক্তা ও পথ প্রদর্শক। আপনার সৃষ্টির উপরে ভিত্তি করেই এ দেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। আপনার সৃষ্টির প্রতি অবহেলা বা অশ্রদ্ধা এদেশের লোকের মনে থাকা সম্ভবও নয় স্বাভাবিক-ও নয়। তবে জাতীয় স্বাধীনতার অভাবে দেশের লোকের খাওয়া-পরার অভাবের প্রতিকার সম্ভবপর হচ্ছে না বলে আমাদের মতো আরো অনেকে হয়তো মনে করে যে আজকের দিনে রাজনীতির চর্চা অধিকতর প্রয়োজন। কিন্তু আজ যাদে কাল তো সকলকে আসতেই হবে এখানে, আপনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই আদর্শের কাছে। আপনি এখানে যে কর্মপন্থা প্রবর্ত্তন করেছেন, তাই হবে সেদিন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের আদর্শ কর্মপন্থা। আপনি যে লোকের উৎসাহের অভাব দেখছেন, তার কারণ লোকের সত্যিকার উদাসীনতা নয়—সময়টা এখন অনুকূল নয় এই মাত্র।"

কবি—"বলো কি তুমি। সংস্কৃতি ছাড়া কোনো জাত বাঁচতে পারে? পারলেই বা সে বাঁচার মূল্য কি? আমি দেশ বিদেশের সারা দুনিয়ার খবর জানি। চীন, জাপান, রুশিয়া, জার্মানী, ইতালী সব দেশে আমি গিয়েছি। যে কোনো জাত, তারা যত বড় বিপদেই পড়ুক না কেন, তখনও তারা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিকের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। তুমি দেশের স্বাধীনতা আনতে চাও? কিন্তু দেশের লোকের মন যদি না জাগে, তবে কাকে নিয়ে তুমি কি করবে? কেউ তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। তোমার সমস্ত প্রয়ত্ন পণ্ড হবে। দেশের মনটাকে আগে উদ্বুদ্ধ করে তোলা চাই। তা করতে হ'লে চাই যথোচিত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। তা না হলে তুমি কেমন করে কি করবে? সব সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে লোকের মনটাকে জাগানো এবং নব নব প্রচেষ্টায় প্রেরণা জোগানো। জাতির পক্ষে এর প্রয়োজন সর্বত্র ও সর্বদা, এর মধ্যে কোনো সময় অসময়ের কথা নেই। এর প্রয়োজন সকল প্রয়োজনের উপরে। যে জাতের সংস্কৃতির প্রতি দরদ নেই—সে সম্বন্ধে আন্তরিক প্রচেষ্টা নেই, সে জাত মরতে বসেছে—তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

কথা বলতে বলতে কবির অতিমাত্র উত্তেজনা লক্ষ করে রথীবাবু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ মুখ দেখেই আমরা তাঁর মনের কথাটা বুঝতে পারলাম এবং একটুখানি বিব্রত বোধ করলাম। আমরা আর কোনো কথা বললাম না। রথীবাবু উঠবার জন্যে আমাদের ইসারা করলেন। আমরাও অমনি কবিকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কবির সামনে বসে তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিলো—কত বড় বিরাট পুরুষের

সামনে বসে আছি, সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এবং সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র-কলায় যাঁর অত্যুৎকৃষ্ট অজস্র সৃষ্টির তুলনা জগতের ইতিহাসে মেলে না। কিন্তু আসল মানুষটি যেন একেবারে শিশু। মান অভিমানে ভরা যেন অবোধ বালকটি। প্রাণটা যেন একেবারে নরম, তাজা—তার টনটনে তারগুলি যেন বেজে উঠবার জন্যেই সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছে—সামান্য একটুখানি স্পন্দনের প্রতিঘাতে ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে।

কবির সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে এসে আমরা খেলার মাঠে চলে এলাম। তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে গাছের আড়াল থেকে সাদৃশ্যের আড়ালে মুখ ঢাকছেন। কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে এই সময়টাই তো খেলবার বেড়াবার, দিনের কর্ম-ব্যস্ততার পরে আনন্দ করবার সময়, সুবিস্তীর্ণ মাঠে এখনকার সবাই এসে জুটেছে। মেয়েরা ও ছেলেরা বিভিন্ন জায়গায় খেলাধূলা করছে। কেউ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেউ কেউ বা এখানে সেখানে জটলা পাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে প্রাণের প্রবাহ এতক্ষণে ঘরের সীমানা ছাপিয়ে এই মাঠের পরে এসে তরঙ্গ তুলছে। মুক্ত প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রদেশের ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে প্রাণোচ্ছল অবাধ ছুটোছুটি দেখতে দেখতে তাদের প্রাণের ছোঁয়াচ আমাদেরও প্রাণে লাগলো, প্রাণ আনন্দে ভরে গেলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে ফিরে তাদের খেলার সাথী হয়ে মনে মনে আমরাও খেলতে লাগলাম।

সন্ধ্যার পরে এক ভদ্রলোক এসে বললেন—"অনিলবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার হিসেবে বিশ্ব-ভারতী সম্বন্ধে আপনাদের মতামত লিখে নেবো এবং পরে তা খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেবো।"

আমরা যা লিখে দিয়েছিলাম, তার মোট কথাটা এইরূপ—রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের বোলপুর আজ সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। নব ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান উৎস হিসেবে এখন আজ প্রত্যেক ভারত-সন্তানের পবিত্র তীর্থ-স্বরূপ। অপরূপ সুষমা মণ্ডিত কবিমনের অপূর্ব সৃষ্টি এই আশ্রম একখানি জীবন্ত কবিতা। রাজনৈতিক কর্মের অতি-ব্যস্ততার মাঝে আজ কবিগুরুর সকল সাধনার এই পরম রমণীয় প্রতীকটি দেখবার সুযোগ পেয়ে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। বিভিন্ন প্রদেশের ছেলে-মেয়েদের একত্র অবস্থান ও এক সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের ফলে যে বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষ্টির সমন্বয় সাধনের আজ নীরবে অগ্রসর হচ্ছে ও একটি মহাভারতীয় অখণ্ড সংস্কৃতি গড়ে উঠছে এইটিই এখানকার বিশেষত্ব। জাতির ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্ব-ভারতীর দান অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবে। আমাদের মতে লোক শিক্ষা সংসদের পরিকল্পনাটি যত শীঘ্র সম্ভব কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা উচিত। এই শিক্ষার মারফতে সুদূর পল্লীর সঙ্গে বিশ্ব-ভারতী একটা ঘনিষ্ঠ মিলন ডোরে সংযুক্ত হবে এবং এখানে এই যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির যে নব নব উপাদান তৈরেরী হচ্ছে, এই শিক্ষা বিস্তারের উপলক্ষেই তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে এক অখণ্ড সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হবে।

রাত্রের আহারের পরে আমাদের ডাক পড়লো বিশ্ব-ভারতী পরিকল্পিত এক বিশেষ নাচ দেখবার জন্যে। একটা খোলা জায়গায় দুটো নাতিদীর্ঘ সরল বৃক্ষকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে বৃত্তাকারে একটা প্রশস্ত গোল পথ তৈরেরী হয়েছে। রঙীন কাগজের শিকলী দিয়ে ও ফুলপাতা দিয়ে গাছ দুটোকে ও সেই জায়গাটাকে সাজানো হয়েছে। গিয়ে দেখি ছেলে মেয়ে, পুরুষ, মহিলাতে জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে। বহু পুরুষ, প্রায় তত মহিলা। অত মেয়ে এক সঙ্গে দেখে মনে হ'লো, তারা

যেন সেই আসরের সাজ-সজ্জারই অঙ্গ—তারা উপস্থিত না থাকলে সে আসর রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

একটু পরেই কবি এলেন ঘটখে চড়ে। তিনি এসে একটা আরাম কেদারায় বসলেন। তার পরেই নাচ আরম্ভ হ'লো। ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় এলো। তারপরে তাদের সম্মিলিত নাচ চললো। তুলনায় গুজরাটি নাচের ধরণে পরিকল্পিত নাচ। আমরা বিশেষজ্ঞ নই। দেখতে কিন্তু আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। তাদের মনের উৎফুল্ল আনন্দ যেন তাদের সুগঠিত সুঠাম দেহ বল্লরীর প্রতি বিভাসে সুপরিস্ফুট। সবাই মিলে সেই গাছ দুটোকে পরিবেষ্টন করে বৃত্তাকার পথের উপর দিয়ে পরিকল্পনা মতো তালে তালে নেচে চলেছে। প্রত্যেকে নাচের ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তেই পিছন ফিরে সঙ্গী সঙ্গিনী মুখোমুখি হয়ে যেন পরস্পরকে হাত নেড়ে আমন্ত্রিত করছে—আবার এগিয়ে যাচ্ছে। সবটা মিলে এমন সুসমঞ্জস্য ভাবে ব্যাপারটা চলছে, মনে হয় যেন সাগরের ঢেউ এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে—আবার উঠছে—আবার গড়িয়ে পড়ছে—এমনি বিরামহীন খেলা।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমরা বিশ্ব-ভারতীর বাসে চড়ে কেরার পথে বেরিয়ে পড়লাম। এমনি করে আমরা এক দিনের তীর্থদর্শন শেষ করে এবং তীর্থের জীবন্ত দেবতার পাদ-স্পর্শে ধন্য হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

———

* * *

রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশ করার কাজে কোন কৃতিত্বের প্রয়োজন নাই। বাঙালী আজ এতে পটু হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ চালাবে অথচ শৃঙ্খলা মানবে না। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত সমরায়োজন আর কুত্রাপি দেখা যায়নি। বাঙালীর যুদ্ধ বাহিরের কোন শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর নিজের সঙ্গে, পরকে উপলক্ষ্য করে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ওরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে, সেই ছুরিও কোন ধাতুর তৈরী নয়, ঘৃণা ও কাদা দিয়ে তৈরী সেই অস্ত্র। বড়কে বৃহৎকে মহৎকে মানব না। পরস্পরের কাঁধে চড়ে তার উপর কাদা ছুঁড়বো—এই মনোবৃত্তি থেকে কোনও কল্যাণ আসতে পারে না। পুরুষের চিত্তবৃত্তি ও নারীর হৃদয়বৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা তার উদ্যোগ হয়েছে এতদিনে। মেয়েরা এতদিন তাদের হীনতা, মূর্খতা অজ্ঞতা অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। সেই মেয়েরা এখন যদি বলে যে, সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টিতে তাদের কাজ করতে হবে তবে তাদের তা করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বৈশাখে রবীন্দ্র জন্মতিথি। পঁচিশে বৈশাখ তাঁর জন্মদিন।

আজ তাঁর সপ্তোত্তর শততম জন্মদিবসে আমরা এই দুর্লভ মহাপুরুষের উদ্দেশে আমাদের প্রণাম নিবেদন করি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা ছিল মৈত্রীর সাধনা।

তাঁর স্বদেশ বলতে শুধু তাঁর নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশই ছিল না—ছিল সারা ভারতবর্ষ—ছিল সারা বিশ্ব। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শুভচেতনা তাকে আত্মবিকাশের এমন একটি উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ করে দেবে যেখানে তিনি আশা করেছিলেন অধিকাংশ মানুষ তার সকল সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করে উদার বৃহৎ একটি কল্যাণময় ঐক্যের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারবে। মানবিক ঐক্যের এই আদর্শ আর মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ—ভারতীয় সভ্যতার এই দুটি মূল লক্ষ্যের প্রতি মানুষকে বারবার তিনি তাঁর আহ্বানে জানিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর তিরোধানের মাত্র এই কয়েক বৎসর পরেই বর্তমান যুগের মানুষগুলির দিকে তাকালেই মনে হচ্ছে—সব যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে। সারা দেশ তথা সারা পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের সময় থেকে অন্যাবধি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এত উচ্ছ্বাস এত সেবাসেবির পরেও দেখি রবীন্দ্রনাথের জীবন সাধনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের যোগাযোগ একেবারেই ঘটেনি।

তা যদি ঘটতো তাহ'লে আজ মানুষের এত দুর্গতি হতো না।

কোথায় গেল মানুষের মনুষ্যত্ববোধ আর কোথায় গেল তার শুভবুদ্ধি?

রাষ্ট্রের রাজনীতির চিন্তা হয়েছে সঙ্কীর্ণ, এবং তার ভয়াবহ পরিণতি সারা দেশকে টেনে এনেছে দুর্গতির চরম সীমায়।

আজ তাই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব হারায় তাহ'লে সে কিসের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দেবে?

মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই সত্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করে যদি মনুষ্যত্বকে পেতে না হতো, যদি সে সুলভ হতো, তাহ'লে আমাদের হৃদয় তাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতো না। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তার প্রকৃত আনন্দ। এতেই তার যথার্থ আত্মপরিচয়।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'দেশ শুধু মাটির দেশ নয়, সে মানব চরিত্রের দেশ। আমি ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনও সমাজের বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত। আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই। যিনি কেবল হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

'গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য দুটোই সমান সত্য। একের মধ্যে অন্যটির বাসা, কেউ কাউকে ছেড়ে দিয়ে সত্য নয়।

শঙ্কর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি। উভয়ে মিলেমিশে যখন একাত্ম হয়ে যায় তখনই পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানে এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন এবং মুক্তির একত্র প্রতিষ্ঠা নেই, যেখানে অনুরাগ ও বিরাগে বিরোধ ঘটেছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ সেইখানেই আমরা শুধু নিতে চাই, দিতে চাই না। সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না। সেখানে আমরা শুধু ভোগ করি। ভোগের আর অন্ত দেখতে পাই না। সেইখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ। সেখানে কোনো কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নেই। অপঘাত মৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিনাশ।

জীবনটাকে না হয় যুদ্ধ বলেই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করবার বিদ্যাই আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ থেকে বেরোবার কৌশল আমরা না জানি তাহলে সপ্তরথী মিলে আমাদের মেরে ফেলবে। সেরকম মরেও আমরা বীরত্ব দেখাতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় তাকে বলে না। আবার যারা ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতেই চাইলে না, সে কাপুরুষদের বীরের সদ্গতি নেই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া এই দুইএর দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

কোনও দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মূল্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ মোহটা জঞ্জাল হয়ে আমাদের ঘুরে বসে। তখন পাখী উড়ে পালায়, খাঁচাটা পড়ে থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটেছে। আমরা এখনও নানাবিধ মামাবাড়ি মেনে চলি। অথচ তার পরিণামের দিকে তাকাই না। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে নেই, অথচ তার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বয়ে চলেছি। এতে আমাদের দেশে মুক্তির যে আদর্শ তাও নষ্ট হচ্ছে, আবার ইউরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ সেখানেও পদে পদে বাধা পড়ছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে যদি কেউ বলে—ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে বিচারে আটেঘাটে বন্ধন করবার ফাঁদ, তবে মনে রাগ হতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকিয়ে গেছে তখন তাকে যদি কেউ গর্ত বলে, তবে তা আমাদের বৈষয়িক অসন্তুষ্টি হলেও চুপ করে থাকতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুন্দরীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ এবং আনন্দময় করতে হলে সর্বপ্রথম তাকে মানুষ হতে হবে। মনুষ্যত্ববোধ না থাকলে সে সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারবে না। আর তাকে হতে হবে ধর্মপরায়ণ।

ধর্মপরায়ণ অর্থে ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করা নানাবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলা মানুষকে বোঝায় না।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করে সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না। বরঞ্চ অত্যন্ত বাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করে

ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, একটা নিয়ম বেঁধে সেইগুলিকে বারংবার শোনাতে গেলে কিংবা বারংবার উচ্চারণ করলে হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আর নয়ত আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বিপদ শুধু এইখানেই নয়। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাবাবিষ্টাবে একপ্রকার ভাবাবেশ মাদকতার মত অভ্যাস করে ফেলতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেশকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলে ভুল করি। এও একপ্রকার সম্মোহন মাত্র।

সুতরাং ভগবানকে উপলব্ধি করবার তাঁকে ধ্যান করবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো গায়ত্রী মন্ত্র।

প্রথমেই—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ

অর্থাৎ ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক মানে সমস্ত বিশ্বজগৎকে প্রথমেই মনের মধ্যে আহরণ করে আনতে হয়।

যিনি যথার্থ আর্য্য, তিনি অন্ততঃ প্রত্যহ একবার চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন। পৃথিবীকে অতিক্রম করে নিখিল জগতের সঙ্গে আপনার চির সম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করে নেন। তারপর সেই অনন্ত জ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি মন্ত্র উচ্চারণ করেন?

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—

এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি। এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি—বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁর কাছ থেকে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হচ্ছে। আমরা যাকে দেখে শেষ করতে পারি না, জেনে অন্ত করতে পারি না, তা সমস্তভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সঙ্গে আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কি সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করে তাঁকে ধ্যান করব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করছেন, তাঁর প্রেরিত সেই ধীশক্তিতেই তাঁকে ধ্যান করব।

সূর্য্যের প্রকাশ আমরা যেমন জানতে পারি তাঁর কিরণ দিয়ে, তেমনি বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করছেন—যে ধীশক্তি দ্বারাতেই আমি নিজেকে এবং বাইরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করছি, সেই ধীশক্তি তাঁরই শক্তি। এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁরই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতম রূপে অনুভব করতে পারি। বাইরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই সেই একই শক্তির বিকাশ, এইটুকু জানলেই জগতের সঙ্গে আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সঙ্গে সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করে সঙ্কীর্ণতা থেকে, স্বার্থ থেকে, ভয় থেকে বিষাদ থেকে মুক্তিলাভ করি।

এই ধ্যানযোগে যেমন আমরা আমাদের অন্তরবাহিরকে বিশ্বেশ্বরের দ্বারা বিকীর্ণ দেখতে চেষ্টা করব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করব—যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রয়েছি, তাকে সচেতন ভাবে জানবার বাধাটি যাতে, সেই অসত্য, সেই অন্ধকার, সেই মৃত্যু যেন দূর হয়ে যায়।

যা নাই তা চাই না, যা আমাদের আছে তাকেই পাব—এই আমাদের প্রার্থনার বিষয়। যা দূরে তাকে সন্ধান করব না, যা আমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশিত তাকেই আমরা উপলব্ধি করবো—এই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য।

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এমনি সরল, এমনি উদার, এতই অন্তরঙ্গ। এতে কল্পনা-দুরহের স্পর্ধামাত্র নেই।

জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও তাই।

সন্তোষং হৃদি সংধায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।

সুখ যিনি চাইবেন তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করবেন। সন্তোষ যিনি চাইবেন তিনি সংযম অভ্যাস করবেন।

সুখ বাইরে নেই, সুখ আছে মানুষের অন্তরে। উপকরণ-জালের বিপুল জটিলতার মধ্যে সুখ নেই, সুখ আছে সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে।

উপকরণ সঞ্চয়ের আদি অন্ত নেই। বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া হয়, সমস্ত ভস্ম হয়ে ঘৃতসিক্ত শিখা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। ক্রমেই সে নিজের অধিকার থেকে পরের অধিকারে যায়, তার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণতার ধারণ করে।

সুখকে বাইরে কল্পনা করে মৃগয়ার মৃগের মত সারা বিশ্বকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করে ফিরলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারীর উদ্যম অস্ত্র তাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এমনি উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্য বেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হয়ে যায়। আমাদের চারদিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ অহরহ প্রতীক্ষা করে আছে, অনায়াসেই তাদের আমরা লঙ্ঘন করে দলন করে বিচ্ছিন্ন করে চলে যাই। জগতের অজস্র আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা ছুটতে ছুটতে দেখতে পাই না।

আমরা খাই, পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়ে ছাই হয়ে যাই। মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে-জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি না, মানবসমাজে সে-জীবনের কণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আলোকে একটা ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হতে পারে যে কঠোর-সাধ্য প্রতিজ্ঞাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য আলোক ও অমৃত অন্বেষণের পরিচয় দেয়।

কিন্তু তা কোনোমতেই নয়। তা যদি হতো তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশে লোক অমৃতের আশা পর্যন্ত করতে পারতো না। যা সাধারণ বুদ্ধিবল মানবলের পক্ষে দুঃসাধ্য তাতেই প্রতিজ্ঞা বা অসাধারণ শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করে নেওয়া, এ কেবল একান্তভাবে যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। এ আর-কিছু নয়, যা কাছেই আছে তাকেই পাওয়া।

এইটুকু শুধু মনে রাখতে হবে—আমাদের যা-কিছু দেবার তা আমাদের প্রার্থনার অনেক আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। আমাদের যথার্থ ইপ্সিত ধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল নেবার চেষ্টা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করেছেন।

তিনি সবই দিয়েছেন, অথচ এইটুকু আমাদের বলবার মুখ রেখেছেন যে, আমরাই নিয়েছি। এই নেওয়াটাই সফলতা, এইটিই লাভ। পাওয়াটা সব সময় লাভ নয়।

আধিক পরমার্থিক সব বিষয়েই এই কথা খাটে।

ঋষি বলেছেন—

আবিরাবীর্ম এধি!

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা আপনি প্রকাশিত আছই, এখন আমার কাছে প্রকাশিত হও। এই আমার প্রার্থনা।

তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নেই। আমার পক্ষে বাকি আছে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখবো, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণ প্রকাশ হলেও আমার কাছে ঢেকা থেকে যাবে। সূর্য তো আপন আলোকে আপনিই প্রকাশিত হয়েই আছেন, এখন আমার কেবল চোখ খোলবার অপেক্ষা। জাগ্রত হবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খোলবার ইচ্ছা হয় আমরা চোখ খুলি। তখন সূর্য আমাদের নতুন করে কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনিই দান করে বসে আছেন সেইটুকুই শুধু বুঝতে পারি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা যে কি চাই তা যথার্থভাবে জানতে পারাই আমাদের প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তা জানতে পারলাম, তখন সিদ্ধির আর বিলম্ব রইলো না। তখন আর ঘুরে মরার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝতে পারি সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। এই সুবৃহৎ আকাঙ্ক্ষাই আমার মধ্যে আমার সফলতাকে অতি সুন্দর ভাবে এবং অতি সহজ ভাবে বহন করে আনে।

আমাদের ছোট বড় সকল ইচ্ছাকেই মানুষের এই বড় ইচ্ছা এই ধর্মগত প্রার্থনা দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। নিশ্চয় বুঝতে হবে আমাদের যে-ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাই আমাদের খর্ব করে, তাই কেবল আমাকে নয়—সমস্ত মানবকে পেছনের দিকে টানতে থাকে।

এ যে কেবল আমাদের খাওয়া পরা আমাদের ধন-মান অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তা নয়—আমাদের বড় বড় চেষ্টা সম্বন্ধেও আরও বেশি করে খাটে।

যেমন দেশ-হিতৈষী। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদের আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে নিয়ে যায়, তবু এটি একদিন মানবত্বের গুরুতর অন্তরায় স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। এর প্রমাণ আমাদের নিকটেই রয়েছে। ইওরোপীয় জাতিরা একেই তাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে ইওরোপের দৃষ্টি থেকে আড়াল করছে। ইওরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতা লাভের ইচ্ছাকে প্রবলভাবে প্রতিহত করছে এবং ইওরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হয়ে উঠছে। ইওরোপ কেবলই মাটি চাইছে, সোনা চাইছে, প্রভুত্ব চাইছে—এমন মোহান্ধভাবে, এমন ভীষণভাবে চাচ্ছে যে, সত্য আলোক অমৃতের জন্য মানুষের যে চিরন্তন প্রার্থনা, তা ইওরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে তাকে উদ্দাম করে তুলছে। এইই বিনাশের পথ। পথ নয় এরই নাম মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে আমাদের অত্যন্ত নিকটে ইউরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদের সবাইকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করে তুলছে।

কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই শুধু মনে রাখতে হবে যে, সত্য, আলোক অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী। বিষয়ানুরাগই হোক আর দেশানুরাগই হোক, যেখানেই সে সত্য আলোক আর অমৃতকে অতিক্রম করতে চায়, সেইখানেই তাকে অভিশাপ দিয়ে বলতে হবে—

'বিনিপাত।'

বলা কঠিন। প্রলোভন প্রবল। ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য। তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করে বলেছে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করে তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগিয়ে তোলো—তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দিকে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হবে। কোনও ভয়, কোনও সংশয়, কোনও দীনতা মনের মধ্যে রেখো না। আনন্দে প্রত্যূষে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম কর, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করে যাও, কোথাও যেতে হবে না, কোথাও খুঁজতে হবে না, সর্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করতে শিক্ষা কর—যা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নেবার সাধনা কর।

নিজের চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করে ফেলি, তবে আকাশ ভরা আলো তো আর দেখতে পাই না। তেমনি আমাদের ছোট মনের ছোট ছোট বিষাদ-অবসাদ-বৈরাগ্য-নিরানন্দ আমাদের অন্ধ করে দেয়—আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখতে পাই না—নিজের কালিমা দ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি। চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা, কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি।

কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের জন্যও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে-সপ্তকে বেজে ওঠে, যে আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলে যায়, তবে সেইখানেই চোখ পড়ে সেখানে একমাত্র তাঁকেই দেখি। দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। ঘরে-বাহিরে, সুখে-দারিদ্র্যে, অপকারে অপমানেও তাঁকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝতে পারি—প্রকাশমাত্রই তাঁরই প্রকাশ এবং প্রকাশ মাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝতে পারি যে-আনন্দে আকাশে আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দের প্রকাশ। সেই আনন্দে আমি কারও চেয়ে ছোট নই, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নেই, ক্ষতি নেই, অসম্মান নেই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন।

তিনি প্রচুর রূপে আপনাকে দান করছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করতে পারব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই যে বিশ্বসিংহাসন পূর্ণ করে রয়েছেন, আমরা সঙ্কুচিত হয়ে দীন হয়ে অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন?

হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করে দাও। দুই হাত ভরে চোখ ভরে প্রাণ ভরে অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ কর! তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি যেসব জায়গা থেকে দেখছে—তুমি একবার তোমার চোখের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মুছে ফেল। তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করে চেয়ে ভাখো, তখনি দেখবে তাঁর প্রসন্নসুন্দর কল্যাণ মুখ তোমাকে অনন্তকাল বক্ষে করছে।

সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য্য, সে কী প্রেম, আনন্দরূপমমৃতম্।

যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নেই, সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন?

ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসি, সেই আনন্দ সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তোর সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করে দেতে বল্—বলের সঙ্গে বল্—অল্প নয়, আমার সবই চাই। তুমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। তুমি যতটা দিচ্ছ, আমি সবটাই নেবো। আমি ছোটটার জন্যে বড়টাকে বাদ দেবো না, আমি একটার জন্য অন্যটা থেকে বঞ্চিত হব না, আমি এমন ধন নেবো যার অর্জ্জনে আনন্দ রক্ষণে আনন্দ, যার বিনাশ নেই, যার জন্য জগতে কারও সঙ্গে বিরোধ করতে হয় না।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হচ্ছে সেখানে যেন শুধু নেবার ক্ষমতা হারিয়ে কাঙালের মত না ঘুরে বেড়াই! যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি—নিজেকে স্বয়ং প্রকাশিত করে দিয়েছ, সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি যেন না ঘটে যে, সর্ব্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখেও না দেখি, এবং কেবল শোক-দুঃখ ভ্রান্তি-জন্মা বিচ্ছেদ-ক্ষতি নিয়ে হাহাকার করতে করতে সংসার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাই!

•　　•　　•

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন···। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তারপরে পঁচিশ বছর পূর্ণশক্তিতে কাজ করবার সময়।···কর্ম্মের বন্ধন থেকে মুক্তির নেবার জন্যে আরও পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝ-খানটাতে; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রমানসের মণিমুক্তা

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার সহস্রমুখী সৃষ্টির ব্যাপকতাও তেমনি বিস্ময়কর। মানবজাতির ইতিহাসে এর আর তুলনা নেই।

আজ সারা দুনিয়ায়, বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে, মানুষ যে অবক্ষয়ের পথে ধেয়ে চলেছে সেটাই আজকের দিনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বলে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই মনে করছেন। তাঁরা ভাবছেন মানুষ যদি তার মনুষ্যত্ব ফিরে পায় তাহলে সে সব সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং সব কিছুই আবার ফিরে পাবে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখার মধ্যেই মানুষকে নিয়ে তাঁর চিন্তা আছে। তার কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

…আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিনী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সঙ্গীত করে তোলে, তারপর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না।

…মানুষ কী চোখ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাৎ হাতে ঠেকে।

…যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এই জন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট ; সেখানে তার ভিতরের জলস্থল, সেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না। মনে হয়, যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

…মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপন গোরস্থান তৈরী করতে বসেছে।

…মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরী।

…মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য আছে বলিয়া মানুষ বড়ো।

…বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

…মানুষ এক দিকে প্রকৃতি আর এক দিকে আত্মা—এক দিকে রাজার কাজনা জোগায়, আর

এক দিকে বন্ধুর ডাকি সাধায়। এক দিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মরণ পেতে হয়, আর-এক দিকে তাকে মরণের ভিতর দিয়ে অমর হয়ে উঠতে হয়।

…মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোক লোকান্তরে আনন্দ শঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ।

…আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের নিজের হয়নি তার প্রধান কারণ এদেশের মানুষ দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলতে পারেনি। দেশকে আমরা অধিকার করতে পারিনি। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে পাওয়া যায় তাকেই আমরা অধিকার করি।

…দেশকে ভাল না বাসলে তাকে ভাল করে জানবার ধৈর্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভাল করতে চাইলেও ভাল করা যায় না।

…দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে একঘরে হয়। ইহাতে বড় কেহ ঠকেও না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া, নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি, তার চেয়ে অনেক বড় দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

…দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষের তৈরী।

…ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণসুরে বীণা বাজাইতেছেন, এরূপ ধ্যান করা মেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কের পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ রোগাবোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহাই যথার্থ দেখা।

…মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে
　　মানুষ আপন হাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।

সংকলন—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাজাতি সদন ঃ নেতাজীর স্বপ্ন

ডক্টর কালিদাস নাগ

[১৯৬০ সালে ডক্টর কালিদাস নাগ ইংরাজিতে যে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন তার মর্মানুবাদ]

মহাজাতি সদন স্থাপনার দ্বারা সুভাষচন্দ্র নিজের মনের কোন্ নীরব ইচ্ছাটিকে রূপ দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তা আমি আমার দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিতে চাই।

আমাদের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে ঐ ভবনের নামকরণ যজ্ঞে পৌরোহিত্য করবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথ নাম দেন—মহাজাতি সদন।

নামটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। কোন একটি বিশেষ জাতির সংকীর্ণ আদর্শবাদ নয়, এই সদনে মূলতঃ বিশ্বমানবজাতির মানসলোকের প্রকাশ ঘটবে, তাই এর নাম হয় মহাজাতি সদন।

সারা বিশ্বে যখন জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা আর হানাহানি চলছে ঠিক সেই সময় এই মহাজাতি সদন সকল দলাদলির ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বিশ্ববাসীর সামনে নিজেকে উদ্ঘোষিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এই সংকীর্ণ জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ঘোষণা করেছেন, জাতি-ভেদের বিপক্ষে সর্বদা তাঁর বজ্রগর্ভ বাণী শোনা গেছে, তাই সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন, মহাজাতি সদনের নামকরণ-উৎসবে কবিগুরুর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছেন?

রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে এই সদনের মাধ্যমে গড়ে উঠুক এমন এক আদর্শবাদী সর্বসংকীর্ণতামুক্ত যুব সম্প্রদায় যারা কায়মনোবাক্যে সকল প্রকার দোষদের, সর্ব স্তরের বৈষম্যের এবং সমস্ত ধরণের আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গীর ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্র মহিমা আর চিন্তার বাহক ও ধারকরূপে এই দেশকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলবে।

সুভাষচন্দ্র জানতেন, ব্রিটিশের দৃষ্টিপথ থেকে মুক্ত হোতে না পারলে আমাদের দেশে জাতিরতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

তাই তিনি শেষ পর্যন্ত ভারতের বাইরে থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নায়করূপে এক মহান দূত পরিচালনা করেছিলেন।

তাঁর সর্বাত্মক আত্মত্যাগের দ্বারা তিনি এমন এক সচিন্ত সৈন্য শ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা তাঁদের রক্ত দিয়ে শুধু ভারতের নয় সারা এশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে গেলেন।

দলীয় রাজনীতি এবং শ্রেণীগত ঝগড়া বিবাদ আর মতভেদের মধ্যে আমরা ভুলে গিয়েছি যে কি সত্যিকার আধ্যাত্মিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি।

ভাগবত গীতা, বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের বাণী ছিল তাঁর আজীবনের নিত্যসহচর।

মহাজাতি সদনকে যাঁরা পরিচালনা করেন বা যাঁরা এই জাতীয় সম্পদকে নতুন ভাবে পরিচালিত করবার কথা চিন্তা করছেন তাঁদের এই কথা মনে রাখতে বলি।

এই সদনের এক বড় হলঘরে গীতা, মহাভারত এবং সেই সঙ্গে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের জীবনের ঘটনাবলী দেওয়ালে দেওয়ালে অঙ্কিত করা হোক। সেই সব চিত্র দেখে দর্শকরা অনুপ্রাণিত হবে।

এই সদনে এশিয়ার পুনরুত্থানের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ নিয়ে একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হোক। এখানে রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত দেশের মনিষীদের জীবনকথা ও জীবন সাধনার ইতিবৃত্ত দেশের লোকদের গোচরে আনা হোক। আত্মত্যাগ এবং সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেওয়া হোক এখানে দেশের তরুণ তরুণীদের।

সর্বোপরি সুভাষের জীবনের আদর্শ, তাঁর সর্বাত্মক আত্মত্যাগ এবং বীর্যবত্তার পরিচয় এই সদনে বসে তারা লাভ করুক। তবেই হবে সুভাষচন্দ্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

Amidst the din and bustle of party politics and sectional controversies, we in India have almost forgotten that the politics of Subhas was based on his profound spirituality. The Bhagvat-Gita and the messages of Vivekananda and Rabindra nath were his life-long companions. These facts should be constantly remembered by all those who would be called to re-build and re-organise the Mahajati Sadan. A special Hall therein should be decked by masterly mural paintings representing episodes from the Gita and the Mahabharata as well as from the lives of Swami Vivekananda and Rabindranath who nurtured a generation of Indian youths with Subhas as the crowning gem, for he made total sacrifice, the condition—precedent of Freedom. In the building should be developed also the central library of Asian Renaissance starting with the career of Rammohon Roy (1774-1833) and ending with the consecration of the life Netaji Subhas. We have many desultory collections of books on Asia in our libraries, but what we expect the Mahajati Sadan to do is to supply, to the rising generation of India a systematic documentation of books and periodicals on the entire resurgent East so badly represented in the books and libraries of India and abroad.

STUDENTS' FORUM

The proximity of the Mahajati Sadan to College street and University district should normally suggest that we should try to build up a model Students' Forum and youth organisation in the Mahajati Sadan which naturally should be kept above party politics. Dedication and Discipline should be writ large on the portals of the Sadan which would bear the proud memories of one of the noblest sons of Bengal and of India. By luring our immature youth into the path of politics we have sadly undermined discipline which is the very soul of youth organisations.

The best corrective to this deplorable state of affairs would come from an intensive study of a career of Netaji Subhas, the supreme disciplinarian of our first national army.

• • •

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে—একটা প্রয়োজনের আর একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে।

রবীন্দ্রনাথ

কোলে
▲ ভেনিস
▲ অ্যাসর্টেড
লজেন্স ও টফি
KOLAY
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ

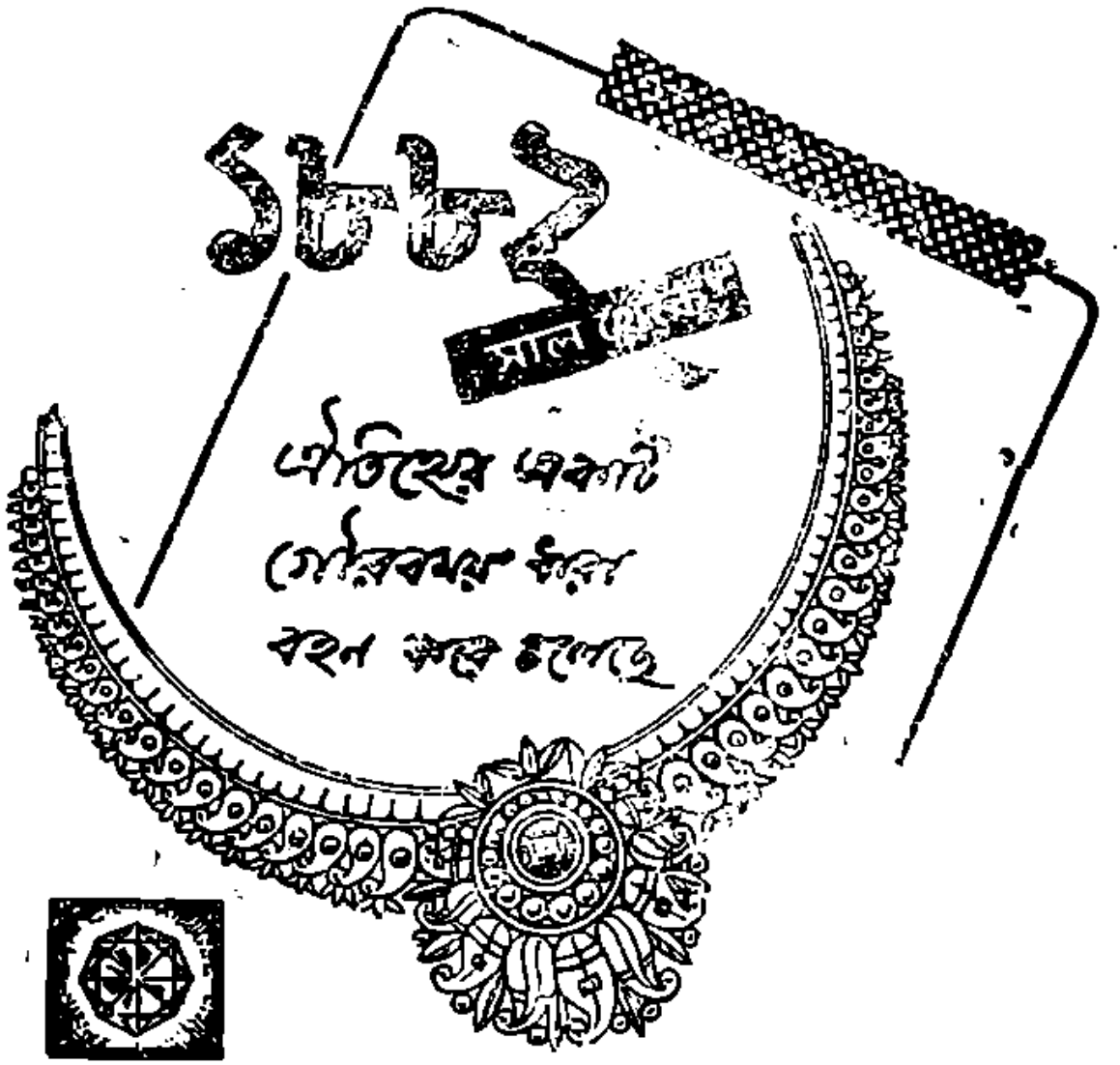

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকারী :
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘরে বাইরে যেখানেই

বেশভূষাই আপনার
মর্য্যাদার পরিচায়ক

ভারতের সিল্ক শাড়ীই
আজ আধুনিক নারীর
শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আমাদের রূপদক্ষ শিল্পীর স্পর্শে এই
সিল্ক শাড়ী নানা রঙে, বর্ণে ও বৈচিত্র্যে
অতুলনীয় হয়।

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

ভারতীয় সিল্কের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান
টাওয়ার ব্লক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

ক্যাস্টরল

সুগন্ধী ক্যাষ্টর অয়েল

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন কেশশ্রীর জন্য

রুচিবান ব্যক্তিমাত্রেই, কি নারী কি পুরুষ,
ব্যবহার করেন ক্যাল্‌কেমিকোর ক্যাস্টরল,
কারণ তাঁরা জানেন ঘন কালো
কেশবর্দ্ধনে এর তুলনা নেই।

প্রস্তুতকারক।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-৭১

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI
জৈষ্ঠ ১৩৭৪, JUNE, 1967
দ্বাদশবর্ষ ৫ম—১২শ সংখ্যা

প্রতি সংখ্যা—এক টাকা
বার্ষিক পনের টাকা

সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক : কল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

PIONEER
VESTS

ARE HYGIENICALLY BLEACHED !

EVERY BODY NEEDS PIONEER VESTS

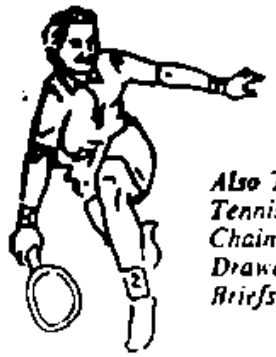

Also Tee shirts, Tennis shirts, Chain Shirts, Drawers & Briefs

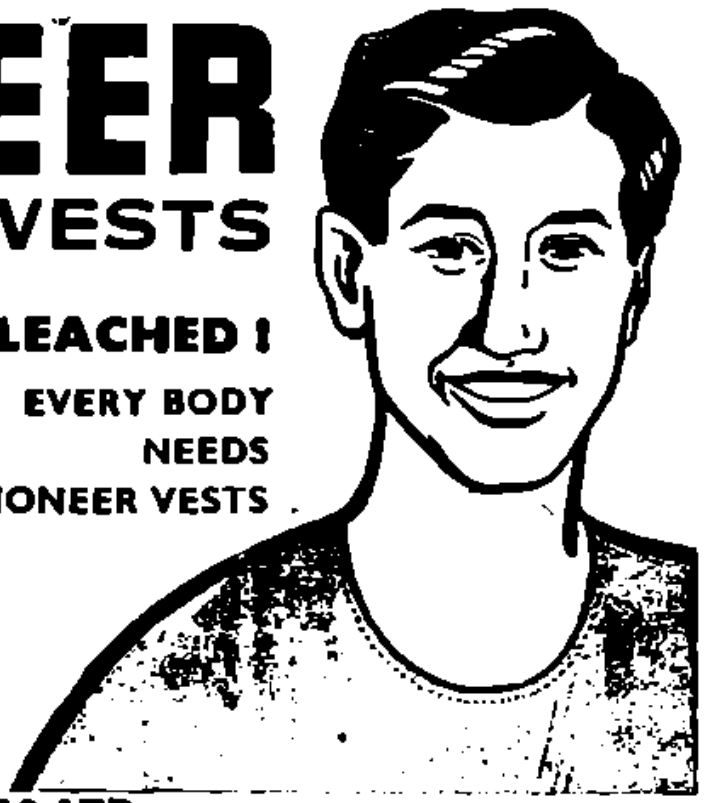

PIONEER KNITTING MILLS LTD PIONEER BUILDINGS, CALCUTTA-2 Phone : 56-2981

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী ব্যবহার করুন

জাতীয় অধ্যাপক **শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু** বলেন—পাইওনিয়ার নিটিং মিলের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের হোসিয়ারী দ্রব্য ধৌত করিবার বিরাট আধারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য.....
আয়ন এক্সচেঞ্জ স্তম্ভের মধ্য দিয়া চালিত জল বিশুদ্ধ হইয়া আধারগুলি পূর্ণ করিয়া থাকে।

পাইওনিয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনিয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা

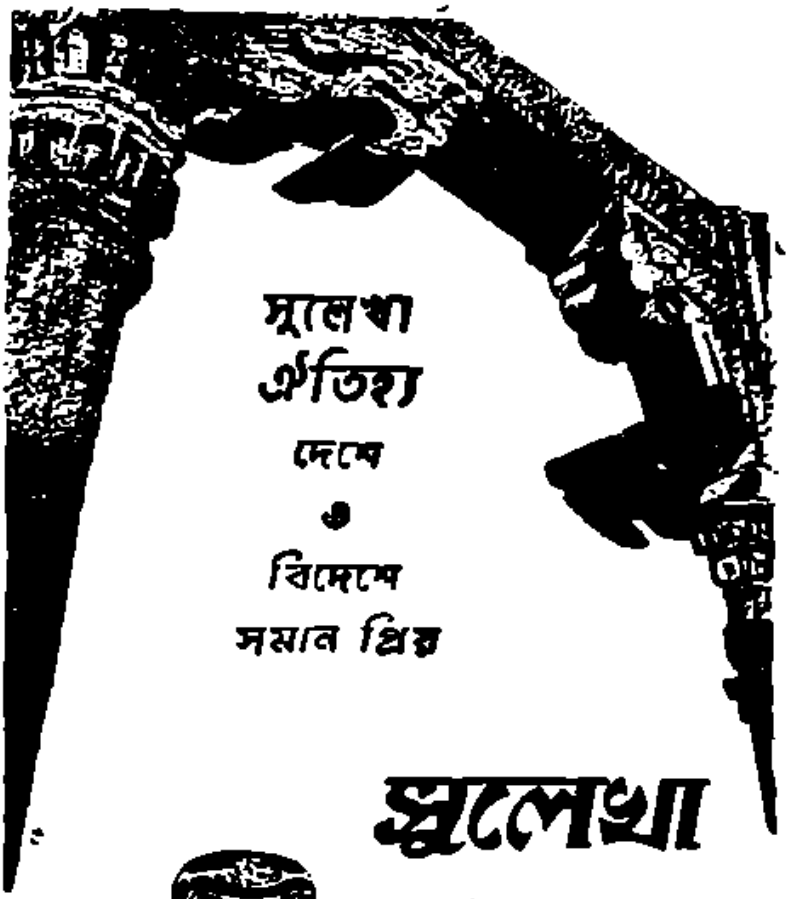

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউন্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Programme LW-318

গল্প-ভারতীর প্রিয় লেখক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কয়েকটি বহুপ্রশংসিত বই

যাত্রা শুভ হ'ল (উপন্যাস : চলচ্চিত্রে রূপায়িত : ৩য় সংস্করণ) ৩·৭৫

আগুনের পরশমণি (উপন্যাস) ... ৩·০০

পূর্বাপর (গল্প) ... ২·৫০

বিয়োগান্ত (গল্প) ... ... ২·৫০

যে মরজীবন (মনীষীদের গল্প) ... ৩·০০

নব নব রূপে (রম্য কাহিনী) ... ৩·৫০

বীরবল রঙ্গ (আকবরের সভাস্থ বীরবলের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার আশ্চর্য কাহিনী) ৩·০০

স্মৃতির প্রদীপ (রহস্য) ... ২·৫০

তারকার মৃত্যু ও কালরাত্রি (রহস্য) ... ২·০০

মায়াজাল ও মরণাভিসার (,) ... ২·০০

তিন সঙ্গী শিরানবেলো, মলেয়ার, ক্রিস্টিন্ড বার্গ (নাটক) ... ২·০০

নবনাট্যরূপে গিরিশচন্দ্রের : মায়াবসান (নাটক) ২·৫০

নবনাট্যরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ (নাটক) ৩·০০

Carey's Good Old Days (সম্পাদনা) ১৫·০০

: যন্ত্রস্থ :

চিরঞ্জীবিকা (চার্লি চ্যাপলিনের জীবন রহস্য)

রহস্য পঞ্চক (পাঁচটি রহস্য উপন্যাসের একত্রিবাস)

নিশি বিসর্প (রহস্য কাহিনী)

কেরী সাহেবের কলকাতা (কোম্পানী আমলের কাহিনী-রূপে গল্প-ভারতীতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত)

Glimpses of the Olden Times (সম্পাদনা)

Echoes from Old Calcutta (,)

গল্প-ভারতী কার্যালয়ে অর্ডার পাঠালে উল্লিখিত বইগুলি তৎপরতার সঙ্গে সরবরাহ করা হবে। যে-কোন বাংলা বই-এর জন্য পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকারা গল্প-ভারতী কার্যালয়ে লিখতে পারেন। আমাদের ক্রয় সার্ভিস বিভাগ তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

গল্প-ভারতী কার্যালয় :

২১৯বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-৬

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের এক অসাধারণ উপন্যাস

ঈষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নূতন উপন্যাস

মৃগমদ ৮॥

বিমল মিত্রের নূতন উপন্যাস

সখী সমাচার ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী উপন্যাস

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

সুবর্ণলতা ১৩৲

প্রথম প্রতিশ্রুতির নায়িকা 'সত্যবতী'র কন্যার কাহিনী

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ৯৲

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

এক আকাশে অনেক তারা ৬৲

অমিতকৃষ্ণ বসুর (অরুণ)-র নূতন উপন্যাস

ম্যারিনা ক্যান্টিন ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সুবৃহৎ নূতন উপন্যাস

একদা কী করিয়া ১৩৲

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas
Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

THE HOUSE OF NRM

THE LARGEST MANUFACTURERS OF INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS IN INDIA

NATIONAL RUBBER MANUFACTURERS LTD.

THE ONLY WHOLLY INDIAN-OWNED AUTOMOBILE TYRE COMPANY

Inchek Tyres Limited

My day long companion

Lovely Lord's Sweets, filled with Jelly, Chocolate, Cream...that get into your mouth and tickle.... make you want to eat a jar a day.

Lord's

Sweets & Toffees

JAMES LORD & SONS LTD. CALCUTTA-I.

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	৯৭৫
ভাববার কথা	৯৭৮
বঙ্কিমের স্বদেশী ভাবনা—সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৮০
দুর্গত মহানগরী (কার্টুন)	
বন্যা কন্যা (উপন্যাস)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৮৪
নাটমঞ্চ—রত্নাকর	৯৯১
গুপ্তচর কাহিনী	
কুহকিনী—গৌরীশঙ্কর দে	১০০১

এই সংখ্যায়

মেয়ে-মজলিশ

নারীর তিনবন্ধু—মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০৫

রান্না আর রান্না—মীরা বসু ১০০৮

লোভনীয় আম—নীলিমা দে ১০০৯

চলতি দুনিয়া ১০১১

স্বপ্ন দর্শন (শেক্সপিয়র বিষয়ক)—সুপর্ণ রায়চৌধুরী ১০১৫

মর্যাদা—প্রভঞ্জন কুমার রায়চৌধুরী ১০১৭

এই সংখ্যায়

ছায়াবাণী—চিত্রমিত্র ১০২২
ব্যাপার যা চলছে—চক্রপাণি ১০২৭
আগুনের চাবুক (ছোটগল্প)—নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১০৩২
অন্যতমা (গল্প)—হরিপ্রসাদ ভৌমিক ১০৩৭
তিলতর্পণ—অমৃতলাল বসু ১০৪১
খেলাধুলা—শ্রীজ্যোতির্ময় ১০৫৭

আপনার কেশগুচ্ছ
দীর্ঘ সুন্দর ক'রে
আপনাকে রূপ-লাবণ্য
উজ্জ্বল করবে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
সুবাসিত
তিল তৈল

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর • দিল্লী

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

দোকান প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা ও বৈকাল ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা ও শুক্রবার সকাল ৮টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

একমাত্র সত্বাধিকার :—
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কোলে
▲ ভেনিস
▲ অ্যাসর্টেড
লজেন্স ও টফি
KOLAY

পোড়া ···· কাটা ···· পোকার কামড়

এই সব আকস্মিক **দুর্ঘটনায়**

শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও নিরাপদ দাগ লাগে না

এ্যাক্রিমেণ্ট

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
সংক্রমণ প্রতিরোধক
সত্বর আরোগ্যদায়ক

ছোটদের নাগালের বাইরে রাখুন

খেলা ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস

সম্পাদকীয়

পদ্মলোচনবাবু রোজ সকালে আমার বাড়িতে আসেন। গরীব মানুষ। সারা জীবন সরকারী চাকরি করেছেন। এখন বয়স হয়েছে। পেনসনের টাকায় অতি কষ্টে সংসার চালান।

বাড়িতে চায়ের পাট নেই। ভেবেছিলাম বুঝি চা খেতে আসেন। রোজ তাঁকে এক পেয়ালা চা দেওয়া হয়।

খেতে তিনি চান না, তবু আমি জোর করে খাওয়াই।

পদ্মলোচনবাবু চা খেয়েই ব্যাগ থেকে একখানি খবরের কাগজ নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়তে বসেন। ঠিক একটি ঘণ্টা।

এক ঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবরগুলি পড়েন। পরে কাগজখানি আবার তেমনি সযত্নে ভাঁজ করে রেখে বাড়ি চলে যান।

সেদিন আমি একা ছিলাম। কাগজ পড়া শেষ করে পদ্মলোচনবাবু বললেন, একটা কথা রোজই ভাবি আপনাকে বলবো। কিন্তু আশপাশে লোকজন থাকে, বলতে পারি না।

শোনবার জন্যে তৈরি হয়ে বললাম, বলুন।

পদ্মলোচনবাবু ম্লান একটু হেসে বললেন, বলতে লজ্জা করে, তবু বলছি। দেখুন, রোজ সকালে আপনার বাড়িতে আমি আসি। আমাকে এককাপ করে চা দেওয়া হয়। চা খেতে আমি কিন্তু আসি না। আপনি নিজেরও ক্ষতি করছেন, আমারও ক্ষতি করছেন।

—ক্ষতি করছি?

—আজ্ঞে, হাঁ। পদ্মলোচনবাবু বললেন, আমার চায়ের জন্যে রোজ দু'তিন চামচে চিনি আপনি খরচ করছেন। হিসেব করে দেখুন সপ্তাহে কতটা চিনি আপনি আমার জন্যে খরচ করছেন। ছপ্তার র‍্যাশানের চিনি যখন আপনার ফুরিয়ে যাবে তখন যতই টাকা খরচ করুন এক ছটাক চিনি কোথাও কিনতে পারবেন না।

বললাম, আমার এই ক্ষতির কথা বলছেন?

—ক্ষতি নয়? যা না দিলেও চলে তা আপনি দেবেন কেন?

বললাম, দেবো আমার আনন্দের জন্যে। আপনাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে মনে আমি আনন্দ পাই। লাভক্ষতির অত হিসেব আমি করি না।

পদ্মলোচনবাবু কেমন যেন অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, হিসেব না করলে আপনার হয়ত চলে, কিন্তু আমার চলে না।

যাঁরা পেনসনের টাকায় থাকে সংসার চালাতে হয়, হিসেব না করলে তাঁর চলে না জানি, কিন্তু যে-কথা তিনি বললেন, সে রকম ভাবে কোনোদিন ভেবে দেখিনি।

পদ্মলোচনবাবু বললেন, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, কাজেই আগেকার হিসেবে আর চলছে না। এখন একটা নতুন 'বাজেট' তৈরি করেছি, তাইতে বেশ ভালই চলে যাচ্ছে। শরীরটাও ভাল আছে।

বলুন 'বাজেটে'র হিসেবটা জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, সেটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। যেমন ধরুন, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা —পিয়ার বালি ওয়াটার। সেদ্ধ দিয়ে খেতে বেশ ভালই লাগে। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন—একদম বন্ধ। গ্রীণ ভেজিটেব্‌লস্ মানে শাক-সব্জি—সেদ্ধ করে খেলে ভিটামিন্ নষ্ট হয় না, সামান্য একটুখানি তেলেই কাজ চলে যায়। তারপর ভাতের ফেন, তরকারির খোসা—আপনারা ফেলে দেন, আমরা ফেলি না। এমনি আরও অনেকরকম কায়দা-কানুন—মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়েছে। তাতে বেশ ভালই চলে যাচ্ছে।

এই বলে একটুখানি থেমে তিনি আবার বললেন, শুধু এই একটা ফতি আপনি আমার করে ফেললেন।

—আপনার ফতি করলাম আমি?

কথাটা কেমন যেন রহস্য শোনালো। পদ্মলোচনবাবু চমকে উঠলেন। বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি ইচ্ছে করে করেননি। এই যে আপনি রোজ আমাকে চা খাইয়ে খাইয়ে চা খাওয়ার নেশাটি ধরিয়ে দিলেন, এখন আপনি যদি এখান থেকে চলে যান, তখন আমি কি করবো? দোকানে এক পেয়ালা চায়ের দাম পনেরো পয়সা।

বললাম, আমি অবশ্য যাব না এখান থেকে, কিন্তু আপনি দোকানে কেন চা খাবেন? বাড়িতে এক পেয়ালা চা তৈরি করেও তো নিতে পারেন! খরচ অনেক কম পড়বে।

পদ্মলোচনবাবু ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন।

—উঁহুঁ, উঁহু, আমার 'বাজেটে' চায়ের উল্লেখ নেই। দুধ চিনির পাট আমি তুলে দিয়েছি।

—কেন, চিনি তো র‍্যাশানে পান আপনি?

পদ্মলোচনবাবু বললেন, পাই। কিন্তু বুড়ো বয়েসে চিনি খেলে ডায়েবেটিস্ হবার ভয় থাকে। আপনার কাছে মিথ্যে কথাটা আর বলি কেমন করে? আমার র‍্যাশানের চিনিটা আমি বেচে দিই।

বেচারাকে দোষ দেওয়া যায় না।

পরের দিন থেকে পদ্মলোচনবাবুকে চা দেওয়া আমি বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু তাঁর আসা বন্ধ হলো না। যেমন আসতেন তেমনি আসতে লাগলেন।

আসেন, বসেন, খবরের কাগজটি পড়েন, পড়েই চলে যান। বলেন, সারাজীবন সরকারী চাকরি করেছি। সকালে উঠেই বাজার করেছি, তারপর কোনোরকমে চারটি খেয়ে নিয়েই আপিস ছুটেছি। খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস কোনোদিন ছিল না। এখন দেখছি খবরের কাগজ না পড়লে চলে না। কারও সঙ্গে কথাই বলতে পারি না।

সুতরাং পদ্মলোচনবাবুর পিপাসা—চায়ের পিপাসা নয়, একটুখানি জ্ঞানের পিপাসা।

হঠাৎ একদিন পদ্মলোচনবাবু আমাকে চুপিচুপি বললেন, দেখুন, আমি তেমন লেখাপড়া জানি না। সব জিনিস ভাল বুঝতে পারি না। তাই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।

বললাম, কি কথা—বলুন।

পদ্মলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা—মানে এই ভারতবর্ষ কার দিকে?

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না। বললাম, ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।—

বুঝিয়ে তিনি বললেন।

—যেমন ধরুন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো পাকিস্তানের। তখন যেমন দেখলাম আমেরিকা পাকিস্তানের দিকে আর রাশিয়া আমাদের দিকে, তেমনি এই যে ইস্রায়েলের সঙ্গে আরব যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ হলো—আমরা ইস্রায়েলের দিকে, না আরব যুক্তরাষ্ট্রের দিকে?

বললাম, আমরা কারও দিকে নই। আমরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য।

পদ্মলোচনবাবু বললেন, কিন্তু খবরের কাগজে দেখলাম, আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা নাসেরকে সমর্থন করেছেন।

বললাম, উনি এমনি করে থাকেন! উনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।

পদ্মলোচনবাবু বললেন, এটা কিন্তু উচিত হয়নি। পাকিস্তান যখন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, নাসের তখন চুপ করেছিলেন, আমাদের তেমনি চুপ করে থাকাই উচিত ছিল। এমন-কি এই আরব রাষ্ট্রের অন্তর্গত তুরস্ক পাকিস্তানকে সাহায্য পর্যন্ত করেছিল। সেকথা তিনি ভুলে গেলেন কেমন করে?

এ-সব কথা ভুলে অবশ্য যাওয়াই উচিত। কিন্তু ভুল হওয়া উচিত নয়। কারণ এই রাজনীতির ক্ষেত্রটাই অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। এখানে সামান্য একটু ভুলের জন্য সারা দেশ বিপন্ন হতে পারে।

পদ্মলোচনবাবু খুশী হলেন। বললেন, তাহ'লে আমি ঠিকই বলেছি বলুন।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। খবরের কাগজ পড়বার নেশাটা আপনার অতি কিছু করেনি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভাববার কথা

রাত্রির শেষে তখন চলেছে আলো আঁধারের খেলা। ফাগসা ফাগসা দেখাচ্ছে দূরের মাঠঘাট। মানুষ গুলোকে ছায়ার মত মনে হচ্ছে। ঠিক এমনি সময় পাশের বাড়ীর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো একদল ছেলে। যত ছোট নানা বয়সের ছেলের দল। বড়রা সামনে সামনে চলেছে তাদের পেছনে চলেছে ছোটর দল। বড় একজনের গলায় বাঁধা একটি হারমোনিয়াম। তার দুধারে দুজন সঙ্গী একসঙ্গে চলেছে তালে তালে। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়তেই সমবেত কণ্ঠে গান আরম্ভ হল "জীমূত সমঘন করেনা গর্জন প্রলয় প্রতজন ঘুপ্ত ভবে" এই গান গেয়ে গেয়ে প্রভাতফেরীর দল গ্রামের প্রতিটি পল্লীতে ঘুরেঘুরে শেষে গ্রামের মাঝখানে একটি বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে দাঁড়াল। আর একদিন সেই একই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো গান গাইতে গাইতে ছেলেরা—"রাম রহিমনা ভুলাকরো ভাই মনটা ছাচ্চা রাখো জি, দেশের ভাবনা ভাব ভাইরে দেশ আমাদের মাতাজী।" এই ভাবে প্রতিদিন প্রত্যুষে গান গেয়ে গেয়ে গ্রামের ছেলেরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে এসে একটি স্থানে সমবেত হত। কোনদিন মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ কোনদিন হাতে বোনা দেশী কাপড় বিক্রি। এও চলতো সঙ্গে সঙ্গে। যারা বয়সে বড় তারা সামনে সামনে আর ছোট দল তাদের আদেশ ও নির্দেশ মেনে নেবার জন্য সদাই উদগ্রীব হয়ে তাদের পেছনে পেছনে যেতো। কোনদিন মত বিরোধ তো দূরের কথা; কথান্তর পর্যন্ত হতনা। বড়রা দাদার দল—গুরু, আর ছোটরা ভাইয়ের দল—শিষ্য। বয়সে বড় হলেই তারা গুরুপদে অভিষিক্ত হত। স্কুলেও তাই হত, বড়রদল পথপ্রদর্শক ছোটরদল তাদের অনুসরণ করে চলেছে। খেলার মাঠেও এই একই নীতি একই নিয়ম। সেখানে কর্তা ক্যাপ্টেন, তার নির্দেশ মাথা পেতে নিতে হবে।

সেবারে রামালপুরে মুসলমানরা হিন্দুর দেবদেবীর মন্দির ভাঙছে এই সংবাদ এসে পৌছালো গ্রামে। এসংবাদে সকলে খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। সঙ্গেসঙ্গে তৈরী হয়ে গেল ছেলের দল। লাঠিখেলার আখড়া পাড়ায় পাড়ায়। যারা লাঠি খেলা শেখাতে আরম্ভ করলে তারা প্রায় সকলেই নিরক্ষর চাষার বা মুহুরদের ছেলে। তাতে বয়ে গেল, তারাতো শিক্ষক কাজেই সে সম্মান তাদের দিতেই হবে। গুরুর আসন তাদেরই। কলেজে অধ্যাপকরা সবই অভিভাবক। পিতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁদের করে চলেছে ছাত্ররা। তারপর জীবনের বৃহত্তরক্ষেত্রে দেশের সেবায়, স্বদেশী আন্দোলনে, স্বাধীনতা আন্দোলনে সেখানেও নেতৃত্বের অপার মহিমা। গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা। তাঁদের আদেশ বেদবাক্য, অকাট্য, অমান্য করে কার সাধ্য। কখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি কত দুঃখ কত কষ্ট ভোগকরেও তাদের আদেশ মাথাপেতে নিতে হয়েছে এবং পালন করতে হয়েছে। নেতার আদেশ, নেতৃত্বের গৌরব সমস্ত জীবন দিয়ে রক্ষা করতে হয়েছে।

এইভাবে জীবনের প্রতিটি ধাপে, প্রতি কর্মক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন, আদেশ পালন ও মানার স্থান ছিল সবার উপরে। আর এইভাবে সম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই প্রতিটি কাজ হত কত সুন্দর, কত সার্থক, গ্রাম হত বড়, মানুষ হত মহৎ গ্রামের লোকের আনন্দ বাড়তো। সকলের প্রশংসা জোগাতো তাদের কত প্রেরণা। দেশের মানুষ অতি সহজেই প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারতো। কোন সংকট বা সমস্যাই তাদের পথে এসে দাঁড়াতে পারতো না। সকলেই একই সূত্রে বাঁধা। প্রতিদিনের ছোটখাট দুঃখকষ্ট থেকে আরম্ভ করে বড় রকমের আপদ বিপদ সকলে একইসঙ্গে মাথাপেতে নিতো। একই বুক দিয়ে তা প্রতিরোধ করতো। এইছিল আমাদের দেশ এবং এর জন্যই একদিন সারাদেশ সাড়া দিতে পেরেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে। দেশের মানুষ গৌরবের মুকুট পরে মাথা উঁচু করে পৃথিবীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল সেদিন।

আর আজ, জীবনের ছোট বড় প্রতিটি ক্ষেত্রে না-মানার পালা—শ্রদ্ধার অভাব। নিজের বাড়ী থেকে আরম্ভ করে কর্মক্ষেত্রে, দেশসেবার সর্বত্র সেই না-মানা। কেউ কাউকে মানিনা। পিতামাতা গুরুজন কাউকে মানিনা, শ্রদ্ধা করিনা, সম্মান কি জানিনা, স্ব স্ব প্রধান। যার যা ইচ্ছা করে চলেছি। সর্বত্রই না-মানা, ফলে অশান্তি অরাজকতা। আর এই না-মানার জন্যই আজ দেশের নিদারুন দুরবস্থা। বড় বড় প্ল্যানিং হচ্ছে। ক্যাবিনেটে সুপার ক্যাবিনেট মিটিং চলেছে। কংগ্রেস বিভিন্ন স্থানে মিটিং ডাকছে দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করবার জন্য। তোড়জোড়-এর অভাব নেই। কিন্তু কাজে কিছুই হচ্ছেনা। এইসব কোন কিছুতেই কিছু হবেনা, হতে পারেনা। কারণ দেশের সর্বাঙ্গে ঘা, আর এই কঠিন ব্যাধির ঔষধও একটিই—তা হচ্ছে এই না-মানার পালাকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে এবং সাদরে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে সে-দিনের সেই মানার-পালাকে। সম্মান, শ্রদ্ধা ভক্তিকে জাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তা যদি করা সম্ভব হয়, তবেই হবে সকল দুঃখ, সকল কষ্টের অবসান। আবার এই মৃতপ্রায় জাতির দেহে প্রাণ-স্পন্দন দেখা দেবে। এই ঘনতমসাচ্ছন্ন—মহাশ্মশানে আবার শুরু হবে জীবনের জয়গান।

———

"শ্রীঅরবিন্দ যখন ভারতের মুক্তি সাধনার জন্ত বরোদা হইতে বাংলায় আসেন, তখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তার ও ত্যাগের আদর্শে প্রমোদিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাই, সকল কর্মের প্রথমে ভবানী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত বাণী ক্রমশঃ তাহাকে মায়ের ভক্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং সেই মায়ের রূপ তিনি দেখিলেন দেশমাতৃকার মূর্ত্তিতে। 'বন্দেমাতরম' গানে মুগ্ধ হইয়া তিনি মাতৃমূর্ত্তির অনুরক্ত পূজারী হইলেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশ সেবা আরম্ভ করিলেন ১৯০৬।৮ সালে। তাহার পূর্বে তিনি তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্র কুমার এবং পরে যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে বরোদা হইতে বাংলায় কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রেরণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতের মুক্তি সাধনার পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিলেন এবং নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া ভারতের যুবকদের আহ্বান করিলেন। তাঁর প্রকাশ্ত আন্দোলন চালিত হইল—ইংরাজী দৈনিক বন্দেমাতরমের মারফৎ এবং বাংলার যুগান্তর নবশক্তির ও সন্ধ্যার মাধ্যমে। তাঁহার স্পর্শে ও প্রেরণায় অসম্ভব সম্ভব হইতে লাগিল। যে বাঙ্গালীর দুর্নাম ছিল ভেতো কাপুরুষ সেই বাঙ্গালী হইল বীর, ত্যাগী, দেশভক্ত এবং ভারতের মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকৃত হইল। বাংলার যুবকরা এক অজ্ঞাত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া অধীর হইয়া মাতৃভূমির জন্ত আত্মবলি দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯১০ সালে মজঃফরপুর বোমার পরই গুপ্ত সমিতির প্রকাশ হইল। শ্রীঅরবিন্দই ভারতের তথা বাংলার আকাশে বাতাসে ভারতের মুক্তি সাধনার বীজমন্ত্রকে প্রাণবন্ত করিলেন। সেই জন্তই দেশের যুবকদের প্রাণে ভারতের মুক্তি সাধানার দৃঢ় পণ জাগ্রত হইয়াছিল ও বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তার ফলেই দেশে স্বাধীনতা আসিয়াছিল। তখন দেশ ছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে মুখরিত, জাতির আশায় পরিপূর্ণ, জীবন্ত"—বন্দেমাতরম

স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

[কবি নবীনচন্দ্র সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে গিরিশচন্দ্রকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে আনন্দমঠ রচনায় প্রেরণা দিয়েছিলেন। এই চিঠিখানি 'চিঠি শুধু চিঠি নয়' এই পর্যায়ে 'গল্প-ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কারণ আজো অনেকে এ খবরটি জানেন না। স্বদেশী যুগের বিপ্লবী নেতা ব্যারিষ্টার পি. মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৈহাটিতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি নিয়ে নানা আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বে যে সকল বাঙালী বীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন ও অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল 'আনন্দমঠ'।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বাংলার নয় সারা ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের দীক্ষাগুরু। তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি ভারতবাসীর মনে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি একদিন ভারতের বুকে যে স্বাধীনতার বীজ রোপন করেছিলেন ক্রমক্রমে তাই ভারতের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে একদিন আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত হয়েছিল।

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার বাইশ বছর কেটে গেলো কিন্তু "কই স্বাধীনতা তো এলো না"—এই কথা আজ ভারতের প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনকে উদ্বেলিত করছে —এর কারণ কি ? দেশের চরমতম দুরবস্থা—দেশের মানুষের অন্তহীন দুঃখ-কষ্ট দেশের অভাবনীয় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখে এ কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

যাঁদের রক্তে, যাঁদের বিপুল আত্মত্যাগে, যাঁদের সর্বস্ব বিসর্জনে ও যাঁদের অশ্রুজলে ও বিনিদ্র তপস্যায় দেশ স্বাধীন হয়েছিল তাঁরা আর পৃথিবীর এ পারে নেই। তাঁদের কথা ক্ষণেক আজ আর আমরা কেউ স্মরণ করিনা। তাঁরা যে সকলেই ছিলেন বঙ্কিমের মন্ত্রশিষ্য একথাও আমরা বিস্মৃত হয়েছি। তাই আজ বারংবার মনে হয় ঋষি বঙ্কিমকে আবার প্রণতচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মানুষ হই। দেশ প্রেমিক সন্ন্যাসীদের মতো জীবনব্যাপী কৃচ্ছসাধনে নিজেদের কলুষমুক্ত করে, দেশমাতৃকার দুঃখমোচনে সর্বস্ব পণ করি। কোটি-কোটি কণ্ঠে আবার উচ্চারিত হোক ; বন্দেমাতরম্, জয় মা ভবানী, হর হর বমবম। এই পথেই সত্যিকার স্বাধীনতা।]

বঙ্কিমের স্বদেশী ভাবনা

শ্রীপ্রশান্ত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম্,—বার বার মন বলে—বন্দে মাতরম্—বন্দনা করি মাকে—সুফলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্—বরদীম্ তরণীম্, কিন্তু কে সেই মা যাঁর বন্দনাগানে উৎসারিত হয়েছিল সার্থক কবিকণ্ঠে মন্ত্রের মত উজ্জীবিত হয়ে—যার বিশুদ্ধ তেজ ওজঃবীর্য জাগিয়ে তুলেছিল পরবর্তীযুগে, আপামর জনসাধারণকে, হিমাচলের এক প্রান্ত থেকে সমুদ্র মেখলা বালুতট পর্যন্ত, নদনদী জনপদ প্রান্তর মাঠঘাট সব তালিয়ে দিয়ে, অপূর্ব শঙ্খধ্বনির গভীর স্বননে—বন্দেমাতরম্। বঙ্কিম সম্বন্ধে আজও আমাদের অন্যমনা হবার সীমা নেই, এই সেদিন তাঁর দুর্গেশ নন্দিনীর শতবার্ষিকী করলাম আমরা। আজও প্রশ্ন ওঠে এবং সঙ্গত ভাবেই যে বঙ্কিমের মাতৃবন্দনার সঙ্গে দেশাত্মবোধ কিরকমভাবে আমরা মেলালুম আত্মসাৎ করলুম। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি—এর পেছনে আছেন কোন স্বাদেশিক সত্তা?—জননী না জন্মভূমি, না লোকমাতা না অঘটন ঘটন পটিয়সী কালাতীতা।

সাতসমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে বণিকের মানদণ্ড যেদিন মারাঠা যোদ্ধা, রাজপুত শিবজাট, বাদিয়শা আকবর শা আবদালীকে পেছনে ফেলে অলক্ষিতে রাজদণ্ড তুলে নিলে সেদিন সত্যই এক যুগসন্ধিক্ষণের দিন—পূবৈয়া বায়ুর শন্‌শনের সঙ্গে মিললো পশ্চিমী বাতাসের ঝন্‌ঝন্। যমুনার কল্লোলের সাথে নদ্বতের তান যখন মিশিয়ে আসছে তখন গঙ্গার ঘাটে এসে লেগেছে সোনার তরীতে ভরা নতুন পসরা—জ্ঞানবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবোধের চেতনা, নূতন দিগ্‌দর্শন নূতন বেপরী ভাবনা। সেই আলোড়নে বেরিয়ে এলো চরণের দল—কেউ জ্ঞানী, কেউ গুণী, কেউ সন্তসাধু, কেউ শিল্পী, কেউ কর্মী, কেউ ভাবুক। এরা মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার হিউম কাঁট কোঁতের কথা বলে, সেক্সপিয়র, বায়রন, মিল্টন আওড়ায়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, যুক্তি তত্ত্ব, নিরীশ্বরবাদের সূত্র নিয়ে তর্ককরে, বলে নিজেদের মন দিয়ে, প্রাণদিয়ে, ভক্তি দিয়ে, শক্তি দিয়ে নিজেদের স্বর্গ নিজেরা রচনা করবো, সমাজকে গড়ে তুলবো। কেউ বললে এরা আলালের ঘরের দুলাল, কেউ বললে এরা খ্রীষ্টান, কেউ বললে এরা নবাবাবু বিলাসের আর এক সংস্কৃত সংস্করণ। কিন্তু এদের চোখে লেগেছিল বিশ্বামিত্রের, মহীয়াসের, চার্বাকের স্বপ্ন, আবার তথাগতের চৈতন্যের শঙ্খের ছায়া। সংখ্যাগণনার ইতিহাস হয়তো বলবে যে এরা 'প্রলেতেরিয়াত' নয়, এরা তাবেলিয়তার গড্ডালিকে দিলে কী আসে যায়—এখানে জীবনের সব চেতনার ভাষা বা ভাষ্য পাইনা আমরা। ইতিহাসের বাইরের মালমশলা খতখতিয়ান কি সাক্ষ্য দেবে জানিনা। কিন্তু অন্তর্জগতের মনি মন্দনে সেদিন যে নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল গঙ্গোত্রীর ধারা বেয়ে, তারই সুস্পষ্ট অনুরেখা উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁচেছে। সেই যোগল রসায়নের ফলভোগ আজ আমরা করছি,

বুকের প্রেম দিয়ে, ধমনীর রক্ত দিয়ে, বাহুর শক্তি দিয়ে প্রবন্ধিতের দাম দিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর তাঁরাই, যাঁরা শুধু পৃথিবীর কণ্ঠবিলগ্ন হয়ে যৌবনের গান শোনালেন আবার আকাশের দিকে চেয়ে বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশীকে খুঁজলেন, বন্দনা মন্ত্র পড়লেন তাঁর। তাঁরা পড়লেন 'টমাস লিভে লিবার্টে ক্লেটারনিতের কথা। শুধু পশ্চিমের জ্ঞান বিজ্ঞান নয়, ধর্মন রাষ্ট্রবোধ নয়, তাঁরা মাথা মেলালেন সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার কাছে, শুনলেন তার ইতিহাস, দেখলেন জন হাওয়ার্ড নির্জন দ্বীপে কুষ্ঠরোগীর সেবা করছেন, ক্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল করছেন, শুশ্রূষা, আব্রাহাম লিঙ্কন প্রাণ দিচ্ছেন, যাঁহুর যুদ্ধ করছেন পরের দেশের জন্য, ম্যাৎসিনি ম্যাৎসিনিজ্‌ম শৌর্য প্রকাশ করছেন, মিল বেন্থাম, কোঁৎ ভল্টেয়ার এঁদালস, ওয়াল্টস ইটম্যান স্বপ্ন দেখছেন, জড় বিজ্ঞান চেতনাকে নিয়ে আসছেন এডিসন ফ্যারাডে, হোপ্টা। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একজন এঁদেরই Representative men বলে স্মরণ করা যায়। আগে যার তুলিরই শব্দ বাজাবে এঁরাই সেই তত্ত্বিরের দল—বঙ্কিম লিখছেন তারই প্রতীক ঐতিহ্যবিদের ভাষায় বলা যেতে পারে, legend ও Symbol, স্বদেশপ্রেমের বাণীমূর্তিকে তিনি প্রকাশ করলেন দুটি কথায়—বন্দে মাতরম্। ঋষি বলি কাকে—যিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা, যিনি শুধু কবি নন, শুধু সাহিত্যরস রসিক নন্ যিনি মনীষি, পরিভূস্বয়ম্ভূ যিনি বীজে শক্তি বপন করে যান, যার অনুশীলনে মন্ত্রশক্তি হয় চলৎশক্তিমতী, সিদ্ধিদাত্রী, ঋদ্ধিময়ী, যার ক্রিয়াযোগ বলে অন্যরা, রূপ নেয় জ্ঞানের তপস্যায়,জনসেবার আত্মনিবেদনে। বঙ্কিমের মন্ত্র সেই অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও ত্রাণ শক্তির মিলিত ভেজকেই তপস্যার শুচিস্নিগ্ধ ক্ষেত্রে বন্দনা করলে। সেইজন্যই বঙ্কিমের "মা" দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বমাতা 'লোকমাতার পরিণত হয়েছেন স্বাজাত্য বোধ ও স্বদেশ বোধকেই ভিত্তি করে। বঙ্কিম Revivalist নন্, তিনি ভাবজগতের স্রোতা ও রসায়ন বেত্তা—রামমোহনে যার সূচনা দেখেছি, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয় দত্তে মাইকেলে নবীন সেনে যার ত্রয়ীভূতরূপ, বিদ্যাসাগরে কেশবে যার আর এক প্রকাশ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ যার চরম বিকাশ, বঙ্কিম মানসে তারই পূর্ব প্রস্তুতি— আমাদের পিতামহরা শুধু দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তির উইল, গোবিন্দলাল শৈবলিনী প্রতাপ রোহিণীকে নিয়েই থাকেন না, তাঁরা শুনতেন নূতন করে কর্মযোগের কথা, নূতন করে অনুশীলনের ছন্দ, নূতন করে কৃষ্ণ চরিত্রের ব্যাখ্যা। আনন্দমঠের কমলাকান্তের প্রবন্ধগুলো তারই। বঙ্কিম শতবর্ষ প্রতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বেশী বলেন—কমলাকান্তের রচনা আইডিয়ার Eldorado, পথেঘাটে মাণিক্যের টুকরো ছড়ানো।

বঙ্কিমের স্বদেশ ভাবনার বীজকে জানতে গেলে এই মূলজিজ্ঞাসার অন্তর্নিহিত সত্যকে বুঝতে হয়, তাই একথার অবতারণা করলাম। আর সেই সত্য ছড়িয়ে আছে শুধু তার গদ্যগদ্য উচ্ছ্বাসে নয়, যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে গল্পে তোলা নানা মতবাদে, নানা চরিত্রে, নানা ব্যাখ্যানে—বঙ্কিমকে শুধু আনন্দমঠ বা বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বলে নুতা করলেই তাঁর স্বদেশ ভাবনার মূল সূত্রটিকে পাওয়া যাবেনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে তাঁর কল্পনা ছিল, কিন্তু কাল্পনিকতা ছিল না—বঙ্কিম ছিলেন সাহিত্যে কর্মযোগী আর মনে রাখতে হবে বঙ্কিম যেদিন লিখতে আরম্ভ করেন সেদিন বাংলা ভাষা এক কোণে অবহেলিত—সে দরিদ্রের ঘরের মেয়ে, তার বাপের রাজত্ব ছিল না, রাপট্ ছিল না, সে সম্মান দিতে পারে না, অর্থ দিতে জানে না, সে পারতো কেবল ভালোবাসা দিতে—আর সেদিন ইংরাজী ভাষা ছিল শুধু রাজার ঘরের মেয়ে নয়, তার রূপ ও ঐশ্বর্য অতুল আর তার সম্পর্কে রাজপুরুষের ঘরে কিঞ্চিৎ সম্মানেরও প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু মজার কথা

এই যে এই স্বদেশ ভাবনা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ ইংরেজী শিক্ষারই ফল। ১৮৬২ সালে বঙ্কিম লিখলেন—যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হতে লাভ করছি তার মধ্যে আছে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠা। এর আট দশ বছর পরে আনন্দ মঠের আবির্ভাব। ১১৭৬ সালের সমচিহ্ন বিষ্ণুর পাদপদ্মের মতই। আজ পণ্ডিতরা তর্ক করুন আনন্দমঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা, পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য যদুনাথ কি বলেছেন, শ্রদ্ধেয় বিমান বিহারী মজুমদার মহারাষ্ট্রেই তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুন, আনন্দমঠের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা অর্ধেক বাংলায় লিখিত, বন্দেমাতরম গানটি (তনেছি উপন্যাসের একটি সংযোজন) বাঙালীর উদ্দেশে লিখিত বা ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত, বঙ্কিমের বন্দেমাতরমের "মা" কে। কিন্তু এসব প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে বঙ্কিম যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফল বন্দেমাতরম, এবং সে জন্যই উজ্জীবিত হয়ে উঠলো স্বদেশী যুগে শতবীণার বেণু রবে সহস্র কণ্ঠের 'মা' 'মা' ধ্বনিতে বন্দেমাতরমে। তার সার্থকতা ঐতিহাসিকতা নয়, সকলের প্রতিভূ মনে। এমন কি বিদেশী শাসকদের চিত্তেও বন্দেমাতরমের তাৎপর্য নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে—লণ্ডনের টাইমসে, এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায়, নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে 'বন্দেমাতরম' গানের উদ্দেশ্য নিয়ে হয়েছে আলোচনা। গ্রীয়ারসন্ লিখলেন এ তো কালীকলমে ভবপার স্তব, কটন্ সাহেব বললেন—মা মা এ হচ্ছে বাংলা মায়ের প্রশস্তিনা, যাকে বলি আমরা বাংলার মাটি, বাংলার জল। অক্সফোর্ডের বাংলা অধ্যাপক এডারসন মন্তব্য করলেন—বঙ্কিমের মায়ের কল্পনা শুধু কালী নয়, আরও আর এক দেবতা—ইনি কে—ইনি কি গণদেবতা ?

বঙ্কিমের কথাই তুলে দিই—

বিষ্ণুর অধোপরি এক মোহিনীমূর্তি, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা ।। সত্যই, বিস্ময়, দেব যক্ষ রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে··· !

ব্রহ্মচারী—বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ ?

মহেন্দ্র—দেখিয়াছি। কে উনি ?

ব্রহ্মচারী—মা।

মহেন্দ্র—মা কে ?

ব্রহ্মচারী—আমরা যাঁর সন্তান

মহেন্দ্র—কে তিনি ?

এ প্রশ্ন চিরকালের—বঙ্কিমের কল্পনা এক পূর্ণতমাকে সমাজ বিজ্ঞানে রাষ্ট্রে ধর্মচেতনায় স্বদেশভাবনায়, চারিত্রশক্তিতে, ত্যাগে নিষ্ঠায়, শিক্ষাদীক্ষায় সর্বতোভদ্রাকে চেয়েছিলো—তিনিই মা—তাঁরই কথা তিনি বলেছেন আনন্দ মঠে, দেবী চৌধুরাণীতে, কমলাকান্তের দপ্তরে, নানা প্রবন্ধ নিবন্ধে, এর জন্যই গীতার কর্মযোগ, এর জন্যই অনুশীলনের ছন্দ, এর জন্যই কোমতের পজিটিভিজমের ব্যাখ্যা, ইতিহাসতত্ত্ব পুরাণকাব্যের আলোচনা—শুধু রাষ্ট্র সাধনা নয়, তার সাধনা, শুধু আত্মত্যাগ নয়, সামুদর্বের মধ্যে আত্মবিনিয়োগও—তারই প্রতীক মাতা—তিনি দেশমাতা ত বটেই, আরো কিছু—যেখানে শ্রী ও ত্রী, যেখানে পূর্ণতা আছে সাফল্য আছে, বাণী আছে, বল আছে সর্বসিদ্ধিদাতা গণাধ্যক্ষ ঈশঃ আছেন, আর আছেন শিব যাকে শিবতর, শিবতম করতে হবে, তং হি দুর্গা—এই মহাপ্রকৃতিই পারে দুর্গতি নিবারণ করতে, সুস্থ করতে, স্বস্থ করতে, স্বাভাবিক জীবনবোধ ফিরিয়ে দিতে—বঙ্কিমের

বৃষ্টি তাই রাষ্ট্রযোগের চেতনা পেরিয়ে সাধারণ জন নিয়েছে, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ তারই যোগ্য উত্তর সূরী—এই মাতৃমন্ত্রের দীপশিখাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন—

তোমার পণ কি ?
পণ আমার জীবন সর্বস্ব
জীবন তুচ্ছ, পরকেই তাও করিতে পারে
আর কি আছে ? আর কি দিব ?
ভক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনায় ভক্তি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখা শক্তি হচ্ছে তার ইন্ধন (Bhakti is the leaping flame Shakti is the fuel), তারপর হল কর্ম, কর্মীরা হবেন নব সন্ন্যাসী নব ব্রহ্মচারী শান্তি সংঘের অন্তত: চার বৎসরের পূর্বে তাঁরা গৃহস্থাশ্রমে ফিরবেন না, তারপর চাই জ্ঞান, শুধু ভক্তি আর কর্মে কাজ হয়না। বঙ্কিমের অনুকরণে শ্রীঅরবিন্দের ভবানী মন্দিরের কল্পনা বঙ্কিমের স্বদেশ ভাবনা পরিস্ফুট হলো—যা যা ছিলেন,—যা এখন যা আর যা যা হবেন, ত্রিকালের ত্রিরূপে ত্রিগুণান্বিতা।

এলো, মায়ের ডাক শোন আহ্বান এসেছে—তিনি তো বলে আছেন আমাদের প্রকৃতমনে পূজার জন্য, দেখা দেবার জন্য, পরিস্ফুট হবার জন্য সেই ভাগবতী শক্তি তো তমসাচ্ছন্ন, তাইতো তাঁর কাজ হচ্ছে না, তাঁর সন্তানরা তাঁকে ডাকছে না, সাহায্য চাইছে না। তুমি যদি শুনে থাক তাঁর ডাক, তোমার বুকে যদি শুনতে উঠে থাকে তাঁর পদধ্বনি তবে ছিঁড়ে ফেলো তোমার আর্থের কালো পর্দা, ভেঙে ফেলো আলস্যের অহমিকার অচলায়তন—তাঁর ডাক যারা আমাকে আঘাত কর—মাতৃপূজার অঙ্গনে এলো সবাই।

—যে যা পার তাই নিয়ে এলো—যেটুকু সাধ্য পূজার তাঁর, দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, অর্থ দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে,—দিতে ভোলোনা—বরপুত্র সবে বিরাজ যে !

শ্রীঅরবিন্দের চেয়ে বঙ্কিমের বড় ব্যাখ্যাতা বোধহয় আর কেউ নেই। আজ যখন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পেয়েও আমরা চতুর্দিকে অন্ধকার দেখছি যখন দিগন্তে কাল বৈশাখীর ঝড়ে আমরা বিক্ষুব্ধ, যখন সর্বস্তরে কল্যাণ চেতনা লুপ্ত, যখন অরসিকা জনগণ ঘোর ঘোর, কালোবাজারী হিংসা বিদ্বেষ আমাদের শুভ চেতনাকে লুপ্ত করছে, সাহিত্যকে বিলিয়ে দিচ্ছে সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করছে, মানুষের মনকে ভেঙে দিচ্ছে, যখন ক্ষুধার ফোটে না অন্ন, তৃষ্ণায় নেই পিপাসারে জল মনমন্থ ভরে ওঠে মারী বীজে, শস্যের ক্ষেত্র হয় বন্ধ্যা, যখন রোগে ফোটে না এক কোটা ওষুধ, মাথার উপরে নেই আশ্রয়, যখন জীবনের মান যায় নেমে, নারী হয় পণ্যা, পুরুষ কামক্লেদপরায়ণ, রীতি ও নীতির শুচিশুভ্রবোধ তিরিত, তখন মনে হয়—বঙ্কিম Thou shouldst be living at this hour.

বিলে যাক বঙ্কিমের উজ্জীবন মন্ত্র, আর বিশ্বামিত্রের কর্মচাঞ্চল্য সাত্ত্বিক চিন্তার সঙ্গে রাজসিক কর্মোদ্যম নূতন জীবনবাদের সঙ্গে নূতন জীবনবোধ যা হবে নবজীবন বেদ বঙ্কিম, তুমি তো সেই স্বপ্ন এনেছিলে—

তুমি এলো, কাঁপুক আমার বুক
তুমি এসো আসুক আমার দুখ
তুমি এলে, এলো তোমার আগুন জ্বলা আনন্দ
জীবন-মরণ দুফান তোলা হাতুল বসন্ত।

দুর্গত মহানগরী

পার্কে, পার্কে,
অমর কীর্তি
এই সেই মর্মর মূর্তি

রাজপথের আহ্বান—
লাক্সলি প্যারিস শিকচারস স্টার।

মাঠে ময়দানের

"এপিসোড্"

মন্ত্রণালয়ের অবস্থা—

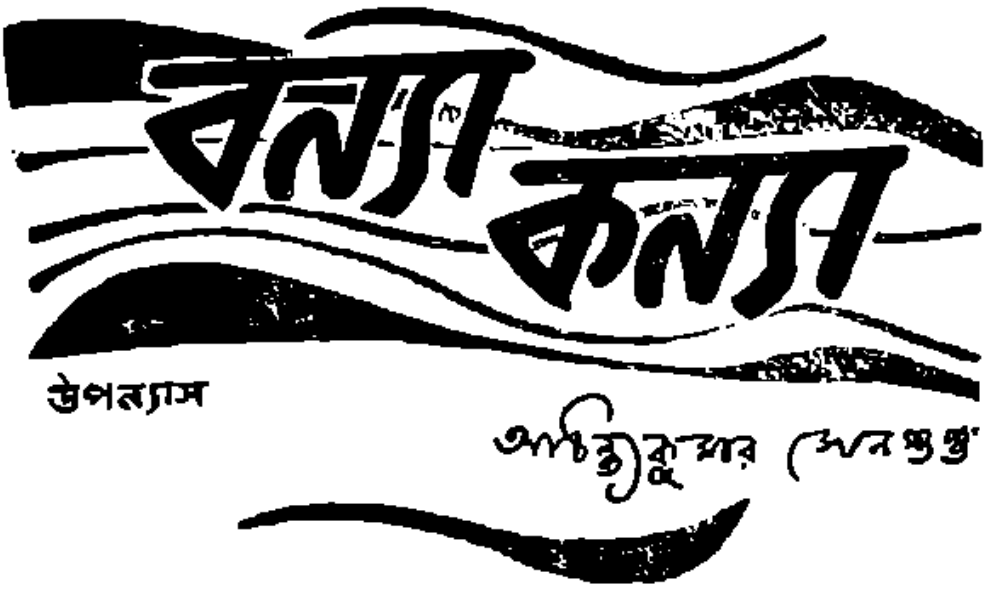

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'কদ্দূর যাবেন?' দুই চোখে দীর্ঘ আশা নিয়ে তাকাল হিমাংশু।

'বেশি দূর নয়। এই কাছেই—'বনছায়া কুণ্ঠিত হবার ভাব করল।

বেশিদূর নয় কেন, চলুন না, দক্ষিণে-উত্তরে গা-ঢালা হাওয়া-খাওয়া রাস্তায় বেশ খানিকটা ঘুরে আসি, বলতে একবার ইচ্ছে হল হিমাংশুর, কিন্তু কেমন-যেন শঙ্কা শোনাবে ভেবে বললে না। সম্ভ্রান্ততার পথ ধরে এসেছে, সম্ভ্রান্তই থাকা উচিত।

'কোনো দোকানে যাবেন?' আলাপটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই জিজ্ঞেস করল হিমাংশু।

'না, এক আত্মীয়ের বাড়ি যাব।' সায়ন্তনের আভা-মাখানো মুখে বললে বনছায়া।

ড্রাইভারকে নিশানা দিয়ে বনছায়া যে এলেকায় গাড়িটা নিয়ে এল, হিমাংশুর মনে হল, দুঃস্থ আত্মীয়।

মনে হল হিমাংশু কি তার কোনো উপকারে আসতে পারে না? কেননা আজকের তার এই আনন্দের মুহূর্তে বনছায়ার আশে-পাশে কোনো দুঃখ-দারিদ্র্য থাকে এ যেন মনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কষ্টকর।

হয়তো, কে জানে, সেই দুঃস্থ আত্মীয়ের কথা ভেবেই বনছায়া সম্প্রতি একটু গম্ভীর।

'এইখানে দাঁড়াবেন।'

'এইখানে?' চারপাশে তাকাল হিমাংশু।

কিন্তু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। আজকে থেকে গাড়ির কর্ত্রী কে, ড্রাইভারের বুঝে নিতে দেরি হয়নি।

গাড়ি থামতেই বনছায়া নেমে পড়ল।

'আমি কি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব?' সন্দেহে জিজ্ঞেস করল হিমাংশু।

'অপেক্ষা করবেন?' প্রস্তাবটা অসঙ্গত নয় ধরে এমনি একটু কোমলতা আনল বনছায়া, পরে বললে, 'কী দরকার! আত্মীয়-বাড়ি তো, দেরি হতে পারে।'

'কিন্তু তুমি ফিরবে কী করে?' সে সম্পর্কেও বুঝি আগে থেকে হিমাংশুর ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার।

'ট্যাক্সি করে ফিরব।'

চলে যাচ্ছিল বনছায়া, হিমাংশু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'সে তো পত্রিকা আপিসে।' মিষ্টি হাসতে হাসতে বললে বনছায়া।

'আমি কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাকে তোমার অফিসে ফোন করব।'

'করবেন। আমিও ছাড়ব না।' আর না দাঁড়িয়ে পা চালাল বনছায়া।

কিন্তু যেতে-যেতে হিমাংশু এক পলক লক্ষ্য করে দেখল বনছায়া ডাহে-বাঁয়ে কোনো বাড়ির দিকে গেল না, পাশেই আরেকটা রাস্তায় ঢুকল। সে রাস্তায়ও তো গাড়িটা অনায়াসে যেতে পারত, বনছায়াকে একেবারে তার নির্দিষ্ট দিতে পারত পৌঁছে।

বনছায়া বুঝি ক্রমেই দূরে সরল। বাড়িটা এখুনি চিনতে রেখে কী দরকার।

'এই' বলে ডাকবার আগে বনছায়া একবার তাকিয়ে দেখল হিমাংশুর গাড়িটা তাকে অনুসরণ করছে কিনা। না, গাড়ি-টাড়ি কোথাও কিছু নেই। গায়ের আঁচলটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বনছায়া ডেকে উঠল: 'এই!'

আলো-আলা ঘরে টেবিলে বসে লিখছিল সুবীর, ডাক শুনে চমকে উঠল। শুধু চমকে উঠল না, উথলে উঠল।

'আমার বন! আমার বনের বাতাস!' লাফিয়ে উঠে দরজা দুহাতে খুলে দিল সুবীর। দু' ছত্র কবিতা আওড়ে বলল: 'প্রত্যহ যে প্রার্থনার বনের বাতাস এসেছিলো—সে কি এলো? সে কি এলো?'

উচ্ছ্বাসের পাশ কাটিয়ে টেবিলের সামনে পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ল বনছায়া। বললে, 'একটা চিঠির কাগজ আর কলম দাও।'

'কিছু লিখবে? কী লিখবে?'

'তোমার জন্যে সেই লেটার অব রেকমেন্ডেশন—' চোখে ঝিলিক দিল বনছায়া।

'দাঁড়াও, লিখো—রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে না—ইন্টারভিউ তো কাল সকালে।' পাশের ড্রয়ারগোছে বলল সুবীর: 'খাস্ত হয়ে চুপচাপ বোসো। তোমাকে খানিকক্ষণ স্থিরচিত্রে দেখি।'

'স্থিরচিত্রে?' ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত করল বনছায়া।

'স্থিরচিত্রে নয়, স্থির চিত্রে।'

'মুহূর্তের জন্যে স্থির থাকতে পারছি-না—জীবন এখনি উত্তেজনা। তাছাড়া আর বলতে-দাঁড়াতে রাজি নই, এখন শুয়ে পড়তে পেলে বাঁচি।' টেবিলের উপর থেকে বনছায়া নিজেই কাগজ ও কলম কুড়িয়ে নিল। বললে, 'কী ভাবে লিখি বলো তো—যার কথা সেদিন আপনাকে বলেছিলাম, না যে এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছে সে—না কি সোজাসুজি পত্রবাহক লিখব?' সুবীরের চোখে চোখ রাখল বনছায়া।

'তার চেয়ে পত্রবাহক লেখো।'

মুচকে হাসল বনছায়া: 'সতীর মানেটা বুঝতে পারবে না, ফিল অব দেন ভাববে।'

'কিন্তু তার কাছে পাঠাচ্ছ বলো তো ?'

'হিমাংশু চ্যাটার্জি।'

'কে সে ?'

'আমার বড়দার বন্ধু। করেন কী সব ডিগ্রি নিয়ে এসে কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম খুলে বসেছে। হাতে অনেক চাকরি আছে বলে শুনেছি। তোমার একটা হয়ে যেতে পারে।'

সুধীরের চোখে-মুখে কৌতুক জ্বলে উঠল : 'তোমার একটা চিঠিতেই হয়ে যাবে ?'

'মানে, সেদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, কথায়-কথায় আমাকে জিজ্ঞেস করলে ওর হাতে আনাশোনা কোনো রিলায়েবল লোক আছে কিনা, কয়েকটা ডেকোলি ফিল-আপ করা দরকার। আমি বললাম আমার কাছে একজন আছে। মিস্টার চ্যাটার্জি বললে, পাঠিয়ে দেবেন, দেখব। তাই তোমাকে একবার যেতে বলা। যদি হয়ে যায় তো মন্দ কী। মাইনেটা নিশ্চয়ই বেশি হবে।'

'তুমি পাঠাচ্ছ তাই যাব। যেখানে পাঠাবে সেখানে যাব। কিন্তু আমিও জানি তুমিও জানো, কিছু হবে না।' আনন্দিত ঔদাসীন্যে হেসে উঠল সুধীর।

'না হয় তো না হবে।' ক্ষুব্ধকণ্ঠে অস্ফুটে বলে উঠল বনছায়া। মনে মনে ভাবল, না হলে তো সেটাই প্রত্যাখ্যানের নিটোল কারণ হতে পারবে। স্পষ্টস্বরে বললে, 'চিঠির কী দরকার! তুমি অমনি আমার নাম করে দেখা করো না—'

'তোমার নাম করে ?'

'না বাপু, কর্ম্যাল একটা চিঠি দিয়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু,' মুখটিপে হাসল বনছায়া : 'কিন্তু পত্রবাহকটা ভালো লাগছেনা, কী রকম বেয়ারার বেয়ারার শোনাচ্ছে। তার চেয়ে লোক লিখি—এই আমার লোক—যে লোকের কথা আপনাকে সেদিন বলেছিলাম—'

'তার চেয়ে সোজাসুজি ইংরিজিতে লেখ, আরাম পাবে।'

'ঠিক বলেছ। ইংরিজিতেই লিখি।'

'কিন্তু তাই বলে আমার লোক-এর ইংরিজি মাই ম্যান লিখো না। মাই ম্যান-এর কিন্তু অন্য মানে।'

'কী মানে ?'

'মাই ম্যান মানে আমার পুরুষ।'

'তাহলে চাকরিতে কাঁচকলা।' মুখ তুলল আবার বনছায়া : 'দরকার নেই ইংরিজিতে —বাংলাই ভালো। যে ভদ্রলোকের কথা বলেছিলাম—কিংবা ইনিই আমার সেই চেনাশোনা ভদ্রলোক—'

সহাস্যে সুধীর কাতরোক্তি করে উঠল : 'ভদ্রলোক! শেষকালে তুমি আমাকে ভদ্রলোক বানিয়ে ফেললে—'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোকই ভালো।' নিচু হয়ে লিখতে লাগল বনছায়া।

'তুমি পণ্ডশ্রম করছ, কিছু হবে না।'

'তোমার তো শুধু 'কিছু হবে না'।' দু চোখে মণির চিরকার পুরে বনছায়া বললে, 'তোমার জীবনে আমিও তো কিছু হইনি।'

'উঃ, ভাবা যায় না, কল্পনা করা যায় না, তুমি সত্যি সত্যি আমার হয়েছ, আমার হবে!' উদ্দীপনায় উঠে পড়ল সুবীর : 'তারই জন্যে তো আমি কিছু মানিনা।'

'মানো না?'

'কিছু মানি না। সব এলোমেলো, সব খামখেয়াল—শুধু আচমকার চমক। নইলে আমার মতন দরিদ্র অকিঞ্চনের ঘরে তোমার মত রাজেশ্বরী! আমার দুই হাত ভরা অমরাবতীর ঐশ্বর্য।' হঠাৎ চোখের পিছন দিক থেকে ঝুঁকে পড়ল সুবীর। বললে, 'শোনো, চিঠি থাক। আমি এমনি গিয়ে দেখা করি, বলি বনছায়া পাঠিয়েছে।'

'কেন, চিঠিতে দোষ কী?' বনছায়া ঘাড় বেঁকাল।

'আমার মুখের উপর 'না', বলে, আমার গায়ে লাগবেনা। কিন্তু তোমার চিঠি যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে অপমানের মত মনে হবে। আমি বলি, মিছিমিছি গাল বাড়িয়ে চড়টা খাও কেন?'

'আচ্ছা, এতে আবার অপমান কোথায়? দুনিয়ার সকলের কাছে সব ব্যবস্থাই মঞ্জুর হয় নাকি? তবু চেষ্টা করা দরকার।' নিচু হয়ে লিখতে লাগল বনছায়া : 'গাল বাড়িয়ে চড় যদি খাই তো গাল পেতে তোমার কাছ থেকে উপশম নেওয়া যাবে।'

'না, লেখ। লিখে যাও। বলা যায়না। হাতের লেখার একটা আলাদা শক্তি আছে।'

'যদি অবশ্যি তাতে ধানাই পানাই না থাকে।' হাসল বনছায়া।

'যাহোক, তাড়াতাড়ি করে দু লাইন লিখে শেষ করে দাও তো।'

আবার হাসল বনছায়া। বললে, 'তাড়াতাড়িই তো করছি কিন্তু শেষ করতে পারব কিনা জানা নেই।'

'দরকার নেই জেনে। চিরন্তন আরম্ভের রোমাঞ্চ নিয়েই দিন আমৃত্যু দিন থাক। এখন তুমি উঠে এস তো?'

'কোথায়?'

'তুমি বলছিলে না শুয়ে পড়তে পেলে বাঁচো—'

'হ্যাঁ, দাঁড়াও, আর দু'লাইন বাকি। তোমার কাছে পাখা আছে?

'সব আছে। দু হাত ভরা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য আছে। বল, বলের বাতাস, তুমি সত্যিই আমার বুকের নিশ্বাস হতে এসেছ?' চোখের পিছন দিক থেকে বনছায়ার পিঠের উপর দিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল সুবীর : 'কই আমার দুই কই?' সেদিন দুটি কবিতার চরণের মত তোমার দুখানি পা ধরেছিলাম—'

'আজ এই যে তোমার দুই।' দু কাঁধের উপর দিয়ে সুবীরের দুহাত নিজের দুহাতে ধরে সামনের দিকে টেনে নিল বনছায়া। বললে, 'আমি ধরব তারে ভরব তারে রাখব তারে সাধে।'

'তোমার আর বুঝি দুই নেই?'

'ও, হ্যাঁ, এই যে।' বনছায়া সুবীরের দুহাত এবার তার দু চোখের উপর রাখল।

দুজনেই সমস্বরে খিলখিল করে হেসে উঠল।

হুরন্ত—হুরন্তের শিরোমণি।

তারপরে খালা খামে চিঠি পুরে ঠিকানা লিখে নিখুঁত করে দিল বন্ধ।

'চিঠি চুলোয় যাক,' সুধীর দৃঢ়স্বরে বললে, 'কালকেই রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে দুজনেই বিয়ের নোটিশ দিয়ে আসব।'

'কাল না হলে তরশু।

'পরশু না হয়ে তরশু কেন?' সুধীরের বুক বুঝি কেঁপে উঠতে চাইল।

'কাল শনিবার, তাই পরশু—'

'ঠিক বলেছ, তরশু সোমবারেই নোটিশ হবে। কিন্তু কাল শনিবার ইন্টারভিয়ুর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে তো?'

'নিশ্চয়ই হচ্ছে।'

'কোথায়?'

'কেন, কাল আমি আসব বিকেলে। আচ্ছা, তোমার ঘরের তালার একটা ডুপ্লিকেট চাবি আমাকে দিতে পারো? তাহলে আমি তোমার আগে এসেই ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করতে পারি। ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে রাখতে পারি। তুমি এসে দেখ আমি তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছি।'

'সে কি, তুমি একলা ঘরে দরজা খুলে রেখে ঘুমুবে নাকি?'

'যা, তা কেন?'

'আমি বন্ধ দরজায় ধাক্কা মারলে তুমি তো ভেতর থেকে খিল খুলে দেবে।'

'তা দেব বৈ কি।'

'তাহলে আর তোমাকে ঘুমন্ত দেখব কী করে?' সুধীর সরে গিয়েছিল আবার ঘনিয়ে এল। বললে, 'কাল জগৎ সংসারের কী অবস্থা হবে কে জানে। বরং আজই যদি খানিকক্ষণ চোখ বুজে স্থির হয়ে থাকতে পারো আমি কবির স্পর্ধায় ভেবে নিতে পারি তুমি ঘুমিয়ে আছ, আমি কী দেখছি তুমি তা দেখছ না।'

'সোমবার।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বনছায়া।

'আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি যদি জানতে চায় আমি কে, কী বলব?'

'ঠিক কথাই বলবে।'

'কী ঠিক কথা?'

'বলবে আমি কবি।'

'তাহলে তুমি দরজার দিকে আঙুল দেখাবে।' সুধীর আরেকটু স্পষ্ট হতে চাইল: 'যদি জিজ্ঞেস করে তোমার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'বলবে চেনাশোনা।'

'এর বেশি কিছু নয়?'

'দরকার কী ঘরের কথা পরকে বলে।'

'ঠিক বলেছ, মন করে বললেও যা তরল করে বললেও তাই। যোগফল সমান। একশো বাষট্টি একশো বাষট্টিই থাকবে।'

'থাক। আমি আছি না? আমার আড়াই শো আছে না?'

'আমাদের সাহিত্য আছে না? ভালোবাসা আছে না? আমাদের কে হারায়? কাল এস। না হয় একটু দেরি করেই এস। ড্রয়িংকেট চাবি সোমবার অফিসে দেব।'

শনিবার যথাসময়েই হিমাংশুর অফিসে গিয়ে হাজির হল সুবীর।

চিরকুট না পাঠিয়ে খাকি-মোড়া বনছায়ার চিঠিটাই বেয়ারার হাতে চালান করে দিল।

আসতে বলো।

ভিতরে ঢুকে সুবীর দেখল বনছায়ার লেখা চিঠিটাই পড়ছে হিমাংশু। এত বড় চিঠি নয় যে বুঝতে সময় লাগবে। তবে মুখের উপরে সরাসরি 'না' বলতে হলে একটু ভেবে নিতে হয় বৈকি।

সুবীরের মনে হল হিমাংশু চিঠিটা পড়ছে না, বনছায়ার হাতের লেখাটাই দেখছে তন্ময় হয়ে।

কিংবা হয়তো দেখছে তার স্পর্ধাটাকে। এমন একটা অনুরোধও কেউ করতে পারে—দেখছে তার অবাস্তবতাকে।

আচ্ছা, দেখলাম, সময়মত খবর দেব—কিংবা, এমনি কিছু ডেফেলি কিন্ড-আপ হচ্ছে না, ছমাস পরে খোঁজ নেবেন—এমনি কী পালটা উত্তর দেওয়া যায় তারই উপযুক্ত ভাষা খুঁজছে হয়তো।

কিন্তু মাথা তুলে এক নজর দেখে প্রথম কথাই হিমাংশু বললে, 'আমি দুশো টাকা দিতে পারি। এতে কি আপনার পোষাবে?'

'খুব পোষাবে। একশো বাইশটা পাচ্ছিলাম—' সুবীর অবিশ্বাস্য খুশি হল, কিন্তু বিনয় বজায় রেখে জিজ্ঞেস করলে, 'কাজ কী করতে হবে?'

'তা কিছু খাতা দেখা নকল করার কাজ—বিশেষ অসুবিধে হবে না।' আবার সুবীরের মুখের দিকে তাকাল হিমাংশু: 'কবে থেকে আসবেন? পরশু, সোমবার?'

'সোমবার?'

'কেন, অসুবিধে হবে?'

'না, অসুবিধে নয়।' সুবীরকে একটা ঢোক গিলতে হল: 'অফিস থেকে একটা ছাড়ান নিতে হবে তো! আমি বলছিলাম—'

'বলুন, কোন দিন থেকে আসবেন?'

'ধরুন, মঙ্গলবার।'

'বেশ, তাই হবে। তাই আসবেন।' হিমাংশু আবার তাকাল: 'বসবেন?'

সুবীরের কাণ্ডজ্ঞান মাথা চাড়া দিয়ে উঠল: 'তার আর কী দরকার! কাজ তো হয়ে গেল।'

বনছায়ার কাছে কী ভাবে রিপোর্ট হয় কে জানে, তাই একটু দ্বিধাগ্রস্তের মত প্রশ্ন করল: 'চা খাবেন?'

কেরানির সঙ্গে বসে প্রভু আবার কবে চা খায়, সুবীর আবার কাণ্ডজ্ঞান দেখাল, বললে, 'দরকার নেই। আমি বিল ব্যানার্জিকে বলব।'

বনছায়ার চিঠিটা আরেকবার পড়ল হিমাংশু।

ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই সুধীরের মনে হল তক্তপোষের উপর বনছায়াকে ঘুমন্ত দেখবে। ঘুমন্ত বনছায়াকে দেখবে না, দেখবে বনছায়ার ঘুমটুকুকে। ঘরজা জানলা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেবে, বনছায়া টেরও পাবে না। তারপর সে সেই ঘুমের অন্ধকার ঘরে নিবিড় মমতায় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

ভয়ে ভয়ে ধীর পায়ে বনছায়া দরজায় এসে দাঁড়াল।

'এসেছ? এ অন্যায়, এ অবিচার। এ কখনো হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়!' প্রায় বিদ্রোহীর মত আস্ফালন করে উঠল সুধীর: 'তাই তো আমি কিছু, মানিনা, ধরি না—কোনো নিয়ম নেই শৃঙ্খলা নেই, সমস্তই একটা অর্থহীন প্রলাপ—'

'কেন, 'না' করে দিল?'

'না করে দিলে তো যুক্তির কোথাও একটা ছন্দ আছে, বিচার আছে। নইলে ভাবতে পারো, প্রথম কথাই বললে, চুপোতে রাজি আছি কিনা আর দ্বিতীয় কথা বললে, সোমবারই যেন অয়েন করি। আমার মত অকৃতী অধমের কপালে এত আনন্দ, এ কি ভাগ্যের অপচয় নয়?'

'সোমবারই অয়েন করবে তো?'

'আমি মঙ্গলবার চেয়েছি। সোমবার তো আমাদের বিয়ের নোটিশ।'

'সেটা বলেছ নাকি?'

'না, না, কিছুই বলিনি। শুধু ভাবছি এমন অঘটন ঘটল কী করে? এ কি শুধু ভাগ্যলিপি, না, তোমার হাতের লেখা?'

বনছায়া সুধীরের কাঁধে হাত রাখল। কানে কানে বললে, 'এ শুধু প্রেমের বর। ভালোবাসার অমরাবতী।'

সোমবার ডুবলে গিয়ে যথারীতি নোটিশ লটকাল।

আর মঙ্গলবার নতুন কাজে অয়েন করল সুধীর।

এখন তিরিশ দিন শুভেচ্ছাতে চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারলেই প্রশান্তি। [ক্রমশঃ

বিশ্বসাহিত্য

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ ঃ

পৃথিবীর প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের (বন্দীজীবনে) সাহিত্য সাধনা।

রত্নাকর

আর্টের প্রমাণ রুচির পথে ; সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়।

.....তারে বলে আর্ট, না বলা যাহার কথা।
ঢাকা খুলে বলা, সে কেবল বাচালতা।

রবীন্দ্রনাথ

নাট্য চিন্তা

সংস্কৃত নাটকের মধ্যে কালিদাস থেকে আরম্ভ করে অভিনয়ের নির্দেশে তিনটি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে.—"নাটয়তি", "রূপয়তি", "সূচয়তি"। প্রাচীন টীকাকারেরা এবং আধুনিক পণ্ডিতেরা পদ তিনটি সমার্থক মনে করেছেন, কিন্তু অনুধাবন করলে, পুরানো নাটকে বিশেষ করে কালিদাসের নাটকে ও দৃষ্টকটিকে, তিনটি পদের পৃথক পৃথক অর্থ ও তাৎপর্য্য বোঝা যায়। বিনা কারণে কালিদাসের মতো লেখক একই অর্থে তিনটি আলাদা আলাদা ধাতুর পদ ব্যবহার করবেন না। সংস্কৃত ভাষায় সমার্থক ধাতু অনেক আছে। কালিদাস ও অন্যান্য কবিরা তা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সে কাজ করেছেন ছন্দের প্রয়োজনে। নাট্য-নির্দেশ ছন্দে নয়, গদ্যে—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায়। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে ক্রিয়াপদ তিনটির অর্থের মধ্যে অবশ্যই কিছু ভেদ ছিল। নিরুক্তের থেকে এবং কালিদাসের প্রয়োগ থেকে পদ তিনটির অর্থভেদ বোঝা কঠিন নয়।

"নাটয়তি" মানে "নাকানাকি, ঘোরাফেরা, প্রবেশ অথবা নিষ্ক্রমণ করছে।" "রূপয়তি" মানে "ভাব দেখাচ্ছে!" "সূচয়তি" মানে "ইঙ্গিত করছে, কথা অগ্রসরণের অথবা ইষৎ অগ্রগতির দ্বারা জানাচ্ছে।" প্রথম দুটি পদ মানুষ-অভিনয় ও পুতুলনাচ দুয়েতেই সমান খাটে, তৃতীয় পদটি মানুষ-অভিনয়ে বেশি খাটে, পুতুলনাচে কম।

শ্রী সুকুমার সেন

আলোচনা

লেটোর পালা

লোক সাহিত্যে লেটোর পালার বিশেষ উল্লেখ নেই। কিন্তু পল্লীবাংলার কয়েক স্থানে, বিশেষ করে কোলিয়ারি অঞ্চলে এই পালার একদিন খুব চল ছিল। পালাগুলি পাড়াগাঁয়ের সম্পূর্ণ অশিক্ষিত বর্ণকরের জন্যেই রচিত হত এবং তারাই সেই পালার আসরে অবতীর্ণ হত। পল্লীর ভদ্রলোক মাতব্বররা সে আসরে যেতেন না। কিন্তু সেই সব পালাগুলির মধ্যেও পল্লী বাংলার যে মানসচিত্র ফুটে উঠেছে তা উপেক্ষণীয় নয়।

একটি লেটোর পালা সংগ্রহ করেছেন শ্রীপাঁচুগোপাল রায়। পালা নাটকের বৃত্তটি এখানে উদ্ধৃত করা হল। এই নাটকে যুবরাজ শ্রীরায় বলছেন—"এই পালা নাটকটির নাম—'বিষম সমস্যা'। আমাদের কোলিয়ারির অদূরে এই পালাটি মাঝে মাঝেই অভিনীত হত। ছোটলোকেরা আমোদ করে, তাকেই বলে লেটো। ভদ্রলোকের শোনার যোগ্য নয়। এই রায় দিয়েছিলেন আমার ন'কাকা। তার মানে আমরা যেন তার ঘরের কাছে ঘেঁসি না। অথচ আমাদের গাঁয়ের লেটো হল ডাক-সাইটে। সারা কোলিয়ারি অঞ্চলে তার নামডাক। বড় বড় আয়গায় বাঁধা আসর। যদুল সেখ তার বেহালাদার আর নিবারণ বাউড়ি অধিকারী। নিবা বাউড়ি ওর মধ্যে লেখাপড়া জানা। সুরেন্দ্র আসরের পাঠশালায় প্রথম ভাগ ছেড়ে দ্বিতীয় ভাগ ধরেছিল। পাঠশালায় একধারে নিমতলায় একটুকরো চটের উপর বসে পড়া করত। ধলের খাতাটি তার হাতে থাকত। চেহারাটাও তার ভাল ছিল। রঙ কালো হলে কি হবে বেশ পুষ্ট গোলগাল হাত পা আর ফুলো ফুলো গাল। রাজার পাট করত ভারি তরাট গলায়। বাজনার মধ্যে বেহালা প্রধান। অধিকাংশে সময় আড়ালে থাকলেও উত্তেজনার মুহূর্তে উঠে দু-একটা ঝালার দেখাতেও আপত্তি নেই। লম্বা বেণী, লাল আলপাকা শাড়ী, আর সারা গায়ে লাল সাদা আবির আর সকেদা মেখে নাথু বাউড়ি মেয়ে সাজত। এক সময়ে সেই রাণী, অন্য সময়ে সেই আবার মেথরানী। প্রেমের পালাতে নায়িকাও আবার সেই। নাথুর সাধারণ অবস্থাতেও কথাবার্তা চলন বলন মেয়েদের মতন। তাকে হাত নেড়ে নেড়ে বুড়ি মাথার সারের গাড়ি বোঝাই করতে দেখলে আমরা হাসতুম। আর অভিনেতা হল শশী ডোম। তার কথাবার্তায় অসাধারণ সংযম। সব পালাগানে তার সমান আদর। মনসার ভাসানে বেহুলা সাজে, এখন সেজেছে মন্ত্রী।

দৃশ্যারম্ভ

সভার মধ্যে এসে মন্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

মন্ত্রী-বৌ বললে, হ্যাগো, তুমার হল কি? মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে।

মন্ত্রী বললে, মোটা রাজ্যের ভাবনা এই মাথার উপর। মাথায় হাত না দিয়ে উপায় আছে।

মন্ত্রী-বৌ বললে, তুমর ভাবনা রাখ। এখন কিছু খাবে চল।

মন্ত্রী বললে, কি রেঁধেছ?

বৌ বললে, কাঁচা মাছ দিয়ে লাউয়ের শাক।

শুনেই মন্ত্রী গুড়ুক করে একটু জিভের জল টেনে বললে, আর ?

বৌ বললে, গোটা সরষে ছড়িয়ে পোয়াল ঘাড়।

মন্ত্রী বললে, আর ?

বৌ বললে, আর আছে পাস্তাভাত জামবাটিতে ভিজানো।

মন্ত্রী বললে, আর ?

বৌ বললে, আর ঘরের গাছের লেঁপুয়ে গোটাকতক খাবড়ে দিব খাবি যখন।

মন্ত্রী বললে, তাহলে আমি আড়াই করে তেল মাখি।

বলে নিজের শরীরের ওপর হাত বুলিয়ে তেল মাখার অভিনয় করতে লাগল।

মন্ত্রী-বৌ জামবাটিতে ভাত এগিয়ে দিয়ে বললে, নাও, ভাত কটা হাম্‌রাম্‌ করে খেয়ে ফেল। রাজ্যের ভাবনা ভেবে ভেবে হত্তোক্কিয়ে করে প্রাণটা দিবে নাকি ? শরীলে যে বাতা ধেইয়ে গেছে।

মন্ত্রী খেতে বসেছে এমন সময় আসরের বাইরে থেকে ডাক এল, মন্ত্রী আছ ? মন্ত্রী ?

মন্ত্রী বললে, বলছি। কেনে ?

বাইরে যে ছিল সে আসরে ঢুকল। রাজার পেয়াদা।

বললে, রাজা মশায় তলব করেছেন। খুব জরুরি তলব। বলে সে চলে গেল।

শুনেই মন্ত্রী চঞ্চল হয়ে কাঁপতে লাগল। বৌ উঠে আসবামাত্র সে খুব স্বাভাবিক হয়ে বৌকে বললে, দেখেছিস বেপি, রাজামশায় আর রাজ্যের ভাবনায় আমার খাবার খাবার সময় নাই। রাজামশাই ডেকেছেন। আমি চললাম।

মন্ত্রীর প্রস্থান হল। মাঝে সে আসর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার উঠল রাজা মশায়। তারিক্কি চেহারা, তারিক্কি গলা, বড় রাজপাট্টা পাগানো। (সেইটি বোধ হয় রাজার চিহ্ন)

আসরের বাইরে মন্ত্রী ডাকলে, রাজামশায়।

রাজা বললে, অগ্রসর, মন্ত্রী।

মন্ত্রী আসরে ঢুকল। ঢুকে এগিয়ে দিয়ে বললে, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, হুজুর ?

রাজা বললে, হ্যাঁ। পড়েছি এক বিষম সমিস্যের। এই সমিস্যের ভাবনায় আমার সারারাত মাথা গরম, ঘুম নাই। এই সমিস্যের ভাঙানি যে দিতে পারবেক সে যদি পুরুষ হয় তাকে আমি অর্ধেক রাজত্ব দিব আর যদি স্ত্রীলোক হয় তো তাকে আমি বিয়া করব।

মন্ত্রী বললে, সমিস্যেটা কী মহারাজ ?

রাজা বললে, আকাশে কী নাই ?

মন্ত্রী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল। তারপর বললে, বলেন কী !

রাজা বললে, হ্যাঁ। তুমি সমস্ত শহরে ঢোল দিয়ে দাও। এর ভাঙানি আমার চাই। একদিন মাত্র সময় দিলাম। তার মধ্যে না পেলে তুমার গর্দান যাবেক।

রাজা বসে পড়ল। মন্ত্রী বৌ উঠল।

মন্ত্রী যেন ঘরে এসে খুব বিষণ্ণভাবে গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছে।

বৌ বললে, কী হইছে ? এত ঘনঘন্না কেবে ?

মন্ত্রী বললে, রাজামশাই বলেছেক এক তীষণ সমিস্তে। সে সমিস্তের তাঙানি চাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে সমিস্তের তাঙানি চাই। না হলে গর্দান যাবেক। আর তাঙানি যদি দিতে পারি অর্ধেক রাজত্বি পাব। কে জানে কি আছে আমার কুপালে। কিন্তুক এখন আমি কী করি ?

বলে মন্ত্রী হাত ছুঁড়তে লাগল।

বৌ বললে, কী সমিস্তে আমাকেই বল না ছাই।

মন্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললে, সে তুর কম্ম লয়।

বৌ বললে, সমিস্তেটাই শুনি।

মন্ত্রী বললে, আকাশে কী নাই।

শুনে অমনি মন্ত্রী-বৌ বললে, ওমা, এই কথা ! আকাশে খনি নাই।

শুনেই মন্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগল।

মন্ত্রী-বৌ বললে, আনন্দের চোটে কি বিয়ে হেঁটা সব ভুলে গেলে নাকি ?

মন্ত্রী বললে, রাখ্ তুর ধাওয়া। অর্ধেক রাজত্বি পাব। এতদিনে কুপাল ফিরল বটে।

বৌ বললে, এবার কিন্তুক আমার নাকে সোনার নথ চাই। তখন কিন্তুক না বলতে পারবে।

নারে বেশি না,—বলে মন্ত্রী বৌয়ের থুতনিটা নেড়ে দিলে। মন্ত্রী-বৌ হেসে পড়ল।

মন্ত্রী পাগ বেঁধে রাজবাড়ি গেল (অর্থাৎ আসর থেকে বেরিয়ে গেল)। বাইরে থেকে ডাকলে, রাজামশায়, রাজামশায়।

রাজা বললে, অগ্রসর, মন্ত্রী।

মন্ত্রী আসরে ঢুকে এগিয়ে এল।

রাজা বললে, আমার সমিস্তের কী হল ?

মন্ত্রী হাসিমুখে বললে, কী সমিস্তে হুজুর ?

রাজা বললে, আকাশে কী নাই।

মন্ত্রী অমনি বললে, আকাশে খুনি নাই।

রাজা খুশি হয়ে বললে, ঠিকতো। ঠিক তাই। এ তাঙানি কে বলেছেক ?

মন্ত্রী বললে, আমি।

রাজা বললে, বেশ, তোমাকে আমি অর্ধেক রাজত্বি দিব। চল, মায়ের পাটা ছুঁয়ে দিব্বি গালবে চল যে এ তাঙানি তুমি নিজে মাথা থেকে বার করেছ, কারু সাহায্য নাও নাই।

মন্ত্রী বললে, রাজামশায়—

রাজা বললে, কী ?

মন্ত্রী বললে, এ তাঙানি আমি বলি নাই।

রাজা বললে, তবে কে বলেছেক ?

মন্ত্রী বললে, আমার পরিবার।

রাজা বললে, তবে তাকে আমি বিয়া করব। তাকে আনতে রাজবাড়ি থেকে পালকি যাবেক এখুনি। তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দাওগে। সে হবে আমার পাটরাণী।

আসর থেকে মন্ত্রীর প্রস্থান। রাজা বসে পড়ল। মন্ত্রী বৌ উঠল। মন্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে আসরে এসে ঢুকল। মন্ত্রী বৌ বললে, কী হ'ল! হাসতে হাসতে রাজবাড়ী গেলে, কাঁদতে কাঁদতে ফিরলে কেনে?

মন্ত্রী বললে, আমি বলে কেলাইছি।

বৌ বললে, কী বলে কেলাইছ?

মন্ত্রী বললে, রাজামশায় বললে—এ ভাঙানি কে বলেছে? আমি বললাম—আমার পরিবার।

বৌ বললে, তারপর?

মন্ত্রী বললে, রাজামশায় বললে—আমি তাকে বিয়া করব।

মন্ত্রী-বৌ আনন্দে নাচতে নাচতে বললে, বল কিগো! তাহলে তো আমি রাজরাণী হব।

বলেই গান ধরলে।

আকাশে ফুটেছে ফুল পরাণ হল আকুল
বাতাসে নড়িছে যত পাতা।

বেহালাদার উঠে অমনি বেহালা বাজাতে আরম্ভ করলে। দুঃখে মন্ত্রীর বুক ফেটে যাচ্ছে, সেও কিন্তু গান ধরলে—

বরনে কাটছে মাটি আকাশে চুকল হাতি
আমি তবে দাঁড়াই কোথা।

গান শেষ হলে মন্ত্রী-বৌ বললে, আমি তবে রাজবাড়ি চললাম।

মন্ত্রী তার পথ আটকে বললে, আমি তবে আত্মঘাতী হব।

বলেই তার বাঁধারির তলোয়ার নিজের বুকে ঠেকিয়ে বললে, এই আমি মলম। তুমি আমার রক্তে পা ধোও, আলতা পর। বিয়ে রাজবাড়ী যাও।

এমন সময় রাজা খাদের (অর্থাৎ খুঁটির) আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। এসে বলল, তুমাদের সব কথা শুনলাম। মন্ত্রী, তোমাকে আত্মঘাতী হতে হবেক না। আমি তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দিব।

বলেই রাজা বসে পড়ল।

মন্ত্রী-বৌ বললে, নাও, খাবে এস।

মন্ত্রী বললে, না।

বৌ বললে, কেনে?

মন্ত্রী বললে, তুই যে রাজবাড়ীতে গেছিলি?

বৌ বললে, তুমি যে আত্মঘাতী হছিলে।

মন্ত্রী বললে, তুই নিশ্চয়ই রাজাকে বিয়া করে পাটরাণী হবিস।

বৌ জোর গলায় বললে, কখ্খনো না।

মন্ত্রী বললে, তবে কী করবিস্?

বৌ বললে, আমি বলব্ম্ -রাজামশায়, হাড়ি বাউড়িদেরই সাজা হয়। বামুন কায়েতের তো সাজা হয় না। আর যাজা তো হাড়ি বাউড়ি লয়।

মন্ত্রী আনন্দিত হয়ে—'সত্যি'—বলে বৌয়ের হাত ধরলে। হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে দুজনে গান জুড়লে—

যতদিন দেহে প্রাণ রহিবেক
তুমি আমারি আমি তুমারি।

[শ্রোতারা সমস্বরে হরি হরি বলে উঠল। লেটোর পালা শেষ হল।]

[ডঃ সুকুমার সেনের সৌজন্যে]

পুরোনো কথা

[গত যুগে অর্থাৎ ৩০।৪০ বছর আগে যে সব নাট্যকার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর 'কেদোর কীর্তি' 'শালারাম্বের স্বদেশিতা' দেশবন্ধুর নামে উৎসর্গীকৃত। 'বাঙালী', 'দেশের ডাক', শিশিরকুমার অভিনীত 'শঙ্খধ্বনি' প্রভৃতি নাটকগুলি একদা দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। শুধু নাটক লেখাতেই নয়, নাট্যশিক্ষক হিসাবেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। 'অভিনয় শিক্ষা' নামে যে বইখানি তিনি লিখেছিলেন, আজ তা outdated হলেও তার মধ্যে তাঁর অনেক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তার পরিচয় আছে। বইখানি আজ আর পাওয়া যায় না। সেই বই থেকে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠকদের উপহার দেব। সেই সব রচনার মধ্যে পাঠকবর্গ যেমন সেকালের অনেক কথা ও সরস ঘটনা জানতে পারবেন, তেমনি লেখকের অনেক মূল্যবান কথাও শুনবেন।]

বাংলা নাট্যশালার উৎপত্তি

"বঙ্গীয় নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল বলেন, নাটক ও নাট্যাভিনয় পুরাতন যাত্রা ও পাঁচালির উন্নত ও আধুনিক সংস্করণ মাত্র। অপর দল বলেন, বঙ্গের এই আধুনিক নাট্যকলার উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় 'রামলীলা' নামক উৎসবের পদ্ধতি হইতে। তৃতীয় দল বলেন, বঙ্গীয় নাট্যশালা ইংরাজী নাট্যশালার অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়া শেষোক্ত মতকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বঙ্গীয় নাট্য-কলার উৎপত্তি যাত্রা, পাঁচালি বা 'রামলীলা' উৎসব হইতে হইলেও, বঙ্গীয় নাট্যশালার উদ্ভব যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের ফলে—একথা একেবারে অস্বীকার করা চলে না।

যথা সম্ভব সন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গলার আদি নাটক নামের পুস্তক 'কলিরাজার যাত্রা'। ১৮৫০ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকা হইতে জানা যায়, ১৮২১ খৃঃ ইহার অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা প্রথম বাঙ্গলা নাটক অভিনীত হয় ১৭৯৫ বঙ্গাব্দের কোজাগর পূর্ণিমা রাত্রে। স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র বসু কলিকাতা বাগবাজারস্থ বাটীতে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেন। এই অভিনয়ে চিত্রিত দৃশ্যপট ও নির্মিত নাট্যশালা ব্যবহৃত হয়

নাই। যুক্তাবলী বাটীর বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সজ্জিত হইয়াছিল; ফলে দর্শকদের অভিনয় দেখিতে একাধিকবার স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। নারী-চরিত্রগুলি স্ত্রীলোকদের দ্বারাই অভিনীত হয়।

ইহার পর ১৮৫৭ খৃঃ পর্যন্ত আর কোনো বাঙলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল কিনা, তাহার সঠিক খবর পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খৃঃ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার সন্নিকটে চড়ক-ডাঙার জয়রাম বসাকের গৃহে, শিমলায় ছাতুবাবুর বাটীতে, দর্জিপাড়ার শেঠের বাটীতে এবং মফঃস্বলের নানাস্থানে, বিশেষতঃ চুঁচুড়ায়, সংস্কৃত হইতে ভাষান্তরিত সংস্কৃত নাটকাবলীর অভিনয় হয়। ১২৬১ অব্দে কবি কেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্য লিখিত প্রথম বাঙলা মৌলিক নাটক। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৬৩ অব্দে চড়কডাঙার জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাটীতে এই নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। ক্রমশঃ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নানাস্থানে অভিনীত ও জনপ্রিয় হইতে লাগিল। ইহার পর রামনারায়ণের 'নবনাটক' নাটকখানি শিমলায় ছাতুবাবুর বাটীতে সসম্মানোদ্যোগে অভিনীত হইল। এইখানে একটি প্রসিদ্ধ নাট্যশালার কথা বলা প্রয়োজন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগেছিয়ার বাগানবাটীতে একটি চমৎকার স্থায়ী নাট্যশালা নির্ম্মিত হয়। বাঙলা ১২৬৪ সালের ১৬ই শ্রাবণ এই 'বেলগেছিয়া থিয়েটারে' শ্রীহর্ষদেব প্রণীত 'রত্নাবলী' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রথম অভিনীত হয়। অনুবাদক কবিকেশরী রামনারায়ণ।

রামনারায়ণের সমসাময়িক হইলেও মাইকেল মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ কিছু পরে হইয়াছিল। মধুসূদনের প্রথম নাট্য-রচনা 'শর্ম্মিষ্ঠা'—১৮৫৮ খৃঃ রচিত, ১৮৫৯ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগেছিয়া থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। ইহার অব্যবহিত পরেই মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। আনুমানিক ১৮৬০ খৃঃ মাইকেলের 'পদ্মাবতী' রচিত। বাঙলা নাটকে এই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইল।

১২৭১ অব্দে শোভাবাজারের রাজবাটীর ৺গোবীকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের ভবনে একটি নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। নাম—শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকেল পার্টি। ইঁহারা মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' প্রথম অভিনয় করেন। এতদ্ব্যতীত পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রযত্নে যে নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত হয়, এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নাট্য-সম্প্রদায়—এই উভয় সম্প্রদায়ই আরো সুন্দর সুন্দর নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া বর্ত্তমানে সম্ভব নহে।

ইহাই বঙ্গীয় নাট্য-কলার আদি যুগের কথা। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে মধ্য-যুগের আরম্ভ।"

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবনব রূপে

গতমাসের নানা অভিনয়

বাঙালী হিন্দু সমাজের চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন তাঁর নাটক 'অচলায়তন'-এর মাধ্যমে। এই নাটকটির আকর্ষণ যে আজও আছে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল রূপকারের 'অচলায়তন' দেখে। নিয়ম যে সবচেয়ে বেশী মানে সেই মহাপঞ্চক একদিকে এবং নিয়মের মধ্যে যে ধরা দিতে চায়না, মহাপঞ্চকের ভ্রাতা সেই উদ্ধত পঞ্চক আর একদিকে—এই দুই দ্বন্দ্বের মধ্যে অচলায়তনের কর্মধারা বিপর্যস্ত তখনই যখন অতিক্রম করে আবির্ভূত হন নাটকের গুরু, যিনি অন্তত সেখানে পাংক্তেয়দের দাদাঠাকুর। সুপরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জা, দাদসজ্জা, সঙ্গীত এবং অভিনয়ে সবিতাব্রত দত্ত ও গীতা দত্ত ছাড়াও অন্যান্য শিল্পীরাও "অচলায়তন" নাটকাভিনয়কে সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিলেন।

বার্ন্স স্পোর্টস ক্লাব। এই সংস্থাটি সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' মঞ্চস্থ করলেন। নাটক নির্বাচন ব্যাপারে এঁরা সুস্থ মনের পরিচয় দিয়েছেন। যাঁরা নিয়মের বাইরে নতুন নাটক নিয়ে এঁদের যে এই প্রচেষ্টা তা সত্যিই আনন্দের। সমগ্র অভিনয়ের মধ্যে প্রতিটি শিল্পীর যে সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া গেছে তার ফলেই 'শ্রীকান্তে'র দীপ্তি ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

অভিনয়ে 'পাহলী'র চরিত্রে অসীমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'অন্নদাদিদি'র ভূমিকায় রেণু ঘোষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দন বসু, গোবিন্দ পাত্র।

দি ওয়েস্টবেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ষ্টাফ রিক্রিয়েশান ক্লাব।

এর শিল্পীরা সম্প্রতি বিশ্বরূপা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' অভিনয় করলেন। পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমণি দত্ত। অভিনয়ের দিক থেকে গীতা দের 'কিরণময়ী' এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শিবির দের উপেন, সুনীল ঘোষের 'সতীশ', প্রণবকুমুদদারের 'দিবাকর', বিজয় কুণ্ডুর 'বেহারী', ভানুদাস রায়ের 'বিপিন' প্রশংসাযোগ্য। অন্যান্যের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, মীরা বসু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মণিকা দত্ত, দীপিকা দাস, মনোজ নন্দী, রমেন চৌধুরী, কাজল বর্ধন, রবীন অধিকারী, ইন্দু গুপ্ত ও রবি বসু।

রূপমহল। মোহন মজিদারের 'দুইমহল' নাটক মঞ্চস্থ করা হয় শ্রীরামপুর রাস ময়দানে রূপমহল সংস্থার শিল্পী সমন্বয়ে। মৃদু চৌধুরী (রজন), প্রশান্ত চক্রবর্তী (ভজহরি), রমেন ঘোষ (ছেদন), অজিত বাগ (সালুয়া), সুনীল রায় চৌধুরী (মহুয়া) কবিতা দাস (ওসমানী)—এঁরা প্রত্যেকটি চরিত্র সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সুঅভিনয় যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন তেজময় গুহ, অর্নব পাল, মিস পালিত, সাধনা হাজরা, সুকুমার চক্রবর্তী। পরিচালনা সুষ্ঠু ও সুনিপুণ। নির্দেশনা ও সঙ্গীতে ছিলেন কাজল সেন ও মৃদু চৌধুরী। মঞ্চ নির্দেশনায় অমরেশ রায়।

শৌভনিক। এই সুপরিচিত সংস্থা দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত অঙ্গনে প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিতভাবে 'অন্তত পুত্রা' অভিনয় করছেন। এই নাটকের রচয়িতা—রতন মুখার্জি ঘোষ; নির্দেশনা গোবিন্দ গাঙ্গুলী। এই নাটকে সমগ্র মানব সমাজের নৈতিক অবনতির কথা বিভিন্ন ঘটনার বিন্যাসে উপস্থাপিত করা হয়েছে। নাটকের ভাষা বড়বাঁধা ছকে লিখিত নয়। চরিত্র ও ঘটনার চিত্র কোথাও

মুল, বাস্তব, আবার কোথাও বা পঙ্গুময় লিবিক। অভিনয়ে শৌভনিক গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে বিশেষ করে শঙ্কর বা সনাতনের নাম ভূমিকায় রুক্ষ কুশ্রী ও দুর্বৃত্ত সজ্জনের রূপে গোবিন্দ গাঙ্গুলীর কলাকৌশল বিশেষ প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। অবাঙালী সুন্দরলালরূপে অশোক মিত্র অনবদ্য; কতো কায়দা বেশে নিমু ভৌমিক আনন্দ দান করতে পেরেছেন। একটি কঠিন ভূমিকায় ধূর্ত চোরাকারবারীবেশী রমণী মোহনের অভিনয় অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন সুকুমার ঘোষ। পাগলাসে মৈত্র অভিনীত চামারুরওলা উপভোগ্য। চামারুরওয়ালার স্ত্রী বেশী ইন্দু চট্টোপাধ্যায়ও উপভোগ্য। এ ছাড়া অমল মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক), অসিত ঘোষ (বিদ্যুৎ), বিমল চক্রবর্তী (মিস্তিরমশাই), শিবু মজুমদার (অজিত), শিবানী (জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবি তালুকদার (কবিতা), অনুরাধা বাগচী (বিধবা) মায়া বসু (ঝরা) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতরচনা, শব্দ প্রয়োগ এবং আলোক সম্পাতে যথাক্রমে ভাস্কর মিত্র, ঘন্টু প্রসাদ ও স্বরূপ মুখোপাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বহুরূপী। বাদল সরকার রচিত ও শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'বাকি ইতিহাস' সম্প্রতি অভিনীত হয়েছে। 'বাকি ইতিহাস' শুধু মানুষের জীবনযাত্রার রূপ রচনা করেনি, মানুষের অন্তরের কথাকেও নিবেদন করেছে। নাটকের প্রশ্ন: ব্যক্তি মানুষের বাঁচার সঙ্গে গোষ্ঠী মানুষের বাঁচার মিল কোথায়? শরদিন্দু ও বাসন্তী যখন সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত, তখন সীতানাথের প্রেতমূর্তি মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে; এর পরেও কি শুধু মানুষের আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে জানবার কিছু প্রয়োজন হয়? অধ্যাপক শরদিন্দুকে প্রতিপ্রশ্ন করে এ-হেন পৃথিবীতে তুমি আত্মহত্যা করনি কেন? অর্থাৎ সীতানাথের মতে এই ঘৃণ্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই হয়না। অভিনয়ে শরদিন্দু ও সীতানাথ রূপে কুমার রায় অসামান্য নাটনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাসন্তী ও সীতানাথ-পত্নী কথাবেশে তৃপ্তি মিত্র তাঁর নিজস্ব নাট্যপ্রতিভার অপূর্ব বিদর্শনপরিবেশন করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় (বাসুদেব), শান্তিদাস (নিখিল), গৌতম মজুমদার (বিধুভূষণ) শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (কথার বাবা), অমর গাঙ্গুলী (বিজয়) প্রভৃতি যথাযোগ্য সুঅভিনয় করেছেন। ছায়াসূতি সীতানাথ রূপে দেবতোষ ঘোষের নিজস্ব উক্তি প্রশংসনীয়। শম্ভু মিত্রের সুনির্দেশে নাটকটি অতি অনাড়ম্বর ও সুষ্ঠু। আলোক সম্পাতের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আবহসঙ্গীত রচনা নাটকের উপযোগী।

সাধারণ রঙ্গালয়ের চলতি অভিনয়

বিশ্বরূপায় রঙ্গিনী

১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর। অর্থাৎ ১৭২ বছর আগেকার কথা। ঐ দিন শহর কলকাতা এক নতুন অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আলোড়িত স্পন্দিত হয়েছিল। ঐ দিন এই শহরে বাংলা থিয়েটার খোলা হয়েছিল, বাংলা ভাষার নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু কে এই অঘটন ঘটালে? আশ্চর্য! তিনি এদেশের লোক নন, তিনি রাশিয়ান। এদেশে এসে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন এবং তারপর The Disguise ও Love is the best doctor নামে দুইখানা ইংরেজি নাটক বাংলাতে অনুবাদ করেন। শুধু তাই নয়, দেশে ফিরে ১৮০১ সালে তিনি একটি হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ রচনা করেন। লোকটির নাম, হেরাসিম লেবেডেফ। উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকায় লেবেডেফ লিখেছেন "তাঁহা শিক্ষক গোলক দাস আমার নিকট প্রস্তাব করলেন যে যদি আমি এই নাটক (The Disguise) সর্বসমক্ষে অভিনয় করি তাহলে তিনি আমাকে এদেশী অভিনেতা অভিনেত্রী যোগাড় করে দিতে পারেন। তাঁর এই প্রস্তাবে আমি আনন্দিত হলাম এবং তারপর ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর নিজস্ব নাট্যশালায় এই নাটক প্রকাশ্যে অভিনয় করালাম।"

এই সূত্রে অভিনয়ের আগের দিন ক্যালকাটা গেজেটে যে বিজ্ঞপ্তি বেরোয় তা হুবহু নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল :

BENGALLY THEATRE
No 25 Doomtullah
Mr. LEBEDEFF
Has honour to acquaint the Ladies and
Gentlemen of the Settlement,
THAT HIS THEATRE
will be opened
TOMORROW FRIDAY, 27th INST.
with a comedy called
THE DISGUISE
The play to commence at 8'Oclock pecisely
Tickets to be had at his theatre
Box and Pit.....Sicca Rs 8
Gallery..... " " 4

এই অভিনয়ের কিছুদিন আগে চন্না নামে একটি মেয়েকে অশেষ মিত্রদের হাত থেকে উদ্ধার করে লেবেডেফ তাকে নিজের দলের প্রধানা অভিনেত্রী রূপে গড়ে তোলেন এবং তার নতুন নামকরণ করেন—রঙ্গিনী। উভয়ের মধ্যে নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু রঙ্গিনী ভালোবাসত বব রবিসন নামে এক ভাগ্যান্বেষী ইংরাজ পুরুষকে যার ঔরসে সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিল। লেবেডেফের জীবনে রঙ্গিনীকে পেয়েও না পাওয়া এক অতি করুণ ট্র্যাজেডি। সেই সঙ্গে আছে তখনকার দিনের শহর কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজদের নাট্যশালা দি ক্যালকাটা থিয়েটারের ইংরাজ মালিকদের লেবেডেফের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সর্বনাশ সাধন। যে বেঙ্গলি

থিয়েটার তিনি বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন, দেনার দায়ে হাতছাড়া হবার পর সেই থিয়েটারকে নিজ হাতে ভেঙে দিয়ে তার ইট কাঠ কড়ি বরগা বিক্রী করে দেনা মিটিয়ে, সর্বস্ব খিন্ন হয়ে লেবেডেফ এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন।

এইসব উপকরণ নিয়ে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 'লেবেডেফের রঙ্গিনী' নামে একটি সুপাঠ্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। সেই কাহিনীকে অবলম্বন করে কুশলী নাট্যকার মনোজ বৈরাগী রঙ্গিনী নামে নাটকটি রচনা করেছেন এবং যশস্বী নাট্য-পরিচালক তরুণ রায় সেই নাটকটিকে বিশ্বরূপা মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন। বলা দরকার, ইতিপূর্বে ঐ কাহিনী নিয়ে মনোজ বৈরাগীর 'লেবেডেফ' নামে যে নাটক থিয়েটার সেন্টারে অভিনীত হয়েছে, আলোচ্য নাটক রঙ্গিনীর সঙ্গে তার প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে। আলোচ্য নাটকে অবশ্য কয়েকটি নতুন দৃশ্য এবং কিছু নতুন বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে।

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে যে ধরণের নাটক সাধারণতঃ অভিনীত হয়, রঙ্গিনী সে ধরণের নাটক নয়। এ নাটকের জাত আলাদা, রস আলাদা, আবেদন আলাদা, প্রয়োগরীতি আলাদা। দেড়শতাব্দিক বছর আগেকার এক দুঃসাহসিক উদ্যমচেতা বিদেশীর জীবনে, শঠতা, প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, সংগ্রাম ও প্রণয় বেদনার যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তার ট্র্যাজিডি যেন সর্বমানবের এবং সর্বকালের। সেই ধরণ আবেদন আজকের মানুষের জীবনেও সত্য হয়ে উঠতে পারে, সে ট্র্যাজিডি বিশ্বজনীন। নাট্যগ্রন্থনের গুণে এক বিদেশীর জীবনের আলোছায়ার রং আজকের দিনের দর্শক মনেও তাই তার স্পর্শ রেখেছে, লেবেডেফের প্রতি প্রীতি আর সহানুভূতিতে দর্শকচিত্ত আলোড়িত হয়েছে। 'রঙ্গিনী' নাটকের সার্থকতা এখানেই।

নাটকটির বিন্যাসে যে ক্ষিপ্রগতি, বহুচরিত্র সমাবেশের মূলে যে কম্পোজিসন কৌশল এবং সমগ্র প্রয়োগকর্মের মধ্যে যে সুষ্ঠু নৈপুণ্যের পরিচয় নাট্যপরিচালক দিয়েছেন তা অসাধারণ।

অনেক চরিত্রের ভিড় এই নাটকে। সুতরাং দলগত অভিনয়ের মধ্যে উৎকর্ষ সম্পাদন অভিনয় সাফল্যের প্রধান সর্ত। রঙ্গিনী নাটকে দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখা দেছে বলা যেতে পারে। লেবেডেফের ভূমিকায় তরুণ রায় এই চরিত্রের অন্তর্নিহিত তেজ, সাহসিকতা, প্রীতি ও স্নিগ্ধ প্রেমের যে মনোজ্ঞ আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করে। রঙ্গিনীর ভূমিকায় দীপান্বিতা রায় চরিত্রটির মর্ম সার্থকরূপে চিত্রিত করেছেন। এই নাটকের আর একটি বড় ভূমিকা—বধূ মহিলন। এই চরিত্রে অমৃতভূষণ গুজরাল তাঁর মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন। মিসেস সংযুক্তা গুজরাল মিসেস মহিলনের ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রণত ঘোষ (টমাস রোমাট), সাবি হন (জোসেফ বাটলি), দেবব্রত রায় (ডাঃ হুইটনি), শংকর ভট্টাচার্য (ম্যাকনাব), পান্নালাল চ্যাটার্জি (কবীরাম), অজিত মিত্র (জগন্নাথ পাদুলী) মধুকুল দত্ত (গোপাল দাস), শম্ভু ব্যানার্জি (হরসুন্দর) বিভাস মুখোপাধ্যায় (তান্ত্রিক), নিমাই দাস (সরস্বতী), অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় (হরিরাম) এবং নন্দিতা ভট্টাচার্য (মুনুন) নিখুঁত সুন্দর অভিনয় করেছেন।

নাটকটির সাফল্যের মূলে শশাঙ্ক ঠাকুরের সঙ্গীত পরিচালনা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। নাটকের মেজাজ ও ঘটনা অনুযায়ী আবহসঙ্গীত উচ্চাঙ্গের।

নাটকের পাত্র-পাত্রীদের রূপসজ্জা যথাযথ। দৃশ্য সংস্থাপনেও পরিচালকের বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের ছাপ পরিস্ফুট। দৃশ্যসজ্জায় আর. সিংহের কাজ উল্লেখযোগ্য। আলোক সম্পাত বিশেষ প্রশংসনীয়। মোটের উপর যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়ে মামুলি, ছকে বাঁধা, দুর্বল কাহিনী ও উদ্ভট চরিত্র সম্বলিত নাটক দেখে দেখে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়েছেন ওঁদের কাছে রঙ্গিনী নতুন স্বাদ ও নতুন অনুভূতি পৌঁছে দেবে। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে রঙ্গিনী একটি বিরল সৃষ্টি, একথা বলতে দ্বিধা নেই।

কুহকিণী

গৌরীশংকর দে

মহাযুদ্ধ শুরু হবার অনেক বছর আগে। বার্লিনের সুন্দরী তরুণী ক্রলিন মেদের প্রণয় অন্ধারোলী বাহিনীর এক জাঁদরেল সেনাপতির প্রণয়িনী। সেবার সেনাপতির মাথার চুল উঠে যাবার উপক্রম। তাই, যে এলাকায় থাকলে খরচ কম হতে পারে এমন এলাকার বদলী হবার জন্য উপরে আবেদন করলেন। তরুণ সেনাপতি মনে প্রাণে বিশ্ব-নাগরিক। বহু ভাষায় কথা বলতে পারেন। আবেদন অনুযায়ী তাঁকে বদলী করা হলো কর্ণেল নিকোলাই-এর বিভাগে। বার্লিনের উপকণ্ঠে সাধারণ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের খবরাখবর আলিসে পৌঁছে দেয়া—এই হলো তার কাজ। ওই প্রতিষ্ঠান মোটর গাড়ি ইত্যাদির যন্ত্রপাতির কারবার করে। বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স—এক কথায় পশ্চিম য়ুরোপের সব জায়গায় ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক প্রতিনিধি। ওই প্রতিনিধিরা ব্যবসার সূত্রে ঘুরে বেড়ালেও আসলে তারা গুপ্তচর।

তরুণ অফিসারটি য়্যানা-মেরীকে আবার সম্প্রতি সে ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে আর সেই জন্যেই তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে নানা জায়গায়। য়্যানা বায়না ধরলো ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। প্রথমে তা না নানা করলেও অবশেষে গুপ্তচরটি শেষপর্যন্ত রাজী হলো। তার মনে হলো য়্যানাকে শিখণ্ডী হিসেবে ব্যবহার ক'রে গুপ্তচরবৃত্তি চালাতে সুবিধাই হবে। য়্যানা-মেরী কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই জেনে গেলো ওর প্রেমিক পুরুষটির আসল জীবিকা কী!

ছেলেটি নানা জায়গায় বিক্রি ক'রে বেড়ায় মোটর গাড়ির নানা যন্ত্রপাতি। আর সেই সময়টা অ্যানা কাটায় ছবি এঁকে। নামুর অঞ্চল তাকে মুগ্ধ করে য়্যানার। দিন কয়েকের মধ্যেই সে এঁকে ফেললো নামুর-এর সবগুলি দুর্গের ছবি। 'বার্লিনের বন্ধুদের' কাছে পাঠানো হলো ওই ছবিগুলি। কর্ণেল নিকোলাইয়ের বাহিনীর অন্যান্য লোকেরা আবিষ্কার করলো ওই ছবিগুলি শিল্পীর খেয়ালী মনের প্রকাশ হ'লেও এদের সামরিক গুরুত্বও অপরিসীম।

ওদের ফুজনকে ফিরে যেতে বলা হলো বার্লিনে। পথে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে জানালো অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। কলোন-এ ট্রেন থেকে নামিয়ে তাকে ভর্তি করা হলো স্থানীয় একটা হাসপাতালে। মারা গেলো ঘণ্টা কয়েক পরে।

শোকে আনা মেয়ীর বুক ভেঙে গেলো। আত্মহত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করলো। কিন্তু আর্মান গুপ্তচরবাহিনীর লোকেরা আন্তরিক সহানুভূতি আর অকাট্য যুক্তির জোরে অ্যানাকে নিবৃত্ত করলো। তারা ওকে বোঝালো ওর প্রকৃত কর্তব্য এখন ফেলে আসা এলাকায় ফিরে যাওয়া, ছদ্মবেশে থাকা। গুপ্তচরবাহিনী বুঝে ফেলেছে অ্যানা ওর মৃত প্রেমিকের চাইতে অনেক বেশি দক্ষ গুপ্তচর। ওকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। এবার সে গেলো লীজ শহরে। বেলজিয়মের ওই শিল্প-নগরে সে আস্তানা নিলো পাহাড়ে। দিন কয়েকের মধ্যেই ও খুঁজে বের করলো ওই শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোন কোন জায়গায় সব চাইতে দুর্বল। ও দেখতে পেলো দুর্গের পরে একটা জায়গা আছে যেখানে দুর্গ থেকে গোলাগুলি একেবারেই ব্যবহার করা যায় না। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে আর্মান বাহিনী এই এলাকা দিয়েই পরে বেলজিয়ম আক্রমণ করেছিলো।

১৯১১ সালে অ্যানা-মেয়ীকে পাঠানো হলো কোয়েস রিগাটা নামে একটা জায়গায়। আর্মানীর সম্রাট স্বয়ং ওখানে মাঝে-মাঝে যেতেন। ওখানে অ্যানাকে দেখা গেলো সুইস স্কুল-শিক্ষিকার ভূমিকায়। কিন্তু ওর অস্বাভাবিক কৌতূহল আর প্রশ্ন শুনে গোয়েন্দাবাহিনীর লোকদের সন্দেহ হয়। ফলে ওকে অচিরেই ওই স্থান ত্যাগ করতে হয়।

বেলজিয়মে ফিরে এসে অ্যানা হলো এক তরুণ বেলজি অফিসারের প্রণয়িনী। যাকে ও সত্যি সত্যি হৃদয় দিয়েছিলো তাকেই যখন মৃত্যু আচমকা ছিনিয়ে নিয়েছে তখন দেহের শুচিতা রেখে লাভ কি? তুচ্ছ দেহটা দান ক'রে যদি স্বদেশের কিছু উপকার হয় অ্যানা তা-ই করবে।

তরুণ বেলজি অফিসারটির সঙ্গে অ্যানা একদিন গাড়িতে ক'রে। ওর হাতে ছিলো একটা ব্যাগ। হঠাৎ ব্যাগটা খুলে গিয়ে কাগজ-পত্র ছড়িয়ে পড়লো পথের ওপর। অ্যানা বারবার বললো: "ওগুলো বাজে কাগজ, ওর জন্য গাড়ি থামাবার দরকার নেই।" তবু অফিসারটি গাড়ি থামিয়ে গেলো কাগজ-পত্র কুড়িয়ে আনতে। ফিরে আসার পর সে আরও নীরব হয়ে রইলো। যা জানিয়ে পাঠাবে এমন একটা গোপন খবর অ্যানা রেখেছিলো ওই কাগজ-পত্রগুলির ভিতরে। অফিসারটির অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে অ্যানা বুঝতে পারলো ও ধরা প'ড়ে গেছে। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে একটা শহরের কাছে পৌঁছানো মাত্র অফিসারটি হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ঢুকে পড়লো থানার ভিতরে। কেন ঢুকেছে তা বুঝতে অ্যানার একটুও কষ্ট হলো না। জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়ে এ যাত্রা সে নিস্তার পেলো।

যুদ্ধ বাধবার দিন কয়েক আগে অ্যানা মেয়ীকে পাঠানো হলো রাশিয়ায়। পশ্চিম য়ুরোপে যে রকম সেবেছিলো এখানে ততটা সুবিধা ও করতে পারলো না। তবে সৈন্যবাহিনীর মাঝারী অফিসারদের বশ ক'রে যে সব খবর ও আর্মানীতে পাচার করে তার সামরিক গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম।

পশ্চিম সীমান্ত থেকে অ্যানাকে শেষ-পর্যন্ত আর্মানীতে ফিরিয়ে নেয়া হয়। কারণ শত্রুর হাতে ওর ধরা পড়বার উপক্রম হয়েছিলো। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আগত একটি দল রেডক্রসের হয়ে কাজ করছিলো। তাদের দোভাষী অ্যানা। ফ্রান্সের সীমান্তে আহত ফরাসী সৈন্যদের দেখতে গেছে মার্কিনী অতিথিরা। বড়ো মোহের অপারেশনের পরে ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে একজন সৈনিক। তাকে দেখবার জন্য একটা ঝুঁড়ে ঘরে ঢুকলো দলটি। সঙ্গে অ্যানা। আধো-অচেতন সৈনিকটি অ্যানাকে দেখেই ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো: "এই মেয়েছেলেটাকে গ্রেপ্তার করুন…

ও একজন জার্মান গুপ্তচর।" আইভ সৈনিকটি আর কেউ নয়; সেই তরুণ বেলজি অফিসার য়্যানা কিছুকাল যার প্রণয়িনী ছিলো। আজের জন্ম সেদিন ও কথে গিয়েছে। ডাক্তাররা কিন্তু ভাবলো লোকটা অসুখের ঘোরে ভুল বকছে। একটা ইনজেকশন দিয়ে তারা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। দক্ষিণ আমেরিকার দলটি প্যারিসের হোটেলে ফিরে গেলো। কিন্তু দেখা গেলো করাসী মোতায়িনীটি তখন কেটে পড়েছে।

এর পরে য়্যানার কর্মস্থল আবার বেলজিয়ম। তখানে গিয়ে সে ইংরেজ গুপ্তচরদের গুপ্তচর বৃত্তির এক অভিনব কৌশল ধ'রে ফেলে। য়্যানা দেখতে পেলো ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে, কিংবা কাঁধে কফিন নিয়ে অনবরত শবযাত্রীরা যাচ্ছে। য়্যানার ভীষণ সন্দেহ হলো। এক সকালে এত লোক মারা যেতে পারে? অথচ শহরে কোনো মড়ক লেগেছে ব'লেও তো খবর পাওয়া যায়নি। কী ব্যাপার! য়্যানের নির্দেশে মতো কয়েকটা কফিন নামাতেই দেখা গেলো তার মধ্যে শবের চিহ্নও নেই; তার বদলে আছে গোপন খবরাখবরের কাগজ আর দলিল। যে দু একটি কফিনে শব পাওয়া গেলো সেই সব শবের নিচে থেকে পর্যন্ত বহু কাগজ-পত্র বের হলো। জার্মানরা জানলো য়্যানা শুধু গুপ্তচরবৃত্তিতেই পারদর্শিনী নয়, বিদেশী গুপ্তচরদের কারসাজি ধরে ফেলতেও তার জুড়ি নেই।

গল্প নয় সত্য ঘটনা

সেনসর বোর্ড। কুলি মজুরের কাজে তদারক করার বোর্ড বা গরু বাছুরের অসুখ ধরার বোর্ড নয়। নাটকের বিষয় বস্তুর সেনসর করার বোর্ড।

বোর্ডের কাছে উপস্থিত হয়েছে কোন সম্প্রদায় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ বই নিয়ে।

বোর্ডের কর্তা বহুক্ষণ ধরে অনেক আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন আপনারা এলে তো মিটবে না,

এ আপনাদের দ্বারা হবে না।

—কেন? জিজ্ঞাসা করেন সম্প্রদায়ের কর্তা।

কেন-এর কোন উত্তর নেই—বললেন সেনসর বোর্ডের কর্তা।

তবে কি করে কি হবে?

বোর্ডের কর্তা উত্তর করলেন যিনি এই নাটকখানি লিখেছেন তাঁকেই আসতে হবে আমাদের কাছে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করা হবে। এই হচ্ছে নিয়ম।

তার উত্তরে সম্প্রদায়ের কর্তারা কি বলেছিলেন জানি না।

এই ঘটনা ঘটেছিল এই বাংলাদেশেই ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারী মাস-এর ২২ তারিখে।

নারীর তিন বন্ধু

মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবন আমাদের—মেয়েদের, অবয়বে নিয়ে আসে তন্বিমা, অধরে ও কপোলে আনে লালিমা, চাহনিতে আনে ঘরিমা, লাবণ্যিকতায় আনে গরিমা, সেই যৌবন আমাদের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। এরই জন্যে আমরা মেয়েরা ফুলের সঙ্গে উপমিত, পুরুষের প্রশংসনীয়া, কাব্যের উপকরণ। এই যে যৌবন, এর প্রকাশ কিসে?—শারীরিক পূর্ণতায়, লাবণ্যের উজ্জ্বলতায়, রূপের ছন্দোময় আকর্ষণে। অর্থাৎ এক কথায়, স্বাস্থ্যসম্পদে—যে স্বাস্থ্যসম্পদ যুবতী মেয়েদের পক্ষে, সংসারের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন।

শুধু যুবতীই বা বলি কেন? যৌবনের গণ্ডী সবেমাত্র পার হয়েছেন, বা হচ্ছেন মধ্যবয়স্কা, প্রৌঢ়া—এমন সব মেয়েরাও যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন, এবং তা তাঁদের সকলের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন।

বাইরের রূপ চাইই। সমাজে সংসারে শোভা হয়ে থাকবে যে নারী, সে তো রূপবতী হবেই সেইটাই তো হওয়া চাই। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। রূপ নেই অথচ নারী—এমনটা কল্পনা করাই তো ভুল। রূপ মানেই কিন্তু খানিকটা ফর্সা রং নয়। রূপের প্রকাশ নানারকমের। একেক জনের কাছে একেক ভাব। বাইরের রূপটাই শুধু রূপ নয়। রূপের মাধ্যম বা প্রকাশ যেমনই হোক না কেন, তার মূল উৎস স্বাস্থ্য।

মেয়েদের এই স্বাস্থ্য আগেকার দিনে যতখানি বজায় হত ও সমৃদ্ধ হত, আজ আর ঠিক ততখানিটা যেন দেখা যায়না। দিন বদলেছে, পরিস্থিতি পালটেছে, সুযোগ সুবিধে আর সেরকম হয়ত নেই। কিন্তু একেবারেই নেই, বলা যায় কি? একটা ইংরেজি প্রবচনে বলে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। মনে আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই সুস্থা থাকবার—বয়স যাই হোকনা কেন।

বলবেন হয়ত—এ যুগে সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সংসারের মেয়েদের স্বাস্থ্য, রূপ, যৌবন এসব নিয়ে অত খুঁতখুঁতুনি থাকলে চলেনা, যেখানে কোনমতে বেঁচে থাকাটাই হয়েই। আমি বলব —বেঁচে আমাদের সকলেই থাকতে হবে, কিন্তু 'কোনমতে' নয়, যতটা সম্ভব 'ভালভাবে' বাঁচবার চেষ্টা থাকা চাই।

আমাদের, সাধারণ সেরকম ঘরের মেয়েদের, পক্ষে করণীয় কয়েকটা অতি সাধারণ প্রক্রিয়া নির্দেশ করা যেতে পারে, কয়েকটা অতি সাধারণ 'রুটিন ওয়ার্ক' আমরা ক'রে যেতে পারি প্রতিদিনই, যা প্রায় ঘরের কাজেরই সামিল মনে হবে, সংসারের কাজের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না।

সূর্যের আলো, বাতাস ও জল—এই তিনটি জিনিস সম্বন্ধে আমি অল্প দু'এক কথা বলতে চাই। এই তিনটি জিনিস হল প্রসাধনের ও সেবাযত্নের, অর্থাৎ যারা চর্চার, প্রথম ও প্রধান অবয়ব। সাধারণভাবে সুস্থ থাকা যায় এই তিনের যথোপযুক্ত ব্যবহারে।

পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় আছে সূর্যালোকের জন্যে, অন্যথায় প্রাণের বিলুপ্তি ঘটত। সূর্যকিরণে এমন কতকগুলি উপাদান আছে যা আমাদের, অর্থাৎ সব মানুষেরই, জীবনের পোষক। আমি অবশ্য কড়া রোদের কথা বলছি না—তাতে শরীরও ঝলসে যায়, অনেক সময় উপকারের চাইতে অপকারই বরং হয় বেশি। শরীরে তাই নিয়মিত লাগাতে হবে মিঠে সূর্যের কিরণ, অর্থাৎ প্রথম সকালের ও সূর্যাস্তবেলার নরম রোদ। আগেকার আমলের মেয়েরা যতদূর সম্ভব খোলা গায়ে রোদ্দুর লাগতে দিতেন বলে শুনেছি। তাতে তাঁদের শরীর ভাল থাকত। এযুগে আমরা অত খোলামেলা আর থাকি কই, তবু যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে পারি তো। ঘরের জানালার সামনে, বারান্দায় কোণে উঠোনের চিলতেটুকুতে, রোয়াকটুকুর ধারে, ছাতটুকুতে—যার যেটুকু সুবিধে আছে, কাজে লাগান, যেটুকু পারেন রোদ্দুর গায়ে মাখুন, যেমন ক'রে সাধ্যি যাবেন। আজ বজায় রেখে দেহের যতখানি সম্ভব রোদে মেলে ধরে খানি শুকনো হাতেই ঘসড়াবেন তেল-সাবান মাখার ভঙ্গীতে। তাতে ক'রে হবে কী—লোমকূপ মারফৎ ও ত্বকের অসংখ্য ছিদ্র মারফৎ সূর্যকিরণ দেহাভ্যন্তরে শোষিত হয়ে যাবে, টনিকের কাজ করবে। পেশী, স্নায়ু, অস্থি, রক্তবাহী, এগুলো সঞ্জীবিত হবে।

নিজের বাড়িতে বা বাসায় কোন সুযোগই যদি না থাকে তবে কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ির খোলা জায়গায় রোজ দশমিনিটের জন্য গিয়ে একাজটা সেরে নিতে পারেন। তাতে লজ্জা বা অগৌরবের কিছু নেই। বরং দেখবেন, ব্যাপারটা অনেকেই প্রশংসা করবেন, আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন। রৌদ্রস্নান ও রৌদ্রমালিশ সত্যিই বড় উপকারী জিনিস, এতে সূর্যের উপকারী আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি আপনার অধিক যত্নের কাজ করবে। অন্তত মাসখানেক ক'রে দেখুন না, তফাৎটা নিজেই টের পাবেন।

জল আমাদের শরীরে এক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ। বাংলাদেশ সজল দেশ, বাংলার মানুষ, গাছপালা সবই সরস। জলকে আমরা ভালভাবেই জানি, চিনি। কিন্তু এতো গেল বাইরের দিক থেকে। স্বাস্থ্যের আইনে বলে, জল মানুষের দেহের বাহির-ভিতর দুইয়ের শৌচকরণের জন্যেই অবশ্য প্রয়োজনীয়। পানীয় জল ও স্নানের জল দুই-ই আমাদের নিত্যবন্ধু।

তেল, ঘাম, ধুলোময়লা, কাদা, শারীরিক নানা দূষিত পদার্থ—এগুলো অনবরতই আমাদের ত্বকের উপর জমতে থাকে, তাতে স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি, ত্বকের উজ্জ্বলতা ও সেনসিবারও ক্ষতি। এই ক্ষতি থেকে দূরে থাকতে হলে নিত্যনিয়মিত অবমার্জনা ও স্নান করা চাই। স্নান হবে প্রচুর জল ব্যবহার ক'রে। শুধু ময়লা দূর করবার জন্যে নয়, দেহ অর্থাৎ ত্বককে যতখানি সম্ভব জল শোষণ ক'রে সরস ও আর্দ্র থাকতে দেবার জন্যে। অবগাহন স্নান সবচাইতে ভাল। বেশি সময় নিয়ে অবগাহন করতে পারলে শরীরের পরম উপকার হয়। এ জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি external flushing.

পানীয় জলের পরিমাণ যত বেশি হয় ততই ভাল। অনেকেই বেশি জল পান করেননা, কেউ কেউ এত কম জল পান করেন যে, তাতে স্বাস্থ্যরক্ষা চলেনা। জলপানের অভ্যাস বাড়াবার চেষ্টা করুন। দিনে রাতে যতবার যতরকমে পারেন জল খাবেন। তৃষ্ণা না থাকলেও খাবেন, জোর ক'রেই খাবেন, তাতে তাল ছাই মন্দ নেই। প্রতিবার অনেকখানি না খেলেও চলবে, তবে বারে অনেক হওয়া দরকার। জল যখন খাবেন ধীরে ধীরে খাবেন, তাড়াহুড়ো ক'রে নয়। জল বেশি খেলে ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে ধোয়া হবে এবং তার ফলে হবে দৈহিক দূষিত নানা পদার্থের সহজ ও সম্পূর্ণ নিষ্কাশন। তাতে দেহ বিষমুক্ত থাকবে, রোগের সম্ভাবনা দূরে থাকবে, শরীর সজীব থাকবে, যাকে বলা যায় internal flushing, তা হবে, এবং তাতে উৎসাহ আসবে। প্রচুর জলপানে দেহের লোমকূপ ও ঘর্ম-গ্রন্থিগুলির পরিস্করণের কাজও সহজ হয়। ধীরে জলপান প্রসঙ্গে আমরা একটি প্রবাদের উল্লেখ করতে পারি—"Eat' the liquid and 'drink' the solid."

শেষে বাতাস বা হাওয়ার কথায় আসি। জল-আলোর মত, হাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও তত। খোলা বাতাস, বিশুদ্ধ হাওয়া, নির্মল বায়ু কেবল যে শরীরকেই পরিপোষণ করে তা নয়, ফুসফুসকে সুস্থ ও নীরোগ করে তা নয়, রক্তপ্রবাহকে তাজা রাখে তা নয়, মানুষের মনকেও সজীব ও সুস্থ ক'রে তোলে। আমরা অনেকেই বদ্ধ বা অবরুদ্ধ বাতাসের পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হই, রান্নাঘরে অনেকটা সময় ধোঁয়ার মধ্যে কাটাই,—তাই আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সারা দিনরাতে খানিকটাও অন্তত নির্মল শুদ্ধ হাওয়ার বিচরণ করা, ফুসফুসকে তা সরবরাহ করা। খোলা মাঠে বা নদীর ধারে, কিংবা বাগানে রোজ খানিকক্ষণ বেড়াতে পারেন যদি, খুব ভাল হয়। সে সুযোগ বেশির ভাগ মেয়েরই থাকে না, বেশ, তাহলে ছাদে দু'বেলা অনেকক্ষণ পায়চারি করবেন, কিংবা যদি তাঁকা উঠোন আঙিনা থাকে, সেখানে। ঘরে যাতে যথেষ্ট আলোবাতাস খেলে সেদিকে নজর রাখুন।

আর এই সবের মধ্যে খানি হাতেই নানাধরণের ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা করুন। আর করবেন যাকে ইংরাজিতে বলে deep breathing বা গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া। বুকের ছাতি সর্বাধিক ফুলিয়ে ভিতরে যতদূর সম্ভব বাতাস গ্রহণ—তবে হ্যাঁ, শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া দুটোই বেশ ধীরে ধীরে সময় নিয়ে করবেন। তাতে আপনার ফুসফুস ও রক্তনালীগুলি সর্বাধিক হাওয়া নেবার সুযোগ পাবে। শরীরের তাতে পরম উপকার।

আমরা মেয়েরা যেন এটা না ভুলে যাই যে, অস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যহীনতার ওপর ভিত্তি ক'রে সৌন্দর্য, রূপ বা লাবণ্য গড়ে উঠতে পারেনা। অসম্ভব সে ব্যাপার। স্বাস্থ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য বজায় রাখতে পরিশ্রম কত সামান্য! কতটুকু সময় লাগে! আর খরচ তো এক পয়সাও নেই, যেসব প্রক্রিয়াগুলো বললাম, তাতে। তবে কেন এটুকু করবেন না, বলুন তো?

• • •

রান্না আর রান্না

—মীরা বসু

কাঁচা পেপের গুজ্জামি

কাঁচা পেপে একটি (মাঝারি সাইজের) সরিষা চায়ের চামচের ২।০ চামচ। আদা—পরিমাণ মত। পোস্ত—দুই চামচ (চায়ের চামচের)

সিকি মালা নারিকেল কোরা, সরিষার তেল।

পেপে জিরে জিরে করে কেটে সিদ্ধ করুন পরে জল ফেলে একটি পাত্রে রাখুন।

এবার কড়াতে অল্প সরিষার তেলে চারটি সরিষা ফোড়ন দিয়ে নারিকেল কোরা ও আদা অল্প সাতলিয়ে পেপে, সরিষা বাটা, পোস্ত বাটা, নুন, অল্প মিষ্টি ও একটু দুধ দিয়ে ঘুঁটিয়ে মাখামাখা মত হলে নামিয়ে নিন।

চিঁড়ার পোলাও

চিঁড়া—দুই কাপ। পেয়াজ—বড় ২টি কুচি করে কাটা। আদা—পরিমাণ মতন কুচি করে কাটা। কাঁচা লঙ্কা—কুচি করে ২।৩টি। ধনে পাতা—অল্প এক আঁটি। মটরশুটি—আধ কাপ। আলু—ছোট ডুমো করে কাটা ২টি। ঘি, নুন, চিনি। অল্প হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়া।

চিঁড়া জলে ভিজিয়ে ঝরঝরে করে তুলে রাখতে হবে। তারপর কড়াতে ঘি দিয়ে পেয়াজ:কুচি, লঙ্কা ও আদা কুটে দিয়ে আলু ভাজতে হবে। আলু নরম হলে তাতে চিড়া ঢেলে নুন, অল্প মিষ্টি, হলুদ গুঁড়ো ও লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে ধনে পাতা ছেড়ে দিলে চিঁড়ার পোলাও হলো।

চিংড়ি মাছের কোপ্তা

কুঁচো চিংড়ি আধকিলো। আলু—৪টি ডুমো করে কাটা। পেয়াজ—২টি বড় কাটা। আদা—অল্প এক টুকরা বাটা। রসুন—ছোট একটি বাটা। হলুদ—এক গিয়ে বাটা। লঙ্কা—রুচি অনুযায়ী বাটা। নুন—পরিমাণ মত। চিনি—চায়ের চামচের ১১ চামচ। টক দৈ—৵০ আনার মত ও সরিষার তেল।

চিংড়ি মাছ পরিষ্কার করে বেটে নিন। ঐ বাটা মাছে অল্প পেঁয়াজ বাটা কুচোন কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা ও একটু ময়দা দিয়ে মেখে ছোট ছোট বড়ার আকারে ভেজে তুলে রাখুন। তারপর আলুগুলি ভেজে তুলতে হবে।

পরে কড়ায় তেল দিয়ে পেঁয়াজ আদা, হলুদ, ও লঙ্কা বাটা কষে টক দৈ দিয়ে আলুগুলি দিয়ে ঘসিয়ে নিন। পরে নুন ও জল ঢেলে ফুটতে দিন আলু বেশ সিদ্ধ হলে চিংড়ি বড়া ও মিষ্টি দিয়ে ঝোল ঘরে ফুটিয়ে নামিয়ে রাখুন। এইভাবেই চিংড়ি মাছের কোপ্তাকারি প্রস্তুত হল।

লোভনীয় আম

নীলিমা সে

'ফলের রাজা আম এর তুলনা নেই
খেতেও ভাল কাজেও ভাল
কাঁচাপাকা দুইই ভাল

কাঁচা আম দিয়ে নানা মুখরোচক বিভিন্ন আচার তৈরী করতে পারি। আচার, আমচুর, জেলি ও মোরব্বা কত কি। পাকা আম দিয়েও দু-চার রকমের মুখরোচক খাবার তৈরী করা যায়।

প্রথমেই আমসত্ত্ব—আমসত্ত্বর কথা মনে পড়ে। ক্ষীরের আমসত্ত্ব পশ্চিম বাংলার খাতনামা উপাদেয় খাদ্য। তৈরী করতেও খুব ঝামেলা বা সময় লাগে না।

পাকা আম ভালো ছেঁকে নিয়ে তিনভাগ আমের সঙ্গে ক্ষীর মিশিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো চিনি দিন। এদিকে টিনের অথবা ভাল কাঁসার কিংবা পাথরের পাত্র রোদ্দুরে দিয়ে আগে থেকে গরম করতে দিন। তারপর ওই আম থালাতে ছড়িয়ে দিন। অতিরিক্ত ভারি করে একবারে দিলে ভাল শুকাতে চায় না। তাই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিন আর একবার আমের গোলা ঢেলে দিন যদি আমসত্ত্ব পুরু করতে চান। ২।৩ দিন ভাল রৌদ্র পেলেই শুকিয়ে যাবে।

যদি দিনের রৌদ্রে আমসত্ত্ব শুকাতে অসুবিধা থাকে তবে উনানে একটা হাড়ি কিংবা একটা কড়াতে জল বসান। জলটা যখন খুব গরম হয়ে উঠবে তখন একখানা ভেলমাখানো থালা তার উপরে বসিয়ে গরম করুন। এবার ক্ষীর মিশানো আমের গোলা কিংবা শুধু আমের গোলা ঢেলে দিয়ে ভাল করে ছড়িয়ে দিন। যতক্ষণ না আমসত্ত্ব শুকাবে ততক্ষণ ঐভাবে আঁচে বসিয়ে নিন। সব সময়েই যে ক্ষীরে দিয়ে আমসত্ত্ব করতে হবে তা নয়। ক্ষীর ছাড়া আমসত্ত্বও খেতে খুব ভাল লাগে।

আমসত্ত্ব শুকনো যেমন খাওয়া যায় তেমনি দুধে কিংবা জলে ভিজিয়ে মুড়ি, রুটি ও ভাতের সঙ্গে মেখে খাওয়া যায়। আমসত্ত্বর চাটনীও রান্না করা যায়।

থালা ছাড়া কুলোতে কিংবা ছোট্ট ছোট্ট পাটিতে তেল মেখে নিয়েও রৌদ্রে শুকাতে পারা যায়। তবে নানা কারুকার্যকরা পাথরের কিংবা মাটির ছাঁচের গায়ে তেল মাখিয়ে নিয়ে আমের গোলা ঢেলে দিন। কিংবা একবার সবটা না ঢেলে পাতলা করে দিয়ে দুবার ঢেলে দিতে পারেন। কিংবা দিনে একবারে যদি আমের গোলা ঢেলে দিতে চান তবে ২।৩ দিন দিতে হবে। ছাঁচের আমসত্ত্ব দেখতে খুব সুন্দর হয়। স্বাদের অবশ্য কোন পার্থক্য থাকে না।

পাকা আমের আমকাসুন্দি

পাতলা পাতলা করে আম কেটে নিতে হবে। সবে পেকে উঠছে এমন আম দিয়ে কাঁচা আমের আমকাসুন্দির মতোই করা যায়। এবার কাঁচা আমের সঙ্গে পরিমাণ মতো নুন, মিষ্টি এবং সামান্য হলুদের গুঁড়ো মাখিয়ে নিতে হবে প্রথমে। তারপর কাসুন্দি কিংবা সরষের হলুদ বেঁটে নিয়ে তাহিয়ে সমস্ত আমটা মাখিয়ে নিয়ে রৌদ্রে দিন, তারপর কাঁচের অথবা পাথরের পাত্রে তুলে রাখুন। আম কাসুন্দি যখন তৈরী করা হয়, তখনও খাওয়া যায়।

সরষে কিংবা কাসুন্দি দিয়ে তৈরী করতে না চান তো ওইভাবে তৈরী করে নিয়ে ঘনে দিয়ে ও গুড়না সঙ্গে কিংবা পাঁচফোড়ন ভেজে নিয়ে গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিয়ে রৌদ্রে দু-চারদিন শুকাতে দিন। পাকা আমের এই আচার বেশীদিন ভাল থাকেনা। রুটি, পাউরুটির সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

আম শুকনো—

শক্ত শক্ত পাকা পাকা আম লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়ে নুনও ও হলুদের সামান্য পরিমাণে মাখিয়ে নিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে কাঁচের পাত্রে তুলে রাখতে হবে।

এই আমশুকনো দিয়ে বর্ষাকালে টক-ডাল, চাটনী খাওয়া যায়। ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে খুবসুস্বাদু অম্বল হয়। রন্ধন প্রণালী: সামান্য ভেজে ইলিশ মাছের মাথা কিংবা কাঁটাগুলো ভেজে নিয়ে তুলে রাখুন। এবার কড়াতে কয়েকটি সরষে ফোড়ন দিয়ে ধোয়া আম সুটি ও মাছের কাঁটা ঢেলে দিন। তারপর পরিমাণ মতো নুন, মিষ্টি ও কিঞ্চিৎ হলুদ দিয়ে ঢেকে দিন। পরিমাণ মতো ঝোল রেখে নামাতে হবে। ভাত ও রুটির সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

কচুর লতা (শিকড়ের মতো গোড়া থেকে বেরোয়) ও এই আম শুকনো দিয়ে ঘাঁটা করলে খেতে ভালই লাগে।

প্রস্তুত প্রণালী: আমশুকনো গুলো রান্নার সামান্য আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কড়াতে সরষে ফোড়ন দিয়ে কাটা লতাগুলো ও আম শুকনো ঢেলে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে সরষে বাটা দিয়ে নাম'ত জল দিয়ে ঢেকে দিন। লঙ্কা খুব কম দেবেন। নুনও মিষ্টি পরিমাণ মতো দিতে হবে। লতা রান্নার আগে একটুখানি সিদ্ধ করে নিতে ভুলবেন না।

যদি পাকা আমের এসব জিনিস তৈরী করে রাখতে পারেন তবে ওই ধরণের নানা রকম জিনিস তৈরী করে পরিবারের সকলের মুখের স্বাদ বদলাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে আর তাতে আনন্দ কিছু কম হবেনা।

চলতি দুনিয়া

পাকস্থলীতে ফোরসেপ্‌স

গতিয়াতে মিসেস জোসেফাইন অগাস্টাইন নামে এক ভদ্রমহিলার পাকস্থলী থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা একটি ফোরসেপ্‌স বের করা হয়েছে। ক'মাস পেছে বছর দুই আগে মিসেস জোসেফাইনের অপারেশন হয়েছিলো। অসতর্ক ডাক্তারদের অসাবধানতা বশতঃ ফোরসেপ্‌সটি তাঁর তলপেটে থেকে যায়।

চুম্বন বিষয়ে সেমিনার

জনসাধারণ, বিশেষ ক'রে ছাত্রদের, মতামত জানবার জন্য মিঃ এ. কে. শাহ 'রূপালী পর্দায় চুম্বন' বিষয়ে কতিপয় সেমিনার অনুষ্ঠানের কথা বলেন। তরুণ এবং বৃদ্ধরা একত্রে এই সেমিনারে যোগদান ক'রে আলোচনা করবেন এবং রূপালী পর্দায় চুম্বন প্রদর্শন উচিত হবে কিনা সেই বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করবেন। মিঃ শাহ ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্র জগতের উপরে নৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাখার পক্ষপাতী।

মিনি-স্কার্ট পরার বিপদ

প্যারিসের ফ্যাশন-সচেতন মেয়েরা মিনি-স্কার্ট প'রে বাইরে বেরুনো আর নিরাপদ মনে করছেনা। বিশেষ ক'রে সম্প্রতি সেখানে যে ঘটনা ঘটে গেছে তারপর। চারটি যুবতী মেয়ে মিনি-স্কার্ট প'রে যাচ্ছিলো লা ভলদ মার্কেটের পাশ দিয়ে। বাজারের কুলিরা ঠিক করলো অসভ্য পোশাকপরা মেয়েগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে। পুলিশ যখন এলো তখন মেয়েগুলো প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পীতে হি হি ক'রে কাঁপছে। মুলেভার্ড সেন্ট জার্মেইন-এ এমনি আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। মিনি-স্কার্ট প'রে একটি বার-মেড যাচ্ছিলো। একদল ছোকরা তার পিছু নিয়ে তাকে বিবসনা ক'রে ফেলে। ফ্রান্সের একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেছেন যে মিনি স্কার্ট মেয়েদের মুক্তির প্রতীক হতে পারে, কিন্তু—পুরুষরা এই পোশাক কখনই সমর্থন করতে পারে না।

শেরিডনের রসিকতা

ইংল্যাণ্ডের রসিক ব্যক্তিদের মধ্যে রিচার্ড শেরিডনের স্থান প্রথম সারিতে। একদিন তিনি সেন্ট জেমস স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় দেখা হলো রাজার দুজন ডিউকের সঙ্গে। তাদের

মধ্যে একজন ব'লে উঠলো: "এই যে শেরি, তোমার কথাই হচ্ছিলো। আলোচনা করছিলাম; তুমি মস্ত এক ধোকা না শয়তান। এ বিষয়ে তোমার নিজের মত কি?"

দু-দিকে দু-জনের হাত ধরে' শেরিডন জবাব দিলেন: "বলার আর কি আছে, আমি হলাম ধোকা আর শয়তান এই দুয়ের মাঝামাঝি।"

টাকা না থাকলেও বিপদ, থাকলেও

মুদ্রাস্ফীতি কী ব্যাপার আজ আর তা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার একটা অঞ্চল সাস্টিন-এ যে মুদ্রাস্ফীতি একবার ঘটেছিল সে রকম মুদ্রাস্ফীতি আজো আমাদের কল্পনার বাইরে। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে রুশ সৈন্যরা নাৎসী দুর্গরক্ষীদের যখন হটিয়ে দিলো সাস্টিন গ্রামের লোকেরা ভাবলো এতদিনে তাদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। হায়রে! তারা বুঝতে পারেনি তাদের দুঃখের দিন সবে শুরু হয়েছে। জার্মানদের পরিত্যক্ত নগর ভাণ্ডারে পাওয়া গেলো ২,০০০,০০০ পাউণ্ডের নোট। এত টাকা! কী হবে এই টাকা দিয়ে? শেষ পর্যন্ত স্থির হলো টাকাটা ভাগ ক'রে দেয়া হবে গ্রামবাসীদের ভিতর। জানা গেলো গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে পাবে প্রায় ৫০০০ পাউণ্ড ক'রে। শুনে তো গ্রামের মধ্যে নাচানাচি শুরু হয়ে গেলো। হবারই কথা। যে বস্তুর সপ্তাহ ছুটির পর পায় মাত্র দশ শিলিং সে হঠাৎ ৫০০০ পাউণ্ড পেলে নিজেকে তার কোটিপতি না ভাবার কোনো কারণ নেই। টাকা গ্রামবাসীদের হস্তগত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই স্থানীয় দোকানগুলির সব জিনিষপত্র বিক্রি হয়ে গেলো। নতুন জিনিষপত্রও দোকানগুলি আনতে পারছে না। যাও দু-একটা জিনিস আসছে তার জন্য কাড়াকাড়ি, মারামারি লেগে যাচ্ছে। ফলে জিনিসপত্রের দাম হয়ে গেলো আকাশ ছোঁয়া।

এক টুকরো রুটির দাম হলো পনেরো শিলিং। লোকজনের তো বিহ্বল অবস্থা। দোকানের সামনে লম্বা কিউ। কিউ-এর পুরোভাগে যারা আছে তারাই ভাগ্যবান, তারাই শুধু জিনিস পাচ্ছে। মাল আসার সঙ্গে-সঙ্গে তারা বের ক'রে দিচ্ছে নোটের তাড়া। তাই লাইনের শেষ দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কিছুই পাচ্ছে না।

ঘরে গিন্তা-গিন্তা নোটের বাণ্ডিল থাকা সত্ত্বেও বহু পরিবার হরি মটর খেয়ে রইলো। শুরু হয়ে গেলো রাজা রাজায় তা খাবারের ক্ষমতা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রইলো না। তখন অবস্থাপন্ন গ্রাম-বাসীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানালো তাদের অর্থ নিয়ে নিতে।

সরকারী কর্মচারীরা এসে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড গ্রাম থেকে নিয়ে গেলো। গ্রামবাসীরা আবার গরীব হয়ে পড়লো; কিন্তু তাদের শান্তি ফিরে এলো। জিনিস কম থাকলে আর অর্থ বেশি থাকলে যে কী দুর্দশা হতে পারে তা তারা হাড়ে-হাড়েই টের পেয়েছে।

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার মেয়ে চন্দনা। আন্তর্জাতিক কিশোরী সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সে হয়েছে প্রথম রানার-আপ।

বিজয় মুকুট লাভ করেছে ফিনল্যাণ্ডের ষোড়শী রূপসী কুমারী ক্রিশ্চিয়ানা কাকারেনা। ওই প্রতিযোগিতায় মোট পনেরোটি মেয়ে যোগ দিয়েছিলো।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাণীর আগ করেছে তেহেরাণের সুমারী শাহলা এবং রিয়োলিনার সুমারী সেংসুবু সাও।

চুম্বনে বিদ্যুৎ

ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকেরা জানাচ্ছেন প্রতি বিশ জনে একজন চুম্বনের সময় বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি ক'রে থাকে। সেই বিদ্যুতের রং নীল। অবশ্য যদি চুম্বনরত নরনারীর অধর শুষ্ক থাকে। এবং চুম্বনে ৫০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ সৃষ্টি হতে পারে। তবে এই বিদ্যুতে ভয়ের কিছু নেই। তড়িতাহত হবার সম্ভাবনা নেই।

মেয়েদের মুখ

ব্রিটেনের কোনো বড় দোকানের প্রসাধন দ্রব্যের বিভাগে গেলে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো দেখতে পাওয়া যাবে :—

১০০ রকম সেন্ট। ২০০ রকম মুখের পাউডার। ১১৭ রকম লিপস্টিক। ৫০ রকম মুখের ক্রিম। ৭০ রকম নোখ-পালিশ। ১০০ রকম গায়ের পাউডার। ৩০ রকম স্নানপুঁ।

১৯৬৭ সালে ব্রিটিশ মেয়েরা শুধু প্রসাধনের জন্যই খরচ করেছে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। এক সময় ক্যাসান ছিল মেয়েরা খুব ছোট্ট হাত ব্যাগ ব্যবহার করবে। এখন সব সময়ই কিছু কিছু প্রসাধন দ্রব্য বহন করার জন্য মেয়েদের হাত ব্যাগের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সব মেম সাহেবরাই কিন্তু লিপস্টিক মাখে না। ব্রিটিশ মেয়েদের মধ্যে লিপস্টিক ব্যবহার করে শতকরা ৮৪ জন।

হংকং-এ পত্নী ও উপপত্নী

এতদিন পরে হংকং-এর ঔপনিবেশিক সরকার স্থির করেছেন ওখানে পত্নী ও উপপত্নীকে আইনের দিক থেকে একই শ্রেণীর বলাও বিবেচনা করা যাবে না।

কিন্তু সরকারের এই নতুন সিদ্ধান্তে হংকং-এর অধিকাংশ প্রথম স্ত্রীরাই অসন্তুষ্ট। কারণ তারা নিজেরাই স্বামীদের বহু বিবাহে উৎসাহিত ক'রে আসছেন। দু নম্বর, এমন কি চার নম্বর স্ত্রী গ্রহণেও স্বামীদের উৎসাহিত করেছেন।

'কুয়াইন' এই নিষ্ঠুর কথাটা চীনারা উপপত্নী সম্পর্কে ব্যবহার করেন না, তারা বলে 'টি-সিপ।' প্রথমা বা প্রধান স্ত্রীকে বলে 'সাই।'

আধুনিকা সাই হারেমের কর্তা-কর্তা। হিংসার বা ঈর্ষাপরতন্ত্রতায় সে ভোগে না। অধিকাংশ চীনা স্ত্রীলোকই চায় স্বামী আরো স্ত্রী গ্রহণ করুক। য়ুরোপে অনেক গুলি সাড়ির যে মালিক সেই পুরুষের যে সম্মান, চীনে যে স্বামীর অনেক স্ত্রী তারও সে রকম সম্মান। সাই বা প্রধান স্ত্রীরও তাতেই গৌরব।

বিভিন্ন পত্নীরা একই বাসগৃহে থাকুক এই প্রধানা স্ত্রীর ইচ্ছা। তাতে খরচ কম। অনেক সাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর জন্য নতুন স্ত্রী ধ'রে আনে।

উপপত্নীকে ঘরে আনবার সময় আগে একটা অনুষ্ঠান করা হতো। সাই অভিনন্দন জানাতো টি-সিপকে আর টি-সিপ ঘরে এসে চা পরিবেশন করতো সাইকে। এই ছিলো অনুষ্ঠানের সরল রীতি।

চীনের প্রাচীন আইন অনুসারে টি-সিপ-এর গর্ভজাত ছেলে-মেয়েরা বৈধ ব'লে সমাজে স্বীকৃতি পেতো, আর পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাদেরও ছিলো অধিকার।

প্রায় চৌদ্দ বছর আগে প্রথম হংকং থেকে উপপত্নী-প্রথা তুলে দেবার প্রস্তাব আসে। কিন্তু তখন হংকং-এর সব চাইতে বড়ো আইনজ্ঞ স্যার মান কাম লু এই ব'লে ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন যে বহু বিবাহ প্রথা চীনের প্রাচীন বিধির দ্বারা স্বীকৃত, ১৮৪৩ সালে রচিত উপনিবেশের আদি সনদ দ্বারা রক্ষিত এবং বিশিষ্ট আইন জীবিদের দ্বারা সমর্থিত। মূলত: তারই বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবটি তখন বাতিল হয়ে যায়।

স্বামী এবং সাই-এর কথাবার্তা থেকে বহু বিবাহ প্রথার সুবিধা সম্পর্কে এক আঁচ পাওয়া যায়:

সাই: বহু বিবাহ প্রথা বেশ সুবিধার। অনেক সময় আমার ইচ্ছা করে না নাচের আসরে, নাইট ক্লাবে কিংবা থিয়েটরে স্বামীর সঙ্গে যেতে। সেই সময়ে আমার স্বামী টি-সিপদের একজন নিয়ে যেতে পারে।

স্বামী: কিংবা দু'জন টি-সিপকে।

সাই: কিংবা আমার মত বয়সালে আমাদের তিন জনকেই।

স্বামী: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

• • •

আস্তাকুড় থেকে

আস্তাকুঁড়ে রোজ কত কিছু যাচ্ছে বলে ফেলে দেন, ডিমের খোলা, ব্যবহৃত চায়ের পাতা, কফির ভগানি ইত্যাদি। জানেন কি এ জিনিসগুলিও কত কাজের।

ঐ ফেলে দেওয়া চায়ের পাতা অনেক কাজে লাগে। আপনার বাগানে যদি গোলাপ গাছ থাকে তবে তার গোড়ায় এই পাতা ঢেলে দিন। ভালো সারের কাজ করবে। একটা গামলে ওই চায়ের পাতা আর ডিমের খোলা রোজ জমা করুন। তারপর ডিমের খোলা গুঁড়ো ক'রে ওই চায়ের পাতার সঙ্গে মেশান। সপ্তাহ খানেক রোদে শুকিয়ে নেবার পর গোলাপ গাছের গোড়ায় ওই সার দিন। চমৎকার ফলপাবেন।

ঘরের মেঝেতে ঐ ফেলে দেওয়া ভেজা চায়ের পাতা ছড়িয়ে দিয়ে ঘর ঝাঁট দিন। কাজটা অনেক সহজ হবে এবং পরিষ্কার হবে। কারণ চায়ের পাতা আগেই মেঝের ধুলো টেনে নিয়েছে।

ব্যবহৃত চায়ের পাতার গরম জল দিয়ে তাতে কাচের বাসন পত্র ধুয়ে নিন, ঝক ঝকে করবে ঠিক যেন নূতন।

কফির ভগানির সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে তাই দিয়ে যে প্লেটে ডিম ছিল তা মাজুন দেখবেন কফির গন্ধ ডিমের গন্ধ দূর ক'রে দিয়েছে। প্লেট সাফ হয়ে গেছে।

স্বপ্ন-দর্শন ঃ শেক্সপীয়র বিষয়ক

সুপর্ণ রায়চৌধুরী

হয় মাথা খারাপ, নয়তো কপাল মন্দ। কার আবার? আমার। অন্তত আমার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনেরা এ ধারণা ক'রেই বসে আছেন। নইলে কোন ইংল্যাণ্ডে পাঁচ বছর কাটাবার পর কেউ খালি হাতে ফেরে? যারা কি হনলুলু যারা যায় তারাও ফেরার সময় নিয়ে আসে খেতাব, বিদেশী স্ত্রী, অন্তত একটি ট্রানজিস্টর সেট। আমি সে সবের কিছু নিয়ে ফিরিনি। সবাই আমাকে ধিক্কার দেয়!

সঙ্গে কিছু আনতে পারিনি ব'লে আমার কিন্তু এতটুকুও আপসোস নেই। আমি তো জানি কী আমি পেয়েছি, কী নিয়ে ফিরেছি। সেই সম্পদ কারো চোখে পড়বার নয়।

আর কিছুই নয়, একটি সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা। হয়তো বা আমারই মনের সৃষ্টি। তবু আমার কাছে তার চাইতে বাস্তব আর কিছু নেই।

একদিন লণ্ডন শহরের পথ দিয়ে সন্ধ্যায় একা-একা যাচ্ছিলুম। দোকান-পসার, বাড়ি-ঘর আলোতে ঝলমল করছে। অদূরে তারাভরা আকাশের গায়ে উঠে গেছে লণ্ডনের ঐতিহাসিক কেল্লাটির চূড়া। আর ক' পা বাড়ালেই বুঝি টেম্‌স নদী। হঠাৎ মনে হল নদীর দিক থেকে একটা কুয়াশা উঠে এসে আমার চোখ ঝাপসা ক'রে দিল। সেই আবরণ কতক্ষণ ছিল জানি না। যখন স'রে গেল, তাকিয়ে দেখি আমার চারদিকের দৃশ্যপট বদলে গেছে। সেই উজ্জ্বল আলোগুলি আর নেই। তার পরিবর্তে পথে, দোকানে, আর বাড়িতে মিটমিট ক'রে জ্বলছে তৈলদীপ কিংবা মোমবাতি। কলকাতা শহরে মাঝে-মাঝে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বিকল হ'য়ে পড়লে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। বাস, মোটরগাড়ি, স্কুটার ইত্যাদি আধুনিক যান-বাহনগুলি রাজপথ থেকে অদৃশ্য হয়েছে। পথে চলেছে শুধু ঘোড়ার গাড়ী, কেউবা চলেছে ঘোড়ার চ'ড়ে। আর হেঁটে চলেছে নানা ধরণের মানুষ: সওদাগর, নাগরিক, আর শ্রমিকেরা। ঘোড়ার গাড়ি কিংবা ঘোড়ার পিঠে দেখা যাচ্ছে রাজপুত্র, সামন্তপ্রভু, কিংবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের। কেউ কিন্তু কাউকে পরিহার ক'রে চলছে না। কেমন একটা একতা এদের মধ্যে।

কিছুদূর যেতেই যা চোখে পড়ল তাতে মন তারি খুশী হ'য়ে উঠল। চমৎকার মেলা বসেছে মাঠের মতো একটা জায়গায়। খেলনা, পুতুল, জামা-কাপড় নানা-রকম সৌখীন জিনিসের দোকান ব'সে গেছে। সেই সব দোকানে ক্রেতাদের অসম্ভব ভিড়। ভেলভেট, সাটিন সিল্ক, আর পশমের তৈরি, কারুকাজ করা পোশাকে মেয়েদের মনে হচ্ছে শীতের বাগানে ঘরওয়ালী ফুলের মতো। পুরুষদের

পোশাকও কম যায় না। তাতেও অলংকরণ। ঝুলা সালোয়ার হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা। হাঁটদাঁটি ছোক। অবাক হ'য়ে দেখছি এমন সময় একটা সোরগোল হতেই মাথা ঘুরিয়ে তাকালুম। কী ব্যাপার! একজন পকেট-মার ধরা পড়েছে।

আর দাঁড়িয়ে না থেকে, ভেসে ছাড়িয়ে চললুম আরো সামনের দিকে। পথগুলো কেমন সরু সরু। একটা জায়গা থেকে হৈ-হল্লোড় কানে আসতেই তাকিয়ে দেখি সেটা একটা সরাইখানা। জমিদার মক্কেলরা সেখানে বাজী পোড়াচ্ছে, পানাহার, আমোদ-ফুর্তি করছে।

এই রাস্তার ধারের বাড়িগুলি ভারি সুন্দর। কোনোটা পাথরের, আবার কোনোটা বা লাল ইটের তৈরি। ইটের বাড়িগুলির আবার অর্ধেকটা কাঠের। একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লুম। না ব'লে ক'য়ে ঢুকতে যে ভয় লাগছিল না তা নয়। কিন্তু আমাকে তখন কৌতূহলে পেয়ে বসেছে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে আরো ভালো লাগল। সুন্দর পর্দা দিয়ে জানলাগুলি মোড়া। সিলিংএ বিচিত্র কারুকাজ। অনেকের সিঁড়ি। মনে হল রূপকথার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি।

কৌতূহল তৃপ্ত করে আবার বেরিয়ে পড়লুম পথে। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলুম। সম্বিত ফিরতেই তাকিয়ে দেখি টেমস্ নদীর ধারে হাজির হয়েছি। নদীর বুকে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য জাহাজ। হাওয়ায় উড়ছে পাল। মনে হচ্ছে দূর অজানা দেশে যাবার জন্য যেন উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে ওই অসংখ্য জলযান।

নদীর ধারেই একটা থিয়েটর। বাস্তিলের মতো উজ্জ্বল। কী একটা নাটক অভিনীত হচ্ছে। তাই দেখার আশায় লাখো লণ্ডন শহর যেন ভেঙে পড়েছে এখানে। দর্শকদের ভেতরে আছে বণিক, কারিগর, ঐশের প্রেমিকা, আইন-ব্যবসায়ী, জমিদার ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মানুষ। থিয়েটরটিকে মনে হল মানুষের মিলন-তীর্থ।

থিয়েটর পেছনে ফেলে এসে দাঁড়ালুম একটা প্রায় নির্জন পথের মোড়ে। এখানে দু তিনটে রাস্তা এসে একসঙ্গে মিশেছে। দুতিন জন লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। তাদের পোশাক, চেহারা, আর ভাব-ভঙ্গি মোটেই সুবিধার ঠেকল না। বাঁ দিকের পথটা ধ'রে ন'য়ে পড়বো ভাবছি, আমার মনের গতি আঁচ ক'রে কে যেন পাশ থেকে ব'লে উঠল: "ও তো জলাভূমির পথ, আরো বিপজ্জনক।" বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল কোথায় যেন ওঁকে দেখেছি। তীক্ষ্ণ চোখে ধিষ্ণতা। প্রশস্ত ললাট। মস্ত টাক। তবু তিনি সুদর্শন।

কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কে পাশে ধাক্কা দিয়ে বলল: "ও মশাই! আপনি যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই পথ চলছেন! বিপদে পড়বেন তো।" চোখ খুলে দেখি পুলিশ।

মর্যাদা

প্রত্যুষ কুমার রায় চৌধুরী

ঐ বিল্ডিং দেখেই নিরুপার বাপ-মা ভুলেছিল আর সব। আশেপাশের সবাই বলতো—হ্যাগো, শুধু দালান দেখেই ভুললে নিরুপার মা? শুনছি কোন খোঁজ খবরই করলেনা পাত্রের? নিরুপার মা শুধু একটু মুচ কি হাসে। অবাক মেয় নিরুপাদের মুখরা কি, তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন গা? হিংসিংশির যা ভাগ্যি, দেখবে যার ঘরে যাবে একেবারে রাজরাণী হয়ে যাবে। সে জানতো, অমন সুন্দর যার মুখশ্রী, অমন মিষ্টি যার স্বভাব, তাকে কি আর বিধাতা যেখানে সেখানে দিতে পারেন?

রাজপথ জুড়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঐ প্রকাণ্ড বিল্ডিং বিরাট দৈত্যের মতো। ঐ দানবের ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে সনতের আপিসে। বেশী খোঁজখবর করেননি সেদিন নিরুপার বাবা মোহনবাবু।

একদিন তিনতলায় আপিসে গিয়ে মোহিনীবাবু লাগনে টেলিফোন অপারেটারকে দেখে পাত্রের বিষয় গোপনে খোঁজখবর করতেই অপারেটার মৃদুস্বরে বলে উঠলো—মিস্টিরি মনে মশাই, মিস্টিরি মনে। এত বড় বিল্ডিং-এর আপিস—তারা কি যা-তা মাইনে দিতে পারে? কলকাতায় কটা এত বড় দালান দেখতে পান বলুনতো। পাত্রের প্রশস্তি অপেক্ষা বিল্ডিং-এর প্রশস্তি শুনেই মোহিনীবাবুকে নানা রঙীন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ফিরে আসতে হলো সেদিন। তিনিও মনে মনে ভাবলেন, পাশ করা সবৎ, অত বড় বিল্ডিং-এ কাজ করে, টাকা আনার মাইনেটা ঠিক না জানলেই বা এমন কি এসে যায়?

আসছে ২৩শে বৈশাখ বিবাহের দিন ধার্য্য হলো। ঘটা করে সেদিন মোহিনীবাবু আদরের একমাত্র নিরুপাকে পাত্রস্থ করলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় সবৎ-এর ঘরে বসুন বৌ হয়ে গেল নিরুপা। ওরা তিনিতে পদার্পন করেছিল বলে সবৎ আদর করে নিরুপার নাম রাখলো ওরা। এই নাম রাখা নিয়েই কত না হাসি ঠাট্টার মধ্য দিয়ে কাটলো বৈশাখী বাসর ঘর। ক্রমে সন্ধ্যা তারুণ্যে এল প্রকৃতির নিয়েছিলো নিরুপা ক'দিন যাবেই। সনতের নাম রাখলো সে মিস্টার সিন্‌। আহাজের মতো চয়ের বিরাট বিল্ডিং-এ আপিস করে—তাই।

এমনি করে আনন্দ হাসি ভালোবাসায় কাটতে লাগলো দাম্পত্য জীবনের মধুর মুহূর্তগুলি। বছর আয়ের ছোট সংসার। বিরাট বিশ্বপ্রাণী চাহিদার সমুদ্রীন হতে হয়নি বলে যাহোক করে কাটিয়ে দিলো তারা দু'বছর। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও খরচার খাতা প্রথম সবৎকে মাতাবাবুর

করে দিলো সেদিন—যেদিন আরেক বৈশাখী পূর্ণিমায় নিরুপাকে হাসপাতালে রেখে এলো। একদিনতো অজ্ঞান অচৈতন্য হয়েই ছিলো নিরুপা। ডাক্তাররাও নানা জটিল উপসর্গ দেখে আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। স্বামীর মানসিক অবস্থা বুঝে চোখ মেলে এরি মধ্যে একদিন নিরুপা বলছিলো—কোনো চিন্তা করোনা, আমু খুকুমণি ভাল হয়ে উঠবো। ভগবানকে ডাকো। সান্ত্বনার কথা শুনে নিরুপার শিয়রে সনৎ-এর দুফোঁটা চোখের জল টপটপ করে পড়লো। প্রবল যন্ত্রনার মধ্যেও স্বামীকে বললো—ছিঃ কাঁদতে নেই।

ঘরে মানুষে টানাটানি করে সাতদিনের দিন সিজারিয়ানের সাহায্যে প্রসব করালো একটি ফুটফুটে মেয়ে। ঐ সুন্দর চেহারার মধ্যে অভিশাপের চিহ্ন আঁকা—একটি চোখ কানা। কেউ বললে, বড় হয়ে সেরে যাবে। কেউবা বললে, এখনই আই-স্পেশালিষ্টকে দেখিয়ে অনবরত চিকিৎসা করানো দরকার, ভাল হলেও হতে পারে। হাসপাতালের ডাক্তারেরা ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলে দেননি। শুধু ডাঃ বোসের হাউস-সার্জেন বলেছিলেন,—দেখুন সনৎবাবু, এই হাসপাতাল বলে ইনি এবার প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু সাবধান। আর যদি কোন ইস্যু হয় অদূর ভবিষ্যতে —তাহলে আর একে বাঁচানো যাবেনা।

বৃহস্পতিবার শুভদিন। সনৎ আপিস না গিয়ে নিরুপা ও নবজাত শিশুকন্যাটিকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরলো। পাড়াপড়শী যে দেখতে আসে সেই একবার বলে ওঠে—মাঃ কি সুন্দর মেয়ে, খাসা দেখতে! বলেই আচমকা থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপার ও সনতের মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়ে।

ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের উল্টোদিকে পাঁচ সাতটি ওষুধের নাম লিখে দিয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। সনৎ নামগুলি পড়ছে আর কপালে হাত দিয়ে ভাবছে—এবার নিরুপার চিকিৎসা করবো, না মেয়েটাকে একজন আই-স্পেশালিষ্ট দেখাব। কোন কুলকিনারা খুঁজে পায়না সনৎ। দু'টোতেই সনতের মত একজন সাধারণ কর্মচারীর পক্ষে বিরাট অর্থের চাপ পড়বে। এদিকে হাসপাতালে নিরুপার চিকিৎসায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সনৎ আপিসের সবগুলো ফণ্ড নিঃশেষ করে রেখেছে। না আছে প্রভিডেন্ট ফণ্ড, না আছে ক্রেডিট সোসাইটির কোন পাওনা। এবার কি করা যায়? আকাশ পাতাল ভেবে অসাড় হয়ে পড়ে সনতের মেহমন। মাকে একবার ফুফুকে বলি কি বল?—জিজ্ঞেস করে নিরুপা। স্বামীর মৈত্র প্রকাশ পায় বলে এতদিন কষ্ট হলেও জানাবো সমীচীন বলে মনে করেনি সে।

সনৎ একবার ভাবে স্ত্রীর চিকিৎসারই আগু প্রয়োজন। মেয়েটার চিকিৎসা দু'মাস বাদে হলেও কোন ক্ষতি নেই। পরক্ষণেই পিতৃস্নেহ অজান্তে পথরোধ করে বলে। ভাবে, সে কি করে সম্ভব?—অসহায় শিশু, তাতে একটা চোখ নেই। কথা কোটেনি বলে তার প্রতি উদাসীন থাকা···নানা সে হবেনা। দিনের পরদিন এমনি অহেতুক ভাবনা ভাবতে ভাবতে সময় চলে যেতে লাগলো। কোন দিকেই কূল পাবার কোন স্পষ্ট পথরেখা দেখতে পেলনা সনৎ। সংসারের নিত্যকার খুঁটিনাটি জোগান দিয়ে চিকিৎসার দিকে পা বাড়াতে পারেনা। শুধু চিন্তায় একবার অসাড় হয়ে পড়ে, আবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে প্রচণ্ড খরচার তালিকা সনতের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়।

ছ'মাসের মধ্যে সরতের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সেই হাসি-ঠাট্টা ঘনিষ্ঠতার পরস্পর আক্রমণ এরি মধ্যে তারা বেমালুম ভুলে গেছে। স্বপ্নের মতো মাঝে মাঝে স্মৃতিগুলি মনের কোণে উঁকি মারে, আবার মিলিয়ে যায়। পরক্ষণেই মনে হয় সব মিথ্যা, সব ফাঁকি, সব ছলনা। থেকে থেকে সরতের কেবলই মনে হয়, নিরুপাকে বিয়ে করা আদৌ উচিত হয়নি। অবশ্যের ঘরের একমাত্র আদরের কন্যা মোহিনীবাবুর। ছিঃ, নানা, শেষ পর্যন্ত আমার উপযাচক হয়ে বসাই ভাল ছিল যে বিচ্ছিরি দেখে ভুলবেন না। আমার তাতে, তারা বড় চালুরে তাহলে আমি কি করবো? আমিতো তাদের ঠকাইনি। আমাকেতো বিয়ের আগে বাইনে জিজ্ঞেস করেনি কন্যাপক্ষের কেউ। হঠাৎ মুখ দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এলো—আমার কি দোষ? শুনতে পেলো নিরুপা। বাবাকের থালাটা রেখে বললে,—বলেছিই তো তোমার কোন দোষ নেই। যে যার অদৃষ্ট নিয়ে আসে। বরাতে যা আছে হবে। শোন, বাবাকে চিঠি লিখেছি মিছর অসুখ বলে; টাকা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন। —না গো না, টাকা পেলেই আমার সব দোষ খণ্ডন হয় না। থেকে থেকে কেবলি মনে হয়—নিজের আনন্দ সুখ শান্তি খুঁজতে গিয়ে একটা মেয়ের জীবন কেমন মাটি করে দিয়েছি, বলতে সরৎ।

নিরুপা বুঝলো এখন কিছু না বলাই ভাল। তৎক্ষণাৎ মেয়ের কান্না শুনে চলে যেতে যেতে শুধু সরতের হতাশার দীর্ঘশ্বাস কানে এলো।

দিন দিন সরৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে যেতে লাগলো। তাকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়—সে বড় অসহায়, পথশ্রমে ক্লান্ত। আপিস যায় আসে। মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে। নিরুপা ঘরসংসার দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হয় না।

নিরুপার চিঠি পাওয়া মাত্র আপাততঃ দু'শ টাকা পাঠিয়ে দিলেন মোহিনীবাবু। লুকিয়ে লিখলেন—

"নিরুপা, কতটা বিপন্ন হলে তোমার মত মেয়ে টাকা চেয়ে চিঠি লিখতে পারে আমি বেশ বুঝি। এ টাকা সংসারের অন্য কোনদিকে খরচা না করে আমার ঝিনিঝণির চিকিৎসায় ব্যয় করো। সেদিনের কথা ভেবে আজ বড় কষ্ট হয় মা। বিচ্ছিরি দেখে ভুলেছিলাম, কোনদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করিনি।"

আপিস থেকে এসে সরৎ টেবিলের উপর থেকে লুকনটা নিয়ে পড়তে লাগলো। শেষ লাইন পড়তে পড়তে কান্না চেপে রাখতে পারলো না; নিরুপা লক্ষ্য করতেই সংবরণ করবার বৃথা চেষ্টা করলো।

—কি হচ্ছে? সন্ধ্যেবেলা চোখের জল ফেলছে মেয়েটার অকল্যাণ হবে যে! নিরুপা বুঝেছিলো মেয়ের অমঙ্গলের ভয় না দেখালে আর যে কথাই বলা যাক কান্না আরো প্রবল বেগে ফেটে পড়বে।

যাচ্ছিয়ে খাওয়া খাওয়ার পর কথা প্রসঙ্গে নিরুপা বললো, আমারতো এ ক'মাসে শরীরের অবস্থা বিনা চিকিৎসায়ই অনেক ভাল; এবার মেয়েটার দিকে নজর দাওতো।

—দেখি।

একটু পরে বলল, মিছামিছি আমাকে প্রবোধ দাও কেন? দেখছ তোমার বাবাও লিখেছেন, বিচ্ছিরিটাই তাঁর চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগিয়েছে। আমার সব খুলে বলাই ভাল ছিল, এ আমারই দোষ। আর যদি কারো কোন দোষ থাকে তো ঐ বিচ্ছিরি-এর।

চোখের বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, এ ক'টি মাস কি করেছিলেন? প্রথম দিকে আসলে নিশ্চয়ই ভাল হতো! বাঁ চোখের রেটিনা একেবারে ডামেজড্। নিরুপা কাতরকণ্ঠে বললে, আপনি ভাল করে চেষ্টা করে দেখুন, টাকার জন্যে ভাববেন না। বলেই চোখ মুছিয়ে রেখে সনৎ মেয়েটার বাঁ চোখের দিকে তাকিয়ে আছে পাথুর দৃষ্টিতে।

বহুরকমের ওষুধ করে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হলো। মোহিনীবাবু এর যা কিছু খরচার বহন করছেন। সেদিন মেয়ের চিঠি পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত ও উৎফুল্ল হলেন মোহিনীবাবু। ভাবলেন, ভগবান মুখিয়া মুখ তুলে চাইলেন এতদিনে। ক্রমে তাঁর ছোট্টমিনিমণি দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে। জানালেন, আসছে পুজোতে তোমাদের কাছে যাচ্ছি নিরুমা। আশাকরি আমার টুকটুকে মিনিমণি তখন দু'চোখ দিয়েই আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারবে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।

চিঠিটা প্রথমে সনতের হাতে এসে পড়লো। এবার শেষ লাইন পড়ে হেসে ফেললো সনৎ। মোহিনীবাবুর চিঠির শেষ লাইনটি সনতের কানে বিদ্রূপের মতো বাজলো।

যতই পুজো ঘনিয়ে আসছে, নিরুপার শরীর ক্রমেই ভেঙে পড়তে লাগলো। আপিস-ফেরতা কোনদিন একটা সেদ্ধ কোনদিন একটা বেদানা হাতে করে বাড়ী ফেরে সনৎ। এ সময় নাকি ফল খাওয়া ভাল।

পুজোর সাতদিন মাত্র বাকি। পঞ্চমীর দিন এসে পৌঁছুবার কথা মোহিনীবাবুর। জীবনে প্রথম মেয়ের বাড়ী আসছেন। বারণ করে আর চিঠি দিলো না নিরুপা শরীর খারাপ বলে। যথা সময়ে এসে উপস্থিত হলেন মোহিনীবাবু। মিনিমণি অনেকটা ভাল। আনন্দ হলো। কিন্তু শাঁখকে উঠলেন মেয়ের শরীরের অবস্থা দেখে। বাবা আসবার আগেই নিরুপা অনেকদিন আগেকার ওষুধের খালি ফাইল দু'তিনটে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলো। চিকিৎসা হচ্ছে না বলে বাবা দুঃখ পাবেন—তাই এ ছলনার আশ্রয়।

গভীর রাত্রিতে মোহিনীবাবু বললেন সনৎকে—নিরুকে এক্ষুনি নিয়ে যাও হাসপাতালে। তোদের অপেক্ষায় আর থেকো না। আমি বরং বাড়ীতে মিনিমণিকে দেখছি। আবার সেই হাসপাতালে ভর্তি হলো নিরুপা।

ষষ্ঠীরদিন বিকেলে হাসপাতালে গেলেন মোহিনীবাবু। মেয়ে নিয়ে রইলো সনৎ। চিন্তা মন সব কিছু পড়ে রইলো হাসপাতালে। টেবিলের ওপর ওষুধের ফাইলগুলির দিকে চোখ পড়তেই অজানা আতঙ্কে সনতের বুকটা কেঁপে উঠলো। বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরী হলো না খালি ফাইলগুলির অর্থ কি, এগুলোর ভিতর দিয়ে স্বামীর কৈফ চেকে তার নিরুপা কি বলতে চায়।

ছুটিও পাওয়া নেই। না গেলে সরাসরি মাইনে কাটা যাবে। ঐ অশান্ত মন নিয়ে পরদিনও তাকে আপিস যেতে হলো। ঐ আপিস বিল্ডিংটা যতবার সনতের চোখে পড়ে ততবারই ভয়ে কেঁপে ওঠে তাঁর অন্তরাত্মা পর্যন্ত। তবুও ঢুকতে হয় তারই গহ্বরে।

আপিস থেকে হাসপাতাল ঘুরে বাড়ী যাবার কথা আজ সনতের। শ্বশুর মশায় পথ চেয়ে বসে আছেন বহুক্ষণ ধরে। হাসপাতালে গিয়েই সনৎ জেনেছে সকাল থেকেই নিরুপার অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেলা এগারোটায় মেজর অপারেশনের সাহায্যে মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করানো হয়। প্রসূতি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। ডুকরে কেঁদে উঠলো সনৎ একইভাবে নিরুপার শিয়রে।

অক্সিজেনের নল ও যন্ত্রপাতি চারিদিক থেকে তাকে ও নিরুপাকে যেন ঘিরে রেখেছে। একবার নিরুপার বিবর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে তাকাচ্ছে আবার চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে নলগুলোর দিকে। নিজু আর তার দিকে তাকায় না। মিটারের কাঁটা নড়েচড়ে সনৎকে আশ্বাসে যেন আশিয়ে দিচ্ছে তার নিরুপার শেষ সময় ক্রমে ঘনিয়ে আসছে। বসে থাকতে পারলোনা আর নিরুপার পিয়রে। হনহন করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতালের সীমানার ভিতরের এক মাঠে ঘাসের ওপর অসাড় হয়ে বসে পড়লো সনৎ। কোন হুঁস নেই অনেকক্ষণ। কে এসে তখন তাকে বাড়ী নিয়ে গেছে জানে না।

রাত তিনটের সময় বাড়ী থেকে ধীর পদক্ষেপে সে বেরিয়ে পড়লো। দুর্বল পা দুটোকে চালিয়ে দিলো হাসপাতালের দিকে যেখানে তার নিরুপা শুয়ে আছে।

মহাষ্টমীর সকাল। পুজোর বাজনা চারদিক থেকে ভেসে আসছে সনতের বধির কানে। নিরুপা কাউকে ডোকাল না, অর্থব্যয় করালো না। নিজেই যেন মৃত্যুর কাছে একপা একপা করে এগিয়ে গেলো। এক ফোঁটা জলও পড়লো না সনতের চোখ থেকে; সব জল শুকিয়ে গেছে। নিষ্প্রাণ পাথরের মতো বসে আছে সনৎ। অদূরে হাউস্-সার্জনের অস্পষ্ট কণ্ঠে চমকে উঠলো সে,—আগইতো সাবধান করে দিয়েছিলাম যে ভবিষ্যতে কোন ইন্জু হলে আর একে বাঁচানো যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে নানা অনলের কথা কাহিনী স্মৃতি সনতের শোকতপ্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিলো।

এতবড় শোকাঘাতের পর সাতদিন কারো সাথে কোন কথা বলেনি সনৎ। বিরাট ছুটি পেয়েছে জীবনে। প্রচুর সময় হাতে। অফুরন্ত অবকাশ। সাতদিন বাদে সোমবার দশটার বহু পূর্বেই আপিসে গিয়ে সে হাজির হলো। অসময়ে উপস্থিত দেখে প্রথমে অনেকে অবাক হয়ে গেলো। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। আধময়লা একটা সার্ট গায়ে। বেলা তিনটের সময় কতগুলো চিঠি ডেস্পাচে দিতে গিয়ে কাউন্টারের বাইরে এক ভদ্রলোকের দিকে তার দৃষ্টি পড়লো। তাকিয়ে দেখে, সে কি যেন জিজ্ঞেস করছে টেলিফোন অপারেটারকে। একটু পাশে গিয়ে শুনতে পেলো অপারেটার বলছে—মাইনে জিজ্ঞেস করতে হয়? এত বড় বিল্ডিং-এ সাত বছর কাজ করছে—সেকি খাতা মাইনে পেতে পারে? কথা শেষ করতে না করতে সনৎ ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিলো টেলিফোন অপারেটারের গালে। চীৎকার করে বলে উঠলো—অসভ্য পাজি বদমায়েস। আমার জীবন নষ্ট করেছ, আবার বিল্ডিং দেখিয়ে এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ ডেকে আনছ?

হৈচৈতে চেম্বার থেকে অফিসাররা বেরিয়ে এলো। আশেপাশের কর্মচারী এসে তাকে তার নিটে সরিয়ে নিয়ে গেলো। তখনও ঐ বিশ্রী অবিন্যস্ত চেহারায় সনতের চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করছে।

চিত্র মিত্র

জার্মান ছায়াছবির কাহিনী

কোল্ডহার্ট

[স্থান : জার্মানীর দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল। ব্ল্যাক ফরেস্ট।]

কাহিনীর নায়ক পিটার। অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে। নিকটবর্তী শহরে কাঠ-কয়লা বিক্রি ক'রে তার বাবা সংসার চালায়।

এই ব্যবসায়-এ বাবার সহকারী হিসেবে কাজ করে পিটার। একদিন কাঠ-কয়লা বিক্রি করতে বাবার সঙ্গে সে শহরে গেলো। শহরে চোখে পড়লো তিনজন ধনী যুবক বিলাস-ব্যসনে দিব্যি দিন কাটাচ্ছে। তারা যে-রকম বেপরোয়া ভাবে ফুর্তি করছিলো তাতে মনে হয় না, পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট আছে। দেখে শুনে পিটার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারও যদি থাকতো অনেক টাকা! সে দেখিয়ে দিতো কাকে বলে জাঁক-জমক। দেখে দুনিয়ার লোক তাজ্জব ব'নে যেতো। পিটার স্বপ্ন দেখে সে যেন পেয়েছে এক রাজার ঐশ্বর্যের সন্ধান। কিন্তু তা কি হবার?

বাড়ি ফিরতে হয় বনের পথ দিয়ে। বনের ভিতরে দেখা হলো এক প্রেতের সঙ্গে। প্রেত তার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহারই করলো। শহরের যাদের সে দেখেছে সেই ধনী যুবকদের মতো অসম্ভব বিত্তবান ক'রে দেবার জন্ত সহসা প্রেতকে অনুরোধ করলো পিটার।

প্রেত রাজী হলো। বললো : "তোমাকে দেবো আমি রাজার ঐশ্বর্য। কিন্তু তার পরিবর্তে আমাকে দিতে হবে তোমার হৃদয়। তুমি মানুষ, মানুষের একটি হৃদয় আমার দরকার।"

পিটার প্রেতকে তার স্বরূপটি দিয়ে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে চ'লে গেলো তার সমস্ত সুকুমার অনুভূতি, কল্পনা-শক্তি, মহত্ত্ব। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ভোগমত্ত, স্থূল এক জীবনের পঙ্কে ডুবে গেলো পিটার। দয়া-মায়া, স্নেহমমতা কোনো কিছুরই আর বালাই রইলো না।

একদিন বাড়ি ফিরে তো স্ত্রীর সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করলো। স্ত্রী একটু প্রতিবাদ করতেই পিটার ভয়ানক রেগে গিয়ে স্ত্রীকে খুন ক'রে ফেললে। স্ত্রীর রক্ত দেখে তার কিন্তু ভয়ানক অনুতাপ হলো, নিজে কতখানি জানোয়ার বনে গেছে তা বুঝতে পারলো। এতদিনে উদয় হলো শুভবুদ্ধি।

বনে গিয়ে প্রেতকে অনুরোধ জানালো "আমার স্বরূপ ফিরিয়ে দাও।" প্রেত মুচকি হেসে বললো: "তা ফিরিয়ে দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই। ফিরে পেতে হবে তোমাদের নিজেকেই, কঠোর পরিশ্রম আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে।

অভিনেত্রীর জীবন

জোয়ি হেথারটন

হলিউডের চিত্র-তারকাদের নামের তালিকায় একটি নতুন নাম সংযোজিত হয়েছে: জোয়ি হেথারটন। এই নতুন অভিনেত্রী বৈধে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, স্বাস্থ্যবতী এবং রূপসী।

"হাই স্ট্রাড' হাল্ড' হোল্ড' ছবিতে অভিনয় ক'রে জোয়ি হেথারটন সর্বপ্রথম খ্যাতি অর্জন করেন। ওই ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রিচার্ড হেথারলিন। এর পরে 'হোয়েয়ার দ্যাট হাজ গন' ছবিতে এক কিশোরী খুনীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে তিনি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। ওই ছবি দেখে বিখ্যাত চিত্র-প্রযোজক ওয়ার্নার ব্রাদার্স জোয়ির অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন এবং তার সঙ্গে পাঁচ বছরের একটা চুক্তি করেন।

শুধু কি রুপালি পর্দায়? মঞ্চে এবং টেলিভিশনে অভিনয় করেও শ্রীমতী হেথারটন হাজার-হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছেন।

মার্কিনী চিত্র জগতে যৌবনের নতুন প্রতীক জোয়ি; তবু সে এখনো যেন আছেন শৈশব অবস্থায়। সং আরল্যাণ্ডের রকভিল সেন্টারে থাকেন মা-বাবার সঙ্গে। অবশ্য হলিউডে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে রেখেছেন যাতে দরকার মতো সেখানে গিয়ে থাকা যায়। টেলিভিশনের অভিনেতা রূপে জোয়ির বাবা রায় হেথারটন মোটামুটি পরিচিত। অভিনয়ের ব্যাপারে জোয়ি বাবার কাছে বাবাভাবে ঋণী। জোয়ির ভাই ডিক গান গাইতে পারে, পারে পিয়ানো এবং গীটার বাজাতে।

শহরের ঠিক মাঝখানে জোয়ির বাড়িটি বাস্তবিকই একজন উদীয়মানা অভিনেত্রীর উপযুক্ত পটভূমি।

জোয়ির মা সব-সময়ই নজর রেখেছেন মেয়ের দিকে, যেন তার মেয়ে এখনো শিশু। ইয়োপের নাবালেপে ছবিতে অভিনয় করার জন্ত যখন জোয়ি যান তার মা-ও যান সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েকে এতই ভালোবাসেন তিনি। আর মেয়েরও হয়েছে তেমনি। মাকে ছাড়া এক দণ্ডও তার চলে না।

ছায়াবাণী সংবাদ

বালিকা বধূ

চিত্রদীপ নিবেদিত নতুন বাংলা ছায়াছবি 'বালিকা বধূ' বিমল করের একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত। বিবাহিত এক কিশোরীর মনে কী ক'রে ধীরে-ধীরে যৌবনের সাড়া জাগলো তা-ই এই কাহিনীর উপজীব্য। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগতা রূপসী অভিনেত্রী মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পার্থ মুখার্জী, ধূর্জটি গাঙ্গুলী, অরুণ কুমার ধাল, অরুন্ধতী গুপ্তা, প্রসাদ মুখার্জী, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য ব্যানার্জী এবং আরো অনেকে। ছবির পরিচালক তরুণ মজুমদার। ছবিটি চলেছে শ্রী, প্রাচী এবং ইন্দিরা চিত্র-গৃহে।

দো দিলন কি দাস্তান

প্রদীপ কুমার নিবেদিত সাম্প্রতিকতম ছায়াছবি 'দো দিলন কি দাস্তান'। ছবির নায়ক এবং পরিচালক প্রদীপ কুমার নিজেই। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বৈজয়ন্তীমালা। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রেহমান, শশীকলা, হেলেন, নাজির হোসেন, বাসবী নন্দী ও ওম প্রকাশ।

লণ্ডনে ডাক্তার জিভাগোর দ্বিতীয় বৎসর

পাস্তেরনাক-এর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ও অ্যাকাডেমী পুরস্কার বিজয়ী ছায়াচিত্র 'ডাক্তার জিভাগো' লণ্ডনের দর্শকদের মন জয় ক'রে নিয়েছে। ওখানকার প্রেক্ষাগৃহ এম্পায়ার থিয়েটরে পুরো একবছর ধ'রে ছবিখানা চলেছে, দ্বিতীয় বছর শুরু হয়েছে। বক্স-অফিসের ইতিহাসে এক নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে। খুব কম ছবিই এক প্রেক্ষাগৃহে এতদিন ধ'রে চলেছে।

৩,০০০,০০০-এরও বেশি ইংরেজ দর্শক ছবিখানা দেখেছেন। এদের মধ্যেও অনেকে তিনবার চারবারও ছবিখানা দেখেছেন। রাণী এলিজাবেথ, রাণীমাতা এবং রাজকন্যা মার্গারেট প্রথম দিনেই দেখে নিয়েছেন।

'ডাক্তার জিভাগোতে' যারা অভিনয় করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা অভিনেত্রী। এঁদের মধ্যে আছেন জেরাল্ডিন চ্যাপলিন, জুলি ক্রিস্টি, টম কোর্টেনে, রালফ রিচার্ডসন, ওমর শরিফ এবং আরো অনেকে। ছবির কিছু দৃশ্য তোলা হয়েছে ফিনল্যাণ্ডে। ১০০ ও ওপরে ন্যাপল্যাণ্ড ফিগলীবাদের পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে হাজির রয়েছে।

মাধবী মুখোপাধ্যায় বিদায় নিচ্ছেন

বাংলার বিখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় শীঘ্রিরই চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' ছবিতে অভিনয় ক'রে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ব্যক্তিগত কারণে তিনি চিত্রজগৎ ত্যাগ করবেন। সেই কারণ জানাতে তিনি অনিচ্ছুক। তবে বাজারে জোর গুজব তিনি নাকি রাজ পরিবারের কাকে বিয়ে করবেন।

তিনি বলেন: 'আমি চাই কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী ও অন্তত দুটি সন্তানের স্নেহশীলা জননী হতে।'

খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত অবস্থায় মাধবীর বিদায় বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে। কারণ বর্তমানে বাংলায় প্রতিভাবতী অভিনেত্রীর সংখ্যা খুবই কম।

মাধবী এসেছিলেন মঞ্চ থেকে পর্দায়। তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করেন চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ।

নট-নটী

অভিনেতার পরিচয়

দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে বিমানে লণ্ডনে পৌঁছবার পর অভিনেতা ডেভিড নিভেন বিমান বন্দরে একটু বিশ্রাম করছিলেন। বিশ্রামের পর আবার বিমানে উঠে অবাক হয়ে দেখলেন তার আসনে বসে আছে মধ্যবয়সী একজন ইংরেজ স্ত্রীলোক। কৌশলে তিনি স্ত্রীলোকটিকে আসন থেকে তুলে দিলেন। আসন থেকে যাবার সময় হঠাৎ সে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলো: "আমি আপনাকে চিনি।"

'ঘি রোমস্' ছায়াছবিতে আপনাকে দেখেছি।" কী বিপদ! অভিনেতা অভিনেত্রীদের কোথাও গিয়ে অপরিচিত থাকবার, গা ঢাকা দেবার উপায় নেই। একজন না একজন তাদের চিনে ফেলবেই। খ্যাতির বিড়ম্বনা।

মিস য়ুনো অনো-র ব্যবসায়

মিস য়ুনো অনো-র ব্যবসায় হলো পুরুষ ও মহিলাদের পেছন থেকে ছবি তোলা ও সেই ছবির পর য়ুরোপ ও আমেরিকার চিত্র ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা। কিন্তু লণ্ডনের রয়েল অ্যালবার্ট হলের পরিচালকেরা তার ছবি কিনতে অস্বীকার করেছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বেঁচে থাকলে শুধু কি অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হতেন?

বারবারা পারকিনস

'পেটন প্লেস'-এর নায়িকা ছিলেন বারবারা পারকিনস। সম্প্রতি তিনি 'ভ্যালি অব দি ডলস' বা 'পুতুলের উপত্যকা' নামে একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এর পরে তিনি যে ছবিতে অভিনয় করবেন তাতে অভিনয় করবেন অভিনেতা মাইকেল কেইন এবং সিটার ও'টুল।

ডুমিনিটের খরচ

টনি কার্টিস-এর 'ডোণ্ট মেক ওয়েভস' ছায়াছবিতে সমুদ্রে ডুব দেবার একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। দৃশ্যটির স্থায়িত্ব মাত্র দু মিনিট। শুধু এরই জন্য ব্যয় হয়েছে ১০০,০০০ ডলার। আর ইনসিউরেন্স করতে হয়েছেই।

জে মস হেসন-এর সাহস

বিখ্যাত অভিনেতা জেমস হেসনকে সত্যি সাহসী বলতে হবে। বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতা লরেন্স অলিভার যে চরিত্র অভিনয় করেছেন সেই একই চরিত্র অভিনয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন। "ওয়োদারিং হাইটস" ছবিতে হেথক্লিফ-এর ভূমিকায় ১৯৩০ সালে লরেন্স অলিভার অভিনয় করেছেন। ওই একই চরিত্র রূপালি পর্দায় রূপায়িত করতে চলেছেন জেমস হেসন। জেমস খুবই ভালো অভিনেতা। কিন্তু লরেন্স অলিভারের চাইতে কি ভালো অভিনয় তিনি করতে পারেন!

য়ুরোপ থেকে হলিউডে

য়ুরোপের বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রী হলিউডে আছেন। হলিউডে অভিনয় করে তারা মোটা অর্থ নিয়ে যান য়ুরোপে। কিন্তু মিচেল কোয়াল সেই অভিনেতা যিনি অভিনয় ক'রে য়ুরোপ থেকে মোটা অর্থ নিয়ে যান হলিউডে।

আগামী সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ ঃ

প্রফুল্ল ভিস্নে (সচিত্র প্রবন্ধ)

ভিস্নে সম্পর্কে এমন মূল্যবান ও সরস আলোচনা বাংলা ভাষায়
এর আগে আপনি নিশ্চয়ই পড়েন নি।

ব্যাপার যা চলছে

চক্রপাণি
(মতান্তরের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

আমার কে বন্ধু আছেন। সরল প্রকৃতির মানুষ। ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। এবং মনের কথা চেপে রাখতে পারেন না। তিনি বাইশ বছর ধরে গল্প-ভারতী পড়ছেন। বোধকরি গল্প-ভারতীর একনিষ্ঠতম অনুরাগী। সেদিন সকালে এলেন। তাঁরই ঐন্দ্রেলিক আর। হাতে বৈশাখ সংখ্যার গল্প-ভারতী। বললেন, "এসব কি যাতা লিখেছ বৈশাখ সংখ্যায়।" না বুঝে চুপ করেই রইলাম। বললেন, "এই যে এবারকার 'ব্যাপার যা চলছে'র শেষ প্রসঙ্গ, মহাজাতি সদন, ফোর্ড আক্কেল ওর নামটা বদলে দেবার প্রস্তাব করলে তুমি।" এতক্ষণে বুঝলাম, মৃদু হেসে বললাম, "তা মন্দ কি করেছি। পাবলিক বিরেটারের মত যখন বেশ্যাবৃত্তি পর্যন্ত রমরমিয়ে চলেছে তখন ওটা পাবলিক বিরেটার ছাড়া আর কি। তাই নামটাও সেই রকমই হওয়া উচিত বলে মনে করি।" ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে বন্ধু বললেন, "হাঁ, তা নাহলে আর ষোলকলা পূর্ণ হবে কি করে? এই সংখ্যাতেই কালিদাস বাবুর লেখাটা পড়েছ? তা পড়বে কেন? এই সদনের নামকরণ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ সুভাষ-চন্দ্রের সম্বন্ধে নিজের যে ধারণার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন ওঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ পড়েছ?" মাথা নেড়ে বললাম, "পড়তে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু খুঁজে পাইনি।" পকেট থেকে সাঁ করে একখানা কাগজ বার করে বন্ধু বললেন, "আমি অনেক খুঁজে বার করে টুকে এনেছি তোমাকে শোনাব বলে। শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।" এই বলে বেশ করে গুছিয়ে বসলেন। একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর ধরাগলায় পড়তে শুরু করলেন।

১৩৪৭ সালের আশ্বিন মাসের সেই অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমার বিশ্বাস য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, সামাজিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পুরাতনের অন্ধতার নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, বুদ্ধির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহামনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল। আচার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্ব-প্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবন সঞ্চারে, সাহিত্যে দেখা দিতে লাগল অপূর্বপূর্ব সফলতায় আশা বহন

করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়-ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা-লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণ চক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হল। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে তুলস্বাগের কলঙ্ক স্বীকার করে, নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে—তার আশু ফলের বিচার করবার সময় হয়নি কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নবনবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তি কামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হতে পারে। প্রাণের স্বর্গশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না। যত দূর থেকেই আহ্বান আসুক, নবযুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশে প্রথম হতেই জড়তা দেখায়নি—বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই তার সত্য পরিচয়। একথা কারো অগোচর নেই একদা রাষ্ট্রমুক্তি সাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলাদেশ এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারা প্রাচীরের বেষ্টনে ছিলেন তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধ্যমঞ্চের মুখে নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে এরকম ঘটেনি। এ ঘটনাকেও ফলের দ্বারা বা শাস্ত্র সুবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না, বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য অনুসারে। বাংলাদেশে সহস্রাধিক তরুণপ্রাণ সুদীর্ঘকাল কারা নির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে—জানি, সেইজন্যে আজ বাংলাদেশের আকাশ অন্ধকার; কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে মাটিতে এদের জন্ম সেই মাটিতে দুঃখজয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

আজ এই মহাজাতি-সদনে আমরা বাংলাজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শক্তিমিত্র সকলের প্রতি সংশয় কণ্ঠকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, কর্মসিদ্ধিমন্ত্রী সাধনা ও সৃষ্টিশক্তিমন্ত্রী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন—এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক। বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের দিকে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তিরূপ গ্রহণ করে বাঙালীকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয়মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস-বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্ম-গৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক—এই কল্যাণ ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্দ্ধে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনা যন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক্—

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক—সত্য হউক—সত্য হউক হে ভগবান।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক—এক হউক—এক হউক হে ভগবান!

সেই সঙ্গে একথা যোগ করা হোক—বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।"

পড়া শেষ করে বন্ধু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললাম, "তোমায় ধন্যবাদ।" মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, "রেখে দাও ধন্যবাদ। এর একটা উপায় করতেই হবে।" বললাম, "কিসের উপায়?" বন্ধু বললেন, "মহাজাতি সদনকে পঙ্ক থেকে উদ্ধারের উপায়। এ কাজ তুমি যদি না কর, যদি আমি না করি তাহলে পরবর্তী জেনারেশনের কাছে আমরা সমাজদ্রোহী, রবীন্দ্রদ্রোহী, সুভাষদ্রোহী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকব। এর বিহিত করতেই হবে। যেতে হবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে। তাতেও যদি না হয় তাহলে—" বললাম, "তাহলে কি করবে?" বন্ধু বললেন, "তাহলে একটা দল তৈরী করব, নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হবে সেই দল। আর সেই দল নিয়ে ঘেরাও করব মহাজাতি সদনকে। সেই ঘেরাও হবে এ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘেরাও, যাতে আমার বিশ্বাস তামাম বাংলাদেশ যোগ দেবে।"

• • •

হঠাৎ দেখি চার-পাঁচজন পুরনো পরিচিত ব্যক্তি বাকস-বিছানা নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে চলেছেন। জিগেস করলাম, "কোথায় চললে সব, দার্জিলিং না ঘুসৌরী, না নৈনিতাল?" তারা বললে, "যাচ্ছি দক্ষিণে। কেরালায়।" বললাম, "এত জায়গা থাকতে ওখানে কেন এই গরমের সময়?" তারা বললে, "ওখানে গেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবো! আমাদের মত অনেকেই যাচ্ছে। সব জিনিষেরই তো অগ্নিমূল্য। তার মধ্যে ওখানকার খবরটা দেখনি?" বললাম, "না তো, কী খবর?" উত্তরে একজন একখানি সংবাদপত্র খুলে, একটি খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। দেখলাম, খবর ছাপা হয়েছে :—

"কেরলে প্রতি বোতল বিয়ার মাত্র পঁচাশি পয়সা। ত্রিবান্দ্রম থেকে খবর এসেছে, কেরল সরকার হয়া হুন থেকে বিয়ার, সীডার ও পচাই মদের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ফলে এক টাকা পঁচাশি পয়সা প্রতি বোতল বিয়ারের দাম কমে গিয়ে মাত্র পঁচাশি পয়সা প্রতি বোতল দাঁড়াবে।—ইউ. এস. আই।"

অতএব "চলো কেরালা।"

• • •

পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের টোকাটুকি. ইনভিজিলেটারের উপর হামলা, মারপিট—এ এক মহা সমস্যা সর্ব শহরে এবং মফঃস্বলেও। ইতিপূর্বে টোকাটুকি বন্ধ করবার জন্যে ছেলেদের পোষাক সম্বন্ধে এক কৌতুকজনক কাহিনী জানিয়েছি। এবার আর একটি জোরদার এবং রংদার কাহিনী জানাই। বাপাড়িয়ার এক পরীক্ষাকেন্দ্রে ছেলেরা আগে ভাগেই গার্ডদের জানিয়ে রেখেছে, তারা টোকাটুকি করবে, তাদের বাধা দিলে তারা গার্ডদের মাথায় টেবিল চেয়ার ভাংবে। কর্তৃপক্ষ তো বিষম

বিচলিত। কী উপায় করা যায়? পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় তো তাঁদের সুনাম বাড়বে না, বরং লোকে বলবে তাঁরাই ঠিকমতো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন নি! অনেক ভেবেচিন্তে অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা এক স্থানীয় কুস্তির আখড়ার অধিকারীর শরণাপন্ন হলেন।

পরের দিন পরীক্ষা আরম্ভ হল। ছেলেরা সব তৈরী হয়ে এসে বসল! কিন্তু হঠাৎ একী ব্যাপার। যাদের গার্ড দেবার কথা, সেই সব বিরাট বিরাট ভীষণদর্শন ইনভিজিলেটারদের তো দেখা

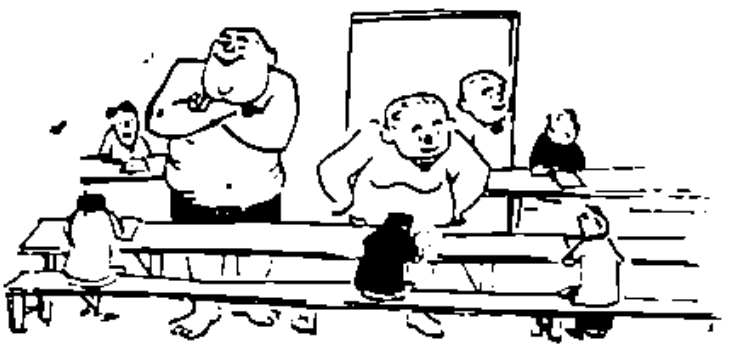

যাচ্ছে না, তার বদলে এরা কারা? মোটা মোটা লাঠি হাতে ভীমকায় পালোয়ানের দল পরীক্ষা-ঘরে ঢুকে পাহারা দিতে শুরু করেছে যে! কী তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা আর কী তাদের চোখের চাউনি। তাদের দেখেই তো পরীক্ষার্থীদের চক্ষুস্থির, পারা অন্ধ হীম! টোকাটুকি ফিসফাস বিলকুল বন্ধ। নিস্তব্ধ ঘরে ঘাড় গুঁজে পরীক্ষার্থীরা সুবোধ বালকের মতো খাতা লিখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। কারুর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই! কুস্তিগীরদের কৃপায় সেই কেন্দ্রের পরীক্ষায় একদিনও কোন গোলমাল ঘটল না!

• • •

মেয়েরাও আসরে নেমে পড়লেন! নামবেন নাই বা কেন! পুরুষদের সঙ্গে যখন সব বিষয়েই পাল্লা দিচ্ছেন তখন এ বিষয়েই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন। তাই তাঁরা গৃহকর্ম ছেড়ে ঘেরাও কর্মে নেমে পড়েছেন! জলপাইগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ, ডুয়ার্স-এর এক চা বাগানের ম্যানেজার তার সহকারী এবং ড্রাইভার নারী শ্রমিকদের দ্বারা ঘেরাও হন। শুধু তাই নয়, ম্যানেজার প্রভৃতিকে মেয়েরা কিল ঘুষি ও লাথি মারেন। পুলিশ তদন্ত সুরু করেছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। বেশি কাজ করতে বলার জন্যেই নাকি এই গোলমালের সূচনা হয়।

উত্তরপ্রদেশে নারী কর্মী সমিতি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরণ সিংহের বাসগৃহ ঘেরাও করেন। সরকার কয়েকটি নারী বিভাগ তুলে দেবার যে সিদ্ধান্ত করেন তারই প্রতিবাদে এই ঘেরাও হয়। বলা বাহুল্য ঘেরাও সফল হয়েছিল।

• • •

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে দেশ-দেশান্তর ঘুরে ভদ্রমহিলা একেবারে টাকার পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে বসলেন। কী কারণে তিনি দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, কী তাঁর উদ্দেশ্য, সে বহুত আলো আনা যায়নি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তা কম চমকপ্রদ নয়—তাঁর "স্মৃতিকথা"-র কথা বলছি! কোন একটা উত্তেজক ঘটনা ঘটলেই সে সম্বন্ধে লেখার চাহিদা বেড়ে যায়। এবং যেহেতু তিনি ষ্টালিন-কন্যা স্বেতলানা তখন তো আর কথাই নেই! তিনি স্মৃতিকথা

লিখেছেন বা লিখছেন। হয়ত বা তাঁকে লেখানো হচ্ছে। মাকিন দেশে গিয়ে তিনি তাঁর লেখা প্রায় শেষ করে এসেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এবং এই লেখার জন্যে তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে যে টাকা পাচ্ছেন তার অঙ্ক শুনলে মাথা ঘুরে যাবে, ঘোর অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। এই বইএর প্রকাশক হারপার কোম্পানী লেখিকাকে কত টাকা দিয়েছেন তা গোপন রাখা হলেও জানা গেছে তা কমসে কম পাঁচ লাখ টাকা। লাইফ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের জন্যে পেয়েছেন আট লাখ টাকা। সিটইয়ার্কের বুক ক্লাব অব দি মান্থ এই বইএর জন্যে দিয়েছে বারো লাখ টাকা! মাত্র একখানা বই, প্রথম বই, তাও নামকরা প্রতিষ্ঠিত কোন লেখিকা নন—তাই লিখে এত টাকা ইতিপূর্বে অন্য কোন লেখক বা লেখিকা শুধু পাননি তাই নয়, পাবার কল্পনা করতে পারেন নি! পৃথিবীময় দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য হয়েছে গৌণ, সাহিত্যের নামে যিনি যত বেশী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারবেন, তাঁরই তত বেশী অর্থকরী জয়জয়কার।

• • •

শতাধিক বছর আগে আমাদের বাংলা পত্র-পত্রিকায় নানান মজার খবর বার হত এবং সেই সব খবরের ওপর কলাও করে সম্পাদকীয়ও লেখা হত। শহর কলকাতার সামাজিক জীবনের এমনি একটি টিপ্পনি বেরিয়েছিল "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায়, ১৭ই শ্রাবণ ১২৫৯ সালে। হুবহু তুলে দিলাম। এর মধ্যে পাঠকরা সেকালের এক কৌতুকাবহ চিত্র পাবেন :—

প্রস্রাব নিবারণ কাণ্ড

"হায় কি অপূর্ব রহস্য! কি আশ্চর্য কৌশল! কি অদ্ভুত ব্যাপার! কলিকাতা পুলিশ কর্মকারকেরা সর্বপ্রকার কর্তব্য কর্ম পরিহার করত একণে কেবল রাস্তায় প্রস্রাব নিবারণরূপ মহাগৌরবজনক বৃহৎ ব্যাপারে আত্মমন নিয়োগ করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রস্রাব বারণ কাণ্ডটি ক্রমে গর্ভস্রাবের কর্মের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। চৌর্য্যাদি দুষ্কর্মাবহ ব্যাপার দমনে দলের নিকট বলের তাজন হইতে না পারিয়া পুলিশ সূত্রধারি কার্যে ব্যাপৃত হইয়া বুঝি, প্রতিপত্তি লাভের সূত্রপাত করিতেছেন। কখন দেখি ইহার কতদূর পর্যন্ত হয়, কিন্তু সাবধান নাগরীয় লোক সাবধান, সাবধান, সাবধান. তোমরা একপাবধি প্রস্রাব বার রোধের চেষ্টা পাও। বস্তুকর্তার চতুর্দিকে বড় রাস্তার কোন ধারে মুতিতে বসিলে তখনি মুতের ধার বন্ধ করিয়া ধর, নতুবা ধর, ধর বলিয়া ধরাধরি করত পুলিশে লইয়া যাইবেক। কলিকাতার পুলিশ একণে আর সে পুলিশ নাই। ...ফলে পুলিশের অন্যান্য তাবৎ কার্য এক দিক আর কেবল এই মূত্রকাণ্ডটি যে অন্য দিক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। আমাদের এই এক ভারি আশঙ্কা হইতেছে যদি বিশেষ কারণ বশতঃ ইংরাজী টোলায় (পল্লীতে) যাইয়া এই মহাপাপ কর্মেতে আসক্ত হইতে একান্তই বাধ্য হই তবে আমাদের কি দুর্দশা ঘটিবেক। বোধ হয় সে দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত ইহকাল পরকালেও হইবেক না। হে প্রস্রাব দেব! আমাদের যেন তাদৃশ বেগ বিরুদ্ধ সময় পুলিশের নিয়ম বহির্ভূত মহা দুষ্কার্য্যে কোন দিন লিপ্ত হইতে না হয়। দোহাই তোমার। আমাদের প্রতি এই বরটি করিও।"

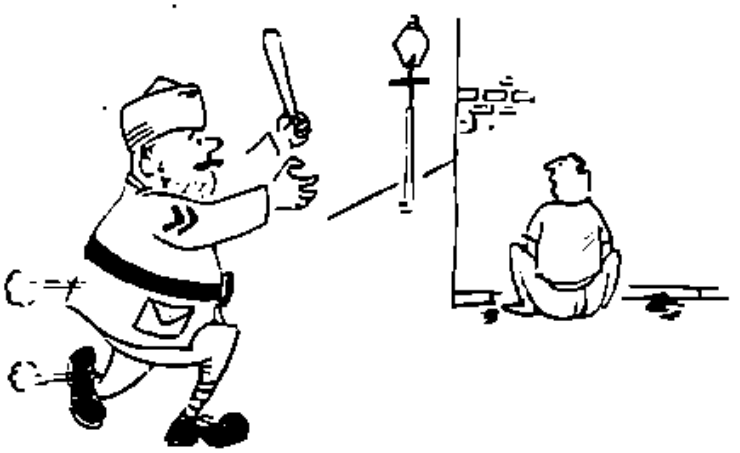

আগুনের চাবুক

নারায়ণ চক্রবর্তী

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম,—"আকাশের রঙ কী অদ্ভুত,—তাই না অদিতি? বলোতো কী রঙ ওটা?"

লালচে বেতের চেয়ার হেলান দিয়ে বসেছিল অদিতি, মাথা তুলে আকাশ দেখল, কী যেন ভাবলো, তারপর অন্যমনস্ক, অস্পষ্ট অস্ফুট গলায় বললে,—"জানি না—"

আমিও আকাশ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, না বলতে পারার জন্য ওকে দোষ দিতে পারলাম না। নীলও নয়, তামাটে নয়, বরং রক্ত ধূসর আর নীলের মাঝামাঝি এমন একটা রঙ যার প্রকাশে মানুষের ভাষা স্বচ্ছন্দ হয়নি এখনো।

অল্প আলো আর অল্প অন্ধকারে বাইরের ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটুকুতে বসেছিলাম আমরা। পশ্চিম থেকে ছুটে আসা দু'-র বিষদাঁত তখন ভেঙে গিয়েছিল, তবু তার নিশ্বাসে আগুনের চাবুক লুকিয়ে ছিল, আমাদের মুখ পুড়ে যাচ্ছিল, শরীরে জ্বালা করছিল, মন অশান্ত, অস্থির হয়ে উঠছিল, তবু সারাদিনের রোদের আগুনে তেতে থাকা চার দেওয়ালের বন্ধী ঘরের ভেতরে বসে বসে সেদ্ধ হবার চেয়ে বাইরের এই ফাঁকাতেই ভালো লাগছিল।

কোলের ওপর পড়ে থাকা হাওয়ার কাঁপা আঁচলটা তুলে নাকে চাপা দিল অদিতি, তখনো বুঝিনি,—ভেবেছিলাম যে পরম হাওয়ার হলকার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই বুঝি,—কিন্তু একটু পরেই ওর দিক থেকে দুটি একটি ভাঙা ভাঙা শব্দ ভেসে আসতে থাকায় বুঝলাম যে কান্নার সমুদ্র আবার উথলে উঠেছে অদিতির মনে।

সান্ত্বনার কোনো কথা উচ্চারণ করতে পারলাম না, চুপ করে বসে রইলাম, ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকালাম। ধূলোর ঝড়ে অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে দুষ্টু বাবুরা বুঝি ঐ আকাশের ওপারে গিয়ে লুকিয়েছে—আকাশের ঐ রক্ত চাদরটা হঠাৎ খুলে গেলেই দেখতে পাবো তার কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল, চকল দুটি ভয়া চোখ আর শেষ দিনে মেনিনজাইটিসে শক্ত হয়ে যাওয়া ঘাড়।

মনে পড়ল।

কিছুক্ষণ আগে পাশের তিনতলা বাড়ির চাকরটা ও বাড়ির বছর দুই এর নাদুসনুদুস ছেলেটাকে নিয়ে বাড়ির সামনে সরু রাস্তায় বেড়াচ্ছিল। অদিতি ছিল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ওদের বেড়ানো শেষ হলে বাড়ি ফেরার সময়ে আমাদের গেটের কাছাকাছি আসতেই ছোঁ মেরে বাচ্চাটাকে

কোলে তুলে নিয়েছিল অদিতি। একটুও কাঁদেনি বাচ্চাটা, বড়ো বড়ো সরল, নিষ্পাপ চোখ মেলে অদিতির কর্সা মুখ, টিকালো নাক আর রক্তাভ ঠোঁট দেখছিল, তার বুকের অমৃত-কলসের দিকে তাকিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে হাত দিয়ে অদিতির গলা জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেছিল অদিতি, চেঁচিয়ে বলেছিল,—"ওগো, দেখ দেখ, কী সুন্দর ছেলেটা, আমার কোলে এসে একটুও কাঁদছে না, আমায় বলছে যে আমাদের বাড়িতেই থাকবে, তাই টুনু, থাকবি তো?

সন্তীর ভারে বাড় কাৎ করেছিল টুনু, বলেছিল, "থাক্‌বো—"

হঠাৎ ওর গলায়, ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আপন মনেই অদিতি বলেছিল,—"কী নরম ঘাড়—"

আমার চোখও টুনুর নরম, নরম, সতেজ সরল ঘাড়ে পড়েছিল,—জোর করে চোখ সরাতে হয়েছিল। আমার মনের চোখের সামনে তখন অন্য একটি শক্ত হয়ে যাওয়া, নিস্তেজ, নেতিয়ে পড়া ঘাড়ের ছবি ফুটে উঠেছিল।

টুনুকে নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না অদিতি, ওর ছোট্ট মুঠো ছুটো চকোলেট দিয়ে ভরে দিয়েছিল, বাবুয়ার মতো করে ধরা খেলনা শিশুটা ওর আমার ছোট্ট পকেটে পুরে দিয়েছিল আর বলেছিল কি করে যেতে তাই ভাবছিল।

মিনিট দশেক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পরেও বাড়ির চাকরটা অধীর হয়ে উঠেছিল, বলছিল, "আর দেরী হলে মা বকবে দিদিমণি,—টুনুকে দিন—আমি চলে যাই—"

অসহায় বিভ্রান্ত চোখে আমার মুখে একবার তাকিয়েছিল অদিতি, টুনুকে বুকে চেপে ধরেছিল তার নরম গালে গাল ঘষছিল, তারপর গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাকে চাকরটার কোলে তুলে দিতে দিতে বলেছিল,—"আবার এসো কেমন? রোজ রোজ এসো—"

টুনু ঘাড় কাৎ করে বলেছিল,—"আস্‌ব"

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাতাসে ভাসা আগুনের ছোট ছোট তীরগুলো উপেক্ষা করে অনেকক্ষণ ধরে টুনুর চলে যাওয়া দেখেছিল অদিতি, তার পর কোলখালি শূন্যতা নিয়ে ফিরে এসেছিল, আমার পাশের চেয়ারটায় চুপ করে বসে পড়েছিল, চুপ করেছিল, কী যেন ভাবছিল।

আর আমি তখন আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে তাকে আকাশের রঙ-এর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

অদিতি বলেছে, "জানি না—।" তার জন্য ওকে দোষ দিতে পারলাম না। ওর মনের সব রঙ ঘুরেমুছে গেছে বলেই হয়তো বলতে পারেনি, অথবা আকাশের দিকে তাকালেও ও হয়তো তখন আকাশ দেখেনি,—সারা আকাশ জুড়ে থাকা একটি শিশুর মুখই দেখেছে, যে মুখ ওর মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হয়তো যাওয়ার ভাসা আগুনের চাবুকের ঘোর যেমন কমে আসছে, তেমনি স্মৃতির চাবুকের ঘোরও একদিন কমে আসবে। একদিন কোন ছোট্ট কোনো এক নতুন শিশুর মুখ দেখবে অদিতি, কিন্তু যে মুখের কথা মনে করে আজ এই মুহূর্তেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে মুখ আর কোনো দিনই দেখবে না অদিতি। ছোট্ট একটি শিশুর মুখের অভাব যেন অদিতির জগৎকে আলো নেভা ঘরের মতো অন্ধকার করে দিয়েছে।

———

অন্যতমা

হরিপ্রসাদ ভৌমিক

এই চিঠির প্রতিটি শব্দ যেন অরুণার বুকে হাতুড়ী ঠুকতে লাগল। সুধেন্দু লিখেছে,—তোমার যা হয় আমিই করেছি—। তাই বলে অনুপাতে আমাকে এতটা শুকনো দেওয়া কি তোমার ঠিক হচ্ছে? একথা তোমরা তুমিও স্বীকার করবে, আমাদের ভালোবাসার ভিতর আর যাই থাক—কোন রকম ফাঁক ছিল না। কিন্তু আজ বার বার মনে হচ্ছে, ফাঁকি দিয়ে আমার শিওরের পাখি পালিয়ে যাচ্ছে। তবু, ভালোবাসার সুতোটায় জোর যে এত কম তা আগে আমি স্বপ্নেও ধারণা করতে পারিনি। নইলে তোমাকে আমি ধরে রাখতে পারছি না কেন?

কী আশ্চর্য, একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে সুধেন্দুর কাছে থেকে এই ধরণের একটা উত্তপ্ত আহ্বান অরুণা আশা করতে পারেনি। সুধেন্দুর জীবন তার সূক্ষ্ম নীতিবোধের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। রাজনীতির জটিল আবর্তের বাইরে দৃষ্টি দেবার মতো অবসর কোথায় সুধেন্দুর? আজকের সামান্য ভুল মিস্ট্রেস অরুণা আইচের জীবনে যে সব ধরধরো দিনের স্মৃতিগুলি 'মুদ্রণ রাস্তা মোড়া যেন।'

তাই এই মুহূর্তে পরৎ মেঘে চিত্রিত আকাশের মতো অরুণার দৃষ্টির সামনে অনেক আলো অনেক আঁধার একসঙ্গে খেলা করতে লাগল। নীতের খেজুর পাতার মতো শিরশির ক'রে কেঁপে ওঠল অরুণার গাত্র চর্ম। সে স্পষ্ট অনুভব করল, সেখানে বড় ব্যথা, বড় জ্বালা।

জ্যোৎস্নায় নেয়ে নীলকুঠির দিকটার রূপ যেন খুলে গেছে। চারদিকে প্রশান্ত স্তব্ধতা। দিগন্তে শুধু অশথ গাছটি যেন মৌন দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।—ঘুম ঘুম রাত। আকাশে ঝিকিমিকি তারা স্বপ্নে সাধে আলোয়ে ওরা বিহ্বল। ওরা চঞ্চল, দিশাহারা। অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে ওরা দুর্বাঘাসের ওপর ক্লান্ত বিছিয়ে বসে পড়ল।

অরুণা সুধেন্দুর হাতে হাত রেখে ফিসফিস ক'রে বলল,—জান, বিয়ের পর কিন্তু আমি মাস্টারীটা ছেড়ে দেব।

সুধেন্দু চুপ ক'রে থাকল।

অরুণা সুধেন্দুর গায়ে ঠেলা দিল,—কথা বলছ না যে?

সুধেন্দু স্বপ্নভরে বলল,—মাঝে মাঝে মনে হয়—জীবনটা জ্যোৎস্নার বাগান। আবার মাঝে মাঝে ভাবি—এসব ভুল—সব বাজে।

অরুণা অভিমানাহত কণ্ঠে বলল,—স্বপ্নঘোর আবার মাথায় চেপেছে বুঝি?

সুধেন্দু অরুণার চোখে চোখ রেখে হেসে ওঠল,—চাপলেই বা দোষ কি? সব রকম ঘায় ঘায়িত্বের কাছ থেকে নিয়েছি আজ অবসর—।

অরুণা লক্ষ্য করল, অধরের শব্দটি যেন জোর দিয়ে উচ্চারণ করছে সুধেন্দু। তাছাড়া এই মুহূর্তে অরুণার মনটাও যেন অনাবদ্ধ। কেবল গল্প করতে ইচ্ছা করছে কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে।

তাই খুসি খুসি মনে সুধেন্দুর কথার ওপর উগ্র সমর্থন জানাল অরুণা।

—চল, আজ রাতে আমরা কোথাও হারিয়ে যাই।

—যা হোক কোথাও পালিয়ে যাই চলো।

—সুধেন্দু শিশুর মতো হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

—তারপর অনেকক্ষণ ওরা নির্মল চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকল। আস্তে আস্তে পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প, সাতভাই চম্পার গল্প, বড়ীন নদীর গল্প—বৃত্তের মতো ওদের ঘিরে ধরল। যেন এক অশরীরী প্রেতযোনি ওদের ভয় করেছে। ওরা কথা বলেই চলেছিল।

হঠাৎ ম্লান চাঁদের ছাট পড়ল ওদের গায়ে। সুধেন্দু আকাশের দিকে তাকাল।

—আজ চন্দ্রগ্রহণ নাকি রুণা?

অরুণাও রাহুগ্রস্ত চাঁদের দিকে কিছু চাইল।

সুধেন্দু হুড়মুড় ক'রে উঠে পড়ল। তার কণ্ঠস্বরে অস্বস্তির স্পষ্ট ইংগিত ভেসে উঠেছে।

—না না রুণা, এবার বড় খারাপ লাগছে। যে আষাঢ়ের এত আনন্দ ছিল তার এই দুর্যোগ আমরা দেখব না। চল ফিরে যাই।

সুধেন্দু আগে আগে এগোতে লাগল। অরুণা তার পিছে পিছে।

সেদিন বাড়ী ফিরে প্রায় বিনিদ্র রজনী যাপন করল অরুণা। গানের সুরের মতো সুধেন্দুর সুখস্পর্শ তাকে সম্পূর্ণ রকমে মোহগ্রস্ত ক'রে ফেলল। ভোরের দিকে অরুণা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল,—তোমার সব দুঃখ আমায় ক'রে নেব। আমার যা ব্যথা—তোমাকে উপহার দেব। সংসার রথচক্রে তোমার পিঠদেহ আমি দু'হাতে ঠিলে টেনে তুলব। রাজনীতির জটিল পাঁক থেকে টেনে এনে তোমাকে আমি পংকজ হয়ে ফুটতে সাহায্য করব।

কিন্তু হায়, সোনালী শরৎ বড় তাড়াতাড়ি যায়। সুখ দুঃখে জড়ানো জগৎ। পলে পলে কত না উত্থান পতন মাটির পাত্রের মতো এই ভঙ্গুর পৃথিবীতে।

একদিন সুধেন্দু বলল,—দেখ রুণা, আর যাই পারি নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আমি কোনদিন পারব না।

অরুণা সান্ত্বনার সুরে বলল,—আর কিছুদিন সবুর কর। কমিটি নিশ্চয়ই একটা সুব্যবস্থা করবেন।

সুধেন্দু হাসল—মাষ্টাররা অনাহারে মরলে, বড়জোর ঘটা ক'রে একটা শোকসভা করবে আর কি!

অরুণা ছিঃ, ছিঃ ক'রে উঠল—তোমার মনে রাখা উচিত, তুমি শিক্ষাজীবি নয়—শিক্ষাব্রতী। প্রাচীন মুনি ঋষিরা তোমার আদর্শ।

সুধেন্দু এবার ইচ্ছা করেই কণ্ঠস্বরে একটু বিদ্রূপ মিলিয়ে দিল,—পেটে ক্ষুধা থাকলে নীতি আর আদর্শের কথা বড় জোলো জোলো শোনায় অরুণা।

অরুণা ভুরু কুঁচকে বলল,—দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে মার্কস সাহেব তোমার কাঁধে ভর করেছেন। নইলে এত আষোল তাষোল বকবে কেন?

—তোমাকে তুমি আবেগ-তাবেগ বলছ অরুণা? অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এই তিনটের প্রয়োজন কি প্রাচীন ঋষিরা বোধ করেন নি?

—নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু তাতে আজকের মতে উগ্রতা ছিল না, ছিল না জোরজবরদস্তি।

সুধেন্দুর কণ্ঠস্বর শুকনো পাতার মতো খরখর ক'রে উঠল,—মূল কমিটি আমাদের হাতে দেয় সোটা সত্তর টাকা। মিটিয়ে নেয় একশো পঞ্চাশ। তাহলে তোমাকে তুমি জবরদস্তি বলবে কণা!

—কিন্তু এজন্যে তুমি এত চেঁচিয়ে কি করবে বলো?

অরুণা সহানুভূতির সঙ্গে বলল কথাটা।

—তাইতো রেজিগনেশন সাবমিট করেছি।

সুধেন্দু নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিল।

—প্রিয় ছেলে মানুষী ক'রনা সুধেন্দু। আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা ভাবতে শিখেছি।

অরুণা সুধেন্দুর হাত চেপে ধরল।

—আমি তোমাকে অনুরোধ করছি আর কটা দিন তুমি অপেক্ষা কর।

সুধেন্দুর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল—অরুণা।

অরুণার হাত সরিয়ে দিয়ে সুধেন্দু বলল,—তুমি জান না কণা, তাহলে ওরা আরও বেশী সুযোগ পাবে।

—আমার অনুরোধেও কি তুমি রেজিগনেশনটা উইথড্র করতে পার না? অরুণা এবার কঠিন হ'ল। কর্কশ হ'ল তার কণ্ঠস্বর।

সুধেন্দু নেতীবাচক মাথা নাড়ল,—না।

—তবে কি প্রয়োজন ছিল এতদিন এই ছেলেখেলার?

—তোমার প্রেমকে আমি অস্বীকার করছিনা। প্রিয় তুমি আমাকে ভুল বুঝ না কণা।

সুধেন্দু বোর উল্টো অরুণার হাত চেপে ধরল।

—তাইলে লোকে কি বলবে না যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ? আমাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনাটা সবাই আশা করছে।

সুধেন্দু অরুণার চোখে চোখ রেখে বলল,—যত তাড়াতাড়ি সেই সম্ভাবনাটা কার্যকরী করা যায় তার ব্যবস্থাই আমি দেখব। ভদ্রজনোচিত অন্য একটা চাকরী আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

সুধেন্দুর কণ্ঠস্বর আত্মনিষ্ঠার উপরে উঠল। অরুণা লক্ষ্য ক'রে দেখল, উপল পাষীর মতো সুধেন্দুর দুই চোখ সুযোগের সন্ধানে চকচক করছে।

অরুণা ফিসফিস ক'রে বলল,—তোমার রাজনীতির মতো তুমি আমার কাছে দুর্বোধ্য। তবু মনে থাকে যেন, সময় এলে ডেকো। আমি যেমন থাকব তেমনি চলে যাব তোমার কাছে।

সুধেন্দু কি রোমান্টিক হ'তে জানে না? চট ক'রে সে অরুণার হাত চেপে ধরল। বলিষ্ঠ-বাহু বন্ধনে অরুণার দেহটা অধিকার ক'রে নিল। তারপর একসময় বুকের কাছে মুখ রেখে আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে শুধাল,—কথা দিলে?

অরুণার সর্বশরীর ঘামে ভিজে সেপটে গেল। মনেহল, কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝোকা ঝোকা লাল ফুল কেউ যেন তার কানের কাছে ছিটিয়ে যাচ্ছিল।

বিবর্তনের পরেও আছে পরিবর্তন। শেষের পরেও আছে পরিশেষ। কিন্তু ঘুম রিহার্সেলের জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। দেখতে না দেখতে কালের চাকা ঘুরে গেল। অধীর আগ্রহে সুখেন্দুর একটা খোঁজখবরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল অরুণা। সুখেন্দুর চিন্তা সুখেন্দুর ধারণা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল আস্তে আস্তে।—সুখেন্দু বড় হবে। তার চিন্তার মৌলিকতা আছে। আছে পুরোমাত্রায় সৃজনীয়তা। অতএব মনেমনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ তৈরী করে অরুণা। কোনদিন ভাবে, কেবল দুটো দিনের জন্য আবার কর্ণ পৃথিবী বদলাবে। বদলে যাবে মানুষের ভাগ্য।

হায়, আমরা ভাবি এক হয় আর। নইলে সুখেন্দুর খবরের পরিবর্তে এক আকস্মিক টেলিগ্রাম এসে অরুণার হাতে পড়বে কেন?

—কাদার এক্সপায়ার্ড। কাম সার্প।

টেলিগ্রামের অক্ষরগুলোর মতো অনেক এলোমেলো চিন্তার জট অরুণার মাথায় তিমতিম ক'রে ওঠল। সব শিউরে উঠল তার। অরুণার পায়ের নীচের মাটি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হঠাৎ।

সুখেন্দু বলতো, বিভীষিকার অন্তরায় সংসার। কথাটা মনেপড়তেই অরুণা যেন সম্পূর্ণ রকমে মিইয়ে পড়ল।

কিন্তু কিছু হটলে কি হবে? বাবার অবর্তমানে একটা গোটা সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল অরুণার অপটু হাতে।

সুখেন্দুর খোঁজ পাবার পর খুব তরলা ক'রে তাকে খবরটা জানিয়েছিল অরুণা। কিন্তু সুখেন্দু মহাভারত থেকে বকলস্টি বর্ষদেবের মৃত্যুবিষয়ক একটি শ্লোক উল্লেখ ক'রে সান্ত্বনাপত্র পাঠানো ছাড়া অন্য কোন আশা দিতে পারেনি। তাই নানারকমের চিন্তায় এখন অরুণার দু'চোখ দিয়ে দিনে-দুপুরে লক্ষলক্ষ জোনাকি পোকা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে। চারদিকে অরুণা কেবল অন্ধকার দেখে। এই মুহূর্তে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ মানুষ পাশে থাকলে কত সাহস যে অরুণা পেতো তা আর বলবার নয়।

কথায় আছে, এক দ্বার বন্ধ হ'লে একশো দ্বার খুলে যায়। হবে বোধ হয়। অরুণার মাষ্টারী জীবনের পুরানো প্রহসনটা বন্ধ হ'য়ে গেল। ইদানীং সেক্রেটারী অনন্তবাবু বড় সহানুভূতির সঙ্গে অরুণার সমস্যাটা বিবেচনা করতেন।

অরুণা জানে, সুখেন্দু এই অনন্তবাবুর উদ্দেশ্যে প্রতিমুহূর্তে বিষোদ্গার করে গেছে। প্রচার করেছে তাঁর নানাবিধ কুকীর্তির কথা। কিন্তু সেই অনন্তবাবুর ওপর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে নত হ'তে লাগল অরুণার মন।

আস্তে আস্তে বন্ধুর চাকা ঘুরল। মাসের পাতা বদলাল। নতুন পাতাও সমান বার দুই। অনন্তবাবুর বিগলিত বদান্যতার কথা জানিয়ে সুখেন্দুকে চিঠি দিল অরুণা।

জবাবে সুখেন্দু লিখল,—কোন কোন ঝড়ুতে সাপ মরার মতো পড়ে থাকে বলে মনে ক'রো না যে সে মরেই গেছে। সময় এলে ঠিক জেগে ওঠবে। অতএব সাবধান—!

সুখেন্দুর সন্তিমেন্টাল চিন্তা দেখে অরুণা হাসে। আবার অতিরিক্ত সোড হ'লে সুখেন্দুকে লেখে,—মাননীয় মহাশয়, অনন্ত বাবুর ওপর রাগের মাত্রাটা আপনার দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। এটাকে অবশ্য ঈর্ষাঘটিত কোন ব্যাপার বলে ধরে নেবে নাতো?...আচ্ছা, তুমি তো জান সুখেন্দু।

অনন্তবাবুর বয়সে প্রৌঢ়। প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিক। ওসব কোন ইচ্ছা থাকলে অনেক আগেই একটা কিছু ক'রে ফেলতে পারতেন। যাই হোক, আমার মনে হয় আজকাল ব্যাচেলার লোকদের ওপর তোমার ভীষণ অবিশ্বাস হচ্ছে। অনন্তবাবু ব্যাচিলার বলেই কি তোমার এত রাগ? আর রাগ যদি সত্যিই হয়—তখন তোমার ব্যাচেলার বদনামটা ঘুচাবার ব্যবস্থা করছ না কেন? তোমাদের পার্টির সব রথী মহারথীরাই তো শুনছি বিবিধে দাম্পত্য জীবন যাপন করবার পারমিশন পায়। কেবল তোমার বেলায় বুঝি মানা?

চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে অরুণা দিন গোনে কবে সুধেন্দুর জবাব আসবে। সুধেন্দুর হস্তাক্ষর অরুণার মরুভূমি মনে বসন্তাগমের সংবাদ পরিবেশন করবে।

সুতরাং সুধেন্দুর কথা মতো অরুণা অপেক্ষা ক'রে চলে। বসে বসে দিন গোনে। স্বপ্নের জাল বোনে বছরের পর বছর।

আসন্ন তথা বিধান সভার আগামী ইলেকশানে পার্টির নমিনেশন পেয়েছে সুধেন্দু। উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ। কথাটা ভাবতেও অরুণার ভালো লাগে। সে কর্তব্যনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে স্কুলের কাজে।

অরুণা অনন্তবাবুর চোখে পড়ে। কমি হিসাবে অনন্তবাবুর প্রায় জেলা ভিত্তিক সুনাম রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমবায় ইত্যাদি কর্মসংস্থার সঙ্গে অনন্তবাবু জড়িত। তাঁর প্রচেষ্টায় অরুণার নিজস্ব জায়গা কেনা হ'ল স্কুলের কাছে। নানারকম ঋণ থেকে ব্যবস্থা ক'রে অরুণার ঘর তুলে দিলেন অনন্তবাবু।

এখন অরুণার পারিবারিক শান্তি অনেকটা ফিরে এল। মানসিক উৎকণ্ঠা যে কত দূর হ'ল তার ঠিক নাই। আজকাল সুধেন্দুকে এসব শুভ সংবাদ জানানোই অরুণার একমাত্র কাজ। কিন্তু সুধেন্দু ঠিকমতো উত্তর দিতে পারে না। ইলেকশান নিয়ে তার বড় ব্যস্ততা। অরুণা সকাল সন্ধ্যে সুধেন্দুর মঙ্গল চেয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়।

অরুণার জীবনের এক যেয়ে নাটক আবার একটু পট পরিবর্তন করল। অনন্তবাবুর চাকর এসে দিল তাঁর শরীর ভীষণ অসুস্থ।

হঠাৎ এক রকমের কৃতজ্ঞতাবোধ অরুণার মনকে চঞ্চল ক'রে তুলল। আজকের সবটুকু স্বাচ্ছন্দ্য অনন্তবাবুর কল্যাণেই ভোগ করছে অরুণা। অনন্তবাবু এখন অরুণার ঈশ্বর।

তারপর সুরু হ'ল ঘরে বাইরে একটা ইতস্তত ধস্তাধস্তি। একটি কুমারী মেয়ের জটিল স্নেহ, যত্ন এবং শুশ্রূষার কাছে বয়রাজকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল।

বিজিতার পরিতৃপ্ত হাসিতে অরুণার মুখ প্রভাত সূর্যের মতো ঝলমল ক'রে ওঠল।

কিন্তু আনন্দ আর বিষাদ যেন যুঁটি ভাই। ওদিকের খবর অত্যন্ত বৈরাগ্যজনক। সুধেন্দু তার প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। আরও দুঃখজনক তার শেষ ভরসা জামানতটাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কী লজ্জা—কী লজ্জা! আরও দেরী আরও অপেক্ষা? কথাটা ভাবতেই খারাপ লাগল অরুণার। যেন এক রকমের মানসিক উৎপীড়নে সে ছটফট ক'রে ওঠল।

সন্ত সুস্থ অনন্তবাবু চোখে পড়ল অরুণার এই অবস্থিটা।

—কী ব্যাপার, তুমি এত অস্থির হ'য়ে উঠেছ কেন অরুণা?

অরুণা নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করল,—কি রকম যেন শরীরটা খারাপ লাগছে।

অনন্তবাবু মুচকে হেসে বললেন,—খারাপ তো লাগবেই। একটা বুড়ো মানুষ আজকাল তোমার মূল্যবান সময়ের অনেকটাই নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়।

অরুণা মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল,—না না, আপনাকে বুড়ো মানুষ কে বলেছে? আপনার মনটা যে কতো সুন্দর তা আমি এই কদিনের কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পেরেছি।

অনন্তবাবু তাঁর মুক্তোর মতো ঝকঝকে দাঁত বার ক'রে হাসলেন,—কী বুঝতে পেরেছ?

—বুঝতে পেরেছি আপনি একজন ইয়াংম্যান।

আবেগে অরুণার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেঁপে উঠল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলল,—কিন্তু আপনার মতো লোক যে কেন বিয়ে-থা করলেন না তা আমি বুঝতে পারছি না।

অনন্তবাবু এবার বলিষ্ঠকণ্ঠে বললেন,—বিয়ে-থা যে কেন করিনি তা আমার মুখ থেকে শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে?

অরুণা মাথা নেড়ে বলল,—নিশ্চয়ই হবে। আমার সঙ্গে আপনি মিথ্যা কথা বলতে যাবেন কেন?

—কাজকর্মের ঝোঁকে ওকথাটা যে ভাবিনি তা নয় অরুণা। কিন্তু মনের মতো মেয়ে কোনদিন জোটাতে পারিনি। তাছাড়া—

হঠাৎ থেমে গেলেন অনন্তবাবু।

অরুণা কৌতূহল দেখিয়ে বলল,—তাছাড়া কি বলুন না!

অনন্তবাবু সঙ্গে সঙ্গে খুব ক'রে হেসে উঠলেন। হাসল অরুণাও।

ব্যাপারটা নীহুক কৌতুক অনুভব করবার জন্য সুধেন্দুকে জানাল অরুণা। কিন্তু আগের মতো সেই জটিলতার পাকে নিমজ্জমান সুধেন্দু। এতটুকু স্পষ্ট নয়, সোজা নয়, স্বাভাবিক নয়।

তাই সুধেন্দুর চিঠিটা পড়ে অকস্মাৎ যেন বিষিয়ে উঠল অরুণার অন্তরাত্মা। জীবনে শেষবারের মতো সুধেন্দুর মুখোমুখি দাঁড়াবার ইচ্ছা হ'ল। এবং এতদিন সেই মতো অরুণা প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

হঠাৎ ঝড়ের বেগে অনন্তবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।

—একটা কথা শুনেছ অরুণা?

অরুণা চমকে উঠল,—কী ব্যাপার বলুন তো!

—সবাই প্রচার করছে আমি নাকি তোমাকে জোর ক'রে—।

চরম উত্তেজনায় ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন অনন্তবাবু।

অরুণা ধীরস্থির ভাবে বলল,—বলুন, কী বলছিলেন?

—আমি নাকি জোর ক'রে তোমাকে বিয়ে করছি।

—ও এই কথা।

অরুণা একেবারে স্বাভাবিক হ'য়ে হাসতে লাগল।

—কি ব্যাপার হাসছ যে।

অনন্তবাবু অবাক হলেন।

—কেন? আপনি যদি আমাকে বিয়ে করেন সবার আপত্তিটা কোথায়?

অরুণা অবিচল কণ্ঠে কথাটা বলল।

অনন্তবাবু আরও বিস্মিত হলেন,—তুমি কি বলছ অরুণা?

অরুণা সংযত কণ্ঠে উত্তর করল,—আমি ঠিকই বলছি। আপনার আপত্তি নেই তো?

অনন্তবাবু বললেন,—সেদিন তোমাকে শেষ কথাটা বলা হয়নি অরুণা। তোমার মতো গর্বগুণে গুণান্বিতা একটি মেয়ে পাইনি বলেই তো বিয়ে-থা করিনি।—অরুণা, তুমি কি, তুমি অদ্বিতীয়া, তোমার তুলনা তুমিই।

অনন্তবাবুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বসন্তের কোকিলটা কোথা থেকে এসে কুহু কুহু ক'রে সাড়া দিয়ে উঠল।

"আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশী হইবে না। আমার এক ভাগিনেয়, আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ো একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।

কোন একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা যোগাড় করিলাম। তাহাতে বহুতে পেন্সিল দিয়া কতকগুলি অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।" এই হল কবির সর্বপ্রথম ছাপানো গান ও কবিতা রচনার প্রথম সোপান।

তিল-তর্পণ

অমৃতলাল বসু

ছিয়াশী বছর আগে (১৮৮১) লেখা অমৃতলালের এই প্রহসনটি হাস্যরসের মাধ্যমে এক প্রচণ্ড ঠাট্টাবাণ। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রায়শই যেসব অসাধিচুড়ি অদ্ভুত পারম্পর্যহীন ঘটনা ও প্রক্ষিপ্ত চরিত্র সম্বলিত ইতিহাসের বিকৃতি কণ্টকিত গুরুগম্ভীর অশুদ্ধ ভাষায় লেখা নাটক পরিবেশিত হয় তাদের প্রতি এই নাটকে তীব্র বিদ্রূপ হেনেছেন অমৃতলাল। সেই সঙ্গে সেই সব নাট্য-রচয়িতাদেরও তিনি রেহাই দেননি। দর্শকদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে অনেকানেক নাট্যকার তাঁদের নাটকে যত্রিশ তাজার মত পাচমিশেলী নাটকে যে কীভাবে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটান, যথাযথ্যহীন ঘটনার অবতারণা করেন এবং সেই সঙ্গে ভাষার আড়ম্বরতা সম্পন্ন করেন, তিল-তর্পণ তারই এক ব্যঙ্গাত্মক চিত্র। নবদেল-নাটকের মতো অদ্ভুত এবং অ্যাবসার্ড এই চিত্র। সেই নবদেল ও অ্যাবসার্ড চিত্র কিন্তু লক্ষ্যহীন নয়।

সমসাময়িক কালের অভেই এই নাটক রচিত। সেই সময়কার কোন কোন লোক কোন ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রী হয়ত এরমধ্যে আছে। কিন্তু শাশ্বত সত্যের মত আজো কী এর তাৎপর্য মাঝে মাঝে অনুভব করা যায় না? নাটকটি আজ একেবারে দুষ্প্রাপ্য, প্রথম সংস্করণের যে কপি থেকে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তার প্রতি ছত্রে ছত্রে নানা ভুল। প্রিন্টার নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন—"নিতান্ত সত্বর ছাপা হওয়াতে, এই পুস্তকে কতকগুলি ভুল হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন। শ্রীঅঘরনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্টার।"

নাটকটিকে সম্পাদন করবার সময় আমরা কিছু কিছু অংশ যা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে তা বাদ দিয়েছি এবং কয়েক স্থানে ঘটনাগুলি পুনর্বিন্যস্ত করেছি।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

[একটি রঙ্গালয়ের ম্যানেজারের ঘর। ম্যানেজার, অপেরা মাস্টার দেবেন্দ্র ও কয়েকজন প্রধান অভিনেতা]

১ম অভি। কি হে, আসছে শনিবার কি প্লে হবে?

ম্যানে। শনিবার একখানা অপেরা দিতেই হবে। অ্যাকর্ডিংলের মাইনে না দিলেই নয়। অপেরা মাস্টার। অপেরা যদি দিতে হয় তাহলে আমাকে বাদ দিয়ে করবেন।

ম্যানে। তোমাকে যদি দেব তো অপেরা করব কাকে নিয়ে?

অ-ম। তা বলে আমাকে কি ঐ সব নষ্টামি কিংবেস নিয়ে অপেরা করতে হবে নাকি?

২য় অভি। আচ্ছা দেবেন্দ্রবাবু, কমলাকান্তের দপ্তরখানা ড্রামাটাইজ করে দাও না কেন?

১ম অভি। তা মন্দ হয় না।

৩য় অভি। কে একজন এদিকে আসছেন।

(নাট্যকারের প্রবেশ)

নাট্য। নমস্কার। আপনাদের ম্যানেজার কে?

ম্যানে। আজ্ঞে আমি।

নাট্য। নমস্কার। দেখুন, আমি একখানা ড্রামা লিখেছি, আপনাদের দিতে ইচ্ছে করি।

দেবেন্দ্র। কী ড্রামা? এনেছেন নাকি?

নাট্য। এনেছি। কিন্তু আপনাকে তো চিনলুম না।

১ম অভি। এঁর নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। ইনিই মালিক।

২য় অভি। শুধু মালিক নয়। নিজে নাটকও লেখেন।

নাট্য। নমস্কার! নমস্কার! আপনি দেবেন্দ্রবাবু! আমার কী সৌভাগ্য। দেখুন দেবেন্দ্রবাবু, আমার এ ড্রামাখানি একেবারে নতুন ধিনিষ। এতে world-এর আহার শুধু দুই রসে।

দেবেন্দ্র। নাটকটা ট্রাজেডি না কমেডি?

নাট্য। আজ্ঞে, ট্রাজেডিও না কমেডিও না। আমি মশায় বড় নকলের দিকে যাই না, আমার নিজের অরিজিনাল প্লট্ নিয়ে কাজ করি। এতে সব আছে। এখানি হচ্ছে—Farcial-Tragi-Comedy-de-Pantomimic Operetta।

৩য় অভি। এ যে একেবারে নতুন নাম! এর প্লট কি মশায়?

নাট্য। প্লট যদি বলবেন, তবে বলি, প্লট এর বড় একটা নেই। প্লট নিয়ে তো সকলেই লেখে। কিন্তু এর ভাব বড় গভীর। এতে উইট আছে, হিউমার আছে, ব্ল্যাংক ভার্স আছে, নাচগান, মারামারি, ভারত-যবন, পতন-মূর্ছা, কাশিওড়ানো, ভূত-নাবানো, চিতোর, সাহেব-মারা সব আছে।

দেবেন্দ্র। চিতোরের সঙ্গে সাহেব? সেটা কী রকম হল?

নাট্য। মশায়! নাটক লিখলেই হয় না। অভিনেতাকে চিনতে হবে। ওই তো তারিক। অভিনেতাকে খুশী করতে হবে। নাচের আস্পদা পাই না—মল্লিকদের মেজবৌকে শেষ কালে বিড়কির ঘাটে নাচিয়ে ছিলুম।

অপেরা ম্যানেজার। মেয়েরা বউ নাচবে?

নাট্য। নাচবে বৈকি।

১ম অভি। কেন নাচবে?

নাট্য। নাচবে, because সে নাচবে। নাচলে সে তোড়া পাবে, হাওবিল-এ লিখে দিতে পারবেন, singing and dancing throughout। তাই নাচবে।

দেবেন্দ্র। ড্রামাখানির কি নাম দিয়েছেন?

নাট্যকার। ভিম-তর্পণ।

২য় অভি। নামটা কি ভাল?

নাট্যকার। নিশ্চয় ভাল। অনেক ভেবে নামটা বার করা গেছে। প্রথমে লোকে শুনেই ভাববে, এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধুবাবুকে গাল দিয়েছে। আজকালকার অডিয়েন্স গালাগাল শুনতে ভালবাসে। তাছাড়া আপনাদের বিষয়ে খুব সুখ্যাতি আছে। দ্বিতীয়ত, তিল-তর্পণের আর একটি ভাব আছে। যেমন চাক্তিখানি তিল দিয়ে চোদ্দপুরুষকে খুশি করা যায়, তেমনি আমার এই একখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিষ আছে যে সব অডিয়েন্সকে খুশি করা যাবে।

ম্যানে। ছায়াখানা রেখে যান। পড়ে দেখবো। কী রকম কাটতে কুটতে হয় তাও দেখতে হবে।

নাট্য। এর একটি লাইনও বাদ দেবার জো নেই। বলেন কি মশায়, আমার নাটক আপনি কাটবেন?

দেবেন্দ্র। মশায়, আপনি তো আপনি! আমি, তোমার পে, দীনবন্ধুকে কেটেছি, বঙ্কিমকে কেটেছি, মাইকেলকে কেটেছি। আমরাও বই লিখে থাকি। মশায়, আপনার আগে আমি চিতোরে আগুন জ্বালিয়েছি।

নাট্য। তা যে যা লোক, কিন্তু আমার বিশ্বাস, পড়ে আর বাদ দিতে চাইবেন না। এ নেহাৎ ছোটখাটো বই হয়নি। অপ্রমত্তীর ভবল হবে।

২য় অভি। তাহলে বোধ হচ্ছে বইখানা ভাল attractive হবে। এই শনিবারে লাগিয়ে দাও।

ম্যানে। আচ্ছা, আপনি পরশু আসবেন। সেই দিন ড্রেস রিহারশাল দেওয়া হবে। নাটকটা দিয়ে যান।

নাট্য। এই নিন। আচ্ছা, তবে এখন আসি। (প্রস্থান)

ম্যানে। তাহলে ছাওবিলটা লিখে ফেল না দেবেন্দ্রবাবু।

দেবেন্দ্র। আমি অনরেডি ভাবছি। ভেবে একটা ঠিকও করে ফেলেছি। শুনবে?

ম্যানে। নিশ্চয়। নিশ্চয়। কুইকওয়ার্ক!

দেবেন্দ্র। প্রথমে তো থিয়েটারের নামটায় যেন। Saturday the—ডেটটা বসিয়ে দিও। তারপর শোন—

Great Grand Galatia Night
Come Critics and Auritics for the last time of the season
The great farcial-Tragi-Comedy-de pantomimic operetta
For the first time on Indian stage

তিল-তর্পণ

Or, the Celebration of the Augustian Ceremony on the
bank of Mother Ganges with Til seeds
in a copper plate to eat our fathers
and fourteen generations
Look! Look! Look! Look!

To your Til jumping from the কোণা to the
Mother Ganges
Scene, Wing and Procenium On the Stage
Zoological show on the stage
Singing, Dancing, Climbing, Jumping Throughout
Music Flowing in Cuprimic Flow
To conclude with nothing.
When we laugh laugh with us
আর কিছু চাই না তাহলেই বাস্।
অদ্ভুত মোদের লীলা অকথ্য কথন।
দেখবে যদি দেখ আসি ত্রিদেব তর্পণ।
Goblins and Witches, Fairies and Demons
Price omnipresent
Debenture to commence at 9 p. m. too sharp
Half price!

ম্যানে। বাঃ বাঃ। চমৎকার হয়েছে।

দেবেন্দ্র। তাহলে চল। on with rehearsal!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্ক। চিতোর রাজঅন্তঃপুর। রাণা বাপ্পারাও ও মহিষী]

রাণী। বলেন কি মহারাজ। আমি কি প্রাণ থাকতে আপনাকে হাসমুখে এ ভয়ঙ্কর সমরে যেতে বিদায় দিতে পারি? আমি শুনেছি নবাব আলিবর্দি বড় দুর্দান্ত যোদ্ধা, আর তার সৈন্যবলও বিস্তর।

রাজা। বল কি মহিষী। তুমি আমার প্রেয়সী হয়ে ক্ষত্রিয়নী হয়ে রাজপুত বীরাঙ্গনা হয়ে, সেই অকিঞ্চিৎকর অপদার্থ নবাবের ভয়ে ভীতা হও?

রাণী। প্রাণনাথ। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান লোকের এরূপ অপরিণামদর্শীর ন্যায় বাক্য কওয়া উচিৎ নয়। হৃদয়কান্ত। আত্মাবল্লভ। আমি কায়মনোবাক্যে বোধোদয় পাঠ করে দেখেছি যে, "আমরা ইতস্তত: যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ কহে।" সুতরাং নবাবও পদার্থ। এখন আপনি যাকে দেখতে পাচ্ছেন না বলে অপদার্থ জ্ঞান করছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যখনই সে আপনার সমরে পড়বে তখনই সে পদার্থ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং মহারাজ আপনার যুদ্ধে যাওয়া হবে না।

রাজা। প্রাণেশ্বরি! তুমি নিতান্ত মূর্খের ন্যায় প্রলাপ বকছো। তুমি কি বিবেচনায় আমায় যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছ? চিতোরের বাপ্পারাও বাঙালী আলির ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যায়নি—এ অপবাদ আমি প্রাণ গেলেও সহ্য করতে পারবো না। এ কথা মনে করলেও আমার শিরায় শিরায় শোণিত ধাবিত হয়। মহিষী! বাধা দিও না। আমি চললেম। (প্রস্থানোদ্যত)

রাণী (সরোদনে) হা নাথ। তোমার ওই অমল-কমল-বিনিন্দিত সুলোল নয়ন যুগলবিনিষ্ট সুরুক সুবঙ্কিম খড়্গশোভিত চন্দ্রবদন না দেখলে আমি কী করে জীবিত থাকবো?

রাজা। মহিষী। রোদন সম্বরণ কর। তোমার ভীত হওয়ার কারণ নেই। এযুদ্ধে আমি নিশ্চয় জয়লাভ করব। তার গোপন কারণ তোমায় বলছি শোন। দুরাত্মা যবনের যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে কেবল সেকেলে পাথুরে কয়লার বন্দুক আছে। কিন্তু আমি কলকাতা থেকে মার্টিন হেনরি রাইফেল বন্দুক আনতে পাঠিয়েছি। খুব শিগগিরই পাব। তাহলেই আমার জয়লাভ হবে।

রাণী। (সচকিতে) মাইরী?

রাজা। তেমনি সত্য যেমন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

রাণী। তা হোক মহারাজ। তবু তোমায় যাওয়া হবে না। আমি শুনেছি বন্দুকের ছুটি সর্বদাই ফাটিত হয়ে নানারূপ বিপদের উদ্ভাবন করে—বাপরে, বন্দুকের কাছে মানুষ যায়!

রাজা। প্রেয়সি! তুমি বড় নেইশ্যাকড়া! (নেপথ্যে ভেরী)

ঐ শুন ঐ বাজে শঙ্খের নিনাদ
ধরে রেখে, রাণি, বুকি ঘটাও প্রমাদ!
নগর বাহিরে অরি, ধরিয়া রহিব আমি—
আবাসক, অজ্ঞ, অনার্যের ভয়ে।
কেবা সেই আলিবর্দি বাঙালী-প্রহন?
আমি রাণা বাপ্পারাও ক্ষত্রকুলমণি।
রাণাকুলরাণী তুমি বীরপ্রসবিনী।
অনক শতের তব বাপ্পারাও স্বামী
তুমি কি ভরাও প্রিয়ে বিধর্মী নবাবে?

(প্রস্থানোদ্যত)

রাণী। (সরোদনে) হৃদয়সর্বস্ব! যদি একান্তই যাবে তো উইল করে যাও। আহা! আমার কি উপায় হবে। পুত্রসন্তানবিহীনা আমি কেবল একমাত্র কন্যার মুখ চেয়ে আছি। আহা, কন্যা তো নয়, যেন সাক্ষাৎ জামাঠাকরুণ। প্রাণবল্লভ! অমন অসামান্যা, অতিবয়স্যা, মান্যা, ধন্যা, কন্যার বদনসরোজ দেখলে তোমার মনে কি একটু দয়া হয় না? কোথায় তুমি তাকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে ন্যস্ত করে সুখিনী করবে, না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে রণাঙ্গনে চললে। (স্বগতে) ওকি মহারাজ। তোমার মুখভঙ্গি অমন কেন? কেন কঠোর নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের সদৃশ দৃষ্টি? ওঃ! আমার ভয় হয়। আমি মূর্চ্ছা যাই। (পতন ও মূর্চ্ছা)

রাজা। (শশব্যস্ত) ওরে কে আছিসরে, শিগগির এক গ্লাস বারি আন, রাণী মূর্চ্ছা গেছে। —কই। কেউ এলো না। ওরে ধীরসিং, পরওয়ারসিং, গিরধারিদাস। কেউ এলোনা। (প্রহরীকে লক্ষ্য করিয়া) বই হাতে করে হাঁ করে দেখছো কি! শিগগির, একটা পাগড়ি জড়িয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এসো না। তোমায় ঘাটি হয় যে, আমি ততক্ষণ প্যান্‌টোমাইম করি।

(প্রহরীর তথাকরণ)

রাণী। (ক্ষীণস্বরে) হা নাথ। তুমি কোথায় গেলে?

রাজা। এই যে প্রিয়তমে, পরতলে! চল আমরা কক্ষান্তরে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

ভৃতীয় দৃশ্য

[রাজবাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান। চিতোর রাজকুমারী হেমাঙ্গিনী ও তাহার সখী নলিনী]

নলিনী। (সখিরে) পেখত যায়ের নয়ন যেলারে
ধাঁধাঁই নয়ন তরুণ অরুণ
পুহুরে আসত ঐ।
(কত) ইলিশ, হিলেল, চিংড়ি চিতেল
লাফরে যায়ত যাই।

হেমা (অন্যমনস্কভাবে)। সখি! কি বলছ?

নলি। প্রকৃতির মনোহর শোভা তোমার মন কি এতই হরণ করেছে যে আমার কথা শুনতে পাচ্ছোনা? শোন তবে—

যোয়ন মল্লিকা কুন্দাগুলতিকা ফুটত কতই ফুল।
ভোঁ ভনভন হাঁকি অলিগণ উড়ত বিভোল হুল।

হেমা। সখি। তোমার ছড়া এখন আমার ভাল লাগছে না।

নলি। কেন! তোমার হয়েছে কি? আগে তো আমার ছড়া শুনতে খুবই ভালবাসতে।

হেমা। সখি! এখন কি আর আমার সেদিন আছে? এখন যে আমার বিরহ হয়েছে।

নলি। অবাক করলে রাজনন্দিনী। এর মধ্যে বিরহ আবার কার জন্যে হল?

হেমা। কার জন্যে হল তা বলতে পারিনা। তবে বিরহ আমার হয়েছে নিশ্চয়। দিনে বিষে হয় না, রেতে ঘুম হয় না। এই দেখ আমার বুক শুধু শুধু করছে, কপাল ঘামছে, হাই উঠছে, চোখ জড়িয়ে আসছে, নিশ্বাস ঘন ঘন বইছে, গা চলে পড়ছে। বিরহের আর বাকি কি আছে বল দেখি।

নলি। এ যে সখি ভাজ্জব ব্যাপার! কে তোমার প্রণয়ের পাত্র তা ঠিক করতে পারছো না, অথচ বিরহে ব্যাকুল—

হেমা। চুপ কর, চুপ কর সখি! একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, কী অপরূপ রূপমাধুরি, আহা, কি ভুরু, কি উরু, কি নয়ন, কি চলন, যেন কোন দেবতা ধরা বেশে আজ কানন পরিভ্রমণ করছেন। আহা, এমন মনোহর মূর্তি কখনো দেখিনি।

নলি। বল কি রাজকুমারী? ওর আবার মনোহর মূর্তি! ও যে বাগানের নতুন মালী—

হেমা। হা ঠিক। সখি! তুমি যারে মালী বলছ, আমার চোখে সে অংশুমালী, অর্থাৎ সূর্য। এতক্ষণে বুঝলুম, ওঁর জন্যেই আমার এত বিরহ। দেখ সখি, বুঝি আমাদের দিকেই আসছেন। সখি, তুমি ভাল করে অভ্যর্থনা কর, আমি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকি।

নলি। পোড়া কপাল! ওর আবার অভ্যর্থনা—

(পুষ্পপাত্র হাতে অজু মালীর প্রবেশ এবং রাজকুমারীর পদপ্রান্তে পুষ্পপাত্র রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

হেমা। (অবাক্‌ভাবে) সখি, ওঁকে উঠতে বল। উনি প্রণাম করলে যে আমার অকল্যাণ হয়। ওঁকে বল যে ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্নেছে।

নলি। অ অহু! ওঠ। রাজকুমারী বলছেন।

হেমা। না ঠিক সখি! তুমি ওঁর সঙ্গে অমনভাবে কথা বলছ কেন। আমার হৃদয়জনের সঙ্গে তোমার অমন সদ্ভাবণ! আপনি না তুলুন, নলিনী বুঝতে পারেনি, আপনি ওর কথাতে রাগ করবেন না।

অহু। (উঠিয়া জোড়হস্তে) ঠাকরুণ, তা, তা, আমি আবার একটা মানুষ, আমার সঙ্গে আবার কথা—

হেমা। অবলার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, আপনি মানুষ নন, তা আমি জানি। নিশ্চয় কোন দেবতা ছদ্মবেশে আমাদের দেখা দিয়েছেন। আপনাকে দেখে অবধি আমার প্রাণ যা করছে তা আমিই জানি, জীব জানে সেই দুষ্ট মদন—

অহু (স্বগত) ও বাবা! এ আবার কি কেচাং। এদের মনে কি আছে গো, আমার সঙ্গে অমন করে কথা কইচে কেন। (প্রকাশ্যে) ঠাকরুণ, আমি গরিব, চাকরের চাকর, আমাকে অমন কথা বলবেন না। (প্রস্টাবকে) সেটা কখন? প্রণয় টের পাবে কখন?

প্রস। এই যে, বেশ টের পাচ্ছিস।

অহু। না, বলে দিলে না। face-টা করতে দিলে না, expression হল না।

হেমা। হৃদয়েশ্বর! আমি স্পষ্টাক্ষরে, মুক্তকণ্ঠে সখি সমীপে, জগৎ সমীপে বলব, তুমিই আমার প্রাণনাথ। আর আমি আত্মগোপন করে রাখতে পারি না। শেষে কি লজ্জা করে প্রাণটা খোয়াবো। আমাদের উভয়ের সামাজিক অবস্থা ভেদের জন্যে আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। আপনার বিরহে আমার রাজঅট্টালিকা তুল্য! জীবনকান্ত! আপনার সহবাসে আমার ভিক্ষাও অমৃত।

নলি। রাজকুমারী! এখানে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে আমাদের কথা কওয়া ভাল নয়। কে কোথা থেকে দেখবে, কি ভাববে। অহু, তুমি নিজের কাজে যাও।

অহু। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

হেমা। সখি, তুমি কি আমার শত্রু, প্রাণনাথকে বিদায় করে দিলে। এখন আমার উপায় কি হবে?

নলি। সখি, এতে তোমার বিয়ঘুটে আবদার। তুমি হলে রাজার মেয়ে, আর ও হল মালীর ছেলে। তোমাদের মিলন কেমন করে হবে?

হেমা। সখি, তুমি কি জানো না, অনঙ্গ অন্ধ, প্রণয়ের পাত্র অপাত্র নেই। আমার প্রণয় হয়ে গড়েছে, তা আর যাবার নয়।

নলি। রাজকুমারী। এ অভিসন্ধি ত্যাগ কর।

হেমা। আমি বোঝাতে পারবো না। বুঝবোও না। তুমি এর উপায় কর। নইলে আমি আফিং খেয়ে মরব।

নলি। আচ্ছা, চল ঘরে চল, সেখানে বসে এর মীমাংসা করা যাক।

হেমা। তাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(অম্বুর পুনঃ প্রবেশ)

অম্বু। ওঃ! জগৎ কি পরিবর্ত্তনশীল। কাল এমন সময় কে জানতো যে আমার হৃদয়কন্দরের অন্তরে এমন গূঢ় প্রেমভাব ঝাপটি মেরে আছে। রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন। তাঁর এক চাউনিতে, এক কটাক্ষেতে, এক মুচকিহাসেতে, এক নয়নের বিদ্যুতে, আমার প্রণয়-প্রস্রবনের মুখস্থাপিত প্রস্তরখণ্ড হটিয়ে গেল। এখন অন্যের তোড় কে? ওঃ, আমার হৃদয় কি কন্দরময়, তাহে মাসীরূপ বালিচাপা, ভেতরে রাজপ্রণয়। আহা! কি মধুর নাম! হেমাঙ্গিনী। তোমায় কি করে পাবো হেমাঙ্গিনী! আহা, কি অপরূপ রূপমাধুরী—

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পাহাড় পর্ব্বত চাঁদে আছে কতগুলা॥
প্রিয়ার বদন যদ সুগোল নিটোল,
তাহাতে নয়ন দুটি চিরিত পটোল।
চাঁচর চিকুর কেশ পড়েছে এলায়ে,
জেলিয়ার জাল যেন রেখেছে মেলায়ে।
(বীয়ারস আনবো নাকি?)
উন্নত বিশাল বক্ষ দুধার ধবল।
সুবন্ধ সরেতে শোভে যুগল কমল।
নাসিকার শোভা হেরে সবাই মোহিত।
বাঁশি ছেড়ে কিমলকি ধরিতে বাসিত।
প্রিয়ার পায়ের ছাঁচ যেন দুটি কলাগাছ।
তেউড় অঙ্গুলি তায় বেরিয়ে আছে কত।
প্রেমভরে অধীনেরে প্রিয়া যদি নাখি মারে
এক নাখি খেয়ে আমি হই পঞ্চানন্ত।
(উহুঁ, জমছে না)
পিরিতি গাভীর বাঁটে তুমি মম গয়লা।
প্রণয় পুকুর পাড়ে তুমি মম শেওলা।
বিরহ তপন শোষে হৃদি সরোবর।
আমোদ কাৎলা ঢোকে পাঁকের ভিতর॥

(সর্দ্দার মাসীর প্রবেশ)

সর্দ্দার। বাঃ! এখানে বসে দিব্যি গান করছিস। কপি কেতটা কোপাতে হবে না?

অম্বু। হাঃ! ওহ্!

সর্দ্দার। ও কিরে!

অম্বু। ওহ্! ক্র-য়-য়-য়!

সর্দ্দার। কি সর্ব্বনাশ! তোকে কিছুতে কেটেছে নাকি?

অজু। সখা। গেলেম, জন্মে গেলেম।

সর্দার। (সভয়ে) এখন যেব দেখি! তোকে মানা করি, ঐ তালিমতলায় যাসনি, ওটা কেউটের আড়ৎ—

অজু। সখা

ঢুকেছে যে বিষধর চলন সাজাবে
দাড়িম্ব শুকের মুখে, যা কহিনু সত্য।
সে সাপে এ নয় সখা চতুর ধরিয়া
করে যারা কোল কোল মায়ের কাঁপিতে।
চতুর কটাক্ষ এর পূর্ণিত গরলে
সজোরে মেরেছে চাঁটে হৃদয়ে আমার।

সর্দার। অমন আবোল তাবোল বকছিস কেন! তবে বুঝি গাঁজা খেয়েছিস? এখন ওঠ শালা, বাগান কোপাবি চল্।

অজু। না সখা, এখন আমার প্রণয়লগ্ন, এখন আমায় ও অনুরোধ কোরো না।

সর্দার। চল বেটা বজ্জাত, তোর বীরত্বগিরি বার করছি। (হাত ধরিয়া টানিল)

অজু। তবে নিরাশা।

[অজুকে টানিয়া লইয়া সর্দারের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[চিতোরের গড়ের মাঠ। সৈন্যগণ দণ্ডায়মান। বাপ্পারাওর প্রবেশ।]

বাপ্পা। সৈন্যগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, তোমরা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছ—উত্তম করিয়াছ। এখন একবার সাহসে নয়ন উন্মীলন করিয়া তোমাদের বর্তমান অবস্থা বিলোকন কর। বাংলার ইতিহাস পাঠক মাত্রেই বোধহয় দুর্দান্ত সিরাজদ্দৌলার নৃশংসতার কথা অবগত আছে। সেই অপগণ্ড মৃত সিরাজের মৃত ঠাকুর্দা আলিবর্দি খাঁ তোমাদের এত সাধের চিতোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। চিতোর জয়ে হইলে তোমাদের কি উপায় হইবে? আর এত সকাল সকাল চিতোর গেলে যদের ভবিষ্যত কবিগণ কি লইয়া নাটক লিখিবে? তাই বলি তোমরা উৎসাহিত হও, তোমাদের গগনস্পর্শে গগনমণ্ডল ধূলিধূসরিত হোক, তোমাদের হুহুঙ্কারে সিংহিনীর গর্ভপাত হোক, তোমাদের বীরহৃদয়ে পবিত্র গৌরাঙ্গরস প্রবলবেগে প্রবাহিত হোক। হাঁ, দেখিতে পাইতেছি তোমাদের নয়নকণা হইতে অন্তরদের শিখা নির্গত হইতেছে, তোমাদের উৎসাহতা ক্রমে চড়িতেছে। আচ্ছা, সৈন্যগণ, এতক্ষণ তোমাদের মনে উত্তেজিত করিলাম। এইবার পক্ষ। রোতোময়ী, তেজোময়ী, ভয়ঙ্করী পক্ষ। তোমরাও মধ্যে মধ্যে সমস্বরে আমার সহিত যোগ দাও—

বিশাল মশাল আন, জেলে চক্‌চকাও চাল,
ঝাপটে চাপটে বধ যবন শোনিত
হউক যমুনা জল রুধিরে লোহিত।

সৈন্যগণ। ক্ষত্রিয়ের শোণিত, ওরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত।

রাণা। ওই দেখ মাতৃভূমি ঘ্যাদানি বদন
ভীষণ বিকট হায় কোমলতায়!
ঘনিছেন তারস্বরে, সেতার নিন্দিত
কি মধুর ধ্বনি,—যাওরে বীরেন্দ্রবৃন্দ
ইন্দ্রসম তেজে, পরাক্রমে হানু সিপ,
ভীম কিংবা কর্ণ, পূর্ববশে মান রাখ
আজিরে আহবে—

সৈন্যগণ। আজিরে আহবে, ওরে আজিরে আহবে।

রাণা। যশের লাগিয়ে, কিবা শরীর পাতন
অবাধ্য যা অযতন হবে তব আজি।

সৈন্যগণ। হবে তব আজি, ওরে হবে তব আজি।

রাণা। কেমন, তোমাদের উৎসাহের কলসী পরিপূর্ণ হইয়াছে?

সৈন্যগণ। টৈটুম্বুর।

রাণা। তবে আর কি; অগ্রসর, অগ্রসর। Right about turn—

(সৈন্যগণের তথাকরণ)

রাণা। Quick March, Double time. হর হর বিশ্বেশ্বর।

সৈন্যগণ। হর হর বিশ্বেশ্বর।

(মার্চ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

[আলিবর্দি খাঁর শিবির। আলিবর্দি ও সভাসদগণ]

আলি। তারপর আরংজীব আর আকবর দুই ভ্রাতার বিনে সিন্ধুনদ পার হয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগর আক্রমণ করল।

১ম সভা। হাঁ হুজুর। আপনি তখন উলোয় মৃগয়া করতে গিছলেন। সেখানে এই বিষয়ের টেলিগ্রাম দিয়ে পৌঁছোলো—

আলি। আর আমি অমনি বাগ্নারাওর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেম—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বান্দা বেওয়াজ—

আলি। কহ দূত তোমার সংবাদ।

দূত। হুজুরকা গোড়পর লাগায়ে সেলাম
একদম চৌপায়া চিতোরে সেলাম।

পুঁছোয়া লড়িকা সওয়াস কাকের বাল্লাকে পাস।
(শালেকো মিলেতো কাটায় মে ঘোড়েকো ঘাস)
হুশ বাৎ শুনকে মোসেমে চক্কে
ঘোলা হায়রানজাদ
বাবরপঞ্জ, কুমিল্লা, চাটগাঁ, খানাকুলা,
আউর মুরশিদাবাদ—
এ পাঁচো শহর শিরমে লেকর—
চৌপা দেগা চিত্তোয়রে,
তবেই সন্ধি, নচেৎ যুদ্ধং দেহি,
যুদ্ধং দেহি, দেহি, দেহি, দেহিরে।

আলি। (সরোষে) নাই পেয়ে হয়েছে মত্ত
করব এর হেস্ত নেস্ত,
চৌরস্ত বরবাদ বেটা যোরস্ত হইবে,
হবিষ্যির হাঁড়িতে হিন্দুর গোস্ত পড়িবে।

সভা-গণ। সাবাস, সাবাস, কেয়াবৎ, কেয়াবৎ।

আলি। যমনা খাঁ, তামাকটা ধরছে না। একটু ফুঁ দিয়ে যাও। (যমনা খাঁর তথাকরণ)

(অন্ধুকে বাঁধিয়া ও হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ)

আলি। এ লোক কোন হ্যায়? কেয়া হ্যায়?

সভা-গণ। কোন হ্যায়। কেয়া হ্যায়।

সৈনিক। জাঁহাপনা। বোধ হয় শত্রুর গুপ্তচর।

আলি। তোপে উড়িয়ে দাও।

সভা-গণ। উড়িয়ে দাও। উড়িয়ে দাও।

(অন্ধুর তেউ তেউ রবে ক্রন্দন)

একজন সভা। চোপরও বেয়াদব। জাঁহাপনার সামনে কান্না। একদম গোস্তাকি।

অন্ধু। আমি ঠাকুর কিছু জানি না। ঐ আবাগি ছুঁড়িই এই সেয়ো ঘটালে। আমায় ছেলেমানুষ পেয়ে সলিয়ে ফলিয়ে বের করে আনলে।

হেমা। আহা! ভয়ে ও প্রণয়ে প্রাণনাথ আমার জ্ঞানহারা হয়েছেন। কি বলছেন, কিছুই জানেন না।

অন্ধু। আমায় ছেড়ে দাও বাবা, আমি এক দৌড়ে গঙ্গাপার হয়ে যাই। ওঁ্যা, ওঁ্যা, ওঁ্যা—

আলি। হায়রানজাদ, বউয়া। কেহ যদি কাঁদবি তো ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

হেমা। না, নবাব, তা কখনই হবে না। যতক্ষণ আমার শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ আপনি কি, আপনার সমস্ত সৈন্যসামন্ত, আপনার সভা, মন্ত্রিবা, সমস্ত একত্র মিলিত হলেও প্রাণেশ্বরের একগাছি কেশও স্পর্শ করতে পারবে না।

অজু। ওরো বাছা, কেন কথা বাড়াও। এখনো প্রণয়। প্রণয়, প্রণয় করেই তো প্রাণটা যেতে বসেছে, আর কেন ঝেড়ে ফেল—

হেমা। নাথ প্রাণাধিক, আমায় বলতে দাও। হৃদয়ের বেগে প্রণয়ের বেগে আমার ধমনীতে রাজপুতীরক্ত দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। হাঁ নবাব, শুনুন, অগ্রে আমার প্রাণোচ্ছেদ করুন। যখন আমায় বধ করতে দুরন্ত পাঠান খড়্গ উত্তোলন করবে তখন আমার মস্তকের একটি কেশও কম্পিত হবে না, পদ একটুও টলবে না, যখন আমার প্রাণপক্ষী দেহনীড় ভেঙে উড়ে যাবে তখনও নাথের আলোকাদেখা আমার নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত হবে। তখনও—

আলি। পাগল, পাগল! এরা কি! তোমরা কে?

অজু। আমি বাপ্পা রাজার বাগানের মালী। নাম অজাগর মাইতি।

হেমা। আহা, নাথের কি বিনয়। যেন বীণাপাণি বীণা বাদন করছেন। আর নবাব, আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবেরার উত্তর আমি পিতার নিকট দিতেম (নেপথ্যে প্রহরীর—আরে, ওরে দুর্গেশনন্দিনী) হাঁ, হাঁ, কিন্তু পাছে আমায় ভীরু মনে করেন তাই বলি, ভুবনবিখ্যাত চিতোররাজ বাপ্পারাও আমার পিতা, মালী-কুলতিলক অজাগর সেই আমার প্রণয়ী ও ভাবী হৃদয়রাজ, আমার নাম হেমাঙ্গিনী। আজ আপনার সমক্ষে বললেম, কাল যদি আবশ্যক হয় তবে—তবে বলুন কার সমক্ষে বলব?

আলি। কি আশ্চর্য! তুমি রাজকন্যা, বাপ্পাকন্যা? তুমি এমন নীচলোকের প্রতি অনুরক্ত হলে কেন?

১ম সভা। হলে কেন?

২য় সভা। কেঁও, কেঁও, কেঁও।

হেমা। (ঈষৎ হাসিয়া) নবাব সাহেব বুঝি কখনো প্রণয় করেন নি? অধিনী এবার আত্মাবলম্বী হলে, কার সাধ্য যে তার গতিরোধ করে।

আলি। সান্‌কিউয়া! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে এদের কোন মন্দ অভিসন্ধি নেই। মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হওয়াতেই এরা রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এদের যদি এখন বাপ্পারাওকে প্রত্যর্পণ করা যায় তাহলে আমাদের অনায়াসে লাভের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার সম্ভাবনা।

১ম সভা। আপনি যথার্থ বলেছেন।

আলি। তুমি এক কাজ কর, শাদা পতাকা নিয়ে শিগগির চিতোর রাজবাড়ীতে গিয়ে সংবাদ দাও। আমি পশ্চাৎ এদের সঙ্গে যাচ্ছি। (সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

[প্রীনরুমের একাংশ। নাট্যকার, সমালোচক ও ম্যানেজারের প্রবেশ]

নাট্য। বলুন মশাই। কেমন, জমাট হচ্ছে কি না বলুন। আপনাকে কিন্তু ভাল করে লিখতে হবে।

সমা। কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না মশাই। এরকম ঐতিহাসিক অসংলগ্নতা আমি কখনো দেখিনি।

নাট্য। হাঃ হাঃ হাঃ! যাপ করবেন, তাহলে আপনি যথার্থ নাটকই দেখেন নি। বিস্ময় উৎপাদনই হচ্ছে নাটকের জীবন। অঘটন ঘটানো, অসম্ভবকে সম্ভব করা, অর্থাৎ এক কথায় যা নয় তাই করানো, এই হচ্ছে নাটক। নাটকের বুৎপত্তি হচ্ছে, ব্যাকরণ মতে, ন+আটক=নাটক। অর্থাৎ যাতে কিছু আটক নেই।

ম্যানে। (নেপথ্যাভিমুখে) এই, আমি দেরায়া নেই। অলমি করো।

(নেপথ্যে—আয়ত্ হায়)

(বোতল ও গ্লাস হস্তে বেয়ারার প্রবেশ : সকলের মদ্যপান)

সখা। বড় স্ট্রং হয়েছে, না? একটু জল দিলে ভাল হয়।

নাট্য। না, খুব ভাইলিউট হয়েছে। আমি ও-ই খাই।

সখা। মশায়, ঠিক বলেছেন, আমি প্রগাঢ় চিন্তা করে দেখলাম, অঘটন ঘটানোই নাটকের মেরুদণ্ড অর্থাৎ স্পাইন্যাল কলম আর শব্দটাই হচ্ছে এর আর্টিরিয়েল ব্লাড অর্থাৎ ধমনীর রক্ত। তা এ নাটকে শব্দটার অভাব নেই, এমন কি excuse my vanity, I have read something of Bengali, আমিই এর অনেক ভাষা বুঝতে পারিনি, তাই থেকে আমি সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছি যে এ নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার।

ম্যানে। চলুন, ওদিকপানে গিয়ে বসা যাক। Next scene আরম্ভ হচ্ছে।

নাট্য। চলুন। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

[চিতোর রাজবাড়ী　ক্ষিপ্ত বাপ্পারাও]

বাপ্পা। এ কি! আমি কি পাগল হলেম। হেমাঙ্গিনী! হেমাঙ্গিনী! কোথায় হেমাঙ্গিনী! পিতাগণ! তোমাদের কন্যাদিগকে আর আজ হ'তে বিশ্বাস কোরো না। কোন্ নিষ্ঠুর রাবণ আমার সীতাকে হরণ করে নে গেল। আমি তাকে বধ করব! হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট হাস্য ও করতালি)

(একজন পুরুষের রাণী বেশে প্রবেশ)

রাণী। (কাঁদিয়া) ওরে আমার হেমা কোথায় গেলিরে বাপ! ওগো প্রাণনাথ গো, আমার হেমাকে এনে দাও গো বাপ।

বাপ্পা। (ক্ষণেক তীব্রদৃষ্টি করিয়া) হুঁউউ! বটে. আমি আমি নিশাচর পরম মায়াবী। কিন্তু আগে এ দুয়ারে হনু—

রাণী। ওরে আমার হেমারে—

বাপ্পা। এই, তুই কেরে?

রাণী। প্রাণেশ্বর, আমার হেমা!

বাপ্পা (ভ্যাংচাইয়া) প্যাণেশ্বর, আমার হেমা! তুই কে?

রাণী। (কাঁদিয়া) বাপ—

বাপ্পা। (সক্রোধে) বটে! চালাকি। আমায় স্টেজে দাঁড় করিয়ে মাটি করবার ফিকির, আমি বুঝতে পারি না বটে! তা এই রইল তোর পাগড়ি, এই রইল তোর চোগা। সরে পাগলামিটা

জমাট করে এনেছি, আর এই! তুই কেরে শালা! (নেপথ্যে চাহিয়া) বলি, ও বইওলা বাবু! একবার ডাক দেখি ম্যানেজারকে, ব্যাপারটা কি শুনি—

(প্রমটাদের দ্রুত প্রবেশ)

প্রম। (রাজার হাত ধরিয়া) রাগ করবেন না। একটা কাণ্ড হয়ে গেছে—

রাজা। কি হয়েছে?

প্রম। (চুপি চুপি) বাবু আর তাঁর দুই ইয়ার অ্যাকট্রেস তিনজনকে নিয়ে বাগানবাড়ী চলে গেছে। আপনি দয়া করে একে দিয়ে ডাক চালিয়ে নিন।

রাজা। তার মানে কি? আমি এর explanation চাই।

প্রম। এত অডিয়েন্সের সামনে—

রাজা। রেখে দাও তোমার অডিয়েন্স। ওঁপো রাণী অডিয়েন্সের সামনে বার করতে লজ্জা করল না।

রাণী। বেশুন! আমি অ্যাক্টেস! আপনাদের মাইনে খাই না। অমন কড়া কথা বলবেন না।

রাজা। তোকে মাইনে দেয় কেরে রাসকেল! তারী বেড়েছিস যে দেখ। অমনি থিয়েটার দেখতে পাস এই চের। সৈজ-টৈজ সাজতে দিই এই তোর বাবার ভাগ্যি।

প্রম। যাক, যাক, আর কিছু বলবেন না। চের হয়েছে। এখন আরম্ভ করুন। গাগলামিটা বেশ জমেছিল, চমৎকার face হয়েছিল। (প্রস্থান)

রাজা। আবার ফিলিং কি শিগগির আসবে। নাও বল।

রাণী। (কাঁদিয়া) ওরে, মহারাজ, আমার দেবা কোথায়?

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ (নিকট হাস্য) কে বলে আমি মহারাজ। এই দেখ আমার শিরে মুকুট জ্বলছে, এই দেখ সিংহাসনের ওপর তালপাছ উঠছে—

রাণী। ও কি মহারাজ, তুমি পাগল হলে নাকি?

(নারদের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

জয় গোধন চারক মুরলী মধুকর।
নবনী লুটিয়ে খায়ক জী।
জয় গোকুল নায়ক অর্জুন তারক
তে এঁটে বয়াটে বারক জী।
জয় যমুনাকি তীরে প্রাণধন জোরে
হরদম্ বংশী বাজাও জী,
জয় আসিলে বাগরী তাবিয়ে গাগরী
কুলের কুলটা মজাও জী।
জয় চূড়াবড়াধারী মেড়া গোড়া কারী
মায়ীর প্রেমের ভাণ্ডারী জী।

অয় ব্রহ্ম কি লম্পট পাড়ী লয়ে চম্পট
একদম কলমের ডাণ্ডে জী।
অয় কি আর বর্ষিব চর্বিত চর্বিব
নিন্দা লভিবে কাগমে জী।

রাজা। ওই দেখ রাণী, আমার হেমাঙ্গিনী এসেছে। (নারদকে) মা, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?

নারদ। কী বাছাধন! আমায় বিদ্রূপ কেন?

রাজা। পাষণ্ড, যবন! রাণী, ধর ত ওকে। আমি কোমরটা বেঁধে নি।

নারদ। এরা কি পাগল নাকি? আচ্ছা দেখি—লাগ্ ভাড়িজি চণ্ডীর আজ্ঞা লাগ্। পাগল হয়তো সেরে যাগ্। (উভয়ের মস্তক স্পর্শ)

রাজা। রাণী! এ কি স্বপ্ন?

রাণী। নাথ। আমিও তাই ভিগেস করছিলেম।

রাজা। একি! মহর্ষি নারদ যে। কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! ওরে তামাক দে।

নারদ। থাক, থাক। আমি তামাক ছেড়ে দিয়েছি।

রাজা। কেন, অমন সৌখিন জিনিষ ছাড়লেন কেন?

নারদ। সে বড় দুঃখের কথা। আমি ত্রৈলোক্যে ঝগড়া বাধিয়ে বেড়াই বলে দেবতারা আমার হুঁকো বন্ধ করে দিলেন, সেই পর্যন্ত তামাক ছেড়ে দিয়েছি।

রাজা। তা বেশ করেছেন। এদিকে আমার বিপদের কথা শুনেছেন কি?

নারদ। হাঁ, আমি তপঃপ্রভাবে সমস্তই অবগত আছি। আপনার কন্যার বিষয় তো? সে বিষয়ে চিন্তিত হবেন না। হেমাঙ্গিনী আপনার বাগানের মালী অঙ্গু মালীর সঙ্গে পলায়ন করে—

রাজা। পাষণ্ডিনী। নরাধমিনী!

রাণী! উঃ! কী বিভীষিকা! (পতন ও মূর্ছা)

নারদ। তারপর তিনি নবাব আলিবর্দির হাতে পতিত হন—

রাজা। আরে রোসো ঠাকুর, এখন রাণী মূর্ছো গেছে। ওরে কে আছিস রে, শিগগির আয়। রাণী মূর্ছা গেছে, তুলে নিয়ে যা। আবার দেবাকোর মত দেরি—

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ ও রাণীকে লইয়া প্রস্থান)

নারদ। নবাব আপনাকে কন্যা ফিরিয়ে দিতে আসছে। অঙ্গু রাজপুত্র, পাপ গ্রহে মালী হয়েছে। এখন যদি—

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানে। আর যদিতে দরকার নেই। সর্বনাশ হয়েছে। ওরে হুসসীন ফেলে দে।

নারদ। ব্যাপার কি!

ম্যানে। বাবু আর তাঁর দুই মডেল অপরূপ তিনজনকে নিয়ে চলে গেছেন। আবার নেতা ধুতি পোষাকের বাকস নিয়ে পালিয়েছে—সর্বনাশ হল আমার।

(নাট্যকারের প্রবেশ)

নাট্য। ও ম্যানেজার বাবু! আপনিও যাচ্ছেন নাকি! ড্রপসীন ফেলে দিচ্ছেন কি! নাটক যে শেষ হয়নি।

ম্যানে। এ নাটক আর কোনদিন শেষ হবে না। আমার সর্বনাশ হয়েছে।

(সমালোচকের প্রবেশ)

সমা। কিছু মশাই, আমার ঐ মত। নায়ক নায়িকার অনেকদিন পরে দেখা হলে আদতে কথা কবে না।

ম্যানে। আমার সর্বনাশ হল আর আপনার সমালোচনা শুরু হল। (অভিনেতাদের প্রতি) যাও, তোমরা গ্রীনরুমে যাও। পোষাক সাবধান! বাবুরা, বাড়িটা যেন কোথাও ফেলো না। যাও, এস সব, স্টেজ ক্লীয়ার কর।

(নাট্যকার ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

নাট্য। তাহলে নাটক আর হবেনা! হায় হায়! আমার ভাল সলিলকিটা বলা হল না, আনোয়ার সেখানে না, কাশী উড়ালে না, ভূত নাবালে না, লাহেব মারলে না। আমি, এ বেটাদের বড় অহঙ্কার! এরা সব আপনারা বই লেখে। কালই আমি বইখানা নাটমহল থিয়েটারে দেব। ওরা বড় ভাল, যা পায় তাই গ্রে করে। ওই যে গিরিশ ঘোষ, তারি বই দেখেন! কৈ, দুর্গেশনন্দিনীতে কি করলেন! যে ভুল সে ভুল। ওরা বঙ্কিমবাবুর ভুল কেটে, আয়েষাকে মেরে ফেলে দিলে। বঙ্কিম বাবুও মলেন। তা মরুন গিয়ে। আমি চললাম নাটমহল থিয়েটারে। ওখানে আমার বই গ্রে হবে। যেমন করে হোক, কাশী উড়িয়ে, ভূত নামিয়ে, চিতোরের সঙ্গে লাহেরদের যুদ্ধ লাগিয়ে তবে ছাড়বো—স্টেজের ওপর ভূতনাবাতেই হবে।

যবনিকা পতন

গল্প-ভারতীর বড় আকর্ষণ

আজ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কট।

ঠিক এমনটি হয়েছিলো পাশ্চাত্য দেশে গত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়। তখন সেখানকার বেতারে পাশ্চাত্যের মহিলা-সমাজ খাদ্য-সঙ্কট সমস্যার সমাধানে নিয়ত বিকল্প-খাদ্য প্রণালীর কথা বলে সঙ্কট মুক্তির সমাধানে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমাদের দেশের খাদ্য-সঙ্কটে এখন সেই রকম পরিকল্পনার প্রয়োজন। আগামী সংখ্যা থেকে প্রতি সংখ্যায় গল্প-ভারতীর মেয়ে-মজলিশ পর্যায়ে বিকল্প খাদ্য প্রসঙ্গে নিয়মিত আলোচনা প্রকাশ করার আয়োজন করা হয়েছে।

বিকল্প খাদ্য রন্ধনের সহজ প্রণালী, তার খাদ্য-মূল্য, পরিপুষ্টি—এই প্রসঙ্গে সুন্দর এবং স্বাবলীল রচনায় অংশ গ্রহণ করবেন :

বেলা দে, আভা পাকড়াশী, হাসি ভট্টাচার্য, মঞ্জু দে, নীলিমা দে, শুক্লা বসু, রেবা রায়, নীলা সেন এবং আরো অনেকে।

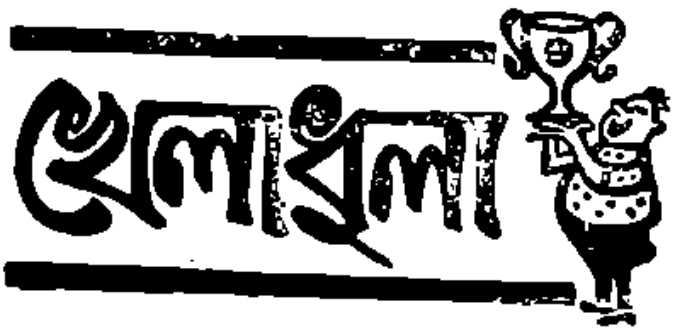

শ্রীজ্যোতির্ময়

ভারত বনাম ইংলণ্ড : প্রথম টেস্ট

ইংলণ্ডের লীডস-এর হেডিংলে মাঠ। আরম্ভ ৮ই জুন ; ১৯৬৭।

প্রাককথন :

এবারকার মতো আবহাওয়া-বিড়ম্বিত সফর ভারত আর কখনো করেনি। শুরু থেকেই বৃষ্টি আর বৃষ্টি। একটা খেলাও ভাল করে খেলতে পারেনি ভারতের খেলোয়াড়রা। তার উপর তেমনি দুর্ভাগ্য নিত। অধিনায়ক পাতাউদি তো স্পষ্ট স্বীকার করেছেন, 'আমরা ভাল খেলতে পারছি না। তার কারণ এভাবে ভাল মত অনুশীলন করবার কোন সুযোগই আমাদেরই ঘটল না। ফলে আমাদের কোন্ খেলোয়াড় এই সফরে এসে কতখানি উন্নতি করেছেন বা করতে পারবেন তার কোন হদিসই আমরা পাচ্ছি না ; ফলে প্রথম টেস্ট-এ দল গঠন করাও রীতিমতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।' যাই হোক শেষ পর্যন্ত পাতাউদি, বোরদে ও দলের ম্যানেজার তারাপোর পরামর্শ করে দল নির্বাচিত করেন।

ভারতীয় দলে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম।—

পাতৌদি (অধিনায়ক), ইনজিনিয়ার, ফরি সুরি, অজিত ওয়াদেকার, বোরদে, হনুমন্ত সিং, রমেশ শকসেনা, প্রসন্ন, সুব্রত গুহ, বিশেন বেদি ও চন্দ্রশেখর। বামন ব্যক্তি ভেঙ্কটরাঘবন। সারদেশাই আহত বলে তাঁকে দলভুক্ত করা হয়নি। তাঁর জায়গায় ফরি সুরি দলে এসেছেন।

গত বছরের আগষ্টে যে ইংলণ্ড দল ওভালে শক্তিধর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারিয়েছিল, সেই দলের দশজন এবারেও প্রথম টেষ্টে খেলবেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে হারাবার কৃতিত্ব যেখান যে কাপ্তেন সেই ব্রায়ান ক্লোজই ভারতের বিপক্ষে জাতীয় দলের নেতৃত্ব করবেন। গত বছরের দল থেকে বাদ পড়েছেন একমাত্র বার্বার। তাঁর জায়গা বদল করেছেন এসেক্সের রবীন হবস।

আগামী জানুয়ারীতে এম সি সি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর করবে। নির্বাচিত হলে সেই দলের সঙ্গে বার্বার যেতে রাজী কিনা তা এখনও জানান নি বলেই তাঁকে দল থেকে বাদ রাখা হয়েছে। বিশ্বস্ত খেলোয়াড় পঁচিশ বছর বয়স রবীন হবস উঠতি লেগ ব্রেক গুগলি বোলার। হবসের অন্তর্ভুক্তিতে ইংলণ্ডের বোলিংয়ে বৈচিত্র্য আসবে। অন্য স্পিনার হলেন রে ইলিংওয়ার্থ এবং কাট বোলার জুটি হলেন জন স্নো ও কেন শিপ্সন। ইংলণ্ডের পক্ষে নির্বাচিত বারোজন :—

ব্রায়ান ক্লোজ (অধিনায়ক) জন মাকে (উইকেট রক্ষক), কেন ব্যারিংটন, মিডল্টন বয়কট, ফেসিল ডি অলিভেরা, জন এডরিচ, টম গ্রেভেনী, কেন ফিলপ, রবীন হবস, রে ইলিংওয়ার্থ, জন স্নো ও ডি এনিস।

প্রথম দিনের খেলা :

ইংলণ্ড টসে জিতে ব্যাটিং করতে নামে এবং দিনের শেষে তাদের ৩ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান হয়। ব্যারিংটনের দুর্ভাগ্য ১৩ রান করবার পর রান আউট। বয়কট ১০৬ রান করে নট আউট। ভারতের ফ্রাইল্ড ফিলডিং ভাল। কিন্তু ক্যাচ ধরায় যথাপূর্বং। দুটি ক্যাচ ফেলে দেওয়া হয়। এনজিনিয়ার অপূর্ব দক্ষতায় এডরিচের ক্যাচ ধরেন, ও ব্যারিংটনকে রান আউট করেন। প্রায় সারাদিন ইংলণ্ডের মন্থর ব্যাটিং দেখে দর্শকরা খুসী হতে পারেন নি। ভারতীয় বোলিং-এর কোন ধার ছিল না। সুব্রত গুহ প্রথম দিন একেবারে নিষ্ফল, ২৫ ওভার ৫৬ রান। কোন উইকেট পাননি। প্রসন্নও তাই, কোন উইকেট না পেয়ে ৫৩ ওভারে ১০৫ রান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন :

ভারতের পক্ষে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। ভারত অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের সম্মুখীন—যদি না বৃষ্টিপাতে খেলা পণ্ড হয়। বয়কট ও অলিভেরা ভারতীয় বোলারদের বল মেরে চেষ্টা করে দিয়েছেন। বয়কট আউট না হয়ে ২৪৬, অলিভেরা ১০১। ইংলণ্ড ৪ জনে ৫৫০ রান তুলে ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারত ব্যাট করতে নেমে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের ৩ উইকেটে ৮৩ রান হয়। ভারতের ফিল্ডিং ভাল হলেও সুব্রতর দুটো ক্যাচ ফসকেছেন। বোলাররা সুবিধা করতে পারেন নি। অল্পদিনের মধ্যে নাম করে সুব্রত গুহ ভাগ্যগুণে মস্তবড় সুযোগ পেয়েছিলেন। হঠাৎ একেবারে লর্ডসকারী টেস্টদলে এবং প্রথম টেস্টেই ওপেনিং বোলার, কিন্তু একটিও উইকেট পান নি। ৬৩ ওভার বল করে ১০৫ রান দিয়েছেন। এই সূত্রে মনে পড়ছে আর একজন বাঙালী বোলারের কথা। সুঁটে ব্যানার্জি। তাঁর তখন অনেক নাম অনেক কীর্তি। ইংলণ্ড সফরে দলে নেওয়া হল। কিন্তু একটি টেস্টেও দলভুক্ত হলেন না। অথচ অনেক খেলায় দুর্গান্ত বল করেছেন। তাছাড়া ব্যাটিংএও কম নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন নি। একটি প্রথম শ্রেণীর কাউন্টি খেলায় সারের বিরুদ্ধে শেষ ব্যাটসম্যান রূপে খেলতে নেমে যখন ব্যাটসম্যান লারভাতের সঙ্গে জুটি বেঁধে তাঁর ও লারভাতের দুজনকার সেঞ্চুরি—আজো বিশ্ব-রেকর্ড। যাক সে কথা। আশা করি সুব্রত গুহ পরবর্তী খেলাগুলিতে ভাল বল করে সুনাম পাবেন।

প্রথম দিনের খেলার পর একজন বড়দরের ক্রিকেটার ও জহুরীর মত : বয়কট অতি মন্থর। টেস্টদলে টিকতে পারবেন কিনা সন্দেহ। তিনি যেন ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়া। দর্শকরা তাঁকে ব্যাঙ্গ করেন। ভারতীয় দলের আক্রমণে ধার নেই। টেস্টম্যাচের তুলনায় মান অত্যন্ত নীচু। চন্দ্রশেখর সবাইকে নিরাশ করেছেন।

তৃতীয় দিন :

প্রথম ইনিংসে সোবার্সের ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ভারত মাত্র ১৬৪ রান করে সবাই আউট। তার মধ্যে কাপ্তেন পাতাউদির অধিনায়কোচিত ৬৪ রান সারা ক্রিকেট জগতের অভিনন্দন লাভ করেছে। খোঁড়া পা নিয়ে সুব্রতও বিশেষ দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ইংলণ্ডের বোলারদের মধ্যে ইলিংওয়ার্থ ব্রহম ও মো যথাক্রমে ৩, ৩, ২ উইকেট লাভ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

৩৮৬ রান মাথায় নিয়ে ভারত ফলো অন করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ২য় ইনিংসে ৩৮৬ রান করতে পারলে তবে লর্ডসের ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে ভারত অব্যাহতি পাবে। সাহসী ব্যাটসম্যান বটে ইনজিনীয়ার! একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে অমিত বিক্রমে চৌড়িয়ে ৮৭ রান করলেন। আর ওয়াদেকর যে সত্যিই ভাল খেলোয়াড় তা প্রমাণ করলেন অপরাজিত ৮৪ রান করে। দিনের শেষে ২য় ইনিংসে ভারত ২ উইকেট খুইয়ে ১৯৮ রান করেছে। খেলার ভাষ্যকাররা উচ্ছ্বসিত। বললেন, যতবারই দেখেছি, কোনঠাসা হয়ে ২য় ইনিংসেও ভারত ততবারই ভাল খেলে। বৃটিশ কাগজগুলোরাও খুব বাহবা দিলেন। রবিবারের কাগজগুলো ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ডেলিতে একসপ্রেসে ডেভিস কমটন লিখেছেন : 'ভারতীয় দলে যে প্রতিভা বা প্রহারের ঘাটতি নেই, তা প্রমাণ হল।' নিউজ অফ দি ওয়ার্ল্ডে রিচি বেনো লিখলেন, 'ভারতের মান নীচু স্তরের একথা আমি স্বীকার করিনা।' অবজারভারে অ্যালেন রস লিখেছেন, 'ইনজিনীয়ার ও ওয়াদেকরের ব্যাটিং নৈপুণ্য মহৎকীর্তি ব্যাটসম্যানদের স্মরণ করিয়ে দেয়।' সানডে টিটিজেন লিখলে : 'একটি চোখ নিয়ে পতৌদি ও এক পায়ে সুব্রতে যে অধ্যবসায় ফুটিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। ভারত হারলেও বীরের মত লড়ে হেরেছে বলতে হবে।'

চতুর্থ দিন :

ক্রিকেট খেলায় ভারত তার সংগ্রামী ঐতিহ্য পুরোপুরি বজায় রেখেছে। এই দিন আশ্চর্য সাহস এবং দৃঢ়তার সঙ্গে মারমুখি ব্যাটিং করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ইংলণ্ডের বোলারদের একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছেন। খেলার শেষে ভারতের ৮ উইকেটে ৪১৫ রান হয়েছে, যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। আর তারই মধ্যে চমকপ্রদ হোলো পাতাউদির নট আউট ১২৩। এই টেস্টের ২ ইনিংসে খেলায় পাতাউদি যে অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখালেন তাতে তিনি নিঃসন্দেহে এ যুগের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান রূপে স্বকৃতি লাভ করবেন। পাতাউদির টেস্ট সেনচুরির খতিয়ান :

১০৩—ব: ইংলণ্ড (মাদ্রাজ ৬১—৬২)।

২০৩—ব: ইংলণ্ড (দিল্লী ৬৪)।　১২৮—ব: অষ্ট্রেলিয়া (মাদ্রাজ ৬৫)।

১৪৩—ব: নিউজিল্যাণ্ড (দিল্লী ৬৩)।　১২৯—ব: ইংলণ্ড (লিডস্ ৬৭)।

পঞ্চম দিন :

প্রথম টেস্টে ভারত পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এই পরাজয়ের গৌরবে আজ সারা ক্রিকেট জগৎ অনুরঞ্জিত। ৩৮৬ রানের ব্যবধানে ফলোঅন করে যে ধরনের ইনিংসে হার সম্পর্কে সকলেই

একদল ছিলেন, সেই দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪১০ রানে শেষ হবার পর জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ১২৬ রান ৪ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ইংলণ্ড ৬ উইকেটে জয়লাভ করেছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত যে অভাবনীয় ব্যাটিং পরাক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা দেখে ভারত ভারত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও স্তম্ভিত। ইংলণ্ডের অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মান এত উচ্চ ছিল যে তাদের প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়-সমালোচক কিথ মিলার বলেছেন, সাবাস, সাবাস! বিলাতের সমস্ত সংবাদপত্র ভারতের প্রশংসায় মুখর। ডেলি মিরর লিখেছেন, ভারত জিন্দাবাদ, পাতৌদি জিন্দাবাদ। ভারতীয় ক্রিকেট দীর্ঘজীবি হোক। স্যার নিয়ারী কনষ্টানটাইন বলেছেন, পাতৌদির খেলা সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় ইনিংস। ডেলী মেল পত্রিকার হেডলাইন ছিল— Tiger, Tiger burning bright! সোয়াটন টেলিভিশনে বলেছেন, এই স্মরণীয় ও আকর্ষণীয় ক্রিকেটের জন্য পাতৌদি এবং তাঁর দলের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

স্কোর বোর্ড

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস

বয়কট নট আউট	২৪৬
এডরিচ, ক ইনজিনিয়ার ব সুব্রতি	১
ব্যারিংটন রানআউট	৯০
গ্রেভনী ক সুব্রতি ব চন্দ্রশেখর	৫৯
ডি ওলিভেরা ক পরিবর্ত ব চন্দ্রশেখর	১০৯
ক্লোজ নট আউট	২২
অতিরিক্ত	২০
মোট (৪ উই)	৫৫০ ডিঃ

বোলিং—	
এস গুহ	৪৩—১৯—১০৫—০
সুব্রতি	১১— ২— ২২—১
চন্দ্রশেখর	৪৫— ৯—১২১—২
বি বেদী	১৫— ৮— ৩২—১
প্রসন্ন	৫২— ৮—১৮৫—০
পাতৌদি	৪— ১— ১০—০
ওয়াদেকার	২— ০— ৯—০
হনুমন্ত	৫— ০— ২৭—০
শকসেনা	২— ০— ১১—০

ভারত : প্রথম ইনিংস

এম ইঞ্জিনীয়ার ক ও ব ইলিংওয়ার্থ	৪২
আর শকসেনা ব ডি ওলিভিয়েরা	৯
এ ওয়াদেকার রান আউট	০
চাদু বোরদে ব মো	৮
হনুমন্ত সিং ক ডি ওলিভিয়েরা ব ইলিংওয়ার্থ	৯
পাতৌদির নবাব ক ব্যারিংটন ব হবস	৬৩
ই এ এস প্রসন্ন ক মারে ব ইলিংওয়ার্থ	০
এস গুহ ব মো	৪
আর সুব্রতি ক ও ব হবস	২২
বি বেদী এল বি ডবলিউ ব হবস	০
বি চন্দ্রশেখর অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৬
মোট	১৬৪

বোলিং : মো ১৭-৭-৩৪-২, হিগস্ ১৩-৬-১৯-০, ডি ওলিভিয়েরা ৯-৪-২৯-১, হবস ২২-২-৯-৪৫-৩, ইলিংওয়ার্থ ২২-১১-৩১-৩, ক্লোজ ৩-৩-০-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংসে

ইঞ্জিনিয়ার ক ও ব ফ্রোম	৮৭
সুতি ক মারে ব মো	৫
ওয়াদেকর ক ফ্রোম ব ইলিংওয়ার্থ	৯১
বোরদে ব ইলিংওয়ার্থ	৩৩
হনুমন্ত সিং কণ্ডলিফিয়েরা ব ইলিংওয়ার্থ	৭৩
পাতৌদি ব ইলিংওয়ার্থ	১৪৮
আর শকসেনা ব মো	১৬
প্রসন্ন এল বি ডব্লিউ ব ফ্রোম	১১
সুব্রত গুহ ব কিলস	১
বি বেদী ক মো ব হবস	১৪
চন্দ্রশেখর অপরাজিত	৩
অতিরিক্ত	২৩
মোট	৫১০

বোলিং—মো ৪১—১০—১০৮—২, কিলস্ ২৪—৩—৭১—১, ডি ওলিভিয়েরা ১১—৪—২৯—০, ইলিংওয়ার্থ ৫৮—২৬—১০০—৪, হবস্ ৪৪—২—১৩—১০০—১, ব্যারিংটন ৯—১—৩৮—০, ফ্রোম ২১—৪—৪৮—২।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংসে

জন এডরিচ ক ওয়াদেকার ব চন্দ্রশেখর	২২
কেন ব্যারিংটন ক ইঞ্জিনীয়ার ব চন্দ্রশেখর	৪৬
টম গ্রেভনী ব চন্দ্রশেখর	১৪
ডি ওলিভিয়েরা অপরাজিত	২৪
জে মারে ক অতিরিক্ত ব প্রসন্ন	৪
আর ইলিংওয়ার্থ অপরাজিত	১২
অতিরিক্ত	৪
৪ উইঃ	১২৬

বোলিং : গুহ—৫—০—১০—০, ওয়াদেকার ২—০—৮—০, প্রসন্ন ২১—৩—৫—৫৪—১, চন্দ্রশেখর ১৯—৮—৪০—৩।

বাঙালী বাংলার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার শ্রেষ্ঠতম মনিষীগণ বাংলার যে চিন্তা ও ভাবকে ভিলে ভিলে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন আজিকার বাঙালী যুবকেরা কেবল নহেন অনেক বৃদ্ধরা পর্যন্ত সে বাংলাকে চেনেন না। বাংলার চিন্তারাজ্য আজ নিষ্পন্দ, ভাবের স্রোত বন্ধ। বাংলার যে বৈশিষ্ট্য চিরদিন ছিল এখনও আছে, যে বৈশিষ্ট্য হারাইলে ভারতবর্ষের সমষ্টিগত চিন্তা ভাব ও কর্মভাণ্ডারে বাংলার আর কিছুই দিবার থাকিবে না, সে বৈশিষ্ট্যের কথা আজিকার বাঙালী কেবল ভুলিয়াছেন তাহা নহে, তাহার উল্লেখ মাত্র তাহাদিগকে অধীর করিয়া তুলে—

বিপিন চন্দ্র পাল

খরা ক্লিষ্ট জনগণের জন্য সাহায্য হিসাবে

এখন

আরও বেশী দান করুন

"আমি আপনাদের কাছে যেমন আর্থিক সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি, অনাবৃষ্টি ক্লিষ্ট জনগণের দুর্দশা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার জন্য আরও বেশী করে আবেদন জানাচ্ছি। এটা স্থানীয় সমস্যা নয়। এটা হ'ল ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর দুর্দশার সমস্যা।

যাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের সাধ্যানুযায়ী দান করেছেন তাঁদের কাছে আমি আরও সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। যাঁরা এখনও কোন দান করেননি তাঁদের কাছে আমি মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। এখনই যথাসাধ্য দান করার জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।"

জাতির উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা।

প্রধান মন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিলে যথাসাধ্য দান করুন

ডাকযোগে এই তহবিলে অর্থাদি পাঠানো হলে তার জন্য মনি অর্ডারের কমিশন, ডাক মাশুল এবং রেজিষ্ট্রেসন ফী দিতে হয় না। ওষুধপত্র, বস্ত্রাদি, টিনজাত খাদ্যাদি বিনা মাশুলে বিমান যোগে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো যায়। ডাক, বিমান ও রেল মাশুলে আয় করে, আবগারি এবং বহিঃশুল্কেও রেহাই পাওয়া যায়।

প্রধান মন্ত্রীর অনাবৃষ্টি সাহায্য তহবিল
কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, রাষ্ট্রপতি ভবন
নূতন দিল্লী—১

DAVP 67/F-3. BENGALI

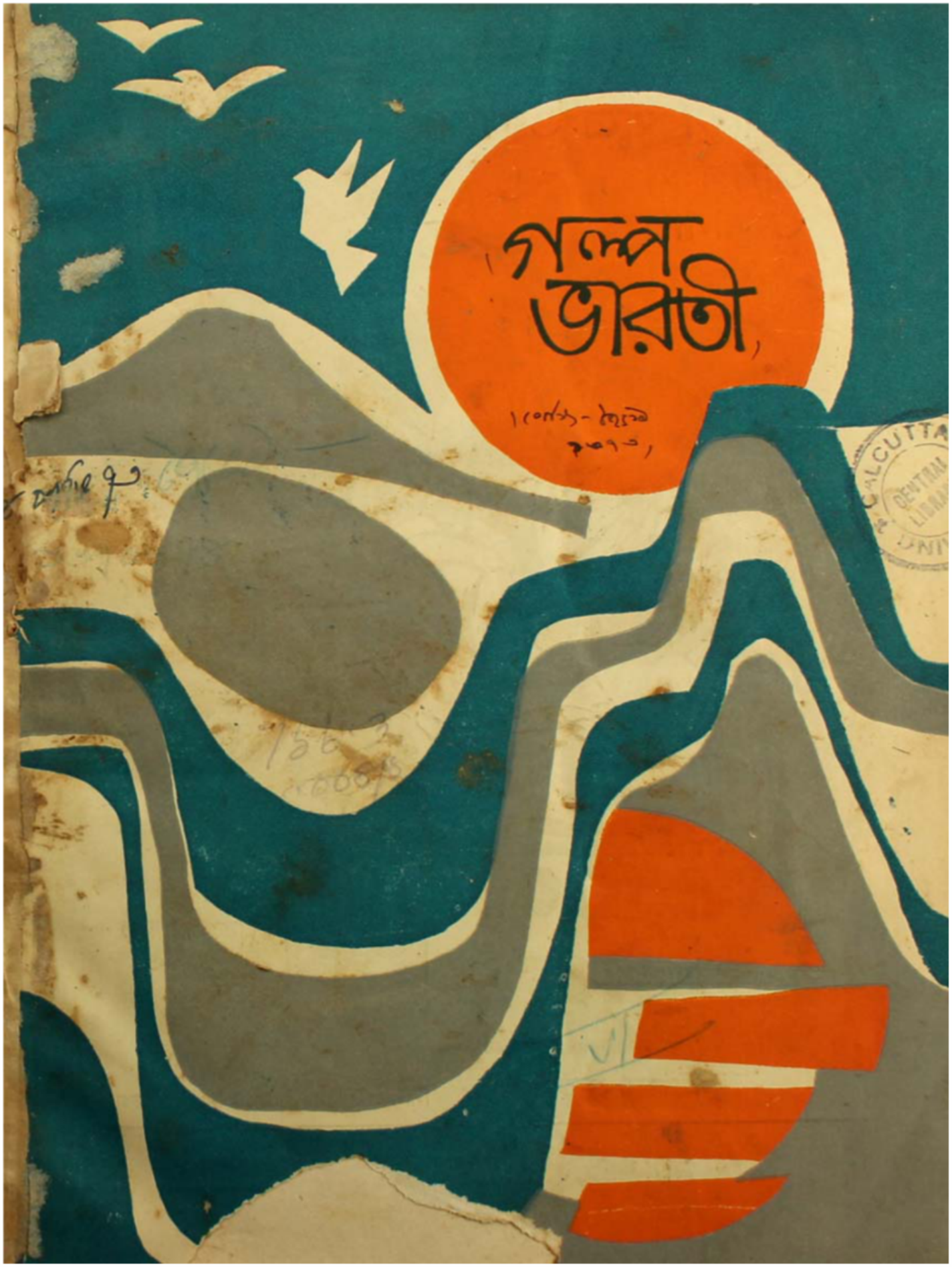
গল্প
ভারতী

প্রসবের পূর্বে ও পরে
আদর্শ পথ্য
ও পানীয়

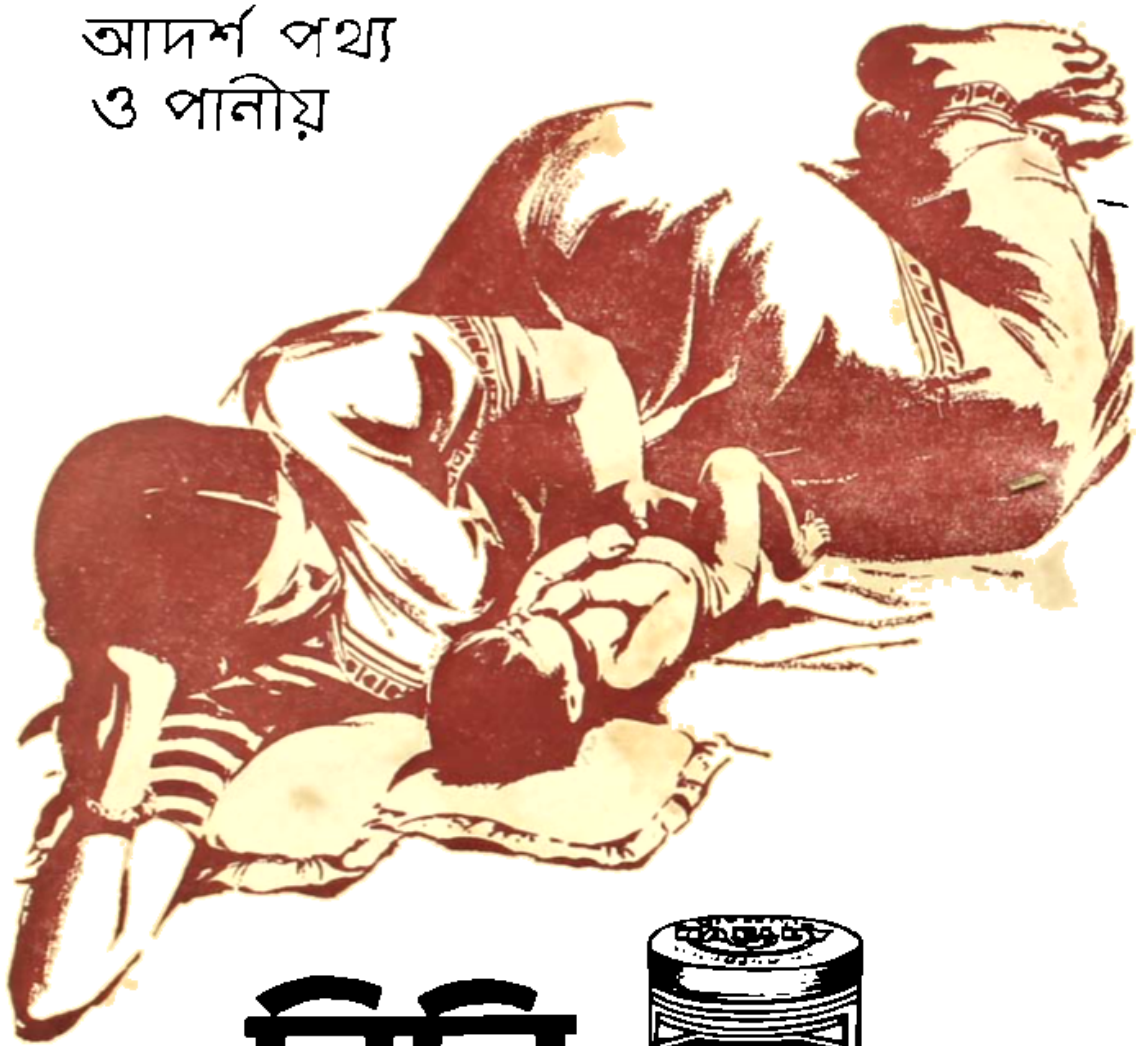

লিলি
ব্র্যাণ্ড
বার্লি

বিশুদ্ধ ও টাটকা

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত।

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

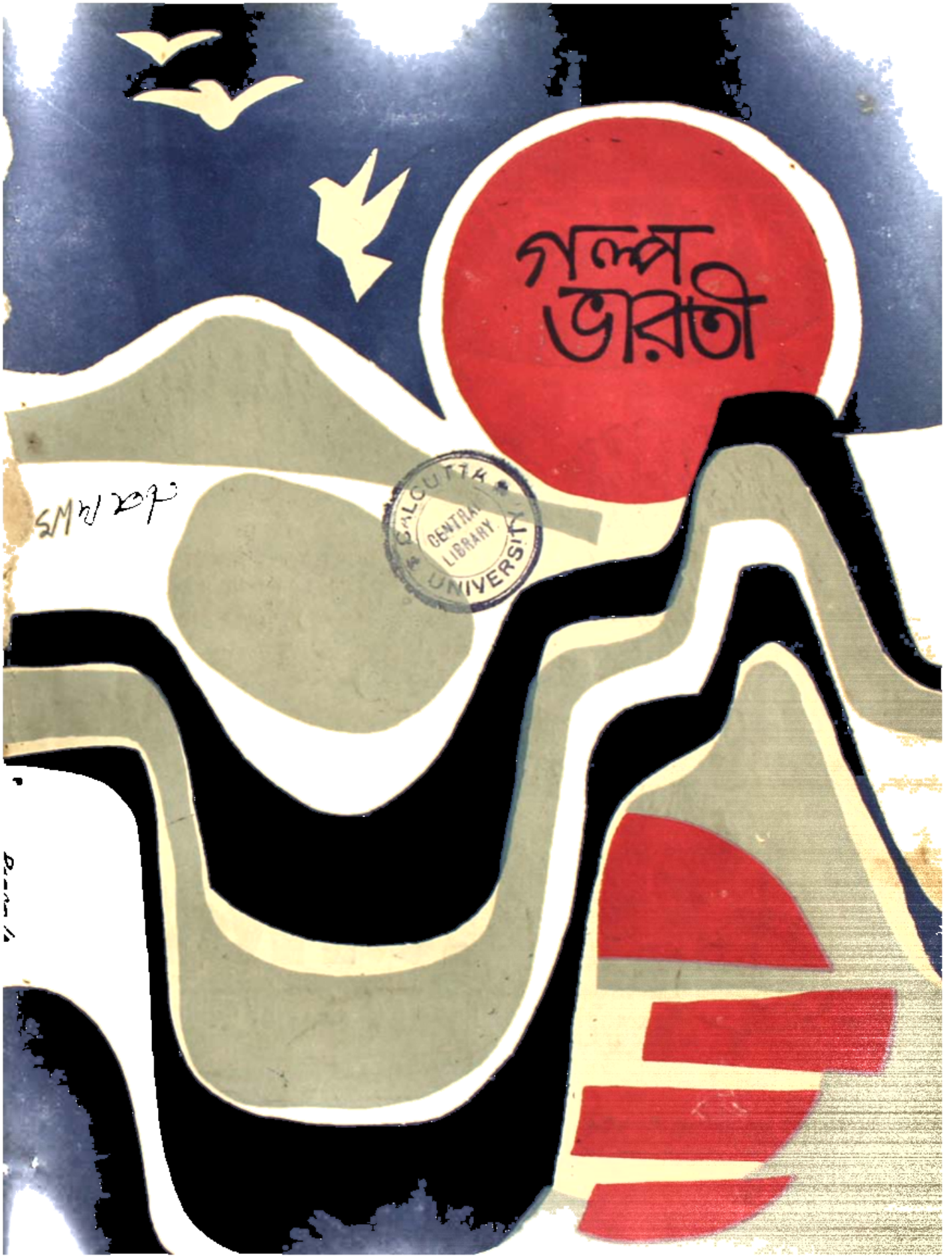

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

নতুন রূপে

লিলি
থিন এরারুট

সবচেয়ে প্রিয় বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোঃ প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

বারী গোল্ড ওয়াটারের পক্ষে প্রচারের আর একটি দৃশ্য

অভিনব প্রচার কৌশল। দোলনায় একটি নারী মূর্তি—ওপরে লেখা "Swing Along with Johnson" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসনের নির্বাচনের সময় এই প্রচার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

উপরে—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে চা বাগানের শ্রমিক ভোটারদের মধ্যে জনৈক প্রার্থীর পক্ষে প্রচারকার্য চালান হচ্ছে।

বামে—সুপ্রীম সোভিয়েতের নির্বাচনে জয়লাভের পর সংসদের অঙ্গনে প্রেসিডিয়ামের পুহগানিন, মুসলভ ও ব্রেজনেভ।

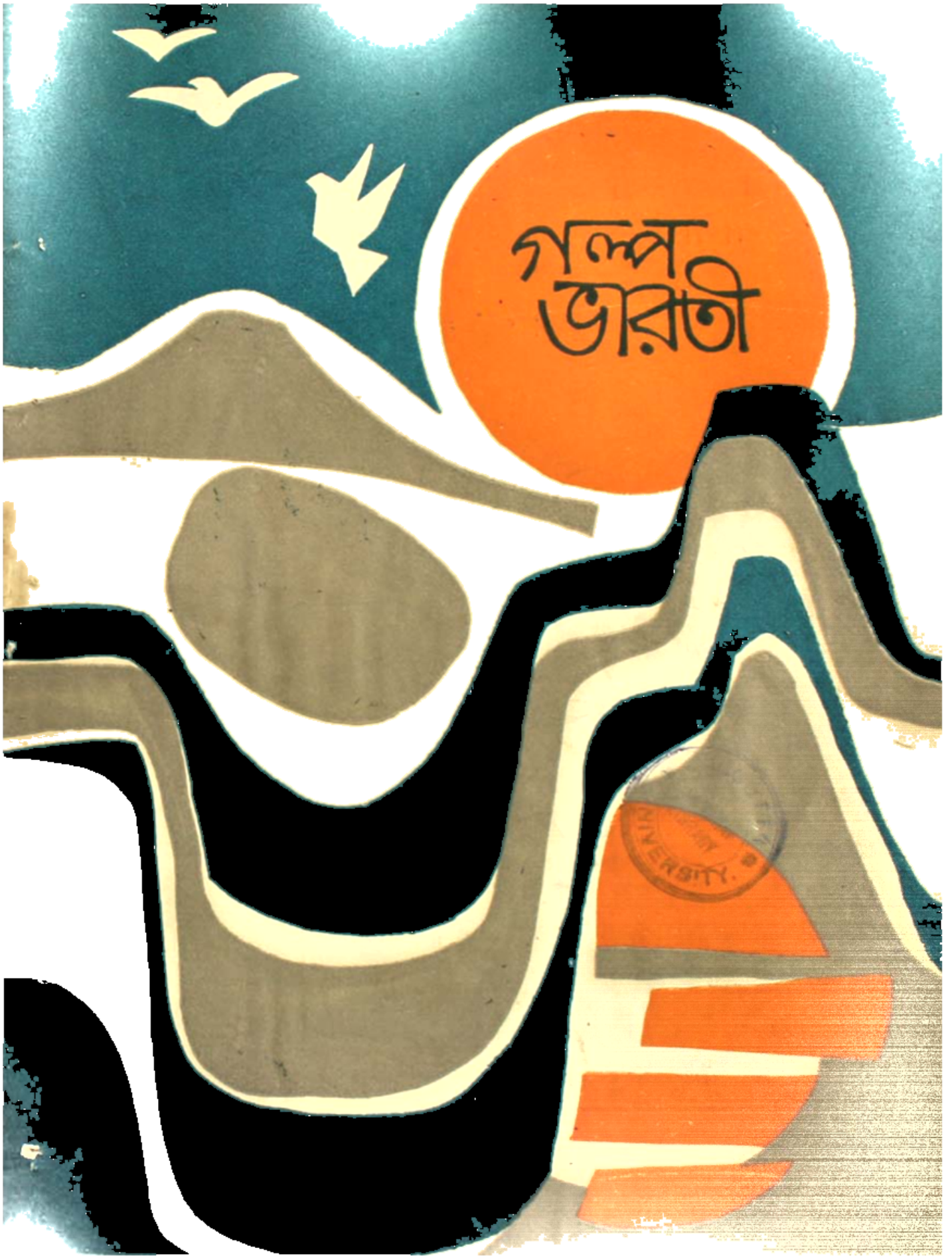
গল্প
ভারতী

প্রসবের পূর্বে ও পরে
আদর্শ পথ্য
ও পানীয়

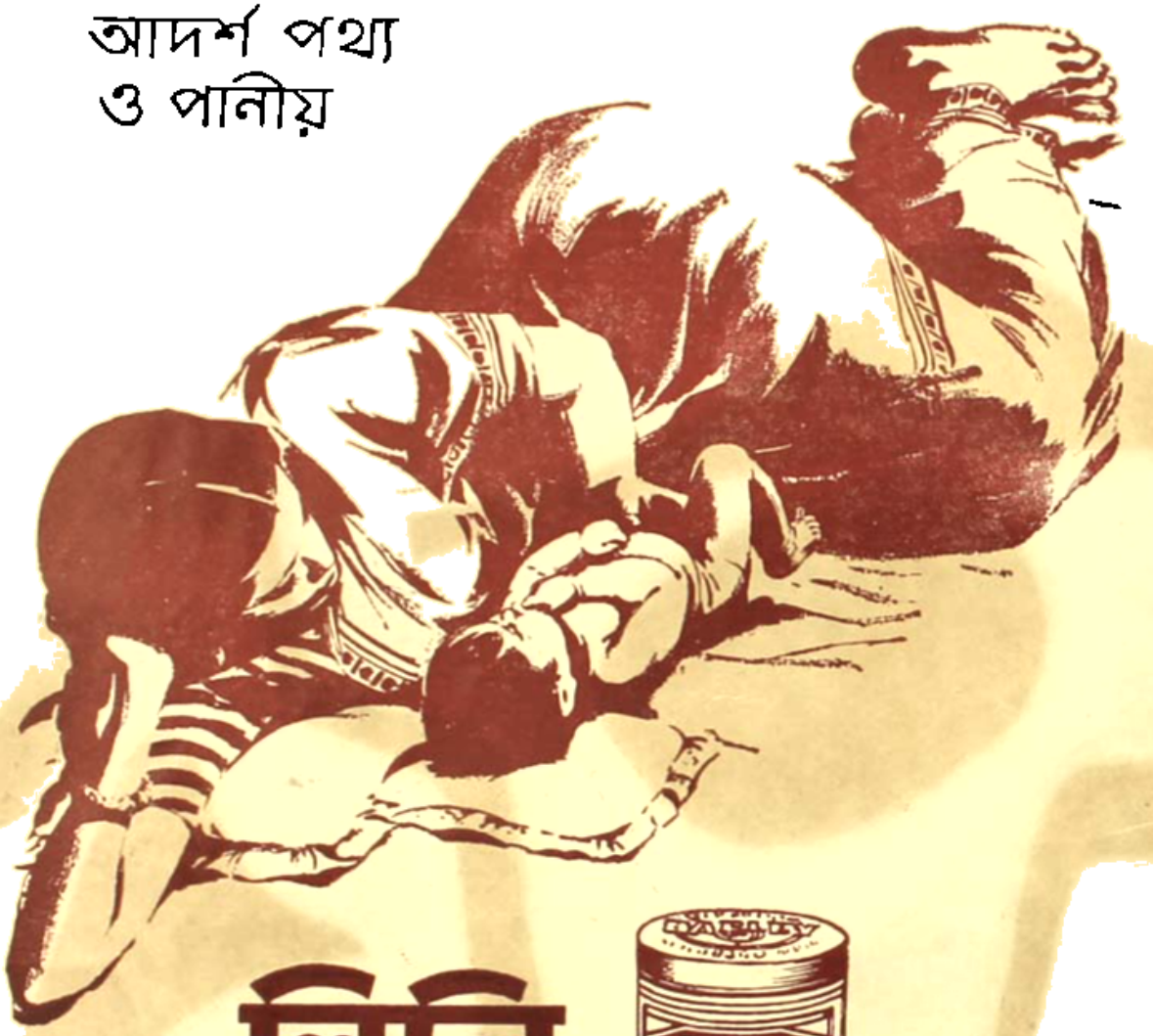

লিলি
ব্র্যাণ্ড
বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত।

বিশুদ্ধ ও টাটকা

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

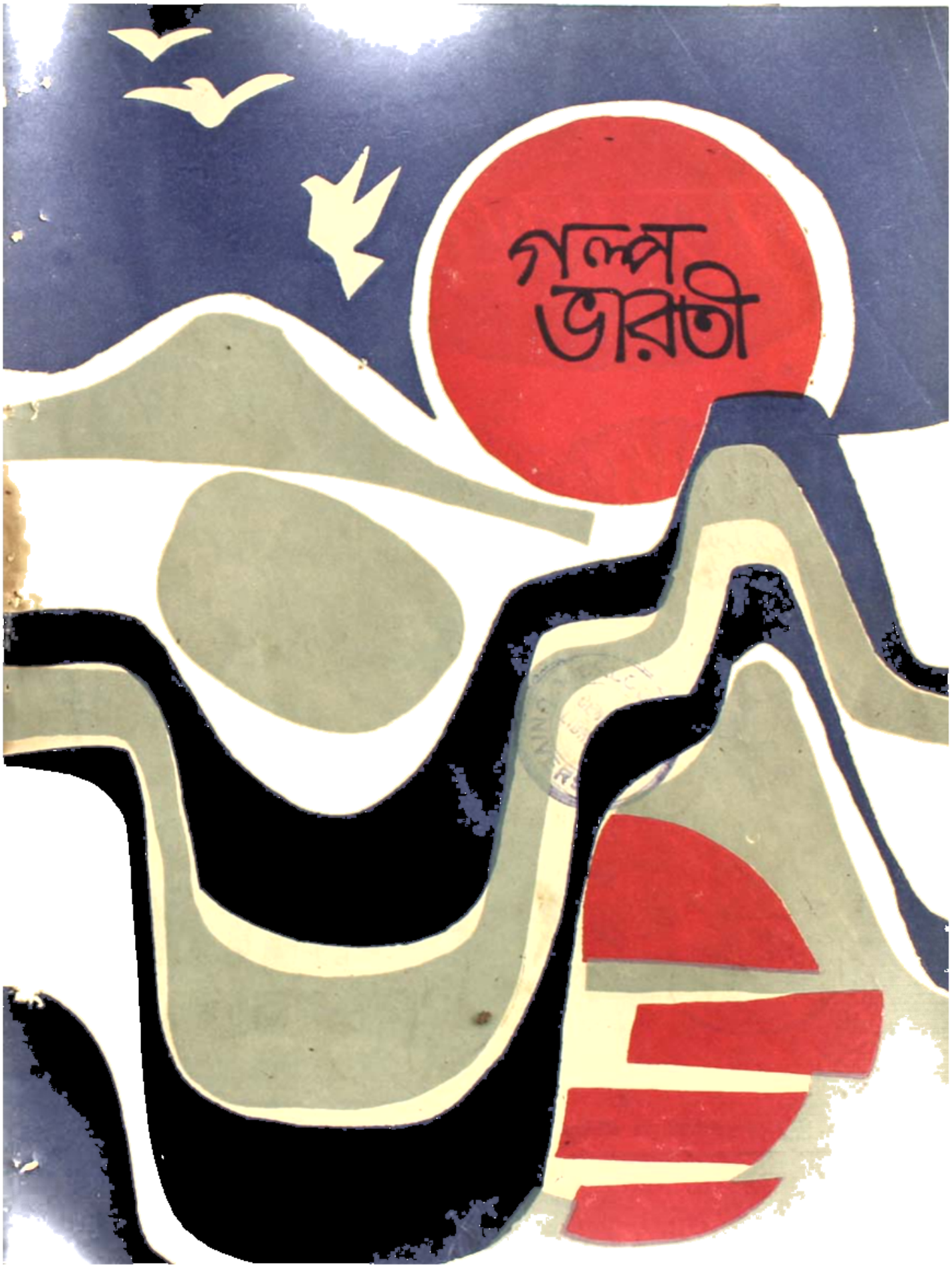
গল্প
ভারতী

নতুন রূপে

লিলি
থিন এরারুট

সবচেয়ে প্রিয় বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

গল্প-ভারতী

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ। একাদশ সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৭৯

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ : রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র সংখ্যা

শিশুদের আদর্শ পানীয় ও পথ্য

লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

বিজ্ঞান সম্মত
প্রণালীতে
প্রস্তুত

সুস্থ, অসুস্থ
সব অবস্থাতেই
সমান
উপকারী

লিলি বার্লি মিলস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

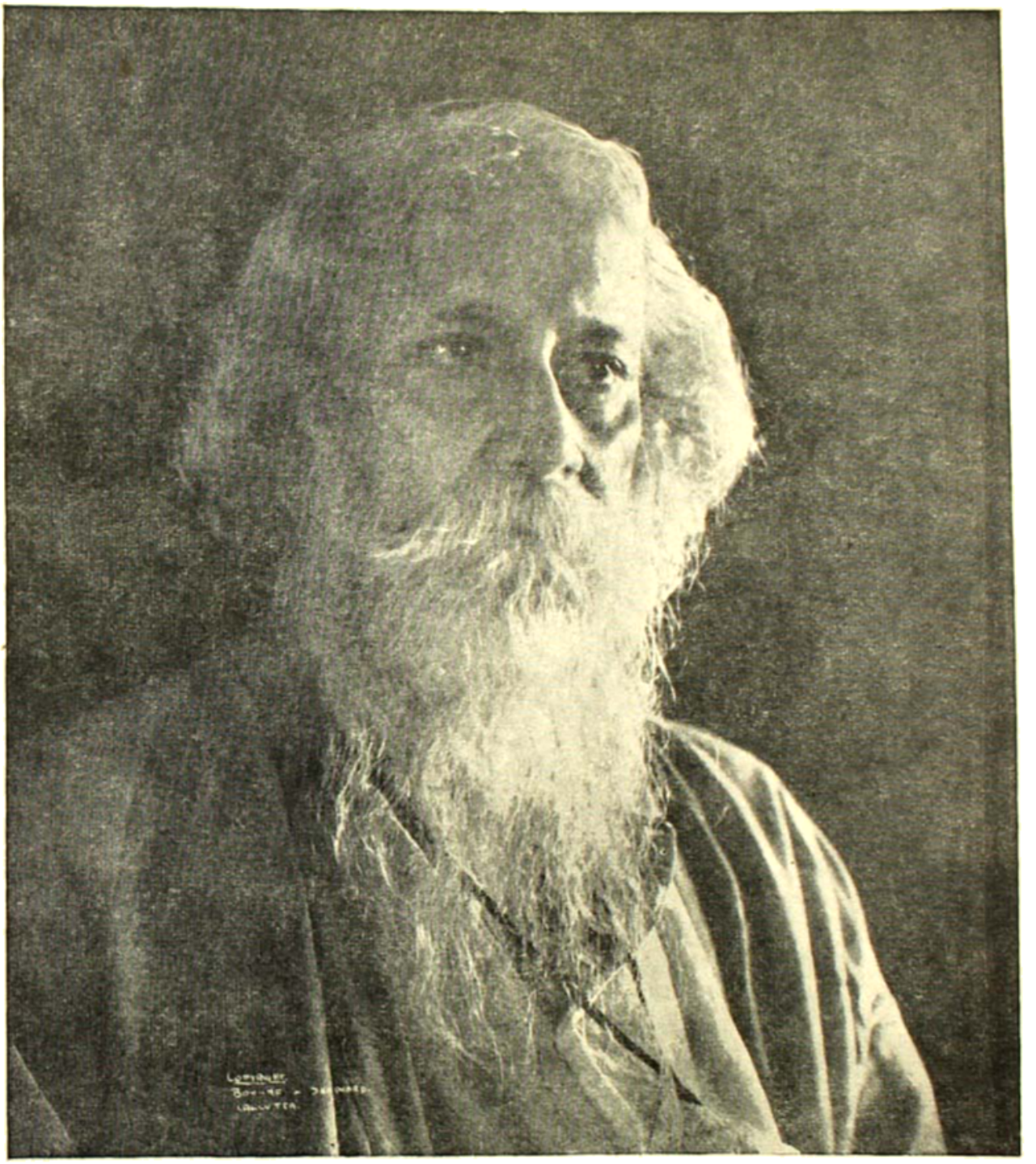

চতুর্থ বার ইউরোপ ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ

Photos - Copyright
Bourne & Shepherd

—রবীন্দ্রনাথ ৭০ বৎসর বয়সে

শেষবার পশ্চিম যাত্রাকালে
রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০-১৯৩১

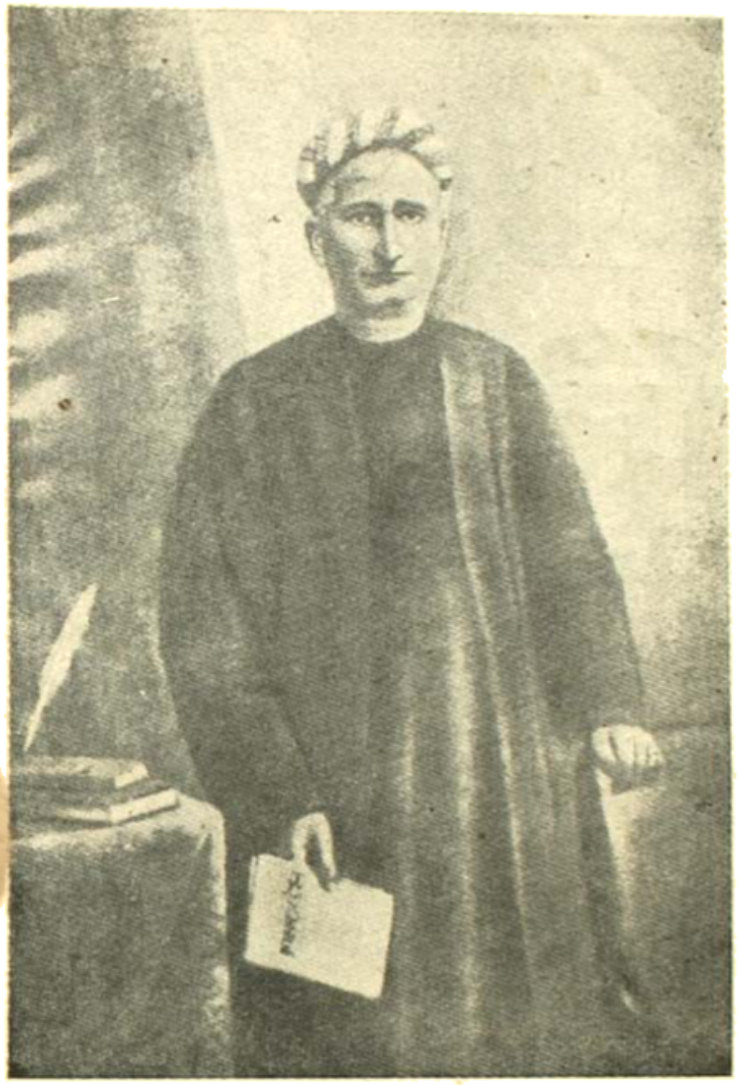

গল্প-ভারতী

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ। দ্বাদশ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪

এই সংখ্যার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

স্বাধীনতা যজ্ঞের দীক্ষাগুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

অমৃতলাল বসুর বাঙ্গ নাটিকা 'তিলতর্পণ'

UNIVERS

লিলি
বিস্কুট

শুধু বড়দের নয়
ছেলেমেয়েদেরও প্রিয়

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

সাধনা
অশোকারিষ্ট

মেয়েদের মুখের হাসি অটুট রাখে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

A-2/67

Regd. No. C3043

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের আধার

লক্ষ্মীঘি

বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত খাদ্য

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

25 JUL 1967